মিখাইল শোলখভ
প্রশান্ত দন
চতুর্থ খণ্ড
প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ

ম. শোলখভ · প্রশান্ত দন · ৪

প্রশান্ত দন

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাস

চতুর্থ খণ্ড

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

М. Шолохов

Тихий Дон

Книга IV

На языке бенгали

Mikhail Sholokhov

Quiet Flows the Don

Book Four

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Ш $\frac{4702010201-543}{031(01)-90}$ 100-90

ISBN 5-05-002893-0
ISBN 5-05-002897-3

সূচী

চতুর্থ খণ্ড

সপ্তম পর্ব ৯
অষ্টম পর্ব ৩৩৩

সপ্তম পর্ব

এক

দনের উজান এলাকার বিদ্রোহ লাল ফৌজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে দক্ষিণ ফ্রন্ট থেকে টেনে নিয়ে গেল। এর ফলে, নোভোচেরকাস্কে যে ফ্রন্টের আড়াল ছিল, দন ফৌজের সেনাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সেখানে নিজের সেনাবল স্বচ্ছন্দে নতুন ক'রে ঢেলে সাজানো সম্ভব ত হলই পরন্তু তারা কামেনস্কায়া ও উস্ত্-বেলাকালিত্‌ভেনস্কায়া জেলার এলাকাতেও মুখ্যত ভাটি এলাকার লোকজন আর কাল্‌মিকদের নিয়ে বেশ জবরদস্ত গোছের অভিজ্ঞ রেজিমেন্টের এক বিশাল হানাদার দলেরও সমাবেশ ঘটিয়ে ফেলল। এই দলের কাজ ছিল সুযোগ বুঝে জেনারেল ফিট্‌জহেলাউরভের ইউনিটগুলোর সঙ্গে মিলে আট নম্বর রেড আর্মির বারো নম্বর ডিভিশনকে ঘায়েল করা এবং তেরো নম্বর ডিভিশন ও উরাল ডিভিশনের পাশ ও পেছন থেকে আঘাত হেনে ব্যূহ ভেদ ক'রে উত্তর দিকে বেরিয়ে আসা, তারপর দনের উজান এলাকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়া।

দন ফৌজের অধিনায়ক জেনারেল দেনিসভ আর তার সদর দপ্তরের প্রধান জেনারেল পলিয়াকভ এক সময় হানাদার দল সমাবেশের যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, মে মাসের শেষের দিকে তা প্রায় পুরোপুরি রূপ পেল। ছত্রিশটা কামান আর একশ' চল্লিশটা মেশিনগান সমেত প্রায় ষোল হাজার সঙীনধারী পদাতিক আর তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল কামেনস্কায়ার দিকে। পল্টনে ডাক পড়ার উপযোগী অল্পবয়সী কসাকদের নিয়ে ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে নওজোয়ান ফৌজ নামে যে সৈন্যদল গড়ে উঠেছিল তার ঝড়তি-পড়তি ঘোড়সওয়ার ইউনিট আর বাছাই রেজিমেন্টগুলো তখনও পজিশন নেওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে বিদ্রোহীরা লাল ফৌজের পিটুনি দলের আক্রমণ ঠেকিয়ে চলেছে। দক্ষিণে দনের বাঁ পারে বিদ্রোহীদের দুটো ডিভিশন শক্ত ঘাঁটি গেড়ে পরিখা আঁকড়ে পড়ে আছে। সমস্ত ফ্রন্ট জুড়ে লাল ফৌজের

অসংখ্য তোপশ্রেণী তাদের ওপর প্রায় অবিরাম নির্মম গোলাবর্ষণ করে চললেও শত্রুপক্ষকে তারা কিছুতেই দন পার হওয়ার সুযোগ দেয় না। বাকি তিনটে ডিভিশনকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে - বিশেষত ফ্রন্টের উত্তর-পূর্ব অংশে ও বটেই। তবু তারা উত্তর, পুব আর পশ্চিম দিক থেকে বিদ্রোহীদের আড়াল দিয়ে চলেছে, সর্বক্ষণ খোপিওর প্রদেশের সীমানায় অটল হয়ে আছে।

তাতারস্কির কসাকদের যে স্কোয়াড্রনটা নিজেদের গাঁয়ের মুখোমুখি ছিল, সেটা এক দিন লাল ফৌজীদের খানিকটা বিপদে ফেলে দিল। দায়ে পড়ে শুয়ে বসে সময় কাটাতে কাটাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল তারা। তাই একদল কসাক সোৎসাহে নিজেদের উদ্যোগে রাতের অন্ধকারে বজরায় চেপে নিঃশব্দে দনের ডান পারে গিয়ে উঠল, অতর্কিতে লাল ফৌজের একটা চৌকির ওপর হানা দিয়ে চারজন লাল ফৌজীকে মেরে একটা মেশিনগান দখল করে ফেলল। পর দিন লাল ফৌজীরা ,ভিওশেনস্কায়ার উপকণ্ঠ থেকে একটা ব্যাটারী নিয়ে এসে কসাকদের ট্রেঞ্চের ওপর প্রচণ্ড গোলা ছুঁড়তে থাকে। বনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে যেই গুমগুম শব্দে বিস্ফোরক-গোলা ফেটে পড়তে থাকে অমনি স্কোয়াড্রনের কসাকরা চটপট ট্রেঞ্চ ছেড়ে দন থেকে খানিকটা দূরে গভীর বনের ভেতর সরে পড়ে। পরের দিন ব্যাটারী সরিয়ে নেওয়া হতে তাতারস্কি লোকেরা তাদের ছেড়ে যাওয়া ঘাঁটি আবার দখল করল। কামানের গোলাবর্ষণে স্কোয়াড্রনের বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। কিছু দিন আগে দল ভারী করার জন্য যাদের আনা হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে দু'জন জোয়ান ছেলে গোলার টুকরো লেগে মারা গেল। এই ঘটনার ঠিক আগে আগে ভিওশেনস্কায়া থেকে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের একজন বার্তাবহ এসেছিল, সেও জখম হল।

এরপর খানিকটা ভাটা পড়ল। ট্রেঞ্চের জীবনযাত্রা আবার আগের অবস্থায় ফিরে এলো। মেয়েরা ঘন ঘন এসে দেখা করতে থাকে। প্রায়ই রাতে তারা রুটি আর ঘরে চোলাই মদ নিয়ে আসে। কসাকদের অবশ্য খাবারদাবারের কোন অভাব ছিল না। দুটো বাছুর দলছুট হয়ে এদিকে এসে পড়েছিল, সে দুটোকে তারা জবাই করেছে। এ ছাড়া রোজই আশেপাশের ঝিলগুলোতে মাছ ধরতে যায়। মাছের ব্যাপারে পাণ্ডা ছিল খ্রিস্তোনিয়া। পিছু হটা লোকজনের মধ্যে কেউ এক জন তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাত লম্বা একটা বেড়াজাল পারে ফেলে গিয়েছিল, সেটা এখন স্কোয়াড্রনের সম্পত্তি। খ্রিস্তোনিয়ার হেফাজতে আছে। খ্রিস্তোনিয়া সব সময় গহীন জল থেকে খেপ ফেলত, জাঁক করে বলত যে খাস জমির এই তল্লাটে এমন একটাও ঝিল নেই যেখানে ও চরে বেড়াতে না পারে। এক সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত ভাবে মাছ ধরে ধরে ওর জামা আর সালোয়ার মাছের আঁষটে গন্ধে

এমন ভরে গেল যে তা আর কিছুতেই দূর হয় না। আনিকুশ্‌কা ত শেষকালে ওর সঙ্গে এক সুড়ঙ্গ-ঘরে রাত কাটাতে সরাসরি অস্বীকারই করে বসল।

'পচা বোয়ালের গন্ধ ছাড়ছে তোর গা থেকে! তোর সঙ্গে যদি আরও একটা দিন এখানে কাটাতে হয় তা হলে জীবনে আর কখনও মাছের দিকে ফিরেও চাইতে ইচ্ছে হবে না।...'

এর পর থেকে আনিকুশ্‌কা মশার কামড় অগ্রাহ্য করে সুড়ঙ্গ-ঘরের বাইরে শুয়ে রাত কাটাতে থাকে। শোবার আগে বিরক্তির সঙ্গে নাক মুখ সিঁটকে কাঁটা দিয়ে বালিতে ছড়ানো মাছের আঁষ আর পূতিগন্ধময় নাড়িভুঁড়ি দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পর দিন সকালে প্রিস্তোনিয়া তার শিকার নিয়ে ফিরে আসে, যেন কিছুই হয় নি এই ভাবে গম্ভীর মুখে সুড়ঙ্গ-ঘরে ঢোকার মুখে বসে আবার পুঁটি মাছের আঁষ ছাড়ায়, নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করে। ওর চারপাশে সবুজ মাছির ঝাঁক ভন ভন করে, ভয়ঙ্কর হলুদ পিঁপড়েগুলো সার বেঁধে চলে। এর পর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে আনিকুশ্‌কা। দূর থেকেই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

'বলি, তোর কি এছাড়া আর কোন জায়গা নেই? হারামজাদা শয়তান, মাছের কাঁটা গলায় ফুটে মরিস নে কেন তুই? সরে যা বলছি, খ্রীষ্টের নাম করে বলছি সরে যা! আমি এখেনে ঘুমোই, আর তুই কিনা মাছের নাড়িভুঁড়ি ছড়াচ্ছিস! সারা তল্লাটের গুচ্ছের পিঁপড়ে টেনে এনেছিস, আর যা গন্ধের আমদানী করেছিস! যেন মেছোহাটা!'

প্রিস্তোনিয়া ঘরে তৈরী ছুরিটা প্যান্টের গায়ে মোছে, আনমনে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আনিকুশ্‌কার বিরক্তিভরা মাকুন্দো মুখখানা। তারপর শান্ত গলায় বলে, 'মাছের গন্ধ যখন সইতে পারিস নে তখন আমার মনে হয় তোর হয়ত কৃমি হয়েছে রে আনিকেই। খালি পেটে রসুন খেয়ে দেখেছিস, অ্যাঁ?'

আনিকুশ্‌কা থুতু ফেলে গালাগাল করতে করতে সরে পড়ে।

খিটিমিটি ওদের নিত্যই লেগে আছে। তবে মোটের ওপর স্কোয়াড্রনটা বেশ সুখে শান্তিতে আছে। পেট পুরে খাওয়াদাওয়া করে কসাকদের মেজাজ খুশ, শুধু স্তেপান আস্তাখভ বাদে।

আক্সিনিয়া যে ভিওশেনস্কায়াতে গ্রিগোরির সঙ্গে মিলছে সে খবর স্তেপান সম্ভবত গ্রামের কসাকদের মুখে শুনেছে কিংবা হয়ত ওর মন তাই বলছিল। সে যাই হোক না কেন, হঠাৎ ও বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিনা কারণেই ট্রুপ কম্যাণ্ডারের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে। সান্ত্রীর কাজে যেতে সরাসরি অস্বীকার করল।

সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে মেঝে পাতার কালো ছাপমারা একটা কম্বল বিছিয়ে সারাদিন ও শুয়ে থাকে, বাইরে বের হয় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর হুস হুস

ক'রে ঘরে তৈরি তামাকের চুরুট টানে। তারপর যখন শুনতে পায় যে আনিকুশ্‌কাকে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার কার্তুজ আনতে ভিওশেনস্কায়াতে পাঠাচ্ছে তখন গত দু'দিনের মধ্যে এই প্রথম সুড়ঙ্গ-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। না ঘুমিয়ে ওর চোখদুটো ফুলে গিয়েছিল, বারবার জল ভরে আসছিল। চোখ কুঁচকে দোদুল্যমান গাছপালার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল উসকো খুসকো পাতা আর হাওয়ায় এলোমেলো মেঘের সাদা কেশরের দিকে সন্দেহ ভরে তাকিয়ে দেখে সে। কান পেতে শোনে বনমর্মর। তারপর সুড়ঙ্গ-ঘরগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে চলে আনিকুশ্‌কার খোঁজে।

অন্য কসাকদের সামনে ওর সঙ্গে কথা বলল না। একপাশে ডেকে নিয়ে অনুনয় করে বলল, 'ভিওশেনস্কায়াতে আক্সিনিয়াকে খুঁজে বার করে আমার নাম করে বলিস যেন দেখতে আসে। বলিস আমার সারা গায়ে উকুন, আমার জামা আর প্যাণ্ট কাচা হয় নি, তাছাড়া আরও বলিস . . .' মুহূর্তের জন্য চুপ করে যায় স্তেপান, গোঁফের ফাঁকে অপ্রতিভ হাসিটা চাপা দেয়। শেষে বলে, 'বলিস যে বড় উতলা হয়ে আছি, শিগ্‌গির দেখা পেতে চাই।'

আনিকুশ্‌কা ভিওশেনস্কায়াতে এলো রাত্রে। খুঁজে বার করল আক্সিনিয়ার আস্তানা। গ্রিগোরির সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে যাবার পর সে আগের মতোই আবার মাসীর ওখানে বাস করছিল। স্তেপান ওকে যা যা বলতে বলেছিল আনিকুশ্‌কা এতটুকু কারচুপি না করে সব ওকে বলল। তবে গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য নিজে থেকে জুড়ে দিল যে আক্সিনিয়া যদি না আসে তাহলে স্তেপান নিজে ভিওশেনস্কায়াতে আসবে বলে শাসিয়েছে।

আক্সিনিয়া ধৈর্য ধরে নির্দেশ শোনে, তারপর যাবার জন্য তৈরি হতে থাকে। মাসী তাড়াতাড়ি ময়দা মেখে কিছু পিঠে ভেজে দিল। দু'ঘণ্টা বাদে একেবারে সাধ্বী বৌটি হয়ে আক্সিনিয়া আনিকুশ্‌কার সঙ্গে চলল তাতারস্কি-স্কোয়াড্রনের ঘাঁটির দিকে।

বৌয়ের সঙ্গে দেখা হতে স্তেপান ভেতরে ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করে। প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তার মুখ। অনেকটা শুকিয়ে গেছে মুখখানা। সাবধানে জিজ্ঞেসবাদ করল তাকে। কিন্তু ভুলেও জিজ্ঞেস করে না গ্রিগোরির সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল কিনা। শুধু একবার কথাবার্তার মাঝখানে চোখ নামিয়ে মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'ভিওশেনস্কায়া দিয়ে পার হতে গেলে কেন? গাঁয়ের দিক থেকেই ত পার হতে পারতে।'

আক্সিনিয়া শুকনো গলায় জবাব দিল বাইরের লোকজনের সঙ্গে পার হওয়ার সুযোগ জোটে নি, মেলেখভদের বলতেও ইচ্ছে হয় নি। জবাবটা দেওয়ার পরমুহূর্তেই আক্সিনিয়ার খেয়াল হল ওর কথার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে মেলেখভরা

বাইরের লোক নয়, ওর আপনারি লোক। স্তেপানও এই রকমই মানে করতে পারে ভেবে সে একটু ফাঁপড়ে পড়ে যায়। স্তেপান সম্ভবত তা-ই বুঝে নিয়েছিল। স্তেপানের ভুরুর নীচেটা কেমন যেন কেঁপে ওঠে, মুখের ওপর যেন খেলে যায় কালো ছায়া।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে সে তাকায় আক্সিনিয়ার দিকে। আক্সিনিয়াও এই নীরব প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পেরে ভেবাচেকা খেয়ে যায়। নিজের ওপরে নিজেই বিরক্তি বোধ ক'রে হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে।

স্তেপান ওকে ক্ষমা করে দেয়, এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই লক্ষ করে নি। প্রসঙ্গ পালটে ঘর গেরস্থালির কথা জুড়ে দেয়, ঘর ছাড়ার আগে কী কী জিনিস লুকিয়ে রেখে আসতে পেরেছে এবং সেগুলো সাবধানে লুকানো হয়েছে কিনা এই সব জিজ্ঞেস করতে থাকে।

মনে মনে স্বামীর এই ঔদার্যটুকু লক্ষ করে আক্সিনিয়া। তার কথার উত্তর দেয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা সংকোচ সব সময় কাঁটার মতন বিঁধতে থাকে। এর আগে ওদের ভেতরে যা কিছু ঘটে গেছে সে সবের যেন কোন গুরুত্ব নেই এইটা ওকে বোঝানোর জন্য, নিজের মনের চাঞ্চল্য চাপা দেওয়ার জন্য সে ইচ্ছে করেই একটু ধীরে সুস্থে, বৈষয়িক ভঙ্গিতে সংযত ভাবে নীরস গলায় কথা বলতে থাকে।

সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে বসে ওরা কথা বলতে থাকে। অনবরত ওদের কথাবার্তার ব্যাঘাত ঘটায় কসাকরা। প্রথম একজন ঢোকে, তারপর ঢোকে আরেক জন। খ্রিস্তোনিয়া এসে ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গে শোবার যোগাড় করল। বাইরের লোকজন থেকে আড়ালে কথাবার্তা বলার কোন সুযোগ নেই দেখে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্তেপান কথা বন্ধ করে দেয়।

আক্সিনিয়া যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। উঠে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি পুঁটলি খুলল। যে পিঠেগুলো সঙ্গে করে এনেছিল সেগুলো স্বামীকে খাওয়াল। তারপর স্তেপানের ফৌজী থলে থেকে নোংরা জামাকাপড় বার করে নিয়ে চলে গেল কাছের ডোবাটায় কাচার জন্য।

বনের মাথার ওপরে ভোরের আগেকার নিস্তব্ধতা আর নীল কুয়াশা জমেছে। শিশিরের ফোঁটার ভারে মাটিতে নুইয়ে পড়ছে ঘাসের ডগা। ডোবায় গ্যাঙর গ্যাঙ করে বেতালা সুরে ব্যাঙ ডাকছে। সুড়ঙ্গ-ঘরের একেবারে ধারে কাছে ঝাঁকড়া ম্যাপল ঝোপের পেছনে কোথায় যেন কর্কশ স্বরে চেঁচাচ্ছে একটা কর্নক্রেক পাখি।

আক্সিনিয়া চলে যায় ঝোপটার পাশ দিয়ে। ঘন ঘাসে ঢাকা গা থেকে শুরু ক'রে একেবারে মাথা পর্যন্ত পুরো ঝোপটা মাকড়সার জালে জট পাকানো। সদ্য

সুতোর গায়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিশিরবিন্দু চিকচিক করছে মুক্তোর মতো। পাখিটা মুহূর্তের জন্য একটু চুপ করেছিল। কিন্তু আক্সিনিয়ার পায়ের চাপে বসে যাওয়া ঘাসগুলো ফের মাথা তুলতে না তুলতে আবার শুরু হয়ে গেল তার ডাক। উত্তরে ডোবা থেকে ডানা মেলে উড়তে উড়তে করুণ কণ্ঠে ডেকে উঠল একটা জলার পাখি।

আক্সিনিয়া গায়ের জামাটা ছুঁড়ে ফেলল। কাঁচুলির জন্য শরীর নড়াচড়া করতে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই সেটাও খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ডোবার ভাপ ওঠা গরম জলে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবিয়ে কাপড় কাচতে শুরু করে দিল। মাথার ওপর ছোট ছোট মশা ঝাঁক বেঁধে গুনগুন করছে। পুরুষ্টু তামাটে হাতখানা কনুইয়ের কাছে বাঁকিয়ে মুখের ওপর বুলিয়ে মশা তাড়ানোর চেষ্টা করে আক্সিনিয়া। কেবলই ওর মনে পড়তে থাকে গ্রিগোরির কথা, স্কোয়াড্রনে গ্রিগোরির ফিরে যাবার আগে ওদের সেই শেষ বারের কথা কাটাকাটির ঘটনা।

'এখন হয়ত আবার আমার খোঁজ করছে? আজ রাতেই ফিরে যাব!' চূড়ান্ত ভাবে ঠিক করে ফেলে আক্সিনিয়া। গ্রিগোরির সঙ্গে দেখা হলে কী হবে, কেমন চটপট ওদের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে সে দৃশ্য মনে মনে কল্পনা ক'রে হাসে আক্সিনিয়া।

অদ্ভুত ব্যাপার! আজকাল গ্রিগোরির কথা মনে হতে ওর বাইরের চেহারাটা আগতে যেমন, কেন যেন ঠিক তেমনি কিছুতেই স্মৃতিতে জাগে না। আক্সিনিয়ার চোখের সামনে গ্রিগোরির যে ছবি ভেসে ওঠে সে আজকের এই গ্রিগোরির নয়। বিশালদেহ পৌরুষদীপ্ত যে কসাক জীবনে অনেক কিছু দেখেছে শুনেছে, যার চোখদুটো ক্লান্তিতে কুঁচকে গেছে, যার কালো গোঁফের ডগায় কটা রঙের ছোপ লেগেছে, রগের চুলে পাক ধরেছে অকালে, যার কপালে ফুটে উঠেছে গভীর বলিরেখা – যুদ্ধের এই কয়েক বছরের অসহনীয় কষ্টের জীবনের অনপনেয় চিহ্ন – এ সেই গ্রিগোরি নয়। এ গ্রিগোরি আগেকার গ্রিশ্‌কা – যার সোহাগে আছে জোয়ান বয়সের রূঢ়তা আর আনাড়িপনার ছাপ। অল্পবয়সী ছেলের মতো সুডৌল আর পাতলা তার ঘাড়টা, মুখে তার অবিরাম হাসি, ঠোঁটে নির্ভাবনার রেখা।

এতে ওর প্রতি আক্সিনিয়া অনুভব করে আরও বেশি ভালোবাসা – প্রায় মাতৃসুলভ একটা স্নেহও।

আজও তাই হল। ওর অপরিসীম প্রিয় মুখের ছবি কল্পনায় নিখুঁত স্পষ্ট হয়ে উঠতে ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে আক্সিনিয়া। ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। স্বামীর আধ-কাচা জামাটা পড়ে থাকে পায়ের তলায়। গলার ভেতরে হঠাৎ যেন মিষ্টি কান্নার সঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় গরম ডেলা। ফিসফিসিয়ে বলে, 'মরণও হয় না! তুমি যে চিরকালের মতো আমার ভেতরে গাঁথা হয়ে রইলে!'

চোখের জল ফেলতে পেরে ওর মনটা হালকা হয়। কিন্তু এর পর ওর আশেপাশের সকালের হাল্‌কা নীল জগৎটা যেন ফেকাশে হয়ে যায়। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে গাল মোছে, মাথা পেছনে হেলিয়ে ভিজে কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয়, নিষ্প্রভ চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে উদাস ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে একটা ছোট্ট ধূসর পানকৌড়ি জল ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বাতাসে ফেনিয়ে ওঠা গোলাপী জালিকাজের মধ্যে।

কাপড় ধোওয়া শেষ করে ঝোপের ওপর মেলে দেয় আক্সিনিয়া। তারপর ফিরে চলে সুড়ঙ্গ-ঘরের দিকে।

খ্রিস্তোনিয়া জেগে উঠে দরজার কাছে বসে ছিল, পায়ের গাঁট গাঁট বাঁকা আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে জোর করে কথা বলার চেষ্টা করছিল স্তেপানের সঙ্গে। স্তেপান কম্বলে শুয়ে চুপচাপ চুরুট টেনে চলেছে। খ্রিস্তোনিয়ার প্রশ্নের কোন জবাবই দিচ্ছে না।

'তোর কি মনে হয় লালেরা এপারে আসার চেষ্টা করবে না? চুপ করে রইলি যে? বেশ, থাক চুপ করে। আমার কিন্তু মনে হয় যেখানে হাঁটুজল সেখান দিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা ওরা করবে – না করে যায় না। ... অবশ্যই চেষ্টা করবে যেখানে হাঁটুজল! এছাড়া আর জায়গাও নেই! নাকি তুই মনে করিস ঘোড়সওয়ার ফৌজ নিয়ে সাঁতরে পার হবে? কী হল, কথা বলছিস না যে স্তেপান? ব্যাপার এদিকে রীতিমতো ঘোরাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর তুই কিনা কাঠের গুঁড়ির মতো অসাড় হয়ে পড়ে আছিস!'

একথায় স্তেপান লাফ দিয়ে উঠে বসে। চটেমটে জবাব দেয়, 'এমন জ্বালাতন করছিস কেন বল্ ত? আশ্চর্য সব লোকজন! বৌ এসেছে দেখা করতে, কিন্তু তোদের হাত থেকে রেহাই নেই। ... যত রাজ্যের বোকা বোকা কথা। বৌয়ের সঙ্গে নিশ্চিন্তে দুটো কথা বলব তাও দেবে না দেখছি এরা!'

'হুঁঃ কথা বলার আর লোক পেলি না!' গজগজ করতে করতে খ্রিস্তোনিয়া উঠে পড়ে। মোজা ছাড়া পায়ে একজোড়া ক্ষয়ে যাওয়া চটি গলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বের হতে গিয়ে দরজার চৌকাটে মাথা ঠুকে গিয়ে জোর ব্যথা পায়।

'এখানে ওরা আমাদের স্বস্তিতে কথা বলতে দেবে না, চল বনে যাই,' স্তেপান বুদ্ধি দেয়। আক্সিনিয়ার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই দরজার দিকে পা বাড়ায়। আক্সিনিয়াও বাধ্য মেয়ের মতো তার পিছু নেয়।

দুপুরের দিকে ফিরে এলো ওরা সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছে। দু'নম্বর টুপের কসাকরা বাদাম ঝোপের ঠাণ্ডা ছায়ায় শুয়ে ছিল। ওদের দেখে তারা হাতের তাস নামিয়ে

রাখল, বুঝদারের মতো নীরবে নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করল, মুখ টিপে হাসাহাসি করল, ঢং করে দীর্ঘশ্বাসও ফেলল।

আক্সিনিয়া অবজ্ঞা ভরে ঠোঁট বাঁকিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। যেতে যেতে সাদা লেস লাগানো মাথার অবিন্যস্ত রুমালটা ঠিক করে নেয়। ওকে ওরা কোন মন্তব্য ছাড়াই চলে যেতে দিল। কিন্তু যেই স্তেপান কাছে এলো অমনি শুয়ে থাকা দলের ভেতর থেকে আনিকুশ্‌কা উঠে এলো। সম্মান দেখানোর ভান ক'রে কোমর ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ ক'রে উঁচু গলায় বলল, 'বাহবা! উপোস ভাঙল তাহলে!'

স্তেপান উৎসাহভরে হাসে। কসাকরা যে বৌয়ের সঙ্গে ওকে বন থেকে ফিরে আসতে দেখছে তাতে ওর ভালো লাগে। বৌয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক তেমন ভালো নেই বলে কসাকদের মধ্যে যে গুজব ছড়িয়েছিল এতে তা অন্তত খানিকটা কমছে।... এমন কি জোয়ান ছোকরার মতো কাঁধ বাঁকায়, জামার পেছনের ঘাম যে এখনও শুকোয় নি সেটা দেখিয়ে যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এর পরই কসাকরা প্রশ্রয় পেয়ে হো হো করে হেসে ওঠে, উৎসাহভরে নানা রকম মন্তব্য করতে থাকে।

'আরে ব্বাপস, কী গরম মেয়েমানুষ ভাই! স্তেপানের জামার অবস্থাটা দ্যাখ - নিংড়োলে জল বেরুবে।... পিঠের সঙ্গে লেপটে আছে!'

'দাবড়ে একেবারে জিভ বার করে দিয়েছে। সারা গা দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে...'

এক অল্পবয়সী ছোকরা ঝাপসা চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিতে পেছন থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আক্সিনিয়াকে যতক্ষণ না ও সুড়ঙ্গ-ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। অন্যমনস্ক ভাবে সে বলে ফেলল, 'সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে এমন খাপসুরৎ মেয়ে আর একটিও খুঁজে পাবে না, ভগবানের দিব্যি!'

আনিকুশ্‌কা তাতে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করল, 'কেন, খোঁজার চেষ্টা করে দেখেছ নাকি কখনও?'

ওদের নির্লজ্জ নোংরা মন্তব্যগুলো শুনে আক্সিনিয়ার মুখটা একটু ফেকাসে হয়ে গেল। স্বামীর সঙ্গে এই খানিক আগেকার ঘনিষ্ঠতার কথা মনে পড়তে আর তার বন্ধুদের অশ্লীল মন্তব্যে ঘৃণায় শিউরে উঠে চোখ মুখ কুঁচকে সে সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। স্তেপান এক নজরেই ওর মনের অবস্থা টের পায়, বুঝ দেওয়ার সুরে বলে, 'লক্ষ্মীটি তুমি রাগ কোরো না ওই মন্দ ঘোড়াগুলোর ওপর। ওরা হয়ে হয়ে আছে।'

'কার ওপরই বা রাগ করব!' ভোঁতা গলায় আক্সিনিয়া বলে। ক্যানভাসের থলেটা হাতড়াতে হাতড়াতে স্বামীর জন্য যে সব জিনিস এনেছিল তাড়াতাড়ি সব বার করে দিল। তারপর আরও চাপা গলায় বলল, 'রাগ হওয়া উচিত

আমার নিজের ওপর, কিন্তু আমার মন বলে কিছু নেই যে। . . .'

ওদের কথাবার্তা তেমন জমে না। মিনিট দশেক পরে আক্সিনিয়া উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবল, 'এখন ওকে বলি, আমি ভিওশেন্স্কায়া চলে যাচ্ছি।' কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ে গেল যে স্তেপানের শুকনো জামাকাপড়গুলো এখনও তোলা হয় নি।

সুড়ঙ্গ-ঘরের দরজার কাছে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে মেরামত করল স্বামীর ঘামে ছিঁড়ে যাওয়া জামা প্যান্টগুলো। মাঝে মাঝে তাকাতে থাকে পড়ন্ত সূর্যটার দিকে।

. . .সে দিন আক্সিনিয়ার আর যাওয়া হল না। মনে সেরকম জোর পেল না। পর দিন ভোরবেলা সূর্য উঠতে না উঠতে সে গোছগাছ করতে থাকে। স্তেপান ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করল, আরও এক দিন অন্তত থেকে যাবার জন্য অনুনয় করল। কিন্তু আক্সিনিয়া এমন জোরের সঙ্গে হাঁকিয়ে দিল যে স্তেপান আর কিছু বলতে পারল না। বিদায়ের আগে শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, 'ভিওশেন্স্কায়াতেই থাকবে বলে ভাবছ?'

'আপাতত তাই।'

'আমার এখানে থেকে গেলেই পারতে কিন্তু।'

'এখানে . . . কসাকদের মধ্যে থাকাটা ঠিক হবে না আমার পক্ষে।'

'তা বটে . . .' স্তেপানকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বিদায় নেয় নিস্পৃহ ভাবে।

দক্ষিণ-পুব থেকে জোর হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়াটা আসছে অনেক দূর থেকে। রাতের দিকে একটু শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু ভোর নাগাদ আবার বয়ে আসে ট্রান্স-কাস্পিয়ান মরু এলাকার গনগনে গরম। বাঁ পারের জলা ঘাস জমির ওপর আছড়ে পড়ে, শিশির শুষে নেয়, ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দেয় কুয়াশা। গোলাপী রঙের গুমোট ভাপে ঢেকে দেয় দন পারের পাহাড়ের খড়িমাটির শৈলশাখা।

আক্সিনিয়া পায়ের জুতো খুলে ফেলে, বাঁ হাতে ঘাগরার কিনারা উঁচু করে তুলে ধরে (বনের ভেতরে ঘাসের গায়ে তখনও শিশির লেগে আছে) হালকা পায়ে হেঁটে চলে নির্জন বনপথ ধরে। ভিজে মাটির ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় আরাম লাগে খালি পায়ে। শুকনো বাতাস তার নিরাবরণ সুডৌল পায়ের গোছায় আর ঘাড়ে সাগ্রহে দিয়ে যায় উষ্ণ ঠোঁটের চুম্বন।

বনের ভেতরে একটা খোলা জায়গায় আসার পর ফুটন্ত বনগোলাপের একটা ঝোপের কাছে জিরিয়ে নেওয়ার জন্য বসল আক্সিনিয়া। কাছেই কোথাও আধা শুকনো একটা বিলের নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে বনহংসীরা ডানা ঝাপ্‌টাচ্ছে, একটা হাঁস ভাঙা গলায় তার জুটিকে ডাকছে। দনের ওপারে ঘন ঘন না হলেও প্রায় অবিশ্রান্ত কটকট আওয়াজ করে চলেছে মেশিনগান, কদাচিৎ গুমগুম করে

ফেটে পড়ছে কামানের গোলা। কামানের গোলা ফাটার গুড়ুগুড়ু আওয়াজ এই পারে শোনাচ্ছে প্রতিধ্বনির মতো।

এর পর গুলিগোলার আওয়াজ হতে থাকে একটু বিরতি দিয়ে। তাতে পৃথিবী তার অন্তঃশীল সুরবৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে আক্সিনিয়ার কাছে। অ্যাশ গাছের সাদা ডোরাকাটা সবুজ পাতা আর ওক গাছের নকশাতোলা ছাঁচেঢালা পাতাগুলো বাতাসে কাঁপা কাঁপা মর্মরধ্বনি তোলে। কচি অ্যাস্পেন গাছের ঘন জঙ্গলের ভেতরে থেকে ভেসে আসে একটা ভারী জমাট গুঞ্জন। অনেক অনেক দূরে একটা কোকিল অস্পষ্ট করুণ সুরে কাকে যেন দিয়ে চলে তার অনাগত বছরগুলোর হিসাব। ঝিলের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে একটা সিপাহী বুলবুলি এক নাগাড়ে শিস দিয়ে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কার?' 'তুমি কার?' আক্সিনিয়ার দুপা দূরেই একটা ছাইরঙা ছোট্ট পাখি রাস্তায় চাকার দাগে জমা জল খাচ্ছে, মাঝে মাঝে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে আরামে পিটপিট করছে খুদে দুটি চোখ। এখানে ওখানে গুনগুন করছে ধুলোমাখা মখমলের মতো ভ্রমর। বুনো ফুলের পাপড়ির ওপর বসে বসে দোল খাচ্ছে কালচে বুনো মৌমাছিগুলো। তারা টুক করে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে সুগন্ধী ফুলের রেণু বয়ে নিয়ে যায় গাছের গুঁড়ির শীতল কোটরে। পপলার গাছের ডাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরে পড়ছে। বৈঁচি ঝোপের তলা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে গত বছরের পচা পাতার ঝাঁঝাল মদির গন্ধ।

আক্সিনিয়া নিশ্চল হয়ে বসে থেকে অতৃপ্তের মতো প্রাণ ভরে গ্রহণ করে বনের বিচিত্র গন্ধ। বহু কণ্ঠের অপূর্ব সুরে পরিপূরিত হয়ে বন যেন তার আদিম জীবনের বিপুল শক্তিতে বেঁচে আছে। বসন্তের জলীয় বাষ্পের প্রাচুর্যে আর বন্যার পলিমাটিতে সরস জায়গাটাতে এত বেশি, এত বিচিত্র রকমের ঘাসপাতা হু হু করে গজিয়ে উঠেছে, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে যে ফুল আর গাছের এই অপূর্ব মেশামেশির মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আক্সিনিয়ার।

হাসি মুখে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ে আক্সিনিয়া, হালকা নীল রঙের নাম-না-জানা অতি সাধারণ কতকগুলো ফুলের ডাঁটা সন্তর্পণে আলাদা করে নেয়, ভারী হয়ে আসা শরীরটা ঝুঁকিয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকতে যায়। এমন সময় হঠাৎ ওর নাকে এসে লাগে বুনো লিলি ফুলের আবেশ জড়ানো মিষ্টি গন্ধ। হাতড়ে হাতড়ে শেষকালে ফুলটা খুঁজে পায়, ওখানেই ঝোপের ঘন ছায়ার নীচে। ওর চওড়া পাতাগুলো এক সময় সবুজ ছিল। এখনও সেগুলো বেঁটে গড়নের বাঁকা ডাঁটা আর তার গায়ে তুষারশুভ্র ছোট ছোট ঘণ্টার মতো মাথা নীচু করে ঝুলে থাকা ফুলকে সযত্নে আড়াল দিয়ে রেখেছে। কিন্তু হলদে মরচে রঙধরা শিশির ভেজা

পাতা মরে যাবার যোগাড় হয়েছে, তাছাড়া ফুলের ওপরেও ক্ষয়ের মারাত্মক ছোঁয়া এসে লেগেছে। নীচের দুটো ঘণ্টা কুঁকড়ে কালো হয়ে গেছে। শুধু মাথার ফুলগুলো সজল শিশিরবিন্দুতে ঝকমকে - সূর্যের আলো পড়ে হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে মন জুড়ানো সাদা ঝলক দিয়ে ওঠে।

চোখের জলের আড়ালে যখন ও ফুলটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আর তার বিষণ্ণ ঘ্রাণ নিচ্ছিল সেই সামান্য এক লহমার মধ্যে হঠাৎ কেন যেন আক্সিনিয়ার মনে পড়ে যায় যৌবনের কথা, ওর সুখবঞ্চিত দীর্ঘ জীবনের কথা। আক্সিনিয়া যে বুড়ি হতে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। . . . যে মেয়ে বয়সে তরুণী সে কি আর আকস্মিক কোন স্মৃতির ভারে এমনি করে কাঁদতে বসবে?

এই ভাবেই চোখের জলে মাখা মুখখানা করতলে রেখে, দলা পাকানো ওড়নায় টসটসে ভিজে গালটা চেপে উপুর হয়ে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল আক্সিনিয়া।

আরও জোরে বাতাস বইতে থাকে। পপলার আর উইলোর ডগা পশ্চিমে নুয়ে পড়ে। চঞ্চল পাতার উত্তাল সাদা ঘূর্ণি গায়ে জড়িয়ে দুলতে থাকে অ্যাস্পেনের পাণ্ডুর কাণ্ড। হাওয়া পড়ে আসতে থাকে। যে বনগোলাপ গাছটার ফুল ফুটে ঝরে পড়ছিল, যার ঝোপের নীচে আক্সিনিয়া ঘুমিয়ে ছিল তার ওপর হাওয়া এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার ভড়কে যাওয়া একদল সবুজ পাখির মতো অস্থির হয়ে সরসর আওয়াজ তুলে ডানা ঝাপটায় পাতাগুলো। চারদিকে ঝরিয়ে দেয় পালকের মতো গোলাপী পাপড়ি। বনগোলাপের ঝরা পাপড়ি গায়ে ছড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে আক্সিনিয়া। বনের বিষণ্ণ আওয়াজ কিংবা দনের ওপাড় থেকে নতুন করে গুলিগোলার গর্জন কিছুই শুনতে পায় না। খাড়া সূর্য ওর খালি মাথাটা যে পুড়িয়ে দিচ্ছে তাও টের পায় না। মাথার কাছে লোকের গলার আওয়াজ আর ঘোড়ার নাকের ঘড়ঘড় কানে যেতে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

সাদা নাকের পাঁটাওয়ালা, জিন চাপানো একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক জোয়ান কসাক। লোকটার গোঁফ পাটরঙা, সাদা ঝকঝক করছে তার দাঁত। দাঁত বার করে সে হাসছে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে নাচছে। ভাঙা ভাঙা গলায় কথা উচ্চারণ করে বেশ ভালো খাদের সুরে গাইছে একটা মজার গান।

আমি যেথায় পড়ি সেথায় শুয়ে থাকি
চতুর্দিকে নজরখানা রাখি।
হেথায় তাকাই
হোথায় তাকাই

কেই বা মোরে তুলবে রে ভাই?
যেই তাকানু পেছন পানে
কসাক খাড়া ঠিক সেখানে। . . .

'আমি নিজেই উঠতে পারব।' আক্সিনিয়া হেসে চটপট উঠে দাঁড়িয়ে অগোছাল ঘাগরাটা ঠিক করে নিল।

'তোমার মঙ্গল হোক গো, সোনার মেয়েটি! আহা পাদুটো আর বোধহয় চলতে চাইছে না, নাকি আলসেমি ধরেছে?' ফূর্তিবাজ কসাক ওকে সমাদর জানায়।

আক্সিনিয়া একটু লজ্জা পেয়ে বলে, 'হয়রান হয়ে পড়েছিলাম, তাইতে ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।'

'ভিওশেনস্কায়া যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'বল ত পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কিসে করে?'

'তুমি ঘোড়ায় উঠে বোসো, আমি হেঁটে যাচ্ছি। তবে তার জন্যে একটু দিতে হবে, এই আর কি . . .' কসাকটা ঠাট্টা করে অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে চোখ টিপল।

'না, চলে যাও, ভগবান তোমার সহায় হোন। . . . আমি নিজেই যেতে পারব।'

কিন্তু কসাক প্রেমঘটিত ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আর একগুঁয়েমি দুয়েরই পরিচয় দিল। আক্সিনিয়া যখন মাথায় ওড়না জড়াতে ব্যস্ত সেই সুযোগে সে বেঁটে অথচ শক্ত হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল, এক ঝটকায় নিজের কাছে টেনে এনে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করল।

'বোকামি করতে এসো না!' আক্সিনিয়া চিৎকার ক'রে কনুই দিয়ে লোকটার নাকের খাঁজে জোর গুঁতো মারল।

'ওগো পিয়ারি আমার, অমন ছটফট করতে নেই! একবার চেয়ে দেখ চারিদিকে কী সুন্দর . . . ভগবানের সব জীবই জুটি বাঁধছে। . . . এসো আমরাও না হয় একটু পাপ করি?' হাসি হাসি চোখদুটো কুঁচকে গোঁফ দিয়ে আক্সিনিয়ার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে ফিসফিস করে কসাক বলল।

কোন রাগের ভাব দেখাল না আক্সিনিয়া। তবে হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে কসাকটির বাদামী ঘাম জবজবে মুখে হাতের চেটো ঠেকিয়ে জোরে ঠেলা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কসাক তাকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে।

'বোকা কোথাকার। আমার রোগ আছে, খারাপ রোগ আছে। . . . ছেড়ে দাও!' হাঁপাতে হাঁপাতে মিনতি করে বলে আক্সিনিয়া। ভাবে এরকম একটা সহজ

চালাকি খাটিয়ে বুঝি লোকটার হাত থেকে রেহাই পাবে।

'ওহো, . . . কার রোগটা বেশি পুরনো!' এবারে চিবিয়ে চিবিয়ে বিড়বিড় করে বলল কসাক তারপর হঠাৎই অবলীলাক্রমে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল আক্সিনিয়াকে।

মুহূর্তের মধ্যে আক্সিনিয়া বুঝতে পারল ঠাট্টা তামাসার সময় চলে গেছে, ব্যাপারটা বাস্তবিকই খারাপের দিকে গড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে সে কসাকের রোদে পোড়া বাদামী নাকের ওপর এক ঘুসি ঝেড়ে ওর জাপটে ধরা হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

'আমি গ্রিগোরি মেলেখভের বৌ। একবার এগোনোর চেষ্টা করে দ্যাখ, হারামজাদা শূয়োরের বাচ্চা। আমি ওকে বলে দেব – তখন ঠ্যালা টের পাবি। . . .'

কথাগুলোর ফল কী হবে তখনও ঠিক বিশ্বাস না হতে একটা শুকনো মোটা লাঠি হাতে তুলে নিল আক্সিনিয়া। কিন্তু কসাক সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওর নাকের দুই ফুটো দিয়েই প্রচুর রক্ত ঝরছিল। খাকী জামার হাতা দিয়ে গোঁফ থেকে সেই রক্ত মুছতে মুছতে আক্ষেপ করে সে বলল, 'বোকা। আচ্ছা বোকা মেয়েমানুষ বটে! আগে বলতে হয় ত। উঃ কী রক্ত বেরোচ্ছে দেখ! দুশমনদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কম রক্ত ঝরাচ্ছি আমরা? তার ওপরে আবার আমাদের নিজেদের ঘরের মেয়েরাও আমাদের রক্ত ঝরাতে শুরু করে দিল!'

মুখটা তার হঠাৎ বেজার আর অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। পথের ধারের জমা জল আঁজলা করে নিয়ে সে যখন নাক ধুচ্ছে আক্সিনিয়া তখন চটপট রাস্তার মোড় নিয়ে ঘুরে তাড়াতাড়ি বনের ভেতরের ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে চলে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরে কসাক ওকে ধরে ফেলল। আক্সিনিয়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নীরবে হাসল, ব্যস্তসমস্ত হয়ে বুকের ওপর রাইফেলের ফিতেটা ঠিক করে নিয়ে দ্রুত দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

দুই

সেই রাতে লাল ফৌজের একটা রেজিমেন্ট কাঠের তক্তা আর গুঁড়ি দিয়ে ভেলা বানিয়ে মালি গ্রোমচোনোক গ্রামের কাছে দন পার হল।

গ্রোমচোনোক-স্কোয়াড্রনের কাছে হামলাটা হল আচমকা। বেশির ভাগ কসাকই সেই রাতে ফূর্তিতে মেতে ছিল। সন্ধ্যা লাগতেই সেপাইদের বৌরা এসে জুটেছিল স্কোয়াড্রনের আস্তানাতে। তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল খাবারদাবার, কলসীতে

বাস্তিতে ঘরে চোলাই মদ। মাঝরাত হতে না হতে সবাই মদে চুর। সুড়ঙ্গ-ঘরের ভেতরে শোনা যাচ্ছিল গানের আওয়াজ, মাতাল মেয়েদের চিৎকার, বেটাছেলেদের হো হো হাসি আর উৎকট শিস। . . . যে কুড়িজন কসাকের চৌকির পাহারায় থাকার কথা তারাও মেশিনগানের পাশে দু'জন মেশিনগান-সেপাই আর ঘোড়ার খাবারের কেঁড়েতে এক কেঁড়ে চোলাই মদ রেখে দিয়ে মাতালদের দলে ভিড়েছিল।

দনের ডান পার থেকে লাল ফৌজী বোঝাই হয়ে একেবারে নিঃশব্দে যাত্রা করল ভেলাগুলো। এপারে নেমে তারা সারি বেঁধে নিঃশব্দে চলতে শুরু করল দনের একশ' পা খানেক দূরে কসাকদের সুড়ঙ্গ-ঘরগুলোর দিকে।

সেপাই কারিগররা, যারা ভেলা বানিয়েছিল, তাড়াতাড়ি দাঁড় ফেলে ওপারে ফিরে চলল। নতুন এক দল লাল ফৌজী সেখানে অপেক্ষা করছিল পার হওয়ার জন্য।

বাঁ পারে কসাকদের গলার অসংলগ্ন গান ছাড়া মিনিট পাঁচেক আর কিছুই শোনা যায় না। তারপরই গুমগুম শব্দে ফেটে পড়তে থাকে হাতবোমা, শুরু হয় মেশিনগানের কটকট আওয়াজ, ঝলকে ঝলকে চলতে লাগল রাইফেলের এলোমেলো গুলি। দূরে কোথায় যেন থমকে থমকে গড়িয়ে পড়ল উল্লাসধ্বনি।

গ্রোম্‌চোনোক-স্কোয়াড্রন তাদের পজিশন ধরে রাখতে পারল না। তবে তারা যে সম্পূর্ণ ধ্বংস হল না তার একমাত্র কারণ এই যে সূচীভেদ্য রাতের অন্ধকারের মধ্যে পিছু ধাওয়া করা সম্ভব ছিল না।

ক্ষয়ক্ষতি তেমন একটা হয় নি কসাকদের। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ওরা আতঙ্কিত হয়ে ঘাস জমির ওপর দিয়ে এলোমেলো ছুটতে শুরু করল ভিওশেন্‌স্কায়ার দিকে। ততক্ষণে ডান দিক থেকে ভেলায় করে লাল ফৌজীদের আরও কয়েকটা নতুন দল এসে পড়েছে, দুটো হালকা মেশিনগান নিয়ে একশ' এগার নম্বর রেজিমেন্টের এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের আধা কম্পানি বিদ্রোহী বাজ্‌কি স্কোয়াড্রনের এক পাশে আক্রমণে নেমে গেছে।

ব্যূহ যেখানে ভেঙে পড়ল সেখানে নতুন নতুন সৈন্যসমাবেশ ঘটল বটে, কিন্তু এলাকাটা লাল ফৌজীদের কারোই জানা না থাকায় তাদের এগোতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছিল। ইউনিটগুলোতে পথঘাট দেখিয়ে নিয়ে যাবার মতো কোন লোক ছিল না। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে যেতে হচ্ছিল তাদের। রাতের অন্ধকারের মধ্যে চলতে গিয়ে ওরা কেবলই ঝিল বিল আর বানের জলে ভরা গভীর স্রোতের মধ্যে এসে পড়ে। সেগুলো হেঁটে পার হওয়া অসম্ভব।

যে ব্রিগেড-কম্যাণ্ডার আক্রমণ পরিচালনা করছিল ভোর হওয়া পর্যন্ত সে পিছু ধাওয়া করা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল। তার মতলব ছিল সকালের মধ্যে রিজার্ভ ফৌজকে এক জায়গায় এনে ফেলবে, ভিওশেন্‌স্কায়ায় ঢোকার মুখে তাদের

জড় করবে, তারপর গোলন্দাজদল ঠিকমতো সাজিয়ে আক্রমণ চালাবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভিওশেনস্কায়াতে ব্যূহের ভাঙন রোধের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল। একজন বার্তাবহ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে লাল ফৌজের পার হওয়ার খবর দিতেই সদর ঘাঁটিতে ডিউটিরত অফিসারটি কুদিনভ আর মেলেখভকে ডেকে পাঠাল। চোর্নি, গরোখোভকা আর দুব্রোভ্কা গ্রাম থেকে কার্গিনস্কায়া রেজিমেন্টের ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রনগুলোকে ডেকে আনা হল। সাধারণ ভাবে অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব নিল গ্রিগোরি মেলেখভ। যাতে ফৌজের বাঁ দিক জোরদার করা যায় এবং শত্রুপক্ষ ভিওশেনস্কায়া ঘুরে পুব দিক থেকে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলে তাতারস্কি ও লেবিয়াজি স্কোয়াড্রনকে সেই চাপ সহ্য করার মতো মদত দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে গ্রিগোরি তিনশ' তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার সৈন্য পাঠাল ইয়েরিনস্কি গ্রামে। পশ্চিম দিকে দনের ভাটিতে বাজ্‌কি-স্কোয়াড্রনকে সাহায্য করার জন্য ভিওশেনস্কায়ার 'অ-কসাক' স্বেচ্ছাসেবকদল আর চির-এর একটা পদাতিক স্কোয়াড্রনকে পাঠিয়ে দিল। বিপজ্জনক এলাকাগুলোতে আটটা মেশিনগান বসাল আর নিজে দুটো ঘোড়সওয়ার স্কোয়াড্রন নিয়ে ভোর রাতে প্রায় দুটো নাগাদ গোরেলি বনের কিনারায় ঘাঁটি গাড়ল। ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে লাল ফৌজীদের ওপর আক্রমণ চালাবে বলে ভোরের সূর্য ওঠার অপেক্ষায় বসে রইল।

সপ্তর্ষির তারা তখনও মিলিয়ে যায় নি এমন সময় বনের ভেতর দিয়ে বাজ্‌কির বাঁকের দিকে চলার পথে বাজ্‌কি-কসাকদের পিছু-হটা দলের সঙ্গে অ-কসাক স্বেচ্ছাসেবীদলটির সংঘর্ষ বেধে গেল। ওদের শত্রুসৈন্য মনে করেছিল। অল্প কিছুক্ষণ গুলিবিনিময়ের পর স্বেচ্ছাসেবীদল পালিয়ে গেল। বনের ভেতরকার বাঁক আর ভিওশেনস্কায়ার মাঝখানের প্রকাণ্ড ঝিলটা ওরা সাঁতরে পার হল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে জুতো আর জামাকাপড় পারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ভুলটা খানিক বাদেই ধরা পড়ল। তবে লালেরা যে ভিওশেনস্কায়ার দিকে এগিয়ে আসছে এই বার্তা আশ্চর্য দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। যে-সমস্ত উদ্বাস্তু মাটির তলার কুঠুরিতে আস্তানা নিয়েছিল, তারা বন্যাস্রোতে উত্তরের দিকে পালাতে লাগল। পালানোর সময় সর্বত্র গুজব ছড়িয়ে দিল যে লালেরা দন পার হয়েছে, ফ্রন্ট ভেঙে এখন ভিওশেনস্কায়ার দিকে এগিয়ে আসছে।

সবে ভোরের আলো ফুটেছে, এমন সময় অ-কসাক স্বেচ্ছাসেবীদলের পালানোর খবর পেল গ্রিগোরি। তখন ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটল দনের দিকে। কম্পানিটা ইতিমধ্যে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পরিখার কাছে ফিরে আসছে, নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কথাবার্তা বলছে। ওদের একটা দলের কাছে এগিয়ে এসে তামাসা ক'রে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'ঝিল পার হবার সময় কতজন ডুবল তোমাদের?'

ভিজে চুপসে যাওয়া এক রাইফেলধারী সৈন্য হাঁটিতে হাঁটিতে গায়ের জামা নিংড়োচ্ছিল। সলজ্জ ভাবে সে উত্তর দিল, 'পাইক মাছের মতো সাঁতার কেটে এসেছি! ডুববো কেন?...'

আরেকজন সেপাই শুধু ভেতরের প্যান্ট পরে পথ চলছিল। বেশ বিজ্ঞের মতো সে বলল, 'ভুল সবারই হতে পারে।... তবে আমাদের প্লেটুন-কম্যাণ্ডার কিন্তু সত্যি সত্যিই ডুবতে বসেছিল। জুতোর ভেতরের পায়ে জড়ানো পটি খুলতে চায় নি, খুলতে অনেক সময় লেগে যাবে কিনা। ওই অবস্থায় সাঁতার কাটতে গিয়ে জলের ভেতরে খুলে গেল পটি। পায়ে জড়িয়ে গেল।... ওঃ সে কি চিৎকার তখন! হয়ত ইয়েলানস্কায়া থেকেও শোনা গেছে!'

স্বেচ্ছাসেবীদলের কম্যাণ্ডার ক্রাসনভকে খুঁজে বার করল গ্রিগোরি। তাকে হুকুম দিল তার সেপাইদের যেন বনের ধারে বার করে এনে এমন ভাবে সাজিয়ে রাখে যাতে পাশ থেকে লাল ফৌজের সারিগুলোর ওপর গুলি ছোঁড়া যায়। এর পর সে ফিরে চলল তার নিজের স্কোয়াড্রনে।

অর্ধেক রাস্তায় সদর দপ্তরের এক আর্দালির সঙ্গে দেখা। ঊর্ধশ্বাসে ছোটার ফলে ভারী নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটার পাঁজর ওঠাপড়া করছিল। লাগাম টেনে ধরে ঘোড়া থামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর্দালি বলল, 'ওঃ আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান!'

'কী ব্যাপার বল ত?'

'সদর ঘাঁটি থেকে আমায় হুকুম দেওয়া হয়েছে আপনাকে এই খবর জানাতে যে তাতারস্কি স্কোয়াড্রন ট্রেঞ্চ ছেড়ে চলে গেছে। চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়তে পারে এই ভয়ে ওরা বালির দিকে পিছু হটছে।... কুদিনভ মুখে আপনাকে জানাতে বলেছেন, এখনই যেন ওখানে চলে যান।'

সবচেয়ে ক্ষিপ্রগামী ঘোড়ায় কসাকদের আধখানা ট্রুপ নিয়ে গ্রিগোরি বনের ভেতর দিয়ে পথে বেরিয়ে এলো। কুড়ি মিনিট ঘোড়া ছুটিয়ে তারা শেষকালে উপস্থিত হল গোলি ইলমেন ঝিলের কাছে। তাদের বাঁ দিকে একটা ঘাস জমির ওপর দিয়ে আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য তাতারস্কি-সেপাইরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। লড়াই-ফেরতা পাকা সেপাই আর ঝানু কসাকরা ঝিলের ধার ঘেঁসে কূলের লম্বা লম্বা জলাঘাসে গা ঢাকা দিয়ে ধীরে সুস্থে চলেছে। তবে বেশির ভাগ লোকেরই, দেখে মনে হয়, একমাত্র ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বনের কাছে গিয়ে পড়া। তাই মাঝে মাঝে মেশিনগান গর্জে উঠলেও সেদিকে গ্রাহ্য না ক'রে তারা সোজা রাস্তায় পড়িমরি ছুটছে।

'ওদের পাকড়াও কর! ধরে চাবকাও!' ক্ষিপ্ত হয়ে চোখ টেরিয়ে চিৎকার

করে উঠে গ্রিগোরি। সে নিজেই প্রথম ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়া করে তার গাঁয়ের লোকদের।

সবার পিছন পিছন বিকট ন্যাচের ভঙ্গিতে ডাইনে বাঁয়ে পা ফেলে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে চলেছে খ্রিস্তোনিয়া। আগের দিন মাছ ধরতে গিয়ে নলখাগরায় ওর পায়ের গোড়ালি সাংঘাতিক ভাবে কেটে গিয়েছিল। তাই ওর লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে সাধারণত যেমন জোর তার সবটুকু খাটিয়ে ও ছুটতে পারছিল না। গ্রিগোরি ওর নাগাল ধরে ফেলল, মাথার অনেকখানি ওপরে চাবুক উঁচাল। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে যেতে খ্রিস্তোনিয়া ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিল পায়ের গতি।

'কোথায় চললি? থাম! বলছি!' বৃথাই চিৎকার করে গ্রিগোরি।

কিন্তু থামার কোন লক্ষণই দেখা গেল না খ্রিস্তোনিয়ার। আরও বাড়িয়ে দেয় ছোটার বেগ। শেষকালে লাগাম-ছাড়া উটের মতো চার পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকে।

গ্রিগোরি তখন খেপে গিয়ে ভাঙা গলায় সাংঘাতিক গালাগাল শুরু করে দেয়, ঘোড়াটার ওপরে একটা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। এবারে খ্রিস্তোনিয়ার পাশাপাশি হতে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ওর ঘামে ভেজা পিঠে চাবুক কষিয়ে দেয়। চাবুকের বাড়ি খেয়ে খ্রিস্তোনিয়া শূন্যে পাক খায়, খরগোসের মতো অদ্ভুত একটা লাফ দিয়ে একপাশে সরে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে সযত্নে পিঠে হাত বুলায়।

গ্রিগোরির সঙ্গী কসাকরা পলাতকদের আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে তাদের থামায়, কিন্তু চাবুক হাঁকায় না।

'মারো ওদের! চাবুক মারো!' কারুকাজ করা চাবুকটা দোলাতে দোলাতে গ্রিগোরি ভাঙা গলায় চিৎকার করে।

গ্রিগোরির ঘোড়াটা গা মোড়ামুড়ি করে পিছনের দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুতেই সামনে যেতে চায় না। অতি কষ্টে তাকে বাগে এনে ছুটন্ত লোকগুলোর আগে আগে চলে এলো গ্রিগোরি। ছুটতে ছুটতে এক পলকের জন্য ওর চোখ পড়ে স্তেপান আস্তাখভের ওপর। একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিটিমিটি হাসছে। গ্রিগোরি দেখল হাসতে হাসতে 'আনিকুশকার পেট ফেটে যাবার দাখিল হয়েছে, মুখের কাছে দু'হাত চোঙের মতো করে ধরে মেয়েদের মতো কিনকিনে গলায় চেঁচাচ্ছে।

'ভাইসব, যে যার প্রাণ বাঁচাও! লালেরা আসছে! ছু ছু, ধর ধর্! . . . ওদের ধর! . . .

গ্রিগোরি ওদের গ্রামের আরও একটা লোকের পিছু ধাওয়া করল। লোকটার গায়ে তুলোর আস্তর দেওয়া কোর্তা। অক্লান্ত গতিতে হাল্‌কা পায়ে ছুটছিল সে।

তার ক্রোলস্ক্রজো মূর্তিটা অদ্ভুত রকম চেনা-চেনা, কিন্তু সনাক্ত করার সময় নেই গ্রিগোরির। দূর থেকেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে সে।

'থাম্ শুয়োরের বাচ্চা। থাম্ বলছি! ... এই কোপ মারলাম। ...'

এমন সময় তুলোর আস্তর লাগানো কোর্তা পরা লোকটা গতি মন্থর ক'রে দিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর যখন মাথাটা ঘোরাল তখনও মুখের চেহারাটা পুরোপুরি নজরে পড়ার আগেই ছেলেবেলা থেকে চরম উত্তেজনা প্রকাশের যে পরিচিত বিশেষ ভঙ্গিটি লক্ষ করল তাতে গ্রিগোরির চক্ষু চড়কগাছ - এ যে তার বাবা।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের গালের মাংসপেশী রাগে কাঁপছে।

'তোর নিজের বাপ হল শুয়োরের বাচ্চা? তুই তোর বাপকে কেটে ফেলবি বলে ভয় দেখাচ্ছিস?' ভাঙা ভাঙা গলায় বিকট স্বরে চেঁচিয়ে বলে সে।

তার দু'চোখে গ্রিগোরির অনেক কালের চেনা একটা অদম্য ক্রোধের ধূমায়মান আগুন। গ্রিগোরির রাগ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। জোর করে লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে সেও চেঁচিয়ে বলে, 'পেছন থেকে চিনতে পারি নি। অমন চেঁচাচ্ছ কেন বাবা?'

'চিনতে পারিস নি মানে? বাপকেও চিনতে পারিস নি?'

বুড়ো মানুষের এই অভিমানের প্রকাশটা এতই খাপছাড়া আর অসঙ্গত যে গ্রিগোরির হাসিই পেয়ে যায়। বাবার পাশাপাশি এসে আপসের সুরে বলে, 'রাগ কোরো না বাবা! তুমি গায়ে এমন একটা কোর্তা চাপিয়েছ যেটা আমি আগে কখনও দেখি নি। তাছাড়া তুমি ছুটছিলে রেসের ঘোড়ার মতো, এতটুক খোঁড়াচ্ছিলে না পর্যন্ত! কী করে চিনব বল!'

আবার সেই আগের মতো, বাড়িতে বরাবর যেমন হত - পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ শান্ত হয়ে এলো। তখনও সে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। তবে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে ছেলের কথায় সায় দিয়ে বলল, 'আমার গায়ের কোর্তাটা, ঠিকই বলেছিস, নতুন। ভেড়ার লোমের লম্বা কোটটা দিয়ে বদল করেছি। ও কোট বড্ড ভারী, বওয়া কঠিন। আর খোঁড়ানোর কথা বলছিস ... খোঁড়াব কি রে? এখন খোঁড়ানোর উপায় নেই রে খোকা! ... মরতে বসেছি, আর তুই কিনা পায়ের কথা বলছিস!'

'মরণের এখনও ঢের দেরি আছে! ফিরে এসো বাবা! কার্তুজগুলো ফেলে দাও নি ত?'

'ফিরব? কোথায় ফিরব?' বুড়ো চটে গিয়ে বলল।

কিন্তু এবারে গ্রিগোরি গলা চড়ায়। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে হুকুম দেয়, 'আমি হুকুম করছি, ফিরে এসো! লড়াইয়ের সময় কম্যাণ্ডারের হুকুম না মানলে কানুনে কী বলে জান ত?'

একথায় কাজ হল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ রাইফেলটা ঠিক করে কাঁধে

ঝুলিয়ে নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসে। আরেকজন বুড়ো আরও ধীরে ধীরে হেঁটে পিছন দিকে আসছিল। তার পাশাপাশি এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল, 'আজকালকার ছেলেপুলে সব কী হয়েছে দেখ! কোথায় বাপকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবে, নয়ত নিদেনপক্ষে লড়াই থেকে তাকে দূরে দূরে রাখবে, তা ত নয় ... ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে একেবারে ... আগুনের মধ্যে ... হুঁঃ! না, আমার পেত্রো দেখছি এর চাইতে অনেক ভালো ছিল। ওর আত্মার শান্তি হোক! বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে ছিল। কিন্তু এটা, এই গ্রিশ্‌কাটা হয়েছে একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ, যদিও ডিভিশনের কম্যাণ্ডার, যোগ্যতা-টোগ্যতা সবই আছে। কিন্তু তাহলে কী হবে, কেমন যেন। সারা জায়গায় কড়ায় ভর্তি, কোথাও ছোঁয় সাধ্যি কার। আমার এই বুড়ো বয়সে আমার কপালে ওর কাছ থেকে লাথি ঝাঁটা ছাড়া আর কিছু জুটবে না দেখছি!'

তাতারস্কির কসাকদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে তেমন বেগ পেতে হল না।

কিছুক্ষণ পরে গোটা স্কোয়াড্রনটাকে জড় করে গ্রিগোরি আড়ালে একটা জায়গায় তাদের নিয়ে যায়। ঘোড়া থেকে না নেমেই সংক্ষেপে অবস্থাটা ওদের বুঝিয়ে দেয়।

'লালেরা দন পার হয়েছে। ভিওশেন্‌স্কায়া দখল করার জোর চেষ্টা করছে তারা। দনের কাছে এই মুহূর্তে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপারটা তামাসার নয়। বিনা কারণে পালাতে পারবে না - এই হল আমার পরামর্শ। আরও একবার যদি পালানোর চেষ্টা কর তা হলে ইয়েরিন্‌স্কিতে যে ঘোড়সওয়ার দল আছে তাদের হুকুম দেব বেইমান বলে যেন তোমাদের কেটে ফেলে!' নানা ধরনের পোশাক পরা গ্রামবাসীদের ভিড়ের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সরাসরি তাচ্ছিল্যের সুরে গ্রিগোরি তার কথা শেষ করল: 'তোমাদের স্কোয়াড্রনে বহু হারামজাদা এসে জুটেছে। তারাই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। আহা কী লড়িয়ে! পালাতে গিয়ে ত কাপড়চোপড়ে ছেড়ে দিয়েছ। নিজেদের আবার তোমরা কসাক বল! বিশেষ করে যারা বুড়ো দাদু, তারা দেখো! লড়াইয়ে যখন নেমেছ তখন দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজলে আর চলবে না! এক্ষুনি দলে দলে ভাগ হয়ে ছুটে ডবল মার্চ করে চলে যাও ঝোপের ওই ধারটাতে - ওখান থেকে সোজা দনের দিকে। দনের পার ধরে গিয়ে সেমিওনোভ্‌স্কি স্কোয়াড্রনের সঙ্গে মিলবে। তাদের সঙ্গে জুটে লাল ফৌজের পাশ থেকে হামলা চালাতে হবে। কুইক মার্চ। জলদি কর!'

তাতারস্কির লোকেরা চুপচাপ শুনে গেল। চুপচাপ তারা এগিয়ে যায় ঝোপগুলোর দিকে। বুড়োরা মনমরা হয়ে কাতরাতে থাকে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে গ্রিগোরি আর তার সঙ্গী কসাকরা তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের

পাশে পাশে হাঁটছিল বুড়ো অব্‌নিজভ। তারিফের সুরে সে বলল, 'একেই বলে বীর! খাসা ছেলে দিয়েছেন তোমাকে ভগবান! সত্যিকারের ঈগল যাকে বলে। গ্রিস্তোনিয়ার পিঠে কী চাবুকটাই কষিয়ে দিল! চোখের পলকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনল!'

অব্‌নিজভের কথায় পিতৃগর্বে ফুলে ওঠে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের বুক। সোৎসাহে সায় দিয়ে বলে, 'আর বোলো না! অমন ছেলে সারা দুনিয়া ঘুরে আর একটাও পাবে না! সারা বুক জুড়ে মেডেল আর ক্রস – এ কি চাট্টিখানি কথা! এই ধর না কেন পেত্রো ... ওর আত্মার শান্তি হোক। ... যদিও আমার নিজেরই বড় ছেলে - কিন্তু সেও এমনটি ছিল না! বড্ড বেশি শান্তশিষ্ট ছিল, কেমন যেন ... কে জানে বাপু ... আধ খেঁচড়া গোছের। ওর ভেতরে ছিল মেয়েমানুষের মন! কিন্তু এটা হয়েছে ঠিক আমার মতন! এমন কি আমার চেয়েও বেশি ওর বুকের পাটা!'

* * *

গ্রিগোরি তার আধা ট্রুপ নিয়ে কাল্‌মিক ঘাটের দিকে চলল। বনের কাছাকাছি চলে আসায় ওরা ভেবেছিল আর বুঝি কোন বিপদ নেই। এমন সময় দনের ওপারের একটা নজর রাখার ঘাঁটির চোখে পড়ে গেল। গোলন্দাজদল কামান দাগল। প্রথম গোলাটা বেতবনের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ধপাস করে জলকাদা ভরা একটা ঘন জঙ্গলের ভেতরে পড়ল, ফাটল না। পরেরটা রাস্তার কাছেই এক বুড়ো কালো পপ্‌লারের বেরিয়ে পড়া শেকড়বাকড়ের মধ্যে পড়ে আগুন ছড়িয়ে দিল। দারুণ গমগম শব্দে সরেস মাটির ডেলা আর পচা কাঠের টুকরো ছিটিয়ে দিল ওদের ওপর।

কানে তালা লেগে গিয়েছিল গ্রিগোরির। আপনা থেকে হাত তুলে চোখ আড়াল করল। ঘোড়ার পাছার ওপর একটা ভিজে মতন জিনিস আছড়ে পড়ার চাপা আওয়াজ টের পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল ঘোড়ার জিনের কাঠামোর ওপর।

বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে উঠতে কসাকদের ঘোড়াগুলো গুড়ি মেরে বসে পড়ে। পরক্ষণেই তীরবেগে সামনে ছুটে যায় – যেন কারও হুকুম পেয়েছে ওরা। গ্রিগোরির ঘোড়াটা পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে কষ্ট করে উঠে দাঁড়ায়, তারপর পিছিয়ে পড়ে, ধীরে ধীরে এক পাশে কাত হয়ে পড়ে যেতে থাকে। গ্রিগোরি চট করে লাফ দিয়ে জিন থেকে নেমে ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে। আরও দুটো গোলা ছুটে গেল, তারপর বনের প্রান্তে নেমে এলো মধুর নীরবতা। ঘাসের ওপর নেতিয়ে পড়েছে বারুদের ধোঁয়া। টাটকা ওপড়ানো মাটি। কাঠের চিলতে আর

আধপচা ডালপালার গন্ধ উঠছে। দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে উৎকণ্ঠ ভাবে কিচিরমিচির করছে কতকগুলো ছাতার পাখি।

গ্রিগোরির ঘোড়াটা ঘড়ঘড় আওয়াজ তোলে, পেছনের দু'পা কাঁপতে কাঁপতে নিস্তেজ হয়ে আসে। হলুদ দাঁতের পাটি যন্ত্রণায় বেরিয়ে আসে, গলাটা সামনে বাড়িয়ে দেয় লম্বা ক'রে। মখমলের মতো ধূসর মুখের কাছটায় গোলাপী রঙের ফেনা জমেছে। ভীষণ ভাবে কাঁপতে থাকে সারা শরীরটা, পাটকিলে রঙের লোমের তলায় ঢেউ খেলিয়ে যায় কাঁপুনি।

'শেষ হয়ে গেল নাকি হুজুর?' একজন কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এসে উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করে।

গ্রিগোরি কোন জবাব না দিয়ে ঘোড়ার ম্লান হয়ে-আসা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন কি জখমের দিকেও নজর দেয় না। ঘোড়াটা খানিকটা অনিশ্চিত ভাবে তড়বড়িয়ে পিঠ সোজা করল। কোন কারণে যেন মনিবের কাছে ক্ষমা চাইছে এমন ভঙ্গিতে মাথা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে হঠাৎ হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ল। একমাত্র তখনই একটু সরে যায় গ্রিগোরি। একটা চাপা আর্তনাদ তুলে একপাশে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা, একবার চেষ্টা করল মাথা তুলতে। কিন্তু ওর শেষ শক্তিটুকুও আর নেই তখন। কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে, চোখে ঘনিয়ে আসে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা, ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। শুধু খুরের ঠিক ওপরে লোমের গুছি তখনও অল্প অল্প কাঁপছে, শেষ বারের মতো জীবনের আভাস দিচ্ছে। তিরতির করে নড়ছে জিনের ঘসা পাশটা।

আড়চোখে ঘোড়ার বাঁ কুঁচকির দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরি দেখতে পেল একটা গভীর কাটা দাগ। মাংস উপড়ে গিয়ে সেখান থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে কালো গরম রক্ত। কসাকটা ঘোড়া থেকে নামতে চোখের জল মোছার কোন চেষ্টা না ক'রে গ্রিগোরি আমতা আমতা করে বলল, 'এক বুলেটে সাবাড় করে দাও!' নিজের মাউজার পিস্তলটা সে তুলে দিল তার হাতে।

কসাকের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে গ্রিগোরি যেখানে তার স্কোয়াড্রনগুলো রেখে এসেছিল সেখানে ছুটে গেল। ইতিমধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে সেখানে।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজীরা হামলা শুরু করে। থরে থরে জমা কুয়াশার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে তারা সারি বেঁধে নীরবে এগিয়ে চলে ভিওশেন্স্কায়ার দিকে। ডান পাশে জলে ডোবা একটা নাবাল পড়তে সেখানে মিনিটখানেকের জন্য ইতস্তত করে, তারপর কার্তুজের থলে আর রাইফেলগুলো উঁচুতে তুলে ধরে বুক-জল ঠেলে এগোয়। কিছুক্ষণ পরে দন পারের পাহাড় থেকে চারটে ব্যাটারী একযোগে সুর মিলিয়ে গম্ভীর গর্জন করে উঠল। যেই পেথমের মতো হয়ে

গোলার ঝাঁক বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, অমনি বিদ্রোহীরাও গুলি ছুঁড়তে লাগল। এবারে লাল ফৌজীরা আর হেঁটে আসছে না, রাইফেল বাগিয়ে ধরে ছুটে আসছে। ওদের সামনে সিকি ক্রোশ খানেক দূরে বনের ভেতরে ফেটে পড়ছে বিস্ফোরক-গোলা। গোলার ঘায়ে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ছে গাছপালা, সাদা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। কসাকদের দুটো মেশিনগান অল্প সময়ের ব্যবধানে দফায় দফায় গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। লাল ফৌজের প্রথম সারিতে যারা ছিল তারা ধরাশায়ী হতে থাকে। সারির ওপর এখানে ওখানে আরও ঘন ঘন গোলা ফাটতে থাকে, ছুঁড়ে ফেলে দেয় ওভারকোট পাকিয়ে কাঁধে ঝোলানো লোকগুলোকে। কেউ উপুড় হয়ে কেউ বা চিত হয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল তারা কেউ আড়াল দেওয়ার জন্য শোয়ার চেষ্টা না করে এগিয়ে চলল। ওদের আর বনের মাঝখানে দূরত্ব ক্রমেই কমে আসতে থাকে।

দ্বিতীয় সারিটার আগে আগে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে গ্রেটকোটের কিনারা তুলে ধরে স্বচ্ছন্দে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটে চলেছে একজন ঢ্যাঙা লোক। ওদের কম্যাণ্ডার। লোকটার মাথায় টুপি নেই। সারিটা মুহূর্তের জন্য পায়ের গতি শ্লথ করে দিল। কিন্তু কম্যাণ্ডার ছুটতে ছুটতেই পিছন ফিরে চিৎকার করে কী বলল। অমনি ওরা সবাই আবার ছুটতে শুরু করল। আবার বেড়ে উঠতে থাকে, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ওদের ভাঙা গলার বিকট উল্লাসধ্বনি।

এবারে এক সঙ্গে গর্জন করে ওঠে কসাকদের সবগুলো মেশিনগান। বনের ধার থেকে রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার জোর শব্দ হতে থাকে অনর্গল, ঘনঘন। . . . গ্রিগোরি ওর স্কোয়াড্রন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বন থেকে বের হওয়ার একটা রাস্তার ওপর। সেখানে ওর পেছনে কোত্থেকে যেন বাজকি স্কোয়াড্রনের ভারী মেশিনগান অনেকক্ষণ ধরে দফায় দফায় গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল। আক্রমণকারীদের সারিগুলো নড়েচড়ে উঠে শুয়ে পড়ে পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। ঘণ্টা দেড়েক লড়াই চলল, কিন্তু বিদ্রোহীরা স্থির লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ে ওদের এমন নাস্তানাবুদ করে তুলল যে দ্বিতীয় সারির সেপাইরা আর টিকতে না পেরে উঠে পড়ল। মাঝে মাঝে আড়াল দিয়ে ছুটতে ছুটতে যে তিন নম্বর সারিটা এগিয়ে আসছিল তার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল ওরা। . . . দেখতে দেখতে ঘাস জমিটা ছেয়ে যায় লাল ফৌজীতে। তারা এলোপাতাড়ি পেছনে ছুটছে। এই বারে গ্রিগোরি ওর স্কোয়াড্রনগুলোকে কদমচালে বার করে আনে বনের ভেতর থেকে। তাদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে লাল ফৌজীদের পিছু ধাওয়া করে। তক্ষুনি পুরোবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসে চির-স্কোয়াড্রন। যারা পিছু হটছিল তাদের ঘাটের দিকে

যাবার পথ বন্ধ ক'রে দিল ওরা। দনের ধারের বনে, তীরের ঠিক কাছ ঘেঁসে শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি লড়াই। লাল ফৌজীদের একটা মাত্র অংশ ব্যূহ ভেঙে ভেলায় চড়ে বসতে পারল। চুড়োচুড়ি লোক বোঝাই হয়ে ভেলা ঘাট ছেড়ে দিল। বাকি সেপাইরা দনের একেবারে কিনারায় কোণঠাস হয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল।

গ্রিগোরি তার স্কোয়াড্রনগুলোকে ঘোড়া থেকে নামাল, ঘোড়া-তদারককারীরা যাতে বনের বাইরে না যায় তাদের সেই হুকুম দিয়ে কসাকদের নিয়ে পারের দিকে চলল। এ গাছ থেকে ও গাছের কাছে দৌড়ে দৌড়ে আড়াল দিয়ে ওরা ক্রমেই দনের কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। শ' দেড়েক লাল ফৌজী হাতবোমা আর মেশিনগানের পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে বিদ্রোহী পদাতিক দলটাকে রুখে দিল। ভেলাগুলো আবার বাঁ তীরের দিকে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু বাজ্‌কির কসাকরা রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে প্রায় সব কয়টা দাঁড়িকে সাবাড় করে দিল। যারা এপারে রয়ে গেল তাদের ভাগ্য আগে থাকতে স্থির হয়ে গিয়েছিল। মনের জোর হারিয়ে রাইফেল ফেলে সাঁতরে ওপারে যাবার চেষ্টা করল। পারের জলা জায়গার কাছে শুয়ে ওত পেতে ছিল বিদ্রোহীরা, তারা ওদের ওপর গুলি ছুঁড়তে লাগল। দনের প্রবল স্রোতে পার হওয়ার মতো শক্তি না থাকায় লাল ফৌজীদের অনেকেই ডুবে মারা গেল। নিরাপদে পার হতে পারল মাত্র দু'জন। ওদের একজনের গায়ে ডোরা কাটা খালাসী-গেঞ্জি - দেখেই বোঝা যায় পাকা সাঁতারু। লোকটা খাড়া পার থেকে মাথা নীচে করে ঝাঁপিয়ে জলে পড়ে, জলের তলায় ডুব দিয়ে ফের মাথা তোলে একেবারে মাঝ দরিয়ায় গিয়ে।

একটা ছড়ানো বেতঝোপের আড়ালে লুকিয়ে গ্রিগোরি লক্ষ করছিল খালাসীটা ঝপাঝপ সাঁতার দিয়ে শেষ পর্যন্ত ওপারে গিয়ে ঠেকল। আরেকজনও নিরাপদে সাঁতরে পার হল। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে লোকটা একের পর এক গুলি ছুঁড়ে বাকি কার্তুজগুলো শেষ করে দিল, কসাকদের দিকে মুঠি পাকিয়ে শাসাল, চেঁচিয়ে কী যেন বলল, তারপর কোনাকুনি চলল পারের দিকে। ওর আশেপাশে জলের মধ্যে গুলি ছিটকে পড়তে লাগল, কিন্তু লোকটার ভাগ্য এতই ভালো যে একটাও তার গায়ে লাগল না। এক সময় যেখানে গোবুবাছুরের চালা ছিল সেখানে জল থেকে উঠে সে গা ঝাড়া দিল, ধীরেসুস্থে খাত ধরে ওপরে গ্রামের বাড়িঘর লক্ষ্য করে হাঁটা দিল।

দনের পারে যারা রয়ে গিয়েছিল তারা বালিয়াড়ির আড়ালে শুয়ে পড়ল। যতক্ষণ না মেশিনগানের নলের খোপে জল টগবগ করে উঠল ততক্ষণ অবিরাম গর্জাতে থাকে তাদের মেশিনগানটা।

মেশিনগানের গুলি থেমে যেতেই গ্রিগোরি অনুচ্চস্বরে হুকুম দিল, 'আমার পেছন পেছন চলে এসো!' বলেই খাপ থেকে তলোয়ার খুলে টিলার দিকে চলল।

পেছনে ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পা ফেলে কসাকরা।

আর তিনশ' পা'র বেশি দূরে নেই লাল ফৌজীরা। তিনবার রাইফেলের গুলি ছুটল। পর মুহূর্তেই বালিয়াড়ির ওপাশ থেকে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াল ওদের কম্যাণ্ডার। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, কালো গোঁফজোড়া। ওকে হাতে ঠেকা দিয়ে ধরে রেখেছে চামড়ার কোর্তা পরা একটি স্ত্রীলোক। কম্যাণ্ডার আহত। ভাঙা পাখানা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে ঢিবির ওপাশ থেকে নেমে এলো সে, সঙীন বসানো রাইফেলখানা শক্ত করে হাতে চেপে ধরে ভাঙা গলায় হুকুম দিল, 'কমরেডরা এগিয়ে চল! সাদাদের খতম কর।'

একদল দুঃসাহসী লোক 'ইন্টারন্যাশানাল' গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গেল পালটা আক্রমণ করতে - মৃত্যুর মুখোমুখি।

শেষ যে এক শ' ষোলজন দনের পারে ধরাশায়ী হল তারা সকলে ছিল একটা ইন্টারন্যাশনাল কম্পানির কমিউনিস্ট।

তিন

গ্রিগোরি সদর ঘাটি থেকে নিজের আস্তানায় ফিরে এলো অনেক রাতে। গেটের কাছে প্রোখর জিকভ ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।

গলার স্বরে একটা উদাসীনতার ভাব এনে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'আক্সিনিয়ার কোন খবর আছে?'

'না। কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে,' হাই তুলে প্রোখর জবাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়ে মনে মনে ভাবল, 'ভগবান না করুন, আবার যেন আমায় ওর খোঁজে না পাঠায়।... ওদের যত রাজ্যের নটঘট, এদিকে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।'

'একটু জল নিয়ে এসো, গা-টা ধুয়ে ফেলি। সারা গা ঘামে জবজব করছে। কী হল? চটপট!' এবারে বিরক্ত হয়ে গ্রিগোরি বলে।

প্রোখর জল আনতে বাড়ির ভেতরে যায়। গ্রিগোরির হাতের আঁজলায় অনেকক্ষণ ধরে মগে করে জল ঢালে। দেখাই যাচ্ছিল হাতমুখ ধুতে বেশ তৃপ্তি লাগছিল গ্রিগোরির। শেষকালে ঘামের বোটকা গন্ধওয়ালা ফৌজী শার্টটা টেনে তুলে বলল, 'পিঠে ঢাল।'

কনকনে ঠাণ্ডা জলে ছাঁত করে উঠে ঘর্মাক্ত পিঠটা। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট

আর্তনাদ বার ক'রে, নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ ক'রে, অনেকক্ষণ ধরে হাতিয়ার ঝোলানো ফিতেতে ছড়ে যাওয়া ঘাড় আর লোমশ বুকে জোরে জোরে হাত ঘসে। একটা পরিষ্কার চট-কাপড় দিয়ে গা মোছে, তারপর গলা চড়িয়ে প্রোখরকে হুকুম করে, 'সকালে আমার জন্যে একটা নতুন ঘোড়া আসছে। এটাকে সাফসুতর করবে, কিছু দানা যোগাড় করে খাওয়াবে। আমায় জাগিও না। আমি নিজে যখন ওঠার উঠব। তবে সদর ঘাঁটি থেকে যদি কেউ আসে তাহলে জাগিয়ে দিও। বুঝেছ?'

এই বলে সে চালাঘরের ছাঁচের নীচে চলে গেল। একটা গাড়ির ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গভীর ঘুমে। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা লাগতে পা গুটিয়ে নিল, শিশিরে ভেজা গ্রেটকোটটা টেনে গায়ে জড়িয়ে নিল। কিন্তু, সূর্য ওঠার পর সে ফের ঝিমুতে শুরু করল। প্রায় সাতটার সময় কামানের ভারী গুমগুম গর্জনে ওর ঘুম ভেঙে গেল। জেলা-সদরের মাথার ওপর পরিষ্কার নীল আকাশে অনুজ্জ্বল দীপ্তি দিতে দিতে চক্কর দিচ্ছে একটা এরোপ্লেন। দনের ওপার থেকে সেটাকে লক্ষ্য করে কামান আর মেশিনগানের গুলি ছোঁড়া হচ্ছে।

খুঁটিতে বাঁধা কটা রঙের উঁচু একটা ঘোড়াকে প্রচণ্ড উৎসাহে বুরুশ করছিল প্রোখর। গ্রিগোরিকে দেখে সে বলল, 'কে জানে বাপু, এটার গায়ে লেগে যেতে পারে কিছু! দ্যাখ পান্তেলেয়েভিচ, কী জিনিস পাঠিয়েছে ওরা তোমার জন্যে!'

গ্রিগোরি ঘোড়াটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'কত বয়স এখনও ঠিক করতে পারি নি। ছ'বছরে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে?'

'হাঁ, ঠিকই বলেছ।'

'বাঃ চমৎকার! নিখুঁত পাগুলো, সবগুলোতেই মোজা লাগানো। বেশ সাজানো গোছানো। . . . আচ্ছা এবারে জিন চাপাও, একবার গিয়ে দেখে আসি এরোপ্লেনে চড়ে কে এলো।'

'ঘোড়াটা বেশ ভালো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৌড়োনোর সময় কেমন হবে? লক্ষণ দেখে ত মনে হচ্ছে বেশ তেজীয়ান,' জিনের নীচের পেটি কষতে কষতে বিড় বিড় করে বলে প্রোখর।

বিস্ফোরক-গোলার আরও একটা সাদা ধোঁয়াটে মেঘ ফেটে পড়ল এরোপ্লেনটার কাছাকাছি।

মাটিতে নামার উপযোগী একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে বিমানচালক চটপট এরোপ্লেনের গতি নীচের দিকে করে দিল। গ্রিগোরি ফটক খুলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ভিওশেনস্কায়ার আস্তাবলের দিকে। আস্তাবলের ওপাশে নেমেছে এরোপ্লেনটা।

আস্তাবল বলতে জেলা-সদরের কিনারায় ইটের তৈরি একটা লম্বা বাড়ি।

জেলার ঘোড়াগুলোকে রাখা হত ওখানে। এখন আট শ' জনেরও বেশি লাল ফৌজী বন্দীতে ঠাসাঠাসি। পাহারাদাররা ওদের হালকা হওয়ার জন্য বাইরে যেতে দেবে না। এদিকে গোটা দালানে পেচ্ছাপ-পায়খানা করার কোন জায়গা নেই। আস্তাবলের কাছটায় দেয়ালের মতো ভারী হয়ে জমে আছে মানুষের মলের উৎকট গন্ধ। দরজার নীচ দিয়ে গড়িয়ে আসছে দুর্গন্ধময় প্রস্রাবের স্রোত। তার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে ভনভন করছে সবুজ মাছিগুলো।

হতভাগ্য কয়েদীদের এই বন্দীশালা থেকে দিন রাত ভেসে আসে চাপা আর্তনাদ। না খেয়ে শুকিয়ে, আমাশা আর টাইফাস রোগের মহামারীতে মারা যাচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে বন্দী। বাসী মড়া অনেক সময় দিনের পর দিন ওখানেই পড়ে থাকছে – সরানো হচ্ছে না।

আস্তাবল ঘুরে ওপাশে গিয়ে গ্রিগোরি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার উদ্যোগ করছে, এমন সময় আবার দনের ওপার থেকে কামানের চাপা গর্জন উঠল। গোলা এগিয়ে আসার কড়কড় আওয়াজটা বাড়তে বাড়তে এক সময় ফেটে পড়ার ভারী আওয়াজের সঙ্গে মিশে গেল।

বিমানচালক আর তার সঙ্গের অফিসারটি প্লেনের ভেতরের আসন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না আসতে কসাকরা তাদের ছেঁকে ধরল। কিন্তু সেই মুহূর্তে পাহাড়ের সবগুলো কামান একসঙ্গে গর্জে উঠল। গোলাগুলো নিখুঁত ভাবে এসে পড়তে থাকে আস্তাবলের চারপাশে।

বিমানচালক তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে আসনে গিয়ে বসে। কিন্তু ইঞ্জিন চলতে চায় না।

'হাত দিয়ে ঠেলা মারে!' দনের ওপার থেকে আসা অফিসারটি চড়া গলায় হুকুম দেয়। শেষকালে নিজেই গিয়ে ধরে একটা ডানা।

একটু দোল খেয়ে এরোপ্লেন স্বচ্ছন্দ গতিতে সরে যেতে থাকে পাইনবনের দিকে। দ্রুতগতিতে ঘন ঘন কামানের গোলা তাকে অনুসরণ করে চলে। একটা গোলা ফেটে পড়ল কয়েদীদের ভিড়ে-ঠাসা আস্তাবলের ওপর। ঘন ধোঁয়া আর চুন সুরকির কুণ্ডলী তুলে ধসে পড়ল একটা কোনা। আতঙ্কগ্রস্ত কয়েদীদের বন্য চিৎকারে আস্তাবলটা কেঁপে উঠল। ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তিনজন কয়েদী লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কসাকরা এখান ওখান থেকে ছুটে এসে সরাসরি লক্ষ্যে গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দিল তাদের।

গ্রিগোরি চট করে একপাশে সরে গেল।

একজন কসাক ওর পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। লোকটার মুখে আতঙ্কের চিহ্ন, ভয়ে চোখের সাদা ডেলা বেরিয়ে আসছিল। চিৎকার করে গ্রিগোরিকে সে বলল,

'মারা যাবে যে! পাইনের বনের ভেতর ঢুকে পড় গে!'

গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল, 'যা বলেছে! সত্যি সত্যি লেগে যেতে কতক্ষণ! শয়তানের কী মতলব কে বলতে পারে?' ধীরে সুস্থে সে তার আস্তানার পথ ধরে।

সেই দিন কুদিনভ অত্যন্ত গোপনীয় এক বৈঠক ডেকেছিল সদর দপ্তরে। গ্রিগোরিকে ডাকা হল না সে-বৈঠকে। এরোপ্লেনে চেপে দন ফৌজের যে অফিসারটি এসেছিল, সে সংক্ষেপে জানাল যে কামেনস্কায়া জেলা-সদরের কাছে জমায়েত ঝটিকা বাহিনী যে-কোন দিন লাল ফৌজের ব্যূহ ভাঙবে এবং জেনারেল সেক্রেতেভের পরিচালনায় দন ফৌজের একটা ঘোড়সওয়ার-ডিভিশন বিদ্রোহীদের সঙ্গে এসে মিলবে। অফিসার প্রস্তাব করল অবিলম্বে পার হওয়ার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে সেক্রেতেভের ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ামাত্র বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ার ইউনিটগুলোকে দনের ডান পারে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। মজুত সৈন্যদলগুলোকে দনের আরও কাছাকাছি টেনে আনার পরামর্শ দিল সে। বৈঠকের একেবারে শেষে, পার হওয়ার আর পিছু ধাওয়ার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাবার পর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কয়েদীদের ভিওশেনস্কায়ায় ধরে রেখেছেন কেন বলুন ত?'

'আর কোথাও রাখার জায়গা নেই, গাঁয়ে কোন দালান নেই,' সেনাপতিমণ্ডলীর একজন উত্তর দিল।

অফিসার পরিষ্কার কামানো ঘামে ভেজা মাথাটা সযত্নে রুমাল দিয়ে মুছল, খাকি উর্দির কলারের বোতাম খুলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ওদের কাজানস্কায়ায় পাঠিয়ে দিন।'

কুদিনভ অবাক হয়ে ভুরু তুলল।

'কিন্তু তারপর?'

'তারপর আবার কী? - সেখান থেকে ফের ভিওশেনস্কায়ায় . . .' নিস্পৃহ নীল চোখদুটো কুঁচকে অনুকম্পাভরে বুঝিয়ে দিল অফিসার। ঠোঁটদুটো আরও চেপে কঠিন গলায় শেষ করল তার বক্তব্য: 'আমি বুঝতে পারছি নে মশাই, ওদের অমন খাতির করার কী আছে? আমার ত মনে হয় ওসব করার মতো সময় এখন নয়। যেমন দৈহিক, তেমনি সামাজিক যত রাজ্যের রোগের ডিপো ওই হারামজাদার দল - ওদের খতম করা দরকার। ছেড়ে কথা বলার কোন মানে হয় না! আপনাদের জায়গায় আমি হলে ঠিক তাই করতাম।'

পরের দিন দু'শ' জন বন্দীর প্রথম দলটাকে বার করে বালির ভেতর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। জীর্ণশীর্ণ পাণ্ডুর নীল বর্ণের লাল ফৌজীরা কোন রকমে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে ছায়ামূর্তির মতো। এলোমেলো ভাবে চলা

ভিড়টাকে ঘন হয়ে ঘিরে রেখেছে একদল ঘোড়সওয়ার পাহারাদার। . . . ভিওশেনস্কায়া আর দুব্রোভ্‌কার মাঝখানে তিন ক্রোশ পথের মধ্যে দু'শ' বন্দীর শেষ প্রাণীটি অবধি কুপিয়ে মেরে ফেলা হল। দ্বিতীয় দলটিকে বার করে আনা হল সন্ধ্যার আগে আগে। পাহারাদারদের ওপর কড়া হুকুম ছিল যারা পিছিয়ে পড়বে তাদের ওপর শুধু তলোয়ারের ঘা মারতে হবে। নেহাৎ উপায় না থাকলে তবেই গুলি করা যাবে। দেড়শ' জনের মধ্যে আঠারো জন কাজানস্কায়া পৌঁছল। . . . ওদের একজন, জিপসিদের মতো দেখতে জোয়ান গোছের এক লাল ফৌজী রাস্তার মাঝখানে পাগল হয়ে গেল। পথের ধার থেকে সুগন্ধী গুল্মের একগোছা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিল সে, তা-ই বুকে চেপে ধরে নেচেকুঁদে গান গাইতে গাইতে সারাটা রাস্তা চলল। মাঝে মাঝে গরম বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল। গায়ের ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা সুতির শার্টটা ফরফর করছিল বাতাসে। তখন ওর হাড্ডিসার পিঠের ওপর টানটান চামড়া আর ছড়ানো পায়ের তলীর কালো ফাটল ঘোড়সওয়ার পাহারাদারদের চোখে পড়ে। তারা ওকে উঠিয়ে জলের বোতল থেকে ওর ওপর খানিকটা জল ছিটিয়ে দেয়। তখন উন্মত্ত জ্বলজ্বলে কালো চোখদুটো মেলে সে তাকায়, নীরবে হাসে, তারপর আবার চলতে থাকে হেলেদুলে।

একটা গ্রামের কিছু নরম্ স্বভাবের মেয়ের দল পাহারাদারদের ঘিরে ধরল। গম্ভীর ভারী চেহারার এক বুড়ি কড়া গলায় পাহারাদারদের সর্দারকে বলল, 'এই কেলেটাকে ছেড়ে দাও। ওর মাথার গণ্ডগোল হয়ে গেছে, ভগবানের কাছে চলে গেছে। এরকম মানুষকে মারলে মহাপাতক হবে তোমাদের।'

পাহারাদারদের সর্দার কটা রঙের গোঁফওয়ালা মস্তান চেহারার এক জুনিয়র কর্পেট। বুড়ির কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আরও কিছু পাপের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে নিতে আমরা ডরাই না বুড়ি মা। হাজার হোক সাধুসন্ত আমরা কোনমতেই বলছি নে!'

'ছেড়ে দাও বাবা, আর 'না' বোলো না।' বুড়িও নাছোড়বান্দা। আমাদের সবারই যে শিয়রে শমন। . . .'

মেয়েরা সকলে এক কাট্টা হয়ে বুড়ির কথায় সায় দিল। জুনিয়র কর্পেট শেষকালে রাজী হয়ে গেল।

'আমার কোন দুঃখু নেই। নিয়ে নাও। ও আর এখন কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আমরা এই যে দয়া দেখালাম তার জন্যে আমাদের প্রত্যেককে এক পাত্তর করে সর-ননী-না-তোলা খাঁটি দুধ খাওয়াও দেখি।'

পাগলকে বুড়ি তার ছোট্ট কুঁড়েঘরে এনে তুলল; বেশ করে খাইয়ে দাইয়ে ভেতরের ঘরে ওর জন্য বিছানা করে দিল। পুরো একদিন এক রাত একটানা

ঘুমাল সে, তারপর জেগে উঠে জানলার দিকে পিঠ করে মৃদু সুরে গান ধরল। বুড়ি ভেতরের ঘরে এসে তোরঙ্গের ওপর বসে, গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ছোকরার শুকনো মুখটা। ভারী গলায় বলে, 'তোমাদের লোকেরা বেশি দূরে নয় বলেই শোনা যাচ্ছে।...'

পাগল মুহূর্তের জন্য চুপ করেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার গান ধরল – তবে এবারে আরও চাপা সুরে।

বুড়ি তখন কড়া গলায় বলল, 'ওসব গান গীত এখন ছাড় ত বাপু, আর ভান করতে হবে না। আমায় ধোঁকা দেবে তুমি! এতটা বয়স হল, তুমি আমায় ঠকাবে! অত বোকা আমি নই। মাথা দস্তুরমতো ঠিক আছে, আমি জানি।... ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি যে সমস্ত কথা বলেছ সব শুনেছি – দিব্যি গোছান।'

লাল ফৌজী গান গেয়ে চলে, তবে তার গলা ক্রমেই আস্তে হয়ে আসতে থাকে। বুড়ি বলে চলে, 'আমাকে ভয় কোরো না তুমি, তোমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই আমার। আমার দুটো ছেলে মারা গেছে জার্মান যুদ্ধে। আর সবচেয়ে ছোটটি মারা গেল এই যুদ্ধে, চের্কাসস্কে। কত আদর করে বুকের আড়াল দিয়ে ওদের মানুষ করেছিলাম!... খাইয়েছি, পরিয়েছি, যখন কচি বাচ্চা ছিল রাতের পর রাত ঘুমোতে পারি নি।... এই জন্যেই ত জোয়ান ছেলেরা পল্টনে কাজ করছে, যুদ্ধ করছে দেখলেই বড় মায়া লাগে।...' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে সে।

লাল ফৌজীও চুপ। চোখ বন্ধ করে। তার রোদে পোড়া তামাটে গালের টিবিদুটোর ওপর ফুটে উঠে লাল আভা। সরু লিকলিকে ঘাড়ের ওপর একটা নীল শিরা টান টান হয়ে দপদপ করতে থাকে।

মিনিটখানেক সে চুপচাপ প্রত্যাশাভরে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে কালো চোখজোড়া খানিকটা মেলে তাকায়। সে দৃষ্টিতে বুদ্ধির ছাপ ছিল, ঝলকাচ্ছিল এমন একটা অধীর প্রতীক্ষা যে বুড়ি তা দেখে মৃদু হাসে।

'শুমিলিন্স্কায়ার রাস্তা চেন?'

'না বুড়ি মা,' কোন রকমে সামান্য ঠোঁট নেড়ে জবাব দেয় লাল ফৌজী।

'তাহলে যাবে কী করে?'

'জানি নে।...'

'সেই ত হল কথা! তোমায় নিয়ে এখন কী করি আমি?'

জবাবের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকে বুড়ি। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'হাঁটতে পার ত?'

'কোন রকমে পারব।'

'কোন রকমে পারলে চলবে না এখন। রাতারাতি তোমাকে হেঁটে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়! আরও একটা দিন থেকে যাও। সঙ্গে খাবার দিয়ে দেব, আমার ছোট নাতিটাকে সঙ্গে দেব – তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ভালোয় ভালোয় চলে যেতে পারলেই হয় এখন। তোমাদের লাল ফৌজীরা শুমিলিন্‌স্কায়ার ওধারে আছে – আমি ভালো করেই জানি। তুমি ঠিক ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। তবে বড় রাস্তা ধরে যাওয়া চলবে না তোমার। যেতে হবে স্তেপের মাঠ পেরিয়ে, রাস্তাঘাট ছাড়িয়ে বন জঙ্গল আর পাহাড়ী খাতের ভেতর দিয়ে। নইলে কসাকরা তোমাকে আবার ধরে ফেলবে, তখন আবার বিপদ ঘটবে। বুঝলে বাছা!'

পরের দিন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই বুড়ির বারো বছরের নাতি আর লাল ফৌজীটি পথে নামার উদ্যোগ করল। লাল ফৌজীর পরনে এখন মোটা বনাত কাপড়ের কসাক-কোর্তা। বুড়ি তাদের আশীর্বাদ করে রুক্ষ গলায় বলল, 'এবারে এসো। ভগবান সহায় হোন! দেখো, আমাদের সেপাইদের হাতে পড়ো না যেন! . . . না না আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই বাছা! আমাকে নমস্কার করার দরকার নেই, নমস্কার কর তাঁকে, পরম করুণাময়কে! . . . আমি একা ত নই, আমরা মায়েরা সবাই ভালো। আমাদের সকলেরই দয়ামায়া আছে। . . . তোমরা অভাগারা সব মারা যাচ্ছ . . . তোমাদের দেখলে বড় কষ্ট হয়! ব্যস ব্যস, এবারে রওনা দাও, প্রভু তোমার সহায় হোন!' এই বলে কুঁড়েঘরের হলুদ গেরিমাটি লেপা তেড়াবাঁকা ঝাঁপখানা ঝপ করে বন্ধ করে দিল বুড়ি।

চার

রোজই ইলিনিচ্‌না ভোরের প্রথম আলো ফুটতে না ফুটতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, গোরু দোয়ায়, তারপর রান্নাবান্নার কাজ শুরু করে দেয়। বাড়ির ভেতরের বড় চুলোটা আর ধরায় না, বাইরের হেঁসেলে উনুন জ্বালিয়ে রান্না ক'রে ফের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে, বাচ্চাদের তদারকি করে।

টাইফাস জ্বর থেকে ভুগে ওঠার পর নাতালিয়া ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। ট্রিনিটি পরব শুরুর পরের দিন সে প্রথম বিছানা ছেড়ে উঠল, হেঁটে এ-ঘর ও-ঘর করল। পাগুলো শুকিয়ে লিকলিকে হয়ে গেছে, খুবই কষ্ট হচ্ছিল পা ফেলতে। অনেকক্ষণ ধরে ছেলেমেয়েদের মাথা হাতড়ে উকুন বাছার চেষ্টা করল, এমন কি জলচৌকিতে বসে বাচ্চাদের জামাকাপড় কাচারও চেষ্টা করল খানিকটা।

মুখ শুকিয়ে গেলেও সারাক্ষণ সে মুখে হাসি লেগে আছে। বসা গালদুটোতে লাল আভা। অসুখের পর ওর চোখজোড়া যেন আরও বড় হয়ে উঠেছে, এমন আবেগের দীপ্তিতে ঝলমল করছে যে মনে হয় বুঝি সবে বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে।

'পলিউশ্‌কা সোনামণি আমার, আমি যখন বিছানায় পড়ে ছিলাম তখন মিশাত্‌কা তোকে জ্বালায় নি ত রে?' মেয়ের মাথার কালো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে ক্ষীণ গলায় অনিশ্চিত ভাবে প্রত্যেকটা শব্দ টেনে টেনে উচ্চারণ ক'রে বলে।

'না মামণি, মিশাত্‌কা শুধু একবার একটু মেরেছিল। এমনিতে আমরা দু'জনে ভালো খেলেছি,' ফিসফিস করে মেয়ে উত্তর দেয়, মায়ের কোলে জোর করে মুখ গোঁজে।

'আর দিদা তোদের যত্ন করতেন ত?' হাসিমুখে নাতালিয়া জিজ্ঞেস করে।

'খুউব!'

'বাইরের লোকেরা? লাল সেপাইরা তোদের কিছু করে নি?'

'আমাদের বাছুরটা জবাই করেছে হারামজাদারা!' ছেলেমানুষী ভারী গলায় বলে মিশাত্‌কা। বাপের সঙ্গে আশ্চর্য মিল ওর চেহারার।

'মিশাত্‌কা, লক্ষ্মীটি অমন গালিগালাজ করতে নেই! ওঃ বুড়ো কত্তা এসেছেন আমার! বড়দের নিয়ে কখনও খারাপ কথা বলে না!' হাসি চাপতে চাপতে উপদেশের সুরে নাতালিয়া বলে।

'দিদাই ত ওদের ওরকম গালাগাল করল, পলিয়াকে জিজ্ঞেস করেই দ্যাখ না,' মুখ গোমড়া করে কৈফিয়ত দেয় ছোট মেলেখভ।

'সত্যি মা, তাছাড়া ওরা আমাদের মুরগীগুলোও সব মেরেছে, একটাও বাদ রাখে নি!'

পলিয়া উৎসাহ পায়। চকচক করে ওঠে ওর ছোট ছোট কালো চোখ। কী ভাবে লাল ফৌজীরা ওদের বাড়ির উঠোনে এসে ঢোকে, হাঁসমুরগীগুলো ধরতে থাকে তার বর্ণনা দিতে থাকে। দিদা কত করে বলল যাতে আমাদের সেই যে হলুদ মোরগটা যার ঝুঁটিটা বরফে খেয়ে গেছে সেটাকে অন্তত ছেড়ে দেয় পালে দেবার কাজে লাগবে বলে। তাতে একজন রগুড়ে লাল সেপাই মোরগটাকে তুলে দোলাতে দোলাতে বললে, 'এই মোরগটা সোভিয়েত সরকারের ওপর কোঁকর-ও-কোঁ ডেকেছে, তাই একে আমরা মারার হুকুম দিলাম! যত যাই বল না কেন বাপু, কোন কাজ হবে না – আমরা একে দিয়ে সুরুয়া বানাব, বদলে তোমার জন্যে এক জোড়া পুরনো পশমের জুতো রেখে যাব।'

পলিউশ্‌কা দেখানোর জন্য হাঁতদুটো দু'পাশে ছড়িয়ে বলল, 'রেখে গেছে এই অ্যাত্ত বড় জুতো! মা গো কী বিরাট, কী বিরাট! সারা জায়গায় ফুটো আর ফুটো!'

নাতালিয়া হেসে কেঁদে ছেলেমেয়েদের আদর করে মুগ্ধ চোখ মেয়ের দিক থেকে সরাতে পারে না। আনন্দে ফিসফিস ক'রে বলে, 'হ্যাঁ বাপের বিটি হয়েছিস! একেবারে বাপের মতো, কোথাও এতটুকু তফাত নেই ওর সঙ্গে।'

'আর আমি? আমি বুঝি বাবার মতো না?' ঈর্ষাভরে প্রশ্ন করে মিশাতকা। ভয়ে ভয়ে মায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়ায়।

'তুইও ওর মতো। তবে দেখিস বড় হয়ে কিন্তু তোর বাপের মতো ছন্নছাড়া হোস নে।'

'কিন্তু বাবা কি ছন্নছাড়া? কী করে ছন্নছাড়া হল?' পলিউশ্‌কা জানতে চায়।

নাতালিয়ার মুখের ওপর বিষাদের ছায়া পড়ে। কোন কথা না বলে অতি কষ্টে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

ওদের কথাবার্তার সময় ইলিনিচ্‌না ঘরের ভেতরেই ছিল। অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। নাতালিয়া ছেলেমেয়েদের কোন কথায় আর কান না দিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে আস্তাখভদের বাড়ির বন্ধ খড়খড়িগুলোর দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অস্থির হয়ে গায়ের পুরনো রঙজ্বলা জামার ঝালর নাড়াচাড়া করতে থাকে।...

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে নাতালিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ছেলেমেয়েদের ঘুম যাতে ভেঙে না যায় তাই নিঃশব্দে উঠে পড়ল। হাতমুখ ধুয়ে সিন্দুক থেকে একটা পরিষ্কার ঘাগড়া আর মাথার ঘোমটা দেবার একটা বড় সাদা ওড়না বার করল। দেখলেই বোঝা যায় ও ভেতরে ভেতরে দারুণ চঞ্চল হয়ে পড়েছে। ওর জামাকাপড় পরার ধরন আর মুখে বিষাদ ও কঠোর নীরবতা লেগে থাকতে দেখে ইলিনিচ্‌নার বুঝতে বাকি রইল না যে ছেলের বৌ ওর ঠাকুরদা গ্রিশাকার কবরের কাছে যাবে।

অনুমানটা ঠিক কিনা জানার জন্য ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় চললে?'

'যাই, দাদুকে দেখে আসি,' মাথা না তুলেই নাতালিয়া বলল।

গ্রিশাকা দাদুর মারা যাওয়ার খবর ও শুনেছিল। কশেভয় যে ওদের বাড়ি আর খামারে আগুন দিয়েছে তাও শুনেছিল।

'বড্ড দুর্বল তুমি, অতটা যেতে পারবে না।'

'মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিলে ঠিক চলে যেতে পারব। বাচ্চাদের খেতে দেবেন মা। ওখানে হয়ত আমার বেশ দেরি হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কেন - অত দেরি কেন হবে? দিন কাল ভালো নয় - বলা যায় না, ভগবান না করুন, ওই শয়তানগুলোর খপ্পরে গিয়ে না পড়। না গেলেই ত হত নাতালিয়া, লক্ষ্মী মা আমার!'

'না, যাব বলেই ঠিক করেছি।' নাতালিয়া ভুরু কুঁচকে দরজার হাতল চেপে ধরল।

'তাহলে একটু সবুর কর। খালি পেটে যাবে কেন? অন্তত একটু টক দুধ দিই, খেয়ে যাও।'

'না মা। ভগবানের দোহাই। দরকার নেই। . . . এসে খাব 'খন।'

ছেলের বৌ যাবে বলেই স্থির করেছে দেখে ইলিনিচনা পরামর্শ দিল, 'দনের পাশের রাস্তা ধরে আনাজ বাগানের ভেতর দিয়ে বরং যেও। ও রাস্তায় তোমাকে কারও তেমন চোখে পড়বে না।'

দনের বুকের ওপর ছাউনির মতো ঝুলে আছে কুয়াশা। সূর্য তখনও ওঠে নি। তবে পুব দিকে পপ্‌লার গাছের আড়ালে ঢাকা আকাশের ঝালরটা ভোরের লাল আভায় জ্বলজ্বল করছে। মেঘের কোল থেকে ভেসে আসছে ভোরের আগের মুহূর্তের মৃদুমন্দ সিরসিরে হাওয়া।

বুনো লতাপাতায় জড়ানো ধসে পড়া বেড়া ডিঙিয়ে নাতালিয়া গিয়ে ঢুকল নিজেদের বাড়ির বাগানে। দু'হাত বুকে চেপে ধরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সদ্য তোলা একটা মাটির ঢিবির সামনে।

বিছুটি গাছ আর নানা রকম আগাছায় ছেয়ে গেছে বাগানটা। বাতাসে ভেসে আসছে শিশিরভেজা ভাঁটুইফুল, কুয়াশা আর ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। আগুন লাগার পর শুকিয়ে গেছে পুরানো আপেল গাছটা। তার ওপর রোঁয়া ফুলিয়ে বসে আছে নিঃসঙ্গ একটা শালিক পাখি। কবরের ঢিবিটা বসে গেছে। এখানে ওখানে শুকিয়ে যাওয়া মাটির ডেলার ফাঁকে ফাঁকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সবুজ ঘাসের শীষ।

অসংখ্য স্মৃতির বন্যাস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় নাতালিয়াকে। নীরবে হাঁটু গেড়ে বসে নাতালিয়া মুখ লুকোয় মাটির বুকে, যে মাটি নির্দয়, যে মাটিতে আছে এই ক্ষয়িষ্ণু মরজগতের চিরন্তন গন্ধ।

ঘন্টাখানেক পরে নাতালিয়া গুড়ি মেরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো বাগান থেকে, বেদনা ভারাক্রান্ত মনে শেষ বারের মতো ফিরে তাকাল সেই জায়গাটায় যেখানে কোন এক সময় ওর যৌবন কুসুম ফুটেছিল, ঝরে পড়েছিল। আগুনে পুড়ে ঝাঁই চালাঘরের আড়কাঠ, পোড়া চুল্লীগুলো আর বাড়ির ভিতের ধ্বংসস্তূপ - সব মিলিয়ে পোড়ো উঠোনটা যেন বিভীষিকার কালো ছায়া। নাতালিয়া ধীরে ধীরে গলি দিয়ে বেরিয়ে এলো।

* * *

রোজ একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে নাতালিয়া। পায়ে বল পাচ্ছে, ওর কাঁধজোড়া সুডৌল হয়ে উঠছে, স্বাস্থ্যের জোয়ারে ভরে উঠছে সারা দেহ।

অল্পদিনের মধ্যেই ও শাশুড়ীর রান্নার কাজে সাহায্য করতে থাকে। উনুনের ধারে কাজ করতে করতে অনেক কথা হয় ওদের দু'জনের মধ্যে।

একদিন সকালে নাতালিয়া বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'কিন্তু কবে এর শেষ হবে? আর যে পারা যায় না!'

'আমাদের লোকেরা দনের ওপার থেকে এই এল্যো বলে, দেখে নিও তুমি,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল ইলিনিচ্না।

'আপনি কী করে জানলেন মা?'

'আমার মন বলছে।'

'আমাদের কসাকরা সব বেঁচেবর্তে থাকলেই হল। ভগবান না করুন, কেউ মারা যেতে পারে, কেউ বা জখম হতে পারে। গ্রিশা যে আবার বড্ড বেপরোয়া।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাতালিয়া।

'ওদের কোন ক্ষতি হবে বলে আমার মনে হয় না। ঈশ্বর দয়াময়। আমাদের বুড়ো ত কথা দিয়েছিল আবার এপারে এসে দেখা করে যাবে আমাদের সঙ্গে। হয়ত ভয়-টয় পেয়ে গেছে। এলে তোমাকেও পাঠিয়ে দেওয়া যেত এই পোড়া জায়গা থেকে ওপারে আমাদের লোকজনের কাছে। গাঁয়ের উল্টো দিকে মাটি খুঁড়ে ঘাঁটি আগলাচ্ছে আমাদেরই গাঁয়ের লোকেরা। যখন তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলে সেই সময় এক দিন ভোরবেলায় আমি জল আনতে গিয়েছিলাম দনের দিকে – শুনি ওপার থেকে আনিকুশ্‌কা চেঁচাচ্ছে, 'নমস্কার দিদিমা। তোমার বুড়ো নমস্কার জানিয়েছে তোমায়!''

নাতালিয়া সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, 'আর গ্রিশা? গ্রিশা কোথায়?'

'ও দূর থেকে ওদের সবাইকে হুকুম দিচ্ছে,' সরল ভাবে উত্তর দিল ইলিনিচ্না।

'কিন্তু কোত্থেকে?'

'হয়ত ভিওশেনস্কায়া-থেকে। আর কোত্থেকেই বা হবে?'

নাতালিয়া বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ইলিনিচ্না ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, 'কী হল তোমার? কাঁদছ কেন?'

উত্তর না দিয়ে বুকের সামনের নোংরা কাপড়ের আঁচলে মুখ গুঁজে নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে নাতালিয়া।

'কাঁদো না লক্ষ্মীটি নাতালিয়া। চোখের জলে কোন কাজ হবে না। ভগবান যদি করেন ওদের আবার সুস্থসবল দেখতে পাব। নিজের যত্ন নাও একটু। যখন তখন বাড়ির বাইরে যেও না, খ্রীষ্টের দুশমনগুলোর নজরে পড়ে গেলে কী হয় বলা যায় না। . . .'

রান্নাঘরটায় হঠাৎ আরও অন্ধকার ছায়া নেমে আসে। বাইরে কার একটা

ছায়ামূর্তি জানলা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। মুখ ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকাতেই আঁতকে ওঠে ইলিনিচ্না।

'ওই ত ওরা! লালগুলো এসে গেছে, নাতালিয়া। শিগ্‌গির গিয়ে শুয়ে পড় বিছানায়, অসুখের ভান করে শুয়ে থাক।... কী হয় বলা যায় না!... এই ছালাটা দিয়ে গা ঢাক গে!'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নাতালিয়াও বিছানায় গিয়ে পড়েছে, অমনি দরজার শিকলিটা ঝনাৎ করে উঠল। একটু ঝুঁকে পড়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকল এক ঢ্যাঙা লাল ফৌজী। বাচ্চারা ইলিনিচ্নার ঘাগরার খুঁট চেপে ধরেছে। ইলিনিচ্না ফেকাসে হয়ে গেছে। উনুনের ধারে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই ধপ করে বসে পড়ল বেঞ্চের ওপর। জ্বাল দেওয়া দুধের মালসাটা উল্‌টে পড়ে গেল।

লাল ফৌজীটি রান্নাঘরের চারদিকে চট করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'ভয় পাবার কিছু নেই। তোমাদের খেয়ে ফেলব না। নমস্কার!'

নাতালিয়া মাথা পর্যন্ত চাদরে মুড়ি দিয়ে অসুস্থতার ভান করে কাতরাতে থাকে। মিশাত্‌কা ভুরু কুঁচকে আগন্তুককে দেখতে দেখতে শেষকালে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে, 'দিদা, এই যে এই লোকটাই সে দিন আমাদের মোরগটা জবাই করেছিল! মনে আছে তোমার?'

লাল ফৌজী মাথার খাকি টুপি খুলে জিভ দিয়ে টাকরায় টুসকি মেরে হাসে।

'শয়তানটা আমায় চিনতে পেরেছে তাহলে? ওই মোরগের শোক এখনও ভুলতে পারছ না, অ্যাঁ? যা হোক, গিন্নি-মা যে কাজে এসেছি বলি! কিছু রুটি সেঁকে দিতে পার আমাদের? ময়দা আমাদের আছে।'

'তা পারি... এতে আর কী আছে?... দেব বানিয়ে...' আগন্তুকের দিকে না তাকিয়ে তড়বড় করে কথাগুলো বলে বেঞ্চের ওপর থেকে ছলকানো দুধ মুছতে থাকে ইলিনিচ্না।

লাল ফৌজী এবারে দরজার কাছে বসে পড়ে। পকেট থেকে তামাকের বটুয়াটা বার ক'রে, সিগারেট পাকাতে পাকাতে আলাপ শুরু করে দেয়।

'আজ রাতের মধ্যে বানিয়ে দিতে পারবে ত?'

'যদি অত তাড়া থাকে তাহলে তাও পারি।'

'লড়াই যখন চলে বুড়ি-মা তখন সব সময়ই তাড়া। তবে মোরগটার জন্যে মন খারাপ কোরো না।'

ইলিনিচ্না ভয় পেয়ে বলল, 'না না তা কেন! বোকা ছেলে... কী বলতে কী বলে ফেলেছে!'

একগাল হেসে মিশাত্‌কার দিকে ফিরে আলাপপ্রিয় আগন্তুকটি বলল, 'যাই

বল্‌ না কেন খোকা তুমি কিন্তু ভারী কেপ্পন! . . . আরে নেকড়ে ছানার মতো অমন কটমটিয়ে তাকাচ্ছ যে? এদিকে এসো দেখি, মন খুলে তোমার ওই মোরগের কথাই বলা যাক না হয়।'

'যা রে, যা বোকা ছেলে!' নাতিকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে ফিসফিস করে বলে ইলিনিচ্‌না।

কিন্তু নাতি ততক্ষণে ঠাকুমার আঁচল ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে ধার ঘেঁসে ঘেঁসে কেটে পড়ার তাল করছিল। লাল ফৌজী লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে ওকে ধরে কাছে টেনে আনল।

'রাগ হয়েছে বুঝি?'

'না,' ফিসফিস করে মিশাত্‌কা উত্তর দিল।

'বাঃ, এই তো চাই! তোমার সব সুখ বলতে কি আর ওই একটা মোরগ! তোমার বাপ কোথায়? দনের ওপারে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের সঙ্গে লড়ছে তাহলে?'

লোকটার দরদভরা কথায় মিশাত্‌কার মন ভিজে যায়। উৎসাহের সঙ্গে সে জানায়, 'আমার বাবা সব কসাকদের চালায়।'

'ধুৎ, বাজে কথা বলছ খোকা!'

'কেন, দিদাকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না।'

বুড়ি এদিকে নাতির বাচালতায় একেবারে ভেবাচেকা খেয়ে গেছে। সে শুধু গালে হাত দিয়ে অস্ফুটস্বরে কী যেন বলল।

লাল ফৌজী স্তম্ভিত হয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'সবাইকে চালায়?'

'না, সবাইকে হয়ত নয় . . .' ঠাকুমার মরিয়া চাউনি দেখে কী বলবে বুঝতে না পেরে এবারে অনিশ্চিত ভাবে মিশাত্‌কা বলল।

লাল ফৌজী একটু চুপ করে থাকে। তারপর আড়চোখে নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বৌটার কী হয়েছে? শরীর খারাপ নাকি?'

'টাইফাস জ্বরে ভুগছে,' ইলিনিচ্‌না অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দেয়।

দু'জন লাল ফৌজী রান্নাঘরে এক বস্তা ময়দা এনে চৌকাঠের কাছে রাখে।

'উনুন ধরাও গো গিন্নি।' ওদের একজন বলল। 'সন্ধের দিকে রুটি নিতে আসব। দেখো ভালো সেঁকা হয় যেন। নইলে ব্যাপার খারাপ হবে কিন্তু।'

'আমার যেমন ক্ষ্যামতা তেমনি সেঁকব,' ইলিনিচ্‌না উত্তর দেয়। নতুন লোকগুলো এসে বিপজ্জনক প্রসঙ্গটা পালটে দিতে এবং মিশাত্‌কাও সেই ফাঁকে রান্নাঘর ছেড়ে পালাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বুড়ি।

একজন মাথা নেড়ে ইশারায় নাতালিয়াকে দেখিয়ে বললে, 'টাইফাস জ্বর নাকি?'

'হ্যাঁ।'

লাল ফৌজীরা নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কী নিয়ে যেন কথাবার্তা বলল। শেষে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওদের শেষ লোকটি তখনও গলির কোনায় মোড় নেওয়ার অবকাশ পায় নি, এমন সময় দনের ওপার থেকে কটকট করে রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুরু হল।

লাল ফৌজীরা নীচু হয়ে মাথা বাঁচিয়ে আধভাঙা পাথরের পাঁচিলের দিকে ছুটে গিয়ে তার আড়ালে শুয়ে পড়ল। সকলে একসঙ্গে খটাস করে রাইফেলের ছিটকিনি টেনে পাল্টা গুলি ছুঁড়তে লাগল।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে মিশাত্কার খোঁজে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে আসে ইলিনিচ্না। পাঁচিলের ওপাশে থেকে একজন সেপাই চিৎকার করে ওকে বলল, 'এই বুড়ি মা, বাড়ির ভেতরে চলে যাও! মারা পড়বে যে!'

'আমাদের ছোট বাচ্চাটা যে বাইরে! মিশাত্কা! মিশা! লক্ষ্মী, সোনা আমার।' কাঁদো কাঁদো গলায় ডেকে ফিরতে থাকে বুড়ি।

বুড়ি দৌড়ে উঠোনের মাঝামাঝি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দনের ওপার থেকে গুলি ছোঁড়া বন্ধ হল। কসাকরা হয়ত ওপার থেকে ওকে দেখতে পেয়েছিল। মিশাত্কা ছুটে কাছে আসতে বুড়ি ওর হাত ধরে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে যেতেই আবার নতুন করে গুলি ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল। লাল ফৌজীরা যতক্ষণ না মেলেখভদের বাড়ি ছেড়ে চলে যায় ততক্ষণ চলতে থাকে গুলি।

ময়দা মাখতে মাখতে ইলিনিচ্না আর নাতালিয়া নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথাবার্তা বলে। কিন্তু রুটি আর সেঁকতে হল না।

মেশিনগান-ঘাঁটির যে-সমস্ত লাল ফৌজী গ্রামে আস্তানা নিয়েছিল দুপুরের দিকে দেখা গেল হঠাৎ তারা দুড়দাড় করে গ্রামের বাড়ি ঘর ছেড়ে পেছনে পেছনে মেশিনগান টানতে টানতে খাত ধরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের ওপরে যে কম্পানিটা পরিখা আগলে ছিল তারা সকলে সার বেঁধে দ্রুত মার্চ করে হেটম্যান সড়কের দিকে চলে গেল।

দনের আশপাশের সমস্ত এলাকা জুড়ে হঠাৎ যেন ছড়িয়ে পড়েছে গভীর নিস্তব্ধতা। কামান মেশিনগানের কোন সাড়াশব্দ নেই। পথঘাট বয়ে আর গরমকালের যে-সমস্ত কাঁচা রাস্তায় ঘাস গজিয়েছে সেগুলোর ওপর দিয়ে গ্রাম থেকে হেটম্যান সড়কের দিকে চলেছে মালপত্রের গাড়ি আর কামানের অন্তহীন সারি, দলে দলে সার বেঁধে চলেছে পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার সেপাই।

জানলা থেকে ইলিনিচ্না দেখছিল পেছনে পড়ে থাকা কয়েকজন লাল ফৌজী

খড়িমাটির খাড়াই বয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। বুকের আঁচলে হাত মুছে ভক্তিগদগদ হয়ে সে ক্রুশচিহ্ন আঁকল।

'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, ও নাতালিয়া! লাল সেপাইরা সরে পড়ছে!'

'না মা, ওরা এখন গাঁ ছেড়ে পাহাড়ে কাটা মাটির খোঁড়লগুলোর ভেতরে গিয়ে ঢুকছে, সন্ধেবেলা আবার ফিরে আসবে।'

'তা হলে অমন পড়িমরি ছুটছে কেন? ওরা তাড়া খেয়েছে! পিছু হটে যাচ্ছে মুখপোড়াগুলো! ছুটে পালাচ্ছে খ্রীষ্টের দুশমনেরা!' উল্লসিত হয়ে ওঠে ইলিনিচ্না। কিন্তু আবার শুরু করে ময়দা মাখা।

নাতালিয়া বারান্দা ছেড়ে দেউড়ির চৌকাটের কাছে এসে দাঁড়ায়, চোখের ওপর হাত রেখে আড়াল করে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে রোদঝলমলে খড়িপাহাড় আর রোদে পোড়া লালচে বাদামী শৈলশিরাগুলোর দিকে।

পাহাড়ের ওপাশে ঝড়ের আগের গম্ভীর থমথমে ভাব। তারই মধ্যে সাদা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে মেঘের জটা। দুপুরের ঠাঁটা রোদে মাটি পুড়ে যাচ্ছে। গোরু চরানোর মাঠে মেঠো ইঁদুরগুলো শিস দিচ্ছে, ওদের মৃদু করুণ সুরের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিশে যাচ্ছে চাতক পাখিদের প্রাণোচ্ছল খুশির গান। কামানের গর্জনের পর যে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে তা নাতালিয়ার বড় মধুর লাগে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে, সাগ্রহে কান পেতে শোনে চাতক পাখির সহজ সরল গান, কুয়ো থেকে জল তোলার কপিকলের ক্যাঁচকোঁচ আর সোমরাজের কটু গন্ধে ভরপুর বাতাসের ঝিরঝির শব্দ।

স্তেপের এই ডানা ছড়ানো পুবাল বাতাস ঝাঁঝাল অথচ মধুর। বাতাসে ছড়াচ্ছে গনগনে কালো মাটির তাপ, রোদের তাপে যত রকমের ঘাস নিস্তেজ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে তাদের নেশা ধরানো গন্ধ। কিন্তু এর মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন বর্ষণের পূর্বাভাস: দন থেকে ভেসে আসছে একটা স্যাঁতসেঁতে সজল হাওয়া। চাতকের দল তাদের তীক্ষ্ণ ডানা ছড়িয়ে প্রায় মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে চলেছে, শূন্যে নকশা কাটছে। অনেক অনেক দূরে ঊর্ধ্ব আকাশের নীল মেঘের কোলে স্থির ডানা মেলে ভাসতে ভাসতে আসন্ন ঝড়ের মুখ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে স্তেপের একটি ছোট্ট ঈগল।

নাতালিয়া উঠোনের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেল। পাথরের দেয়ালটার ওপাশে দুমড়ানো ঘাসের ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে রাইফেলের খালি কার্তুজের সোনালি খোল। বাড়ির জানলার কাচ আর চুনকাম করা দেয়াল বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। একটা মুরগীর বাচ্চা বেঁচে গিয়েছিল, নাতালিয়াকে দেখতে পেয়ে ডাক ছেড়ে উড়ে গোলাঘরের চালে গিয়ে বসল।

যে মধুর নীরবতা গ্রামের ওপর নেমে এসেছিল সেটা কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। বাতাস বইতে শুরু হল। খালি ঘরবাড়ির খোলা দরজা আর খড়খড়িগুলো দড়াম দড়াম শব্দে বন্ধ হতে থাকে। তুষারধবল ঝোড়ো মেঘ দাপটের সঙ্গে সূর্যটাকে ঢেকে দিয়ে ভেসে চলে পশ্চিমে।

বাতাসে এলোমেলো চুল চেপে ধরে নাতালিয়া এগিয়ে যায় বার-বাড়ির হেঁসেলের দিকে, সেখান থেকে আবার তাকায় পাহাড়ের দিকে। দিগন্তের কোলে বেগনী রঙের ধোঁয়াটে ধুলোর আড়ালে কদমচালে এগিয়ে চলেছে দু'চাকার গাড়ি, একেকবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে একজন দু'জন ঘোড়সওয়ার। 'তাহলে ঠিকই চলে যাচ্ছে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাবে নাতালিয়া।

নাতালিয়া বারান্দায় উঠতে না উঠতেই পাহাড়ের ওপারে অনেক দূর থেকে ভেসে এলো কামানের গোলা ছোঁড়ার চাপা গুরুগুরু গর্জন। আর তারই যেন সাড়া দিয়ে দনের ওপর দিয়ে ভেসে এলো ভিওশেনস্কায়ার দুটো গির্জার উল্লসিত ঘন্টাধ্বনি।

দনের ওপারে বনের ভেতর থেকে ঘন দল বেঁধে বেরিয়ে এসেছে কসাকরা। ওরা মাটির ওপর দিয়ে নৌকো টেনে আনছে, কেউ কেউ হাতে করে বয়ে আনছে দনের কাছে, জলে নামাচ্ছে। দাঁড়িরা গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে চটপট দাঁড় বাইছে। ডজন তিনেক নৌকো একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসছে গ্রামের দিকে।

'নাতালিয়া রে! ওরে সোনা আমার! আমাদের ওরা আসছে!' হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বিড়বিড় করতে করতে ছুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইলিনিচ্না।

নাতালিয়া মিশাত্‌কাকে কোলে করে অনেকখানি উঁচুতে তুলে ধরে। ওর চোখদুটো উত্তেজনায় ধকধক করে জ্বলতে থাকে, গলা কেঁপে যায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'লক্ষ্মী দ্যাখ ত রে খোকা, তোর চোখের নজর ত খুব সাফ।... বলা যায় না, হয়ত তোর বাবাও থাকতে পারে কসাকদের সঙ্গে।... দেখতে পাচ্ছিস না? আচ্ছা ওই যে সামনের নৌকোয়... ও-ই না। আঃ তুই যে অন্য দিকে তাকাচ্ছিস!'

পারঘাটায় ওরা শুধু পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দেখা পেল। জীর্ণশীর্ণ চেহারা। বুড়ো প্রথমেই খোঁজ নিল বলদগুলো, বিষয় আশয় আর তোলা ফসল সব ঠিক আছে কিনা। নাতিনাতনীদের জড়িয়ে ধরে কাঁদল। পরে যখন তাড়াতাড়ি পা ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকল তখন ওর মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। অনেকখানি হাত ছড়িয়ে ক্রুশ-প্রণাম করল, পুবের দিকে মুখ করে মাথা নোয়াল, অনেকক্ষণ অবধি রোদে পোড়া গরম মাটি থেকে ওর সাদাচুল মাথাটা আর তুললই না।

পাঁচ

জুন মাসের দশ তারিখে জেনারেল সেক্রেতেভের সেনাপতিত্বে ঘোড়ায় টানা ছয়টি কামান আর আঠারোটা ভারী মেশিনগান নিয়ে দন ফৌজের তিন হাজার ঘোড়সওয়ারের একটি দল প্রচণ্ড আঘাত হেনে উস্ত্-বেলোকালিত্ভেন্স্কায়া জেলা সদরের কাছে ব্যূহ ভাঙল, রেললাইন বরাবর রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল কাজান্স্কায়ার দিকে।

তিন দিনের দিন খুব ভোরে দনের কাছে বিদ্রোহীদের ঘাঁটির একদল পাহারাদারের সঙ্গে নয় নম্বর দন-রেজিমেন্টের অফিসারদের একটা ঘোড়সওয়ার-টহলদার দলের দেখা হয়ে গেল। ঘোড়সওয়ার দল দেখে কসাকরা পাহাড়ী খাতের ভেতরে ছুটে পালাচ্ছিল। টহলদার দলের অধিনায়ক ছিল এক কসাক মেজর। পোশাক দেখেই বিদ্রোহীদের চিনতে পেরে তলোয়ারের ডগায় একটা রুমাল বেঁধে নাড়তে লাগল, চড়া গলায় হেঁকে বলল, 'আমরা তোমাদের লোক! পালিও না, কসাক ভাইরা!'

টহলদার দলটা কোন রকম সাবধানতা না মেনে খাতের নীচে পাহাড়তলার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বিদ্রোহী পাহারাদার দলের সেনাপতি এক পাকা চুল বুড়ো সার্জেন্ট-মেজর। শিশির ভেজা গ্রেটকোটে বোতাম আঁটতে আঁটতে সে-ই বেরিয়ে এলো সবার আগে। আটজন অফিসার ঘোড়া থেকে নামল। মেজর এগিয়ে এলো বিদ্রোহী দলের সার্জেন্ট-মেজরের দিকে। চুড়োয় অফিসারের উজ্জ্বল সাদা তকমা লাগানো মিলিটারী টুপিটা খুলে সম্মান জানাল, মৃদু হেসে বলল, 'কসাক ভাইসব, আমাদের অভিনন্দন! আমাদের সাবেকী কসাক প্রথায় আমরা এ ওকে চুমু খাব, এসো!'

সার্জেন্ট-মেজরের দু'গালে চুমু খেল সে। রুমাল দিয়ে ঠোঁট আর গোঁফ মুছল। সঙ্গীরা তার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অনুভব ক'রে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে থেমে থেমে বলল, 'এখন তাহলে বুদ্ধিসুদ্ধি ফিরল তোমাদের? এবারে তাহলে বুঝতে পারলে যে বলশেভিকদের চেয়ে নিজেদের লোকেরা ভালো?'

'জি হুজুর, যা বলেছেন! পাপের প্রাচিত্তির আর কাকে বলে! . . . তিন মাস ধরে লড়ে চলেছি, শেষ পর্যন্ত যে আপনাদের দেখা পাব এমন আশাও মনে ছিল না!'

'ভালো বলতে হবে যে দেরিতে হলেও তোমাদের সুমতি হয়েছে। যা হবার তা হয়ে গেছে – ও প্রসঙ্গ আর তুলে কাজ নেই। কোন্ জেলার লোক তোমরা?'

'কাজানস্কায়া, হুজুর!'

'তোমাদের ইউনিট দনের ওপারে?'

'জি, হাঁ।'

'লালেরা দন ছেড়ে কোন দিকে সরে গেল?'

'দনের উজানে – মনে হয় দনেৎস্ক বসতিতে।'

'তোমাদের ঘোড়সওয়ার দল এখনও পার হয় নি!'

'জি, না।'

'কেন?'

'বলতে পারছি নে হুজুর। আমাদেরই প্রথম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এপারে।'

'ওদের কি এখানে কোন কামান ছিল?'

'দুটো ব্যাটারী ছিল।'

'কখন সরে গেল?'

'কাল রাতে।'

'পিছু নেওয়া উচিত ছিল। যত সব আনাড়ি!' ভর্ৎসনার সুরে মেজর বলে। ঘোড়ার কাছে গিয়ে ফৌজী ব্যাগ থেকে নোট বই আর ম্যাপ বার করে।

সার্জেণ্ট-মেজর অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দু'পাশে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দু'পা পেছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে কসাকেরা। আনন্দ আর অস্পষ্ট উদ্বেগের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে অফিসারদের, দেখছে তাদের ঘোড়ার জিন আর ভালো জাতের ঘোড়াগুলো – এত ছোটাছুটির পর সেগুলোর শরীরে আর কিছু নেই।

অফিসারদের পরনে উঁচু কলারওয়ালা ছিমছাম আঁটো ব্রিটিশ ফৌজী জামা, কাঁধপটি লাগানো, চওড়া ব্রিচেস। তারা তাদের ঘোড়াগুলোর কাছাকাছি পায়চারি করে পায়ের আড় ভাঙছে, আড়চোখে তাকাচ্ছে কসাকদের দিকে। ওদের একজনের কাঁধেও উনিশ শ' আঠারো সালের শরৎকালের মতো সেই কপিং পেন্সিল দিয়ে এঁকে যেমন তেমন করে বানিয়ে নেওয়া পটি আর নেই। জুতো, জিন, কার্তুজের খলে, দূরবীন, জিনের সঙ্গে বাঁধা কার্বাইন – সবই নতুন, রুশ দেশের বাইরে তৈরি। ওদের মধ্যে যে অফিসারটি চেহারায় একটু বেশি বয়স্ক, প্রৌঢ় গোছের, একমাত্র তারই পরনে ছিল পাতলা নীল বনাত কাপড়ের লম্বা চেরকেসীয় কোর্তা, বুখারার কোঁকড়া সোনালী ভেড়ার লোমের ঘের দেওয়া কুবান-টুপি আর পাহাড়ীদের হিলছাড়া বুটজুতো। সে-ই প্রথম হালকা পা ফেলে এগিয়ে এলো কসাকদের কাছে, ম্যাপ-কেস থেকে বেলজিয়ামের রাজা আলবার্টের ছবি আঁকা একটা বাহারী সিগারেট-প্যাকেট বার করে আপ্যায়ন করল কসাকদের।

'তামাক খাও ভাইসব!'

কসাকরা সাগ্রহে হাত বাড়ায় সিগারেটের দিকে। অন্য অফিসাররাও কাছে এগিয়ে আসে।

'তারপর বলশেভিকদের খপ্পরে কী রকম ছিলে?' বড় মাথাওয়ালা চওড়া কাঁধ এক কর্ণেট জিজ্ঞেস করে।

'খুব একটা আরামে নয়,' মহা উৎসাহে সিগারেট টানতে টানতে মোটা বনাত কাপড়ের পুরনো কোর্তা পরা একজন কসাক সংযত ভাবে উত্তর দেয়, কর্ণেটের পায়ের মোটা গোছার সঙ্গে হাঁটুসমান উঁচুতে ফিতে দিয়ে এঁটে বাঁধা পটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

কসাকের পায়ে কোনমতে টিকে আছে ক্ষয়ে যাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া চটিজুতো। সালোয়ারটা অসংখ্যবার রিপুকরা শতচ্ছিন্ন সাদা উলের মোজার মধ্যে গোঁজা। ও: ব্রিটিশ বুটগুলো, বুটের দড়ি পরানোর ফুটোয় পেতলের চকচকে চাকতি আর মজবুত সোল দেখে সে যে মুগ্ধ হবে তাতে আর বিচিত্র কি! মুগ্ধ চোখে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। শেষকালে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে ভালোমানুষের মতো তারিফ করে বসে, 'আহা কী চমৎকার বুটজোড়া আপনার!'

কিন্তু নিছক গালগল্প করার কোন আগ্রহ কর্ণেট দেখাল না। টিপ্পনী কেটে তেড়ে ফুঁড়ে বলে উঠল, 'বিলিতি সাজের বদলে মস্কোর ছালবাকলের জুতোই যে তোমাদের বেশি মনে ধরেছিল! এখন আর অন্যের জিনিস দেখে হিংসে করলে কী হবে?'

'ভুল হয়ে গেছে। দোষ স্বীকার করছি। . . .' সমর্থনের আশায় অন্য কসাকদের দিকে ফিরে তাকিয়ে অপ্রতিভ হয়ে লোকটি উত্তর দেয়।

কর্ণেট আগের মতোই বিদ্রূপের সুরে ওদের তিরস্কার করে চলল।

'তোমাদের বুদ্ধি সব বলদের মতো। বলদ সব সময় এরকম করে। প্রথমে পা ফেলে, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবে। ভুল হয়ে গেছে! তাহলে শরৎকালে যখন ফ্রন্ট খুলে রেখে সরে পড়লে তখন কী ভেবেছিলে! কমিসার হবার বড় সাধ হয়েছিল! হুঃ তোমরা হলে কিনা আবার স্বদেশের রক্ষাকর্তা! . . .'

কর্ণেটকে বড় বেশি তেতে উঠতে দেখে অল্পবয়সী একজন লেফটেনান্ট চাপা গলায় ফিসফিস করে ওর কানে কানে বলল, 'অনেক হয়েছে! আর নয়!' কর্ণেট সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট পায়ে মাড়িয়ে, থুতু ফেলে হেলেদুলে এগিয়ে গেল ঘোড়াগুলোর দিকে।

মেজর ওর হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে নীচু গলায় কী যেন বলল।

ভারী চেহারার কর্ণেট আশ্চর্য রকম ক্ষিপ্রগতিতে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঝট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিল পশ্চিমের দিকে।

কসাকরা বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকে। মেজর এগিয়ে এসে গমগমে মোটা গলায় সুর নামিয়ে ফুর্তিভরে জিজ্ঞেস করে, 'এখান থেকে ভারভারিন্‌স্কি গাঁ কত ক্রোশ হবে?'

'বারো ক্রোশ,' এক সঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ বলে উঠল।

'বেশ। তাহলে শোনো, কসাক ভাইরা, তোমরা গিয়ে তোমাদের ওপরওয়ালাদের জানিয়ে দাও ঘোড়সওয়ার দলগুলো যেন এক মুহূর্তও দেরি না ক'রে এপারে চলে আসে। আমাদের অফিসার তোমাদের সঙ্গে খেয়াঘাট অবধি যাবে, ঘোড়-সওয়ারদের চালিয়ে নিয়ে যাবে সে। আর যারা পায়দল সেপাই তারা বরং মার্চ ক'রে কাজান্‌স্কায়ার দিকে এগোতে থাকুক। বুঝেছ? আচ্ছা এবারে তাহলে ঘুরে বাঁয়ে চলে যাও! ভগবান মঙ্গল করুন! জোর কদম!'

কসাকরা দঙ্গল বেঁধে পাহাড়ের উৎরাই বয়ে নীচে নামতে থাকে। শ' দুয়েক পা নীরবে হেঁটে চলে – যেন নিজেদের মধ্যে এরকম পরামর্শই করে নিয়েছিল - তারপর মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তা পরা বদখত চেহারার সেই যে কসাকটিকে উৎসাহী কর্পোট আচ্ছা করে ধুয়ে দিয়েছিল, মাথা নাড়িয়ে সখেদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'এই ভাবে তাহলে আমরা মিললাম, কী বল ভাইসব!'

আরেকজন কসাক চটপট যোগ করল, 'এ যে দেখছি, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ! ...' বলেই জোর মুখখিস্তি করল।

ছয়

লাল ফৌজের ইউনিটগুলোর তাড়াহুড়ো করে পিছু হটার খবর ভিওশেন্‌স্কায়াতে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে দুটো ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট নিয়ে গ্রিগোরি মেলেখভ সাঁতরে দন পার হয়ে গেল, জবরদস্ত গোছের টহলদার সেপাইদল পাঠিয়ে নিজেরা এগিয়ে গেল দক্ষিণের দিকে।

দন পারের টিলার ওধারে লড়াই চলেছে। কামানের চাপা গর্জন ভেসে আসছে – যেন মাটির তলা থেকে উঠে আসছে গুমগুম শব্দ।

কম্যাণ্ডারদের একজন ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এসে তারিফের সুরে বলল, 'ক্যাডেটরা ত দেখছি দু'হাতে গোলা খরচ করছে! জোর আগুন ঝেড়ে দিচ্ছে ওদের ওপর!'

গ্রিগোরি চুপ করে থাকে। আশেপাশে মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে সারির আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে ও। দন থেকে বাজকি গ্রাম পর্যন্ত এক ক্রোশ

জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্রোহীদের ফেলে যাওয়া হাজার হাজার হালকা ফিটনগাড়ি আর ভারী মালটানা গাড়ি। জঙ্গলের সর্বত্র ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ফেলে যাওয়া নানা সামগ্রী – ভাঙা সিন্দুক, চেয়্যার, জামাকাপড়, ঘোড়ার সাজ, বাসনকোসন, সেলাইকল, শস্যের বস্তা - এই রকম যাবতীয় জিনিসপত্র। সম্পত্তি আঁকড়ে ধরে রাখার দারুণ লোভে এগুলো বাড়ি থেকে তুলে টেনে আনা হয়েছিল দনের দিকে পিছু হটার সময়। জায়গায় জায়গায় রাস্তায় হাঁটু-সমান গাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে সোনালি গমের দানা। সেখানেই আবার গড়াগড়ি যাচ্ছে পচে গলে বীভৎস, ফুলে ঢোল হয়ে ওঠা মরা বলদ আর ঘোড়া। উৎকট গন্ধ ছাড়ছে সেখান থেকে।

দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গ্রিগোরি বলে উঠল, 'আহা, ঘরসংসারের কী হাল দেখ!' একটা শস্যের গাদা পচে উঠেছে। তার ওপর এক বুড়ো কসাক হুমড়ি খেয়ে হাত পা ছড়িয়ে মরে পড়ে আছে। মাথায় কসাক টুপি, গায়ের বনাত কাপড়ের কোর্তাটা রক্তমাখা। মাথার টুপি খুলে দম যতদূর পারা যায় চেপে রেখে গাদাটা সাবধানে ঘুরে যায় গ্রিগোরি।

কসাকদের মধ্যে একজন দুঃখ করে বলল, 'খুব সম্পত্তি পাহারা দিয়েছে বুড়ো দাদু! কোন্ শয়তানে লোভ দেখিয়েছিল এখানে সম্পত্তি আগলে পড়ে থাকতে!'

'নিজের ক্ষেতের তোলা ফসল ছেড়ে যেতে দুঃখু হচ্ছিল নিশ্চয়! . . .'

'চল চল, তাড়াতাড়ি এগোও! উঃ, কী বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়াচ্ছে রে বাবা! এই, এগিয়ে চল!' পেছনের সারি থেকে ক্রুদ্ধ চিৎকার ওঠে।

স্কোয়াড্রন এবারে কদমচাল ধরে। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। বনের ভেতরে শুধু শোনা যায় অসংখ্য খুরের খটখট আওয়াজ আর তারই তালে তাল মিলিয়ে কসাকদের শক্ত ক'রে বাঁধা হাতিয়ারের ঝনঝনা।

. . .লড়াইটা চলছিল লিস্তনিৎস্কিদের জমিদারীর কাছাকাছি। শুকনো উপত্যকার ভেতর দিয়ে লাল ফৌজীরা ঘন দল বেঁধে ছুটছে ইয়াগোদনয়ের দিকে। ওদের মাথার ওপর ফেটে পড়ছে বিস্ফোরক-গোলা, পেছনে ঘা মারছে মেশিনগানের গুলি। ওদের পালানোর পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য টিলার ওপর থেকে হুহু স্রোতে নেমে আসছে একটা কাল্‌মিক রেজিমেন্ট।

গ্রিগোরি যখন তার রেজিমেন্ট নিয়ে এগিয়ে এলো ততক্ষণে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। ভিওশেন্‌স্কায়ার গিরিপথ দিয়ে চৌদ্দ নম্বর ডিভিশনের কতকগুলো মালগাড়ি আর কিছু বিধ্বস্ত পাঁচমিশালী ইউনিট পিছু হটছিল। তাদের আড়াল দিতে গিয়ে রেড আর্মির দুটো কম্পানি তিন নম্বর কাল্‌মিক রেজিমেন্টের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। টিলার ওপরে উঠেই গ্রিগোরি ফৌজের ভার ইয়েরমাকোভের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'আমাদের ছাড়াই ওরা

চালিয়ে নিয়েছে। ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দাও। আমি এই চট করে মহাল থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'কী দরকার?' ইয়েরমাকোভ অবাক হয়ে যায়।

'কী করে বলি তোমায়! ছোকরা বয়সে এখানে কাজ করেছি, পুরনো জায়গাগুলো দেখার তাই ভারী সাধ হল।'

প্রোখরকে ডেকে নিয়ে গ্রিগোরি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল ইয়াগোদ্‌নয়ের দিকে। সিকি ক্রোশটাক চলার পর দেখতে পেল সামনের স্কোয়াড্রনটার মাথার ওপর উঠেছে সাদা চাদরের একটা পতাকা। হাওয়ায় সেটা পতপত করে উড়ছে। কোন বিচক্ষণ কসাক বোধ হয় বুদ্ধি করে ওটা সঙ্গে এনেছিল।

'মনে হচ্ছে যেন ধরা দিতে যাচ্ছে!' গ্রিগোরি চিন্তিত হয়ে পড়ে। ভেতরে ভেতরে একটা অস্পষ্ট বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তার মনটা যখন দেখতে পায় ধীরে ধীরে অনেকটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই সারিটা উপত্যকার মধ্যে নেমে যাচ্ছে আর তাদের মুখোমুখি সোজা সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে কদমচালে এগিয়ে আসছে সেক্রেতেভ বাহিনীর কেবল ঘোড়সওয়ার।

হুমড়ি খেয়ে পড়া ফটকের ভেতর দিয়ে গ্রিগোরি যখন বাড়ির উঠোনে ঢুকল তখন যেন একটা অবহেলা আর বিষাদের নিঃশ্বাস ওকে ছুঁয়ে গেল। আগাছায় ছেয়ে আছে গোটা উঠোনটা। ইয়াগোদ্‌নয়েকে এখন আর চেনাই যায় না। সব জায়গায় নজরে পড়ে অবহেলা আর ধ্বংসের চিহ্ন। এক কালের সেই সুন্দর জমকাল বাড়িটার আর সেই জৌলুস নেই, মনে হয় যেন খানিকটা মাটিতে বসে গেছে। চালে বহুকাল রঙ না পড়ায় জায়গায় জায়গায় হলদে মরচের দাগ ধরেছে, ড্রেনের পাইপগুলো ভেঙে পড়ে আছে দেউড়ির কাছে। কব্‌জা থেকে খুলে গিয়ে কাত হয়ে ঝুলছে খড়খড়িগুলো, ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে শিস দিয়ে ঢুকছে হু হু হাওয়া। ভেতর থেকে ভেসে আসছে পোড়ো বাড়ির ছাতলা পড়া ভ্যাপসা গন্ধ।

বাড়ির পুব দিকের একটা কোনা আর দাওয়াটা তিন-ইঞ্চি কামানের গোলায় ধসে পড়েছিল। গোলোর ঘায়ে একটা ম্যাপ্‌ল গাছের মাথা ধসে বাড়ির গলি-বারান্দার ভেনিসীয় জানলার কাচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। এখনও সেই ভাবেই গাছটা পড়ে আছে ভিত ঠেলে ওঠা ইটের পাঁজার ভেতরে গুঁড়িটা গুঁজে দিয়ে। গাছটার মরা ডালপালা বয়ে ইতিমধ্যেই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে শুরু করেছে বুনো স্বর্ণলতা। ভয়ঙ্কর ঝাঁকড়া হয়ে বেড়ে উঠেছে লতাগুলো, জানলার যে শার্সিগুলো এখনও আস্ত আছে তাই জড়িয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে কার্নিশের দিকে।

সময় আর দুর্যোগ রেখে গেছে তাদের চিহ্ন। বার-বাড়ির দালানকোঠাগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। দেখে মনে হয় ওগুলোয় মানুষের হাত পড়ে নি বহুকাল।

বসন্তের বন্যা আর বৃষ্টির জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধসে পড়েছে আস্তাবলের একটা দেওয়াল। গাড়ি-ঘরের চালখানা ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল। মড়ার মতো সাদা কড়িবরগাগুলোর কঙ্কালের গায়ে এখানে ওখানে লেগে আছে শুধু কয়েক গোছা আধপচা খড়।

চাকরদের মহলের দেউড়িতে শুয়ে ছিল তিনটে বর্জোই কুকুর। বুনো হয়ে গিয়েছিল সেগুলো। মানুষ দেখে এক লাফে উঠে চাপা গরগর আওয়াজ করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল বারান্দার ভেতরে। সদর দালানের জানলা হাট খোলা। গ্রিগোরি সে দিকে এগিয়ে গেল। জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে গ্রিগোরি জোরে ডাকল, 'কেউ আছ কি? কোন জ্যান্ত মানুষ আছে কি এখানে?'

সদর দালানে অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই। শেষে মেয়েলি গলার একটা কাঁপা কাঁপা আওয়াজ পাওয়া গেল।

'একটু দাঁড়াও, খ্রীষ্টের দোহাই! এখনই আসছি।'

বুড়ি হয়ে গেছে লুকেরিয়া। খালি পা ঘসটাতে ঘসটাতে বেরিয়ে আসে দেউড়ির ধাপের কাছে, রোদের জন্য চোখ কুঁচকে মন দিয়ে দেখতে থাকে গ্রিগোরিকে।

'চিনতে পারলে না লুকেরিয়া মাসী?' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে।

একমাত্র তখনই লুকেরিয়ার বসন্তের দাগওয়ালা মুখের ওপর কেমন একটা কাঁপুনি খেলে গেল, ভাবলেশহীন উদাসীনতার বদলে সেখানে ফুটে উঠল ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন। বুড়ি কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ ধরে একটিও কথা বার করতে পারল না মুখ দিয়ে।

গ্রিগোরি ঘোড়াটাকে বেঁধে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে।

'ওঃ কী দুর্ভোগই না গেছে। ভগবান না করুন কারও ভাগ্যে যেন অমন না হয়। . . .' নোংরা চটকাপড় দিয়ে গাল মুছতে মুছতে লুকেরিয়া বিলাপ করতে থাকে। 'ভাবলাম আবার বুঝি ওরা ফিরে এলো। . . . ওঃ গ্রিশ্‌কা রে, কী কাণ্ডই যে হয়ে গেল এখানে! . . . মুখে বলা যায় না! . . . একমাত্র আমিই রয়ে গেছি। . . .'

'কেন, সাশ্‌কা দাদু কোথায়? মনিবদের সঙ্গে চলে গেল নাকি?'

'চলে গেলে ত বেঁচেই যেত। . . .'

'অ্যাঁ, মারা গেছে নাকি?'

'খুন করেছে ওকে। . . . আজ তিন দিন হল মরে পড়ে আছে তলকুঠুরিতে। কবর দেওয়া দরকার। এদিকে আমি নিজে পড়লাম অসুখে। জোর করে উঠে এসেছি। . . . তাছাড়া ওই মরা মানুষটার কাছে যাবার কথা ভেবে ভয়ে আমার হাত পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে। . . .'

'কেন মারল ওকে?' মাটি থেকে চোখ না তুলে ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল গ্রিগোরি।

'হল' ওই ঘুড়ীটার জন্যে। . . . আমাদের মনিবরা ত-চলে গেলেন তাড়াহুড়ো করে। শুধু টাকাপয়সাই সঙ্গে নিল, আর সম্পত্তি প্রায় সবই ফেলে গেল আমার ওপরে।' লুকেরিয়া এরপর ফিসফিস করে বলতে থাকে, 'রেখেছি সব যত্ন করে - একেবার সুতোগাছোটি অবধি। মাটির নীচে পোঁতা রয়েছে এখনও। ঘোড়াগুলোর মধ্যে ওঁরা নিয়েছিলেন শুধু তিনটে অর্লোভ জাতের মদ্দা ঘোড়া, বাকিগুলো রেখে যান সাশ্‌কা বুড়োর জিম্মায়। বিদ্রোহ যখন শুরু হল তখন কসাক আর লাল ফৌজ দু'দলই যে যেমন পারে নিয়ে চলে যায়। কালো কুচকুচে সেই যে মদ্দা ঘোড়াটা, 'ঘূর্ণি' যার নাম, তোমার মনে আছে হয়ত - বসন্তের গোড়ার দিকে লালেরা সেটাকে নিয়ে গেল। জোর করে জিন চাপাল ওর পিঠে। অথচ জন্মে কখনও সওয়ারের ঘোড়া ছিল না ঘূর্ণি। অবশ্য ওর পিঠে চড়ে আনন্দ করা ওদের কপালে ছিল না। এক হপ্তা বাদে কার্গিনস্কায়ার কয়েকজন কসাক এখানে এসেছিল, তাদের মুখেই শুনলাম। টিলার ওপরে লালদের সঙ্গে ওদের লড়াই বেধে যায়, এ ওকে সামনাসামনি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। কসাকদের সঙ্গে একটা হাবা গোছের ঘুড়ী ছিল, ঠিক তক্‌খুনি সেটা ডেকে উঠল। আর যায় কোথায়? - লাল সেপাইটাকে পিঠে নিয়েই ঘূর্ণি ছুটল কস্যকদের দিকে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল মাদী ঘোড়াটার দিকে, ওর পিঠে যে সওয়ার হয়ে বসে ছিল সে লোকটা আর ওকে সামলাতে পারল না। যখন দেখলে যে ঘোড়া বাগে আনতে পারছে না তখন ছুটন্ত অবস্থায়ই লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। লাফ ত দিল, কিন্তু পা আর টেনে বার করতে পারল না রেকাব থেকে। ঘূর্ণি ওকে সোজা তুলে দিল কসাকদের হাতে।'

'সাবাশ!' তারিফ করে প্রোখর বলল।

'এখন কার্গিনস্কায়ার একজন ছোট কর্তে ওই ঘোড়ায় চেপে ঘোরে,' লুকেরিয়া তার গল্পের তাল বজায় রেখে বলে। 'কথা দিয়েছে মনিব ফিরে এলেই ঘূর্ণিকে আস্তাবলে ফিরিয়ে দেবে। তা যা বলছিলাম, সমস্ত ঘোড়াই নিয়ে গেল ওরা। রয়ে গেল শুধু দুলকি চালের ঘুড়ী 'তীর'। ওটার পেটে বাচ্চা ছিল, তাই কেউ গায়ে হাত দেয় নি। কিছু দিন আগে বাচ্চা বিয়োল। সাশ্‌কা বুড়োর কী মায়াই না পড়ে গেল বাচ্চাটার ওপর - এমন মায়া পড়ে গেল যে বলবার নয়! কোলে করে বয়ে বেড়াত, শিঙে করে দুধ খাওয়াত, আর পায়ে যাতে জোর হয় তার জন্যে কী সব যেন গাছগাছড়ার আরক খাওয়াত। তার পরই হল বিপদ। . . . তিন দিন আগের কথা। . . . সন্ধ্যার আগে আগে তিনজন ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হল ঘোড়া ছুটিয়ে। বুড়ো তখন বাগানে ঘাস কাটছিল। লোকগুলো

চেঁচামেচি করে 'এই ব্যাটা অমুক-তমুক, এদিকে আয় দেখি' বলে ডাকল। বুড়ো কাস্তে রেখে দিয়ে ওদের কাছে এসে নমস্কার করল। ওরা ওর দিকে ফিরেও তাকায় না, দুধ খেতে খেতে ওকে জিজ্ঞেস করে, 'ঘোড়া আছে?' ও বলে, 'একটা আছে বটে, কিন্তু সিটি তোমাদের মেলিটারী কাজের যুগ্যি হবে নি। একে ঘুড়ী, তায় আবার সবে বাচ্চা বিইয়েছে, দুধের বাচ্চা আছে ওর।' ওদের মধ্যে যেডা সবচাইতে জংলী ধরনের সে যা চোটপাট করে উঠল! 'ও নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে নি! ঘুড়ীটাকে নিয়ে আয় বুড়ো শয়তান! আমার ঘোড়াটার পিঠে ঘা হয়েছে, ওটাকে পালটাতেই হবে আমার।' বুড়োর উচিত ছিল ওটাকে ধরে রাখার চেষ্টা না করে ওদের কথা মেনে নেওয়া। কিন্তু তুমি ত জানোই বুড়ো কী ধাঁচের মানুষ ছিল।... মনিব যে মনিব তাকেও ছেড়ে কথা কইত না। মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার?'

'তাহলে কি দিল না?' গল্পের মাঝখানে প্রোখর জিজ্ঞেস করল।

'না দিয়ে কি আর উপায় আছে? ও শুধু এই কথাই বলেছিল ওদের, 'তোমাদের আগে কত ঘোড়সওয়ার এসেছিল, সবগুলো ঘোড়াই নিয়ে গেছে। কিন্তু তারা সবাই এটার ওপর মায়া দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আর তোমরা কিনা...' একথায় ওরা ফোঁস করে উঠল – 'ওরে মনিবের পা চাটা কুকুর, তোর মনিবের জন্যে যত্ন করে রেখেছিস ওটাকে?' ওরা ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল।... একজন ঘুড়ীটাকে বার করে এনে পিঠে জিন চাপাতে শুরু করল। এদিকে বাচ্চাটা তখন ওর মায়ের পেটের নীচে দাঁড়িয়ে ওলানে মুখ দিচ্ছে। বুড়ো কাকুতি মিনতি শুরু করে দিল: 'দয়া কর, ওটাকে নিও নি! বাচ্চাটা কোথায় যাবে?' 'ওই হোথা!' - বলে আরেকজন মা'র কাছ থেকে ওটাকে ছাড়িয়ে নিল, তারপর কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে গুলি করল। আমি ত কেঁদে ভাসিয়ে দিলাম।... ছুটে গিয়ে কত ক'রে বললাম ওদের, বুড়োকে ধরে আপদ থেকে দূরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বাচ্চাটার দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ছোট্ট দাড়িটা কেঁপে উঠল, কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়ে বলল, 'তাই যদি হয় তাহলে আমাকেও গুলি কর তোরা, শুয়োরের বাচ্চারা।' ছুটে গিয়ে ওদের চেপে ধরে, কিছুতেই ঘুড়ীর পিঠে জিন চাপাতে দেবে না। ওরাও খেপে গেল, মাথা গরম করে ওখানেই ওকে শেষ করে দিল। ওকে যখন গুলি করল তখনই আমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেল।... এখন ভাবতেই পারি নে ওকে নিয়ে আমি কী করব। একটা কফিন বানাতে হয় ওর জন্যে। কিন্তু সে কি মেয়েমানুষের কম্ম?'

'দুটো কোদাল দাও, আর মোটা চটকাপড় নিয়ে এসো কিছু,' গ্রিগোরি বলল।

'ওকে কবর দেবে ভাবছ নাকি?' প্রোখর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'অত সব ঝুটঝামেলা সাধ করে নিজের ঘাড়ে নেবার কী মানে হয় গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! তার চেয়ে বল, আমি এক্ষুনি কয়েকজন কসাককে ডেকে নিয়ে আসছি। ওরাই কফিন বানিয়ে দেবে, বেশ ভালো করে কবরও খুঁড়ে দেবে। . . .'

কোথাকার কোন্ এক বুড়ো – তার কবর নিয়ে ঝামেলা পোয়াবার ইচ্ছে প্রোখরের ছিল না এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু গ্রিগোরি ওর প্রস্তাব এক কথায় নাকচ ক'রে দিল।

'আমরা নিজেরাই মাটি খুঁড়ে ওকে কবর দেব। বড় ভালো লোক ছিল বুড়ো। তুমি বাগানে চলে যাও, পুকুরের ধারে গিয়ে অপেক্ষা কর। আমি যাই, মরা মানুষটাকে একবার দেখে আসি।'

পানায় ঢাকা সেই পুকুরের ধারে ডালপালা ছড়ানো যে বুড়ো পপ্‌লার গাছটার নীচে বুড়ো সাশ্‌কা একদিন গ্রিগোরি আর আক্সিনিয়ার কচি মেয়েটিকে কবর দিয়েছিল সেখানেই সে তার নিজেরও শেষ বিশ্রামের স্থান পেল। লতার গন্ধে ভরা একটা পরিষ্কার মোটা কাপড়ে জড়িয়ে ওরা ওর শুকনো দেহটাকে কবরের মধ্যে শুইয়ে দেয়, মাটি চাপা দিল। ছোট্ট কবরের ঢিবিটার পাশে ওঠে আরও একটা ঢিবি – সেটা বুটজুতো দিয়ে সযত্নে মাড়ানো, তাজা ভিজে দোআঁশ মাটি সেখানে উল্লাসের দীপ্তিতে ঝলমল করছে।

স্মৃতিভারাক্রান্ত গ্রিগোরি তার একান্ত আপনার সেই ছোট্ট কবরখানাটার কাছেই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মাথার ওপর সুগম্ভীর সুবিস্তীর্ণ নীল আকাশের দিকে। সেখানে অনন্ত শূন্যের বুকে কোথায় যেন খেলে বেড়াচ্ছে বাতাস, ভেসে চলেছে রোদঝলমলে হিমেল মেঘ। কিন্তু ধরণী ঘোড়াপাগল ফুর্তিবাজ মাতাল সাশ্‌কা বুড়োকে সবেমাত্র তার বুকে ঠাঁই দেওয়ার পর এখনও সেই আগের মতোই টগবগ করছে প্রাণের উচ্ছ্বাসে। বাগানের একেবারে কিনারা অবধি সবুজের ঢল নামিয়ে দিয়েছে স্তেপপ্রান্তর, পুরনো মাড়াই উঠোনে ফসলের আঁটি শুকানোর মাচার কাছটা বুনো শণের জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। তারই ফাঁকে অবিরাম শোনা যাচ্ছে তিতির পাখিদের দাপাদাপির জোর খসখস শব্দ। মেঠো ইঁদুর শিস দিচ্ছে। গুনগুন করছে ভ্রমর। বাতাসের স্নেহস্পর্শে সরসর করছে ঘাস। গোধূলির ধিকিধিকি আলোর মধ্যে গান গাইছে চাতক পাখি। ওদিকে প্রকৃতির বুকে মানুষের গরিমা সরবে ঘোষণা ক'রে দূরে বহু দূরে শুকনো উপত্যকার ভেতরে কোথায় যেন ক্ষিপ্ত হয়ে এক নাগাড়ে চাপা গর্জন তুলে চলেছে মেশিনগান।

সাত

জেনারেল সেক্রেতেভ তাঁর সেনাপতিমণ্ডলী এবং এক স্কোয়াড্রন কসাকদের ব্যক্তিগত রক্ষিদল নিয়ে ভিওশেনস্কায়াতে এলে লোকে তাকে সম্মানীয় অতিথির মর্যাদা দিয়ে, গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সেখানকার দুটো গির্জাতেই সারা দিন ধরে প্রবল উল্লাস তুলে ঘণ্টা বেজে চলল। যেন ঈস্টারের উৎসব লেগে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় দন দেশী ঘোড়ার পিঠে চলেছে ভাটি এলাকার কসাকরা। দীর্ঘ পথযাত্রায় শ্রান্ত ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। ঘোড়সওয়ারদের নীল কাঁধপটি বেয়াড়া ধরনে জ্বলজ্বল করছে। সওদাগর-বাড়িতে থাকার জায়গা হয়েছে জেনারেল সেক্রেতেভের। বাড়ির কাছের চত্বরটাতে ভিড় করে আছে আর্দালির দল। সূর্যমুখী বীচির খোসা দাঁতে কাটতে কাটতে তারা গাঁয়ের যে-সমস্ত মেয়েকে ভালো সাজগোজ পরে পাশ দিয়ে যেতে দেখছে তাদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে।

দুপুরবেলায় তিনজন কাল্‌মিক ঘোড়সওয়ার জনা পনেরো বন্দী লাল ফৌজীকে তাড়া করিয়ে নিয়ে এলো জেনারেলের আস্তানার কাছে। তাদের পেছন পেছন আসছিল জোড়া ঘোড়ায় টানা এক মালগাড়ি – সানাই ব্যাগপাইপ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বোঝাই। লাল ফৌজীদের পোশাকগুলো ঠিক অভ্যস্ত ধরনের নয়। ছাইরঙা বনাতের প্যান্ট, ওই একই কাপড়ের কোর্তা, হাতার কিনারায় লাল ডুরি। কাল্‌মিকদের মধ্যে একজন, এক বেশি বয়স্ক লোক, গেটের কাছে আর্দালিরা যেখানে অলস ভাবে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল, ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এলো। মাটির পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে পকেটে গুঁজল, তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

'আমাদের লোকেরা লাল ফৌজী ভেরী বাজিয়েদের ধরে নিয়ে এসেছে। বুঝতে পারছ?'

'এর মধ্যে আবার বোঝাবুঝির কী আছে?' ওদের মধ্যে যে লোকটার মুখ মেদবহুল, কাল্‌মিকের ধুলোমাখা বুটের ওপর থু থু করে সূর্যমুখী বীচির খোসা ছড়িয়ে অলস ভাবে সে বলল।

'তা-ই যদি হয় তাহলে এই নাও ওদের জিম্মা করে। খেয়ে খেয়ে মুখে চর্বি জমেছে, তাইতে, যত আলটু ফালটু বুকনি!'

'কী-ই! 'আলটু-ফালটু' বার করছি, গাড়ল কোথাকার!' আর্দালি রেগে গেল। তাহলেও বন্দীদের আনার খবর জানাতে গেল।

ফটকের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো কিম্ভূতকিমাকার চেহারার এক মেজর। তার গায়ে তুলো ঠাসা খয়েরি রঙের খাটো কোর্তা, কোমরের কাছে শক্ত করে

বেল্ট আঁটা। মোটা মোটা পাদুটো ফাঁক করে ছবির ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল সে, বন্দী লাল ফৌজিদের ভিড়টার দিকে তাকিয়ে হেঁড়ে গলায় বলল, 'ওরে তাবোভের জঞ্জাল, বাজনা বাজিয়ে কমিসারদের আমোদ দেওয়া হচ্ছিল! ছাইরঙা উর্দি কোত্থেকে এলো? জার্মানদের গা থেকে খুলে নেওয়া নাকি?'

'না হুজুর,' সকলের আগে যে লাল ফৌজীটি দাঁড়িয়ে ছিল ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে করতে সে জবাব দিল। তারপর তড়বড় করে বোঝাল, 'সেই কেরেনস্কির আমলেই জুন আক্রমণে* নামার আগে আমাদের বাজনাদার দলের জন্যে এই পোশাক সেলাই করা হয়েছিল।... তারি পর থেকে পরে আসছি।...'

'পরে আসছ! পরবে! পরা বার করে দিচ্ছি!' বলতে বলতে মেজর তার মাথার গোল চ্যাপ্টা টুপিটা পেছনে সরিয়ে দিল, তাইতে তার কামানো মাথায় দগদগে লাল সদ্য কাটা দাগ বেরিয়ে পড়ল। তারপর ক্ষয়ে যাওয়া উঁচু গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঝট্ করে কালমিকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ওরে হারামজাদা বর্বর। এগুলোকে এখানে নিয়ে এলি কী করতে? কী হবে ছাই এদের দিয়ে? পথে সাফ করে দিতে পারলি নে?'

কালমিক অলক্ষিতে পুরো ভাবভঙ্গি পালটে ফেলে। চটপট ধাঁকা পাদুটো এক সঙ্গে করে টানটান হয়ে দাঁড়ায়। মিলিটারী টুপির কানাতের কাছে হাত ঠেকিয়ে রেখেই উত্তর দেয়, 'স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার হুকুম দিলেন, ওখানে নিয়ে যা।'

'ওখানে নিয়ে যা!' ফুলবাবু ধরনের মেজরটি তাচ্ছিল্যভরে পাতলা ঠোঁট বেঁকিয়ে ভেঙচি কেটে বলল। ফোলা পায়ে থপথপ করতে করতে ভারী পাছা দুলিয়ে লাল ফৌজীদের পাশ দিয়ে একবার ঘুরে এলো, অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মন দিয়ে এমন ভাবে দেখল তাদের যেন ঘোড়ার খদ্দের ঘোড়া বাছছে।

আর্দালিরা মুখ টিপে হাসতে থাকে। কালমিক পাহারাদারের মুখে তাদের সেই চিরকালের আবেগশূন্য ভাব।

'ফটক খুলে দাও! উঠোনের ভেতরে নিয়ে যাও ওদের!' মেজর হুকুম দেয়।

লাল ফৌজীরা আর এলোমেলো ভাবে বাদ্যযন্ত্র চাপানো গাড়িগুলো দাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'ব্যাণ্ডমাস্টার কে?' একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে মেজর জিজ্ঞেস করল।

'নেই,' সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠ সমস্বরে বলে উঠল।

'কোথায় গেল? পালিয়েছে নাকি?'

---

* প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, ১৯১৭ সালের ১৮-৩০ জুন (পুরনো দিনপঞ্জী অনুযায়ী) দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে রুশ সেনাবাহিনীর আক্রমণ। - অনুঃ

'মারা গেছে।'

'আপদ বিদেয় হয়েছে। তাকে ছাড়াই চলবে তোমাদের। আচ্ছা, এবারে যার যার বাজনার যন্ত্র উঠিয়ে নাও দেখি!'

লাল ফৌজীরা এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। গির্জার ঘণ্টার একরোখা আওয়াজের সঙ্গে উঠোনে এসে মিশল কাঁসাপেতলের ভেরীর বেসুরো সলজ্জ গলা।

'রেডি! এবারে বাজাও 'প্রভু তুমি সম্রাটেরে রাখিও কুশলে'।'

বাজিয়েরা নীরবে মুখ চাওয়া চাউয়ি করে। কেউই শুরু করে না। মিনিট খানেক চলল অসহনীয় নীরবতা। শেষকালে ওদের একজন, যে-লোকটার পায়ে কোন জুতো না থাকা সত্ত্বেও নিখুঁত ভাবে কাপড়ের পটি জড়ান, মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুরনো আমলের স্তোত্র আমরা কেউ জানি নে।...'

'কেউ জান না? ভালো ব্যাপার ত!... এই কে আছ।... আধা প্লেটুন রাইফেলধারী আর্দালি চাই এখানে!'

মেজর জুতোর ডগা দিয়ে অশ্রুত সুরের সঙ্গে তাল ঠোকে। বাড়ির গলি-বারান্দায় কার্বাইনের ঝনঝন আওয়াজ তুলে সার বেঁধে দাঁড়াতে থাকে আর্দালিরা। বেড়ার বাইরে বাবলাগাছের ঘন জঙ্গলের মধ্যে চড়াই-পাখিরা কিচিরমিচির করছে। চালায় তেতে ওঠা টিনের ছাদ আর লোকের গায়ের ঘামের উগ্র গন্ধে ঝাঁ ঝাঁ করছে আঙিনাটা। মেজর রোদের তাপ থেকে ছায়ায় সরে দাঁড়ায়। এমন সময় খালি পা বাজিয়েটি ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল, অনুচ্চস্বরে বলল, 'হুজুর আমরা এখানে সবাই অল্পবয়সী বাজনাদার। পুরনো গানের সুর বাজানোর সুযোগ হয় নি।... বেশির ভাগই বাজিয়েছি বিপ্লবী মার্চের বাজনা।... হুজুর...'

মেজর অন্যমনস্ক ভাবে রুপোর কাজ করা বেল্‌টের ডগাটা নাড়াচাড়া করতে থাকে।

আর্দালিরা দেউড়ির কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারা হুকুমের অপেক্ষায় আছে। ধাক্কাধাক্কি করে লাল ফৌজীদের সরিয়ে দিয়ে পিছনের সারি থেকে চটপট সামনে এগিয়ে এলো একজন মাঝবয়সী বাজনাদার। লোকটার চোখে ছানি পড়েছে। গলা খাঁকারি দিয়ে সে বলল, 'যদি অনুমতি করেন ত আমি বাজাতে পারি।' অনুমতির অপেক্ষা না করেই রোদের তাপে গনগনে বাঁশীটা কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে ঠেকায়।

নিঃসঙ্গ বাঁশীর উদাস নাকী আওয়াজ ঝড়ের বেগে সওদাগর-বাড়ির প্রশস্ত আঙিনার মাথাও উঠে যেতে মেজর রাগে চোখমুখ কোঁচকায়। হাত নেড়ে চিৎকার করে বলে, 'থামাও দেখি ফ্যাচফেচি! ভিখিরির ইয়ে হৌড়া হচ্ছে! বাজনার কী ছিরি!'

জানলায় স্টাফ অফিসার আর এড্‌জুটেন্টদের হাসি হাসি মুখ দেখা যায়।

'আপনি ওদের কবরে যাবার কুচকাওয়াজের বাজনা বাজাতে বলুন!' জানলা

থেকে কোমর পর্যন্ত শরীর ঝুলিয়ে দিয়ে বাচ্চাদের মতো রিনরিনে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলল এক ছোকরা লেফ্‌টেনান্ট।

গির্জার তুমুল ঘন্টাধ্বনি মিনিটখানেকের জন্য থামতে মেজর ভুরু নাচিয়ে তোষামোদের ছলে ওদের জিজ্ঞেস করল, ''ইন্টারন্যাশনাল' বাজাতে পার আশা করি? বাজাও তাহলে! ভয়ের কোন কারণ নেই। বলছি যখন, বাজাও।'

প্রচণ্ড গরমের দুপুরে যে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল তা ভঙ্গ করে যেন লড়াইয়ের ডাক দিয়ে হঠাৎ স্বমহিমায় গমগম করে তুরী-ভেরীতে বেজে ওঠে ইন্টারন্যাশনালের ক্রুদ্ধ সুরেলা আওয়াজ।

বেড়ার বাধার সামনে দাঁড়িয়ে পড়া ষাঁড়ের মতো মাথা নীচু ক'রে দুই পা ছড়িয়ে থাকে মেজর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে। ওর পেশল ঘাড়টা আর কোঁচকানো চোখের নীলচে সাদা অংশটা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে।

'থামাও!' আর সহ্য করতে না পেরে ক্ষেপে গর্জন করে বলল সে।

ব্যাণ্ডের বাজনা সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। শুধু ফ্রেঞ্চ হর্ণটা একটু দেরি করে ফেলে - অনেকক্ষণ ধরে তপ্ত বাতাসে ভেসে থাকে তার আবেগপূর্ণ অসমাপ্ত ডাক।

বাজনাদাররা শুকনো ঠোঁট চাটল, জামার হাতায় আর নোংরা হাত দিয়ে ঠোঁট মুছল। ওদের মুখ ক্লান্ত আর উদাসীন। শুধু একজন কিছুতেই চোখের জল লুকিয়ে রাখতে পারল না - তার ধূলিধূসরিত গাল বয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল। রেখে গেল ভিজে চিহ্ন।

এই সময় জেনারেল সেক্রেতেভ সেই রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় থেকে জানাশোনা, তার পল্টনের সঙ্গী এক অফিসারের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ভোজনপর্ব সারছিল। পানোন্মত্ত এড্‌জুটেণ্টের সহায়তায় সে সামনের চত্বরে বেরিয়ে এলো। গরমে আর ঘরে চোলাই মদের নেশায় বেসামাল হয়ে পড়ল জেনারেল। চত্বরের কোনায় হাইস্কুলের ইটের দালানের উলটো দিকে আসার পর জোরবল হারিয়ে একটা হোঁচট খেল, হুমড়ি খেয়ে মুখ গুঁজে পড়ে গেল সেখানকার গরম বালিতে। এড্‌জুটেণ্ট ভেবাচেকা খেয়ে যায়। বৃথাই তোলার চেষ্টা করে তাকে। তখন খানিক দূরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্য থেকে তাড়াতাড়ি লোকজন এগিয়ে আসে ওকে সাহায্য করার জন্য। দু'জন বুড়ো মতন কসাক পরম শ্রদ্ধাভরে জেনারেলকে হাত ধরে তুলে ধরল। সকলের সামনেই বমির উদ্রেক হল তার। কিন্তু তখনও দমকে দমকে বমি করার ফাঁকে ফাঁকে যুদ্ধংদেহি ভঙ্গিতে ঘুষি নাড়িয়ে চেঁচিয়ে কী যেন সব বলার চেষ্টা করতে লাগল। লোকে কোন রকমে বুঝিয়ে তাকে শান্ত করে আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলল।

খানিক দূরে যে সমস্ত কসাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল তারা

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল জেনারেলের চলে যাওয়া, চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে মন্তব্য করতে লাগল।

'এঃ একেবারে শূল অবস্থা যে! নিজেকে সামলাতে পারে না, আবার কিনা জেনারেল!'

'মদের কোন জাত-পাঁত বিচার নেই।'

'সামনে যা দেবে সবটাই কি গিলতে হবে? . . .'

'সবাই কি আর লোভ সামলাতে পারে রে ভাই! লোকে অনেক সময় মাতাল অবস্থায় লজ্জা পেয়ে যায়, জীবনে আর মদ খাবে না বলে প্রতিজ্ঞে করে। কিন্তু তাহলে কী হবে? – ওই যে কথায় আছে না: কাকে বলে আর গাব খাব না, গাবতলায় যাব না। কিন্তু পরে? . . . গাব খাব না, খাব কী? গাবের মতো আছে কী? . . .'

'ঠিকই বলেছ! এই বাচ্চাগুলোকে তাড়া দিয়ে সরিয়ে দাও ত! পাশে পাশে চলেছে ডেঁপোগুলো। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে – যেন জন্মে কখনও কোন মাতাল দেখে নি।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নামা পর্যন্ত জেলা সদরে বেজে চলল গির্জার ঘণ্টা, সেই সঙ্গে চলল মদ টানা। অফিসারদের ক্লাব হিশেবে যে বাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল সন্ধ্যাবেলায় সেখানে বিদ্রোহীদের সেনাপতিমণ্ডলী নবাগতদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করল।

দীর্ঘকায়, সুঠাম গড়নের সেক্রেতেভ, একজন আদত কসাক যাকে বলে। ক্রাস্‌নকুত্‌স্কায়া জেলার এক গ্রামে তার জন্ম। ঘোড়া চড়তে দারুণ ভালোবাসে। পাকা ঘোড়সওয়ার, বেপরোয়া ক্যাভালরি জেনারেল। কিন্তু বক্তৃতা তার আসে না। ভোজসভায় যে বক্তৃতা সে দিল তা মাতালের অসার দম্ভে ভরা। বক্তৃতা শেষ করল দনের উজান এলাকার কসাকদের উদ্দেশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খোঁটা আর ধমক দিয়ে।

ভোজসভায় গ্রিগোরিও উপস্থিত ছিল। প্রবল উত্তেজনা আর রাগ চেপে রেখে মনোযোগ দিয়ে সেক্রেতেভের সব কথা সে শুনল। জেনারেল তখনও পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ হয়ে পারে নি। টেবিলে একটা হাত রেখে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। আরেক হাতে গেলাস ধরা। তা থেকে ছলকে পড়ছে কড়া গন্ধের চোলাই মদ। প্রতিটি কথার ওপর অনাবশ্যক জোর দিচ্ছিল।

'না, সাহায্যের জন্যে আমরা আপনাদের ধন্যবাদ দেব না। আপনাদেরই বরং উচিত হবে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া। হ্যাঁ, আপনাদেরই উচিত – একথাটা জোর দিয়ে বলা দরকার। আমরা না থাকলে লালেরা আপনাদের খতম করে দিত।

আপনারা নিজেরাও সে কথা বেশ ভালো ভাবে জানেন। আমরা কিন্তু আপনাদের সাহায্য ছাড়াই ওই শুয়োরের বাচ্চাদের পিষে মেরে ফেলতে পারতাম। আমরা ওদের পিষে মারার আয়োজন করছি, পিষে মারবও। মনে রাখবেন সে কথা। যত দিন না সারা রাশিয়া একেবারে সাফ করতে পারছি ততদিন তা-ই করব। আপনারা শরৎকালে ফ্রন্ট ছেড়ে পালিয়েছিলেন, কসাকদের দেশের মাটিতে বলশেভিকদের ঢুকতে দিয়েছেন। ... আপনারা ভেবেছিলেন ওদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। কিন্তু তা আর হল না: তখন আপনারা মাথা তুললেন নিজেদের সম্পত্তি আর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে - সোজা কথায় আপনাদের নিজেদের আর বলদগুলোর পিঠের চামড়া বাঁচানোর তাগিদে। আপনাদের পাপের কথা তুলে গালিগালাজ করার উদ্দেশ্যে আমি অতীত প্রসঙ্গ তুলছি না। ... আপনাদের মনে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে সত্য নির্ধারণ করা কোন সময়ই খারাপ নয়। আপনাদের বেইমানিকে আমরা ক্ষমা করেছি। আপনাদের চরম বিপদের মুহূর্তে আমরা ভাইয়ের মতো এগিয়ে এসেছি আপনাদের সাহায্য করতে। কিন্তু আপনাদের লজ্জাজনক অতীতের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ভবিষ্যতে। বুঝতে পেরেছেন ত মহোদয়রা? সে প্রায়শ্চিত্ত হবে নিজেদের কীর্তি দিয়ে, আমাদের প্রশান্ত দনকে অকৃত্রিম ভাবে সেবা করে। বুঝেছেন?'

'বেশ তাহলে প্রায়শ্চিত্তিরের নামেই হোক!' গ্রিগোরির উলটো দিকে যে মাঝবয়সী কসাক সেনাপতিটি বসে ছিল প্রায় চোখে না পড়ার মতো মৃদু হেসে কারও অপেক্ষা না করেই গেলাস তুলে শুভ কামনা করে মদ খেল। কথাগুলো যে সে বিশেষ কারও উদ্দেশ্যে বলল তা-ও নয়।

লোকটার পৌরুষব্যঞ্জক মুখে সামান্য বসন্তের দাগ, খয়েরী চোখে কৌতুকের দীপ্তি। সেক্রেতেভের বক্তৃতার সময় বেশ কয়েকবার তার ঠোঁট কুঁচকে উঠেছিল অনির্দিষ্ট ধরনের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসিতে। তখন তার চোখের রঙ গাঢ় হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন কালো কুচকুচে। কসাক সেনাপতিটির গতিবিধি লক্ষ করে গ্রিগোরি দেখতে পেল যে সেক্রেতেভের সঙ্গে তার 'তুই তোকারি' সম্পর্ক - সেক্রেতেভের সঙ্গে কথা বলছে দিবি স্বচ্ছন্দে, কিন্তু বাকি অফিসারদের সঙ্গে ব্যবহারে রীতিমতো সংযত ও উদাসীন। ভোজসভায় যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র তারই গায়ে খাকী উর্দির ওপর ওই একই রঙের খাকী কাঁধপটি আর হাতায় কর্নিলভ বাহিনীর প্রতীক চিহ্ন। গ্রিগোরির মনে হল লোকটা বোধ হয় কোন ভাবাদর্শ প্রচার করে পল্টনে। হয়ত বা কোন স্বেচ্ছাসেবী। মদ সে গিলছিল জালার মতো, সঙ্গে কোন খাবার খাচ্ছিল না। তবু মাতাল হল না। শুধু মাঝে মাঝে কোমরের চওড়া ব্রিটিশ কোমরবন্ধটা ঢিলে করছিল।

গ্রিগোরির পাশে বসে ছিল বগাতিরিওভ। ফিসফিস করে গ্রিগোরি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মুখোমুখি ওই যে লোকটা বসে আছে . . . যার মুখে বসন্তের দাগ . . . ও কে?'

বগাতিরিওভের সামান্য নেশা ধরেছিল। হাত নাড়িয়ে সে বলল, 'কে জানে বাপু!'

অতিথিদের মদ সরবরাহের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করে নি কুদিনভ। ঘরে-চোলাই মদ ছাড়া কিছু বিশুদ্ধ সুরাসারও কোথা থেকে যেন টেবিলে এনে রাখা হয়েছিল। অতি কষ্টে বক্তৃতা শেষ করে মিলিটারী লংকোটটার বুকের বোতামগুলো খুলে ফেলে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সেক্রেতেভ। স্পষ্ট মোঙ্গলীয় ধাঁচের মুখ, অল্পবয়সী এক লেফটেনান্ট তার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

কুদিনভ বিগলিত ভঙ্গিতে ওর গেলাসে বিশুদ্ধ সুরাসার ঢেলে দিয়েছিল। ঢক করে সেটা খেয়ে ফেলে চোখমুখ লাল করে সেক্রেতেভ জবাব দিল, 'চুলোয় যাক!'

'আর ওই যে ট্যারা চোখ যার, ওই লোকটা কে? এড্‌জুটেন্ট?' বগাতিরিওভকে জিজ্ঞেস করল গ্রিগোরি।

হাতের তেলোয় মুখ আড়াল করে বগাতিরিওভ উত্তর দিল, 'না, ও হল সেক্রেতেভের পোষ্যপুত্র। জাপানী যুদ্ধের সময় মাঞ্চুরিয়া থেকে এনেছিল। তখন একেবারে বাচ্চা ছেলে ছিল। ওকে মানুষ করে পরে মিলিটারী কলেজে দেয়। চীনে বাচ্চাটা বেশ উন্নতি করেছে। বেপারোয়া আর কাকে বলে! গতকাল মাকেয়েভ্‌কার কাছে লালদের কাছ থেকে টাকার সিন্দুক কেড়ে নিয়েছে। কুড়ি লক্ষ টাকা হাতড়েছে। একবার তাকিয়েই দেখ না, ওর সমস্ত পকেট থেকে উঁচু হয়ে আছে নোটের তাড়া! ব্যাটার কী ভাগ্য! খাঁটি গুপ্তধন যাকে বলে। আরে কী হল? অমন হাঁ করে দেখছ কী? খাও!'

বক্তৃতার জবাব দিতে উঠল কুদিনভ। কিন্তু ওর কথায় প্রায় কেউই কান দিল না। পানের আসর ক্রমেই আরও উদ্দাম হয়ে উঠতে লাগল। সেক্রেতেভ গায়ের মিলিটারী কোট খুলে শুধু ভেতরের জামা পরে বসে রইল। ওর চাঁছাছোলা কামানো মাথাটা ঘামে চকচক করছে। নিখুঁত পরিষ্কার লিনেনের শার্টটা যেন লাল টকটকে মুখ আর রোদে পোড়া তামাটে ঘাড়টা আরও প্রকট করে তুলছে। কুদিনভ চাপা গলায় তাকে কী যেন বলল। কিন্তু সেক্রেতেভ তার দিকে না তাকিয়েই গোঁয়ারের মতো বার বার বলতে লাগল, 'ন-না মাপ কর! এ ব্যাপারে মাপ করতে হবে! আমরা তোমাদের ততটাই বিশ্বাস করি যতটা না করলে নয়। . . . তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা অত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবার নয়। শরৎকালে যারা লালদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়েছিল তাদের যেন এটা ভালোমতো মনে থাকে। . . .'

গ্রিগোরির নেশা হয়েছিল। চাপা রাগের সঙ্গে সে ভাবল, 'বেশ আমরাও তোমাদের সেবা ততটাই করব যতটা না করলে নয়!' উঠে দাঁড়াল সে।

টুপি মাথায় না দিয়েই দাওয়ায় বেরিয়ে এলো গ্রিগোরি। বুক ভরে রাতের টাটকা হাওয়া টেনে নিয়ে স্বস্তি পেল।

দনের ধারে কলরব করছে ব্যাঙের দল, বিষণ্ণ গুনগুন আওয়াজ তুলছে জলের পোকাগুলো – বৃষ্টির আগে যেমন হয়ে থাকে। বালিয়াড়ির ঢালে বসে করুণ সুরে চখাচখী ডাকছে। দূরে কোথায় যেন কূলের জলামাঠে একটা ঘোড়ার বাচ্চা তার মাকে হারিয়ে একটানা সরু গলায় চিঁহিহি ডাক ছেড়ে চলেছে। 'বড় ঠেকায় পড়ে তোমাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হয়েছে আমাদের, নয়ত তোমাদের গায়ের গন্ধ অবধি আমরা বরদাস্ত করতাম না। শালা শুয়োরের বাচ্চা! মরণও হয় না তোদের! ভারী ত কানাকড়ির বাতাসা, তারই ফুটুনি কত। আমাদের ওপর চোটপাট করা হচ্ছে! এক হপ্তা পরে সোজা আমাদের গলা টিপে ধরবে। . . . যা হবার তা হয়েছে! যে দিকে তাকাও সেখানেই ঝক্কি। আমি কিন্তু আগেই জানতাম। . . . এরকমই হবার কথা। কসাকরাও এখন নাক সিঁটকোবে। কথায় কথায় 'জি হুজুর' বলে সেলাম ঠোকার অভ্যেস তাদের চলে গেছে,' এই সব কথা ভাবতে ভাবতে গ্রিগোরি দেউড়ির ধাপ বয়ে নীচে নেমে হাতড়ে হাতড়ে শ্লথ চরণে গেটের দিকে চলল।

কড়া মদের প্রতিক্রিয়া ওর ওপরও শুরু হয়েছে। মাথা ঘুরছে, পা ভারী ভারী লাগছে। চলাফেরার মধ্যে তেমন আস্থা পাওয়া যাচ্ছে না। গেট থেকে বেরিয়ে আসার পর পা সামান্য টলে উঠল। টুপিটা মাথায় থেবড়ে বসিয়ে পা টেনে টেনে হেঁটে চলল রাস্তা ধরে।

আক্সিনিয়ার মাসীর বাড়ির কাছে আসার পর এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে থাকে। পরে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যায় সদর দরজার দিকে। বার বারান্দার দরজায় আগল ছিল না। গ্রিগোরি টোকা না মেরেই ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে দেখতে পেল স্তেপান আস্তাখভকে। স্তেপান বসে আছে টেবিলের ধারে। চুল্লীর ধারে কাজে ব্যস্ত আক্সিনিয়ার মাসী। পরিষ্কার চাদরে ঢাকা টেবিলের ওপর ঘরে চোলাই মদের একটা বোতল – এখনও খাওয়া শেষ হয় নি। থালায় শুকানো মাছের কয়েকটা কাটা গোলাপী টুকরো।

স্তেপান সবে একটা গেলাস খালি করেছে। দেখে মনে হচ্ছিল বোধহয় কিছু খাবার মুখে দেওয়ার উদ্যোগ করছিল। কিন্তু গ্রিগোরিকে দেখে থালাখানা সরিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসল।

নেশার ঘোরে থাকলেও গ্রিগোরি লক্ষ না করে পারল না যে স্তেপানের মুখটা মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে উঠেছে। ওর চোখজোড়া ধকধক করছে নেকড়ের

চোখের মতো। সাক্ষাৎকারের আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেলেও গ্রিগোরি শেষ পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'খবর ভালো ত?'

'ভগবানের আশীর্বাদে, ভালোই,' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল বাড়ির গিন্নি। বোঝাই যাচ্ছিল বোনঝির সঙ্গে গ্রিগোরির সম্পর্কের কথা তার জানা আছে। তাই স্বামী আর উপপতির মধ্যে এই আকস্মিক সাক্ষাতের ফল ভালো হবে না বলেই তার ধারণা।

স্তেপান চুপচাপ হাত দিয়ে গোঁফে তা দিতে থাকে। জ্বলন্ত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে গ্রিগোরির দিকে।

এদিকে গ্রিগোরি দু'পা অনেকখানি ছড়িয়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বাঁকা হাসি হাসে, বলে, 'এই এলাম একটু দেখা করতে।... মাপ চাইছি।'

স্তেপান চুপ করে থাকে। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা চলতে থাকে, যতক্ষণ না বাড়ির গিন্নি সাহস করে গ্রিগোরিকে ভেতরে আসতে বলে।

'ভেতরে আসুন। এসে বসুন।'

এখন গ্রিগোরিরও লুকানোর কিছু নেই। আক্সিনিয়ার মাসীর বাড়িতে ওর আগমনের কারণ স্তেপানের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। গ্রিগোরিও সরাসরি কথায় চলে আসে।

'তোমার বৌ কোথায়?'

'ও... তাকে দেখতে-এসেছ বুঝি?' মৃদুস্বরে কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে স্তেপান জিজ্ঞেস করে। চোখ বন্ধ করে ও। তিরতির করে কাঁপতে থাকে চোখের পালক।

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রিগোরিকে স্বীকার করতে হয়।

এই মুহূর্তে গ্রিগোরি যে-কোন কিছুর জন্য তৈরি স্তেপানের কাছ থেকে। তাই সে হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু স্তেপান চোখদুটো অল্প একটু খুলে (খানিকক্ষণ আগের সেই আগুন আর তাতে নেই) বলে, 'ভোদ্‌কা আনতে পাঠিয়েছি ওকে। এক্ষুনি এসে যাবে। বোসো, অপেক্ষা কর।'

এমন কি সে উঠেও দাঁড়াল দীর্ঘ সুঠাম দেহখানা নিয়ে, গ্রিগোরির দিকে একটা চেয়ার ঠেলে দিল। গৃহকর্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই বলল, 'একটা পরিষ্কার গেলাস দিন ত মাসীমা।' তারপর গ্রিগোরির দিকে ফিরে বলল, 'এক গেলাস খাবে ত?'

'একটু চলতে পারে।'

'ঠিক আছে, বোসো।'

গ্রিগোরি টেবিলের ধারে গিয়ে বসল।... বোতলে যেটুকু মদ অবশিষ্ট ছিল স্তেপান সমান ভাগ করে দু'গেলাসে ঢালল, তারপর কেমন যেন অদ্ভুত ধোঁয়ায় ঢাকা চোখ তুলে তাকাল গ্রিগোরির দিকে।

'সব রকমের ভালোর নামে!'

'স্বাস্থ্য কামনা করে!'

দু'জনে গেলাস ঠেকাল। পান করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাড়ির গিন্নিটি ইঁদুরের মতো ছুটফটে। একটা থালা আর খাঁজকাটা হাতলওয়ালা একটা কাঁটা সে তুলে দিল অতিথির হাতে।

'একটু মাছ খান? নোনা, তবে বেশি নুন দেওয়া নয়।'

'না, ঠিক আছে।'

'থালায় তুলে নিন, তুলে খান!' একটু খুশি হয়ে গ্রিগোরিকে সাধল গৃহকর্ত্রী।

সব কিছু এত ভালোয় ভালোয় কেটে গেল - মারামারি হল না, থালা-প্লেট ভাঙল না, গলাবাজি হল না - এতে সে ভারী খুশি। কথাবার্তার মধ্যে যে রকম অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল সেটা কেটে গেছে। স্বামী এখন তার স্ত্রীর পুরুষ-বন্ধুটির সঙ্গে একই টেবিলের ধারে ভালো মানুষের মতো চুপচাপ বসে আছে। এখন ওরা নীরবে খেয়ে চলেছে। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। অতি মনোযোগী গৃহকর্ত্রী সিন্দুক থেকে একটা পরিষ্কার তোয়ালে বার করে তার দুই কিনারা দু'জনের হাঁটুর ওপর বিছিয়ে দিল - বলতে গেলে যেন একরকম মিলনই ঘটিয়ে দিল গ্রিগোরি আর স্তেপানের মধ্যে।

'তুমি তোমার স্কোয়াড্রন ছেড়ে চলে এসেছ যে?' কাঁটা ছাড়িয়ে মাছ খেতে খেতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'আমিও এসেছি দেখা করতে,' একটু চুপ করে থেকে স্তেপান উত্তর দেয়। ওর বলার ধরন থেকে কোন মতে বোঝার উপায় থাকে না ঠাট্টা করছে না সত্যি সত্যি বলছে।

'স্কোয়াড্রনের সবাই বুঝি বাড়িতে?'

'সবাই গাঁয়ে আছে, আমোদ ফুর্তি করছে। কী হল, শেষ করা যাক তাহলে বাকিটা?'

'এসো।'

'স্বাস্থ্য কামনা করি!'

'মঙ্গল হোক!'

বাইরের বারান্দায় ঝনাৎ করে দরজার শেকলের আওয়াজ হল। গ্রিগোরির নেশা এখন সম্পূর্ণ টুটে গেছে। আড়চোখে সে তাকায় স্তেপানের দিকে, দেখে যেন নতুন করে পাণ্ডুরতায় ছেয়ে গেল ওর মুখখানা।

আক্সিনিয়ার মাথায় একটা ফুলের কাজ করা ওড়না জড়ানো। গ্রিগোরিকে প্রথমে চিনতে না পেরে সে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়, আড়চোখে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর কালো চোখদুটো বড় বড় হয়ে ওঠে। চোখে ফুটে ওঠে আতঙ্কের

ভাব। হাঁপাতে হাঁপাতে শেষকালে জোর করে বলে, 'আরে, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ যে!'

স্তেপানের গাঁটধরা বড় বড় হাতদুটো টেবিলের ওপর পড়ে ছিল, এখন হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল। গ্রিগোরি সেটা লক্ষ করল। একটা কথাও না বলে সে নীরবে মাথা নুইয়ে প্রতিনমস্কার জানাল আক্সিনিয়াকে।

ঘরে-চোলাই মদের দু'খানা বোতল টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে আক্সিনিয়া ফের গ্রিগোরির ওপর নজর দেয়। উদ্বেগ আর চাপা আনন্দে ভরপুর ওর দু'চোখ। শেষে ঘুরে গিয়ে ঘরের অন্ধকার কোনায় তোরঙ্গটার ওপর বসে পড়ে। কাঁপা কাঁপা হাতে মাথার চুল ঠিক করতে থাকে। গায়ের জামাটার জন্য স্তেপানের যেন এতক্ষণ দম আটকে আসছিল।

উত্তেজনা চেপে রেখে কলারের বোতাম খুলল সে, কানায় কানায় গেলাস ভরে বৌয়ের দিকে ফিরল।

'একটা গেলাস নিয়ে বসে পড় টেবিলের ধারে।'

'আমার ইচ্ছে নেই।'

'বসে পড়!'

'আমি যে ওসব খাই নে স্তেওপা!'

'কতবার বলতে হবে?' স্তেপানের গলা কেঁপে ওঠে।

'বসে পড় গো পড়শী!' গ্রিগোরি উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসে।

আক্সিনিয়া নীরবে তাকাল ওর দিকে, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল খাবারের আলমারিটার দিকে। তাক থেকে একটা ডিশ ঝনঝন করে মেঝেতে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

'হায় হায়!' বাড়ির গিন্নি দুঃখ ক'রে কপাল চাপড়ায়।

আক্সিনিয়া চুপচাপ ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োতে থাকে।

স্তেপান ওকেও কানায় কানায় পুরো এক গ্লাস ঢেলে দিল। আবার স্তেপানের চোখ কোণে আর ঘৃণায় দপ করে জ্বলে ওঠে।

'এসো তাহলে. . .' বলতে বলতে আবার থেমে যায়।

আক্সিনিয়া টেবিলের ধারে এসে বসেছিল। নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে ওর বুকের ধড়াস ধড়াস ওঠা-পড়া।

'এসো গো, বন্ধু কালের জন্যে যে ছাড়াছাড়ি হতে যাচ্ছে তারই নাম করে খাওয়া যাক। কী হল, ইচ্ছে নেই? খাবে না?'

'তুমি ত জানই. . .'

'এখন আমি সবই জানি। . . . বেশ ছাড়াছাড়ির নাম করে না হয় না-ই

হল : আমাদের প্রিয় অতিথি গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচের স্বাস্থ্য কামনা করেই হোক।'

'ওর স্বাস্থ্য কামনা করে খাব!' সুরেলা গলায় এই কথা বলে এক ঢোকে গেলাস শেষ করে ফেলে আক্সিনিয়া।

'কী দুঃখই যে আছে তোর কপালে!' রান্নাঘরের দিকে ছুটে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলে বাড়ির গিন্নি।

রান্নাঘরে ঢুকে দু'হাত বুকে চেপে এক কোনায় জড়সড় হয়ে বসে বসে সে অপেক্ষা করতে থাকে এই বুঝি দড়াম করে টেবিল উলটে পড়ল, কান ফাটানো শব্দ করে গুলি ছুটল।... কিন্তু ঘরের ভেতরে কবরের নিস্তব্ধতা। শোনা যায় শুধু ছাদের গায়ে আলো পড়ে চঞ্চল হয়ে ওঠা মাছিদের ভনভনানি আর বাইরে মাঝরাতকে স্বাগত জানিয়ে পাড়ার মোরগগুলোর ডাকাডাকি।

আট

দনের পারে জুনের রাতগুলো ঘন অন্ধকার। নিকষ কালো আকাশের বুকে, ক্লান্তিকর নিস্তব্ধতার মধ্যে সোনালি বিজলির চমক খেলে যায়, তারা খসে পড়ে – দনের খরস্রোতে তার ছায়া পড়ে। স্তেপের প্রান্তর থেকে শুকনো গরম হাওয়া লোকালয়ে বয়ে আনে সুগন্ধী লতার সৌরভ। কিন্তু কূলের জলামাঠে ভিজে ঘাস, পলিমাটি আর শেওলার সোঁদা গন্ধ। সেখানে অনবরত ডেকে চলেছে কোঁচবক। তীরের বনভূমি যেন রূপকথার ছবির মতো কুয়াশার রূপোলি জরিতে আগাগোড়া ঢাকা।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল প্রোখরের। বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কর্তা ফিরে আসে নি এখনও?'

'না। জেনারেলদের সঙ্গে আমোদ ফুর্তি করছে।'

'নির্ঘাত ওখানে মাল টানছে!' ঈর্ষাভরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে প্রোখর হাই তুলে জামাকাপড় পরতে থাকে।

'তুমি আবার কোথায় চললে?'

'যাই, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিতে হয়। পান্তেলেয়েভিচ বলেছিল ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতারস্কির দিকে বেরিয়ে যাব। সেখানে সারাদিন কাটাব, তারপর ফের ধরতে হবে আমাদের দলের নাগাল।'

'ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। আরেকটু ঘুম দিয়ে নাও বরং।'

প্রোখর বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, 'বোঝাই যাচ্ছে জোয়ান বয়সে তুমি কোন দিন পল্টনে কাজ কর নি বুড়ো দাদু! আমাদের যে ধরনের চাকরী তাতে

ঘোড়াগুলোকে যদি না খাওয়াই, তাদের যদি সেবাযত্ন না করি তাহলে আমরা হয়ত প্রাণেই বাঁচব না। মরকুটে ঘোড়াকে দাবড়ে কত দূর ছুটে বেড়াবে? তোমার বাহনটি যত ভালো দুশমনের কাছ থেকে তত তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারবে। আমার কথা যদি বল, ওদের পিছু ধাওয়া করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আর যদি বেকায়দায় পড়ি তাহলে আমিই প্রথম ছুট লাগাব। আজ কত বছর হল বুলেটের বিপদ মাথায় করে ঘোরা যায় - ঘেন্না ধরে গেল। বাতিটা একটু জ্বালো গো দাদু, আমার পায়ে লাগানোর পটিগুলো খুঁজে পাচ্ছি নে।... হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ত! এই আমাদের গ্রিগোরি প্যান্তেলেয়েভিচ হল একজন লোক - মেডেল আর খেতাব পাচ্ছে, আগুনের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিচ্ছে। আমি বাপু অমন বোকা নই, ওসবে আমার কোন দরকার নেই। শয়তানের পাল্লায় পড়েছে লোকটা। নির্ঘাত মদে চুর হয়ে আছে।'

দরজায় আস্তে টোকা পড়ল।

'ভেতরে আসুন!' প্রোখর চেঁচিয়ে বলল।

ঘরে এসে ঢুকল একজন অচেনা কসাক। লোকটার গায়ে জুনিয়র সার্জেন্টের কাঁধপটি লাগানো আঁটো ফৌজী শার্ট, মাথার টুপির চূড়োয় লম্বা ফলা।

'আমি জেনারেল সেক্রেতেভের সদর দপ্তরের একজন আর্দালি। মহামান্য মেলেখভ মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?' চৌকাটের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টুপির কানাতে হাত ঠেকিয়ে সেলাম ঠুকে বলল সে।

সুশিক্ষিত আর্দালিটির চালচলন আর সম্বোধনের বহরে আশ্চর্য হয়ে গেল প্রোখর। বলল, 'উনি এখানে নেই। কিন্তু তুমি অমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আরে ছোকরা বয়সে আমিও তোমারই মতো বুদ্ধু ছিলাম। আমি ওর আর্দালি। কী কাজে এসেছ বল ত?'

'জেনারেল সেক্রেতেভের হুকুমে মেলেখভ মশাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। এক্ষুনি ওঁকে অফিসারদের ক্লাবে হাজির হবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।'

'সন্ধের সময়ই ত সেখানে চলে গেছেন।'

'গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে সেখান থেকে বাড়ি চলে এসেছেন।'

প্রোখর শিস দিল। বাড়ির কর্তা বিছানার ওপর বসে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সে।

'বুঝতে পারলে দাদু? সটকান দিয়েছে, তার মানে গেছে তার ওই পিয়ারির কাছে। তুমি চলে যাও সেপাইজী। আমি ওকে ঠিক খুঁজে বার করে গরমা গরম এনে হাজির করব সোজা ওখানে।'

ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দেওয়ার ভার বুড়োর ওপর দিয়ে প্রোখর রওনা দিল আক্সিনিয়ার মাসীর বাড়ির দিকে।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে-ঢাকা পড়ে আছে ঘুমন্ত জেলা সদরটা। দনের ওপারে বনের ভেতরে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে শিস দিয়ে চলেছে বুলবুলগুলো। প্রোখর ধীরেসুস্থে পরিচিত ছোট্ট কুটিরখানার দিকে এগিয়ে গেল, বার-বারান্দায় উঠে সবে দরজার হাতলে হাত রেখেছে এমন সময় শুনতে পেল স্তেপানের গম্ভীর গলার আওয়াজ। 'আচ্ছা ফেসাদ হল ত!' প্রোখর মনে মনে ভাবল। 'জিজ্ঞেস করবে কেন এসেছি। আমার তখন কিছুই বলার থাকবে না। যাক গে যা হবার হবে – ওরকম কতই ত দেখা গেল! বলব, মদ কিনতে এসেছিলাম, পড়শীরা এই বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে।'

বুক ঠুকে প্রোখর ঢুকে পড়ল ভেতরের ঘরে। ঢুকে যা দেখল তাতে অবাক। মুখ হাঁ হয়ে গেল, কোন কথা সরল না মুখে। একই টেবিলের ধারে আস্তাখভের সঙ্গে বসে আছে গ্রিগোরি। যেন ওদের মধ্যে কোন কালে কিছুই হয় নি এই ভাবে পরম নিশ্চিন্তে গেলাস থেকে ঘোলাটে সবুজ রঙের ঘরে-চোলাই মদ টানছে।

প্রোখরের দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে স্তেপান বলল, 'অমন হাঁ করে কী দেখছ? একটা নমস্কার করার পর্যন্ত নাম নেই! ভূত দেখছ নাকি?'

প্রোখরের ঘোর তখনও কাটে নি। এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপর দেহের ভর রাখতে রাখতে অবাক হয়েই সে জবাব দিল, 'অনেকটা তা-ই।'

'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এসো, বসে পড়,' স্তেপান আমন্ত্রণ জানাল।

'বসবার সময় নেই আমার। . . . আমি তোমার খোঁজে এসেছি গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। হুকুম হয়েছে জেনারেল সেক্রেতেভের কাছে এখনই হাজির হতে হবে তোমাকে।'

প্রোখর আসার আগেই গ্রিগোরি বেশ কয়েকবার ওঠার চেষ্টা করেছিল। গেলাস সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়েছে, পরক্ষণেই আবার বসে পড়েছে – ভয় হয়েছে পাছে ওর চলে যাওয়াটাকে স্তেপান ওর ভীরুতার স্পষ্ট নিদর্শন বলে মনে করে। আক্সিনিয়াকে ছেড়ে দিয়ে স্তেপানকে জায়গা ছেড়ে দেবে – এটা তার অহঙ্কারে বাধছিল। মদ সে খেয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার কোন প্রভাব ওর ওপর পড়ছিল না। সুস্থ মস্তিষ্কে নিজের অনিশ্চিত অবস্থার মূ..্যায়ন করতে করতে গ্রিগোরি উৎসুক হয়ে পরিণতির অপেক্ষা করতে থাকে। আক্সিনিয়া যখন গ্রিগোরির স্বাস্থ্যের জন্য পান করছিল তখন মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরির মনে হয়েছিল এই বুঝি স্তেপান তার বৌকে ধরে মারে। কিন্তু গ্রিগোরি ভুল করেছিল। স্তেপান হাত তুলল, খসখসে তালু দিয়ে রোদে পোড়া কপালটা মুছল – খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুগ্ধ

দৃষ্টিতে আক্সিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাবাস তোমাকে। তোমার সাহসের প্রশংসা করতে হয়।'

এমন সময় প্রোখর ঘরে ঢোকে।

একটু ভেবে গ্রিগোরি ঠিক করল সে. যাবে না – স্তেপানকে সুযোগ দেবে তার মনের কথা খুলে বলার।

প্রোখরের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'ওদের গিয়ে বল আমায় খুঁজে পাও নি। বুঝলে?'

'সে না হয় বুঝলাম। তবে তুমি গেলেই বোধ হয় ভালো করতে পান্তেলেয়েভিচ।'

'তোমার মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। ভাগো।'

প্রোখর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা দিল আক্সিনিয়া। গ্রিগোরির দিকে না তাকিয়েই শুকনো গলায় বলল, 'না আপনি বরং ওর সঙ্গে যান গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। আমাদের অতিথি হয়ে আসার জন্য, আমাদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।... তবে খুব একটা ভোর এখন নয়, দু'পহরের মোরগ ডেকে উঠল। শিগ্‌গিরই ফরসা হয়ে যাবে। এদিকে আমাকে আর স্তেওপাকে ভোরবেলায় বাড়ি ফিরতে হবে। তাছাড়া যদও আপনি টেনেছেন অনেক। আর নয়।'

স্তেপান ওকে ধরে রাখার কোন চেষ্টা করল না। গ্রিগোরি উঠে পড়ে। বিদায় নেবার সময় স্তেপান তার ঠাণ্ডা রুক্ষ হাতের মধ্যে গ্রিগোরির হাতখানা চেপে ধরে – যেন শেষ মুহূর্তে কিছু বলার ইচ্ছে তার ছিল – কিন্তু তা আর বলা হয়ে উঠল না। নীরবে চোখের দৃষ্টি দিয়ে গ্রিগোরির দরজা অবধি যাওয়া অনুসরণ করে, তারপর হাত বাড়ায় অসমাপ্ত বোতলটার দিকে।...

রাস্তায় বেরিয়ে আসতে না আসতে একটা নিদারুণ ক্লান্তি গ্রিগোরিকে পেয়ে বসল। অনেক কষ্টে পা টেনে টেনে গিয়ে পৌঁছুল প্রথম মোড়টার কাছে। প্রোখরও নাছোড়বান্দার মতো ওর পিছন পিছন আসছিল। গ্রিগোরি তার দিকে ফিরে বলল, 'যাও, ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন লাগিয়ে এখানে নিয়ে এসো। আমি আর হাঁটতে পারছি নে।...'

'তুমি যে আসছ তা রিপোর্ট করব?'

'না, দরকার নেই।'

'তাহলে একটু সবুর কর। আমি এক্ষুনি আসছি।'

অমনিতে প্রোখর ঢিমে তালের, কিন্তু এবারে সে জোর কদমে ছুটল আস্তানার দিকে।

গ্রিগোরি বেড়ার ধারে বসে একটা সিগারেট ধরায়। স্তেপানের সঙ্গে সাক্ষাতের

ঘটনাটা পর্যালোচনা করতে করতে উদাসীন ভাবে মনে মনে বলে, 'ভালো, এখন ও জানে। এখন আক্সিনিয়াকে ধরে না পেটালেই হয়।' ক্লান্তিতে আর এতক্ষণের উত্তেজনায় বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়ে, ঝিমুতে থাকে।

একটু বাদেই ঘোড়া নিয়ে এলো প্রোখর।

খেয়া নৌকোয় চেপে ওরা দন পার হয়ে ওপাড়ে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জোর দুলকি চালে।

তাতারস্কিতে ওরা যখন এসে ঢুকল ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। বাড়ির ফটকের সামনে এসে গ্রিগোরি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ঘোড়ার লাগামটা প্রোখরের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে মনে মনে উত্তেজনা নিয়ে তাড়াতাড়ি পা বাড়াল বাড়ির দিকে। কোন রকমে গায়ে একটা পোশাক জড়িয়ে নাতালিয়া কেন যেন বার-বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। গ্রিগোরিকে দেখে ওর ঘুমজড়ানো চোখে আনন্দের এমন উজ্জ্বল আলোকছটা ঝলক দেয় যে তা দেখে গ্রিগোরির বুকটা দুলে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আচমকা সজল হয়ে ওঠে ওর চোখের পাতা। নাতালিয়া নীরবে জড়িয়ে ধরে তার একমাত্র প্রাণের ধনকে, সারা শরীর দিয়ে লেগে থাকে তার গায়ের সঙ্গে। ওর কাঁধের কাঁপুনিতে গ্রিগোরি বুঝতে পারে ও কাঁদছে।

ঘরে ঢুকে ও বুড়ো বুড়িকে আর ভেতরের ঘরে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের চুমু খেল। এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের মাঝখানে।

'তারপর কেমন কাটল তোমাদের? সব ভালোয় ভালোয় কেটেছে ত?' উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল, দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওর।

'ভগবানের মহিমা রে খোকা! বড় ভয়ে ভয়ে ছিলাম ঠিকই। তবে আমাদের ওপর খুব একটা উৎপাত করে নি,' চটপট উত্তর দেয় ইলিনিচ্না। আড়চোখে নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে তাকে কাঁদতে দেখে কড়া গলায় ধমক দিয়ে বলে, 'কোথায় আনন্দ হবে, তা না কাঁদছে, হাঁদা মেয়ে কোথাকার! কাজকম্ম ফেলে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে? লাকড়ি নিয়ে এসো, উনুন ধরাতে হবে না! ...'

ইলিনিচ্না আর নাতালিয়া মিলে যখন চটপট সকালের খাবার বানাতে লাগল, সেই ফাঁকে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা পরিষ্কার তোয়ালে এনে ছেলেকে দিয়ে বলল, 'আমি তোর হাতের আঁজলায় জল ঢেলে দিচ্ছি, ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নে। মাথাটা সাফ হয়ে যাবে তাতে। ... তোর গায়ে ভোদ্‌কার যা গন্ধ! কাল খুশির চোটে খুব খেয়েছিস বুঝি?'

'তা বলতে পার। তবে খুশিতে না শোকে তা বলতে পারছি নে। ...'

'সে আবার কী রে?' যার পর নাই অবাক হয় বুড়ো।

'সেক্রেতেভ আমাদের ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে আছে।'

'তাতে ক্ষেতি কিসের? তোর সঙ্গে মদ খেলেন নাকি রে?'

'হুঁ, তা খেলেন।'

'বলিস কী! কী সম্মানের কথা গ্রিশ্‌কা! একজন খাঁটি জেনারেলের সঙ্গে এক টেবিলে, এ যে ভাবাই যায় না।' সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মুগ্ধ হয়ে জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করে।

গ্রিগোরি মৃদু হাসল। বুড়োর সরল আনন্দের ভাগ সে কোন মতেই নিতে পারছে না।

গোরু ঘোড়া ও সম্পত্তির কতটা রক্ষা পেল, কতটা ফসল নষ্ট হল, গম্ভীর ভাবে এই সব কথা জিজ্ঞেস করতে করতে গ্রিগোরি লক্ষ করল ঘর-গেরস্থালির বিষয়ে বাপের যেন আগের সে আগ্রহ নেই। বুড়োর মনের ভেতরে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কী যেন জমে আছে। কিসে যেন ভার হয়ে আছে তার মনটা।

'এখন কী রে খোকা? আবার কি আমাদের সেই পলটনে কাজ করতে যেতে হবে?'

'ঠিক কাদের কথা বলছ তুমি?'

'বুড়োরা। এই ধর না কেন, অন্তত আমার মতো যারা বুড়ো আছে।'

'এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না।'

'তার মানে, যেতে হবে?'

'তুমি থেকে যেতে পার।'

'বলিস কী!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে বলল। উত্তেজনায় খোঁড়া পায়ে রান্নাঘরে ছটফট করে বেড়াতে লাগল।

'আ মলো যা বুড়ো! একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসোই না! পায়ে দাপাদাপি করে ঘরময় ধুলোবালি ছোটাচ্ছ যে! আহ্লাদে আটখানা হয়ে রাস্তার কুকুরছানার মতো ছুটছে দেখ!' এক ধমক লাগাল ইলিনিচ্‌না।

কিন্তু ও চেঁচামেচিতে বুড়ো কোন কানই দিল না। হাসতে হাসতে হাতে হাত ঘসতে ঘসতে বার কয়েক সে টেবিল থেকে উনুন পর্যন্ত ছুটোছুটি করল। কিন্তু শেষকালে একটা সন্দেহ ঢুকল ওর মাথায়।

'তুই কি আমায় পলটন থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারিস?'

'পারব না কেন?'

'কাগজে লিখে দিবি ত?'

'তা নয়ত কী!'

বুড়ো তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে আমতা আমতা করতে থাকে। শেষকালে

বলেই ফেলে, 'কাগজটা কেমন হবে, শুনি? . . . সীলমোহর ছাড়াই? নাকি সীলমোহরও আছে তোর কাছে?'

'সীলমোহর ছাড়াই চলে যাবে!' গ্রিগোরি হাসে।

'তাহলে অবিশ্যি বলার কিছু নেই!' আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বুড়ো। 'ভগবান তোকে সুস্থ রাখুন! তুই নিজে কবে যাবিস বলে ভাবছিস?'

'কাল।'

'তোর দলবল কি আগেই চলে গেছে? উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসার দিকে গেল বুঝি?'

'হ্যাঁ। তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই বাবা। অমনিতেই তোমার মতো বুড়োদের শিগগিরই বাড়ি ফিরে যেতে দেওয়া হবে। তোমাদের যা করার ছিল তোমরা করেছ।'

'ভগবান করুন!' বলতে বলতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম করল। বুঝতে বাকি রইল না এখন আর তার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই।

ছেলেমেয়েরা জেগে উঠল। গ্রিগোরি ওদের কোলে নিয়ে হাঁটুতে বসায়। একে একে ওদের চুমু খায়, হাসে, অনেকক্ষণ ধরে শোনে ওদের খুশির কলরব।

বাচ্চাদুটোর চুলের কী চমৎকার গন্ধ! রোদ, ঘাসপাতা, গরম বালিশ আর এমন আরও কিছুর গন্ধ যা কেন যেন বড় আপনার। আর ওরা - ওর নিজের রক্তমাংসে গড়া এই শিশুরা যেন স্তেপভূমির খুব ছোট ছোট পাখি। বাপ যখন তার কালো কালো বিশাল হাতে ওদের জড়িয়ে ধরে তখন কী বেয়াড়াই না দেখায় তার সেই হাতদুটো। এই শান্তির পরিবেশে কেমন যেন বেখাপ্পা সে নিজে - একজন ঘোড়সওয়ার, যে মাত্র একটা দিনের জন্য তার ঘোড়াটাকে ছেড়ে এসেছে, যার গা এখনও সেপাই-সেপাই গন্ধ আর ঘোড়ার ঘামের ঝাঁঝাল গন্ধে, বহু দূর অভিযান আর চামড়ার সরঞ্জামের কটু গন্ধে ছেয়ে আছে। . . .

গ্রিগোরির চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে। গোঁফের আড়ালে ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে। . . . বার তিনেক বাপের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। নাতালিয়া যখন ওর জামার হাতা ছোঁয় একমাত্র তখনই এগিয়ে যায় টেবিলের দিকে।

না, গ্রিগোরি বাস্তবিকই আর আগের সেই মানুষ নেই! কোন কালেই ও বিশেষ ভাবপ্রবণ ছিল না, এমন কি ছেলেবেলায়ও কদাচিৎ কাঁদত। কিন্তু এখন ওর চোখে জল, বুকের চাপা দ্রুত স্পন্দন আর এমন একটা অনুভূতি যেন গলার ভেতরে নিঃশব্দে বেজে চলেছে একটা ছোট্ট ঘণ্টা। . . . তবে হয়ত বা কাল রাতে বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিল আর ঘুমও হয় নি - তারই ফল হতে পারে এটা।

গোরুগুলোকে মাঠে চরাতে দিয়ে এসে ফিরল দারিয়া। হাসি হাসি ঠোঁটজোড়া সে বাড়িয়ে দিল গ্রিগোরির দিকে। গ্রিগোরি মস্করা করে গোঁফে তা দিয়ে ওর

মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসতে ও চোখ বুজল। গ্রিগোরি দেখতে পেল ওর চোখের পাতা যেন হাওয়ায় কেঁপে উঠল, মুহূর্তের জন্য অনুভব করল ওর গালের বুজের মশলা-মশলা গন্ধ। যেন এতটুকু বিবর্ণ হয় নি সেই গালদুটো।

দারিয়া কিন্তু সেই আগের মতোই আছে। দেখলে মনে হয় কোন লোকের সাধ্যি নেই তাকে মচকাতে পারে, ভাঙা ত দূরের কথা। দিব্যি আছে সে বেতসের মতো – নমনীয়, সুন্দর আর সব সময়ই সকলের নাগালের মধ্যে।

'দিব্যি রূপের খোলতাই দেখছি!' গ্রিগোরি বলল।

'পথের ধারের বুনো ফুলের মতো!' জ্বলজ্বলে চোখদুটো বুজে চোখ ধাঁধান হাসি হাসে দারিয়া। পরক্ষণেই আয়নার সামনে গিয়ে মাথার কাপড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা চুলগুলো ঠিক করে নিল নিজেকে আরও সুন্দর দেখানোর চেষ্টায়।

এই হল দারিয়া। কিছুতেই বুঝি আর কিছু হবার নেই ওর। পেত্রোর মৃত্যু যেন কশাঘাত করে ওকে জাগিয়ে তুলেছে। শোকের আঘাত সামলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও উদগ্র হয়ে উঠেছে ওর জীবনের সমস্ত কামনা বাসনা, নিজের চেহারার ওপর ও যেন আরও বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছে।

দুনিয়াশ্‌কা ঘুমোচ্ছিল গোলাঘরে। তারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল এতক্ষণে। পরিবারের সবাই ভগবানের নাম জপ সেরে খেতে বসল।

'ইস্, কী বুড়িয়ে গেছ তুমি, দাদা।' দুনিয়াশ্‌কা দুঃখ করে বলল। 'চুলগুলো পেকে একেবারে ছাইরঙা নেকড়ের মতো দেখাচ্ছে যে!'

গ্রিগোরি একটুও না হেসে টেবিলের ওধার থেকে নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখে। তারপর বলে, 'তা ত হতেই হবে। ... আমার বুড়ো হবার কথা, এদিকে তোরও একটা পাত্র খুঁজে বার করতে হয় এই বেলা। ... তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি, আজ থেকে মিশ্‌কা কশেভয়ের কথা মনেও ঠাঁই দিবি নে। এর পর যদি ফের শুনি ওর জন্যে তুই হেদিয়ে মরে যাচ্ছিস তা হলে এক পায়ে মাড়া দিয়ে আরেক পা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলব ব্যাঙের মতো। বুঝলি?'

দুনিয়াশ্‌কার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল। জলভরা চোখে সে তাকাল গ্রিগোরির দিকে।

দুনিয়াশ্‌কার মুখের ওপর থেকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সরাল না গ্রিগোরি। ওর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা সমস্ত চেহারার মধ্যে – গোঁফের নীচে উঁকি দেওয়া দাঁতের সারিতে, কোঁচকানো চোখে – আরও বেশি করে প্রকট হয়ে উঠল জন্মসূত্রে পাওয়া মেলেখভ বংশের আত্মবত্তা।

কিন্তু দুনিয়াশ্‌কাও ত সেই বংশেরই মেয়ে। তাই লজ্জা আর মনের দুঃখ

কাটিয়ে উঠে শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে সে বলল, 'দাদা, তুমি কি জান, মানুষের অন্তর কারও হুকুমে চলে না?'

'যে অন্তর তোমার বশ মানে না তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া উচিত,' কঠিন স্বরে গ্রিগোরি পরামর্শ দিল।

'অমন কথা তোর মুখে মানায় না রে খোকা . . .' ইলিনিচ্না মনে মনে ভাবছিল। ঠিক সেই সময় কথার মাঝখানে যোগ দিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। টেবিলে দুম করে একটা ঘুসি মেরে গলা ফাটিয়ে বলল, 'চোপ রও, হারামজাদী মেয়ে! তোর নিকুচি করেছি আমি। এমন মজা দেখিয়ে দেব যে মাথায় তোর একগাছি চুলও থাকবে না! লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! এক্ষুনি নিয়ে আসছি ঘোড়ার লাগাম। . . .'

'বাবা গো! লাগাম যে একখানাও নেই ঘরে! সব নিয়ে গেছে!' কাচুমাচু ভাব করে শ্বশুরকে বাধা দিয়ে বলল দারিয়া।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ওর দিকে, গলার স্বর এতটুকু না নামিয়ে যা প্রাণে চাই তা-ই বলে যেতে লাগল।

'জিনের পেটি নেব তবে – ওই দিয়েই পিটিয়ে ভূত ভাগাব তোর। . . .'

'সেও ত নিয়ে গেছে লাল সেপাইরা!' আগের মতোই নিরীহ দৃষ্টিতে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে এবারে আরও জোরে যোগ করে দারিয়া।

এবারে কিন্তু পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য ছেলের বৌয়ের দিকে তাকাল নীরবে। মুখখানা বিরাট হাঁ হয়ে যায় (সেই মুহূর্তে ওকে জল থেকে তোলা ভেটকি মাছের মতো দেখাচ্ছিল), বোবা রাগে লাল টকটক হয়ে ওঠে। শেষকালে ভাঙা গলায় গর্জন করে বলে, 'চোপ রও হতচ্ছাড়ী! কী জ্বালা রে বাবা! একটা কথা কইবার জো নেই! এসব কী, অ্যাঁ? আর তুই দুনিয়াশ্‌কা, মনে রাখিস ওটা কখনই হবার নয়। তোর বাপ হিসেবেই বলছি, জেনে রাখ! ঠিক কথাই বলেছে গ্রিগোরি – ওই ইতরটার কথা যদি মনেও ঠাঁই দিস তাহলে তোকে খুন করলেও তেমন সাজা দেওয়া হয় না। ভালোবাসার লোক আর পেলি না! মনে ধরল কিনা একটা ফাঁসীর আসামীকে! ও আবার একটা মানুষ? খ্রীষ্টের দুশমন ওমন পাষণ্ড হবে আমার জামাই? এই মুহূর্তে যদি আমার কাছে এসে পড়ে তাহলে নিজের হাতে যমের দোরে ঠেলে দেব। ফের ক্যাচক্যাচ করবি তো ডালের ছড়ি দিয়ে এমন দেব না . . .'

'সেই ডালের ছড়িও ত দিনে দুপুরে বাতি নিয়ে উঠোন খুঁজে পাওয়া যাবে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিনিচ্না বলল। 'উঠোনটা হয়েছে ফাঁকা গড়ের মাঠ – আগুন জ্বালানোর এক টুকরো ডালও যদি মেলে সেখানে। কী দশা হয়েছে আমাদের!'

এই নিরীহ মন্তব্যের মধ্যেও দুষ্ট অভিসন্ধির আঁচ পায় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। বুড়ির দিকে স্থির দৃষ্টিতে কটমট করে তাকায়, তারপর পাগলের মতো এক লাফে ছুটে যায় উঠোনে।

গ্রিগোরি হাতের চামচ ফেলে দিয়ে রুমালে মুখ ঢেকে নিঃশব্দ হাসিতে ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকে। ওর রাগ জল হয়ে যায় । এমন হাসি হাসতে থাকে যে তেমন ও বহুকাল হাসে নি। দুনিয়াশ্‌কা ছাড়া আর সকলেই হাসল। খাবার টেবিলে আনন্দের উচ্ছ্বাস খেলে গেল। কিন্তু যে মুহূর্তে দেউড়ির ধাপে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পা দাবড়ানোর আওয়াজ পাওয়া গেল অমনি সকলের মুখ গম্ভীর। এলডারের বিশাল এক ডাল টেনে আনতে আনতে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল বুড়ো।

'এই যে হতচ্ছাড়ীরা, তোদের যাদের বড় বড় জিভ তাদের সব্বার কুলিয়ে যাবে এতে। লম্বা লেজওয়ালা ডাইনীর দল। ডাল নেই, না? এটা তাহলে কী? আর তুই বুড়ী শয়তানী, তোর কপালেও জুটবে! তোরা সবাই ভালোমতো পরখ করে দেখতে পারবি! . . .'

লগিটা এত বড় যে রান্নাঘরে জায়গা হল না। বুড়ো একটা লোহার কড়াই উলটে দিয়ে দড়াম করে সেটা ছুঁড়ে দিল বার বারান্দায়। ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল টেবিলের ধারে।

তার মেজাজটা যে খিচড়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুখে কোন কথা না বলে ফোঁস ফোঁস করে সে খেয়ে চলল। পাছে হেসে ফেলে এই ভয়ে দারিয়া টেবিল থেকে চোখই তুলল না। ইলিনিচ্‌না দীর্ঘশ্বাস ফেলে। প্রায় শুনতেই পাওয়া যায় না এমনি ভাবে ফিসফিস করে বলে, 'হা ভগবান, ভগবান! কী যে আমরা করেছিলাম!' একমাত্র দুনিয়াশ্‌কারই হাসার মতো মনের অবস্থা ছিল না। বুড়ো যখন বাইরে ছিল তখন নাতালিয়া কেমন যেন কষ্ট করে একটু হেসেছিল। কিন্তু এখন আবার সে বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, ভেতরের কোন এক ভাবনায় নিবিষ্ট হয়ে আছে।

'নুনটা দাও এদিকে! বুটি!' বাড়ির লোকজনের ওপর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে এমনি মাঝে মাঝে ভীষণ গলায় গর্জন করে যাচ্ছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

পারিবারিক কলহের পরিসমাপ্তিটা ঘটল আকস্মিক ভাবে। সকলে যখন চুপচাপ এমন সময় মিশাত্‌কা নতুন করে চটিয়ে দিল দাদুকে। ঝগড়া বাধলে ওর ঠাকুমা নানা রকমের যে-সমস্ত অকথ্য কথা বলে দাদুকে গাল পাড়ে সেগুলো সে অনেক বার শুনেছে। দাদু সবাইকে পেটাবে বলে ঠিক করেছে এবং সারা বাড়ি মাথায় করে চেঁচাচ্ছে দেখে ওর শিশুমন বড় উতলা হয়ে পড়ল। নাকের পাটা ফুলিয়ে

হঠাৎ সে রিনরিনে গলায় বলে উঠল, 'ঢের হয়েছে খোঁড়া শয়তান। তোমার মাথায় ডাণ্ডা মারতে হয়। অমন ভয় দেখানো চলবে না আমাকে আর দিদাকে। . . .'

'তুই . . . তুই . . . আমায় বলছিস? . . . তোর দাদুকে . . . অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ,' বুক ফুলিয়ে মিশাত্কা জবাব দেয়।

'তোর আপন দাদুকে এমন কথা বলতে পারলি কী করে?'

'তুমি ওরকম চিল্লোচ্ছ কেন?'

'খুদে শয়তানটার কথা শোন একবার!' দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অবাক হয়ে সকলের ওপর চোখ বুলায়। 'এসব তোর কাজ বুড়ি মাগী। তোর কাছ থেকেই শোনা এ সব কথা। তুই-ই শেখাস!'

'কে শেখাতে যাবে ওকে? হুবহু তোমার মতো আর ওর বাপের মতোই লাগাম ছাড়া হয়েছে!' রেগে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ইলিনিচ্না বলে।

নাতালিয়া উঠে দাঁড়াল, মিশাত্কার গালে চড় কষিয়ে এক ধমক লাগিয়ে দিল।

'দাদুর সঙ্গে অমন করে কথা বলতে হয়! আর যেন না শুনি!'

মিশাত্কা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, গ্রিগোরির কোলে মুখ গুঁজল। এদিকে নাতি-নাতনি-অন্তপ্রাণ পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচও টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। তার দু'চোখ জলে ভরে এলো। দাড়ি বয়ে গড়ান জলের ধারা না মুছেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল, 'গ্রিগোরি! ওরে খোকা! নিকুচি করেছি তোর মায়ের! বুড়ি ঠিক কথাই বলেছে! আমাদের! আমাদের মেলেখভ বংশের রক্ত! . . . রক্তের তেজ যাবে কোথায়! কেউ মুখ বন্ধ করতে পারবে না! . . . ওরে নাতি আমার! সোনা আমার! . . . নে, মার, যা দিয়ে খুশি মার বোকা বুড়োটাকে! টান দাড়ি ধরে!' গ্রিগোরির কোল থেকে মিশাত্কাকে টেনে নিয়ে বুড়ো তাকে মাথার ওপর তুলল।

সকালের জল খাবার শেষ হতে সকলে টেবিল ছেড়ে উঠল। বাড়ির মেয়েরা এঁটো বাসনকোসন ধুতে গেল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা সিগারেট ধরিয়ে গ্রিগোরির দিকে ফিরে বলল, 'তোকে বলাটা অবিশ্যি সাজে না - তুই হলি আমাদের অতিথি - কিন্তু কীই বা করতে পারি? . . . মাড়াই উঠোনের চারধারে বেড়া লাগানো দরকার, বেড়াটা তুলে দিতে একটু হাত লাগাতে হবে। সব ধসে পড়ার মতো অবস্থা। বাইরের লোককে এখন বলে কোন কাজও হবে না। সবারই ত এক অবস্থা।'

গ্রিগোরি এক কথায় রাজি হয়ে যায়। দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত ওরা দু'জনে মিলে উঠোনে কাজ করল, বেড়া ঠিকঠাক করল।

খুঁটির জন্য গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'ঘাস কাটা শুরু হয়ে

গেল বলে। ঘাস কিনব কিনা বুঝতে পারছি না। তুই কী বলিস গেরস্থালির ব্যাপারে? ঝামেলা করাটা ঠিক হবে কি? মাসখানেক পরে যদি লাল ব্যাটারা এসে হানা দেয়? আবার সব চলে যাবে ওই শয়তানগুলোর খপ্পরে?'

'জানি নে বাবা,' অকপটে স্বীকার করে গ্রিগোরি। 'কী যে দাঁড়াবে, কে জিতবে কে হারবে কিছুই জানি নে। এমন ভাবে চালিয়ে যাও যাতে উঠোনে বা গোলায় বাড়তি কিছু পড়ে না থাকে। যা দিনকাল পড়েছে, সবই বেফায়দা। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কথাই ধর না কেন – সারাটা জীবন খেটে মোলো, বিষয় আশয় করল, নিজের বুকের রক্ত জল করল, অন্যদের নিংড়োল - কী রইল শেষ পর্যন্ত? উঠোনের মাঝখানে শুধু গোটা কয়েক পোড়া কাঠের গুঁড়ি!'

'ওরে খোকা আমি নিজেও ত তাই ভাবি,' দীর্ঘশ্বাস চেপে সায় দিয়ে বলে বুড়ো।

ঘর গেরস্থালি নিয়ে আর কোন কথা ওঠালো না। একবার শুধু দুপুরের পরে গ্রিগোরিকে মাড়াই উঠোনের ফটকটা বিশেষ যত্ন নিয়ে লাগানোর চেষ্টা করতে দেখে তিক্ততা না চেপেই বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, 'যেমন পারিস তেমনি কর। অত চেষ্টা করে কী হবে? চিরকাল খাড়া হয়ে থাকার জিনিস ত নয়!'

এই এখনই দেখা যাচ্ছে বুড়ো বুঝতে শুরু করেছে সাবেকী ধরনে জীবনযাত্রা গড়ে তোলার চেষ্টার নিষ্ফলতা।

সূর্য ডোবার আগে আগে গ্রিগোরি কাজ ছেড়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। ভেতরের ঘরে নাতালিয়া একা ছিল। সুন্দর সাজগোজ করেছে নাতালিয়া। উৎসবের সাজে সেজেছে। গাঢ় নীল রঙের পশমী কাপড়ের ঘাগরায়, বুকের কাছে ছুঁচের কাজ করা আর হাতার সামনে লেসলাগানো পপ্‌লিনের নীল জামাটায় ভারী চমৎকার মানিয়েছে ওকে। ওর মুখটা হালকা গোলাপী, এই কিছুক্ষণ আগে সাবান দিয়ে ধোয়ায় সামান্য চকচক করছে। তোরঙ্গের মধ্যে কী যেন খুঁজছিল সে, কিন্তু গ্রিগোরিকে দেখে ডালাটা নামিয়ে দিল, মুচকি হেসে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

গ্রিগোরি তোরঙ্গের ওপর বসে পড়ে বলল, 'একটুখানি বোসো। কালই চলে যাব, আর কথা বলার অবসর মিলবে না।'

নাতালিয়া বিনীত ভাবে বসল ওর পাশে, একটু ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকাল ওর দিকে। কিন্তু গ্রিগোরি ওকে অবাক ক'রে দিয়ে আচমকা ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আদর ক'রে বলল, 'তোমায় কিন্তু বেশ মোলায়েম দেখাচ্ছে। দেখে কে বলবে তোমার অসুখ করেছিল।'

'গায়ে মাংস লেগেছে। . . . আমাদের মেয়েমানুষের প্রাণ হল বেড়ালের প্রাণ,' মাথা নীচু করে লাজুক হাসি হেসে সে বলল।

গ্রিগোরি দেখতে পেল ওর সামান্য কগাছি ফুরফুরে চুলে ঢাকা হাল্‌কা আরক্ত

কানের লতি আর মাথার পেছনে চুলের ফাঁকে ফাঁকে হলদেটে চামড়া।

'চুল উঠে যাচ্ছে?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে।

'প্রায় সব চুল উঠে গেল। কিছু আর রইল না, শিগগিরই টাক পড়ে যাবে।'

'এসো, আমি তোমার মাথা কামিয়ে দিই, এক্ষুনি - কী বল?' হঠাৎ গ্রিগোরি প্রস্তাব করে।

'বল কী!' ভয়ে আঁতকে ওঠে সে। 'কেমন দেখাবে আমায় তাহলে?'

'কামানো দরকার। নয়ত আর চুল গজাবে না।'

'মা বলেছিলেন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেবেন,' বিব্রত হয়ে হেসে বলে নাতালিয়া। গাঢ় করে নীল দেওয়া সাদা ধবধবে একটা ওড়না চটপট মাথায় জড়ায়।

গ্রিগোরির পাশে রয়েছে ও - নাতালিয়া, গ্রিগোরির বৌ, গ্রিগোরির ছেলেমেয়ে মিশাত্‌কা আর পলিউশ্‌কার মা। গ্রিগোরির জন্যই আজ ও সেজেছে, সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছে। অসুখের পর ওর মাথার যে বিশ্রী হাল হয়েছে তা যাতে চোখে না পড়ে সে জন্য ও তাড়াতাড়ি করে ওড়নাটা টেনে দিয়ে মাথা এক পাশে হেলিয়ে বসে থাকে। এমন করুণ, হতশ্রী, তবু যেন কতই না সুন্দর, অন্তর্নিহিত কী যেন এক নির্মল সৌন্দর্যে ভাস্বর। কোন এক সময়কার সেই যে কাটার দাগ ওর ঘাড়টাকে বিকৃত করে দিয়েছিল সেটা লুকানোর জন্য ও সব সময় উঁচু কলারের জামা পরে। এ সবই গ্রিগোরির জন্য। . . . একটা কোমল অনুভূতির প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে গ্রিগোরির হৃদয়। উষ্ণতা আর দরদে ভরা কিছু একটা বলতে চায় ওকে। কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। নীরবে ওকে নিজের কাছে টেনে এনে ওর ফর্সা ঢালু কপালে আর বেদনাবিধুর চোখে চুমু দেয়।

না, এর আগে গ্রিগোরি কখনও ওকে আদর দিয়ে মাথায় তোলে নি। সারা জীবন আক্সিনিয়ার ছায়ায় সে ঢাকা পড়ে ছিল। স্বামীর এই আবেগের প্রকাশে উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ে নাতালিয়া। তার হাতখানা নিয়ে ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে।

মিনিটখানেক ওরা চুপচাপ বসে থাকে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আলোর রেশ ঝরে পড়েছে ঘরের ভেতরে। দেউড়িতে বাচ্চারা হৈ চৈ করে খেলছে। দারিয়া চুল্লীর ভেতর থেকে গরম খাবারের হাঁড়ি নামাচ্ছে। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে গজগজ করে সে শাশুড়ীকে বলছে, 'আপনি কিন্তু গোরুগুলোকে রোজ দোয়াচ্ছেন না। বুড়ী গাইটা যেন আগের চেয়ে কম দুধ দিচ্ছে। . . .'

মাঠ থেকে গোরুর পাল ফিরছে। হাম্বা হাম্বা ডাকছে গোরুগুলো। রাখাল ছেলেরা সপাং সপাং ঘোড়ার লেজের চাবুক আছড়াচ্ছে। গাঁয়ের পাল দেওয়ার ষাঁড়টা থেকে থেকে কর্কশ গলায় গাঁ গাঁ ডাকছে। তার রেশমের মতো নরম

গলকম্বল আর ঢালাই লোহার মতো গড়ানে পিঠটা ডাঁশমাছির কামড়ে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। ষাঁড়টা খেপে গিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, চলতে চলতে অনেকখানি ব্যবধানের বেঁটে বেঁটে শিঙ দিয়ে ঢুঁ মেরে আস্তাখন্দের বেড়াটা উপড়ে ফেলে এগিয়ে গেল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নাতালিয়া বলল, 'ষাঁড়টাও কিন্তু ওদের সঙ্গে দনের ওপারে চলে গিয়েছিল। মা বলছিল, গাঁয়ে যেই গুলিগোলা শুরু হয়ে গেল অমনি ওটাও সোজা গোয়াল ভেঙে দন পার হয়, সারা সময় খাঁড়িতে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।'

গ্রিগোরি চুপচাপ। ভাবনায় ডুবে যায়। নাতালিয়ার চোখদুটো অমন বিষাদমাখা কেন? তাছাড়াও সেখানে আছে গোপন রহস্যময় অধরা এমন একটা কিছু যা এই প্রকাশ পাচ্ছে আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আনন্দের মাঝখানেও ও ছিল বেদনাচ্ছন্ন, কেমন যেন দুর্বোধ্যও। হয়ত বা ভিওশেন্স্কায়ায় আক্সিনিয়ার সঙ্গে গ্রিগোরির দেখা হওয়ার খবর ওর কানে গেছে?

শেষকালে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'অমন মুখ গোমড়া করে আছ কেন আজ বল ত? তোমার মনের ভেতরে কী আছে নাতাশা? বরং খুলেই বল না, অ্যাঁ?'

গ্রিগোরি অপেক্ষা করছিল এই বুঝি চোখের জল দেখতে পাবে, অনুযোগ শুনতে পাবে। কিন্তু নাতালিয়া শঙ্কিত হয়ে উত্তর দিল, 'না, না ও তোমার অমনি মনে হচ্ছে। আমার কিছু হয় নি ত।... অবিশ্যি এখনও পুরোপুরি সেরে উঠি নি আমি। মাথা ঘোরে, ঝুঁকে পড়লে বা নীচু হয়ে কিছু তুলতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখি।'

গ্রিগোরি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। আবার জিজ্ঞেস করে, 'আমি যখন ছিলাম না তখন তোমার ওপরে কোন ঝামেলা হয় নি ত?... কেউ হুজ্জুতি করে নি?'

'না, না ও কী বলছ! আমি যে সারাক্ষণ অসুখ হয়েই পড়ে ছিলাম।' সোজা তাকাল গ্রিগোরির চোখে চোখে, এমন কি একটু হাসলও। খানিক চুপ করে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কি সকাল-সকাল বেরিয়ে যাচ্ছ?'

'ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।'

'আরও একটা দিন থেকে গেলে পারতে না?' একটা অনিশ্চিত ভীরু আশার আভাস ফুটে ওঠে নাতালিয়ার কণ্ঠস্বরে।

কিন্তু গ্রিগোরি মাথা নেড়ে জানাল যে তা সম্ভব নয়। নাতালিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি তাহলে কী করবে এখন?... কাঁধপটিগুলো পরতে হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, তা পরতে হবে।'

'তা হলে জামাটা খোলো, আলো থাকতে থাকতে সেলাই করে দিই।'

অস্ফুট কাতরোক্তি করে গ্রিগোরি গায়ের ফৌজী শার্টটা খুলল। তখনও ঘামে জবজব করছে। কাঁধে আর পিঠে যেখানে যেখানে ফৌজী বেল্টে ঘসা খেয়ে চকচক করছে সেখানে ভিজে দাগ ফুটে উঠেছে গাঢ় হয়ে। নাতালিয়া তোরঙ্গ থেকে রোদে রঙজ্বলা একজোড়া ফৌজী কাঁধপটি বার করল।

'এগুলো নাকি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ এগুলোই। রেখে দিয়েছিলে দেখছি?'

'তোরঙ্গটা আমরা মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম,' ছুঁচে সুতো পরাতে পরাতে অস্পষ্ট ভাবে নাতালিয়া বলে। ধুলোমাখা ফৌজী শার্টটা চুপিচুপি মুখের কাছে নিয়ে আসে, সাগ্রহে শোঁকে নোনতা ঘামের গন্ধ - যে গন্ধ ওর কাছে বড় বেশি আপন। . . .

'ও কী?' গ্রিগোরি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তোমার গন্ধ,' বলতে বলতে চকচকে হয়ে ওঠে নাতালিয়ার দু'চোখ। দু'গালে হঠাৎ যে লাল আভা ফুটে উঠেছিল তা লুকানোর জন্য মাথা নীচু করে ছুঁচসুতো নিয়ে নিপুণ ভাবে কাজে লেগে যায়।

গ্রিগোরি জামাটা গায়ে দেয়, ভুরু কোঁচকায়, কাঁধ ঝাঁকায়।

'তোমায় বেশ দেখায় এগুলো পরলে!' মুগ্ধদৃষ্টি গোপন না রেখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে নাতালিয়া বলে।

কিন্তু গ্রিগোরি আড়চোখে বাঁ কাঁধটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'জীবনে আর কখনও না দেখতে পারলে খুশি হতাম। কিছুই বোঝো না তুমি!'

আরও অনেকক্ষণ ওরা ভেতরের ঘরে তোরঙ্গের ওপর বসে থাকে, হাতে হাত রেখে, চুপচাপ ডুবে থাকে যে যার চিন্তায়।

তারপর যখন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, জুড়িয়ে যাওয়া মাটির ওপর বাড়িঘরের গাঢ় বেগনী রঙের ছায়া ঘন হয়ে এসে পড়ল তখন ওরা রান্নাঘরে গেল রাতের খাবার খেতে।

দেখতে দেখতে রাতটাও কেটে যায়। ভোর হওয়ার আগেই আকাশে ঝলক দিতে শুরু করেছিল লাল আভা। আকাশ যতক্ষণ না ফরসা হয় ততক্ষণ চেরিবাগানে বুলবুলগুলোর কলতান চলেছে। গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারপরও অনেকক্ষণ সে শুয়ে থাকে চোখ বুজে, কান পেতে শুনতে থাকে বুলবুলের মিষ্টি সুরেলা গান। শেষকালে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়, যাতে নাতালিয়ার ঘুম না ভেঙে যায়। জামাকাপড় পরে বেরিয়ে আসে উঠোনে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়াটাকে দানাপানি খাওয়াচ্ছিল। গ্রিগোরিকে

খাতির করে সে বলল, 'তুই যাবার আগে এটাকে একবার চান করিয়ে, ধোয়াপাকলা করে নিয়ে আসব নাকি?'

'কোন দরকার নেই,' ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় জড়সড় হয়ে গ্রিগোরি বলে।

'ভালো ঘুম হয়েছিল ত?' বুড়ো জিজ্ঞেস করে।

'জোর ঘুমিয়েছি। তবে ওই বুলবুলগুলোই জ্বালিয়ে খেয়েছে। ওঃ সারা রাত সে কী চেঁচামেচি!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়ার মুখ থেকে খাবারের থলিটা খুলে নিয়ে হাসল।

'ওদের আর কল্যার কী আছে রে খোকা। মাঝে মাঝে হিংসে হয় ভগবানের জীব এই পাখিগুলোকে দেখে।... ওদের কোন যুদ্ধ বিগ্রহ নেই, সব্বোনাশ কাকে বলে তাও জানে না ওরা।...'

ফটকের কাছে ঘোড়া চালিয়ে এলো প্রোখর। সদ্য দাড়ি গোঁফ কামানো, রোজকার মতোই খুশি মেজাজ, কথাবার্তায় উৎসাহী। টানার দড়িটা একটা লাঙলের গায়ে বেঁধে সে এগিয়ে এলো গ্রিগোরির দিকে। গায়ের মোটা কাপড়ের জামাটা চমৎকার ইস্ত্রি করা, কাঁধে নতুন কাঁধপটি লাগানো।

'আরে, তুমিও কাঁধপটি লাগিয়েছ, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ?' এগিয়ে আসতে আসতে সে চেঁচিয়ে বলল। 'এতদিন পরে থাকার পর আপদগুলোর গতি হল! এখন এই যে পরলাম, শেষ অবধি টিকে যাবে! আমাদের ফৌত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দিব্যি চলবে! আমি বৌকে বললাম, 'ওরে বোকা ওগুলো আর অত মজবুত করে সেলাই করিস নে। একটু ফোঁড় দিয়ে রাখ্‌- হাওয়ায় উড়ে না গেলেই হল - তাতেই বেশ চলে যাবে!' আমাদের অবস্থাটা কী, তুমিই বল? বন্দী হয়ে গেলাম ত ওরা চট্‌ করে ওই চিহ্ন দেখে বুঝে নেবে আমি অফিসার না হলেও একজন সিনিয়র সার্জেন্ট ত বটেই। ওটা দেখলেই ওরা গাল পেড়ে বসবে, 'এই অমুক-তমুক, সেবা করে ত অনেক দূর উঠতে শিখেছিস, এবারে মাথাটা কী করে পেতে দিতে হয় তাও শেখ!' দেখছ, কিসে ঝুলছে আমার এগুলো? হাসতে হাসতে মারা যাবে!'

প্রোখরের কাঁধপটিগুলি বাস্তবিকই সুতো দিয়ে সদ্য সেলাই করা, কোন মতে ঝুলছে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হো-হো করে হেসে ওঠে। ওর সাদা ছোপ ধরা দাড়ির ফাঁকে ঝকঝক করে ওঠে সাদা দাঁতের পাটি, যেখানে ওর বয়সের কোন ছাপ পড়ে নি।

'এই বুঝি সেপাই! তার মানে, বেকায়দা দেখলেই কাঁধপটি খুলে ফেলে দেবে!'

'তা নয়ত ভেবেছ কী?' বাঁকা হেসে প্রোখর বলল।

গ্রিগোরি হেসে তার বাপকে বলল, 'দেখছ ত বাবা, কেমন আর্দালিটি বাগিয়েছি আমি? এ থাকতে বিপদে পড়লেও তলিয়ে যাবার ভয় কখনও নেই!'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী জান গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, ওই যে কথায় বলে না, তুমি আজ মর গে, আমার বাপু কালকের আগে মরার ইচ্ছে নেই,' কৈফিয়তের সুরে কথাগুলো বলে প্রোখর অনায়াসে কাঁধপটিগুলো ছিঁড়ে অবহেলাভরে পকেটে গুঁজে ফেলল। 'ফ্রন্টের কাছাকাছি যখন আসব তখন সেলাই করে নিলেই চলবে।'

গ্রিগোরি তাড়াহুড়ো করে সকালের জলখাবার সেরে নিয়ে বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল।

'স্বর্গের দেবী তোকে রক্ষা করুন,' ছেলেকে চুমু খেয়ে বিচলিত ভাবে ফিসফিস করে বলল ইলিনিচ্না। 'তুই যে আমাদের একমাত্র সম্বল রয়ে গেলি এখন। . . .'

'আচ্ছা, আচ্ছা, দূর যাত্রা মানেই বেশি চোখের জল। এবারে আসি!' কাঁপা কাঁপা গলায় এই বলে গ্রিগোরি এগিয়ে যায় ঘোড়ার দিকে।

শাশুড়ীর কালো ওড়নাটা মাথায় ফেলে ফটকের বাইরে বেরিয়ে আসে নাতালিয়া। বাচ্চারা ওর ঘাগরার খুঁট আঁকড়ে ধরে থাকে। পলিউশ্‌কার কান্না আর থামতে চায় না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদে, কান্নায় তার গলা বুজে আসে। কাকুতি মিনতি করে মাকে বলে, 'ওকে যেতে দিও না! ও মামণি যেতে দিও না! লড়াইয়ে গেলে লোকে মরে যায় যে! ও বাবা, বাবা গো, তুমি যেয়ো না!'

মিশাত্‌কার ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। কিন্তু না, ও কাঁদল না। পুরুষের মতো নিজেকে সামলে রেখেছে। বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'বাজে বকিস নে, বোকা মেয়ে কোথাকার। লড়াইয়ে কি আর সবাই মারা যায়!'

কসাকরা কখনও কাঁদে না, কান্নাটা কসাকদের কাছে ভয়ানক লজ্জার ব্যাপার – ঠাকুর্দার এই কথাগুলো ও বেশ ভালো করে মনে রেখে দিয়েছে। কিন্তু যখন বাবা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসার পর ওকে জিনের ওপর তুলে নিয়ে চুমু খায় তখন অবাক হয়ে দেখে বাবার চোখের পাতা জলে ভিজে উঠেছে। এরপর মিশাত্‌কার পক্ষেও পরীক্ষাটা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ওর চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল ঝরতে থাকে। বাপের বেল্ট জড়ানো জামা পরা বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ও চিৎকার করে বলে ওঠে, 'দাদু যাক না লড়াই করতে। ওকে দিয়ে আমাদের কী হবে? . . . চাই নে . . . তুমি যেয়ো না! . . .'

গ্রিগোরি সাবধানে ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে দিল। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নীরবে ঘোড়া ছেড়ে দিল।

কতবার লড়াইয়ের ঘোড়া বাড়ির দেউড়ির সামনে খুর দাপিয়ে মাটি উড়িয়ে

এক ঝটকায় ঘুরে গিয়ে সদর রাস্তা আর পথঘাটহীন দুর্গম স্তেপভূমির ওপর দিয়ে ওকে বয়ে নিয়ে গেছে রণাঙ্গনে, যেখানে কসাকদের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুর করাল গ্রাস, যেখানে কসাকদের গানের ভাষায়, 'প্রতিদিন প্রতিক্ষণ শোক আর শঙ্কা থাকে বুকে'! কিন্তু আজকের এই স্নিগ্ধ ভোরবেলার মতো আর কখনও গ্রিগোরি এত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তার গ্রাম ছাড়ে নি।

ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের অস্পষ্ট পূর্বাভাস, দম আটকানো উৎকণ্ঠা আর মনোবেদনায় ক্লান্তি এসে যায়। জিনের কাঠামোর ওপর লাগাম ফেলে রেখে পিছন ফিরে না তাকিয়ে সে চলে যায় একেবারে টিলার মাথা অবধি। চৌরাস্তার মোড়ে যেখানে ধূলিধূসরিত পথটা হাওয়া কলের দিকে আলাদা হয়ে চলে গেছে সেখানে আসার পর ও ফিরে তাকাল। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে শুধু নাতালিয়া। ভোরের আগের মুহূর্তের তাজা বাতাস ওর হাত থেকে যেন উড়িয়ে নিতে চাইছে শোকের চিহ্ন সেই কালো ওড়নাখানা।

* * *

হাওয়ায় ফেনিল হয়ে আকাশের নীল পাকদহের গহনে ভেসে ভেসে চলেছে মেঘের রাশি। তরঙ্গিত দিগন্তরেখার ওপর কুয়াশার ক্ষীণ প্রবাহ। এক কদম দু'কদম করে চলেছে ওদের ঘোড়াদুটো। প্রোখর জিনে বসে দোল খেতে খেতে ঝিমুচ্ছে। গ্রিগোরি দাঁতে দাঁত চেপে ঘন ঘন ফিরে তাকাচ্ছে। প্রথমে সে দেখতে পেল বেতবনের সবুজ ঝাড়গুলো, দনের খামখেয়ালী ধরনের আঁকাবাঁকা রুপোলি রেখা আর হাওয়া কলের পাখাগুলোর মন্থর আবর্তন। এর পরে সদর রাস্তাটা সরে গেল দক্ষিণের দিকে। কূলের জলামাঠ, দন আর হাওয়া কলটা আড়াল পড়ে গেল পায়ে-মাড়ানো ফসল ক্ষেতের ওপাশে। গ্রিগোরি শিস দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে থাকে। ঘোড়াটার সোনালি-বাদামি ঘাড়ের ওপর মুক্তাবিন্দুর মতো ছোট ছোট ফোঁটায় ঘাম জমেছে। একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকে সে। এবারে আর পিছন ফিরে তাকায় না। . . . চুলোয় যাক এই যুদ্ধ! চির-এর ধারে লড়াই চলেছিল, দনের পার ধরে চলল। এর পর দামামা বেথে যাবে খোপিওর, মেদ্‌ভেদিৎসা আর বুজুলুকের কূলে কূলে। আর শেষকালে? – গ্রিগোরি মনে মনে ভাবে – দুশমনের বুলেট কোথায় তাকে ধরাশায়ী করবে তাতে তার কীই বা আসে যায়?

নয়

উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া জেলা-সদরে ঢোকার মুখে লড়াই চলেছে। গরমকালের কাঁচা রাস্তা ছেড়ে হেটমান সড়কে উঠতেই গ্রিগোরির কানে গেল কামানের চাপা গর্জন।

সড়কের সর্বত্র লাল ফৌজের ইউনিটগুলোর তাড়াতাড়ি পিছু হটার চিহ্ন চোখে পড়ে। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ফিটনগাড়ি আর দু'চাকার মালগাড়ি। মাত্‌ভেয়েভ্‌কা গ্রাম ছাড়িয়ে একটা চওড়া খাতের মধ্যে পড়ে ছিল একখানা কামান। গোলায় তার চাকার ডাণ্ডাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কামানের নলের মাচাটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। কামানটানা গাড়ির সামনের জোয়ালে বাঁধা ফিতেগুলো তেরছা করে কুপিয়ে কাটা। খাতের সিকি ক্রোশখানেক দূরে নোনা জলের বিলে, রোদে ঝলসানো অবাড়ন্ত ঘাসের ওপর গাদা মেরে পড়ে আছে সেপাইদের লাশ। তাদের পরনে ফৌজী জামা আর প্যান্ট, পায়ে পটি আর ভারী লোহার নাল লাগানো জুতো। এরা সব লাল ফৌজের সেপাই, কসাক ঘোড়সওয়ারদের হাতে পড়ে তলোয়ারে কাটা পড়েছিল।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওদের কোঁচকানো জামায় প্রচুর পরিমাণে চাপ চাপ শুকনো রক্ত আর লাশগুলো পড়ে থাকার ধরন দেখে গ্রিগোরি অনায়াসেই সেটা আঁচ করতে পারল। কাটা ঘাসের মতো ওরা পড়ে আছে। কসাকেরা ওদের জামাকাপড় খুলে নেওয়ার অবকাশ পায় নি - হয়ত পিছু ধাওয়া করা তখনও পুরোদমে চলছিল বলেই।

একটা কাঁটাঝোপের পাশে মাথা পেছনে হেলিয়ে মরে পড়ে ছিল এক কসাক। তার পাদুটো অনেকখানি ছড়ানো, প্যান্টের দু'পাশের লাল ডোরা টকটক করছে। কিছু দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে হালকা পাটকিলে রঙের একটা মরা ঘোড়া। পিঠে পুরনো ঝরঝরে জিন বাঁধা। জিনের কাঠামোটা গেরিমাটির রঙ করা।

গ্রিগোরির আর প্রোখরের ঘোড়াদুটো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের দানাপানি দেওয়া দরকার। কিন্তু যেখানে এই দিন কয়েক আগে লড়াই হয়ে গেছে এমন একটা জায়গায় থামার ইচ্ছে গ্রিগোরির ছিল না। আরও আধ ক্রোশখানেক এগিয়ে একটা গিরিখাতের মধ্যে ঢুকে সেখানে ঘোড়া থামাল। খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পুকুর, বাঁধটার একেবারে গোড়া অবধি জলে ধুয়ে গেছে। পুকুরের কিনারার চড়চড়ে শুকনো ফাটল ধরা মাটির কাছে প্রায় চলে গিয়েছিল প্রোখর। কিন্তু আচমকা সে পিছু হটে এলো।

'কী ব্যাপার?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'নিজে গিয়েই দ্যাখ না।'

'গ্রিগোরি বাঁধের দিকে ঘোড়া চালিয়ে গেল। এসা জায়গাটাতে পড়ে আছে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। নীল ঘাগরার ঘের দিয়ে তার মুখটা ঢাকা। রোদে পোড়া পায়ের ডিম আর হাঁটুর ওপরে টোল খাওয়া পুরুষ্ট ফরসা পাদুটো লজ্জাশরমের কোন বালাই না রেখে বীভৎস ভাবে ফাঁক হয়ে আছে। বাঁ হাতখানা পিঠের নীচে দোমড়ানো।

গ্রিগোরি তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে মাথার টুপি খুলল। নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে মরা মেয়েমানুষটির ঘাগরা ঠিক করে দিল। রোদে পোড়া তামাটে কচি মুখখানা, মৃত্যুর পরেও সুন্দর দেখাচ্ছে। ব্যথায় কোঁচকানো ভ্রধনুর নীচে সামান্য ঝিলমিল করছে আধবোজা চোখদুটো। কোমল রেখা আঁকা মুখের ফাঁকে শক্ত ক'রে চেপে থাকা দাঁতের সারি মুক্তোর মতো ঝিলিক দিচ্ছে। ঘাসের ওপর চাপা গালে এসে পড়েছে চূর্ণকুন্তল। আর সেই গালটাতে, যেখানে ইতিমধ্যেই মৃত্যুর জাফরান হলুদ পাণ্ডুর ছায়া এসে পড়েছে, আনাগোনা করছে ব্যস্তসমস্ত পিঁপড়ের দল।

'আহা কী রূপের ডালি! একে কিনা শেষ করে দিল শালা শুয়োরের বাচ্চারা!' অর্ধস্ফুট স্বরে প্রোখর বলল।

মিনিটখানেক সে চুপ করে থাকে। পরে ভীষণ বিরক্ত হয়ে থুতু ফেলে।

'আমি . . . আমি হলে এই বুদ্ধির জাহাজগুলোকে দেয়ালের ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারতাম! চল, এখান থেকে চলে যাই। ভগবানের দোহাই! আমি ওর দিকে তাকাতে পারছি নে। আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় ক'রে উঠছে।'

'ওকে কবর দিলে হয় না?' গ্রিগোরি বলে।

'আমরা রাজ্যের যত মড়া কবর দেবার ঠিকে নিয়েছি নাকি?' প্রোখর রুষ্ট হয়ে বলে। 'ইয়াগোদ্‌নয়েতে এক বুড়োকে গোর দিয়ে এলাম, এখন এই মেয়েমানুষটাকে . . . এদের সবাইকে কবর দিতে শুরু করলে ত হাতে কড়া পড়ে যাবে। তাছাড়া কবর খুঁড়বই বা কী দিয়ে? তলোয়ার দিয়ে ত আর খোঁড়া যায় না ভাই! গরমে মাটি হাত দেড়েক নীচে অবধি পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে!'

প্রোখর যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তাড়াতাড়িতে বুটের ডগা রেকাবে গলাতে ওর বেগ পেতে হল।

আবার ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে টিবির ওপর গিয়ে ওঠে। এই সময় প্রোখর একাগ্র ভাবে কী যেন ভাবতে ভাবতে গ্রিগোরিকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, পান্তেলেয়েভিচ, আমরা কি রক্ত বইয়ে পৃথিবীর মাটি কম ভিজিয়েছি?'

'তা অনেকই ভিজিয়েছি বলতে পার।'

'তোমার কি মনে হয়, শিগ্‌গির এর শেষ হবে?'

'আমাদের যখন সাবাড় করে দেবে তখনই শেষ হবে। . . .'

'আহা কী সুখের জীবনই শুরু হল! এতে শয়তানেরই সুখ! যত তাড়াতাড়ি সাবাড় করে দেয় ততই মঙ্গল। জার্মান যুদ্ধের আমলে এমন হয়েছে যে লোকে নিজের আঙুল গুলি ক'রে উড়িয়ে দিয়ে দিব্যি লড়াই থেকে ছুটি পেয়েছে। কিন্তু এখন, গোটা হাতখানা উড়িয়ে দাও না তবু তোমাকে দিয়ে জোর করে কাজ করাবে। নুলো, খোঁড়া, ট্যারা সবাইকে নিচ্ছে। যাদের একশিরা রোগ আছে তাদের নিচ্ছে। দু'পায়ে খাড়া থাকতে পারলেই হল। এই ভাবে কি লড়াই কখনও শেষ হবে? জাহান্নামে যাক ব্যাটারা সব!' হতাশ হয়ে প্রোখর বলে। রাস্তা থেকে একপাশে ঘুরে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামে সে। নীচু গলায় কী যেন বিড়বিড় করতে করতে ঘোড়ার জিনের কষি আলগা করতে থাকে।

* * *

উস্ত্-মেদ্‌ভেদংস্কায়ার কাছাকাছি খোভানস্কি গ্রাম। গ্রিগোরি রাত্রে এসে হাজির হল সেখানে। গ্রামের সীমানায় তিন নম্বর রেজিমেন্টের পাহারাদারদের ঘাঁটি প্রথম আটকে দিয়েছিল তাকে। কিন্তু গলার আওয়াজে তাদের ডিভিশন-কম্যাণ্ডারকে চিনতে পারল। গ্রিগোরির প্রশ্নের উত্তরে কসাকরা জানাল যে ডিভিশনের সদর ঘাঁটি এই গ্রামেই রয়েছে আর ওদের ওপরওয়ালা লেফ্‌টেনাণ্ট কপিলোভ অধীর হয়ে ওর পথ চেয়ে বসে আছে। পাহারাদারদলের আলাপপ্রিয় জমাদারটি গ্রিগোরির সঙ্গে একজন কসাককে দিল ওকে সদর ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবার জন্য। শেষকালে বলল, 'জোর খুঁটি গেড়ে বসেছে ওরা, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। শিগ্‌গির আমরা উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়ায় ঢুকতে পারব বলে ত মনে হয় না। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত কী হবে কে-ই বা বলতে পারে। . . . আমাদেরও শক্তি যথেষ্টই আছে। শোনা যাচ্ছে মরোজোভ্‌স্কায়া থেকে ইংরেজদের ফৌজও নাকি আসছে। আপনি শুনেছেন সে রকম কিছু?'

'না,' ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিতে দিতে গ্রিগোরি জবাব দিল।

সেনাপতিমণ্ডলী যে বাড়িতে ছিল তার জানলার খড়খড়িগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে আঁটা। গ্রিগোরি প্রথম ভেবেছিল বাড়িতে বোধ হয় কেউ নেই। কিন্তু গলি-বারান্দায় ঢুকতে শুনতে পেল চাপা গলায় উত্তেজিত কথাবার্তা। রাতের অন্ধকারের পর ভেতরের বড় ঘরটার মধ্যে ঢুকে ছাদ থেকে ঝোলানো বিরাট বাতির আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় গ্রিগোরির। ভক করে নাকে এসে লাগে তামাকের ধোঁয়ার ঘন, ঝাঁঝাল গন্ধ।

'শেষকালে এলে তাহলে তুমি!' টেবিলের মাথার ওপরে তামাকের নীলচে

ধোঁয়ার যে-কুণ্ডলী উঠছিল তাই ঠেলে কোথা থেকে যেন ভেসে উঠে উল্লসিত হয়ে কপিলোভ বলল। 'তোমার আশায় থেকে থেকে হালই ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভাই!'

গ্রিগোরি উপস্থিত সবাইকে নমস্কার জানাল। টুপি আর গ্রেটকোট খুলে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

'ইশ্‌ ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার করে ফেলেছ যে! নিশ্বাস নেবার উপায় রাখ নি। অমন আটকপাটি মেরে বসে আছ কেন? অন্তত একটা ত খোল!' ভুরু কুঁচকে সে বলল।

কপিলোভের পাশে বসে ছিল খার্লাম্পি ইয়ের্মাকোভ। মৃদু হাসল সে।

'ও আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে, এখন টেরই পাই নে,' এই বলে কনুই দিয়ে একটা শার্সি ঠেলে জোর করে খড়খড়ি তুলে দিল।

ঘরের ভেতরে রাতের এক ঝলক তাজা হাওয়া এসে ঢুকল। বাতির শিখাটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

'বাঃ খাশা ব্যবস্থা বটে তোমার! জানলার কাচটা ভাঙলে কী বলে, শুনি?' দু'হাতে টেবিল হাতড়াতে হাতড়াতে বিরক্ত হয়ে কপিলোভ বলল। 'কার কাছে দেশলাই আছে? সাবধান, ম্যাপের কাছেই কালির দোয়াত আছে।'

বাতি জ্বালানো হল। জানলার পাল্লার ফুটোটা বন্ধ করে দেওয়ার পর কপিলোভ তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করল, 'ফ্রন্টের অবস্থাটা, কমরেড মেলেখভ, আপাতত, আজ যা আছে সেটা এই রকম: লালেরা তিন দিক থেকে প্রায় চার হাজার সঙীনধারী সেপাইয়ের আড়াল দিয়ে উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া আটকে রেখেছে। ওদের যথেষ্ট পরিমাণ কামান আর মেশিনগান আছে। মঠের কাছে, সেই সঙ্গে আরও বেশ কিছু জায়গায় ওরা ট্রেঞ্চ খুঁড়েছে। দন পারের উঁচু জমি ওদের দখলে। অবশ্য এই নয় যে ওদের ঘাঁটিকে একেবারে কায়দাই করা যায় না। তবে দখল করা বেশ কঠিন সে কথা মানতেই হবে। আমাদের তরফে, জেনারেল ফিট্‌জহেলাউরভের ডিভিশন আর অফিসারদের দুটো ঝটিকা বাহিনী, বগাতিরিওভের পুরো ছয় নম্বর ডিভিশন এসে পড়েছে, আর আছে আমাদের এক নম্বর ডিভিশন। তবে আমাদের ডিভিশনটা পুরো নেই - পায়দল রেজিমেন্টের পাত্তা নেই, এখনও উস্ত্‌-খোপিওরস্কায়ার কাছাকাছি কোথাও আছে। ঘোড়সওয়াররা সব এখানে এসে পড়লেও স্কোয়াড্রনে লোকবল পুরো আছে এমন কথা আদৌ বলা চলে না।'

দু'নম্বর রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার জুনিয়র কর্ণেট দুদারেভ বলল, 'এই ধর না কেন, আমার রেজিমেন্টের তিন নম্বর স্কোয়াড্রনে মাত্র আটত্রিশ জন কসাক আছে।'

'ছিল কতজন?' ইয়ের্মাকোভ জানতে চাইল।

'একানব্বই।'

'স্কোয়াড্রন অমন ভাবে ভাঙতে দিতে গেলে কী বলে? কিসের কম্যাণ্ডার তুমি?' টেবিলে আঙুল বাজিয়ে ভুরু কুঁচকে গ্রিগোরি বলল।

'কার সাধ্যি ধরে রাখে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে আমরা যখন আসছিলাম তখন ওরা সব এদিক ওদিক সটকে পড়ল, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করবে বলে। তবে ওরা আস্তে আস্তে এসে জুটছে। এই ত আজই তিনজন এসে পড়েছে।'

কপিলোভ ম্যাপটা ঠেলে দেয় গ্রিগোরির দিকে, কড়ে আঙুল দিয়ে বিভিন্ন ইউনিটের অবস্থান দেখায়। তারপর আবার বলতে থাকে।

'আমরা এখনও আক্রমণে নামতে পারি নি। গতকাল শুধু আমাদের দু'নম্বর রেজিমেন্টটা পায়ে হেঁটে হামলা করেছিল এই যে এই এলাকায়। তবে কোন সুবিধে করতে পারে নি।'

'ক্ষয়ক্ষতি কি খুব বেশি?'

'রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডারের রিপোর্ট অনুযায়ী গতকাল মরা এবং জখম মিলিয়ে ছাব্বিশজন লোক খোয়া গেছে তার। আচ্ছা এবারে দু'পক্ষের ফৌজের অবস্থাটা তুলনা করে দেখা যাক। সংখ্যার দিক থেকে আমরা বেশি আছি। কিন্তু পায়দল সেপাইদের আক্রমণে মদত দেবার মতো যথেষ্ট মেশিনগান আমাদের নেই, গুলিগোলার অবস্থাও ভালো নয়। ওদের রসদ-সরবরাহ-কর্তা কথা দিয়েছে যে হাতে এলেই চার শ' গোলা আর দেড় লাখ কার্তুজ আমাদের দেবে। কিন্তু সে ত সেই যখন হাতে পাবে! এদিকে হামলায় নামতে হবে কালই – জেনারেল ফিট্জহেলাউরভের হুকুম। উনি চান ঝটিকা বাহিনীকে মদত দেবার জন্য আমরা যেন একটা রেজিমেণ্ট লাগাই। কাল ওরা চারবার হামলা করেছে। তাতে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। ছিনে জোঁকের মতো লেগে থেকে লড়াই করেছে! যাই হোক, এখন ফিট্জহেলাউরভ বলছেন ডান দিকের ব্যূহ জোরদার করে আক্রমণের মূল জায়গাটা এই এখানে সরিয়ে আনতে – দেখতে পাচ্ছ? এখানকার জায়গাটা এমন যে শত্রুপক্ষের পরিখার দু'শ' আড়াইশ' গজের মধ্যে এসে পড়া যায়। হ্যাঁ ভালো কথা, তাঁর এড্জুটেণ্ট এইমাত্র চলে গেল। তোমাকে আর আমাকে মুখে এই নির্দেশ জানাতে এসেছিল যে কাল ভোর ছয়টা নাগাদ আমরা যেন দপ্তরে যাই। সেখানে আমাদের সকলের মধ্যে যোগাযোগ করে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হবে। জেনারেল ফিট্জহেলাউরভ আর তার ডিভিশনের কর্তারা এখন বলশয় সেনিন গ্রামে আছেন। মোট কথা আমাদের কাজ হল সেব্রিয়াকোভো স্টেশন থেকে নতুন সৈন্যসমাবেশ ঘটার আগেই এই মুহূর্তে শত্রুকে ঘায়েল করা। দনের ওপারে আমাদের ফৌজের তেমন কোন নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে না।... চার নম্বর ডিভিশন খোপিওর পার হয়েছে। কিন্তু লাল ফৌজীরা তাদের ঘাঁটি আগলানোর

জোর ব্যবস্থা ক'রে রেললাইনের দিককার রাস্তাগুলো প্রাণপণে আটকে রেখেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তারা দনের ওপরে একটা ভেলার পুল বানিয়ে ফেলে যত তাড়াতাড়ি পারে উস্ত্‌-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া থেকে যুদ্ধের সরঞ্জাম আর মালপত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

'কসাকরা বলে বেড়াচ্ছে মিত্রপক্ষ নাকি আসছে। সত্যি নাকি?'

'গুজব শোনা যাচ্ছে যে চের্নিশেভ্‌স্কায়া থেকে নাকি কিছু ব্রিটিশ ব্যাটারী আর ট্যাঙ্ক আসছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এসব ট্যাঙ্ক ওরা দন পার করবে কী করে? আমার মতে ট্যাঙ্কের ব্যাপারটা একদম বাজে কথা! অনেক দিন হলই চলছে এরকম গালগল্প।'

ঘরের ভেতরে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো।

কপিলোভ উঁচু কলারওয়ালা বাদামী রঙের অফিসার-উর্দির বোতাম খুলে খোঁচা খোঁচা কটা দাড়িতে ছাওয়া ফুলো ফুলো গাল হাতের তেলোয় ঠেকিয়ে বসে থাকে, নিভে যাওয়া সিগারেটটা অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ ধরে চুষতে থাকে। নাকের দু'পাশে অনেকখানি ব্যবধান জুড়ে ওর গোল গোল কালো চোখদুটো ক্লান্তিতে আধবোজা, একটানা রাত জাগায় দুমড়ে গেছে ওর সুন্দর মুখটা।

এক সময় সে গ্রামের এক গির্জার স্কুলে মাস্টারী করত, রবিবার-রবিবার জেলার ব্যবসাদারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত, তাদের বাড়ির বৌদের সঙ্গে রঙ মেলান্তি খেলত, পুরুষদের সঙ্গে অল্পস্বল্প বাজি রেখে তিন তাসের খেলা খেলত। চমৎকার গিটার বাজাতে পারত। বেশ আমুদে আর মিশুক যুবক ছিল। তারপর বিয়ে করল এক অল্পবয়সী স্কুল-দিদিমণিকে। এই ভাবেই হয়ত পেনশন পাওয়া অবধি চাকরী করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিত জেলা-সদরে। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় ওর ডাক পড়ল মিলিটারীতে। ক্যাডেট ট্রেনিং স্কুল শেষ করার পর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পশ্চিম ফ্রন্টে, একটা কসাক-রেজিমেন্টে। ওর গোলগাল বেঁটেখাটো চেহারা, ভালোমানুষ গোছের মুখখানা, তলোয়ার ঝোলানোর কায়দা আর অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তার ধরনের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা একান্ত অসামরিক, একেবারেই নির্দোষ। ওর গলায় হুকুমের চড়া সুর থাকে না, সামরিক লোকের সচরাচর যে রকম নীরস আর স্বল্পবাক হয় ওর কথাবার্তায় তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অফিসারের উর্দি ওর গায়ে চটের থলির মতো দেখায়। ফ্রন্টে তিনটে বছর কাটিয়ে মিলিটারী মেজাজ আর চালচলন আয়ত্ত করা ওর আর হয়ে উঠল না। যুদ্ধে সে যেন এক মূর্তিমান উটকো লোক। একজন খাঁটি অফিসারের চেয়ে বরং অফিসারের পোশাকপরা স্থূলকায় এক শহুরে বাবুর সঙ্গে ওর বেশি মিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কসাকরা ওকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত, সেনাপতিমণ্ডলীর বৈঠকে ওর বক্তব্য মন দিয়ে শুনত। ওর বিচারবুদ্ধি সুস্থ, স্বভাব

নরম। যুদ্ধে লোক-দেখানো নয় – একাধিকবার সত্যিকারের সাহস সে দেখিয়েছে। এই সব কারণে বিদ্রোহী ফৌজের সেনাপতিমণ্ডলীতে ওর যথেষ্ট খাতির ছিল।

কপিলোভের আগে গ্রিগোরির সদর দপ্তরের কর্তা ছিল ক্রুজিলিন নামে একজন বুদ্ধিসুদ্ধিহীন অশিক্ষিত কশেট। চির্-এর কাছে এক লড়াইয়ে সে মারা যায়। তখন কপিলোভ সদর দপ্তরের ভার নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায়, হিসাব করে, বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ সামাল দেয়। এক সময় যে ভাবে ছাত্রদের খাতা সংশোধন করত সেই ভাবেই ধৈর্য ধরে দপ্তরে বসে মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অভিযানের পরিকল্পনা তৈরি করত। আবার দরকার পড়লে গ্রিগোরির মুখের এক কথায় দপ্তরের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে কোন রেজিমেন্টের ভার নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

সদর দপ্তরের নতুন কর্তাকে গ্রিগোরি গোড়ার দিকে খুব একটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু দু'মাসের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতে পারল তাকে। এক দিন ত লড়াইয়ের পর তাকে সরাসরি বলেই ফেলল, 'তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা বড় খারাপ ছিল, কপিলোভ। এখন দেখছি ভুল করেছিলাম। তাই বলি কি, আমায় যা হোক করে ক্ষমা করে দিও।' কপিলোভ হাসল। কোন জবাব দিল না। তবে একটু স্থূল ধরনের এই স্বীকৃতিতে মনে মনে যেন খুশিই হল।

কোন রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা কপিলোভের ছিল না, কোন দৃঢ় রাজনৈতিক মতামতও সে পোষণ করত না। যুদ্ধ ওর কাছে ছিল একটা অনিবার্য পাপ, তাই তা শেষ হওয়ার আশাও সে করত না। এখনও সে কিন্তু উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া দখল করার লড়াইটা কী ভাবে জোরদার হতে পারে তা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছে না। ওর মনে পড়ছে নিজের দেশ গাঁয়ের কথা, বাড়ির লোকের কথা। মনে মনে ভাবছে মাস দেড়েকের ছুটি নিয়ে একবার বাড়ি ঘুরে এলে মন্দ হত না।...

গ্রিগোরি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কপিলোভের দিকে। শেষকালে উঠে পড়ে।

'আচ্ছা আতামান ফৌজের সেপাই ভাইসব, এবারে যে যার আস্তানায় ফিরে গিয়ে ঘুমানো যাক। উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া কী ভাবে দখল করা যায় এখানে বসে বসে সেই নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না। এখন জেনারেলরাই আমাদের হয়ে ভাবনা চিন্তা করবেন, সিদ্ধান্ত নেবেন। কাল আমরা ফিট্‌জহেলাউরভের কাছে যাচ্ছি। আমাদের এই অভাজনদের হয়ত কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি খাতলে দেবেন।... আর দু'নম্বর রেজিমেন্ট সম্পর্কে আমার নিজের মত হল এই যে এখনও আমাদের হাতে যা ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার বলে এখনই রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার দুদারেভকে নীচের পদে নামিয়ে দেওয়া উচিত। ওর সমস্ত মেডেল আর পদমর্যাদার চিহ্ন কেড়ে নিতে হয়।...'

'সেই সঙ্গে ওর খিচুড়ির ভাগটাও,' ইয়েমাকোভ যোগ করল।

'না, না, ঠাট্টা নয়,' গ্রিগোরি বলে চলল। 'এখনই ওকে স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডারের পদে নামিয়ে দিতে হয় আর রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার করে পাঠাতে হয় খার্লাম্পিকে। এই মুহূর্তে চলে যাও, ইয়েমাকোভ, ওখানে গিয়ে রেজিমেণ্টের ভার নিয়ে কাল সকালে অপেক্ষা কর আমাদের হুকুমের। দুদারেভকে সরানোর হুকুমনামাটা কপিলোভ এখনই লিখে দিচ্ছে। সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি দেখতে পাচ্ছি দুদারেভের দ্বারা কোন কাজ হবে না। লোকটার মাথায় কিছু নেই। আবার একটা গাড্ডায় মধ্যে নিয়ে না ফেলে কসাকদের। পায়দল সেপাই নিয়ে লড়াই করা – সে যে কী জিনিস ... কম্যাণ্ডার গণ্ডমূর্খ হলে লোকক্ষয় যে হবে তাতে আর বিচিত্র কি!'

'ঠিক কথা। আমিও দুদারেভকে বদল করার পক্ষে,' সমর্থন করল কপিলোভ।

ইয়েমাকোভের মুখে কেমন যেন একটা অসন্তোষের ভাব লক্ষ করে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার ইয়েমাকোভ, তোমার অমত আছে যেন মনে হচ্ছে?'

'না ত, মোটেই না। আমার কি একটু ভুরু ওঁচানোও চলবে না?'

'তা হলে ত কথাই নেই। ইয়েমাকোভের অমত নেই। ওর ঘোড়সওয়ার-রেজিমেণ্টের ভার আপাতত নেবে রিয়াব্‌চিকভ। তাহলে মিখাইল গ্রিগোরিচ* মশাই, হুকুমটা লিখে ফেল, তারপর শুতে যাও। ভোর অবধি ঘুমোও গে। ছ'টার সময় খাড়া থাকতে হবে কিন্তু। ওই জেনারেলের কাছে যাব। সঙ্গে চারজন আর্দালি নেব।'

কপিলোভ আশ্চর্য হয়ে ভুরু ওঁচায়।

'অতজন কেন?'

'লোক-দেখানোর জন্যে! আমরা কেউ চুনোপুঁটি নই। ডিভিশন-কম্যাণ্ডার বলে কথা!' গ্রিগোরি মৃদু হেসে গ্রেটকোটটা কাঁধের ওপর ফেলে বোতাম না লাগিয়েই দরজার দিকে এগোয়।

জুতো আর গায়ের গ্রেটকোট না খুলেই ঘোড়ার গা-ঢাকা চাদর বিছিয়ে চালার ছাঁচের তলায় শুয়ে পড়ল গ্রিগোরি। উঠোনে আর্দালিদের কথাবার্তার আওয়াজ অনেকক্ষণ শোনা গেল। কোথায় যেন ঘোড়াগুলো নাক দিয়ে আওয়াজ করছে, সমান তালে খাবার চিবিয়ে চলেছে। শুকনো ঘুঁটে আর দিনের তাপের পর এখনও জুড়িয়ে না আসা মাটির গন্ধে বাতাস ছেয়ে গেছে। তন্দ্রার মধ্যে গ্রিগোরির কানে আসে আর্দালিদের কণ্ঠস্বর, তাদের হাসির আওয়াজ। শুনতে পায়

* কপিলোভের পুরো নাম। – অনুঃ

ওদের একজন – গলার আওয়াজ শুনে অল্পবয়সী কোন ছোকরা বলেই মনে হয় – ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে চাপাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে, 'আর বোলো না ভাই, ঘেন্না ধরে গেল। রাত-বিরেত বলে কথা নেই – এখন যাও, এই চিঠিটা নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। ... এই এই স্থির হয়ে দাঁড়া বলছি শয়তান। পা'টা দেখি, দেখি বলছি পা'টা।'

আরেকজনের গলাটা ভারী, সর্দিতে বসে গেছে। চাপা গলায় সে একটা গানের কলি ভাঁজে: 'সেপাইগিরি করে করে ঘেন্না ধরে গেল। ভালো ভালো ঘোড়া যত নষ্ট হয়ে গেল। ...' এরপরই ওর গলায় ফুটে ওঠে মিনতির সুর, তাড়াতাড়ি চলে আসে কাজের কথায়: 'ওরে ভাই প্রোশ্‌কা, সিগারেট খাব, এক চিমটে তামাক ছাড় না! ওঃ কী কেপ্পন রে তুই! বেলাভিনে রেড আর্মির এক জোড়া বুট দিয়েছিলাম তোকে, সে কথা ভুলে গেলি? হারামী তুই! আর কেউ হলে অমন বুটের জন্যে চিরকাল মনে রাখত, তোর কাছ থেকে কিনা সিগারেটের জন্যে একটু তামাকও বার করা যায় না!'

ঘোড়ার দাঁতের ফাঁকে ঝনঝন ঠনঠন আওয়াজ তুলছে কড়িয়াল। ঘোড়াটা ভেতরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গম্ভীর নিশ্বাস ছাড়ল, তারপর শুকনো শক্ত মাটির ওপর নালের শুকনো খটখট আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলল।

'সবাই ওরা বলে ... সেপাইগিরি করে করে ঘেন্না ধরে গেল,' মনে মনে কথাগুলো আওড়াতে আওড়াতে গ্রিগোরি হাসে। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমানোর সঙ্গে সঙ্গে সে একটা স্বপ্ন দেখে – স্বপ্নটা এর আগেও দেখেছে। ধূসর বাদামী রঙের কাটা ক্ষেত। উঁচু উঁচু নাড়ার ওপর দিয়ে চলেছে সারি সারি লাল সেপাই। যত দূর চোখ যায় তত দূর অবধি ছড়িয়ে রয়েছে সামনের সারিটা। তার পেছনে আরও ছয়-সাতটা সারি। একটা দম আটকানো স্তব্ধতার মধ্যে এগিয়ে আসছে আক্রমণকারীরা। কালো মূর্তিগুলো ক্রমেই বেড়ে উঠছে, আকারে বড় হয়ে উঠছে। এবারে গ্রিগোরি দেখতে পায় হোঁচট খেতে খেতে দ্রুত পায়ে ওরা এগিয়ে আসছে। আসছে ত আসছেই। শেষকালে পাল্লার দূরত্বে এসে পড়তে এখন ছুটছে রাইফেল তাক করে। ওদের মাথায় কান-ঢাকা টুপি। মুখ হাঁ করে আছে ওরা। গ্রিগোরি শুয়ে আছে একটা অগভীর পরিখার মধ্যে, উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে রাইফেলের ঘোড়া টিপে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ে চলেছে। ওর গুলিতে লাল ফৌজীরা উলটে মাটিতে পড়ে যায়। ঘরার মধ্যে নতুন করে কার্তুজের ক্লিপ ভরতে ভরতে মুহূর্তের জন্য এপাশে ওপাশে ঘাড় ফিরিয়ে গ্রিগোরি দেখতে পায় আশেপাশের পরিখাগুলো ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে কসাকরা। তারা পাশে মোড় নিয়ে চোঁচা ছুটছে। ভয়ে আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে ওদের মুখ। গ্রিগোরি

শুনতে পাচ্ছে ওর নিজের বুকের ভেতরে ভয়ানক টিপটিপ আওয়াজ। ও চেঁচিয়ে বলছে, 'গুলি কর! শালা শুয়োরের বাচ্চারা, কোথায় যাচ্ছ? থামো! পালিও না বলছি! . . .' ও প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ওর গলার স্বর আশ্চর্য রকম দুর্বল, প্রায় শোনাই যায় না। ভয়ে গা ছমছম ক'রে ওঠে। সেও লাফিয়ে ওঠে – একজন রোদে পোড়া তামাটে রঙের, বয়স্কগোছের লাল ফৌজীকে নিঃশব্দে সোজা ওর দিকে ধেয়ে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে থেকেই গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু দ্যাখে তাক ফসকে গেছে। লাল ফৌজীর মুখখানা গম্ভীর, উত্তেজনায় থমথম করছে, ভয়ের চিহ্ন নেই সে মুখে। লোকটা দৌড়ুচ্ছে হাল্কা পায়ে। পাদুটো প্রায় মাটিতে পড়ছেই না। তার ভুরুজোড়া ওপরে কোঁচকানো, টুপিটা চলে গেছে মাথার পেছনে, গায়ের গ্রেটকোটের কিনারা গুটিয়ে গেছে। নিমেষের জন্য গ্রিগোরি তাকায় এগিয়ে আসা দুশমনের দিকে, খুঁটিয়ে দেখে লোকটাকে। দেখতে পায় ওর চকচকে চোখজোড়া, খোঁচা খোঁচা কাঁচা কোঁকড়ানো দাড়িভরা ফেকাসে গাল, ওর বুটের ওপরকার খাটো চওড়া খোল। রাইফেলটা সামান্য নামানো, নলের হাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, ছোটার তালে তালে নলের মাথার ওপর দুলছে সঙীনের কালো ধারাল ফলাটা। একটা দুর্বোধ্য আতঙ্ক ছেয়ে ফেলে গ্রিগোরিকে। রাইফেলের ছিটকিনি ধরে টানে, কিন্তু ছিটকিনি কিছুতেই নড়তে চায় না। কোথায় যেন আটকে গেছে। গ্রিগোরি মরিয়া হয়ে হাঁটুতে ছিটকিনি ঠোকে – কোন ফল হয় না। এদিকে লাল ফৌজীটি ওর মাত্র পাঁচ পাখানেক দূরে। গ্রিগোরি ঘুরে দৌড়াতে শুরু করে। ওর সামনে ধূসর বাদামী রঙের ন্যাড়া মাঠখানা আগাগোড়া ছেয়ে গেছে কসাকদের ভিড়ে – দলে দলে পালাচ্ছে তারা। গ্রিগোরি পিছনে শুনতে পায় পিছু ধাওয়া করা লোকটার ভারী নিঃশ্বাস আর বুটের খটখট আওয়াজ। কিন্তু ছোটার গতি আর বাড়াতে পারে না। পাদুটো যেন দুর্বল হয়ে জড়িয়ে আসছে, প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হচ্ছে আরও জোরে ছোটার জন্য জোর খাটাতে। অবশেষে সে এসে পৌঁছায় কোন্ এক বিধ্বস্তপ্রায় অন্ধকার কবরখানায়। ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। ধসে পড়া কবর, হেলেপড়া ক্রস আর ছোট ছোট সমাধিমন্দিরগুলোর মাঝখান দিয়ে ছুটতে থাকে। আর একটুখানি চেষ্টা করলেই ও বেঁচে যায়। কিন্তু ওর পেছনের পায়ের শব্দটা যেন আরও বেড়ে উঠছে, আরও জোরাল হয়ে উঠছে আওয়াজটা। পিছু ধাওয়া করা লোকটার গরম নিশ্বাস গ্রিগোরির ঘাড় পুড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রিগোরি অনুভব করল ওর গ্রেটকোটের পেছনের কষি আর কিনারা ধরে কে যেন টানাটানি করছে। একটা দমচাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে। ঘুম ভেঙে গেল। চিত হয়ে শুয়ে ছিল গ্রিগোরি। আঁটো বুটজুতোর ভেতরে চেপে ধরা পাদুটোয় সাড় নেই কপালে ঠাণ্ডা ঘাম জমেছে।

সারা শরীর ব্যথায় জর্জর – যেন কিলঘুসি খেয়েছে। 'ধুত্তোর ছাই!' ভাঙা গলায় বলে ওঠে। নিজের গলার আওয়াজ কান পেতে শুনে যেন আশ্বস্ত হয়। তবু যেন বিশ্বাস হয় না এইমাত্র যা ঘটে গেল তা স্বপ্নমাত্র। এরপর কাত হয়ে শুয়ে মাথা অবধি গ্রেটকোটে মুড়ি দিয়ে মনে মনে বলে, 'উচিত ছিল লোকটাকে কাছে আসতে দেওয়া, ওর মার ঠেকিয়ে, রাইফেলের বাঁটের গুঁতোয় ধরাশায়ী ক'রে তবেই পালানো যেত। ...' মিনিটখানেক ভাবে দ্বিতীয়বার দেখা স্বপ্নটার কথা। ওর মনটা খুশিতে ভরে ওঠে এই ভেবে যে সবটাই একটা দুঃস্বপ্নমাত্র। বাস্তবে ওর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই – অন্তত আপাতত নেই। 'আশ্চর্য, সত্যিকারের ঘটনার চেয়ে স্বপ্নে দশগুণ ভয়ঙ্কর মনে হয় কেন? সারা জীবন কত বিপদ-আপদের মুখেই না পড়তে হয়েছে, কিন্তু কই, এত ভয় ত কখনও পাই নি!' ভাবতে ভাবতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে অসাড় পাদুটো টানটান করে। ঘুম পেতে থাকে ওর।

দশ

ভোরবেলায় ওকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে কপিলোভ।

'উঠে পড় হে, এখনই বেরিয়ে পড়তে হয়! ছ'টায় ওখানে হাজির হবার হুকুম।'

সদর দপ্তরের কর্তা সবে দাড়ি কামিয়েছে, বুটজোড়া পালিশ করেছে, উঁচু কলারওয়ালা যে ফৌজী জামাটা গায়ে পরেছে সেটা দোমড়ানো হলেও পরিষ্কার। বোঝাই যাচ্ছিল দাড়ি কামিয়েছে সে তাড়াহুড়োয় – ফুলো গালদুটো দু'জায়গায় ক্ষুরে কেটে গেছে। তবে আগে যে ফিটফাট কেতাদুরস্ত ভাবটা তার স্বভাবের মধ্যে ছিল না এখন যেন সেটা ওর সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে।

গ্রিগোরি আপাদমস্তক ওকে একবার বেশ দেখে নিল, মনে মনে ভাবল, 'ওঃ চেহারাখানার কী ঘসামাজা হয়েছে দেখ! জেনারেলের সামনে যেমন-তেমন ভাবে হাজির হতে মন চায় না! ...'

গ্রিগোরির মনের ভাবটা ধরতে পেরেই যেন কপিলোভ বলল, 'নোংরা হয়ে যেতে কেমন যেন লাগে! তাই তোমাকেও পরামর্শ দিই একটু ফিটফাট হয়ে নেবার।'

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে গ্রিগোরি বিড়বিড় করে বলল, 'যেমন আছি তাতেই চলবে। তাহলে, বলছ ছ'টায় হাজির হবার হুকুম হয়েছে? তার মানে, তোমার আমার ওপর হুকুম চালাতে শুরু করেছে?'

কপিলোভ মৃদু হেসে বিমূঢ় ভাবে কাঁধ ঝাঁকায়।

'দিনকাল নতুন পড়েছে, তাই সুরও আলাদা। যারা আমাদের ওপরওয়ালা

তাদের মেনে চলাটাই দস্তুর। ফিট্জহেলাউরত একজন জেনারেল - তিনি ত আর তাই বলে আমাদের কাছে আসতে পারেন না!'

'তা যা বলেছ! আমরা যে পথে চলেছিলাম এটাই ত তার পরিণতি,' এই বলে গ্রিগোরি হাতমুখ ধুতে গেল কুয়োর পারে।

বাড়িউলি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ঘরে ঢুকে একটা পরিষ্কার নকশাতোলা তোয়ালে নিয়ে এলো, মাথা নুইয়ে সম্মান দেখিয়ে গ্রিগোরির হাতে তুলে দিল। কনকনে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটায় আর তোয়ালের কোনা দিয়ে মুখ ঘসে ঘসে পোড়া ইটের মতো পাটকিলে রঙের করে তোলে গ্রিগোরি। কপিলোভ কাছে এগিয়ে এলে বলে, 'তা যা বলেছ! তবে জেনারেল মহোদয়দেরও মনে রাখা উচিত একটা কথা। বিপ্লবের পর লোকজন পালটে গেছে, বলা যেতে পারে নতুন করে জন্ম হয়েছে তাদের! কিন্তু ওঁরা সেই পুরনো মাপকাঠিতেই সব কিছু মাপতে চান। তবে সেই মাপকাঠিও ভাঙল বলে! . . . নড়তে চড়তে তাদের বড় কষ্ট। ওদের মগজে খানিকটা চাকার তেল দেওয়া দরকার, যাতে চলাফেরা করার সময় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ না হয়।'

আস্তিনের ওপর কোত্থ থেকে নোংরা এসে পড়েছিল, ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিতে দিতে কপিলোভ অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'তার মানে, কী বলতে চাও?'

'বলতে চাই এই যে ওনাদের হালচাল সাবেকী। এই ধর আমার কথা। জার্মান যুদ্ধের আমল থেকে আমি একজন অফিসার, অফিসারের পদ পেয়েছি। এ পদ আমি রোজগার করেছি বুকের রক্ত খরচ করে। কিন্তু অফিসারদের মহলে গিয়ে যেই পড়ি অমনি মনে হয় যেন বরফের মধ্যে নেংটি পরে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। এমন একটা ঠাণ্ডা ভাব দেখায় আমার ওপর যে আমার সমস্ত শিরদাঁড়াটা সিরসির করতে থাকে!' বলতে বলতে গ্রিগোরির চোখদুটো ক্ষিপ্ত হয়ে জ্বলতে থাকে। নিজের অজানতেই ও গলা চড়ায়।

কপিলোভ অসন্তুষ্ট হয়ে আশেপাশে তাকায়, চাপা গলায় বলে, 'চুপ, চুপ আর্দালিরা শুনতে পাবে।'

গলার স্বর নামিয়ে গ্রিগোরি বলে চলে, 'কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, কেন এমন হয়? তার কারণ ওদের কাছে আমি হলাম হংসমধ্যে বকো যথা। ওদের আছে হাত, কিন্তু আমার হাত বড্ড বেশি কড়া পড়া - তাই ওগুলো হাত নয়, ঘোড়ার খুর! ওরা দিব্যি গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে মিলিটারী চাল দেখাতে পারে, আর আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, আমার পায়ে পা জড়িয়ে যায়। ওদের গায়ে মুখে ঘসার সাবান আর মেয়েলি ক্রীম-পাউডারের সুগন্ধ, কিন্তু আমার গায়ে ঘোড়ার মুত আর ঘামের দুর্গন্ধ। ওরা সবাই শিক্ষিত, কিন্তু আমি কোন

মতে গাঁয়ের গির্জের স্কুল শেষ করেছি। আমি ওদের কাছে আপাদমস্তক একজন বাইরের লোক। আসল কথাটা হল এই। ওদের থেকে বেরিয়ে আসার পর আমার কেবলই মনে হয় মুখের ওপর যেন মাকড়সার জাল লেগে আছে – সুড়সুড় করছে, ভয়ঙ্কর বিশ্রী লাগছে, খালি ঝেড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।' তোয়ালেটা কুয়োর পাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল গ্রিগোরি। একটা ভাঙা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াল। কপালটা রোদে না পোড়ায় তামাটে মুখের তুলনায় অনেক বেশি ফরসা দেখাচ্ছে; এবারে ওর গলার স্বর আরও শান্ত হয়ে আসে। 'ওরা এটা বুঝতে চায় না যে পুরনো সব কিছু ভেঙে রসাতলে তলিয়ে গেছে। ওরা ভাবে আমরা বুঝি অন্য মালমশলায় তৈরি, অশিক্ষিত সাধারণ লোকজন বুঝি গোবুভেড়ার সামিল। ওরা ভাবে আমি বা আমার মতো যারা লোকজন তারা বুঝি যুদ্ধের ব্যাপার স্যাপার ওদের চেয়ে কম বুঝি। কিন্তু লাল ফৌজের সেনাপতি কারা? বুদিওন্নি – সে কি অফিসার? পুরনো আর্মিতে ছিল একজন সার্জেন্ট-মেজর। অথচ সে-ই না জেনারেল স্টাফের জেনারেলদের খুব এক চোট দেখিয়ে দিয়েছে? ওর হাতেই কি অফিসারদের রেজিমেন্টগুলো সাবাড় হয় নি? আচ্ছা কসাক জেনারেলদের মধ্যে গুসেলশ্চিকভ ত সবচেয়ে জঙ্গী, ডাকসাইটে সেনাপতি – অথচ তাকেই না গত শীতকালে একমাত্র ইজের সম্বল করে উস্ত-খোপিওরস্কায়া থেকে ঘোড়ায় চেপে সটকান দিতে হয়েছিল? কে তাকে পেছন বরফের ওপর তাড়িয়ে এনেছিল, জান? মস্কোর এক সামান্য মিস্ত্রি, রেড রেজিমেন্টের একজন কম্যাণ্ডার। বন্দীরা পরে ওর কথা বলাবলি করে। এটা বোঝা উচিত! আমরা যারা শিক্ষা না পাওয়া অফিসার তারা কি বিদ্রোহের সময় কসাকদের খারাপ চালিয়েছি? জেনারেলরা কি আমাদের খুব একটা সাহায্য করেছিল?'

'সাহায্য কম করে নি,' অর্থপূর্ণ ভাবে কপিলোভ উত্তর দেয়।

'বলতে পার হয়ত কুদিনভকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু আমি ওদের সাহায্য ছাড়াই চালিয়েছি, কারুর পরামর্শের তোয়াক্কা না করে লাল ফৌজকে ঘায়েল করেছি।'

'তাহলে তুমি কি যুদ্ধের ব্যাপারে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে চাও?'

'না, বিজ্ঞানকে অস্বীকার আমি করছি না। কিন্তু যুদ্ধে সেটাই আসল কথা নয়, ভাই।'

'তাহলে কী, প্যান্তেলেয়েভিচ?'

'আসল হল সেই কারণটা, যার জন্যে আমরা লড়াই করতে চলছি। ...'

কপিলোভ সতর্ক ভাবে হেসে বলল, 'সে ত অন্য প্রসঙ্গ। ... সে প্রশ্নই ওঠে না। ... এ ব্যাপারে আদর্শটাই বড় কথা। যে লোক নিশ্চিত জানে কিসের জন্যে সে লড়ছে, যার বিশ্বাস আছে নিজের আদর্শে একমাত্র সে-ই জিততে পারে। এ

সত্য পৃথিবীর মতোই পুরনো, অনেক কালের প্রাচীন – তুমি খামোকাই নিজের আবিষ্কার বলে চালানোর চেষ্টা করছ। আমি সাবেকী লোক, সেকালকে আমি ভালো বলে মনে করি। অন্যথায় আমি থোড়াই যেতাম কোন কিছুরই জন্যে কোথাও লড়াই করতে! আমাদের সঙ্গে যারা যারা আছে তারা সকলে তাদের পুরনো অধিকার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে হাতিয়ারের জোরে বিদ্রোহী জনসাধারণকে ঠাণ্ডা করতে চায়। যারা ঠাণ্ডা করতে চায় তাদের দলে তুমি আছ আমিও আছি। কিন্তু গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, কিছুকাল হল তোমাকে লক্ষ করে আসছি, অথচ বুঝতে পারছি না . . .'

'পরে বুঝবে 'খন। চল, এখন যাওয়া যাক,' চট করে বলে উঠে চালাঘরের দিকে এগিয়ে গেল গ্রিগোরি।

বাড়িউলি অনেকক্ষণ ধরে গ্রিগোরির গতিবিধি লক্ষ করছিল। তার মন যোগানোর খাতিরে বলল, 'একটু দুধ খেলে পারতেন না?'

'না মা থাক, দুধ খাবার সময় আর নেই। পরে এক সময় হবে 'খন।'

* * *

প্রোখর জিকভ চালার কাছে দাঁড়িয়ে প্রবল উৎসাহে হাপুস হুপুস করে বাটিতে টক দুধ খাচ্ছিল। গ্রিগোরিকে ঘোড়ার বাঁধন খুলতে দেখেও সে নির্বিকার। শুধু জামার হাতায় ঠোঁট মুছে জিজ্ঞেস করল, 'অনেক দূরে যাচ্ছ? আমাকেও যেতে হবে নাকি তোমার সঙ্গে?'

গ্রিগোরির সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। নিষ্করুণ বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'তোমার গুষ্টির পিণ্ডি, হারামীর বাচ্চা। পল্টনের চাকরীর আইনকানুন জান না? ঘোড়াটার মুখে বাঁধন পরানো কেন? কে আমায় ঘোড়া দেবে? পেটুক রাক্ষস কোথাকার! গিলছে ত গিলছেই, এতটুকু কামাই নেই! চামচ ফেলে দে হতভাগা! আইনশৃঙ্খলা সব লোপ পেয়ে গেল নাকি! . . . শয়তানের ছা!'

ঘোড়ার জিনে চেপে বসতে বসতে প্রোখর আহত স্বরে বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি অমন খেপে গেলে কেন? অত চেঁচামেচি করার কোন মানে হয় না বাপু। কী এমন লাটের বাঁট এসেছ তুমি? কোথাও যাবার আগে দুটো খাবার পেটে দিতে পারব না! চেঁচাচ্ছ কেন, অ্যাঁ?'

'চেঁচাচ্ছি এই কারণে যে তোর জন্যে আমার মাথা কাটা যাবে, হারামজাদা শুয়োর কোথাকার! আমার সঙ্গে কী ভাবে তুই কথা বলছিস? এত দূর আস্পর্ধা তোর! এখন জেনারেলের কাছে যাচ্ছি, বুঝে শুনে চলবি! . . . বড় বেশি মাখামাখি

করা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে!... আমি তোর কে? পাঁচ পা পেছন পেছন থাকবি!' নির্দেশ দিয়ে গ্রিগোরি বেরিয়ে পড়ে ফটক থেকে।

প্রোখর এবং আরও তিনজন আর্দালি একটু পেছনে সরে আসে। তখন কপিলোভের পাশ দিয়ে চলতে চলতে গ্রিগোরি আগের কথার জের টেনে ঠাট্টার সুরে বলল, 'হ্যাঁ, তারপর, কোনটা তুমি বোঝ না বললে? হয়ত আমিই তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব?'

প্রশ্নের ধরন আর কথার মধ্যে ঠাট্টার ভাবটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না কপিলোভ।

'এই ব্যাপারে তোমার মনের ভাব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না – এই হল কথা! এক দিকে তুমি পুরনো জমানার হয়ে লড়াই করছ, অন্য দিকে কেমন যেন – মাফ করবে সরাসরি বলছি বলে – অনেকটা যেন বলশেভিকের মতো।'

'কিসে আমি বলশেভিক হলাম?' গ্রিগোরি ভুরু কুঁচকে ঘোড়ার জিনের ওপর এক ঝটকায় নড়ে চড়ে বসে।

'আমি বলছি না বলশেভিক – তবে অনেকটা যেন বলশেভিক গোছের।'

'ওই একই কথা হল। কিসে, শুনি?'

'আচ্ছা অফিসার মহলে তোমার কথাবার্তা আর তোমার সম্পর্কে ওদের মনোভাবের ব্যাপারটাই না হয় ধর। ওসব লোকের কাছ থেকে তুমি কী চাও? মোটের ওপর, কী তোমার ইচ্ছে?' প্রসন্ন হাসি হেসে হাতের চাবুকটা নিয়ে খেলা করতে করতে কপিলোভ জানতে চায়। পেছন ফিরে তাকিয়ে যখন দেখতে পায় আর্দালিরা কী একটা বিষয়ের আলোচনায় মেতে উঠেছে তখন গলা চড়িয়ে বলে, 'ওরা ওদের মহলে তোমাকে পাত্তা দেয় না, সমান চোখে দেখে না, অবজ্ঞা করে এই ভেবে তুমি মন খারাপ করছ। কিন্তু তোমার এটা বোঝা উচিত যে ওদের দিক থেকে ওরা ঠিকই মনে করে। এটা ঠিক যে তুমি একজন অফিসার – কিন্তু অফিসার মহলে তুমি অফিসার হয়ে এসে পড়েছ নেহাৎই পাকেচক্রে। অফিসারের কাঁধপটি তোমার থাকলেও তুমি... মনে কিছু কোরো না ভাই... রয়ে গেছ সেই চোয়াড়ে কসাক। ভদ্র ব্যবহার কাকে বলে তুমি জান না, তোমার চালচলন কথাবার্তা রুক্ষ, অভদ্র ধরনের। একজন শিক্ষিত লোকের যে-সমস্ত গুণ থাকা দরকার তা তোমার নেই। যেমন, যে-কোন রুচিবান লোকে যেখানে রুমাল ব্যবহার করে সেখানে তুমি দু'আঙুল দিয়ে নাক ঝাড়। খাবার সময় হয় বুটের ওপরকার খোলে নয়ত মাথার চুলে হাত মোছ। মুখ ধোওয়ার পর ঘোড়ার গা-ঢাকা-কাপড়ে মুখ মুছতে তোমার এতটুকু ঘেন্না হয় না। হাতের নখ কাট দাঁতে, নয়ত তলোয়ারের ডগা দিয়ে। কিংবা আরও বিচ্ছিরি সমস্ত কাণ্ডকারখানা

কর। মনে আছে, গত শীতকালে কর্গিন্স্কায়ায়, এই ত আমারই সামনে, তুমি কথা বলছিলে এক শিক্ষিত ভদ্র মহিলার সঙ্গে – তাঁর স্বামীকে কসাকরা আটক করে রেখেছিল . . . কথা বলতে বলতে মহিলার উপস্থিতিতেই তুমি প্যাণ্টের বোতাম আঁটতে লাগলে . . .'

'তার মানে তুমি বলতে চাও বোতাম খোলা রাখলেই ভালো করতাম?' বিষণ্ণ ভাবে হেসে গ্রিগোরি বলল।

ওদের দু'জনের ঘোড়া পাশাপাশি চলেছে। গ্রিগোরি আড়চোখে তাকায় কপিলোভের দিকে, ওর প্রসন্ন মুখখানার দিকে। কপিলোভের কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে থাকে। শুনে দুঃখও হয় মনে।

বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে কপিলোভ বলে ওঠে, 'আসল কথাটা সেখানে না! মোট কথা শুধু পাতলুন পরে খালি পায়ে একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে পারলে কী বলে? এমন কি ফৌজী জামাটা কাঁধে ফেলার কথা মনে হল না তোমার! এটা আমার বেশ মনে আছে! এসবই অবিশ্যি ছোটখাটো ব্যাপার। কিন্তু এতেই প্রকাশ পায় তোমার চরিত্রবৈশিষ্ট্য . . . তুমি মানুষটা যে কতখানি . . . কী ভাবে বলব তোমাকে . . .'

'বলে যাও, সোজা করেই বল না বাপু!'

'অর্থাৎ কিনা, তুমি মানুষটা একেবারেই আকাট! তাছাড়া তোমার কথাবার্তার ধরনই বা কী? যাচ্ছেতাই! 'কোয়ার্টার' বলতে বল 'কোয়াটার' 'রেফিউজি' বলতে বল 'রিফুজি', 'যেমন' বলতে 'যেমুন', 'আর্টিলারী' বলতে 'আটিলারী'। অশিক্ষিত লোক মাত্রেরই যেমন ভারী ভারী বিদেশী শব্দের ওপর একটা অকারণ ঝোঁক দেখা যায় তোমারও তা আছে। তুমি জায়গায় অ-জায়গায় সেগুলো ব্যবহার করে বস, অবিশ্বাস্য রকমের বিকৃত কর। আর অফিসারদের বৈঠকে যখন কাউকে 'স্থানান্তরণ', 'স্থানচ্যুতি', 'গতিবৃদ্ধি', 'কেন্দ্রীভবন' ইত্যাদি বিশেষ ধরনের সামরিক পরিভাষা উচ্চারণ করতে শোন তখন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাক বক্তার দিকে – আমার ত মনে হয় শুনে তোমার হিংসেই হয়।'

'নাঃ, এ তোমার স্রেফ বাজে কথা!' গ্রিগোরি বলে ওঠে। ওর মুখে খেলে যায় খুশির চাঞ্চল্য। ঘোড়াটার দু'কানের মাঝখানে হাত বুলাতে বুলাতে, ওর কেশরের তলায় রেশমের মতো মোলায়েম উষ্ণ চামড়া চুলকে সে বলে, 'তারপর বলে যাও, বলে যাও। তোমার কম্যাণ্ডারকে উচিত শিক্ষা দাও হে!'

'উচিত শিক্ষা দেবার কী আছে বল? তোমার নিজেরই পরিষ্কার বোঝা উচিত যে এ ব্যাপারে তোমার ঘাটতি আছে। এর পরেও কিনা অফিসাররা তোমায় সমান চোখে দেখে না বলে তুমি ক্ষেপে যাও! ভদ্রতা আর শিক্ষার ব্যাপারে

তুমি একেবারে গোমুখ্যু!' আচমকা মুখ ফসকে অপমানসূচক কথাটা বেরিয়ে যেতে কপিলোভ শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। ও জানে যে রেগে গেলে গ্রিগোরির কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, ভয় হয় এই বুঝি সে ফেটে পড়বে। কিন্তু গ্রিগোরির দিকে এক পলক নজর বুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হয়। গ্রিগোরি জিনের ওপর বসে পিছনে হেলে নিঃশব্দে হাসছে, গোঁফের ফাঁক দিয়ে ঝকঝক করছে ওর চোখ ধাঁধান দাঁতের পাটি। কপিলোভের কাছে তার নিজের কথার ফল এত অপ্রত্যাশিত ঠেকে, গ্রিগোরির হাসি তাকে এমন সংক্রামিত করে যে সে নিজেও হেসে ফেলে। বলে, 'দেখলে ত, অন্য কোন বিবেচক লোক হলে এরকম খোঁচায় কেঁদে ফেলত, আর তুমি কিনা হো-হো করে হাসছ! . . . আজব লোক বটে তুমি!'

'তাহলে বলছ আমি একটা গোমুখ্যু, অ্যাঁ? গোল্লায় যাও সব।' অনেকটা হাসার পর গ্রিগোরি বলল। 'তোমাদের ওসব আদব কায়দা ভদ্রতা আমি শিখতে চাই নে। আমার বলদ দাবড়ানোর কোন কাজে আসবে না ওগুলো। ভগবান যদি করেন, যদি বেঁচে থাকি, আমার ত বলদ চরিয়েই খেতে হবে – আমি ত আর বলদগুলোর সামনে জুতো ঘসে কুর্নিশ করে বলতে যাব না, 'ও বাবা টেকো আমার, একটু গা-গতর নাড়াও! ও গো আমার লক্ষ্মী সোনা, আমায় মাফ্ করতে হবে। দয়া করে ঘাড়ে জোয়ালটা বসাতে দাও। হুজুর, বলদসাহেব অধীনের আর্জি লাঙলের দাগটা ঠিক রাখবেন!' ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয় খুবই সংক্ষেপে – অ্যাই হট্ হট্। বলদের থানচুতির পক্ষে এ-ই যথেষ্ট!'

'থানচুতি' নয়, স্থানচ্যুতি!' কপিলোভ শুধরে দেয়।

'ঠিক আছে বাবা, স্থানচ্যুতিই হল। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।'

'কী ব্যাপারে?'

'ওই যে বললে না, গোমুখ্যু। তোমাদের কাছে আমি গোমুখ্যু হতে পারি, কিন্তু সবুর কর, আমি লালদের দলে গিয়ে ভিড়ি – দেখবে আমার ওজন কত বেড়ে যায়। তখন কিন্তু তোমাদের মতো ভদ্র শিক্ষিত গুখেকোর ব্যাটাদের আমার হাতে না পড়াই ভালো! সোজা নাড়িভুঁড়ি টেনে ছিঁড়ে প্রাণটা বার করে ফেলব!' খানিকটা তামাসা করে, খানিকটা যেন গম্ভীর চালেই কথাগুলো বলে চাবুক মেরে হঠাৎ জোর কদমে গ্রিগোরি ছুটিয়ে দিল তার ঘোড়াটা।

দন পারের সকাল। সূক্ষ্ম জাল ছড়ানো এমন একটা নিস্তব্ধতা যেখানে যে-কোন শব্দ, এমন কি সামান্য এতটুকু আওয়াজও তাকে ছিন্ন করে, প্রতিধ্বনি জাগায় তার বুকে। স্তেপের প্রান্তরে শুধু চাতক আর তিতিরের রাজত্ব। কিন্তু কাছাকাছি গ্রামগুলোতে অবিরাম চাপা গুমগুম আওয়াজ, যা সচরাচর বড় বড়

সামরিক ইউনিটগুলো চলাফেরা করার সময়ই শোনা যায়। রাস্তার খানাখন্দের মধ্যে পড়ে গোলাবারুদের গাড়ি আর কামানের চাকার ঝনঝন আওয়াজ উঠছে। কুয়োতলায় ঘোড়াগুলো চিঁহিঁহি ডাকছে। পায়-দল 'দণ্ডবৎ' সেপাইদের স্কোয়াড্রনগুলো সমান তালে হালকা পা ফেলে চাপা শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে। ঘোড়ায় টানা হালকা গাড়ি আর ফ্রন্টলাইনের অভিমুখী রসদ ও গোলাবারুদ বোঝাই মালগাড়িগুলো ঘড় ঘড় করে ছুটছে। ফৌজী রসুই-গাড়িগুলোর আশপাশ তেজপাতার সুবাস মেশানো মাংস আর সেদ্ধ কাউনের চালের মিষ্টি গন্ধে ম ম করছে।

উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়ার ঠিক কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে ঘন ঘন বন্দুকের গুলি বিনিময়ের কটকট আওয়াজ আসছে। কদাচিৎ কামানের গোলাও মন্থর গুমগুম আওয়াজে ফেটে পড়ছে। সবে লড়াই শুরু হয়েছে।

জেনারেল ফিট্‌জহেলাউরভ প্রাতরাশ সারছিল, এমন সময় অগোছাল গোছের চেহারার মাঝবয়সী এড্‌জুটেন্ট খবর দিল, 'এক নম্বর বিদ্রোহী ডিভিশনের কম্যাণ্ডার আর ডিভিশনের সদর ঘাঁটির ওপরওয়ালা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।' শিরাওঠা বিশাল হাতটা দিয়ে ডিমের খোলা বোঝাই প্লেটখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ধীরেসুস্থে এক গেলাস কাঁচা দুধ চুমুক দিয়ে খেল ফিট্‌জহেলাউরভ, ন্যাপ্‌কিনটা পরিপাটি ভাঁজ করে রেখে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দীর্ঘকায়, বয়সের দরুন ভারিক্কি, থলথলে চেহারার জেনারেলকে কসাক-বাড়ির এই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে, দরজার তেরাবাঁকা চৌকাট আর ঘোলাটে গোছের ছোট ছোট জানলার মাঝখানে কেমন যেন অবিশ্বাস্য রকমের বিশাল দেখায়। চলতে চলতে নিখুঁত কাঁটছাঁট করা উর্দির খাড়া কলারটা ঠিক করতে করতে ঢন ঢন কাশতে জেনারেল পাশের ঘরে এসে ঢুকল। কপিলোভ আর গ্রিগোরি উঠে দাঁড়াতে সামান্য ঝুঁকে নমস্কার জানাল। ওদের সঙ্গে করমর্দনের জন্য হাত না বাড়িয়ে টেবিলের কাছে এসে বসতে ইশারা করল।

পাশে ঝোলানো তলোয়ারটা হাত দিয়ে ঠেকিয়ে গ্রিগোরি সাবধানে টুলের কিনারায় বসল। আড়চোখে তাকাল কপিলোভের দিকে।

ফিট্‌জহেলাউরভ ধপ্ করে ভেনিসীয় চেয়ারটাতে বসে পড়ল। তার দেহের ভারে মচমচ আওয়াজ করে উঠল সেটা। বকের মতো লম্বা ঠ্যাঙদুটোকে গুটিয়ে চেয়ারের তলায় ঠেলে দিয়ে বড় বড় হাতদু'খানা কোলের ওপর রেখে গুরুগম্ভীর নীচু গলায় কথা বলতে শুরু করল।

'অফিসার মহোদয়রা আমি আপনাদের এখানে ডেকেছি গুটিকয়েক প্রশ্নের ফয়সালা করতে।... বিদ্রোহী গেরিলা দল আর নেই! আপনাদের ইউনিটগুলো

স্বাধীন পুরোপুরি একটা দল হিসাবে আর থাকছে না। অবশ্য পুরোপুরি ফৌজীদল হিসাবে কোনকালে তার অস্তিত্ব ছিলও না। সবটাই গল্পকথা। এখন দল ফৌজের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমরা সুপরিকল্পিত আক্রমণে নামতে যাচ্ছি, সেইটে আপনাদের বোঝার সময় হয়েছে এবং সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর হুকুম বিনা শর্তে আপনাদের মেনে নিতে হবে। এবারে দয়া করে বলবেন কি, গতকাল কেন আপনাদের পদাতিক রেজিমেন্ট ঝটিকা বাহিনীর আক্রমণে মদত দেয় নি? কেন আমার হুকুম সত্ত্বেও রেজিমেন্ট আক্রমণে নামতে অস্বীকার করে? আপনাদের তথাকথিত ডিভিশনের কম্যাণ্ডার কে?'

'আমি,' অনুচ্চ স্বরে গ্রিগোরি উত্তর দিল।

'একটু কষ্ট ক'রে তাহলে প্রশ্নের উত্তরটা দিন!'

'আমি মাত্র গতকাল ডিভিশনে এসে পৌঁছেছি।'

'কোথায় ছিলেন বলবেন কি?'

'বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'সামরিক অপারেশনের সময় ডিভিশনের কম্যাণ্ডার বাড়িতে বেড়াতে যান কী বলে! ডিভিশনটা একটা হাট বাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে! যে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে! বিশৃঙ্খলার একশেষ!' ছোট ঘরখানার মধ্যে স্থান সঙ্কুলান করতে না পেরে জেনারেলের মোটা গলা যেন ক্রমেই আরও জোরাল গমগম আওয়াজ তুলতে থাকে। ঘরের বাইরে এড্‌জুটেন্টরা ততক্ষণে পা টিপে টিপে হাঁটছে, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে আর মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। কপিলোভের গালদুটো উত্তরোত্তর বেশি করে ফেকাসে হয়ে উঠছে। এদিকে গ্রিগোরি যতই জেনারেলের লাল রঙ ধরা মুখের দিকে, আর তার ফোলা হাতের শক্ত মুঠোর দিকে তাকায় ততই অনুভব করতে থাকে নিজের মধ্যে যেন জেগে উঠছে একটা অদম্য ক্রোধ।

ফিট্‌জহেলাউরভ সকলকে চমকে দিয়ে চটপট লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চেয়ারের পিঠ চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'আপনাদের ইউনিটটা কোন সামরিক ইউনিট নয় – আজেবাজে লাল ফৌজীদের একটা দঙ্গল! . . . ওরা কসাক নয়, যত রাজ্যের ইতর লোকজন। আর আপনি মেলেখভ মশাই, ডিভিশন চালানো আপনার কম্ম নয়! আপনার উচিত ছিল অফিসারের চাকর হয়ে জুতো সাফ করা! শুনতে পাচ্ছেন? হুকুম তামিল করা হল না কেন? মিটিং করেন নি? আলোচনা করেন নি? তাহলে ভালো করে মনে রাখুন, এখানে আপনার কমরেড-টমরেড কেউ নই আমরা। ওসব বলশেভিক ব্যবস্থা চালু করা চলবে না। . . . অবশ্যই নয়!'

'দয়া করে আমার সঙ্গে অমন চোটপাট করে কথা বলবেন না।' চাপা গলায় এই কথা বলে পায়ের ধাক্কায় টুল সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রিগোরি।

'কী বললেন?' টেবিলের ওপর দিয়ে ওপাশে ঝুঁকে পড়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় জেনারেল বলল।

'দয়া করে আমার সঙ্গে চোটপাট করে কথা বলবেন না!' এবারে জোর গলায় আওড়াল গ্রিগোরি। 'আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন এই ঠিক করার জন্যে যে . . .' মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে চোখ নামিয়ে নিল, ফিট্জহেলাউরভের হাতের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে গলার স্বর নামিয়ে এনে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'মহামান্য জেনারেল, আপনি আমার গায়ে অন্তত আঙুল তোলার চেষ্টা করেই দেখুন না, সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই তলোয়ার চালিয়ে দেব।'

ঘরের মধ্যে এমন নিস্তব্ধতা নেমে এলো যে ফিট্জহেলাউরভের ঘন ঘন নিশ্বাসের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল। মিনিটখানেকের নিস্তব্ধতা। ঘরের দরজাটা সামান্য ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলল। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল ভীত এড্জুটেন্ট। আবার সেই রকমই সাবধানে সে ভেজিয়ে দিল দরজাটা। তলোয়ারের হাতল থেকে হাত না নামিয়েই দাঁড়িয়ে রইল গ্রিগোরি। কপিলোভের হাঁটুদুটো অল্প অল্প কাঁপছে। দেয়ালের ওপর কোথায় যেন ঘুরছে তার শূন্য দৃষ্টি। ফিট্জহেলাউরভ ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। বুড়োদের মতো কঁকিয়ে উঠে বিড়বিড় করে বলল, 'চমৎকার ব্যাপার!' তারপর গ্রিগোরির দিকে আর না তাকিয়েই এবারে একেবারে শান্ত কণ্ঠে গ্রিগোরিকে বলল, 'বসুন। মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল। যাক গে, হয়েছে! এবারে যা বলি শুনুন, আমি হুকুম দিচ্ছি এই মুহূর্তে ঘোড়সওয়ার ইউনিট সরিয়ে নিয়ে যান . . . আরে কী হল? বসুন না! . . .'

গ্রিগোরি বসল। মুখে হঠাৎ প্রচুর ঘাম জমে উঠেছিল। জামার আস্তিন দিয়ে ঘাম মুছল।

'. . .হ্যাঁ যা বলছিলাম, ঘোড়সওয়ার ইউনিটগুলোকে একখুনি দক্ষিণ-পুব অংশে সরিয়ে দিন, সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণে নেমে পড়ুন। আপনাদের ডান পাশে কসাক-সেনাপতি চুমাকোভের দু'নম্বর ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে যোগ থাকবে। . . .'

'ডিভিশন আমি ওখানে নিয়ে যাব না,' ক্লান্ত কণ্ঠে এই কথা বলে রুমালের খোঁজে সালোয়ারের জেব হাতড়ায় গ্রিগোরি। নাতালিয়ার হাতে তোলা লেসের রুমালখানা দিয়ে আরও একবার কপালের ঘাম মুছে আবার বলল, 'ডিভিশন আমি ওখানে নিয়ে যাব না।'

'কেন নয়?'

'নতুন করে সাজাতে অনেক সময় লেগে যাবে। . . .'

'ও নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। অপারেশনের ফলাফলের দায়িত্ব আমার।'

'মাথা ঘামাতে হয় বৈ কি। দায়িত্ব শুধু আপনার নয়। . . .'

'আপনি আমার হুকুম মানতে অস্বীকার করছেন তাহলে?' স্পষ্টতই বেশ জোর করে নিজেকে সামলে ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল ফিট্‌জহেলাউরভ।

'হ্যাঁ।'

'সে ক্ষেত্রে দয়া করে একখুনি ডিভিশন পরিচালনার ভার ছেড়ে দিন! এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার গতকালের হুকুম মানা হয় নি কেন।'

'আপনি যা খুশি তাই ভাবতে পারেন। তবে ডিভিশন আমি ছেড়ে দেব না।'

'আপনার একথার কী অর্থ হতে পারে?'

'ঠিক যা বললাম তা-ই।' গ্রিগোরির মুচকি হাসি প্রায় চোখেই পড়ে না।

'আমি পরিচালনার কাজ থেকে আপনাকে বরখাস্ত করছি!' ফিট্‌জহেলাউরভ গলা চড়াল। গ্রিগোরিও সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি আপনার অধীন নই, মহামান্য জেনারেল!'

'কিন্তু মোটের ওপর কারও একজনের অধীন ত বটে?'

'অবশ্যই। বিদ্রোহী ফৌজের কম্যাণ্ডার কুদিনভের অধীন। কিন্তু আপনার মুখে এসব কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারছি না। . . . এখন পর্যন্ত আমাদের দু'জনের অধিকার সমান। আপনি একটা ডিভিশন পরিচালনা করছেন, আমিও তাই। তাই আপাতত আমার ওপর গলা চড়াবেন না। . . . যেই মুহূর্তে আমাকে স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের পদে নামিয়ে দেওয়া হবে তখন যত খুশি চোটপাট করার করুন। তবে যদি মারমুখী হন . . .' নোংরা তর্জনীটা তুলে মৃদু হেসে এবং সেই একই সঙ্গে ক্ষিপ্ত দু'চোখে ঝিলিক হেনে গ্রিগোরি তার কথা শেষ করল, 'যদি মারমুখী হন তাহলে আমি সহ্য করব না - কখনও না।'

ফিট্‌জহেলাউরভ উঠে দাঁড়াল। জামার দম-আটকানো কলারটা ঠিক করে নিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে সামান্য ঝুঁকে বলল, 'আমাদের মধ্যে আর আলোচনার কিছু নেই। যা খুশি তাই করুন গে। আপনার আচরণ সম্পর্কে আমি আর্মির সদর দপ্তরে এখনই রিপোর্ট করব এবং ভরসা করে আপনাকে এই মর্মে আশ্বস্ত করতে পারি যে ফল পেতে খুব একটা দেরি হবে না। আমাদের কোর্ট মার্শালের কাজে এখন পর্যন্ত কোন গাফিলতি দেখতে পাচ্ছি নে।'

কপিলোভের হতাশাভরা দৃষ্টির দিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে গ্রিগোরি কোন রকমে মাথার টুপিটা বসিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। চৌকাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আপনার যেখানে খুশি রিপোর্ট করতে পারেন। কিন্তু

আমাকে ভয় দেখাবেন না। আমি ঘাবড়ানোর পাত্র নই। আপাতত আমায় ঘাঁটাতে আসবেন না।' তারপর একটু ভেবে যোগ করল, 'তবে ভয় হয় আমার কসাকরা আপনার ওপর হামলা না করে বসে। . . .' লাথি মেরে দরজা খুলে তলোয়ারের ঝনঝন আওয়াজ তুলে বড় বড় পা ফেলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে।

দেউড়িতে বেশ উত্তেজিত অবস্থায় কপিলোভ এসে ধরল তাকে। হতাশ হয়ে দু'হাত কচলাতে কচলাতে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ পান্তেলেয়েভিচ?'

'ঘোড়া নিয়ে এসো!' হাতের মধ্যে চাবুকটা পাকিয়ে মোচড়াতে মোচড়াতে উঁচু গলায় হেঁকে উঠল গ্রিগোরি।

প্রোখর পড়িমরি ছুটে আসে দেউড়ির কাছে।

ফটক পেরিয়ে যাবার পর গ্রিগোরি পিছন ফিরে তাকায়। দেখে, তিনজন আর্দালি জেনারেল ফিট্‌জহেলাউরভকে ঘিরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাকে সুন্দর সাজগোজ পরানো জিন আঁটা এক প্রকাণ্ড উঁচু ঘোড়ার ওপর উঠে বসতে সাহায্য করছে।

সিকি ক্রোশমতন চুপচাপ ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ওরা দু'জনে। কপিলোভ চুপ করে ছিল, কারণ সে জানে কথাবার্তা বলার মেজাজ গ্রিগোরির নেই। ওর সঙ্গে এখন তর্ক করতে যাওয়াটাও বিপজ্জনক। শেষকালে গ্রিগোরিই আর চুপ থাকতে পারলে না।

'চুপ করে আছ যে?' আচমকা সে জিজ্ঞেস করল। 'তুমি আমার সঙ্গে এসেছিলে কেন? সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকতে এসেছিলে! কত দূর চুপ ক'রে থাকা যায় সেই খেলা খেললে বুঝি?'

'কিন্তু যাই বল ভাই, খেল দেখালে বটে তুমি!'

'আর উনি কি কম দেখালেন?'

'ধরলাম না হয় দোষ ওঁরও ছিল। যেই সুরে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন সেটা সত্যিই ভারী বিচ্ছিরি!'

'উনি কি আদৌ কথা বলেছেন আমাদের সঙ্গে? গোড়া থেকেই এমন চেল্লাতে শুরু করলেন যেন কেউ ওর পাছায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে!'

'তবে তুমিও কম যাও না! পদমর্যাদায় সিনিয়র একজন অফিসারের অবাধ্য হওয়া . . . লড়াই চলার সময় . . . এটা কিন্তু ভাই . . .'

'কিন্তু-কিন্তুর কিছু নেই। কেবল দুঃখ এই যে গায়ে হাত তুলল না! তাহলে তলোয়ারের এমন একটা খোঁচা মারতাম ওর কপালে যে খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যেত!'

'ও ছাড়াই তোমার কপালে যথেষ্ট দুর্ভোগ আছে,' অসন্তুষ্ট হয়ে এই কথা বলে কপিলোভ ঘোড়ার গতিবেগ কদমচালে নামিয়ে আনল। 'সব দেখেশুনে মনে

হচ্ছে এবারে ওরা আইনশৃংখলা শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করবে। তাই বলি, সাবধান!'

ওদের ঘোড়াদুটো পাশাপাশি হাঁটছে, চলতে চলতে নাক ঝেড়ে আওয়াজ করছে আর লেজ দিয়ে ডাঁশ তাড়াচ্ছে। গ্রিগোরি কৌতুকভরে কপিলোভের দিকে তাকাল।

'খুব যে সাজগোজ করেছিলে? ভেবেছিলে চা-জলখাবার খেতে দেবে? আদর করে দু'হাত ধরে টেবিলের ধারে বসাবেন? দাড়ি কামালে, উর্দিটা সাফ করলে, জুতোজোড়া ঘসে চকচকে করলে।... আমি দেখেছি তোমাকে রুমালে থুতু লাগিয়ে হাঁটুর ময়লা ঘসে তুলতে!'

কপিলোভ আরক্তিম হয়ে ওঠে, আত্মরক্ষা করে বলে, 'আঃ ওসব ছাড় ত!'

গ্রিগোরি উপহাস করে বলে, 'তোমার এত পরিশ্রম বৃথা গেল! শুধুই কি তাই? – হাতখানা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন না।'

'তুমি সঙ্গে থাকতে সে আশা করাই অন্যায়,' তাড়াতাড়ি বিড়বিড় করে বলে কপিলোভ। তারপর চোখ কুঁচকে দূরের দিকে তাকিয়ে আনন্দে আর বিস্ময়ে বলে ওঠে, 'দ্যাখো দ্যাখো! ওরা আমাদের লোক নয়! মিত্রপক্ষের লোক না ত?'

সরু গলির ভেতরে ছ'টা খচ্চরের একটা দল একখানা ব্রিটিশ কামান টেনে নিয়ে আসছিল ওদের মুখোমুখি। পাশে বেঁড়ে লেজওয়ালা কটা রঙের ঘোড়ায় চেপে চলেছে একজন ইংরেজ অফিসার। তোপের গাড়ির সামনের খচ্চরের পিঠে যে লোকটা তারও পরনে ব্রিটিশ উর্দি, কিন্তু টুপির ব্যাণ্ডে রুশ অফিসারের তকমা আঁটা। কাঁধপটিদুটো লেফটেনান্টের।

গ্রিগোরির কাছ থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে থাকতেই অফিসারটি তার শোলার টুপির কানাতে দু'আঙুল ঠেকিয়ে মাথা নেড়ে ইশারায় এক পাশে সরে যেতে বলল। গলিটা এত সরু যে একেবারে পাথরের দেয়াল ঘেঁসে ঘোড়াগুলোকে না চালালে আগে বাড়া সম্ভব নয়।

গ্রিগোরির গালের পেশী নেচে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে ও সোজা ঘোড়া চালিয়ে দেয় অফিসারটির ওপরে। অফিসার আশ্চর্য হয়ে ভুরু তুলে একটু সরে গেল। ওরা রাস্তা পার হল অতি কষ্টে – তাও ইংরেজটি চামড়ার আঁটো পটি লাগানো ডান পা'টা তার ভালো জাতের ঘোড়ার সাফসুতর মসৃণ ঝকঝকে পাছার ওপর রাখতে পেরেছিল বলে।

গোলন্দাজ দলের একজন – দেখে মনে হয় রুশ অফিসারই হবে – কটমট করে গ্রিগোরির দিকে তাকাল, ওকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখল।

'আপনি একটু সরে রাস্তা করে দিলেও ত পারতেন! এখানেও কি নিজের গৌয়ার্তুমি জাহির না করলেই নয়?'

'কোন কথা না বলে চুপচাপ কেটে পড় পড় শালা কুত্তীর বাচ্চা! নইলে রাস্তা করে দেওয়া কাকে বলে দেখাচ্ছি!...' অস্ফুট সরে গ্রিগোরি বলল।

অফিসারটি একটু উঁচু হয়ে উঠে পিছন ফিরে চেঁচিয়ে বলল, 'পাকড়াও করুন ত মশাই এই বেহায়াটাকে!'

গ্রিগোরি অর্থপূর্ণ ভাবে চাবুক দোলাতে দোলাতে কদমচালে ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে চলল গলির ভেতর দিয়ে। গোলন্দাজরা সবাই ছোকরা অফিসার, গোঁফদাড়ির রেখা পর্যন্ত ওঠে নি ওদের মুখে। ধুলোমাখা ক্লান্ত চেহারা সকলের। বিষদৃষ্টি হানল ওরা গ্রিগোরির ওপর। কিন্তু ওকে ধরার কোন চেষ্টা কেউ করল না। ছ'টা তোপের গোলন্দাজদলটি মোড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঘোড়া হাঁকিয়ে গ্রিগোরির কাছে এসে ঘেঁসে দাঁড়াল কপিলোভ।

'বোকার মতো করছ কেন, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ? এসব কী ছেলেমানুষী হচ্ছে!'

গ্রিগোরি খেঁকিয়ে উঠল, 'তুমি আমার কোথাকার গুরুমশাই এলে?'

'ফিট্‌জহেলাউরভের ওপরে তোমার চটার না হয় কারণ বুঝলাম,' কপিলোভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। 'কিন্তু ওই ইংরেজটি তোমার কী করল? নাকি তার মাথার টুপিটা তোমার পছন্দ হয় নি?'

'এখানে উস্ত-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়ার কাছে ওকে দেখে আমার কেন যেন ভালো লাগে নি।... অন্য জায়গায় ওটা পরলেই পারত।... যখন দুই কুকুরে খেয়োখেয়ি করে তখন আরেকটা কুকুরের মাথা গলানোর কোন জায়গা সেখানে থাকে না, এটা কি তুমি জান না?'

'হুম্! তার মানে তুমি বিদেশীদের মাথা গলানো পছন্দ কর না? কিন্তু আমার মনে হয় যখন তোমার টুটি টিপে ধরেছে তখন যে-কোন সাহায্যই আনন্দের।'

'সে তুমি আনন্দ কর গে, কিন্তু আমি হলে আমার দেশের মাটিতে ওদের পা রাখতে দিতাম না!'

'লালদের দলে তুমি চীনেদের দেখেছ?'

'তাতে কী হল?'

'সেও কি একই ব্যাপার হল না? সেও ত ওই ভিনদেশীদের সাহায্যই হল।'

'ও তুলনা এখানে খাটে না: চীনেরা লালদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে স্বেচ্ছায়।'

'আর এরা? তুমি কি বলতে চাও এদের জোর করে এখানে ধরে আনা হয়েছে?'

গ্রিগোরি বুঝতে পারল না উত্তরে কী বলবে। গভীর চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে অনেকক্ষণ চুপচাপ চলতে লাগল। শেষকালে যখন কথা বলল তখন তার গলার স্বরে মনের ক্ষোভ আর চাপা থাকে না।

'তোমরা শিক্ষিত লোকেরা সব সময়ই এরকম।... খালি গুলিয়ে দাও! আমি ভাই বেশ বুঝতে পারছি যে এ ব্যাপারে তুমি মোটে ঠিক বলছ না। অথচ তোমায় যে চেপে ধরব সে ক্ষমতা আমার নেই।... যাক, ওসব ছাড়ান দেওয়া যাক এখন। আমায় আর তালগোল পাকিয়ে দিও না, অমনিতেই সব তালগোল পাকিয়ে আছে আমার ভেতরে!'

কপিলোভ আহত হয়ে চুপ করে যায়। আস্তানায় পৌছুন পর্যন্ত বাকি রাস্তায় ওদের মধ্যে আর কোন কথাবার্তা হয় না। শুধু নিদারুণ কৌতূহলের তাড়নায় ছটফট করতে করতে প্রোখর একবার ঘোড়া চালিয়ে ওদের নাগাল ধরতে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, হুজুর, ওই যে ক্যাডেটদের কামানের সঙ্গে জোতা ছিল ওগুলো কী জন্তু দয়া করে বলবে কি? গাধার মতো কান, অথচ বাকি শরীর সত্যিকারের বাচ্চা ঘোড়ার মতো। অমন জানোয়ারের দিকে তাকাতেও যেন অস্বোয়াস্তি হয়।... কোন্ শয়তানের জাত ওগুলো, দোহাই তোমার বুঝিয়ে বল। আমরা আবার ওটার ওপর টাকা বাজি ধরেছি কিনা।...'

মিনিট পাঁচেক এই রকম পিছন পিছন চলল প্রোখর, কিন্তু অপেক্ষা করে করেও কোন জবাব না পেয়ে পিছিয়ে পড়ে থাকল। বাকি আর্দালিরা ওর কাছে এগিয়ে আসতে ফিসফিসিয়ে তাদের বলল, 'ওরা ভাই চুপচাপ চলছে। মনে হয় নিজেরাই অবাক হয়ে গেছে – অমন অনাসৃষ্টি দুনিয়ায় কোত্থেকে আসতে পারে ভেবে কূল পাচ্ছে না।...'

এগার

কসাক-স্কোয়াড্রনগুলো চতুর্থবার উঠে দাঁড়িয়েছিল অগভীর পরিখাগুলো থেকে। কিন্তু লাল ফৌজীদের মারাত্মক মেশিনগানের গুলিতে এবারেও তাদের শুয়ে পড়তে হল। বাঁ তীরের বনের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রেড ব্যাটারীগুলো কসাকদের ঘাঁটি আর খাতের ভেতরে জড় হওয়া মজুত সৈন্যদলের ওপর একটানা গোলা ছুঁড়ে চলেছে।

দন পারের টিলার মাথার ওপর ঝলক তুলে বিস্ফোরক-গোলাগুলো দুধের মতো সাদা ধোঁয়া হয়ে গলে ছড়িয়ে পড়ছে। কসাকদের পরিখাগুলোর ভাঙাচোরা লাইনের সামনে পেছনে বাদামী ধুলো উড়িয়ে ফেটে পড়ছে বুলেট।

দুপুরের দিকে লড়াই বেশ জোরদার হয়ে উঠল। পশ্চিমের বাতাস দনের ওপর দিয়ে বহু দূরে নিয়ে চলল কামানের গোলাবর্ষণের আওয়াজ।

বিদ্রোহী গোলন্দাজদের নজরের ঘাঁটি থেকে দূরবীন দিয়ে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ করছিল গ্রিগোরি। সে বেশ দেখতে পাচ্ছিল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও অফিসারদের কম্পানিগুলো থেকে থেকে একরোখার মতো সামনে ছুটে এসে আক্রমণ চালাচ্ছে। গুলিগোলা জোরালো হতেই তারা মাটিতে শুয়ে পড়ছে, পরিখার ভেতরে গা ঢাকা দিচ্ছে। পরে আবার উঠে একেক বার করে ছুটে একেক ধাক্কায় নতুন লাইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটু বাঁয়ে, মঠের দিকটাতে বিদ্রোহী পদাতিকরা কোন মতেই মাথা তুলতে পারছে না। গ্রিগোরি চটপট একটা চিরকুট লিখে একজন বার্তাবহকে দিয়ে ইয়ের্মাকোভের কাছে পাঠাল।

আধঘণ্টা পরে উত্তেজিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হয় ইয়ের্মাকোভ। গোলন্দাজদের ঘোড়া রাখার জায়গার কাছে ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে নজরের ঘাঁটির পরিখার দিকে টিলার ওপর উঠতে থাকে।

'কসাকদের নড়াতে পারছি না! ওরা উঠে দাঁড়াতে চাইছে না!' দূর থেকেই সে দু'হাত নাড়িয়ে চেঁচাতে থাকে। 'আমাদের তেইশজন লোক এর মধ্যে খতম হয়ে গেছে! দেখছ না লালেরা মেশিনগান দিয়ে কেমন কচুকাটা করে দিচ্ছে?'

'অফিসাররা এগিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি কিনা তোমার লোকদের নড়াতে পারছ না?' দাঁতে দাঁত চেপে গ্রিগোরি বলে।

'তুমি চেয়েই দেখ না, ওদের প্রত্যেক পলটনের আছে একটা করে হালকা মেশিনগান, আর কার্তুজেরও কোন সীমাসংখ্যা নেই। কিন্তু আমাদের কী আছে?'

'হয়েছে, হয়েছে, তুমি আমাকে বোঝাতে এসো না! এখুনই ওদের নিয়ে এগোও, নইলে তোমার কাঁধে মাথা থাকবে না!'

ইয়ের্মাকোভ ভয়ানক মুখ খিস্তি করে টিলা থেকে এক ছুটে নেমে গেল। তাকে অনুসরণ করল গ্রিগোরি। গ্রিগোরি ঠিক করেছে সে নিজে দু'নম্বর পদাতিক রেজিমেন্টকে আক্রমণে নামাবে।

কাঁটা ঝোপের ডালপালার আড়ালে কৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল গোলন্দাজ বাহিনীর শেষ কামানটা। গ্রিগোরি তার কাছাকাছি আসতে গোলন্দাজ-কম্যাণ্ডার তাকে থামাল।

'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, একবার চোখ ভরে দেখ ইংরেজদের কাজটা। এখনই ওরা পুলের ওপর কামান দাগতে শুরু করবে। চল, টিলার মাথায় গিয়ে ওঠা যাক, কী বল?'

দূরবীনে সরু রেখার মতো দেখা যাচ্ছিল দনের বুকে লাল ফৌজের স্যাপারদের

পাতা ভেলা-পুলটা। পুলের ওপর দিয়ে অবিরাম স্রোতে পার হচ্ছে ওদের মালগাড়ি।

মিনিট দশেক পরে একটা নাবাল জায়গার ভেতরে পাথরের সারির আড়ালে সাজিয়ে রাখা ব্রিটিশ তোপশ্রেণী থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হল। চতুর্থ গোলার ঘায়ে পুলের প্রায় মাঝখানটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মালগাড়ির স্রোত থেমে গেল। চোখে পড়ছে লাল ফৌজীদের ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি। ভাঙাচোরা গাড়ি আর মরা ঘোড়াগুলোকে ওরা দনের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

সেই মুহূর্তে ডান তীর থেকে পল্টনের কারিগরদের নিয়ে চারটে বজরা রওনা দিল। কিন্তু পুলের ভাঙা পাটাতন মেরামত করার অবকাশ তারা পেল না – ব্রিটিশ ব্যাটারী এক পশলা গোলাবর্ষণ করল ওদের ওপর। একটা গোলার ঘায়ে বাঁ তীরের ঘাটের সিঁড়িখানা ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় গোলাটা পুলের ঠিক পাশেই এসে পড়তে সেখানে সবুজ জলের একটা স্তম্ভ উঠে ভেঙে পড়ল। পুলের ওপর নতুন করে যে যাতায়াত শুরু হয়েছিল তা থেমে গেল।

'ওঃ কী দারুণ টিপ, শুয়োরের বাচ্চাগুলোর!' তারিফের সুরে বলে ওঠে ব্যাটারী-কম্যাণ্ডার। 'এখন রাত না নামা অবধি ওদের আর পার হতে দেবে না। ও পুল আর আস্ত থাকছে না!'

চোখ থেকে দূরবীন না সরিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তোমার লোকদের কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? নিজের পায়দল সেপাইদের মদত দেওয়া উচিত ছিল তোমার। ওই যে মেশিনগানের ঘাঁটিগুলো, দেখতে পাচ্ছ না?'

'পারলে খুশি হতাম, কিন্তু একটাও গোলা নেই যে! আধ ঘন্টাখানেক আগে শেষ গোলাটা ছুঁড়েছিলাম, এখন উপোস্ মেরে আছি।'

'তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে বড়? কামানের গাড়িতে উঠে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কেটে পড় - চুলোয় যাও!'

'ক্যাডেটদের কাছে লোক পাঠিয়েছি গুলিগোলা চেয়ে।'

'দেবে না,' গ্রিগোরি নিশ্চিত সুরে বলল।

'এর আগে একবার 'না' করে দিয়েছে। আরও একবার পাঠালাম। যদি দয়া হয়। ওই মেশিনগানগুলো থামিয়ে দেবার পক্ষে আমাদের ডজন দুয়েক হলেই চলবে। তামাসার ব্যাপার নয় - আমাদের তেইশজন লোক ইতিমধ্যে খতম হয়ে গেছে। আরও কতজন যাবে কে জানে? দেখ দেখ, কেমন গুলি চালিয়ে যাচ্ছে! ...'

গ্রিগোরি দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় কসাকদের পরিখাগুলোর দিকে। কাছে পাহাড়ের ঢালে গুলি আগের মতোই খুঁড়ে খুঁড়ে তুলছে শুকনো মাটি। যেখানে যেখানে বুলেটের ছররা পড়ছে সেই সব জায়গায় ফুটে উঠছে ধুলোর রেখা – মনে হয় কেউ যেন অদৃশ্য হাতে বিদ্যুৎগতিতে পরিখাগুলো বরাবর এঁকে দিচ্ছে একটা

ধূসর বিকীর্ণ রেখা। কসাকদের পরিখাগুলো যেন আগাগোড়া ধোঁয়ায় ঢাকা। চারধারে ধুলোর দাগ টানা।

গ্রিগোরি এখন আর ব্রিটিশ ব্যাটারীর গোলার গতিবিধি লক্ষ করছে না। মিনিটখানেক ধরে কামান আর মেশিনগানের অবিরাম গুলিগোলার আওয়াজ কান পেতে শোনার পর টিলা থেকে নেমে ইয়েমাকোভের নাগাল ধরল।

'আমার কাছ থেকে কোন হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত আক্রমণে নামবে না। গোলন্দাজদের মদত না পেলে ওদের আমরা ঘায়েল করতে পারব না।'

জোর হাঁকানোর দরুন আর গুলিগোলার শব্দে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ইয়েমাকোভের ঘোড়াটা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসতে বসতে তিরস্কারের সুরে গ্রিগোরিকে সে বলল, 'আমি তাহলে তোমাকে কী বললাম?'

গুলিগোলার ভেতর দিয়ে ইয়েমাকোভকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখে গ্রিগোরি উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবে, 'সোজা রাস্তা ধরে চলতে গেল কী বলে? মেশিনগানের গুলিতে কাটা পড়বে যে! নাবালের ভেতরে ঢুকে পড়লেই ত পারত, তারপর সোঁতা ধরে না হয় ওপরে উঠে পাহাড়ের আড়াল দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে যেত নিজের দলের সেপাইদের কাছে।' ইয়েমাকোভ প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে নাবাল পর্যন্ত চলে গিয়ে ডুব দিল খাতের ভেতরে। ওপাশ দিয়েও বেরোতে দেখা গেল না ওকে। 'যাক তাহলে ঠিকই ধরেছে। এবারে ঠিক পৌঁছে যাবে।' এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গ্রিগোরি শুয়ে পড়ে টিলার পাশে, ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট পাকায়।

একটা অদ্ভুত ঔদাসীন্য পেয়ে বসল ওকে। না, কসাকদের ও মেশিনগানের গুলির মধ্যে বার করে নিয়ে যাবে না। কোন মতেই না। আক্রমণ করতে যেতে হয় অফিসারদের ঝটিকা বাহিনীর কম্পানিগুলো যাক। ওরা গিয়ে দখল করুক গে উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া। এই এখনই টিলার নীচে শুয়ে শুয়ে সরাসরি লড়াই থেকে দূরে সরে থাকার চিন্তা প্রথম মাথায় ঢুকল গ্রিগোরির। এই মুহূর্তে ওর এহেন মনোভাবের কারণ কাপুরুষতা নয়, মৃত্যুভয় নয়, এমনকি মিছিমিছি লোকক্ষয়ও নয়। কিছুক্ষণ আগেও নিজের কিংবা ওর অধীনস্থ কসাকদের জানের এতটুকু পরোয়া না করে সে লড়াই করেছে। কিন্তু এখন কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। . . . আশেপাশে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটছে তার বিরাট অর্থহীনতা এর আগে আর কখনও ও এত বেশি স্পষ্ট করে অনুভব করে নি। কপিলোভের সঙ্গে কথাবার্তা না ফিট্‌জহেলাউরভের সঙ্গে ওর বচসা, নাকি দুটো ঘটনারই যোগফল - কোনটা ওর এই আকস্মিক ভাবোদয়ের কারণ বলা না গেলেও ও ঠিক করে নিয়েছে যে গুলিগোলার মধ্যে আর যাবে না। অস্পষ্ট ভাবে ও বুঝতে পারছিল

যে বলশেভিকদের সঙ্গে কসাকদের মিটমাট করিয়ে দেওয়া ওর কাজ নয়, ওর নিজের পক্ষেও সর্বান্তঃকরণে সে রকম মিটমাট মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে যারা মনেপ্রাণে ওর বিরোধী, যারা ওর প্রতি বৈরভাবাপন্ন, ফিট্জহেলাউরভের মতো এই সব লোকজন, যারা ওকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে, যাদের প্রতি ওর নিজের ঘৃণাও কোন অংশে কম নয় – তাদের স্বার্থ রক্ষা করতেও ও আর চায় না, পারছেও না। আবার ওর সামনে আগের মতোই নিষ্করুণ মূর্তিতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ওর সেই পুরনো দ্বন্দ্ব। 'লড়াই করে মরুক গে ওরা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। যেই ডিভিশনের ভার আমার হাত থেকে নিয়ে নেবে অমনি বলব আমাকে দল থেকে ছাড়িয়ে লড়াইয়ের ময়দানের পিছনে পাঠিয়ে দিতে। অনেক হয়েছে!' এই কথা ভাবতে ভাবতে ও মনে মনে ফিরে যায় কপিলোভের সঙ্গে তর্কে। নিজেকে আবিষ্কার করে সেই জায়গায় যেখানে লাল ফৌজের হয়ে যুক্তি দেখায়। 'চীনেরা খালি হাতে লালদের দলে এসে ভিড়ছে, ওদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। সামান্য সেপাইয়ের মাইনে পাচ্ছে, তার বদলে রোজ প্রাণের ঝুঁকি নিচ্ছে। তাছাড়া মাইনেই বা কী বলি ওটাকে? ও কয়টা পয়সা দিয়ে কীই বা ছাই কেনা যায়? দু'এক হাত তাস খেলে হেরে গেলেই ত গেল সেই পয়সা।... তার মানে দেখা যাচ্ছে স্বার্থটাই সেখানে বড় কথা নয়, আরও অন্য কিছু আছে।... অথচ এদিকে মিত্রপক্ষ অফিসার পাঠাচ্ছে, ট্যাঙ্ক আর কামান পাঠাচ্ছে, এমনকি ওই যে খচ্চরও পাঠিয়েছে! পরে এসমস্তের জন্যে তারা চেয়ে বসবে একগাদা রুবল। এইখানেই ত তফাৎ! হ্যাঁ, এসব নিয়ে আবার আমাদের তর্কাতর্কি হবে আজ সন্ধ্যায়। দপ্তরে ফিরে গিয়ে ওকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলব, 'তফাত কিছু আছে কপিলোভ, তুমি আমায় ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না।' '

কিন্তু তর্ক করা আর হয়ে উঠল না। সেদিন বিকেলের দিকে কপিলোভ মজুদ বাহিনী হিসেবে চার নম্বর রেজিমেন্ট যেখানে ছিল সেই জায়গায় রওনা দিল। পথে একটা উড়ো বুলেট লেগে সে মারা গেল। দু'ঘণ্টা পরে গ্রিগোরি জানতে পেল সে সংবাদ।

পরদিন সকালে জেনারেল ফিট্জহেলাউরভের পাঁচ নম্বর ডিভিশনের ইউনিটগুলো লড়াই করে উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া দখল ক'রে ফেলল।

বারো

গ্রিগোরি চলে যাবার দিন তিনেক পরে মিত্‌কা কোরশুনভ এসে হাজির হয়েছিল তাতারস্কি গ্রামে। এসেছিল সে একা নয়, তার সঙ্গে ছিল পিটুনি বাহিনীর আরও দু'জন সঙ্গী। ওদের একজন মাঝবয়সী এক কাল্‌মিক, মানীচ্‌ না কোথাকার লোক যেন। অন্যজন রাস্‌পপিন্‌স্কায়া জেলার বিশ্রীমতন চেহারার এক কসাক। কাল্‌মিকটাকে মিত্‌কা অবজ্ঞাভরে বলত 'মিটমিটে', রাস্‌পপিন্‌স্কায়ার বেহদ্দ মাতাল আর বদমাশটাকে সম্মান দেখিয়ে তার পুরো নাম ধরে সিলান্তি পেত্রোভিচ বলে ডাকত।

স্পষ্টই বোঝা যায় পিটুনি বাহিনীতে থেকে মিত্‌কা দন ফৌজের জন্য কম করে নি। গত শীতকালের মধ্যে ওর পদোন্নতি ঘটল, প্রথমে সার্জেন্ট-মেজর, পরে জুনিয়র কর্ণেট। গ্রামে সে যখন এলো তখন তার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে পুরোদস্তুর অফিসারের উর্দি। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে পিছু হটে দনের ওপারে চলে যাবার পর তার দিনকাল নেহাৎ মন্দ কাটে নি। খাকী রঙের আঁটোসাঁটো পাতলা মিলিটারী শার্টটা ওর চওড়া দুই কাঁধে টানটান হয়ে আছে, শক্ত খাড়া কলারের ওপর দিয়ে ফেটে বেরোচ্ছে চর্বিওয়ালা ঘাড়ের গোলাপী চামড়ার ভাঁজ, দু'পাশে ডোরা দেওয়া নীল হুইপ্‌কর্ড পাতলুনটা এমন ভাবে সেঁটে আছে যেন এই বুঝি ফেটে যাবে পাছার দিকটাতে। ... মিত্‌কার বাইরের যা জাঁকজমক তাতে এই হতচ্ছাড়া বিপ্লব না ঘটলে আজ হয়ত বা সে আতামান রক্ষিদলের সৈনিক হয়ে প্রাসাদে বাস করত, মহামান্য সম্রাটের পবিত্র দেহ রক্ষার দায়িত্বে থাকত। কিন্তু তা হতে না পারলেও জীবন সম্পর্কে মিত্‌কার কোন অভিযোগ নেই। অফিসারের পদ সেও পেয়েছে, তবে গ্রিগোরি মেলেখভের মতো নিজের মাথার ঝুঁকি নিয়ে নয়, বেপরোয়া বীরত্ব দেখিয়ে নয়। পিটুনি বাহিনীতে কাজ করে অনুগ্রহ লাভ করতে গেলে সম্পূর্ণ আলাদা গুণের দরকার। ... আর সে সমস্ত গুণ মিত্‌কার বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। কাউকে বলশেভিক সন্দেহে ধরা হলে কসাকদের ওপর বিশেষ আস্থা না রেখে মিত্‌কা নিজে তাকে শায়েস্তা করত, কোন ফেরারী সৈন্য ধরা পড়লে নিজের হাতে বেত হাঁকড়িয়ে বা ডাণ্ডা চালিয়ে তাকে সিধে করতে এতটুকু কুণ্ঠা ওর হত না। আর বন্দীদের জেরা করার ব্যাপারে – পুরো বাহিনীতে ওর কোন জুড়ি ছিল না। এমনকি ওদের দলের কসাক-সেনাপতি প্রিয়ানিশ্‌নিকভ নিজেও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলত, 'না মশাই, আপনারা যাই বলেন না কেন, কোরশুনভের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন সাধ্য কারও নেই। মানুষ নয়, একটা দানব বিশেষ।' এছাড়া আরও একটা উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল মিত্‌কার। যখন কোন বন্দীকে গুলি করে মারার এক্তিয়ার পিটুনি বাহিনীর

থাকত না, অথচ তাকে জ্যান্ত ছেড়ে দেওয়াটাও সঠিক বলে বিবেচিত হত না তখন তার দণ্ড হত শারীরিক শাস্তি - বেতের বাড়ি। সেই শাস্তি দেওয়ার ভার পড়ত মিত্কার ওপরে। শাস্তি সে এত ভালো ভাবে দিত যে পঞ্চাশটা ঘা পড়ার পরই আসামী হড়হড় করে রক্তবমি শুরু করত আর একশ'টা ঘায়ের পর লোকটার বুকের আওয়াজ শোনার জন্য অপেক্ষা না করে নিশ্চিন্তমনে তাকে চটকাপড়ে জড়িয়ে ফেলা যেত। . . . মিত্কার হাতে শাস্তি পেয়ে আজ পর্যন্ত কেউ জ্যান্ত ফিরে আসতে পারে নি। ও নিজেই অনেক সময় হাসতে হাসতে বলত, 'যতগুলো লালকে আমি চাবকে মেরে শেষ করেছি তাদের গা থেকে সমস্ত পাতলুন আর ঘাগরা ছাড়িয়ে নিতে পারলে গোটা তাতারস্কি গাঁয়ের সব্বাইকে কাপড় পরানো যেত।'

ছেলেবেলা থেকেই মিত্কার স্বভাবের মধ্যে নিষ্ঠুরতা ছিল। পিটুনি বাহিনীতে ঢুকে তার উপযুক্ত প্রয়োগ ত ঘটলই, এমনকি কোন রকম লাগাম না থাকায় দানবীয় আকারে পল্লবিত হয়ে উঠল। ওর কাজের যা ধরন, সেই সূত্রে অফিসার-সমাজের যত তলানি বাহিনীতে এসে জোটে, তাদের সঙ্গে - যত সব নেশাখোর, নারী ধর্ষণকারী, লুটেরা এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বদলোকদের সঙ্গে ওর সংযোগ ঘটল। ওরা লাল ফৌজের ওপর নিজেদের ঘৃণা থেকে যা কিছু ওকে শেখাল সে সবই মিত্কা প্রবল উৎসাহে চাষীসুলভ অধ্যবসায়ে আয়ত্তে এনে ফেলল। পরে গুরুদের ছাড়িয়ে যেতেও তার বিশেষ অসুবিধা হল না। কোন অফিসার যেখানে স্নায়ুদৌর্বল্যের দরুন অন্য লোকের কষ্ট আর রক্ত দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না, সেখানে মিত্কা শুধু হলদে ফুলকির ছিটধরা চোখদুটো কোঁচকায়, কাজ শেষ অবধি করে ছাড়ে।

কসাক ইউনিট থেকে শস্তায় বাজি মাত করার জায়গায় - কসাক-সেনাপতি প্রিয়ানিশ্‌নিকভের পিটুনি বাহিনীতে পড়ে এই হল মিত্কার পরিণতি।

গ্রামে আসার পর পথে দেখা হতে মেয়েরা তাকে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানালে পাল্টা নমস্কার জানানোর বিশেষ কোন প্রয়োজন বোধ করে না মিত্কা। গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে কদমচালে ঘোড়া চালিয়ে সে চলল বাড়ির দিকে। আধপোড়া, ধোঁয়ায় কালো ফটকের সামনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, হাতের লাগাম কাল্মিকটার হাতে দিয়ে দুই পা অনেকখানি ফাঁক করে হেঁটে ঢুকল বাড়ির উঠোনে। সিলান্তির সঙ্গে নিঃশব্দে একপাক ঘুরল বাড়ির ভিতটার চারধারে। কিছু কাচের টুকরো আগুনে গলে তালগোল পাকিয়ে পড়ে ছিল, ফিরোজা রঙ ঝলমল করছিল তাতে। চাবুকের ডগা দিয়ে সেগুলো ছুঁয়ে উত্তেজিত হয়ে ধরা গলায় মিত্কা বলল, 'পুড়িয়ে দিয়েছে। . . . চমৎকার ছিল বাড়িটা। গাঁয়ের সেরা বাড়ি ছিল। পুড়িয়েছে আমাদেরই গাঁয়ের লোক, মিশ্‌কা কশেভয়। দাদুকেও মেরেছে

ও-ই। বুঝলে পিলাতি পেত্রোভিচ, আমার ভিটের ছাই দেখার জন্যে ফিরে আসতে হল আমাকে।'

'ওই যে কশেভয়ের কথা বললে, ওদের কেউ আছে এখন গাঁয়ের বাড়িতে?' সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল পিলাতি।

'আছে বলেই ত মনে হয়। ওদের আমরা পরে দেখে নেব। . . . আপাতত চল আমাদের তালইয়ের বাড়ি যাওয়া যাক।'

মেলেখভদের বাড়ির রাস্তায় বগাতিরিওভের ছেলের বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে মিত্কা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মা কি দনের ওপার থেকে ফিরেছে?'

'এখনও ফিরেছে বলে ত মনে হয় না, মিত্রি মিরোনিচ।'

'আর তালইমশাই মেলেখভ, বাড়িতে আছে?'

'বুড়োর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'বুড়ো বাড়িতেই আছে। গ্রিগোরি ছাড়া ওদের পরিবারের সবাই বাড়িতে। পেত্রো মারা গেছে গত শীতকালে - শুনেছ নিশ্চয়ই?'

মিত্কা মাথা নাড়াল, দুলকি চালে ঘোড়া ছেড়ে দিল।

সে চলেছে নির্জন রাস্তা ধরে। ওর বেড়ালের মতো হলদে চোখের দৃষ্টি এখন শান্ত, তৃপ্ত। কিছুক্ষণ আগের আবেগ চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। মেলেখভদের বাড়ির দিকে ঘোড়া চালিয়ে যেতে যেতে সঙ্গীদের কাউকেই বিশেষ ভাবে উদ্দেশ্য না করে অনুচ্চস্বরে বলল, 'এই ত অবস্থা নিজের গাঁয়ে এসে! এখন খাবার খেতে হলেও যেতে হবে কুটুমবাড়িতে। . . . যাক গে, এখনও অনেক বোঝাপড়ার বাকি আছে!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চালাঘরে একটা ফসলতোলা কল মেরামত করছিল। ঘোড়সওয়ারদের দেখে এবং তাদের মধ্যে মিত্কা কোরশুনভকে চিনতে পেরে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে।

'আসতে আজ্ঞা হোক,' ফটকের পাল্লা খুলে ধরে সাদরে সে বলল। 'অতিথি দেখে বড় খুশি হলাম! সবাইকে নমস্কার জানাই!'

'কী খবর তালুইমশাই? সবাই বেঁচেবর্তে আছে ত?'

'ভগবানের কৃপায়, এখন অবধি মন্দ নয়। তাহলে তুমি কি এখন অফিসার হলে?'

'কেন, তুমি কি ভেবেছিলে শুধু তোমার ছেলেরাই অফিসারের সাদা কাঁধপটি পরে ঘুরে বেড়াতে পারে?' শিরা ওঠা লম্বা হাতখানা বুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদের সুরে মিত্কা বলে ওঠে।

'আমার ছেলেদের ওগুলো পাবার জন্যে তেমন গরজ ছিল না,' মৃদু হেসে

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জবাব দিল, আগন্তুকদের আগে আগে হেঁটে চলল, কোথায় ঘোড়া রাখতে হবে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য।

অতিথিপরায়ণা ইলিনিচ্না ওদের ভালো করে খাওয়াল। খাওয়াদাওয়ার পর শুরু হল কথাবার্তা। মিত্কা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতে থাকে ওদের বাড়ির লোকদের যাবতীয় খবর। কথাবার্তার মধ্যে সারাক্ষণ চুপচাপ থাকে, রাগ বা দুঃখের কোন প্রকাশ দেখা যায় না ওর মধ্যে। শেষে একবার যেন নেহাৎই কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল মিশ্কা কশেভয়ের বাড়ির কেউ গ্রামে আছে কিনা। বাড়িতে মিশ্কার মা আর পরিবারের ছোট বাচ্চারা আছে জানতে পেরে সবার অলক্ষ্যে সিলান্তির দিকে চট করে তাকিয়ে চোখ টিপল সে।

অতিথিরা তাড়াতাড়ি যাবার আয়োজন করতে থাকে। ওদের এগিয়ে দিতে দিতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জিজ্ঞেস করল, 'কত দিন গাঁয়ে থাকবে বলে ভাবছ?'

'এই দু'-তিন দিন।'

'মা'র সঙ্গে দেখা করবে ত?'

'দেখা যাক ব্যাপার কী রকম দাঁড়ায়।'

'এখন কত দূর যাচ্ছ?'

'কাছেই। . . . গাঁয়ের কারও কারও সঙ্গে দেখা করে আসতে হয়। আমরা শিগ্গিরই ফিরে আসব।'

মিত্কা আর তার সঙ্গীরা মেলেখভদের কাছে ফিরে আসার আগেই সারা গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল, 'কোরশুনভ কাল্মিকদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে, কশেভয় পরিবারের সবাইকে কেটে খুন করে ফেলেছে।'

এসবের কিছুই পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের কানে যায় নি। কামারের বাড়ি থেকে একটা ঘাসকাটা যন্ত্র সারাই করে নিয়ে এসে ফসল তোলা কলটায় যেন্ত্র হাত লাগানোর জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় ইলিনিচ্না ওকে ভেতরে ডাকল।

'এদিকে এসো দেখি গো একবারটি। আরে চটপট এসোই না ছাই!'

বুড়ির গলায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে আতঙ্কের ভাব। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আশ্চর্য হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভেতরে পা বাড়াল।

নাতালিয়া চুল্লীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ফেকাসে, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। ইলিনিচ্না চোখের ইশারায় আনিকুশ্কার বৌকে দেখিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ওগো, খবর শুনেছ?'

'আর দেখতে হবে না, গ্রিগোরির একটা কিছু হয়েছে। হা ভগবান, রক্ষা কর!' ভাবতেই পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে। মুখ ফেকাসে হয়ে যায়। ভয়ে, আতঙ্কে, তার ওপর কেউ কিছু খুলে বলছে না

দেখে ভয়ানক খেপে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে বুড়ো, 'শিগ্‌গির বলেই ফেল না ছাই, হতচ্ছাড়ীর দল। কী হয়েছে? গ্রিগোরির কিছু হয়েছে?' বলতে বলতে চিৎকারের ফলে যেন জোর বল হারিয়ে ফেলে, ধপ করে বসে পড়ে বেঞ্চের ওপরে, হাঁটুদুটো ঠকঠক করে কাঁপতে থাকায় তার ওপর হাত বুলায়।

দুনিয়াশ্‌কারই প্রথম মাথায় খেলে যে বাবা হয়ত গ্রিগোরির কোন খারাপ খবর এসেছে ভেবে ভয় পাচ্ছে। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না বাবা, ছোড়দার কোন খবর নয়। মিত্রি খুন করেছে কশেভয়দের বাড়ির সবাইকে।'

'খুন করেছে? কে, কাকে?' সঙ্গে সঙ্গে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের বুকের ভার নেমে যায়। দুনিয়াশ্‌কা যা বলল তার অর্থ তখনও বুঝতে না পেরে ফের প্রশ্ন করে, 'কশেভয়দের? মিত্রি?'

আনিকুশ্‌কার বৌ ছুটে এসেছিল সংবাদটা দিতে। ঠেকে ঠেকে সে শুরু করে বৃত্তান্ত দিতে।

'আমাদের বাছুরটা খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, খুড়ো। কশেভয়দের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি মিত্রি আর তার সঙ্গে আরও দু'জন সেপাই ওদের উঠোনে গিয়ে ঢুকল। পরে ঢুকল গিয়ে বাড়ির ভেতরে। আমি ভাবছি বাছুরটা হাওয়া কল ছেড়ে দূরে যেতে পারে না। সেদিন আবার আমারই পালা ছিল কিনা বাছুরগুলো চরানোর...'

'চুলোয় যাক তোর বাছুর। ও দিয়ে আমার কী হবে?' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে ওর কথায় বাধা দিয়ে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'ওরা ত ঘরের ভেতরে ঢুকল,' উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে চলে। 'এদিকে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপিক্ষে করতে থাকি, মনে মনে ভাবি, 'ভালো কোন মতলব নিয়ে এসেছে বলে ত মনে হয় না।' তারপরই সেখানে শুরু হয়ে গেল চিৎকার চেঁচামেচি, কানে এলো মারের আওয়াজ। আমি ত ভয়ে মরে যাই। পালাব বলে বেড়ার ধার থেকে সরেছি এমন সময় পেছনে ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, তোমাদের মিত্রিটা বুড়ির গলায় একটা ফাঁস লাগিয়ে হিড়হিড় করে টেনে আনছে মাটির ওপর দিয়ে—ঠিক যেন একটা কুকুর! হে ভগবান, মাপ কর! বুড়িকে টানতে টানতে নিয়ে গেল চালাঘরের দিকে। বেচারির মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই—হয়ত এর মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। মিত্রির সঙ্গে যে কাল্‌মিকটা ছিল সেটা চালের আড়ার ওপর লাফিয়ে উঠে গেল।... দেখি ফাঁসদড়ির একটা কোণ ওর হাতে ছুঁড়ে দিয়ে মিত্রি চেঁচিয়ে বলছে, 'কষে টান, টেনে আচ্ছা করে গিঁট বাঁধ!' ওঃ তখন আমার যা ভয়। আমার চোখের সামনে বেচারি বুড়িকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারলে গো! এরপর ওরা লাফিয়ে ঘোড়ায়

চড়ে গলি ধরে ছুটল – কাছারি বাড়ির দিকে বলেই আমার মনে হল। ঘরের ভেতরে ঢুকতে আমার ভয় হল। . . . তবে দেখেছি দরজার নীচ দিয়ে বারান্দার ধাপ বয়ে রক্তের ধারা গড়াচ্ছে। ভগবান করুন, আর কখনও যেন এমন জিনিস চোখে দেখতে না হয়!'

'ভগবান আমাদের ভালো অতিথি জুটিয়ে দিয়েছেন দেখছি।' উৎসুক দৃষ্টিতে বুড়োর দিকে চেয়ে ইলিনিচ্না বলে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভীষণ উত্তেজনা নিয়ে বৃত্তান্তটা শুনল। একটি কথাও না বলে সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

একটু বাদে ফটকের কাছে মিত্কা আর তার সাঙাতদের উদয় হল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গা ঝাড়া দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে যায় ওদের সামনাসামনি।

বেশ দূর থেকেই বুড়ো হেঁকে বলে, 'থাম! আমার উঠোনে ঘোড়া বাঁধতে পারবে না।'

'কী হল গো তালইমশাই?' মিত্কা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'ফিরে যাও!' একেবারে কাছে ঘেঁসে এসে মিত্কার ঝিকিমিকি হলুদ চোখের ওপর সোজা দৃষ্টি রেখে দৃঢ় কণ্ঠে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলে, 'রাগ কোরো না, কিন্তু আমার বাড়িতে তোমাকে থাকতে দেবার ইচ্ছে নেই আমার। ভালোয় ভালোয় চলে যাও, পথ দেখ।'

'ও-ও।' মিত্কা টেনে টেনে বলল - যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। ওর মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। 'তাড়িয়ে দিচ্ছ তাহলে?'

'আমার বাড়ি নোংরা করতে দেবো না আমি!' দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বুড়ো আবার বলল। 'আর কখনও আমার বাড়ির চৌকাট মাড়াতে এসো না বলে দিচ্ছি। জল্লাদদের সঙ্গে আমাদের মেলেখভদের কোন আত্মীয়তা নেই – এই হল সাফ কথা!'

'বুঝেছি! কিন্তু বড় বেশি দয়ার সাগর যেন হয়ে উঠেছ তালইমশাই!'

'তা দয়ামায়া কাকে বলে তুমি বুঝবে কী করে, বিশেষ করে যখন মেয়েমানুষ আর বাচ্চা ছেলেপুলেদের ধরে ধরে খুন করছ! ওঃ কী জঘন্য কাজে হাত লাগিয়েছ মিত্রি! . . . তোমার বাপ বেঁচে থাকলে আজ তোমায় দেখে মোটেই খুশি হতেন না!'

'আহাম্মক বুড়ো, তুমি কি বলতে চাও ওদের সঙ্গে গদগদ ব্যবহার করব! আমার বাপকে মেরেছে, দাদুকে মেরেছে, আর আমি ওদের গালে চুমু খেয়ে খ্রীষ্ট অবতার সাজব? তুমি . . . তুমি জাহান্নামে যাও!' মিত্কা ক্ষিপ্ত হয়ে লাগামে হেঁচকা টান মেরে গেটের বাইরে নিয়ে যায় ঘোড়া।

'মুখ খারাপ কোরো না মিত্রি, তুমি আমার ছেলের বয়সী। তোমার সঙ্গে

আমাদের ঝগড়াবিবাদের কিছু নেই। ভালোয় ভালোয় চলে যাও, ভগবান তোমায় দেখবেন।'

আরও বেশি ফেকাসে হয়ে যেতে যেতে শাসানোর ভঙ্গিতে চাবুক দোলাতে থাকে মিত্কা। খসখসে গলায় চেঁচিয়ে বলে, 'আমায় পাপের পথে ঠেলে দিও না বলছি, পাপের পথে ঠেলে দিও না আমায়। নাতালিয়ার জন্যে আমার নেহাৎ দুঃখু হয়, নইলে দেখিয়ে দিতাম তোমার ওই দয়ামায়া।... তোমাদের চিনতে আমার বাকি নেই। তোমাদের নাড়িনক্ষত্র আমার জানা আছে। পিছু হটাদের সঙ্গে দনের ওপারে যাও নি যে বড়? লালদের দলে ভিড়েছ? হুঁ হুঁ... তোমাদের মতো সব শুয়োরের বাচ্চাকে কশেভয়দের মতো লটকানো দরকার। চল ভাইসব, আর নয়। ওরে ন্যাংড়া কুত্তা, দেখিস, আমার খপ্পরে যেন পড়িস নে! আমার আঙুলের ফাঁক গলিয়ে পালাতে হবে না। যে অতিথিসেবা তুমি আমায় করলে তা মনে থাকবে! অমন আত্মীয় আমার ঢের দেখা আছে!...'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কাঁপা কাঁপা হাতে ফটকের পাল্লা খিল দিয়ে বন্ধ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ফিরে এলো।

'দূর করে দিয়েছি তোমার ভাইকে,' নাতালিয়ার দিকে না তাকিয়েই সে বলল।

নাতালিয়া চুপ করে রইল, যদিও শ্বশুরের আচরণে মনে মনে ওর সায়ই ছিল। কিন্তু ইলিনিচ্না তাড়াতাড়ি ক্রুশচিহ্ন এঁকে ঠাকুর প্রণাম করে খুশির সুরে বলে উঠল, 'ভগবান বাঁচালেন! আপদ বিদেয় হল! মন্দ কথা বললাম বলে মনে কিছু কোরো না, নাতালিয়া লক্ষ্মীটি। কিন্তু তোমাদের মিত্কাটা একটা ভয়ঙ্কর দুশমন হয়ে উঠেছে! কাজটাও বেশ জুটিয়েছে যা হোক। আর দশজন কসাকের মতো খাঁটি ফৌজের চাকরী নয়। দ্যাখ কাণ্ড! – ঢুকল গিয়ে কিনা পিটুনি দলে! জল্লাদ হয়ে নিরীহ বাচ্চাদের তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে মারা, বুড়িদের ফাঁসিতে লটকানো – এ কি কসাকদের কাজ হল? মিশ্কার কাজের জন্যে ওরা দায়ী হতে যাবে কেন? তাহলে ত লালেরাও গ্রিশকার জন্যে তোমাকে আমাকে মিশাত্কা আর পলিউশ্কাকেও সাবাড় করে দিতে পারত। কিন্তু ওরা আমাদের মারে নি, আমাদের দয়া দেখিয়েছে! না, ভগবান রক্ষে করুন, এতে আমার সায় নেই!'

রুমালের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে নাতালিয়া শুধু বলল, 'আমি কিন্তু আমার ভাইয়ের পক্ষ নিচ্ছি না মা।...'

সেই দিনই মিত্কা চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। শোনা গেল সে নাকি কার্গিন্স্কায়ার কাছাকাছি কোন জায়গায় নিজের পিটুনি বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে জুটেছে। বাহিনীর সঙ্গে চলে গেছে দনেৎস প্রদেশের ইউক্রেনীয় বসতিগুলোতে আইনশৃঙ্খলা জারী

করতে। ওখানকার লোকেরা উজানী দলের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল এই তাদের অপরাধ।

মিত্‌কা চলে যাবার পর সপ্তাহখানেক ধরে গ্রামে নানা রকম আলোচনা চলল। বেশির ভাগ লোকই নিজের হাতে বিচারের ভার নিয়ে কশেভয় পরিবারকে এই ভাবে হত্যা করার জন্য ওকে দোষ দিতে লাগল। সমাজের তহবিল থেকে খরচ করে ওদের কবর দেওয়া হল। কশেভয়দের কুঁড়েখানা বেচে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু কোন খদ্দের পাওয়া গেল না। গ্রামের মোড়লের নির্দেশে জানলার পাল্লাগুলো আড়াআড়ি তক্তার ওপর পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেওয়া হল। এর পর অনেক দিন পর্যন্ত ছোট ছেলেপুলেরা ওই ভয়ঙ্কর জায়গাটার ধারেকাছে খেলতে যেত না। বুড়ো-বুড়িরা পোড়ো কুঁড়েঘরটার সামনে দিয়ে যাবার সময় ঠাকুর দেবতার নাম করে ক্রুশ করত, যারা খুন হয়েছে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করত।

এর পর স্তেপের মাঠে ঘাস কাটার সময় এলো। লোকে কিছুকাল আগের এই ঘটনা ভুলে গেল।

গ্রাম আগের মতো কাজকর্ম আর ফ্রন্টের ঘটনা সম্পর্কে নানা গুজবে ডুবে গেল। গৃহস্থদের মধ্যে যারা কাজের উপযোগী গোরুঘোড়া টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল তারা রসদ সরবরাহের গাড়িতে সেগুলো জুততে গিয়ে গজগজ করতে থাকে, গালিগালাজ দিতে থাকে। প্রায় রোজই বলদ আর ঘোড়াগুলোকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে গাড়িতে জুতে জেলা-সদরে পাঠাতে হয়। ফসলকাটার কল থেকে ঘোড়াগুলোকে খোলার সময় বুড়োরা প্রত্যেকবারই লড়াইয়ের কোন শেষ দেখতে না পেয়ে তার মুণ্ডপাত করে। কিন্তু গুলিগোলা, কাঁটাতারের বাণ্ডিল আর রসদ গাড়িতে করে পাঠাতেই হয় ফ্রন্টে। পাঠায়ও ওরা। অথচ এমনই কপাল যে আবহাওয়া ভারী চমৎকার – পশুর খাবারের ঘাস এমন পেকে উঠতে সচরাচর দেখা যায় না। কেটে বিদেকাঠি দিয়ে জড় করে ঘরে তোলার অপেক্ষামাত্র।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘাস কাটার জন্য তৈরি হচ্ছে, দারিয়ার কথা ভেবে বেশ বিরক্ত হচ্ছে মনে মনে। একজোড়া বলদ নিয়ে গেছে কার্তুজের গাড়িতে জুতে। গাড়ি বদলের স্টেশন থেকে ইতিমধ্যে ফিরে আসার কথা। কিন্তু এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, এখন অবধি তার কোন পাত্তাই নেই। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পুরনো ওই বলদজোড়া ছাড়া স্তেপের মাঠে গিয়ে কিছু করাও যাবে না।

সত্যি বলতে গেলে কি, দারিয়াকে পাঠানো উচিত হয় নি। . . . ওর ভরসায় বলদদুটো ছেড়ে দেওয়ার সময় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের মনে খটকা বেধেছিল ঠিকই। সে জানে ফূর্তি করে সময় কাটানোর দিকে দারিয়ার ভারী ঝোঁক,

গেন্নুঘোড়া দেখাশোনা করতে বললেই ওর মুখ বেজার হয়ে যায়। কিন্তু পাঠানোর মতো আর কাউকে পাওয়াও গেল না। দুনিয়াশ্‌কাকে পাঠানো যায় না - অচেনা অজানা কসাকদের সঙ্গে একটা কুমারী মেয়ের অত দূরের রাস্তায় যাওয়া চলে না। নাতালিয়ার বাচ্চাকাচ্চা আছে। বুড়ো নিজেই বা কী করে যায় ওই পোড়ার কার্তুজগুলো নিয়ে? এদিকে দারিয়া এক কথায় রাজী হয়ে গেল। এর আগেও আটাকলে বল, জোয়ার ভাঙানোর কলে বল, কিংবা ঘর গেরস্থালির কাজে এখানে ওখানে - সর্বত্রই সে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে মহা উৎসাহে। একমাত্র কারণ এই যে ঘরের বাইরে সে অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করত। এরকম প্রত্যেকটি যাত্রাই ওর কাছে আমোদফূর্তির হত। শাশুড়ীর কড়া নজরের আড়াল হতে পেরে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে প্রাণ ভরে গল্পগুজব করতে পারে। তাছাড়া ওর নিজের ভাষাতেই, 'পথ চলতি পীরিতও' করতে পারে কোন উদ্যোগী কসাক মরদের সঙ্গে - যদি সে রকম কেউ ওর নজরে পড়ে যায়। অথচ বাড়িতে, এমন কি পেত্রো মারা যাবার পরও ইলিনিচ্‌নার কড়াকড়িতে এতটুকু এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই। যে দারিয়া স্বামী বেঁচে থাকতেই সতীসাধ্বী ছিল না, এখন যেন তাকে মরা স্বামী দেবতার ওপরে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে!

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জানত যে বলদগুলোর ভালোমতো যত্ন হবে না। কিন্তু অন্য কোন উপায়ও তার ছিল না - তাই বড় ছেলের বৌকেই পাঠাতে হল। পাঠাল ত বটে, কিন্তু সারাটা সপ্তাহ তার ভয়ঙ্কর উদ্বেগ আর মানসিক অস্থিরতার মধ্যে কাটল। 'আমার বলদগুলো গেল আর কি!' কত বারই না মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে একথা মনে হয়েছে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে সে।

দারিয়া বাড়ি ফিরে এলো এগার দিনের দিন সকাল বেলা। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সবে মাঠ থেকে ফিরেছে। আনিকুশ্‌কার বৌয়ের সঙ্গে মিলে সে ঘাস কাটছিল, এখন দুনিয়াশ্‌কা আর তাকে মাঠে রেখে গ্রামে এসেছে জল আর খাবারের জন্য। বুড়োবুড়ি আর নাতালিয়া সকালের খাবার খাচ্ছে, এমন সময় জানলার পাশ দিয়ে পরিচিত চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে একটা গাড়ি চলে গেল। নাতালিয়া ঝটপট উঠে ছুটে গেল জানলার ধারে। দেখতে পেল প্রায় চোখ পর্যন্ত ওড়নায় মাথা ঢেকে বলদদুটোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে দারিয়া। বলদদুটো রোগা হয়ে পড়েছে, ক্লান্তিতে ধুকছে।

'এলো নাকি?' খাবারের গ্রাস মুখে তুলে চিবুনোর অবকাশ না পেয়ে বিষম খেতে খেতে বুড়ো জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, দারিয়া।'

'বলদগুলোকে যে চোখে দেখতে পাব সে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভগবানের

অপার মহিমা! হতচ্ছাড়ী বেল্লিক মাগী কোথাকার! ঘরে যে ফিরেছে এটাই আশ্চর্য বলতে হবে,' তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ক্রুশপ্রণাম করতে করতে বিড়বিড় করে বুড়ো বলল।

বলদগুলোর জোয়াল খুলে দারিয়া রান্নাঘরে ঢোকে, গাড়িতে বিছানোর মোটা চাদরখানা চারভাঁজ করে চৌকাটের ওপর রেখে বাড়ির সবাইকে সম্ভাষণ জানায়।

সম্ভাষণের জবাব না দিয়ে ভুরুর তলা দিয়ে দারিয়ার দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সুরে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলে ওঠে, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন গো? আরও হপ্তাখানেক কাটিয়ে এলেই ত পারতে!'

'নিজে গেলেই পারতেন।' মাথা থেকে ধুলোভরা ওড়নাটা খুলতে খুলতে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে দারিয়া।

'অত সময় লাগল কিসে শুনি?' দারিয়ার অভ্যর্থনাটা বেয়াড়া ধরনের হয়ে যাচ্ছে দেখে কথার মোড় ঘুরানোর জন্য ইলিনিচ্‌না বলল।

'ছাড়ছিল না, তাই অত দেরি।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। জিজ্ঞেস করল, 'খ্রিস্তোনিয়ার বৌকে গাড়ি বদলের ঘাঁটি থেকে ছেড়ে দিল, আর তোমায় ছাড়ল না?'

'ছাড়ল না যে!' রাগে জ্বলে ওঠে দারিয়ার চোখদুটো। যোগ করে, 'বিশ্বাস না হয় - যান, গাড়ির সঙ্গে ওদের যে ওপরওয়ালা ছিল তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন গে।'

'তোমার সম্পর্কে ওসব জিজ্ঞেস করতে আমার বয়েই গেছে। তবে এর পরে তুমি বাড়ি বসে থাকবে। তোমায় কোথাও পাঠাতে হলে একমাত্র যমের বাড়ি পাঠাতে হয়।'

'আহা কী ভয় দেখালেন! ভারী ভয় দেখালেন আমাকে! আরে আমি নিজেই যাব না! এর পর পাঠালেও যাব না!'

'বলদগুলো সব ঠিক আছে ত?' এবারে একটু নরম হয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করে।

'ঠিকই আছে। আপনার বলদের কিছু হয় নি। . . .' দারিয়া অনিচ্ছাভরে জবাব দেয়। ওর মুখটা রাতের আঁধারের মতো থমথম করছে।

'পথে কোন নাগরকে ছেড়ে এসেছে, তাইতে অত রাগ,' নাতালিয়া মনে মনে ভাবল।

দারিয়া আর তার নোংরা প্রণয়লীলা সম্পর্কে নাতালিয়ার মনে বরাবরই একটা অনুকম্পা ও বিতৃষ্ণার ভাব ছিল।

সকালের খাবারের পর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাড়ি নিয়ে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় গ্রামের মোড়ল এসে হাজির।

'তোমায় বলতে পারতাম, যাত্রা শুভ হোক, কিন্তু একটু সবুর কর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, এখনই যেয়ো না।'

রাগে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দম প্রায় আটকে আসে। কিন্তু বাইরে শান্ত ভাব বজায় রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আবার গাড়ি চাইতে এসেছ নাকি?'

'না এবারে অন্য গাওনা। সমস্ত দন ফৌজের প্রধান সেনাপতি খোদ জেনারেল সিদোরিন আমাদের এখানে আসছেন। বুঝলে? এখুনি জেলা-সদরের আতামান লোক দিয়ে কাগজ পাঠিয়েছে - হুকুম হয়েছে গাঁয়ের বুড়ো আর মেয়েমানুষদের প্রত্যেককে পঞ্চায়েতের সভায় অবশ্যই হাজির হতে হবে।'

'বলি ওদের কি মাথার ঠিক আছে?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চিৎকার করে ওঠে। 'এরকম একটা ব্যস্ত সময়ের মধ্যে পঞ্চায়েতের সভা কে ডাকে? শীতের জন্যে খড় বিচালি তোলার কাজটা কি তোমার জেনারেল সিদোরিন করবেন?'

'উনি আমার যেমন তেমনি তোমারও,' শান্ত গলায় মোড়ল বলল। 'আমায় যা হুকুম দেওয়া হয়েছে তা-ই করছি। জোয়াল খুলে ফেল দেখি! ভালোমতো অতিথিবরণ করতে হবে। শোনা যাচ্ছে এছাড়া ওর সঙ্গে মিত্রপক্ষের জেনারেলরাও আছেন।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল গাড়ির কাছে। একটু ভেবে বলদের জোয়াল খুলতে লাগল। ওর কথায় কাজ হয়েছে দেখে মোড়ল খুশি হয়ে বলল, 'তোমার ঘুড়ীটাকে ব্যবহার করতে দেবে?'

'ওটাকে দিয়ে তোমার আবার কী হবে?'

'হতচ্ছাড়াগুলো সজারুর কাঁটার ওপর বসলেই ত পারে? হুকুম হয়েছে-এগিয়ে গিয়ে তেনাদের নিয়ে আসার জন্যে অপয়া খাতে তিনঘোড়ার দুটো গাড়ি পাঠানোর। কোথায় পাব আমি অত বড় গাড়ি, ঘোড়াই বা কোথায় পাব - ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না! সেই সাত সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেছি, তখন থেকে ছুটোছুটি করছি। গায়ের পাঁচটা জামা ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে গেল - এখন অবধি মাত্র চারটে ঘোড়া যোগাড় করতে পেরেছি। লোকে সব কাজে বেরিয়েছে - এতটুকু ফুরসৎ নেই কারও। এখন ডাক ছেড়ে কাঁদলেই বা কে ফিরে তাকাবে?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নরম হয়ে ঘুড়ীটা দিতে রাজী হল, এমনকি নিজের স্প্রিংবসানো ছোট্ট গাড়িখানাও দিতে চাইল। হাজার হোক আর্মির কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ আসছেন, তায় আবার সঙ্গে ভিনদেশী জেনারেলরা। জেনারেল শ্রেণীর লোকদের ওপর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চিরকালই অগাধ শ্রদ্ধাশীল।

মোড়লের চেষ্টায় কষ্টেসৃষ্টে তিনঘোড়ার দুটো গাড়ি যোগাড় হল। সম্মানিত-অতিথিদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্য গাড়িদুটোকে পাঠিয়ে দেওয়া হল অপয়া খাতের দিকে। পল্টনের ময়দানে লোকের ভিড় জমতে লাগল। অনেকেই ঘাস কাটার কাজ ছেড়ে স্তেপের মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি গ্রামে ছুটে এসেছে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের কাজকর্ম মাথায় উঠল। সাজগোজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। পরিষ্কার জামা আর দু'পাশে ডোরা দেওয়া বনাত কাপড়ের সালোয়ার পরল, বেশ কয়েক বছর আগে গ্রিগোরি যে টুপিটা এনে ওকে উপহার দিয়েছিল সেটা মাথায় দিল। দারিয়াকে দিয়ে দুনিয়াশ্‌কার জন্য মাঠে জল আর খাবার পাঠিয়ে দিতে বলল বুড়িকে। তারপর গুরুগম্ভীর চালে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল ময়দানের দিকে।

একটু বাদেই হেটমান সড়কের মাথার ওপর একটা ধুলোর ঘূর্ণি উঠে প্রবল ধারায় ধেয়ে আসতে থাকে গ্রামের দিকে। ধুলোর ঝড়ের ভেতর থেকে ধাতুর মতো কী যেন একটা চকচক করে ওঠে, দূর থেকে ভেসে আসে মোটরগাড়ির ভেঁপুর সুরেলা আওয়াজ। অতিথিরা আসছেন দুটো নতুন ঝকঝকে গাঢ় নীল মোটরগাড়িতে। ওদের বেশ খানিকটা পেছনে দূরে কোথায় যেন মাঠ থেকে ঘাসকাটা সেরে যে-সমস্ত ঘাসুড়ে নিজেদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরছে, তাদের পিছে ফেলে টগবগিয়ে ছুটছে তিন ঘোড়ার খালি গাড়িদুটো। গাড়ির জোয়ালের নীচে করুণসুরে ঝুনঝুন বেজে চলেছে ডাকগাড়ির ঘণ্টা, যেগুলো বিশেষ ভাবে এই গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে যোগাড় করে এনেছিল গ্রামের মোড়ল। পলটন-ময়দানে জনতার মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেল। কথাবার্তার গুঞ্জন উঠল, শোনা গেল বাচ্চাদের উল্লাসধ্বনি। মোড়ল ভেবাচেকা খেয়ে ভিড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে গ্রামের সম্মানিত বুড়ো মাতব্বরদের - নুন রুটি দিয়ে অতিথিবরণের* ভার তাদের ওপরই দেওয়াটা শোভনীয়। হঠাৎ পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের ওপর নজর পড়ে গেল তার – মহা খুশি হয়ে ওকেই আঁকড়ে ধরল।

'খ্রীষ্টের দোহাই, বাঁচাও আমায়! তুমি একজন ঝানু লোক, আচার-ব্যবহার জান ... ওদের সঙ্গে কী ভাবে হাত মেলাতে হয়, কী করতে হয় না হয় তোমার জানা আছে। ... তাছাড়া তুমি কাউন্সিলের একজন মেম্বার, তোমার ছেলেও আবার হল গিয়ে ... পায়ে পড়ি ভাই, নুন রুটি নিয়ে তুমিই এগিয়ে যাও। আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে যাচ্ছি, আমার হাঁটুদুটো ঠকঠক করে কাঁপছে।'

এমন একটা সম্মানের ভার পেয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যে কী কৃতার্থ হয়ে গেল তা আর বলার নয়। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে প্রথমটায় গাঁইগুঁই করল। পরে ঘাড়ের মধ্যে মাথাটা গুঁজে চটপট ক্রুশ করে ভগবানের নাম করে নক্সাতোলা তোয়ালে-ঢাকা নুন রুটির থালাখানা হাতে নিল, কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল।

---

* রুশ দেশে অতিথিবরণের প্রাচীন রীতি। - অনুঃ

মোটরগাড়িগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছে পল্টন-ময়দানের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে নানা রঙের বিচিত্র একপাল কুকুর।

আতামানের মুখ ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দিকে ফিরে ফিসফিস করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বোধ করছ . . . অ্যাঁ? ভয় করছে না ত তোমার?' জীবনে এই প্রথম এত হোমরা চোমরা মানুষদের দেখছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ চোখের নীলচে সাদা ডেলাটা ঠেলে আড়চোখে তার দিকে একবার চেয়ে প্রবল উত্তেজনাভরা গলায় বলল, 'নাও, ধর, দাড়িটা ততক্ষণে আঁচড়ে নি। কী হল, ধর!'

মোড়ল বিগলিত ভঙ্গিতে ওর হাত থেকে থালাটা নিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দাড়িগোঁফ আঁচড়ে সমান করে জোয়ান মানুষের মতো বুক চিতিয়ে খোঁড়া পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে এমন ভাবে দাঁড়াল যাতে পায়ের খুঁতটা চোখে না পড়ে। তারপর আবার থালাটা হাতে তুলে নেয়। কিন্তু হাতের মধ্যে সেটা এমন ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে যে মোড়ল ভয় পেয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'পড়ে যাবে না ত হাত থেকে? দেখো কিন্তু!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকায়। থালা পড়ে যাবে কিনা ওর হাত থেকে। অমন বাজে কথাও কেউ বলতে পারে! পরিষদের সদস্য ছিল এক কালে, আতামান সেনাপতির প্রাসাদে সকলের সঙ্গে করমর্দন করেছে সে – আর আজ কোন্ এক জেনারেলকে দেখে কিনা হঠাৎ ঘাবড়ে যাবে? এই হতভাগা পুঁচকে মোড়লটার বোধহয় মাথাই বিগড়ে গেছে!

'আমি, ভায়া ফৌজী পরিষদে যখন ছিলাম তখন খোদ আতামান সেনাপতির সঙ্গে চিনি মিশিয়ে চা খেয়েছিলাম . . .' বলতে শুরু করেছিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, কিন্তু মুখের কথা সে আর শেষ করতে পারে না।

সামনের মোটরগাড়িটা দশ পাখানেক দূরে থাকতেই থেমে পড়েছে। নিখুঁত দাড়িগোঁফ কামানো গাড়িচালক বেশ কায়দা করে লাফিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে নেমে এসে ছোট্ট দরজাখানা খুলে দিল। লোকটার টুপির কানাতটা বিরাট, গায়ের আঁটসাঁট ফৌজী জামার ওপর সরু কাঁধপটি – অ-রুশী ধরনের। খাকী পোশাক পরা দু'জন আর্মি-অফিসার গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে নেমে ভিড়ের দিকে পা বাড়াল। ওরা এগিয়ে আসছে সোজা পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দিকে। এদিকে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সেই যে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মতো। ও অনুমান করল অনাড়ম্বর পোশাক-পরা এই লোকদুটোই জেনারেল হবে, আর যারা পেছন পেছন চলছে, সাজগোজ যদিও বেশ জমকাল গোছের – নেহাতই ওদের সঙ্গের, কর্মচারী। যে দুই আগন্তুক এগিয়ে

আসছিল বুড়ো অপলক দৃষ্টিতে তাদের দেখতে থাকে। যত দেখে ততই ওর চোখে ফুটে ওঠে সরাসরি আশ্চর্যের ভাব। জেনারেলের কাঁধের তকমা কোথায়? কাঁধের ঝালর আর পদকই বা কোথায়? বাইরে থেকে দেখে অতি সাধারণ ফৌজী কেরানীদের সঙ্গে যদি তফাতই না বোঝা গেল তবে কিসের এরা জেনারেল? পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মুহূর্তের মধ্যে দারুণ হতাশ হয়ে পড়ল। ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ও যে এত ঘটা করে তৈরি হয়েছে সে কথা ভেবে আর জেনারেল নামের কলঙ্ক এই জেনারেলগুলোর জন্যও বটে, কেমন যেন আত্মসম্মানে লাগে ওর। ধুত্তোর ছাই, যদি আগে জানা থাকত এ ধরনের জেনারেলদের উদয় হবে তাহলে কি আর ও এত যত্ন করে পোশাকপরিচ্ছদ পরত, ওদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন কাঁপত বা শিহরিত হত? অন্তত পক্ষে রুটির থালা হাতে নিয়ে এমন হাঁদার মতো মোটেই দাঁড়িয়ে থাকত না। তাও আবার রুটিটা ভালো করে সেঁকা হয় নি, সেঁকেছে কোথাকার কোন্ এক শিকনি ঝরানো বুড়ি! না, পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে এর আগে কখনও লোকের হাসির খোরাক হতে হয় নি। কিন্তু এখানে সেটাই ঘটল। এক মিনিটখানেক আগেও সে নিজের কানে শুনেছে ওর পেছনে ছোট বাচ্চাদের হি-হি হাসি। একটা খুদে শয়তান ত তারস্বরে চেঁচিয়ে বলেই উঠল, 'ওরে দ্যাখ দ্যাখ, খোঁড়া মেলেখভটা কেমন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! যেন মাছের কাঁটা গলায় ফুটেছে!' এই সব হাসিঠাট্টা সহ্য করার, খোঁড়া পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট স্বীকার করার যদি এতটুকু সার্থকতাও থাকত! রাগে রি রি ক'রে উঠল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের সর্বাঙ্গ। সব কিছুর মূলে আছে হতভাগা ভীতুর ডিম ওই মোড়লটা! এসে গুচ্ছের আজেবাজে কথা বলে ঘুড়ীটা আর গাড়িটা বাগাল, জিভ বার করে হন্যে হয়ে ছুটল সারা গাঁয়ে গাড়িতে লাগানোর জন্য ঘণ্টা আর ঘুঙুরের খোঁজে। আসল কথা যে-লোক জীবনে ভালো একটা কিছু চোখে দেখল না সে ওই ন্যাকড়ার ফালি পেয়েই খুশি। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকল, এমন জেনারেল ত বাপু পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কখনও দেখে নি! রাজকীয় কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের কথাই ধর না কেন – একজন করে যাচ্ছে – সারা বুক জুড়ে ক্রস আর পদক, পাকানো সোনালি ডুরি। দেখে মনটা নেচে ওঠে – জেনারেল ত নয় যেন সব পটের দেবতা! আর এগুলো – আগাগোড়া সবুজ – যেন কতকগুলো ভুশুণ্ডী কাক। একজনের মাথায় আবার পুরোদস্তুর উর্দি অনুসারে যেমন টুপি থাকা উচিত তাও নেই – তার বদলে আছে মিহি সুতোর জালি কাপড়ে ঢাকা ধুচনির মতো কী একটা। মুখটা একেবারে চাঁছাছোলা কামানো, শত খুঁজেও একগাছা দাড়ির চিহ্ন পাওয়া যাবে না। . . . পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভুরু কোঁচকাল। এত বিরক্ত সে

হয়ে গিয়েছিল যে আরেকটু হলেই থুতু ফেলত। কিন্তু কে যেন পিঠের ওপর জোরে গুঁতো মেরে উঁচু গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'যাও, নিয়ে যাও। . . .'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সামনে পা বাড়াল। জেনারেল ওর মাথার ওপর দিয়ে তাকাল, জনতার ওপর চটপট দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গমগমে গলায় বলল, 'নমস্কার বুড়ো কর্তারা।'

'আপনার কুশল কামনা করি হুজুর!' নানা কণ্ঠে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল গ্রামের লোকেরা।

জেনারেল কৃপাপরবশ হয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের হাত থেকে নুন-রুটি গ্রহণ করল, ধন্যবাদ জানিয়ে থালাখানা তার এড্‌জুটেণ্টের হাতে তুলে দিল।

সিদোরিনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ঢ্যাঙামতন ইংরেজ কর্ণেল। লোকটার শরীরের মাংসপেশীগুলো টানটান, মাথার হেলমেটটা চোখের অনেকটা ওপরে নামিয়ে দেওয়া, তারই আড়াল থেকে নিস্পৃহ কৌতূহলী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে কসাকদের। বলশেভিকদের কবল থেকে দন ফৌজের এক্তিয়ারভুক্ত প্রদেশ মুক্ত হওয়ার পর সিদোরিন ওই সমস্ত এলাকা পরিদর্শনে বের হয়েছে। ককেশাসে ব্রিটিশ সামরিক মিশনের প্রধান জেনারেল ব্রিগ্‌সের নির্দেশে কর্ণেলটি তার সঙ্গী হয়েছে। দোভাষীর মারফত সে বেশ মন দিয়ে কসাকদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে, ফ্রন্টের হালচালের সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছে।

পথের ধকল, স্তেপের মাঠের বৈচিত্র্যহীন দৃশ্য, একঘেয়ে নীরস কথাবার্তা এবং বৃহৎ শক্তির একজন প্রতিনিধির আরও যে-সমস্ত জটিল দায়িত্ব থাকে সে সবের ভারে কর্ণেল রীতিমতো ক্লান্ত। কিন্তু রাজকীয় কাজের স্বার্থ - সব কিছুর ওপরে। সে মন দিয়ে শুনতে লাগল জেলা-সদরের এক বক্তার ভাষণ। প্রায় সবই বুঝতে পারছিল, যেহেতু বাইরের লোকের কাছে গোপন করলেও আসলে রুশ ভাষা সে জানে। সত্যিকারের এক দাম্ভিক ব্রিটিশের দৃষ্টিতে ওর্ধিকিয়ে তাকিয়ে দেখছে স্তেপের এই সমরলিপ্সু সন্তানদের রোদে পোড়া তামাটে, নানা চরিত্রের মুখগুলো। কসাক জনতার দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে নানা জাতের যে পাঁচমেশালি চেহারা তা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। স্লাভ চেহারার একজন কসাক, পাটের মতো চুলের রঙ লোকটার। তার পাশাপাশি যে দাঁড়িয়ে আছে সে লোকটার চেহারা খাঁটি মোঙ্গলীয়। তারই পাশে আরেকজন - কাকের ডানার মতো কালো কুচকুচে এক জোয়ান কসাক। নোংরা পটিতে একখানা হাত ঝোলানো-কব্জা। চাপা গলায় কথা বলছে বাইবেলের সাধুসন্ন্যাসীর মতো দেখতে এক সাদা চুল কুলপতির সঙ্গে। লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো মানুষটি, গায়ে

সেকেলে কায়দার কসাক-চাপকান। বাজী ফেলে বলা যেতে পারে যে ওর শিরায় ককেশাসের পাহাড়ীদের রক্ত বইছে।

ইতিহাস সম্পর্কে কর্ণেলের খানিকটা জ্ঞান ছিল। কসাকদের ভালো করে দেখতে দেখতে সে ভাবছিল শুধু এই বর্বরগুলোকে নয় এমনকি এদের পৌত্র প্রপৌত্রদেরও হুকুম দিয়ে ভারতের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে কোন নতুন প্লাতভেরও* সে সাধ্য হবে না। বলশেভিকদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের পর গৃহযুদ্ধের রক্তক্ষয়ে পাণ্ডুর রাশিয়া বহু কালের মতো আর বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে থাকতে পারছে না। আগামী বেশ কয়েক দশক ব্রিটেনের প্রাচ্যখণ্ড ধরে রাখার পক্ষে বিপদের কোন কারণ দেখা দিচ্ছে না। আর বলশেভিকরা যে হারবে এবিষয়ে কর্ণেলের এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সুস্থ মস্তিষ্কের লোক সে, যুদ্ধের আগে অনেক বছর রাশিয়ায় বাস করে এসেছে। বলাই বাহুল্য, এমন একটা আধা বর্বর দেশে যে কমিউনিজমের ইউটোপীয় ধ্যানধারণার জয় হতে পারে এটা তার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।...

কর্ণেলের মনোযোগ গিয়ে পড়ল মেয়েমানুষদের দলটার ওপর। ওরা নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কানাকানি করছিল। কর্ণেল মাথা না ঘুরিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের ঝড়ঝাপটা খাওয়া চোয়াড়ে মুখগুলো। তার চাপা ঠোঁটে প্রায় অলক্ষিত ফুটে উঠল অবজ্ঞার মৃদু হাসি।

নুন-রুটি হাতে তুলে দিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ লোকের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। ভিওশেনস্কায়ার এক বক্তা জেলার কসাক জনসাধারণের তরফ থেকে আগন্তুকদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল। তার বক্তৃতা শোনার জন্য আর সেখানে না দাঁড়িয়ে ভিড়ের পিছন দিয়ে ঘুরে সে চলে গেল কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিন ঘোড়ার গাড়িগুলোর দিকে।

ঘোড়াগুলো ঘামে নেয়ে উঠেছে, দু'পাশের পাঁজর ঘন ঘন ওঠাপড়া করছে। তিন ঘোড়ার গাড়ির জোয়ালের মূল অংশে ওর ঘুড়ীটাকেই জোতা হয়েছে। সেটার কাছে গিয়ে বুড়ো জামার হাতা দিয়ে তার নাক মুছে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল যাচ্ছেতাই গালিগালাজ দিয়ে এক্ষুনি জোয়াল খুলে ওটাকে বাড়ি নিয়ে যায়। আর কোন মোহ নেই ওর।

এই সময় তাতারস্কির লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিল জেনারেল সিদোরিন। লাল ফৌজের পেছনের এলাকায় থেকে সামরিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ায়

---

* মাতভেই ইভানভিচ প্লাতভ (১৭৫১ - ১৮১৮) - কাউন্ট, দন-কসাক ফৌজ এলাকার কসাক সেনাপতি, অশ্বারোহী বাহিনীর সেনানায়ক। ১৮১২ সালে এবং ১৮১৩ - ১৮১৪ সালে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। - অনুঃ

ওদের খুব করে উৎসাহ দিয়ে সে বলল, 'আমাদের সকলের দুশমনের বিরুদ্ধে আপনারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন। বলশেভিকদের হাত থেকে, ওদের ভয়ানক জোয়াল থেকে একটু একটু করে মুক্ত হচ্ছে আমাদের দেশের মাটি। আমাদের জন্মভূমি কোনদিন ভুলবে না আপনাদের সেবার কথা। আপনাদের গ্রামের যে-সমস্ত মহিলা লাল ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি তাদের আমি পুরস্কার দিতে চাই। যে সব কসাক বীর নারীর নাম এখন ঘোষণা করা হবে তাঁরা যেন সামনে এগিয়ে আসেন!'

অফিসারদের একজন সংক্ষিপ্ত তালিকাটা পড়ে শোনাল। প্রথম নামটাই ছিল দারিয়া মেলেখভার, বাকিগুলো সেই সব বিধবাদের, যাদের স্বামীরা বিদ্রোহের শুরুতে মারা পড়েছিল অথবা সের্দোবস্ক রেজিমেণ্ট আত্মসমর্পণ করার পর কমিউনিস্ট বন্দীদের তাতারস্কিতে নিয়ে এলে যারা দারিয়ারই মতো ওদের নিধনে যোগ দিয়েছিল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দারিয়াকে মাঠে যাবার হুকুম দিয়ে এলেও সে হুকুম ও মানে নি। গাঁয়ের মেয়েদের ভিড়ের মধ্যেই ছিল ও। বেশ সাজগোজ করেছে, যেন কোন উৎসবের সাজে এসেছে।

নিজের নামটা কানে যেতেই আশেপাশের মেয়েদের ভিড় ঠেলে নির্ভয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। চলতে চলতে কিনারায় সাদা লেসলাগানো ওড়নাটা ঠিক করে নেয়, চোখ দুটো মটকায়, অপ্রতিভ হয়ে মুচকি হাসে। দীর্ঘ পথযাত্রা আর প্রণয়লীলার ফলে ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও নারকীয় ধরনের সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। রোদের তাপের ছোঁয়া লাগে নি ওর গালে, পাণ্ডুর গালের ওপর আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে সামান্য কোঁচকানো উৎসুক দু'চোখের উষ্ণ ঝলক। আঁকা ভুরুর লীলায়িত ভঙ্গিমায় আর হাসি হাসি ঠোঁটের প্রান্তে যেন প্রচ্ছন্ন আছে উদ্ধত ও কলঙ্কজনক কিছু একটা।

ভিড়ের দিকে পিছন ফিরে ওর পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক অফিসার। আস্তে করে ঠেলা মেরে তাকে সরিয়ে দিল সে। 'সেপাইয়ের ঘরের বৌকে রাস্তা ছেড়ে দিন!' এই বলে এগিয়ে গেল সিদোরিনের কাছে।

সেণ্ট জর্জ রিবন দেওয়া মেডেলটা এড্জুটেণ্টের হাত থেকে নিয়ে আনাড়ির মতো আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করে সিদোরিন সেটা দারিয়ার জামার বাঁ পাশে বুকের ওপর এঁটে দেয়, মৃদু হেসে দারিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'মার্চ মাসে যে কর্পেট মেলেখভ মারা যায় আপনি তার বিধবা স্ত্রী?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আপনি পাঁচশ' রুবল পুরস্কারও পাবেন। এই যে এই অফিসার আপনাকে

দেবেন। যে অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় আপনি দিয়েছেন তার জন্য আতামান-সেনাপতি আফ্রিকান পেত্রোভিচ বগায়েভ্স্কি এবং দন সরকার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, তাঁদের সমবেদনা প্রকাশ করছেন। . . . আপনার দুঃখে তাঁরা সমব্যথী।'

জেনারেল ওকে যা যা বলল তার সবটা দারিয়া যে বুঝল এমন নয়। মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে এড্জুটেন্টের হাত থেকে সে টাকাগুলো নিল, মুখ টিপে হাসতে হাসতে সরাসরি তাকাল জেনারেলের চোখের দিকে। জেনারেলকে বুড়ো বলা যায় না। দু'জনেই প্রায় সমান লম্বা। দারিয়া লজ্জাশরমের বিশেষ বালাই না রেখে জেনারেলের শুকনো মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সেই মুহূর্তে ওর নিজের সহজাত বেহায়া মনোভাব নিয়ে ও ভাবতে থাকে, 'বড় শস্তা দরে বিকিয়েছে আমার পেত্রো – এক জোড়া বলদের দামের চেয়ে বেশি নয়। . . . তবে জেনারেলটি মন্দ নয়, চলতে পারে।' সিদোরিন অপেক্ষা করছিল কখন দারিয়া যায়। কিন্তু দারিয়া টালবাহানা করতে থাকে। এড্জুটেন্ট আর যে-সমস্ত অফিসার সিদোরিনের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল তারা ভুরু উঁচিয়ে এ ওকে ইশারা করে দেখায় ফূর্তিবাজ বিধবাটাকে। ওদের চোখে খেলে যায় খুশির ঝলক। এমনকি ইংরেজ কর্ণেলটিও চঞ্চল হয়ে উঠল। কোমরের বেল্টটা ঠিক করে নিল, এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপর শরীর ভর দিয়ে দাঁড়াল, তার নিরাবেগ মুখের ওপর ক্ষীণ হাসির মতো কিছু একটা ফুটে উঠল।

'আমি যেতে পারি?' দারিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই!' সিদোরিন তাড়াতাড়ি অনুমতি দিল।

দারিয়া আনাড়ির ভঙ্গিতে টাকাগুলো ওর জামার সামনের ফাঁক দিয়ে ভেতরে গুঁজে ভিড়ের দিকে পা বাড়ায়। এত বক্তৃতা আর অনুষ্ঠানের পর অফিসাররা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে থাকে ওর হাল্কা চঞ্চল পায়ের চলাফেরা।

এবারে সিদোরিনের কাছে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে এগিয়ে আসে মার্তিন শামিলের বিধবা বৌ। ওর পুরনো নোংরা জামাটার ওপর যখন মেডেল এঁটে দেওয়া হল তখন বেচারি বৌটি হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল – সে কান্না এমনই অসহায় আর মেয়েলি তিক্ততায় ভরা যে নিমেষের মধ্যে অফিসারদের মুখ থেকে মিলিয়ে গেল খুশির চিহ্ন। তার জায়গায় ফুটে উঠল সমবেদনার তিক্ত গম্ভীর ভাব।

'আপনার স্বামীও মারা গেছে!' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে সিদোরিন।

কাঁদতে কাঁদতে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে, নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'ওর একঘর ভর্তি বাচ্চাকাচ্চা,' ভারী গলায় কসাকদের মধ্যে কে একজন বলল।

সিদোরিন ইংরেজটির দিকে ফিরে উঁচু গলায় বলল, 'বলশেভিকদের বিরুদ্ধে

লড়াইয়ে যে-সমস্ত স্ত্রীলোক অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আমরা তাঁদের পুরস্কার দিচ্ছি। এঁদের অধিকাংশেরই স্বামী বলশেভিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শুরুতে মারা যান। এই বিধবা নারীরা স্থানীয় কমিউনিস্টদের এক বিরাট বাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়ে তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। প্রথম যে মহিলাকে আমি পুরস্কার দিলাম উনি এক অফিসারের স্ত্রী - নিজের হাতে তিনি নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত এক কমিউনিস্ট কমিসারকে খুন করেন।'

দোভাষী অফিসারটি চটপট ইংরেজিতে বলতে শুরু করল। কর্ণেল শুনে গেল, মাথা নোয়াল। তারপর বলল, 'এই মহিলাদের সাহসিকতায় আমি মুগ্ধ। আচ্ছা জেনারেল, বলুন দেখি, এঁরা কি পুরুষের সমানে সমানে লড়াইয়ে নেমেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে উত্তর দিল সিদোরিন। অসহিষ্ণু হয়ে হাতের ভঙ্গিতে তৃতীয় জনকে কাছে আসতে বলল।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কিছু পরেই অতিথিরা জেলা-সদর ছেড়ে চলে গেল। লোকজন তাড়াতাড়ি ছত্রভঙ্গ হয়ে পলটন ময়দান থেকে দ্রুত ছুটল ঘাস-কাটার মাঠের দিকে। কয়েক মিনিট বাদে, একপাল কুকুরের চেঁচানির মধ্যে মোটরগাড়িগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবার পর গির্জার বেড়ার ধারে রয়ে গেল মাত্র তিনজন বুড়ো।

'বড় বিশ্রী দিনকাল পড়েছে যা হোক!' ওদের একজন অসহায় ভঙ্গিতে দু'হাত ছড়িয়ে বলল। 'সেকালে যুদ্ধে সেন্ট জর্জ ক্রস দেওয়া হত ম-স্ত বড় কাজের জন্যে, বীরত্বের জন্য। আর দিত যাকে তাকে নাকি? সত্যিকারের ডাকাবুকো যারা তাদেরই দিত। ক্রস পাওয়ার মতো ঝুঁকি নিতে পারে এমন লোক খুব কমই ছিল। সাধে কি আর কথায় বলত 'ক্রস নিয়ে বাড়ি ফের, তা নইলে যুদ্ধে মর!' আর আজকাল মেডেল ঝুলাচ্ছে মেয়েমানুষদের গলায়।... তাও যদি সত্যিকারের সে রকম কিছু করার জন্যে হত, তা নয় ত... কসাকরা খেদিয়ে গাঁয়ে নিয়ে এলো, আর ওরা সেই বন্দীগুলোকে, নিরস্ত্র লোকগুলোকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে মারল। এর মধ্যে বীরত্বের কী আছে? ভগবান মাপ করুন, আমার বাপু মাথায় ঢুকছে না!'

আরেক জন বুড়ো চোখে একটু কম দেখে, গায়ে জোরবলও কম। এক পাশে পাটা সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে জেব থেকে ছিট কাপড়ের তৈরি একটা পাকানো বটুয়া টেনে বার করে বলল, 'ওপরওয়ালারা হয়ত চেরকাসক থেকে আরও ভালো দেখতে পান। আমার মনে হয় ওঁরা হয়ত ভেবেছেন মেয়েদেরও টোপ দেওয়া দরকার যাতে সকলের মনেই উৎসাহ আসে, যাতে সবাই জোর লড়াইয়ে নামে। এই একটা মেডেল তায় আবার নগদ পাঁচশ'টা

টাকা – এমন কোন্ মেয়েমানুষ আছে যে এই সম্মানকে ঠেলে সরিয়ে দেবে? এরকম কসাকও হয়ত থাকতে পারে যে ফ্রণ্টে যেতে চায় না, লড়াই এড়িয়ে চলার মতলব করছে, কিন্তু এখন কি আর তার নিরাপদে ঘরে বসে থাকার জো আছে? ওর ঘরের বৌ কান ঝালাপালা করে ছাড়বে ওর যে কোকিল রাতে গায় সে সবার ওপরে টেক্কা মারে। এখন সব মেয়েমানুষই ভাবতে শুরু করবে, 'বলা যায় না, হয়ত আমিও একটা মেডেল পেতে পারি?"

'এটা কিন্তু তুমি ঠিক বললে না ফিওদর ভায়া!' তৃতীয় জন আপত্তি জানাল। 'ওদের পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, তাই পেয়েছে। মেয়েমানুষগুলো বিধবা হয়েছে, নগদ টাকা ঘরসংসারের বিরাট কাজে লাগবে। আর মেডেল ওরা পেয়েছে সাহস দেখানোর জন্যে। মেলেখভদের দারিয়াই প্রথম বিচার করল কোত্লিয়ারভের, ঠিকই করেছে! ভগবান ওদের সকলের বিচারক তা ঠিক, কিন্তু তাই বলে মেয়েদেরও দোষ দেওয়া যায় না। রক্ত স্থির থাকে না, বুঝলে? . . .'

বুড়োরা তর্কাতর্কি আর গালিগালাজ করে চলল, যতক্ষণ না গির্জায় সান্ধ্য উপাসনার ঘণ্টা বাজল। ঘণ্টাওয়ালা প্রথম ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। টুপি খুলে ভক্তিভরে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, গুরুগম্ভীর চালে পা বাড়াল গির্জার দিকে।

তেরো

মেলেখভদের পরিবারের জীবনযাত্রা যেভাবে পালটে গেল তা বিস্ময়কর! এই কিছুদিন আগেও পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নিজেকে পরিবারের পুরোদস্তুর কর্তা বলে উপলব্ধি করতে পারত। বাড়ির সকলে বিনা শর্তে ওকে মেনে চলত। কাজ চলত ঠিক ঠিক নিয়মে, সকলে মিলেমিশে সুখ দুঃখের ভাগ নিত। ওদের রোজকার জীবনযাত্রার মধ্যে বহু বছরের গড়ে ওঠা একটা বেশ গোছাল ভাব দেখা যেত। সমস্ত পরিবারটা ছিল শক্ত বাঁধনে একসঙ্গে বাঁধা। কিন্তু বসন্তকাল থেকে সব ওলটপালট হয়ে গেল। প্রথম ভেঙে বেরিয়ে গেল দুনিয়াশ্কা। সরাসরি বাপের অবাধ্য সে হল না। কিন্তু বাড়ির যে কোন কাজ ওকে করতে হত তাতে ওর অনিচ্ছা স্পষ্ট প্রকাশ পেত। মনে হত কাজ সে করছে নিজের জন্য নয় – যেন ভাড়া খাটছে। বাইরে থেকে সে হয়ে গেছে কুনো, একাচোরা মতন। দুনিয়াশ্কার উজ্জ্বল হাসিও আজকাল বিরল হয়ে গেছে – কচিৎ শোনা যায়।

গ্রিগোরি ফ্রণ্টে চলে যাবার পর নাতালিয়া বুড়োবুড়ির কাছ থেকে দূরে সরে

এসেছে। প্রায় সারাক্ষণ বাচ্চাদের নিয়েই কাটায়, একমাত্র ওদের সঙ্গেই প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলে, ওদের নিয়ে পড়ে থাকে। দেখে মনে হয় ওর ভেতরে ভেতরে কিসের যেন একটা কষ্ট বড় কঠিন হয়ে বাজছে। কিন্তু নিজের সেই দুঃখের কথা পরিবারের কারও কাছে একবারও মুখ ফুটে বলে না। কারও কাছে কোন অনুযোগ সে করে না, নিজের বোঝা নিজেই নীরবে মুখ বুজে বয়ে বেড়ায়।

আর দারিয়ার কথা না বলাই ভালো। রসদের গাড়ি নিয়ে সেই যে বাইরে গিয়েছিল তার পর থেকে ওর ভোল একেবারে পালটে গেছে। শ্বশুরের ওপর আরও বেশি ক'রে মুখ করে, ইলিনিচ্‌নাকে আমলই দেয় না, কারণে অকারণে সবার সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে ঘাস কাটার কাজে হাত লাগায় না। এমন ভাব দেখায় যেন মেলেখভদের বাড়িতে সে আর বেশি দিন থাকছে না।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের চোখের সামনে সংসার ভেসে যেতে চলেছে। ওরা দু'জনে বুড়ো-বুড়িতে নিজেদের মতো থাকে। হঠাৎই যেন বড় তাড়াতাড়ি পারিবারিক সম্পর্কের বাঁধনগুলো টুটে গেল। সম্পর্কের মধ্যে আগের সেই উষ্ণতা আর পাওয়া যায় না। কথাবার্তায় ক্রমেই বেশি করে ফুটে ওঠে বিরক্তি আর দূরত্বের ভাব। . . . এক সঙ্গে টেবিল ঘিরে যখন বসে তখন পরিবারের আগের অটুট চেহারা আর মিলমিশের কিছুই চোখে পড়ে না – মনে হয় নেহাৎই দৈবাৎ এক জায়গায় কয়েকজন মানুষ এসে জড় হয়েছে।

এসবেরই মূলে রয়েছে যুদ্ধ। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এটা বেশ ভালোই বুঝতে পারে। দুনিয়াশ্‌কা বাপ-মায়ের ওপর রেগে আছে, যেহেতু কোন এক সময় ও যে মিশ্‌কা কশেভয়কে বিয়ে করতে পারবে ওর সে আশায় তারা বাধ সেধেছে। অথচ ওর কুমারী মনের সমস্ত আবেগ দিয়ে ও নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবেসেছিল ওই একটি মানুষকেই। নাতালিয়া অমনিতেই চাপা স্বভাবের মানুষ। গ্রিগোরি যে আবার নতুন করে আক্সিনিয়ার কাছে সরে যাচ্ছে মনের গভীরে নীরবে সে যন্ত্রণায় ও ভুগতে থাকে। এ সবই দেখতে পায় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, কিন্তু সংসারের আগের সেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কোন সাধ্য তার নেই। সত্যিই ত, যা ঘটে গেল তার পর একজন কট্টর বলশেভিকের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়েতে সে মত দেয়ই বা কী করে? তাছাড়া ওর মতামতে কীই বা যায় আসে যখন পাত্র হতভাগা ফ্রন্টে কোথায় যেন চরে বেড়াচ্ছে – তাও আবার লাল ফৌজে। গ্রিগোরির ব্যাপারেও তাই: ওটা যদি অফিসার না হত তাহলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ওর মজা টের পাইয়ে দিত। এমন অবস্থা করে ছেড়ে দিত যে আস্তাখভদের উঠোনের দিকে টেরিয়ে তাকানোর সাধ পর্যন্ত ঘুচে যেত

জন্মের মতন। কিন্তু যুদ্ধ মাঝখান থেকে এসে সব গোলমাল করে দিল। বুড়ো যে নিজের মনের মতো করে জীবন কাটাবে, ঘরসংসার করবে সে উপায় রইল না। যুদ্ধ ওকে পথে বসিয়ে দিয়েছে, ওর কাজের সেই আগের উৎসাহ নষ্ট ক'রে দিয়েছে, বড় ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, পরিবারে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে, বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছে। গমের ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাবার মতো ওর জীবনের ওপর দিয়ে গেছে যুদ্ধের ঝড়ঝাপটা। কিন্তু গমের ক্ষেত ঝড়ের পরও মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, ঝলমল করে সূর্যের আলোয়। অথচ বুড়ো পারল না মাথা তুলতে। মনে মনে ও ধুত্তোর বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে – যা হবার তাই হবে!

জেনারেল সিদোরিনের হাত থেকে পুরস্কার পাওয়ার পর দারিয়া বেশ খানিকটা খুশি হয়ে উঠেছিল। সেদিন পলটনের ময়দান থেকে সে ফিরল পরিপূর্ণ সুখ আর উচ্ছ্বাস বুকে নিয়ে। চোখে ঝিলিক তুলে নাতালিয়াকে মেডেল দেখাল।

'ওটা তুমি পেলে কী করে?' নাতালিয়া অবাক হয়ে যায়।

'এটা পেয়েছি আমার ইভান আলেক্সেয়েভিচ দাদাটির জন্যে। তার আত্মার শান্তি হোক। খানকীর বাচ্চা! আর এটা পেয়েছি আমার সোয়ামি পেত্রোর জন্যে।' এই বলে বড়াই করে দন-সরকারের কড়কড়ে নোটের বাণ্ডিলটা খুলে দেখাল।

দারিয়া মাঠে আর গেলই না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ওকে খাবার দিয়ে মাঠে পাঠানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দারিয়া একদম বেঁকে বসল।

'ছাড়ুন দেখি বাবা! পথের ধকলে মরতে বসেছি!'

বুড়ো ভুরু কোঁচকাল। তা দেখে রুক্ষ জবাবটাকে একটু নরম করার জন্য খানিকটা ঠাট্টার সুরে সে বলল, 'এমন একটা দিনে আমাকে জোর করে মাঠে পাঠালে পাপ হবে আপনার। আজ আমার ছুটি!'

'আমি নিজেই নিয়ে যাব,' বুড়ো রাজী হল। 'কিন্তু টাকার ব্যাপারটা কী হবে শুনি?'

'কী আবার হবে টাকার?' দারিয়া অবাক হয়ে ভুরু ওঁচায়।

'বলি, টাকাগুলো দিয়ে করবে কী?'

'সে আমার ব্যাপার! যা আমার খুশি, তাই করব!'

'সে কী? সে কী করে হয়? টাকা ত তুমি পেয়েছ পেত্রোর জন্যে?'

'দিয়েছে আমার হাতে, আপনার ওতে খবরদারি করার কিছু নেই।'

'কিন্তু তুমি এ পরিবারেরই একজন, তাই নয় কি?'

'পরিবারের লোক হলেই বা কী? তার কাছ থেকে আপনি কী আশা করেন বাবা? টাকাটা নিজের হাতে রাখতে চান?'

'পুরোটা অবিশ্যিই নয়। কিন্তু পেত্রো ত আমাদের ছেলে ছিল – না কী বল তুমি? আমরা বুড়ো-বুড়িতে ওর একটা ভাগ নিশ্চয়ই পেতে পারি?'

শ্বশুরের দাবিটার মধ্যে স্পষ্টই জোরের অভাব ছিল। দারিয়া সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর এক হাত নিল। শান্ত গলায় বিদ্রূপ করে বলল, 'কিছু দেব না আমি আপনাকে, এক রুবলও না! আপনাদের কোন ভাগ এতে নেই। যদি থাকত তাহলে আপনার হাতেই দিত। তাছাড়া ভাগ আছে সে চিন্তাই বা মাথায় এলো কী করে? এ ব্যাপারে কোন কথাও হয় নি। আমার টাকার দিকে হাত বাড়াবেন না, পাবেন না!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এবারে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল।

'তুমি আমাদের পরিবারে আছ, আমাদের অন্ন খাও। তার মানে আমাদের সব জিনিসই সকলের হওয়া উচিত। প্রত্যেকে যদি যার যার আলাদা ব্যবস্থা করে তাহলে সংসারে শৃঙ্খলাটা থাকছে কোথায়? এ আমি সহ্য করব না, বলে দিলাম!' সে বলল।

কিন্তু দারিয়া ওর টাকার ওপর ভাগ বসানোর এই চেষ্টাটাও ব্যর্থ করে দিল। নির্লজ্জের মতো হেসে বলে বসল, 'বিয়েটা আমার আপনার সঙ্গে হয় নি বাবা। আজ আপনাদের সঙ্গে আছি, কিন্তু কালই বিয়ে হয়ে গেলে আমার টিকিটি দেখতে পাবেন না এখানে! আর খাইখরচার টাকা আমি দিতে বাধ্য নই। আমি দশ বছর একটানা ঘানি টেনেছি আপনাদের সংসারের।'

'তুই নিজের জন্যে কাজ করেছিস, খানকী মাগী!' রেগেমেগে চিৎকার করে উঠল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। আরও কী সব চেঁচিয়ে বলল সে। কিন্তু দারিয়া সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। ঘাগরার কিনারাটা ঝাপটে বুড়োর নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে গেল সদর মহলে নিজের ঘরে। 'কার পাল্লায় পড়েছ জান না!' বিদ্রূপের হাসি হেসে চাপা গলায় সে বলল।

এখানেই আলোচনার ইতি। সত্যি কথাই, বুড়োর হম্বিতম্বিতে ভয় পেয়ে তার নিজের পাওনা ছেড়ে দেবে দারিয়া সে পাত্রী নয়।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মাঠে যাবার জন্য তৈরি হতে থাকে। যাবার আগে ইলিনিচ্না্র সঙ্গে তার সংক্ষেপে দু'-একটা কথা হল।

'দারিয়ার ওপর একটু নজর রেখো,' সে বলল।

'কেন গো?' ইলিনিচ্না অবাক হয়ে যায়।

'কেন না হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে, যাবার সময় আমাদের কিছু জিনিস পত্তরও হাতিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমার মন বলছে ওর অমন ঢুলঢুলানি অমনি অমনি নয়। . . . হয়ত কোন মানুষ জুটিয়েছে, আজ কালের মধ্যে ঝুলে পড়াটা বিচিত্র নয়।'

'তা হবেও বা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায় দেয় ইলিনিচ্না। 'সংসারে রয়েছে একটা

উট্‌কো লোকের মতো। কিছুই তার ভালো লাগে না, কিছুই মনের মতন নয়। . . . ও এখন হয়েছে একটা ভাঙা হাঁড়ির মতো – যত চেষ্টাই কর না কেন ভাঙা হাঁড়ি কি আর জোড়া লাগে?'

'সে চেষ্টা করে কোন কাজও নেই আমাদের! দেখো বোকা বুড়ি ও বিষয়ে কোন কথা উঠলে আটক্যানোর কথা মনেও ঠাঁই দিও না। যেতে হয় যাক চলে বাড়ি থেকে। আমার ঘেন্না ধরে গেছে ওর সঙ্গে অত ঝকমারি পোয়াতে গিয়ে।' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাড়িতে উঠে বসে। বলদগুলোকে তাড়া লাগাতে লাগাতে কথাটা শেষ করে, 'মাছির হাত থেকে কুকুরের গা বাঁচানোর মতো সব সময় কাজ এড়ানোর চেষ্টা। এদিকে ভালো ভালো জিনিসে ভাগ বসানো আর আড্ডা ফূর্তি মেরে সময় কাটানোর বেলায় ঠিক আছে। পেত্রো নেই, ওর আত্মার শান্তি হোক, এখন এ বালাই আর ঘরে না রাখাই ভালো। মেয়েমানুষ ত নয়, একটা ছোঁয়াচে রোগ ওটা!'

বুড়োবুড়ির এই অনুমান কিন্তু ভুল। বিয়ে করার এতটুকু মতলবও দারিয়ার ছিল না। বিবাহিত জীবনের কথা সে ভাবছিল না। ওর মাথায় তখন ঘুরছিল অন্য চিন্তা।

সেদিন সারাদিন দারিয়া মেলামেশা আর আমোদ ফূর্তি করে কাটাল। এমনকি টাকাপয়সা নিয়ে বুড়োর সঙ্গে খেঁচাখেঁচিও ওর মেজাজ নষ্ট করতে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে ঘুরে ফিরে নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল পদকটা, বার পাঁচেক পোশাক পালটাল, দেখল কোন জামার সঙ্গে সেণ্ট জর্জ ক্রসের ডোরাদার ফিতেটা বেশি মানায়। ঠাট্টা করে বলল, 'এবারে আরও কিছু ক্রস বাগাতে পারলে মন্দ হত না!' তারপর ইলিনিচ্‌নাকে শোবার ঘরে ডেকে নিয়ে তার জামার হাতার মধ্যে কুড়ি রুবলের দু'খানা নোট গুঁজে দিল, বুড়ির গাঁট ধরা হাতখানা নিজের উত্তপ্ত হাতে তুলে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে ফিসফিস ক'রে বলল, 'এটা পেতিয়ার শ্রাদ্ধ শান্তির জন্যে। . . . ওর আত্মার শান্তির জন্যে ভালোমতো ব্যবস্থা করবেন। কিছু নৈবিদ্যি পাঠিয়ে দেবেন গির্জেয়। . . .' বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। কিন্তু মিনিটখানেক বাদে তখনও চোখে জল চিকচিক করছে, সেই অবস্থাতেই মিশাত্‌কার সঙ্গে খেলা শুরু করে দিল, নিজের পোশাকী রেশমি শাল ওর মাথার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে যে ভাবে হাসতে লাগল তাতে মনে হল বুঝি সে কখনও কাঁদে নি, জীবনে কখনও চোখের জলের নোনতা স্বাদ পায় নি।

দুনিয়াশ্‌কা মাঠ থেকে ফিরতে দারিয়ার উচ্ছ্বাস চরমে পৌঁছুল। ওকে বলতে লাগল কেমন করে মেডেলটা পেল, ঠাট্টার সুরে নকল করে শোনাল জেনারেলের গুরুগম্ভীর বক্তৃতা, দেখাল কেমন কাক তাড়ুয়ার মতো হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে

ছিল ইংরেজ অফিসারটি। শেষে চালাক-চালাক ভাব করে রহস্যভরে নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল, গম্ভীর মুখে দুনিয়াশ্‌কাকে শোনাল যে সেন্ট জর্জ পদক পাওয়ার পর একজন অফিসারের বিধবা পত্নী হিসাবে তাকে, দারিয়াকেও ওরা শিগগিরই অফিসারের পদে তুলবে, তার ওপর বুড়ো কসাকদের পরিচালনার ভার দেবে।

নাতালিয়া বসে বসে বাচ্চাদের জামা রিফু করছিল। দারিয়ার কথা শুনে হাসি চেপে রাখতে পারছিল না। কিন্তু দুনিয়াশ্‌কা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে হাত জোড় করে মিনতি জানিয়ে বলতে লাগল, 'বৌদি গো, তোমার পায়ে পড়ি! বাজে গল্প নয় ত? খ্রীষ্টের দোহাই! কোন্‌টা তোমার সত্যি আর কোন্‌টা বানানো কিছুই বুঝতে পারছি নে যে! সত্যি করে বল না বাপু!'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে সত্যিই বোকা মেয়ে তুই! আমি তোকে খাঁটি সত্যি কথা বলছি। অফিসাররা সবাই ত লড়াইয়ে। কে বুড়োদের কুচকাওয়াজের তালিম দেবে, লড়াইয়ে নামতে গেলে আরও যা যা বিদ্যে দরকার সে সব শেখাবে? আমার হেফাজতে দেওয়া হোক না ওদের, দেখিয়ে দেবো কী ভাবে চালাতে হয় বুড়ো শয়তানগুলোকে! দাঁড়াও দেখাচ্ছি কী ভাবে ওদের ওপর ডাণ্ডা ঘুরাব!' রান্নাঘরের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দিল যাতে শাশুড়ীর চোখে না পড়ে। তারপর চট করে দু'পায়ের মাঝখানে ঘাগরার কিনারা গুঁজে দিয়ে পেছন থেকে এক হাতে টেনে ধরল। ওর পায়ের ডিম বেরিয়ে চকচক করতে লাগল। ঘরের ভেতরে মার্চ করে এগিয়ে দুনিয়াশ্‌কার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল, গুরুগম্ভীর গলায় হুকুম দিল: 'বুড়োর দল, এটেন্‌শন! দাড়ি উঁচিয়ে, আরও উঁচিয়ে! বাঁয়ে মোড়! কুইক মার্চ!'

দুনিয়াশ্‌কা আর সামলাতে না পেরে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফিক ফিক করে হেসে উঠল। নাতালিয়া হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলল, 'উঃ ঢের হয়েছে! ওর ফল ভালো কিছু হবে না!'

'হুঁঃ, ভালো কিছু হবে না! ভালোর কী দেখেছ তোমরা শুনি? তোমাদের যদি মজা দেখিয়ে চাঙ্গা না করে তুলি তাহলে তোমরা যে দমচাপা হয়ে মরে হেজে থাকবে!'

কিন্তু দারিয়ার এই উচ্ছ্বাস যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল সেই ভাবেই দপ্‌ করে নিভে গেল। এর আধঘণ্টা পরে সে তার নিজের ছোট্ট কামরায় ফিরে গেল, অপয়া মেডেলটা রাগ করে বুক থেকে ছিঁড়ে সিন্দুকের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জানলার ধারে বসে রইল। রাতে সে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল, ফিরল সেই প্রথম মোরগ ডাকার পর।

এর পর চার দিন সে জোর খাটুনি খাটল মাঠে।

ঘাস কাটার কাজ খুব একটা সুবিধার হচ্ছিল না। কাজের লোকের বড় অভাব। এক দিনে বিঘে দশেকের বেশি কাটা যায় না। কাটা ঘাসের আঁটি বৃষ্টিতে ভিজে গেল, তাতে কাজ আরও বেড়ে গেল। আঁটি খুলে ছড়িয়ে রোদে শুকোতে দিতে হয়। একসঙ্গে জড় করে তাড়া বেঁধে রাখতে না রাখতে ফের শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি – সে বৃষ্টি সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত সমানে এক ভাবে চলল শরৎকালের মতো। পরে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে এলো, পুবালী বাতাস বইতে শুরু করল, স্তেপের মাঠে আবার খচখচ আওয়াজ করে উঠল ঘাসকাটা কল। কালো হয়ে ওঠা বিচালির তাড়াগুলো থেকে ভেসে আসে ছাতাধরা মিষ্টি তেতো গন্ধ। কুয়াশায় ঢাকা স্তেপের মাঠ। নীলচে কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় পাহাড়ের টিলাগুলোর খুবই সামান্য অস্পষ্ট রেখা, খাদের ভেতরে নীল রঙ ধরা সোঁতা আর দূরের খানাডোবার ওপরে বেতসের সবুজ মাথাগুলো।

চার দিনের দিন দারিয়া মাঠ থেকে সোজা সদরে যাবার জন্য তৈরি হল। মাঠে সবাই যখন চালার নীচে দুপুরের খাবার খেতে বসেছে তখন সে প্রকাশ করল মতলবটা।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'অত তাড়ার কী আছে তোমার শুনি? রোববার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না?'

'কাজ আছে বলেই বলছি, সবুর করার উপায় নেই।'

'তাই বলে একদিনও সবুর করা যায় না?'

দারিয়া দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিল, 'না।'

'তা তোমার যদি বাপু এক মুহূর্তও তর না সয় তাহলে বরং যাও। তবু, কী এমন জরুরী কাজ যে হঠাৎ এরকম তাড়া পড়ে গেল? জানতে পারি কি?'

'সব যদি জেনে ফেলেন তাহলে অকালে মারা যাবেন।'

দারিয়ার যে রকম স্বভাব – কথার জন্যে তাকে বেশি দূর যেতে হয় না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বিরক্ত হয়ে থুতু ফেলল, আর জিজ্ঞেসবাদ করল না।

পর দিন জেলা-সদর থেকে ফেরার পথে দারিয়া একবার গ্রামের ভেতরে ঢুকল। ইলিনিচ্না বাচ্চাদের সঙ্গে ছিল। মিশাত্‌কা ছুটে আসছিল তার জেঠির কাছে। কিন্তু দারিয়া নিস্পৃহ ভাবে ওকে সরিয়ে দিয়ে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করল, 'নাতালিয়া কোথায় গেল মা?'

'ও সবজি ক্ষেতে আছে। নিড়ানির কাজে ব্যস্ত। ওকে আবার কী দরকার পড়ল তোমার? বুড়ো ডেকে পাঠিয়েছে নাকি? ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? বলে দিও আমি এই কথা বলেছি!'

'কেউ ডেকে পাঠায় নি, আমি নিজেই ওকে কিছু বলতে চাই।'

'তুমি হেঁটে এসেছ নাকি মাঠ থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের ওদের কাজ কি শিগ্‌গির শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে?'

'হয়ত কালই শেষ হবে।'

দারিয়া বারান্দা থেকে ধাপ বয়ে নেমে যাচ্ছে দেখে বুড়ি নাছোড়বান্দার মতো ওর পেছন পেছন ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে, 'আরে সবুর কর, অত তাড়াহুড়ো কেন? অনেক বিচালি কি বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেল?'

'না, তেমন বেশি নয়। ... আচ্ছা আমি চলি, সময় নেই।'

'বাগান থেকে ফেরার সময় এই দিকে এসো। বুড়োর জামাটা নিয়ে যেও। শুনতে পাচ্ছ?'

দারিয়া যেন শুনতে পায় নি এমন ভান করে তড়বড়িয়ে চলল গোয়াল ঘরের দিকে। ঘাটের সিঁড়ির কাছে এসে সে থামল, চোখ কুঁচকে নিরীক্ষণ করল তাজা ভিজে নিঃশ্বাস ছাড়ছে দনের সবুজ রঙ ধরা বিস্তীর্ণ জলরাশি। দারিয়া ধীরে ধীরে পা চালায় আনাজ ক্ষেতের দিকে।

দনের ওপর দিয়ে হাওয়া বইছে, ডানায় ঝলক দিয়ে পাক খাচ্ছে গাঙচিলের দল। ঢালু পার বয়ে অলস মন্থর গতিতে ঢেউ গড়িয়ে পড়ছে। সূর্যের আলোয় অস্পষ্ট ঝিকমিক করছে বেগনী রঙের স্বচ্ছ কুয়াশায় ঢাকা খড়িমাটির পাহাড়গুলো। কিন্তু দনের ওপারে উপকূলের কাছে বৃষ্টির জলে ধোয়া বনভূমি দেখাচ্ছে তাজা আর কচি সবুজ-বসন্তের শুরুতে যেমন হয়ে থাকে।

পাদুটো ব্যথায় টাটাচ্ছিল। চটি জোড়া খুলে ফেলে দারিয়া জলে পা ধুল, অনেকক্ষণ বসে রইল পারে, রোদে গনগনে নুড়ি পাথরের ওপর। হাতের তেলোয় চোখে আড়াল করে সে, কান পেতে শোনে গাঙচিলগুলোর ব্যাকুল ডাক আর ঢেউয়ের এক টানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এই নিস্তব্ধতা আর গাঙচিলদের এই বুক ফাটা চিৎকার ওকে এত বিষণ্ণ করে তুলল যে ওর চোখে জল এসে গেল। যে দুর্ভাগ্য আজ এমন আচমকা ওর ওপরে এসে পড়েছে তা যেন আরও কঠিন, আরও তিক্ত হয়ে উঠল।

নাতালিয়া অতি কষ্টে পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়েছে, বেড়ার গায়ে কোদালটা হেলান দিয়ে রেখেছে, এমন সময় দারিয়ার ওপর চোখ পড়তে এগিয়ে গেল তার দিকে।

'আমার খোঁজে এসেছিলে নাকি দাশা?'

'তোমার কাছেই এসেছি, নিজের দুঃখের কথা বলতে।'

দু'জনে পাশাপাশি বসল। নাতালিয়া মাথার ওড়না খুলে চুলগুলো ঠিক করে

নিল, উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল দারিয়ার দিকে। এই কয়েক দিনের মধ্যে দারিয়ার চেহারায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখে ও অবাক হয়ে যায়। গাল বসে গেছে, কালো দেখাচ্ছে। কপালে কোনাকুনি হয়ে পড়েছে গভীর ভাঁজ, চোখে ফুটে উঠেছে উদ্বেগ আর জ্বর-জ্বর উত্তাপের ঝলক।

'কী ব্যাপার বল ত? তোমার মুখ যে একেবারে কালি মেরে গেছে!' দরদের সুরে প্রশ্ন করে নাতালিয়া।

'কালি মেরে যাওয়াটা আর বিচিত্র কি!...' জোর করে হাসে দারিয়া। চুপ করে যায়। 'নিড়ানির কাজ কি এখনও অনেক বাকি?'

'ও সন্ধে নাগাদ শেষ করে ফেলব।...অমন উতলা হয়ে পড়েছ কেন বল ত?'

দারিয়া শিউরে উঠে খানিকটা থুতু গিলে ফেলে, চাপা গলায় তাড়াতাড়ি করে বলে ফেলে, 'বলছি তাহলে। আমার ব্যামো হয়েছে।... খারাপ রোগে ধরেছে। ওই যে শেষবার গেলাম, তখনই বাধিয়ে ফেলেছি।... হতভাগা অফিসারটার কাছ থেকে!'

'ফুর্তির ঠেলা সামলাও এবার।' ভয়ে দুঃখে গালে হাত দিয়ে বলল নাতালিয়া।

'তা যা বলেছ।... আর কিছু বলার নেই, কারো নামে নালিশ করারও নেই।... ওটাই আমার দুর্বল জায়গা। হারামজাদা ইনিয়ে বিনিয়ে ভালো ভালো কথায় ভজিয়ে ফেলল আমাকে। দাঁতগুলো সাদা ঝকঝকে হলে কী হবে ভেতরটা পোকা খাওয়া।... এবারে আমি গেলাম।'

'আহা কী হবে গো তোমার এখন? কী উপায়? কী করবে এখন তাহলে?' চোখ বড় বড় করে নাতালিয়া তাকিয়ে থাকে দারিয়ার দিকে। এদিকে দারিয়া ধাতস্থ হয়ে ওঠে, নিজের পায়ের দিকে চেয়ে থাকে। এবারে আগের চেয়েও শান্ত ভাবে বলে চলে, 'ফেরার পথেই কিন্তু আমি লক্ষ করেছিলাম ব্যাপারটা, বুঝলে।... প্রথমে ভাবলাম হয়ত এমনি... নিজেই ত জান, আমাদের, মেয়েমানুষদের এটা সেটা কত কিছুই হতে পারে।... এই ত গতবার বসন্তকালে গমের একটা বড় বস্তা তুলতে গেলাম – তিন হপ্তা মাসিক আর বন্ধ হয় না। কিন্তু এবারে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা গোলমেলে।... লক্ষণগুলোও ধরা পড়ল।... কাল সদরে গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে। লজ্জায় মরে যাই আর কী।... এখন সব শেষ, মেয়েমানুষের খেলা খতম হয়ে গেল!'

'চিকিচ্ছে করা দরকার। কিন্তু কী লজ্জার কথা বল দেখি! এ ব্যারাম নাকি ভালো হয় শুনেছি।'

'না ভাই, আমার যা অসুখ তা সারবার নয়।' দারিয়া কাষ্ঠহাসি হাসল, কথাবার্তার মধ্যে এই প্রথম আগুনের মতো জ্বলন্ত চোখদুটো তুলে চাইল। 'আমার

সিফিলিস হয়েছে। এ রোগের কোন দাওয়াই নেই। এ হল সেই রোগ যাতে নাক খসে পড়ে। ... আন্দ্রোনিখা মাসীর যেমন হয়েছিল – দেখ নি তাকে?'

'এখন তাহলে কী করবে তুমি?' কাঁদ কাঁদ গলায় নাতালিয়া জিজ্ঞেস করল। জলে ভরে ওঠে ওর দু'চোখ।

দারিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। ভুট্টার ডাঁটির সঙ্গে জড়িয়ে ওঠা লতা থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে চোখের খুব কাছে নিয়ে দেখতে থাকে। ছোট্ট ফুলের পাপড়ির কিনারাগুলো গোলাপী। বড় কোমল, স্বচ্ছ হালকা – ওজন প্রায় টেরই পাওয়া যায় না ফুলটার। রোদে পোড়া মাটির ভারী ঝাঁঝাল গন্ধ ভেসে আসছে তা থেকে। দারিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে অবাক হয়ে সে দিকে এমন ভাবে চেয়ে থাকে যেন নেহাৎই সাদাসিধে মামুলী এই ফুলটাকে জীবনে সে প্রথম দেখছে। নাকের পাটা অনেকখানি ফুলিয়ে ওটার গন্ধ শুঁকল। পরে হাওয়ায় শুকিয়ে যাওয়া ঝুরঝুরে মাটির ওপর সাবধানে নামিয়ে রেখে বলল, 'কী করব তাই জিজ্ঞেস করছ? সদর থেকে আসতে আসতে আমি মনে মনে অনেক ভেবেছি, মতলব এঁটেছি। কী আর করব? নিজের হাতে নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিতে হবে! বড় দুঃখ হয়, কিন্তু ও ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। অমনিতে চিকিচ্ছের জন্যে যদি যাইও গাঁয়ের সবাই জেনে ফেলবে, আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাবে, মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে; হাসবে আমায় দেখে। ... এ অবস্থায় আমি কার কোন্ কাজে লাগব? আমার রূপ ঝরে যাবে, দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাব আমি, জ্যান্ত অবস্থাতেই পচতে থাকব। ... না সে আমার দরকার নেই!' ও এমন ভাবে কথা বলছিল যেন নিজেই নিজের মনে আলোচনা করছে। নাতালিয়া প্রতিবাদ জানিয়ে হাত নাড়তে গেলে সে দিকে কোন আমলই দিল না। 'সদরে যাবার আগেই আমি ভেবে রেখেছিলাম, যদি আমার খারাপ অসুখ হয়ে থাকে তাহলে চিকিচ্ছে করাব। এই কারণে বাবাকে টাকাটাও দিই নি – ভাবলাম, ডাক্তারকে দিতে হবে। ... কিন্তু এখন অন্য রকম ঠিক করেছি। ঘেন্না ধরে গেল আমার ওসরে। দরকার নেই বাপু!'

দারিয়া পুরুষমানুষের মতো বিশ্রী গালাগাল করে উঠে থুতু ফেলল। চোখের দীর্ঘ পালকগুলোতে যে দু'-এক ফোঁটা জল লেগে ছিল হাতের উলটো পিঠ দিয়ে তা মুছল।

'কী সব যা তা কথা বলছ! ... ভগবানের ভয় নেই তোমার?' নীচু গলায় বলল নাতালিয়া।

'ওসব ভগবান-টগবানে আমার কোন কাজ নেই। অমনিতেই সারা জীবন অনেক জ্বালিয়েছেন আমায়।' দারিয়া হাসল। ওর সেই হাসির মধ্যে, চটুল দুরন্ত

হাসির মধ্যে নাতালিয়া মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল আগের সেই দারিয়াকে। 'এটা কোরো না, ওটা কোরো না। সবাই পাপের ভয় দেখায়, শেষ বিচারের দিনের কথা বলে ভয় দেখায়।... নিজেকে যে সাজা আমি দেবো তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কোন বিচারের কথা কেউ ভাবতে পারে না। ঘেন্না ধরে গেল নাতালিয়া, সবেতে ঘেন্না ধরে গেল। লোকজন আর আমার সহ্য হয় না।... নিজেকে শেষ করে দিতে এতটুকু কষ্ট হবে না আমার। আমার সামনে পেছনে কোথাও কেউ নেই। এমন কেউ নেই যাকে ছাড়তে গেলে আমার বুক ভেঙে যাবে।... এই হল কথা।'

নাতালিয়া উত্তেজিত হয়ে ওকে বোঝাতে চেষ্টা করে। আত্মহত্যার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে বলে। কিন্তু দারিয়া প্রথমে অন্যমনস্ক ভাবে শুনতে থাকলেও পরে সামলে নিয়ে ক্ষেপে ওঠে। কথার মাঝখানে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'ওসব ছাড় দেখি নাতালিয়া! তুমি আমায় কাকুতি মিনতি করবে বা ঠেকানোর চেষ্টা করবে তা শোনার জন্যে আমি এখানে আসি নি! আমি এসেছিলাম নিজের দুঃখের কথা তোমাকে বলতে আর সাবধান করে দিতে যাতে আজ থেকে তোমার ছেলেমেয়েরা আমার কাছে না ঘেঁষে। রোগটা আমার ছোঁয়াচে, ডাক্তার বলেছে। তাছাড়া আমি নিজেও তা-ই শুনেছি। দেখো ওরা যেন আবার আমার কাছ থেকে বাধিয়ে না বসে। বুঝেছ, বোকা মেয়ে? বুড়িকেও বোলো তুমি। আমার বলার মুখ নেই। তবে আমি... আমি এই মুহূর্তে গলায় ফাঁস দিতে যাচ্ছি না। তা ভেবো না। যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।... আরও কিছুদিন দুনিয়ায় বেঁচে থেকে সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নিই, তারপর বিদায় নেব। আমাদের অবস্থাটা কী জানোই ত। যতক্ষণ বুকে খোঁচা না লাগছে ততক্ষণ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি, আশেপাশের কিছুই চোখে পড়ে না।... কী জীবনটাই না কাটিয়ে এলাম - অন্ধের মতন! কিন্তু সদর থেকে দনের ধার দিয়ে আসতে আসতে যখন ভাবতে লাগলাম এসবই শিগ্‌গির আমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তখন আমার চোখ যেন খুলে গেল! দনের দিকে তাকাই। তার বুকে ছোট ছোট ঢেউ খেলে চলছে, সূর্যের আলো পড়ে খাঁটি রুপোর মতো দেখাচ্ছে, এমনই ঝিলমিল করছে যে সে দিকে তাকালে চোখ টাটায়। চার ধারে চেয়ে চেয়ে দেখি - ওঃ ভগবান, কী শোভা! কোথায়, এত দিন ত খেয়াল করি নি!...' দারিয়া সলজ্জ হাসি হেসে চুপ ক'রে যায়। ওর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসে। গলার ভেতরে যে কান্নাটা ঠেলে উঠছিল সেটা চেপে রাখার চেষ্টা ক'রে আবার বলতে শুরু করে আগের চেয়েও উত্তেজিত হয়ে, আরও উঁচু গলায়। 'আমি অবশ্য আসার পথেই বেশ কয়েকবার ডাক ছেড়ে কেঁদেছি।... গাঁয়ের কাছাকাছি আসতে দেখি কচি বাচ্চার দল দনে চান করছে।... ওদের দিকে তাকাতেই আমার বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে

উঠল। আমি খোকার মতো ডুকরে কেঁদে উঠলাম। ঘন্টা দুয়েক পড়ে রইলাম বালির ওপর। ভাবতে গেলে ব্যাপারটা আমার পক্ষে সোজা নয়। . . .' মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাগরাটা ঝাড়ল সে, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মাথার ওড়নাটা ঠিক করে নিল। 'মরার কথা চিন্তা করলে আমার শুধু আনন্দ হয় এই ভেবে যে পরলোকে পেত্রোর সঙ্গে আমার দেখা হবে। . . . তখন বলব, 'ওগো, ফিরিয়ে নাও তোমার নষ্ট স্ত্রীটিকে!" বলতে বলতে ওর স্বভাবসিদ্ধ তীব্র শ্লেষের ভঙ্গিতে যোগ করে, 'কিন্তু ওখানে ত ও আমায় মারতে পারবে না। যারা ঝগড়াটে, স্বর্গে তাদের জায়গা নেই, তাই না? আচ্ছা চলি নাতালিয়া বোনটি! শাশুড়ী ঠাকরেনকে কিন্তু বলতে ভুলো না আমার বিপদের কথাটা।'

ময়লা দুটো হাতের সরু তেলোয় মুখ ঢেকে বসে থাকে নাতালিয়া। পাইন গাছের কাটা ফাটা জায়গায় জমে ওঠা রজনের মতো ওর আঙুলের ফাঁকে চিকচিক করছিল চোখের জল। দারিয়া ডালপালায় বোনা ফটক অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলো, কাজের কথা মনে করিয়ে দেবার মতো ক'রে বলল, 'আজ থেকে আমি আলাদা বাসনে খাব। মাকে বলে দিও। হ্যাঁ আরও একটা কথা - বাবাকে যেন একথা না বলে, নয়ত বুড়ো ক্ষেপে যাবে, আমায় বাড়ি থেকে খেদিয়েই দেবে। তাহলে ত আরও চিত্তির! আমি এখান থেকে সোজা ঘাস কাটার জায়গায় যাচ্ছি। চলি?'

চৌদ্দ

পরদিন ঘেসেড়েরা মাঠ থেকে ফিরল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দুপুরের খাওয়ার পর থেকেই গাড়িতে খড় তুলতে শুরু করবে বলে ঠিক করেছে। দুনিয়াশকা বলদগুলোকে দনের ধারে জল খাওয়াতে নিয়ে গেল। ইলিনিচ্‌না আর নাতালিয়া টেবিল সাজিয়ে খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

দারিয়া এসে বসল সবার শেষে, বসল টেবিলের এক কোণ ঘেঁসে। ইলিনিচ্‌না ওর সামনে ছোট এক বাটিতে করে বাঁধাকপির ঝোল এগিয়ে দিল, একটা চামচ আর এক টুকরো রুটিও রাখল। আর সকলের জন্য রোজকার মতোই একসঙ্গে বিরাট জামবাটিতে ঢেলে দিল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অবাক হয়ে গিন্নির দিকে তাকাল, চোখের ইশারায় দারিয়ার বাটিটা দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ আবার কী? ওকে আলাদা ঢেলে দিলে যে? ও কি আমাদের জাতের বাইরে?'

'কী দরকার তোমার অত কথার? খাও দেখি!'

বুড়ো সকৌতুকে দারিয়ার দিকে চেয়ে হাসে।

'ও বুঝেছি! মেডেল পেয়েছে কিনা, তাই আমাদের সঙ্গে খেতে চায় না। কী ব্যাপার দাশা? আমাদের সঙ্গে এক বাটি থেকে খেতে তোমার মান যায় বুঝি?'

'মান যাবার ব্যাপার নয়, খাওয়াটা ঠিক হবে না,' ধরা গলায় উত্তর দেয় দারিয়া।

'তা আবার কেন?'

'গলায় ঘা হয়েছে আমার।'

'তাতে কী?'

'সদরে গিয়েছিলাম, ডাক্তার বলেছে আলাদা বাসনে খেতে।'

'আমারও একবার গলায় ঘা হয়েছিল, কিন্তু আমি ত তখন অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে খাই নি। আর ভগবানের আশীর্বাদে আমার ব্যারামও অন্য কারও ধরে নি। এ তোমার কেমন ধারা সর্দিরোগ?'

দারিয়ার মুখ ফেকাসে হয়ে যায়, হাতের তেলো দিয়ে ঠোঁট মুছে চামচটা রেখে দেয়। বুড়োর অত জেরায় চটে গিয়ে ইলিনিচ্না এক ধমক লাগায় তাকে।

'মেয়েমানুষটাকে অমন জ্বালাতন করছ কেন বল ত? তোমার জ্বালায় কি খেতে বসেও সোয়াস্তি নেই? ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে, রেহাই নেই!'

'আমার আর কী?' বিরক্ত হয়ে গজগজ করে বলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। 'যেমন খুশি খাও গে। আমার বয়েই গেল!'

রাগের মাথায় পুরো এক চামচ গরম ঝোল মুখে ঢেলে দেয় বুড়ো। তাইতে মুখ পুড়ে যেতে দাড়িতে ঝোলটা উগরে দিয়ে বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে ওঠে।

'হতভাগার দল, পরিবেশনও করতে জান না! সোজা উনুন থেকে উঠিয়ে অমন গরম ঝোল কেউ খেতে দেয় নাকি?'

'খেতে বসে একটু কম কথা বললেই ত পার, তাহলে মুখ তোমার পুড়ত না,' ইলিনিচ্না সান্ত্বনা দেয়।

বাপের মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, দাড়ি থেকে বাঁধাকপি আর আলুর টুকরো ছাড়িয়ে বার করছে সে। এই দৃশ্য দেখে দুনিয়াশ্কা আরেকটু হলেই হেসে ফেলেছিল। কিন্তু আর সকলের মুখ এত গম্ভীর যে তা দেখে নিজেকে সামলে নিল, মুখ ফিরিয়ে নিল বাপের দিক থেকে, পাছে আচমকা হেসে ফেলে।

খাওয়াদাওয়ার পর বুড়ো আর তার দুই ছেলে-বৌ দুটো গাড়িতে করে বিচালি আনার জন্য রওনা দিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা লম্বা বিদেকাঠি দিয়ে গাড়িতে বিচালি তুলে দিতে লাগল, নাতালিয়া মাটির সোঁদা গন্ধওয়ালা সেই

বিচালির গাদা জড় করে পায়ে মাড়িয়ে সমান ক'রে রাখল। একসঙ্গে মাঠ থেকে বাড়ির দিকে রওনা দিল নাতালিয়া আর দারিয়া। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে অভ্যস্ত দুটো বুড়ো বলদের গাড়িতে চেপে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

টিলার আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। স্তেপের মাঠে ঘাস কাটার পর সোমরাজের কটু গন্ধ ছড়াচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে আরও জোরালো হয়ে উঠেছে সে গন্ধ। তবে দুপুরে যে শ্বাসরোধী ঝাঁঝ ছিল এখন তা চলে গিয়ে অনেকটা স্নিগ্ধ আর মধুর হয়ে উঠেছে। গরম কমে এসেছে। বলদগুলো নিজেদের খুশিতে চলছে। ওদের খুরের লাথিতে গরমকালের কাঁচা রাস্তার ওপর নীরস ধুলো উঠছে, পথের ধারের কাঁটাঝোপের ওপর এসে থিতিয়ে পড়ছে। কাঁটাঝোপের মাথায় ছড়িয়ে আছে লাল টকটকে ফুলগুলো। আগুনের শিখার মতো জ্বলজ্বল করছে। মাথার ওপর ভোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডাকাডাকি করতে করতে দূরের স্তেপের পুকুরের দিকে উড়ে চলেছে টি টি পাখির দল।

গাড়িতে বিচালির গাদা দুলছে। বোঝার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে দারিয়া। কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা উঠিয়ে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে নাতালিয়ার দিকে। নাতালিয়া কী যেন এক ভাবনায় ডুবে আছে, তাকিয়ে আছে সূর্যাস্তের দিকে। ওর প্রশান্ত নির্মল মুখের ওপর তামাটে লাল আভা খেলছে। 'হ্যাঁ, ভাগ্যবতী বলতে হয় নাতালিয়াকে! ওর স্বামী আছে, ছেলেপুলে আছে। কিছুরই অভাব নেই ওর। বাড়ির সবাই ওকে ভালোবাসে। কিন্তু আমি? আমি ফুরিয়ে গেলাম। আমি মরলে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না,' এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নাতালিয়াকে কোন ভাবে দুঃখ দেওয়ার, ওকে খোঁচা দেওয়ার ইচ্ছা জেগে ওঠে দারিয়ার মনে। দারিয়া একাই কেবল কেন হতাশায় ছটফট করে মরবে, কেন সব সময় ভাববে নিজের ব্যর্থ জীবনের কথা, সয়ে যাবে এত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা? আরও একবার নাতালিয়ার ওপর চট করে চোখ বুলিয়ে নিল, কণ্ঠস্বরে অন্তরঙ্গ ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ক'রে বলল, 'তোমার কাছে একটা অপরাধ স্বীকার করতে চাই নাতালিয়া। . . .'

নাতালিয়া সঙ্গে সঙ্গে কোন সাড়া দিল না। সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে দেখতে ওর মনে পড়ে গেল সেই অনেক দিন আগেকার কথা। তখন গ্রিগোরির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হয়েছে মাত্র। ওকে দেখতে ঘোড়ায় চেপে এসেছিল গ্রিগোরি। ফিরে যাবার সময় বিদায় দিতে ফটকের বাইরে এসেছিল নাতালিয়া। সেদিনও এমনই দাউ দাউ করে জ্বলছিল সূর্যাস্তের আলো, পশ্চিমের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল গোধূলির লাল আভা, বেতসের বনে ডাকছিল কাকের দল। . . . জিনে

বসেই পাশ ফিরে তাকাতে তাকাতে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল গ্রিগোরি। ওর চলার পথের দিকে তাকিয়ে ছিল নাতালিয়া, আনন্দের উত্তেজনায় চোখে জল এসে গিয়েছিল, পীনোন্নত কুমারী বুকে দু'হাত চেপে ধরতে অনুভব করতে পারছিল বুকের দ্রুত স্পন্দন। ... দারিয়া হঠাৎ নীরবতা ভেঙে দিতে নাতালিয়া বিরক্ত হল। অনিচ্ছাভরে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আবার অপরাধ স্বীকার?'

'একটা পাপ কাজ করে ফেলেছিলাম। ... তোমার মনে আছে, সেই যে বসন্তকালে গ্রিগোরি ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিল? সেদিন সন্ধ্যায়, মনে পড়ছে, আমি গোরু দুইছিলাম। ঘরে ফিরে যাচ্ছি, শুনি আক্সিনিয়া ডাকছে আমায়। নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে আমায় উপহার দিল – দস্তুরমতো জোরজার করে গছিয়ে দিল এই ছোট্ট আঙটিটা,' অনামিকায় পরা সোনার আঙটিটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দারিয়া বলল। 'তারপর আমায় কাকুতি মিনতি করে বলল গ্রিগোরিকে ওর কাছে ডেকে পাঠানোর জন্যে। ... আমার আর কী করার ছিল বল ... গ্রিগোরিকে বললাম। গ্রিগোরি তখন সারা রাত ... মনে আছে, ও বলেছিল, কুদিনভ এসেছে, তার সঙ্গে আলাপে বসতে হয়েছিল? একদম বাজে কথা! আক্সিনিয়ার সঙ্গে ছিল!'

হতভম্ব হয়ে ফেকাসে মুখে নাতালিয়া নিঃশব্দে তেপাতা ঘাসের একটা শুকনো ডাঁটা ভাঙল আঙুলে।

'আমার ওপর রাগ কোরো না নাতাশা। তোমার কাছে কথাটা স্বীকার করলাম বটে, কিন্তু আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। ...' নাতালিয়ার চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করতে করতে দরদের সুরে দারিয়া বলে।

নাতালিয়া নীরবে ঢোক গিলল। কান্নায় ওর গলা বুজে আসছিল। নতুন করে এসে পড়া এই দুঃখের বোঝাটা এতই ভারী আর আচমকা ছিল ওর কাছে যে দারিয়াকে কিছু বলার মতো কথা ওর মুখে যোগাল না। দুঃখে বিকৃত মুখখানা লুকানোর জন্য ঘুরিয়ে নেয়।

ওরা যখন গ্রামে ঢোকার ঠিক মুখে তখন দারিয়া নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবল: 'কোন্ শয়তান কাঁধে ভর করেছিল। – কী দরকার ছিল ওকে খোঁচানোর? এখন সারাটা মাস ধরে চোটের জল ফেলবে! না জানলেও দিব্যি চলে যেত ওর। ওর মতো গোবুদের অন্ধ হয়ে থাকাই বাপু ভালো।' ওর কথাগুলোর যে বিশ্রী ফল ফলেছে সেটাকে একটু সহজ করার চেষ্টায় ও বলল, 'অমন ভেঙে পোড়ো না। একে তুমি দুঃখ বল! আমার দুঃখটা তোমার চেয়ে কত বেশি একবার ভেবে দেখ ত – আমি তাও কেমন বুক ফুলিয়ে চলি। তাছাড়া কে বলতে পারে ছাই, হয়ত আসলে আক্সিনিয়ার সঙ্গে ছিল না, কুদিনভের কাছেই

গিয়েছিল। আমি ত আর ওদের ওপর নজর রাখতে যাই নি। আর ধরা যখন পড়ে নি তখন চোরই বা বলি কী করে?'

'আন্দাজ করেছিলাম,' রুমালের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে নীচু গলায় নাতালিয়া বলল।

'আন্দাজই যদি করেছিলে তাহলে ওকে চেপে ধরলে না কেন? নাঃ তুমি একটা অপদার্থ। আমার হাতে পড়লে আর দেখতে হত না। এমন অবস্থা করে ছেড়ে দিতাম যে চোখেমুখে অন্ধকার দেখত।'

'আমার ভয় হচ্ছিল পাছে সত্যি জেনে ফেলি।... তুমি কি মনে কর সেটা অত সোজা?' চোখ চকচক করে ওঠে নাতালিয়ার। উত্তেজনায় সে তোতলাতে থাকে। 'তুমি ও ভাবে কাটাতে পেরেছিলে... পেত্রোর সঙ্গে।... কিন্তু যখন... যখন আমি মনে করি... কী ভাবে আমার দিনগুলো গেছে... কী ভাবে কেটেছে... এখন ভয় লাগে।'

'তাহলে ভুলে যাও ওকথা,' দারিয়া সাদামাঠা উপদেশ দিল।

'ভুলে যাও বললেই কি ভুলে যাওয়া যায়?' বিকৃত ভাঙা গলায় নাতালিয়া বলে উঠল।

'আমি হলে ভুলে যেতাম। ও আর কী এমন বড় ব্যাপার।'

'তাহলে ভুলে যাও তোমার রোগটার কথা!'

দারিয়া হেসে ফেলল।

'ভুলে যেতে পারলে ত খুশিই হতাম, কিন্তু হতচ্ছাড়া জিনিসটা যে নিজেই মনে করিয়ে দেয়। শোনো নাতাশা, তুমি যদি চাও আমি আক্সিনিয়ার কাছ থেকে সব জেনে বার করতে পারি। ও আমায় ঠিক বলবে! ভগবান আমায় সাজা দিন, দুনিয়ায় এমন কোন মেয়েমানুষ নেই যে তাকে কে ভালোবাসে, কেমন করে ভালোবাসে এসব কথা চেপে যাবে, একদম বলবে না। নিজেকে দিয়েই বুঝি।'

'তোমার ওই উব্‌গারে কোন কাজ নেই আমার। অমনিতেই তুমি আমার অনেক উব্‌গার করেছ,' শুকনো গলায় জবাব দিল নাতালিয়া। 'অন্ধ ত আর নই আমি। এসব কথা তুমি কেন বললে আমার জানা আছে। আমার ওপর করুণা হতে ত আর তুমি স্বীকার কর নি এর মধ্যে তোমার দৃতিয়ালির ব্যাপারটা। তুমি বলেছ যাতে আমি মনে আরও কষ্ট পাই।...'

'তা যা বলেছ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায় দেয় দারিয়া। 'নিজেই একবার বিচার করে দেখ, আমি একা কষ্ট ভোগ করি কেন?'

বলদদুটো ক্লান্তিভরে পায়ে পায়ে চলছিল। দারিয়া গাড়ি থেকে নেমে তাদের মুখের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল পাহাড়ের উতরাই বয়ে। বাড়ির গলিতে

ঢোকার মুখে গাড়ি কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আচ্ছা ভাই নাতালিয়া, একটা কথাই শুধু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।... তোমার মানুষটাকে তুমি কি সত্যিই খুব ভালোবাস?'

'যতটা পারি,' মিনমিন করে নাতালিয়া বলল।

'তার মানে, সত্যিই খুব ভালোবাস।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল দারিয়া। 'কিন্তু আমি কাউকে বড় একটা ভালোবাসতে পারি নি জীবনে। ভালোবেসেছিলাম কুকুরের মতো, যেমন তেমন করে, যখন যেমন পেরেছি।... এখন যদি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারতাম তাহলে হয়ত বা অন্য মানুষ হতাম।'

গ্রীষ্মের সংক্ষিপ্ত গোধূলির পরে নেমে এলো কালো রাত। অন্ধকারের মধ্যে ওরা উঠোনে বিচালি ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাদা করে রাখল। ওরা দুই মেয়েমানুষে কাজ করে যাচ্ছে মুখ বুজে। এমন কি পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের হাঁকডাকেও দারিয়া কোন জবাব দিল না।

পনেরো

উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া থেকে শত্রুসৈন্যরা পিছু হটছে। প্রবল বেগে তাদের পিছু ধাওয়া ক'রে দন ফৌজ আর উজানী দনের বিদ্রোহীদের মিলিত বাহিনী এগিয়ে চলেছে উত্তরের দিকে। মেদ্‌ভেদিৎসা নদীর তীরে শাশ্‌কিন গ্রামের কাছে নয় নম্বর রেড আর্মির বিধ্বস্ত রেজিমেন্টগুলো কসাকদের ঠেকাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এবারেও ঘাঁটি ছেড়ে দিতে হল তাদের। তেমন কোন জোরাল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে তাড়া খেয়ে প্রায় থিয়াজি-ত্সারিত্সিন রেলপথের ব্রাঞ্চলাইন পর্যন্ত সরে গেল।

গ্রিগোরি তার ডিভিশন নিয়ে শাশ্‌কিনের লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল। জেনারেল সুতুলভের পদাতিক ব্রিগেড এক পাশ থেকে আক্রান্ত হয়ে পড়লে গ্রিগোরি তাকে জোর সাহায্য করে। গ্রিগোরির হুকুমে ইয়ের্মাকোভের যে ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট হামলায় নেমেছিল তারা প্রায় দু'শ' লাল ফৌজীকে বন্দী করল, চারটি ভারী মেশিনগান আর এগারোটা গোলাবারুদের গাড়ি ছিনিয়ে নিল।

সন্ধ্যা নাগাদ এক নম্বর রেজিমেন্টের এক দল কসাককে নিয়ে গ্রিগোরি গিয়ে ঢুকল শাশ্‌কিনে। ডিভিশনের সেনাপতিমণ্ডলী যে বাড়িটার দখল নিয়েছিল তার কাছে আধ স্কোয়াড্রন কস্যাকের পাহারায় দাঁড়িয়ে বন্দীদের একটা জমাট ভিড়। আধা অন্ধকারে সাদা ধবধব করছে বন্দীদের সুতীর জামা আর পায়জামাগুলো।

ওদের বেশির ভাগেরই পায়ের বুটজুতো খুলে নেওয়া হয়েছে। অন্তর্বাস ছাড়া পরনে আর কোন কাপড় জামা নেই। শুধু মাঝে মধ্যে সাদার ভিড়ের মধ্যে এখানে ওখানে দেখতে পাওয়া যায় সবজে খাকী রঙের নোংরা ফৌজী জামা।

বন্দীদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে প্রোখর জিকভ বলে উঠল, 'ওঃ কী সাদা দেখাচ্ছে! একেবারে রাজহাঁসের মতো!'

গ্রিগোরি লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে এক পাশে ঘুরিয়ে নিল। কসাকদের ভিড়ের মধ্যে ইয়েৰ্মাকোভকে খুঁজে বার করে আঙুলের ইশারায় তাকে কাছে ডাকল।

'এদিকে এসো দেখি। অন্য লোকের পিঠের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছ যে বড় ?'

হাতের মুঠোয় মুখ চাপা দিয়ে কাশতে কাশতে ঘোড়া চালিয়ে ইয়ের্মাকোভ এগিয়ে এলো। ওর পাতলা কালো গোঁফের তলায় জখম হওয়া ঠোঁটের ওপরে চাপ চাপ হয়ে রক্ত জমে আছে। ডান গালটা ফোলা, সদ্য ছড়ে যাওয়ায় কালসিটে সেখানে। আক্রমণের সময় ওর ঘোড়াটা পুরোদমে ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তাইতে ইয়ের্মাকোভ ঘোড়ার জিন থেকে হাত পাঁচেক দূরে পাথরের মতো ছিটকে উপুড় হয়ে গিয়ে পড়েছিল একটা উঁচু নরম মতো চারণ জমিতে। ইয়ের্মাকোভ নিজে আর তার ঘোড়াটা একই সঙ্গে লাফিয়ে পায়ে খাড়া হয়ে উঠল। এক মিনিটের মধ্যে ইয়ের্মাকোভ আবার ঘোড়ার জিনের ওপর। মাথায় টুপি নেই, সারা মুখ রক্তাক্ত। কিন্তু কসাক সৈন্যরা বন্যাস্রোতের মতো পাহাড়ের ঢাল বয়ে আক্রমণের জন্য গড়িয়ে পড়ছে দেখে সেই অবস্থাতেই তাদের নাগাল ধরে এগিয়ে গেল সে। . . .

'গা ঢাকা দিতে যাব কোন্ দুঃখে?' গ্রিগোরির পাশাপাশি এসে যেন অবাক হয়ে গেছে এই ভাবে সে জিজ্ঞেস করল। এদিকে ওর উন্মত্ত আরক্ত চোখে লড়াইয়ের আগুন তখনও না নেভায় অপ্রতিভ হয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে।

'হুঁ হুঁ ইঁদুর ঠিকই জানে কার মাংস সে খেয়েছে! পেছন পেছন আসছ যে?' গ্রিগোরি রেগে যায়।

ইয়ের্মাকোভ ফোলা ঠোঁটে অতি কষ্টে হাসল। আড়চোখে তাকাল বন্দীদের দিকে।

'কিসের মাংসের কথা বলছ তুমি? ওসব হেঁয়ালি ছাড় দেখি এখন। হেঁয়ালির উত্তর এখন মোটেই দিতে পারব না আমি। ঘোড়া থেকে মাথা গুঁজে সোজা মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম।'

লাল ফৌজীদের দিকে চাবুক দিয়ে দেখিয়ে গ্রিগোরি বলল, 'এটা তোমার কাজ?'

ইয়ের্মাকোভ এমন ভাব করল যেন এই প্রথম ওদের দেখছে। এত অবাক হওয়ার ভান করল যে ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না।

'দেখ কাণ্ড! শুয়োরের বাচ্চাগুলো! হতভাগারা করেছে কী! জামাকাপড় সব

খুলে নিয়েছে? কোন্ ফাঁকে করল? . . . এ যে ভাবাই যায় না! এই সবে একটু চোখের আড়াল হয়েছিলাম, পই পই ক'রে বলে গেলাম যেন ওদের গায়ে হাত না দেয়। এরই মধ্যে কিনা খুলে ন্যাংটো ক'রে ছেড়ে দিয়েছে বেচারিদের!'

'আমায় বোকা বানানোর চেষ্টা কোরো না। ওসব চালাকি ছাড়। তুমি ওদের গা থেকে জামাকাপড় খোলার হুকুম দিয়েছিলে?'

'ভগবান রক্ষে করুন! এসব তুমি কী বলছ! তোমার কি মাথার ঠিক আছে, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ?'

'হুকুম মনে আছে?'

'সেই হুকুম যাতে বলা হয়েছে. . .'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাতে বলা হয়েছে।'

'তা কেন মনে থাকবে না! রীতিমতো মুখস্থ আছে! ছোটবেলায় পাঠশালাতে শোলোক মুখস্থ করার মতো শিখেছি।'

গ্রিগোরি অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসল। জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে ইয়ের্মাকোভের তলোয়ারের বেল্টটা খপ্ করে চেপে ধরল। এই দুঃসাহসী, বেপরোয়া কম্যাণ্ডারটিকে মনে মনে সত্যিই ও ভালোবাসত।

'খারলাম্পি। ঠাট্টা নয়। এটা তুমি হতে দিলে কী বলে? কপিলোভের জায়গায় যে নতুন কর্ণেলটিকে সদর ঘাঁটিতে বসানো হয়েছে সে রিপোর্ট করে দেবে, তখন তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। এই নিয়ে যখন হৈ-হট্টগোল, জেরা, প্রশ্ন শুরু হবে তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সুখের হবে না তোমার পক্ষে।'

'বরদাস্ত করতে পারলাম না পান্তেলেয়েভিচ!' গম্ভীর হয়ে সহজ ভাবে উত্তর দিল ইয়ের্মাকোভ। 'ওদের গায়ে সব আনকোরা জামাকাপড়, সবে উস্ত্-মেদ্ভেদিৎ-স্কায়াতে দেওয়া হয়েছে ওদের। এদিকে আমার সেপাইদের পরনেরগুলো ছিঁড়ে ফাতা ফাতা হয়ে গেছে। তাছাড়া ওদের বাড়িতেও জামাকাপড়ের বড় টানাটানি। কিন্তু এই লোকগুলোর কথা যদি বল – কী ছাই আসে যায়! পেছনে চালান হয়ে গেলে সেই ত খুলেই নেওয়া হবে সব! আমরা ওদের ধরব আর জামাকাপড়গুলো খুলে বাগানোর বেলায় বুঝি লড়াইয়ের ময়দানের পেছনের ওই হারামজাদাগুলো? না, তার চেয়ে বরং আমার সেপাইরাই পরুক! আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না আমার কাছে। তুমিও দয়া করে আমায় জ্বালাতন করতে এসো না, বলে দিচ্ছি। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি নে, এমন কি স্বপ্নেও কিছু দেখি নি!'

ওরা বন্দীদের ভিড়ের কাছে চলে এলো। ভিড়ে যে চাপা গলায় কথাবার্তা চলছিল তা থেমে গেল। যারা কিনারায় ছিল তারা ঘোড়সওয়ারদের পথ ছেড়ে

দিল। কসাকদের দিকে তাকাতে লাগল। ওদের চোখমুখ থমথমে, আশঙ্কা ভরা সতর্ক দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে কিসের যেন একটা প্রত্যাশা। গ্রিগোরিকে কম্যাণ্ডার বলে চিনতে পেরে লাল ফৌজীদের একজন বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে এসে হাত দিয়ে ঘোড়ার রেকাব ছুঁল।

কমরেড কম্যাণ্ডার, আপনার কসাকদের বলুন আমাদের গায়ের কোটগুলো অন্তত ফিরিয়ে দিক। এটুকু দয়া না হয় করুন। রাতে ঠাণ্ডা পড়ে, এদিকে আমরা একেবারে ন্যাংটো - দেখতেই পাচ্ছেন!'

'ওরে মেঠো ইঁদুরের ছা, এই ভর গরমের মধ্যে বরফে জমে যাবার ভয়!' কড়া গলায় ইয়ের্মাকোভ বলল। ঘোড়ার গুঁতো মেরে লাল ফৌজীটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গ্রিগোরির দিকে ঘুরল সে। 'তুমি চিন্তা কোরো না। আমি বলে দিচ্ছি ওদের যেন পুরনো কাপড়চোপড় কিছু দেওয়া হয়। . . . এবারে সরে যাও, সরে যাও বলছি লড়ুয়ের দল! কসাকদের সঙ্গে লড়তে না এসে পাতলুনের উকুন বাছলেই ত পারতিস বাপু তোরা!'

দপ্তরে একজন বন্দী কম্পানি-কম্যাণ্ডারকে জেরা করা হচ্ছিল। শতচ্ছিন্ন অয়েলক্লথে ঢাকা টেবিলের ধারে বসে আছে সেনাদপ্তরের নতুন প্রধান কর্ণেল আন্দ্রেয়ানভ। বেশ বয়স্ক অফিসার সে। নাকটা থ্যাবড়া মতন, রগের কাছের চুলে ঘন হয়ে পাক ধরেছে, কানদুটো বড় বড়, ছেলেমানুষের মতো খাড়া। তার মুখোমুখি টেবিলের দু'পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে লাল ফৌজের কম্যাণ্ডার। বন্দীর এজাহার টুকছে দপ্তরের একজন অফিসার লেফ্‌টেনান্ট সুলিন। আন্দ্রেয়ানভের সঙ্গেই সে ডিভিশনে এসেছিল।

লাল ফৌজের কম্যাণ্ডারটি দীর্ঘকায়। গোঁফজোড়া কটা রঙের, মাথার চুল ছাইয়ের মতো সাদা, কদম ছাঁট করে ছাঁটা। লোকটা গেরিমাটির রঙ লাগানো কাঠের মেঝের ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আনাড়ির মতো উসখুস করছে, থেকে থেকে কর্ণেলের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। কসাকরা বন্দীর গায়ের হলদে ছাঁটের কোরা সুতীর গেঞ্জিখানা শুধু রেহাই দিয়েছে। ওর পাতলুনখানা কেড়ে নিয়ে তার বদলে দিয়েছে বদখত তালিমারা শতচ্ছিন্ন একটা কসাক সালোয়ার। সেটার দু'পাশের লাল ডোরার রঙ জ্বলে গেছে। টেবিলের কাছে যেতে গ্রিগোরি লক্ষ করল বন্দী অস্বস্তিভরে সালোয়ারের পাছার দিকের ছেঁড়া অংশটা টেনেটুনে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে।

চশমার ফাঁক দিয়ে চট করে একবার বন্দীর দিকে তাকিয়ে কর্ণেল জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলছেন ওরিওল প্রদেশের মিলিটারী কমিসারিয়েটে?' তারপর আবার চোখ নামিয়ে নিল। কী যেন একটা কাগজের টুকরো হাতে নাড়াচাড়া

করতে করতে চোখ কুঁচকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বুঝতে অসুবিধা হয় না, কোন দলিল হবে ওটা।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গত বছরের শরৎকালে?'

'শরতের শেষ দিকে।'

'আপনি মিছে কথা বলছেন।'

'সত্যি কথাই বলছি আমি।'

'আবার বলছি, মিছে কথা বলছেন।'

বন্দী নিরুপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। কর্ণেল গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যভরে ইশারায় বন্দীকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে দেখে চোখ সার্থক করুন। এককালে সম্রাটের ফৌজের অফিসার ছিলেন, এখন দেখতেই পাচ্ছেন, বলশেভিক। ধরা পড়ে যত রাজ্যের গল্প বানাচ্ছে, বোঝাতে চাইছে দৈবাৎ লালদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়তে হয়েছিল, যেন ওরা ওকে জোর জবরদস্তি করে দলে ঢুকিয়েছে। গোবেচারা সেজে স্কুলের মেয়েদের মতো অম্লান বদনে মিছে কথা বলে যাচ্ছে, ভাবছে আমরা বুঝি বিশ্বাস করব ওর কথা। এদিকে দেশের বিরুদ্ধে যে বেইমানি করেছে এটুকু স্বীকার করার মতো সৎসাহস ওর নেই। ভয় পাচ্ছে বেটা বদমাস!'

লোকটার কণ্ঠমণি নড়ে ওঠে। অনেক কষ্টে ঢোক গিলে বলল, 'একজন বন্দীকে অপমান করার মতো সৎসাহস আপনার আছে দেখতে পাচ্ছি কর্ণেল।'

'বদমাসদের সঙ্গে আমি কোন কথা বলি না।'

'কিন্তু আমাকে এখন বলতে হচ্ছে।'

'সাবধান বলছি। আমি কিন্তু গায়ে হাত তুলে আপনাকে অপমান করতে বাধ্য হব।'

'আপনি যেখানে আছেন সেখানে থেকে একাজটা করা তেমন কঠিন নয় – সব চেয়ে বড় কথা – নিরাপদ।'

একটিও কথা না বলে গ্রিগোরি টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে নির্ভয়ে মুখের ওপর জবাব ছুঁড়ে দেওয়ার পর বন্দীর মুখখানা ফেকাসে হয়ে উঠেছে। সহানুভূতির দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে হাসল গ্রিগোরি। মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবল, 'ভালোমতো বসিয়ে দিয়েছে হারামজাদা কর্ণেলটাকে।' আন্দ্রেয়ানভের লাল টকটকে মাংসল গালদুটো উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছে দেখে ভেতরে ভেতরে হিংস্র উল্লাস অনুভব না করে পারল না।

প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই নিজের সদর দপ্তরের এই প্রধানটিকে গ্রিগোরির অসহ্য মনে হয়েছে। আন্দ্রেয়ানভ সেই শ্রেণীর অফিসারদের একজন, যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

সময় লড়াইয়ের ময়দানে নামে নি। চাকুরীসূত্রে জানাশোনা ও প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজনের যোগসূত্র কাজে লাগিয়ে বেশ বুদ্ধিমানের মতো গা বাঁচিয়ে চলেছে, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাদের নিরাপদ চাকুরী। এমন কি গৃহযুদ্ধের আমলেও কর্ণেল আন্দ্রেয়ানভ ফন্দিফিকির ক'রে নোভোচের্কাস্কে প্রতিরক্ষা দপ্তরে কাজ বাগিয়েছিল। মাত্র আতামান ক্রাস্নোভ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই বাধ্য হয়ে তাকে ফ্রণ্টে যেতে হয়।

আন্দ্রেয়ানভের সঙ্গে একই আস্তানায় দু'রাত কাটিয়েছে গ্রিগোরি। এরই মধ্যে তার মুখ থেকে গ্রিগোরি জানতে পেরেছে যে সে খুব ভক্ত মানুষ, গির্জার পুজো-আচার আড়ম্বরের কথা বলতে গিয়ে তার চোখ জলে ভরে ওঠে, আর তার বৌটির মতো আদর্শ সতীসাধ্বী স্ত্রী আর হয় না। নাম তার সোফিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না। স্বয়ং আতামান সেনাপতি ব্যারন ফন গ্রাবে নাকি কোন এক সময় তাকে প্রেম নিবেদন ক'রে ব্যর্থ হয়েছিল। এছাড়া স্বর্গত পিতৃদেবের জমিদারী কেমন ছিল, আন্দ্রেয়ানভ নিজে কী করে ধাপে ধাপে শেষ পর্যন্ত কর্ণেলের পদে উঠল, ১৯১৬ সালে কোন্ কোন্ হোমরা চোমরা লোকের সঙ্গে শিকারে যাবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল নিজে থেকে এসবের খুঁটিনাটি বর্ণনাও দেয়। গ্রিগোরিকে কর্ণেল এও জানায় যে তার মতে তাসের খেলার মধ্যে হুইস্ট হল সবচেয়ে ভালো খেলা, সবচেয়ে উপকারী পানীয় জিরের পাতার আরক থেকে তৈরী ব্রান্ডি, আর মিলিটারীর চাকরীতে সবচেয়ে বড় দাঁও মারা যায় রসদ যোগানদার হতে পারলে।

ধারে কাছে কোথাও কামানের আওয়াজ হলে কর্ণেল আন্দ্রেয়ানভের থরহরি কম্পমান অবস্থা। ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে তার অনীহা – লিভারের অসুখের দোহাই পাড়ে। সদর ঘাঁটিতে পাহারাদারদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য তার নিরন্তর চেষ্টা। কসাকদের ওপর ওর বিদ্বেষ গোপন থাকে না, কেন না ওর কথায়, ১৯১৭ সালে তারা সকলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সেই সময় থেকে 'নীচু পদের' কোন কর্মচারীকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না – কোন বাছবিচার করে না সেক্ষেত্রে। কর্ণেলের মতে 'একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ই রাশিয়াকে উদ্ধার করতে পারে' – কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে দিতে ভোলে না যে ওর নিজেরও জন্ম অভিজাত বংশে এবং আন্দ্রেয়ানভ পরিবার দন প্রদেশে সবচেয়ে বনেদী আর মান মর্যাদায় সকলের সেরা।

নিঃসন্দেহে আন্দ্রেয়ানভের প্রধান দোষ ছিল তার বাচালতা। এই বাচালতা সেই সমস্ত প্রগল্‌ভ আর নির্বোধ লোকগুলোর মতো, যারা অল্প বয়স থেকেই যে-কোন বিষয়ে অনায়াসে যা খুশি তাই মতামত জাহির করতে অভ্যস্ত, যাদের বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে বসে বুড়োটে, বেচাল বিশ্রী ধরনের বুকনির ঝোঁক।

এধরনের মানুষ গ্রিগোরি তার জীবনে অনেক দেখেছে। পাখির মতো

কিচিরমিচির করা এ: স্বভাব। এদের দারুণ ঘৃণা করে গ্রিগোরি। আন্দ্রেয়ানভের সঙ্গে যেদিন আলাপ হল তার পর দিনই গ্রিগোরি তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে। দিনের বেলায় সেটা সম্ভবও হয়। কিন্তু রাত্রে বিশ্রামের সময় হতেই আন্দ্রেয়ানভ ওকে খুঁজে বার করে। তাড়াতাড়ি করে বলে ওঠে, 'রাতে একসঙ্গে থাকব ত?' – তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই বলতে শুরু করে, 'এই যে ভাই, আপনি বলছিলেন, পায়দল ফৌজের লড়াইয়ের সময় কসাকদের ওপর তেমন ভরসা করা চলে না। অথচ আমি যখন মহামান্যের একান্ত অফিসার ছিলাম তখন . . .   কে আছ ওখানে, আমার তোরঙ্গ আর বিছানাটা এখানে নিয়ে এসো দেখি!' গ্রিগোরি চিত হয়ে শুয়ে থাকে, চোখ বন্ধ করে, দাঁতে দাঁত চেপে শোনে লোকটার কথাগুলো। তারপর ভদ্রতার কোন বালাই না রেখে এই একটানা বকে চলা লোকটার দিকে পিছন ফিরে শোয়, গ্রেটকোটটা দিয়ে মাথা ঢাকে। অন্ধ রাগে গজরাতে গজরাতে মনে মনে ভাবে: 'একবার বদলির হুকুমটা পেলেই হয় – ভারী কোন জিনিস দিয়ে ব্যাটার মাথায় এমন এক ঘা বসিয়ে দেবো যে তারপর আর অন্তত হপ্তাখানেক মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোবে না!' 'ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি লেফ্‌টেনান্ট?' আন্দ্রেয়ানভ জিজ্ঞেস করে। 'ঘুমোচ্ছি,' চাপা গলায় গ্রিগোরি জবাব দেয়। 'হ্যাঁ, কথাটা কিন্তু শেষ হল না,' এই বলে ফের চালিয়ে যায় তার গল্প। আধা ঘুমের মধ্যে গ্রিগোরি ভাবে, 'নাঃ এই বকিয়েটাকে দেখছি ইচ্ছে করেই আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এ নির্ঘাত ফিট্‌জহেলাউরভের কাজ। এখন এই বদ্দি মালটাকে নিয়ে কী করি আমি? অমন লোক দিয়ে কী কাজ হবে আমার?' ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ওর কানে এসে বাজতে থাকে কর্ণেলের কর্ণভেদী খনখনে গলার আওয়াজ – মনে হয় যেন টিনের ছাদে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টির ছররা পড়ছে।

ঠিক এই কারণেই আর্মির সদর দপ্তরের এই বাচাল কর্তাটিকে লাল ফৌজের বন্দী কম্যাণ্ডারের কাছে আচ্ছামতো নাকানি চুবানি খেতে দেখে একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করল গ্রিগোরি।

মিনিটখানেকের জন্য আন্দ্রেয়ানভ চুপচাপ বসে রইল, চোখ কোঁচকাল। ওর খাড়া খাড়া কানের লম্বা লতিগুলো লাল টকটকে হয়ে উঠল। তর্জনীতে ভারী সোনার আঙটি পরা ফর্সা ফুলো হাতখানা টেবিলের ওপর পড়ে আছে, কাঁপছে।

রাগে উত্তেজনায় ভেঙে গিয়েছিল ওর গলা। বলল, 'বেজন্মা কোথাকার! শুনে রাখুন তাহলে! আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করব বলে এখানে ডেকে আনি নি আপনাকে – সে কথা ভুলে যাবেন না! আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আপনার নিস্তার নেই?'

'বেশ বুঝতে পারছি।'

'যত বোঝেন ততই মঙ্গল আপনার পক্ষে। মোট কথা, আপনি ইচ্ছে করে রেড আর্মিতে গেছেন, না ওরা আপনাকে জোর করে ফৌজে ঢুকিয়ে নিয়েছে তাতে আমার ভারী বয়েই গেল। সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল এই যে মানসম্মান সম্পর্কে একটা মিথ্যে ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনি বলতে অস্বীকার করছেন . . .'

'দেখা যাচ্ছে মান মর্যাদা সম্পর্কে আপনার আর আমার ধারণা একেবারেই আলাদা।'

'তার কারণ এই যে সে জিনিসটার ছিটেফোঁটাও আপনার অবশিষ্ট নেই!'

'আপনার কথা বলতে গেলে, আপনি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করছেন, তাতে আত্মসম্মান বোধ আপনার কস্মিনকালে ছিল বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে কর্ণেল!'

'বড্ড তাড়াতাড়ি পরিণতি ডেকে আনার সাধ হয়েছে যেন মনে হচ্ছে আপনার?'

'টেনে বাড়িয়ে আমার কোন লাভ আছে বলে মনে হয় নাকি আপনার? আমায় ভয় দেখাবেন না, তাতে কোন সুবিধে হবে না!'

কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট-কেস খুলে আস্ত্রেয়ানভ একটা সিগারেট বার ক'রে ধরাল। লোভীর মতো লম্বা লম্বা দুটো টান দিয়ে আবার ফিরে তাকাল বন্দীর দিকে।

'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করছেন তাহলে?'

'আমি আমার নিজের কথা সবই বলেছি আপনাকে।'

'চুলোয় যান! আপনার মতো ওঁচা মার্কা লোকের পরিচয় জানতে কোন আগ্রহ নেই আমার। দয়া করে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন আমাকে। সেব্রিয়াকোভো স্টেশন থেকে কোন্ কোন্ ইউনিট আপনাদের সঙ্গে এসে জুটেছিল বলবেন কি?'

'আমি ত আগেই আপনাকে বলেছি, আমি জানি নে।'

'আপনি জানেন!'

'বেশ, আপনাকে খুশি করার জন্যেই তাহলে বলি – জানি, কিন্তু বলব না।'

'ডাণ্ডা দিয়ে পেটানোর হুকুম দেব তাহলে – মুখ না খুলে যাবেন কোথায়?'

বন্দী বাঁ হাতে গোঁফ ছুঁয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে মুচকি হেসে বলল, 'ওতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না।'

'কামিশিন্স্কি রেজিমেন্ট যোগ দিয়েছিল কি এ লড়াইয়ে?'

'না।'

'কিন্তু আপনার বাঁ পাশ আগলাচ্ছিল একটা ক্যাভালরি ইউনিট। সেটা কোন্ ইউনিট?'

'রাখুন দেখি! আরও একবার বলি আপনাকে, এ ধরনের কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।'

'পথ বেছে নিতে হবে তাহলে। কুত্তার বাচ্চা, হয় তোকে এখনই মুখ খুলতে হবে, নয়ত দশ মিনিটের মধ্যে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মারা হবে তোকে! বলছি কী?'

একথায় বন্দী আচমকা গলা চড়াল। সতেজ গলায় গমগম ক'রে বলল, 'আহাম্মক বুড়ো কোথাকার! জ্বালিয়ে খেলে দেখছি! আকাট! আমার হাতে পড়লে অন্য ভাবে আপনাকে জেরা করতাম আমি।...'

আন্দ্রেয়ানভের মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। রিভলভারের খাপে হাত দিল সে। এবারে গ্রিগোরি ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে বারণ করার ভঙ্গিতে হাত তুলল।

'ব্যস্, আর নয়, হয়েছে। খানিকটা কথাবার্তা হল - ওতেই চলবে। আপনারা দু'জনেই বগচটা দেখছি।... বলল না - তা যাক গে। কী দরকার অত আলোচনার? উনি ঠিকই করছেন - নিজের লোকদের ধরিয়ে দেবার ইচ্ছে ওর নেই। সত্যি বলতে গেলে কি, চমৎকার! এটা আমি আশাই করতে পারি নি!'

পিস্তলের খাপের বোতাম খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে আন্দ্রেয়ানভ উত্তেজিত হয়ে বলে, 'না, আপনি একবার মুখ ফুটে বলুন!...'

'না, আমি তা বলব না!' টেবিলের কাছ ঘেঁসে চলে এসে বন্দীকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে খুশিভরা গলায় চটপট বলে ওঠে গ্রিগোরি। 'একজন বন্দীকে খুন করা কোন কাজের কথা নয়। এরকম একটা লোকের ওপর তাক করতে বিবেকে বাধে না আপনার? কোন অস্ত্র নেই, বন্দী মানুষ, ওঁর পরনের কাপড়টুকু পর্যন্ত ত রাখেন নি দেখছি - আপনি কিনা বুলেট ছোঁড়ার জন্যে হাত তুলছেন!...'

'তফাত যান! আমাকে অপমান করেছে এই হতভাগাটা!' জোর করে গ্রিগোরিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পিস্তল বাগিয়ে ধরে আন্দ্রেয়ানভ।

বন্দী চটপট জানলার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল, কাঁধদুটো এমন ভাবে নাচাল যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগেছে। গ্রিগোরি হাসিমুখে আন্দ্রেয়ানভের গতিবিধি লক্ষ করে। এদিকে আন্দ্রেয়ানভ হাতের মধ্যে রিভলভারের খরখরে বাঁটটার স্পর্শ অনুভব ক'রে কেমন যেন আনাড়ির মতো সেটাকে নাচাল, তারপর নলটা নীচে নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই নে!...' শুকিয়ে ওঠা ঠোঁট চাটতে চাটতে ভারী নিশ্বাস ফেলে ভাঙা গলায় সে বলল।

গ্রিগোরি আর হাসি চাপতে পারল না। হাসির দমকে গোঁফের ফাঁক দিয়ে ঝলকে উঠল সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটি।

'সে চেষ্টা করলেও কোন লাভ হত না! একবার তাকিয়ে দেখুন, আপনার পিস্তলে যে গুলি ভরা নেই। . . . রাতে সেই যে আমরা ঘুমিয়েছিলাম, সেখানেই সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর টেবিল থেকে ওটা তুলে দেখেছিলাম আমি। . . . একটা বুলেটও নেই ওর ভেতরে। সাফ করা হয় নি – তা মনে হয় মাস দুয়েক হবে! নিজের হাতিয়ারটার ওপর আপনার তেমন যত্ন নেই দেখা যাচ্ছে!'

আন্দ্রেয়ানভ চোখ নামিয়ে নিল, বুড়ো আঙুল দিয়ে রিভলভারের ঘরটা ঘুরিয়ে দেখার পর মুচকি হাসল।

'ধুত্তোর ছাই! সত্যিই ত . . .'

লেফটেনান্ট সুলিন এতক্ষণ ধরে নীরবে, কৌতুকভরে হাসতে হাসতে গোটা দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। এবারে এজাহারের কাগজটা ভাঁজ করে রেখে আধ আধ স্নিগ্ধ গলায় বলল, 'আমি আপনাকে কতবার বলেছি কর্ণেল, হাতিয়ারের ব্যাপারে আপনার ভীষণ অযত্ন। আজকের এই ঘটনা তার আরেকটা জলজ্যান্ত প্রমাণ।'

আন্দ্রেয়ানভ ভুরু কোঁচকাল, দরজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এই, সেপাইদের কে আছ ওখানে? এদিকে এসো!'

বাইরের ঘর থেকে এসে ঢুকল দু'জন আর্দালি আর পাহারাদার দলের ওপরওয়ালা।

'একে নিয়ে যাও!' মাথার ইশারায় আন্দ্রেয়ানভ দেখিয়ে দিল বন্দীকে।

বন্দী ঘুরে দাঁড়াল গ্রিগোরির মুখোমুখি। নীরবে মাথা নোয়াল। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। গ্রিগোরির মনে হল বন্দীর সামান্য কটা রঙের গোঁফের ফাঁকে ঠোঁটজোড়া যেন নড়েচড়ে উঠল প্রচ্ছন্ন কৃতজ্ঞতার হাসিতে।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে আন্দ্রেয়ানভ ক্লান্ত ভাবে চশমাজোড়া খুলে ছোট্ট এক টুকরো সোয়েড চামড়া দিয়ে যত্ন করে কাঁচ মুছে পরিষ্কার করল, বেশ বিরক্তিভরে বলল, 'খুব বাঁচিয়ে দিলেন হারামজাদাটাকে। যাক গে, সে আপনার নিজের বিচার বুদ্ধিমতো যা ভালো বুঝেছেন করেছেন। কিন্তু ওর সামনে আমার পিস্তল নিয়ে কথা, আমাকে বেকায়দায় ফেলা – এটা কী রকম কাজ হল বলতে পারেন কি?'

'বিশেষ ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না,' ওকে প্রবোধ দিল গ্রিগোরি।

'না, যাই বলেন না কেন, ঠিক হয় নি। আপনি জানেন কি, আমি ওকে মেরেও ফেলতে পারতাম? একটা জঘন্য ধরনের লোক! আপনি আসার আগে আধ ঘণ্টা ওর সঙ্গে প্যাঁচ কষতে হয়েছে আমাকে। কত যে মিথ্যে কথা বলল, গুলিয়ে দেবার আর পিছলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, মিথ্যে সব খবর দিয়ে গেল – কী বলব! কিন্তু যেই হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল অমনি একদম বেঁকে

বসল, একটি কথাও বলতে অস্বীকার করল। শত্রুর কাছে মিলিটারীর গোপন তথ্য ফাঁস করতে নাকি ওর অফিসারী মানে বাধে। যখন বলশেভিকদের কাছে ভাড়া খাটতে যায় তখন কোথায় ছিল তার অফিসারী মান? শালা শুয়োরের বাচ্চা! . . . আমার মতে ওকে আর কম্যাণ্ডের আরও দুই ওপরওয়ালাকে চুপচাপ গুলি মেরে সাবাড় করে দেওয়া দরকার। যে ধরনের খবর আমরা চাই ওদের কাছ থেকে তা পাবার কোন আশা নেই। ওরা সব বাস্তুঘুঘু, বদমায়েসের দল, কোন মতে শোধরাবে না, তাই বলি কি, ওদের বাঁচিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। আপনার কী মনে হয়?'

'কী ক'রে জানলেন যে লোকটা কম্পানির কম্যাণ্ডার?' উত্তরের বদলে পাল্টা প্রশ্ন করে গ্রিগোরি।

'ওরই দলের একজন বলে দিয়েছে।'

'আমি বলি কি কম্যাণ্ডারদের ছেড়ে দিয়ে গুলি ক'রে মারা উচিত ওই লাল ফৌজীটাকে।' গ্রিগোরি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আস্ত্রেয়ানভের দিকে।

আস্ত্রেয়ানভ থতমত খেয়ে কাঁধ ঝাঁকায়, কারও বাজে রসিকতা শুনে লোকে যেমন হাসে তেমনি ভাবে হাসতে থাকে।

'না, না, সত্যি করে বলুন, আপনার মতটা কী?'

'যা বলার ওই ত বললাম।'

'মাপ করবেন, কিন্তু ওর পেছনে কোন্ যুক্তি আছে?'

'যুক্তি? যুক্তিটা হল এই যে রুশ আর্মিতে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। গতকাল আমরা যখন শুতে যাই তখন আপনি কর্ণেল, বলশেভিকদের ধ্বংস করার পর কী ধরনের শৃঙ্খলা ফৌজে আনা দরকার সেই নিয়ে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন ছোকরাদের ভেতর থেকে লাল রোগের বীজ তাড়াতে হলে সেটা দরকার। আমি সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলাম আপনার কথায়, মনে আছে আপনার?' কর্ণেলের মুখের ভঙ্গি কী ভাবে পাল্টাতে থাকে গোঁফে তা দিতে দিতে সেদিকে লক্ষ করে গ্রিগোরি। শেষকালে প্রকাশ করে সুচিন্তিত মন্তব্য: 'কিন্তু এখন আপনি কী বলছেন? এতে ত আপনি দুর্নীতি ছড়াতেই সাহায্য করছেন। তার মানে বলতে চান, সেপাইরা তাদের কম্যাণ্ডারদের ধরিয়ে দিক? এ কী শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি ওদের? আপনি, আমি – আমরা যদি এরকম পরিস্থিতিতে পড়তাম তা হলে? না, মাপ করবেন, এখানে আমি নিজের মত আঁকড়ে থাকব! একমত হতে পারছি নে।'

'সে আপনি যা ভালো বোঝেন,' গ্রিগোরির দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে

ঠাণ্ডা গলায় আস্ত্রেয়ানভ বলে। ও শুনেছিল বটে যে বিদ্রোহী ডিভিশনের এই কম্যাণ্ডারটি একটু মেজাজী আর খাপছাড়া গোছের। তবু এতটা আশা করে নি তার কাছ থেকে। সে শুধু যোগ করল, 'লাল ফৌজের যে সব কম্যাণ্ডার আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে তাদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে এককালে যারা অফিসার ছিল তাদের ক্ষেত্রে আমরা বরাবরই এই ব্যবহার ক'রে আসছি। আপনার ধরনধারণ কেমন যেন নতুন ঠেকছে।... এমন একটা সহজ প্রশ্নে, যাতে কোন তর্কই উঠতে পারে না, আপনার মনোভাব আমার কাছে একেবারেই বোধগম্য নয়।'

'আগে আমরা সুযোগ পেলে লড়াইয়ের ময়দানেই মেরে ফেলেছি ওদের। কিন্তু বন্দীদের অকারণে গুলি ক'রে মারি নি!' জবাব দিতে গিয়ে লাল হয়ে ওঠে গ্রিগোরির মুখ।

'বেশ, তাহলে যা বলেন, লড়াইয়ের জায়গার পেছন দিকে পাঠিয়ে দেব ওদের,' আস্ত্রেয়ানভ সায় দিল। 'তবে হ্যাঁ, এখন একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে – বন্দীদের একটা অংশ – সারাতভ প্রদেশের চাষীরা, জোর করে তাদের পলটনে ঢোকানো হয়েছিল, এখন আমাদের দলে শামিল হয়ে লড়াই করতে চাইছে। আমাদের পায়দল সেপাইদের তিন নম্বর রেজিমেন্টে বেয়নেটধারীদের সংখ্যা তিন শ'রও কম। বেশ যত্ন করে বাছাইয়ের পর কিছু বন্দী স্বেচ্ছাসেবককে সেখানে ঢোকানো সম্ভব বলে আপনি মনে করেন কি? এ ব্যাপারে আর্মির সদর দপ্তর থেকে আমাদের ওপর বিশেষ কতকগুলো নির্দেশ আছে।'

গ্রিগোরি সরাসরি জানিয়ে দিল, 'একটি চাষীকেও আমি আমার কোন ইউনিটে নিচ্ছি না। ক্ষতি যা হয়েছে তা কসাকদের দিয়েই পূরণ করতে হবে।'

আস্ত্রেয়ানভ ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে।

'শুনুন, তর্ক করতে যাব না। ডিভিশনে এক জাতের লোক থাক – পুরোপুরি কসাকরাই থাক, আপনার এই ইচ্ছে আমি বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু আমরা এমন ঠেকায় পড়েছি যে বন্দীদেরও হেলাফেলা করাটা ঠিক হবে না। এমনকি ভলান্টিয়ার আর্মিরও কোন কোন রেজিমেন্ট বন্দীদের দিয়ে জোরদার করা হচ্ছে।'

'তারা যা ভালো বোঝে করুক গে। আমি চাষীদের নিতে রাজী নই। এ নিয়ে আর কোন কথা নয়,' গ্রিগোরি পাল্টা জবাব দিল।

কিছুক্ষণ পরে বন্দীদের পাঠানোর ব্যাপারে তদারক করতে বাইরে বেরোল সে। যাবার সময় আস্ত্রেয়ানভ উত্তেজনাভরে বলল, 'দেখা যাচ্ছে আমরা দু'জনে মিলেমিশে কাজ করতে পারব না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' উদাসীন ভাবে উত্তর দিল গ্রিগোরি। সুলিনের হাসিটা লক্ষ না ক'রে আঙুল দিয়ে প্লেট থেকে এক টুকরো সেদ্ধ মাংস তুলে

নিয়ে এমন ভাবে নেকড়ের মতো কড়মড় করে দাঁত দিয়ে হাড় চিবুতে শুরু করল যে সুলিন মুখ বিকৃত করল, যেন ওর নিজেরই প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। এমন কি মুহূর্তের জন্য চোখই বুজে ফেলল।

* * *

দু'দিন পরে পিছু-হটা লাল ফৌজের ইউনিটগুলোকে তাড়া করে নিয়ে যাবার ভার নিল জেনারেল সাল্‌নিকভের দল। গ্রিগোরির জরুরী তলব পড়ল সেনাপতিমণ্ডলীর দপ্তরে। স্টাফের প্রধান একজন প্রৌঢ়, সুপুরুষ জেনারেল। দন আর্মির সর্বাধিনায়ক বিদ্রোহী সৈন্যদল ভেঙে নতুন করে ঢেলে সাজানোর যে হুকুম দিয়েছেন, সেটার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিশেষ কোন ভূমিকা না ক'রেই সে বলল, 'লাল ফৌজের সঙ্গে গেরিলা লড়াইয়ের সময় একটা ডিভিশন চালিয়ে আপনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এখন একটা ডিভিশনের কেন, রেজিমেন্টের ভার পর্যন্ত আমরা আপনার ওপর ছেড়ে দিতে পারি না। আপনার সামরিক শিক্ষা নেই। তাছাড়া ফ্রন্ট আজকাল যেমন ছড়িয়ে পড়েছে আর লড়াই চালানোর আধুনিক কায়দা কানুনও যেমনি, তাতে বিরাট কোন মিলিটারী ইউনিট চালানোর ক্ষমতা আপনার নেই। আপনি স্বীকার করেন ত?'

'হ্যাঁ, তা স্বীকার করি,' গ্রিগোরি জবাব দেয়। 'আমি নিজেই ডিভিশনের ভার ছেড়ে দেবার কথা ভাবছিলাম।'

'খুব ভালো কথা যে আপনি আপনার নিজের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখেন না। আজকালকার ছেলেছোকরা অফিসারদের মধ্যে এই গুণটা সচরাচর চোখে পড়ে না। তাহলে যা বলি শুনুন। ফ্রন্টের ওপরওয়ালার হুকুমে আপনাকে উনিশ নম্বর রেজিমেন্টের চার নম্বর স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডারের পদ দেওয়া হয়েছে। রেজিমেন্ট এখন পথ চলতি। এখান থেকে ছয়-সাত ক্রোশ দূরে, ভিয়াজনিকভ গ্রামের কাছাকাছি কোথাও আছে। আজই চলে যান, নিদেনপক্ষে কাল। আপনি কিছু বলতে চান মনে হচ্ছে?'

'আমি বলতে চাই কি কোন রসদ ইউনিটে আমাকে দিতে পারলে ভালো হত।'

'সেটা সম্ভব নয়। ফ্রন্টে আপনাকে দরকার হবে।'

'দুটো যুদ্ধে আমি চৌদ্দবার জখম হয়েছি, শেল-শক পেয়েছি।'

'ওকথার কোন মানে হয় না। আপনার বয়স কম, বেশ সুস্থসবল দেখায় আপনাকে। এখনও লড়াই করতে পারেন। জখমের কথা যদি বলেন, অফিসারদের মধ্যে কে না জখম হয়েছে বলুন? যেতে পারেন। আপনার মঙ্গল হোক!'

বিদ্রোহী বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হলে উজানী দলের কসাকদের মধ্যে অসন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। সম্ভবত এই অসন্তোষ চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিদ্রোহের সময় যে-সব সাধারণ কসাক-সেপাই কৃতিত্বের পরিচয় দেয় উস্ত্-মেদভেদিৎস্কায়া দখল করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেককে প্রমোশন দেওয়া হল। প্রায় সব সার্জেন্টের পদোন্নতি ঘটে জুনিয়র-কর্ণেটে। বিদ্রোহে যারা যোগ দিয়েছিল সেই অফিসারদেরও আরও উঁচু পদ আর পুরস্কার দেওয়া হল।

গ্রিগোরিও বাদ গেল না। ওকে লেফ্‌টেনান্টের পদ দেওয়া হল, ফৌজী হুকুমনামায় লাল ফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ে ওর বিশেষ কৃতিত্বের উল্লেখ ক'রে আনুষ্ঠানিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো হল ওকে।

বাহিনী ভেঙে দিতে সময় লাগল অল্প কয়েক দিন। ডিভিশন আর রেজিমেন্টের অশিক্ষিত কম্যাণ্ডারদের জায়গা নিল জেনারেল আর কর্ণেলরা। স্কোয়াড্রনের ভার দেওয়া হল অভিজ্ঞ অফিসারদের ওপর। গোলন্দাজ বাহিনী আর সেনাদপ্তরের অধিনায়কদের পুরোপুরি বদল হল, আর সাধারণ কসাক-সেপাইদের দিয়ে দনেৎসের লড়াইয়ে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত দন আর্মির নিয়মিত রেজিমেন্টগুলো ভারী করা হল।

সন্ধ্যার আগে আগে কসাকদের জড় ক'রে ডিভিশন ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা তাদের জানাল গ্রিগোরি। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে সে বলল, 'আমার ওপর মনে কোন রাগ পুষে রেখো না, কসাক ভাইরা। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে সে কাজ করেছিলাম। আজ থেকে আমাদের আলাদা আলাদা হয়ে বইতে হবে যার যার দুঃখের বোঝা। সবচেয়ে বড় কথা, নিজেদের মাথা বাঁচিয়ে রাখ, যাতে লালেরা ফুটো করতে না পারে। আমাদের মাথা, তা সে বুদ্ধিহীন হোক আর যাই হোক, খামোকা বুলেটের সামনে পেতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওই দিয়ে এখনও আমাদের ভাবতে হবে, বেশ ভালো করে ভাবনাচিন্তা করে দেখতে হবে ভবিষ্যতে কী করা উচিত আমাদের।...'

কসাকরা হতাশ হয়ে চুপ করে রইল। পরে সবাই একসঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল, নানা গলায়, চাপা স্বরে।

'আবার শুরু হল সেই আগের খেল?'

'এখন আমরা তাহলে কোথায় যাব?'

'শালা হারামজাদারা আমাদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে চায়!'

'দল ভাঙা চলবে না! এ আবার কোন্ নতুন কানুন?'

'এ যে দেখছি ভাই আমরা এক হয়ে নিজেরাই নিজেদের ঘাড় ভাঙলাম!'

'কর্তামশাইরা আবার আমাদের ধরে ধরে ঘাড় মটকাতে শুরু করবেন।'

'এই বেলা সামলাও। আমাদের পিটিয়ে লম্বা ক'রে ছাড়বে।...'

গ্রিগোরি চুপ করে থাকে, যতক্ষণ না নিস্তব্ধতা নেমে আসে। শেষকালে বলল, 'তোমরা খামোকা গলা ফাটিয়ে মরছ। সেই সুখের দিন আর আজ নেই যখন ওপরওয়ালার হুকুম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেত, তার প্রতিবাদ করা চলত। যে যার আস্তানায় চলে যাও। জিভ আর বেশি নাড়তে যেয়ো না, নয়ত দিনকাল যা পড়েছে – বেশি দূর যেতে হবে না – কোর্ট মার্শাল হয়ে যেতে পারে, কিংবা কোন জরিমানা-স্কোয়াড্রনে ঢুকিয়ে দিতে পারে।'

কসাকরা দলে দলে গ্রিগোরির কাছে এসে হাত ধরে বিদায় নিতে থাকে। বলে, 'চলি পান্তেলেয়েভিচ। তুমিও আমাদের ওপর মনে রাগ পুষে রেখো না।'

'অজানা অচেনা লোকদের সঙ্গে কাজ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে না। ওঃ সে বড় কঠিন হবে।'

'আমাদের ছেড়ে দিয়ে তুমি ঠিক করলে না। ডিভিশন দিয়ে দিতে রাজী না হলেই পারতে।'

'তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ বলে বড় দুঃখু হচ্ছে মেলেখভ। অন্য কম্যাণ্ডাররা তোমার চেয়ে লেখাপড়া বেশি জানতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের কোন সুবিধে হবে না, বরং অসুবিধেই বেশি হবে – সেখানেই ত বিপদ।'

একমাত্র একজন কসাক – নাপলোভ্স্কি গ্রামের লোক, স্কোয়াড্রনের মধ্যে একটু হ্যাবলা আর বাকচতুর বলে যার পরিচয় আছে, মন্তব্য করল, 'ওদের কথায় বিশ্বাস কোরো না গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। নিজেদের লোকের কাজ কর, আর অচেনা অজানা মনিবের কাজ কর, মনে সায় না থাকলে সব কাজই সমান বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।'

* * *

সে রাতটা ইয়েমাকোভ আর অন্য সব কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে ঘরে চোলাই মদ খেয়ে কাটাল গ্রিগোরি। পর দিন সকাল হতে প্রোখর জিকভকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল উনিশ নম্বর রেজিমেন্টের নাগাল ধরতে।

স্কোয়াড্রনের ভার হাতে নিয়ে লোকজনের সঙ্গে ভালোমতো চেনাপরিচয় হওয়ার আগেই রেজিমেন্ট কম্যাণ্ডারের কাছে ওর তলব পড়ল। তখন খুব ভোর। গ্রিগোরি ঘোড়াগুলো দেখছিল ঘুরে ঘুরে। একটু গড়িমসি ক'রে আধঘণ্টা পার হতে তবে এসে হাজির হল। কম্যাণ্ডারটি বেশ কড়া ধাতের, অফিসারদের কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না। গ্রিগোরির তাই আশঙ্কা ছিল ওকে সে নির্ঘাত ধাতানি দেবে। কিন্তু তা না ক'রে বেশ ভালো ভাবেই ওকে আপ্যায়ন ক'রে জিজ্ঞেস

বলল, 'তারপর স্কোয়াড্রন কেমন দেখছেন? সেপাইরা সব কাজের লোক ত?' গ্রিগোরির জবাবের অপেক্ষা না ক'রেই ওকে ছাড়িয়ে দূরে কোথাও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, 'আপনাকে বড় খারাপ একটা খবর দিতে হচ্ছে, বন্ধু।... আপনার বাড়িতে একটা দারুণ দুর্ভাগ্যের ঘটনা ঘটে গেছে। আজ রাতে ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। পরিবারের সমস্ত কাজকর্ম গোছগাছ করার জন্যে এক মাসের ছুটি দেওয়া হচ্ছে আপনাকে। যান, কাজ সেরে আসুন।'

'টেলিগ্রামটা একবার দেখতে দিন আমায়,' বলার সময় ফেকাসে হয়ে যায় গ্রিগোরির মুখ।

চার ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে ও ভাঁজ খুলে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে ঘেমে ওঠা হাতে সেটা চেপে দলা পাকিয়ে ফেলল। নিজেকে সামলে নিতে ওর তেমন একটা চেষ্টা করতে হল না। মাত্র সামান্য একটু আমতা আমতা ক'রে ও বলল, 'না, এটা ভাবতেই পারি নি। তাহলে যেতেই হয় দেখছি। চলি।'

'ছুটির কাগজটা নিতে ভুলবেন না।'

'হ্যাঁ। ভালোই বলেছেন। ভুলব না।'

বারান্দায় ও বেরিয়ে আসে দৃঢ় পদক্ষেপে, দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কোমরে ঝোলানো তলোয়ারখানা হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে। কিন্তু উঁচু ধাপ থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ যেন নিজের পায়ের শব্দই আর ওর কানে ঢোকে না, তাইতে তৎক্ষণাৎ বুকের ভেতরে অনুভব করে সঙিনের খোঁচার মতো একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা।

একেবারে নীচের ধাপে এসে ও টাল খায়। নড়বড়ে রেলিংটা চেপে ধরে বাঁ হাতে, ডান হাতে তাড়াতাড়ি খুলতে থাকে কলারের বোতাম। মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে বুক ভরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয়। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গভীর বেদনায়। তারপর যখন রেলিং ছেড়ে দিয়ে ফটকের কাছে যেখানে ঘোড়াটা বেঁধে রেখেছিল, সেদিকে পা বাড়ায় তখন চলতে থাকে ভারী পা ফেলে সামান্য টলতে টলতে।

ষোল

দারিয়ার সঙ্গে কথা বলার পর কয়েক দিন ধরে নাতালিয়ার কাটে যেন আচ্ছন্নের মতো ঘুমের ঘোরে, যেন একটা দুঃস্বপ্ন ভারী হয়ে ওর বুকে চেপে বসেছে, অথচ ও কিছুতেই চেতনা ফিরে পাচ্ছে না। ভাবল কোন একটা যুতসই অজুহাত দেখিয়ে প্রোখর জিকভের বৌয়ের কাছে গিয়ে জানার চেষ্টা করবে গ্রিছু

হটার সময় গ্রিগোরি কী ভাবে ভিওশেনস্কায়ায় কাটিয়েছিল বা আক্সিনিয়ার সঙ্গে ওখানে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা। ওর উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর অপরাধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া। দারিয়ার কথা ও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না, আবার একেবারে ফেলে দিতেও পারছিল না।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, এই সময় নিশ্চিত ভাব দেখিয়ে একখানা ডাল হাতে দোলাতে দোলাতে ত্রিকভদের বাড়ির উঠোনের কাছে এগিয়ে এলো নাতালিয়া। প্রোখরের বৌ বাড়ির কাজকর্ম সেরে ফটকের ধারে বসে ছিল।

'এই যে সেপাই গিন্নি, কী খবর? আমাদের বাছুরটাকে দেখেছ?' নাতালিয়া জিজ্ঞেস করল।

'ভগবানের কৃপায় ভালোই গো। না, দেখি নি।'

'লক্ষ্মীছাড়াটা যে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়! - ঘরে কিছুতেই থাকবে না! কোথায় যে এখন খুঁজি জানি নে।'

'সবুর কর, একটু জিরিয়ে নাও। পাওয়া যাবে'খন। সূর্যমুখীর বীচি খাবে?'

নাতালিয়া কাছে এসে বসল। শুরু হয়ে গেল সাধারণ মেয়েলি গালগল্প।

'তোমার সেপাইয়ের খবর কিছু পেলে?' নাতালিয়া জানতে চাইল।

'কোন খবর নেই। ডেকরা মিনসে যেন একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। তা তোমার মিনসেটি কোন খবর দিয়েছে কি?'

'না। বলেছিল বটে লিখবে, কিন্তু কেন যেন আজ অবধি একটা চিঠিও নেই। লোকে বলে আমাদের ওরা নাকি উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসা পার হয়ে কোথায় চলে গেছে - এর বেশি আর কিছু শুনি নি।' এই কিছু দিন আগে সেপাইরা যে পিছু হটে দনের ওপারে চলে যায় নাতালিয়া প্রসঙ্গ পালটে সে কথা তোলে। তারপর সাবধানে শুরু করে ভিওশেনস্কায়ার কথা, জিজ্ঞেস করে সেপাইরা সেখানে কেমন ছিল, গাঁয়ের লোকজনের মধ্যে কারাই বা ছিল ওদের সঙ্গে। প্রোখরের বৌটি বেশ চালাক চতুর, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল নাতালিয়া কেন তার কাছে এসেছে। বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে শুকনো গলায় সে উত্তর দেয়।

স্বামীর মুখ থেকে গ্রিগোরি সম্পর্কে সবই জেনেছিল সে। কিন্তু জিভ সুড়সুড় করলেও কিছু বলতে সাহস হয় না। ওর মনে আছে প্রোখর ওকে পই পই ক'রে বলে দিয়েছিল, 'খেয়াল রাখিস কিন্তু। কারও কাছে ঘুণাক্ষরেও যদি একটি কথা বলে ফেলিস, তাহলে হাড়িকাঠে তোর মাথাটা চেপে ধরে জিভখানা এক হাত টেনে বার ক'রে কেটে ফেলে দেব। এসব কথা গ্রিগোরির কানে গেলে আর দেখতে হবে না - কোন রকম বিচার না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আমায় মেরে ফেলবে। জীবনের দেখাই পেলাম না এখনও, এর মধ্যে তুই একাই আমাকে

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলি। যা বললাম বুঝলি ত? মড়ার মতো মুখ বুজে থাকবি।'

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলে নাতালিয়া সরাসরি প্রশ্ন ক'রে বসে, 'তোমার প্রোখর আক্সিনিয়া আস্তাখভাকে দেখে নি ভিওশেন্স্কায়ায়?'

'কোথা থেকে তাকে দেখবে বল? ওর কি খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই বলে মনে কর? ভগবানের দিব্যি, আমি কিছু জানি নে। দোহাই তোমার, ও নিয়ে আমায় অমন চাপাচাপি কোরো না। আমার ওই পাটরঙা চুলো যা কথা বলে তার কোন মাথামুণ্ডু বার করতে পারলে ত! বলার মধ্যে শুধু বলতে জানে 'দাও' আর 'নাও' - এই দুটো কথা।'

কিছুই আদায় করা গেল না ওর কাছ থেকে। আরও বেশি বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে বিদায় নিল নাতালিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা না জেনে থাকবে তা-ই বা কেমন করে হয়। ঠিক করল আক্সিনিয়ার কাছে একবার যাবে।

পাশাপাশি বাড়িতে থাকে বলে গত ক'বছর প্রায়ই ওদের দেখাসাক্ষাৎ হত। একজন আরেকজনকে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাত, কখন-সখন এক আধটা বাক্যবিনিময় হত ওদের দু'জনার মধ্যে। একটা সময় গেছে যখন দেখাসাক্ষাৎ হলে ওরা কেউ কাউকে কোন সম্ভাষণ করত না, ঘৃণা ভরা চোখে দু'জনে দু'জনকে দেখত। সেদিন এখন আর নেই। ওদের পারস্পরিক শত্রুতার সেই ধারটুকু সময়ে ক্ষয়ে গেছে। আক্সিনিয়ার কাছে যাবার সময় নাতালিয়ারও তাই আশা ছিল ওকে সে তাড়িয়ে দেবে না - আর যার কথাই বলুক না বলুক, গ্রিগোরির কথা নিশ্চয়ই বলবে। ওর সেই অনুমান ভুল হয় নি।

আশ্চর্যের ভাবটা গোপন না করে আক্সিনিয়া ওকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরের ঘরে। জানলার পর্দাগুলো টেনে দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ভালো কী মনে ক'রে এখানে এলে?'

'ভালো কিছু মনে ক'রে কি আর তোমার কাছে আসি? . . .'

'তাহলে খারাপ কী আছে তা-ই বল। গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচের কিছু হয় নি ত?'

আক্সিনিয়ার প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা গভীর আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ পেল যে নাতালিয়ার কিছু বুঝতে বাকি রইল না। মাত্র একটা কথার মধ্যেই প্রকাশ পেয়ে গেল আক্সিনিয়ার সমস্ত সত্তা, ওর বাঁচার অর্থ, ওর সমস্ত আশঙ্কা। এর পর, সত্যি বলতে গেলে কি, গ্রিগোরির সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা জিজ্ঞেস করার কোন অর্থ হয় না। তবু নাতালিয়া সেখান থেকে উঠল না।

উত্তর দিতে একটু দেরি হল তার। শেষকালে বলল, 'না ভয় পাবার কিছু নেই। আমার স্বামী সুস্থ আছে, বহাল তবিয়তেই আছে।'

'ভয় আমি পাই নি। ও আবার কী কথা? ওর স্বাস্থ্য নিয়ে মাথাব্যথা - সে

ত তোমার। আমার নিজেরই ঝামেলার কমতি আছে নাকি?' আক্সিনিয়া কথা বলে বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। কিন্তু মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে টের পেয়ে চট করে এগিয়ে যায় টেবিলের দিকে, আগন্তুকের দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ায়। বাতিটা যদিও বেশ ভালোই আলো দিচ্ছিল তবু অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সলতে উস্কে দিতে থাকে।

'তোমার স্তেপানের কোন খবর আছে?'

'এই কিছু দিন আগে ভালোবাসা জানিয়েছিল।'

'ভালো আছে?'

'মনে ত হয়।' আক্সিনিয়া কাঁধ ঝাঁকায়।

এবারেও সে মনকে চোখ ঠারতে পারল না, নিজের সত্যিকারের মনোভাব চাপা দিতে পারল না। ওর উত্তরের মধ্যে স্বামীর ভাগ্যের ব্যাপারে ঔদাসীন্য এত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসে নাতালিয়া।

'তার সম্পর্কে তোমার তেমন কোন দুঃখ নেই বলে মনে হচ্ছে যেন। ... যাক গে, সে তোমার ব্যাপার। এখন আমি কী জন্যে এসেছি বলি তোমাকে: সারা গাঁয়ে গালগল্প চলছে গ্রিগোরি নাকি ফের তোমার দিকে ঝুঁকেছে, ও যখন বাড়ি আসে তখন নাকি ওর সঙ্গে দেখা হয় তোমার। কথাটা কি সত্যি?'

'জিগ্গেস করার আর লোক পেলে না!' ঠাট্টার সুরে বলল আক্সিনিয়া। 'তাহলে, আমিই তোমায় জিগ্গেস করি, তোমার কি মনে হয়, এটা সত্যি কি না?'

'সত্যি বলতে ভয় পাচ্ছ?'

'না, ভয় পাই নে।'

'তাহলে বল, যাতে আমি জানতে পারি, না জেনে কষ্ট না পাই। খামোকা নিজেকে তিলে তিলে কষ্ট দিই কেন?'

আক্সিনিয়া চোখদুটো কোঁচকায়, কালো ভুরুজোড়া নাচায়।

'ভেবো না তোমার জন্যে আমার দুঃখ হবে,' তীব্রস্বরে সে বলে। 'তোমার আমার সম্পর্কটা এই রকম: আমি কষ্ট পাই, তাতে তোমার সুখ, আবার তুমি কষ্ট পেলে আমার সুখ। ... একজন মানুষকে নিয়ে আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি যে! তবে সত্যি কথাটা বলব বৈকি, যাতে আগে থাকতে জানতে পার। যা রটেছে সব সত্যি, বাজে গালগল্প নয়। আবার গ্রিগোরিকে দখল করে নিয়েছি আমি। এবারে আর হাতছাড়া হতে দেব না কোন রকমেই। এখন তুমি কী করবে বল? আমার ঘরের জানলা ভাঙবে, নাকি আমার বুকে ছুরি বসাবে?'

নাতালিয়া উঠে দাঁড়াল। হাতের নরম ডালটা বাঁকিয়ে গিট পাকাল, চুল্লীর

দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অস্বাভাবিক দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, 'এই মুহূর্তে তোমার খারাপ কিছু আমি করতে যাচ্ছি নে। গ্রিগোরি না ফেরা অবধি অপেক্ষা করব, ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি। তারপর দেখা যাবে তোমাদের দুটিকে নিয়ে কী করা যায়। আমার দু'-দুটো বাচ্চা, ওদের জন্য আর নিজের জন্যও কী করে খাড়া হতে হয় সে আমি জানি।'

আক্সিনিয়া মুচকি হাসল।

'তার মানে এখনকার মতো আমি বেঁচে গেলাম?'

বিদ্রূপে কোন আমল না দিয়ে আক্সিনিয়ার কাছে গিয়ে তার জামার হাতাটা ছুঁল নাতালিয়া।

'আক্সিনিয়া, সারাটা জীবন তুমি আমার পথের কাঁটা হয়ে রয়েছ। সেই সেবার কেমন তোমার পায়ে ধরেছিলাম মনে আছে ত? এবারে কিন্তু আর তেমন করব না। তখন আমার বয়স কম ছিল, আরও বোকা ছিলাম আমি। ভেবেছিলাম হাতে পায়ে ধরে বোঝাব, তাহলে মন গলবে, দয়া হবে আমার ওপর, গ্রিশার ওপর দাবি ছেড়ে দেবে। এবারে তা করব না। তবে একটা জিনিস আমি জানি। ওকে তুমি ভালোবাস না, ওকে আঁকড়ে ধরে আছ স্রেফ অভ্যেসের বশে। আমি যেমন ওকে ভালোবাসি তেমন করে তুমি ওকে কখনও ভালোবেসেছ কি? না, অবিশ্যিই না। লিস্তনিৎস্কির সঙ্গে ছেনালি ক'রে বেড়িয়েছ তুমি। তুমি একটা নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ, কার সঙ্গেই বা ছেনালি ক'রে বেড়াও নি বলতে পার? কোন মেয়ে যখন কাউকে ভালোবাসে তখন সে এমন করে না।'

আক্সিনিয়া ফেকাসে হয়ে যায়। তেরিঙ্গের ওপর বসে ছিল। হাতের এক ঝটকায় নাতালিয়াকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, সেখান থেকে উঠে দাঁড়ায়।

'ও আমাকে এই নিয়ে কখনও খোঁটা দেয় নি, আর তুমি দিতে এসেছ? তোমার তাতে কী, শুনি? বেশ ত, আমি না হয় খারাপই হলাম, তুমি ভালো, কিন্তু তারপর? আর কী বলবে?'

'আর কিছু বলার নেই। রাগ কোরো না। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। ভালো বলতে হয় তোমাকে যে সত্যি কথাটা খুলে বললে।'

'ও বলার কোন মানে হয় না। আমার সাহায্যি ছাড়াই জানতে পারতে। একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমিও বেরোচ্ছি, জানলার খড়খড়ি টেনে দিতে হবে।' দেউড়িতে এসে আক্সিনিয়া থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, 'কোন ঝগড়া মারামারি না করে আমরা যে ভালোয় ভালোয় বিদায় নিচ্ছি, এতে আমি খুশি। তবে শেষকালে একটা কথা বলে রাখি গো তোমায় পড়শি ভাই, জোর ক'রে যদি পার কেড়ে নিও, আর সে ক্ষমতা যদি না থাকে তা হলে রাগ কোরো

না। আমিও নিজের ইচ্ছেয় ওকে ছেড়ে দেব না। বয়সে আমি কচি খুকীটি নই। আর তুমি আমায় নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ বলে গাল দিলেও তোমাদের দারিয়া আমি নই। ওসব ব্যাপার নিয়ে আমি জীবনে কখনও ছেলেখেলা খেলি নি। . . . তোমার ত তবু ছেলেপুলে আছে, কিন্তু আমার . . .' বলতে বলতে আক্সিনিয়ার গলা কেঁপে উঠল, কণ্ঠস্বর আরও চাপা আরও নীচু হয়ে এলো, 'এত বড় দুনিয়ায় আমার নিজের বলতে আছে শুধু ও। ওই আমার প্রথম, আমার শেষও। একটা কথা বলব? ওকে নিয়ে আর কোন কথা নয়। যদি বেঁচে থাকে – স্বর্গের দেবী ওকে মরণের হাত থেকে বাঁচান – যদি বেঁচে ফিরে আসে, তাহলে নিজেই বেছে নিক। . . .'

সে রাতে ঘুমোতে পারল না নাতালিয়া। সকালে ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে বেরিয়ে গেল তরমুজক্ষেতে নিড়ানি দিতে। কাজের মধ্যে মন অনেকটা হালকা হয়ে আসে। রোদে শুকিয়ে যাওয়া ঝুরঝুরে বেলেমাটির চাপড়ার ওপর সমান তালে কোদাল চালানোর সময় ভাবনাচিন্তার তেমন একটা অবকাশ পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে পিঠ সিধে করে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নিতে হয়, মুখ থেকে ঘাম মুছে ফেলে খানিকটা জল খেয়ে নেয়।

হাওয়ার ঝাপটায় ছিন্নভিন্ন সাদা মেঘের খণ্ডগুলো নীল আকাশের বুকে ভাসছে, ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যাচ্ছে। গনগনে মাটিকে পুড়িয়ে দিচ্ছে সূর্যের কিরণ। পুব দিক থেকে ভেসে আসছে বাদল। মাথা না তুলেই নাতালিয়া টের পায় কখন বর্ষারি কালো মেঘ এসে আড়াল ক'রে দিল সূর্যটাকে। মুহূর্তের জন্য পিঠে লাগে ঠাণ্ডার ছোঁওয়া। গরম নিঃশ্বাস ফেলছে যে গৈরিক মাটি, তার ওপর, লতায় পাতায় জড়ানো তরমুজক্ষেত আর সূর্যমুখীর লম্বা লম্বা ডাঁটাগুলোর মাথার ওপর দ্রুতবেগে এসে পড়ল ধূসর ছায়া। সে ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায় ঢালের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তরমুজক্ষেত, গরমে নিস্তেজ আর নুয়ে পড়া ঘাস, বন গোলাপ আর কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় যাদের ঝিমধরা পাতাগুলো নোংরা হয়ে আছে পাখির বিষ্ঠায়। আরও সুরেলা হয়ে বাজতে থাকে তিতিরের একটানা করুণ আর্তনাদ, আরও স্পষ্ট হয়ে কানে এসে লাগে চাতক পাখিদের মিষ্টি গান। এমনকি উষ্ণ ঘাসপাতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যে হাওয়া বয়ে চলেছে তাকেও আর ততটা গরম মনে হচ্ছে না। কিন্তু তারপরই সূর্য তেরছা ভাবে পশ্চিমগামী মেঘের চোখ ধাঁধানো সাদা ঝালরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দেয়, আবার ছাড়া পেয়ে মাটির বুকে ছড়িয়ে দেয় উদ্ভাসিত সোনালি আলোর বন্যা। অনেক অনেক দূরে কোথায় যেন, দন-পারের পাহাড়ের নীল শাখায় তখনও মেঘের সঙ্গে সঙ্গে মাটির ওপর হাতড়ে হাতড়ে ছিটে ফেলে এগিয়ে চলেছে সেই ছায়া। এদিকে তরমুজক্ষেতের ওপরে

শুরু হয়ে গেছে ঘিয়ে রঙের দুপুর রোদের দাপট। দিগন্তে মাঝে মাঝে ঝলক দিয়ে ঝিরি ঝিরি কাঁপছে তরল কুয়াশা। ধরণী আর তার লালিত ঘাসপাতা থেকে আরও তীব্র শ্বাসরোধী গন্ধ ওঠে।

দুপুরবেলার কাছে পাহাড়ের খাতের ভেতরে খোঁড়া একটা ইঁদারার ধারে গেল নাতালিয়া। সেখান থেকে কলসী ভরে ঝরনার বরফ-ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলো। ইলিনিচ্‌না সঙ্গে সেও আকণ্ঠ জল খেল। তারপর হাত ধুয়ে যেখানে রোদের বেশ তেজ সেখানেই বসে গেল দুপুরের খাবার খেতে। মাটিতে একটা চাদর বিছিয়ে ইলিনিচ্‌না নিখুঁত ভাবে টুকরো টুকরো ক'রে রুটি কেটে রাখল তার ওপর। থলি থেকে চামচ আর বাটি বার করল। জামার তলায় রোদ থেকে আড়াল ক'রে রেখে দিয়েছিল সরু-গলা একটা ছোট্ট কুঁজোতে টক দুধ - সেটা বার ক'রে রাখল।

খাওয়ায় নাতালিয়ার তেমন রুচি দেখা গেল না। শাশুড়ী জিজ্ঞেস করল, 'অনেক দিন হল লক্ষ করছি, কেমন যেন বদলে গেছ। গ্রিশ্‌কার সঙ্গে কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?'

হাওয়ায় শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটদুটো করুণ ভাবে কেঁপে উঠল নাতালিয়ার।

'ও আবার আক্সিনিয়ার সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে মা।'

'কী করে . . . কেমন ক'রে জানলে তুমি?'

'কাল আমি আক্সিনিয়ার কাছে গিয়েছিলাম।'

'তা কী বলল সেই হতচ্ছাড়ি মাগী? কবুল করল?'

'হ্যাঁ।'

ইলিনিচ্‌না চুপ করে যায়, ভাবতে থাকে। তার বলিরেখা পড়া মুখে, ঠোঁটের কোনায় কঠিন ভাঁজ পড়ে।

'আবাগীর বেটী হয়ত নেহাতই বড়াই ক'রে বলেছে?'

'না মা, কথাটা সত্যি। নইলে বলবে কেন . . .'

'ঠিক মতো নজর রাখতে পার নি তুমি গ্রিশ্‌কার ওপর . . .' বুড়ি সাবধানে বলে। 'ওরকম সোয়ামীকে চোখে চোখে রাখতে হয়।'

'কিন্তু কী ক'রে রাখব বলুন? আমি ওর বিবেকের ওপর ভরসা করেছিলাম। . . . আমার আঁচলে বেঁধে রাখব নাকি তাই বলে?' তিক্ত হাসে নাতালিয়া, তারপর প্রায় শোনাই যায় না এমন ভাবে যোগ করে, 'ও ত আর মিশাত্‌কা নয় যে ধরে রাখব। মাথার চুল অর্ধেক পেকে গেছে, কিন্তু পুরনো ব্যাপার এখনও ভোলে নি। . . .'

ইলিনিচ্‌না চামচগুলো ধুয়ে মুছল, বাটিটা ধুয়ে ফেলল। বাসনগুলো থলের

ভেতরে যখন পোরা হয়ে গেল কেবল তখনই বলল, 'এই হল গিয়ে তোমার বিপদ, ব্যস?'

'আপনি কী বলছেন মা! . . . জীবনটা বিষিয়ে ওঠার পক্ষে এটা কি কম হল?'

'এখন তুমি তাহলে কী করবে ভেবেছ?'

'আর কীই বা করতে পারি? ছেলেপুলে নিয়ে ফিরে যাব নিজের ঘরে। আর ঘর করব না ওর সঙ্গে। আক্সিনিয়াকে নিয়েই ঘর করুক ও। অনেক সয়েছি আমি, আর নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিনিচ্না বলল, 'জোয়ান বয়সে আমিও অমনিই ভাবতাম। আমারটিও কম ছিল নাকি? ছাড়া কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক করে বেড়াত। ওর কাছ থেকে যে দুঃখু আমায় পেতে হয়েছে তা বলার নয়। কিন্তু নিজের সোয়ামিকে ছেড়ে যাওয়া অত সহজ নয়। তাছাড়া এতে ভালোটাই বা কী? মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখ, নিজেই বুঝতে পারবে। আর বাপের কাছ থেকে বাচ্চাগুলোকে সরিয়ে নেওয়া - সেটাই বা কেমন? না, না ও কোন কাজের কথা নয়। ও নিয়ে আর ভাবতে যেয়ো না। আমি বলে দিলাম কিন্তু।'

'না মা, ওর সঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না। খামোকা আর কথা খরচ করবেন না।'

'খামোকা কথা খরচ করা মানে?' ইলিনিচ্না বিরক্ত হয়ে বলল। 'তুমি কি আমার পর নাকি? তোমাদের দুটো হতভাগার জন্যে আমার কি দুঃখু হয় না, বল? আমাকে, বুড়ি মা'কে তুমি বলতে পারলে অমন কথা? তোমায় কতবার বলেছি, ওসব চিন্তা ছাড় - দেখবে ব্যস, সব ঠিক হয়ে গেছে। আহা, কী কথাই ভেবেছে: 'বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।' ছেড়ে যাবে কোন্ ঠাঁই? তোমার নিজের গুষ্টির কে আছে যে তোমায় চাইবে? বাপ নেই, বাড়ি পুড়ে গেছে, তোমার মা'রই কোন চালচুলো নেই - অন্যের চালার নীচে ঠাঁই পেলে সেটাই ভগবানের অশেষ দয়া বলতে হবে। সেখানে কিনা তুমি গিয়ে সেঁধোবে, আবার সঙ্গে নিয়ে যাবার মতলব করছ আমার নাতিনাতনীদুটোকে! না, সেটি হচ্ছে না বাছা। গ্রিশ্কা আসুক, তখন দেখা যাবে কী করা যায় ওকে নিয়ে। কিন্তু এখন ও নিয়ে আর একটি কথাও নয়। বলতে দেব না, শুনতেও চাই নে আমি।'

এতদিন ধরে নাতালিয়ার বুকের ভেতরে যে ব্যথা জমে ছিল হঠাৎ তার বাঁধ ভেঙে গেল আকুলি-বিকুলি করা প্রবল কান্নায়। ডুকরে কেঁদে উঠে মাথার ওড়নাটা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। শুকনো নিষ্করুণ মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কিন্তু চোখে তার জল এলো না।

ইলিনিচ্না বুড়ি বুদ্ধিমতী, মনে বেশ সাহসও আছে তার। জায়গা থেকে

এতটুকু নড়ল না সে। বাকি দুধটুকুসুদ্ধ কুঁজোটা সযত্নে জামা দিয়ে জড়িয়ে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখল। বাটিতে জল ঢেলে নিয়ে নাতালিয়ার পাশে এসে বসল। সে জানত এমন শোকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা নেই, এও জানত যে এক্ষেত্রে শুকনো চোখ আর শক্ত করে চেপে রাখা শুকনো ঠোঁটের চেয়ে চোখের জল অনেক ভালো। নাতালিয়াকে কেঁদে হাল্‌কা হওয়ার সুযোগ দিল সে। তারপর ঘর সংসারের নিত্য কাজে রুক্ষ হয়ে যাওয়া হাতখানা পুত্রবধূর মাথায় রাখল। চিক্কণ কালো চুলের রাশিতে বিলি কাটতে কাটতে কঠিন গলায় বলল, 'হয়েছে, আর নয়! কেঁদে সবটা চোখের জল শেষ করা যায় না। পরের বারের জন্যে তোলা থাক। নাও, জলটুকু খেয়ে নাও।'

নাতালিয়া শান্ত হয়ে আসে। শুধু থেকে থেকে ওর কাঁধ ওঠা নামা করে, সারা গায়ে খেলে যায় অল্প অল্প কাঁপুনি। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ইলিনিচ্‌নাকে আর তার বাড়িয়ে ধরা জলের বাটিটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। পুবদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জলে ভেজা হাতদুটো প্রার্থনার ভঙ্গিতে জড় ক'রে কান্না ভরা গলায় তড়বড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'ভগবান! আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। এ ভাবে আর বেঁচে থাকার শক্তি নেই আমার। ওই আপদটাকে তুমি শাস্তি দাও ভগবান! ওকে মেরে ফেল! আর যেন ও না বাঁচে, আমাকে যেন আর জ্বালাতে না পারে। . . .'

পুব দিক থেকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে একটা কালো মেঘের কুণ্ডলী। চাপা গুরু গুরু মেঘের ডাক। মেঘের গোল গোল পাকানো চূড়াগুলো ভেদ করে জ্বলন্ত সাদা বিজলির রেখা কিলবিলিয়ে আছড়ে পড়ল আকাশের গায়ে। হাওয়ায় সরসর আওয়াজ তুলে পশ্চিমে হেলে পড়েছে ঘাসগুলো, সদর রাস্তা থেকে উড়ে আসছে ঝাঁঝাল ধুলো, বীজের বোঝায় ভারী সূর্যমুখী ফুলের মাথাগুলো নুয়ে পড়ছে প্রায় মাটি অবধি।

হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যায় নাতালিয়ার চুল, শুকিয়ে যায় ওর কান্নাভেজা মুখখানা, পরনের আটপৌরে ছাইরঙা চওড়া ঘাগরার কিনারাটা জড়িয়ে যায় পায়ের সঙ্গে।

কয়েক মুহূর্ত ইলিনিচ্‌না কুসংস্কার ভরা আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছেলের বৌয়ের দিকে। অর্ধেক আকাশ ছেয়ে থাকা ঝড়ের কালো মেঘের সামনে নাতালিয়াকে অচেনা ভয়ঙ্কর মনে হতে থাকে।

বৃষ্টি দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে। ঝড়ের আগের নিস্তব্ধতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। তেরছা হয়ে নীচে নামতে নামতে ব্যাকুল আর্তচিৎকার করে ওঠে একটা চিল। একটা মেঠো ইঁদুর শেষ বারের মতো শিস দিয়ে ডাকে তার গর্তের কাছে

বসে। দমকা হাওয়া বালি ভরা ধুলোর ঝাপটা দিয়ে যায় ইলিনিচ্‌নার মুখে, হু হু আওয়াজ তুলে ছুটে যায় স্তেপের মাঠের ওপর দিয়ে। বুড়ি অনেক কষ্টে পায়ে খাড়া হয়। মুখখানা তার মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গেছে। আসন্ন ঝড়ের ঘোর গর্জন ভেদ ক'রে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে সে বলে উঠল, 'সুমতি হোক তোমার! ভগবান তোমায় সুমতি ফিরিয়ে দিন! কার মরণ চাইছ গো তুমি?'

'হে ভগবান সাজা দাও ওকে! শাস্তি দাও প্রভু!' চিৎকার ক'রে বলে নাতালিয়া। ক্ষ্যাপাটে চোখ তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ঘূর্ণি হাওয়ার টানে আকাশের গায়ে বিপুল সমারোহে স্তূপাকার হয়ে থাকা মেঘরাশির দিকে, যেখানে থেকে থেকে জেগে উঠছে চোখ ধাঁধানো বিজলির চমক।

স্তেপের মাঠের ওপর কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। ভয়ে আঁতকে উঠে ইলিনিচ্‌না ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রার্থনা জানাল। কোন রকমে পা ফেলে এগিয়ে গেল নাতালিয়ার দিকে, ওর কাঁধ চেপে ধরল।

'হাঁটু গেড়ে বোসো! শুনতে পাচ্ছ নাতাশা?'

নাতালিয়া কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে শাশুড়ীর দিকে তাকায়। অসহায় ভাবে বসে পড়ে হাঁটু গেড়ে।

কর্তৃত্বের সুরে ইলিনিচ্‌না বলল, 'ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। বল, তোমার মিনতি যেন না শোনেন। কার মরণ চাইছ তুমি? তোমার ছেলেমেয়ের বাপের? ওঃ সে যে মহাপাতক! ক্রুশ কর! মাটিতে মাথা ঠেকাও বল, 'হে প্রভু আমি মহাপাতকী, আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর।''

নাতালিয়া ক্রুশ চিহ্ন এঁকে প্রণাম ঠুকল, ফেকাসে ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। ওর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। বিশ্রী ভাবে একপাশে কাত হয়ে ও পড়ে গেল।

* * *

মুষলধার বৃষ্টিতে নেয়ে উঠে স্তেপের মাঠ হয়ে উঠেছে আশ্চর্য সবুজ। দূরের দীঘি থেকে একেবারে দন অবধি ছড়িয়ে পড়েছে রামধনুর উজ্জ্বল অর্ধবৃত্ত। পশ্চিমে শোনা যায় মেঘের চাপা গুরুগুরু ডাক। বাজপাখির ডাকের মতো খাতের ভেতরে কলকল শব্দে ছুটে চলেছে পাহাড়ী ঘোলা জলের স্রোত। নীচে পাহাড়ী ঢাল বেয়ে তরমুজ ক্ষেতগুলোর ওপর দিয়ে সবেগে ছুটে চলেছে ফেনায়িত স্রোতের ধারা। সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছে বর্ষণে ছেঁড়া পাতা, মাটি থেকে ওপড়ানো শেকড়সুদ্ধ ঘাসের চাপড়া আর রাইয়ের ছেঁড়া শীষ। তরমুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে তরমুজ

আর ঝুটির জড়ানো লতাপাতা বোঝাই করে দিয়ে গড়িয়ে চলেছে উর্বর নরম পলিমাটি। গরমকালে চলার পথের ওপর দিয়ে গাড়ির চাকার গভীর দাগ ধরে উচ্ছল হয়ে ছুটছে জলের ধারা। দূরের গিরিপথের পায়ের কাছে ধিকিধিকি জ্বলছে বাজপড়া একটা খড়ের গাদা। ধোঁয়ার বেগনী স্তম্ভটা অনেক উঁচুতে উঠেছে, আকাশের গায়ে ছড়িয়ে থাকা রামধনুর মাথাটা প্রায় স্পর্শ করেছে।

ইলিনিচ্‌না আর নাতালিয়া ঘাগরা উঁচু ক'রে পিছল কর্দমাক্ত পথে খালি পা টিপে টিপে সাবধানে গাঁয়ের দিকে নামছে।

ইলিনিচ্‌না বলে, 'তোমরা ছেলেমানুষ – একটুতেই মেজাজ চড়ে যায় তোমাদের, সত্যি বলছি! ভগবানের দিব্যি! একটু কী হল না হল অমনি মাথা খারাপ। অল্পবয়সে আমার যে ভাবে জীবন কেটেছে সে রকম যদি তোমার হত তাহলে যে কী করতে। গ্রিশ্‌কা সারা জীবনে কখনও তোমার গায়ে হাত তোলে নি, তাতেও তোমার মন উঠল না। কী কাণ্ডটাই না করলে! ওকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছিলে, অজ্ঞান হয়ে মাথা ঠুকতে লাগলে – কী না করলে। এমনকি ভগবানকেও টেনে আনলে তোমাদের নোংরা ব্যাপারে। . . . আচ্ছা বল ত বাপু, এসব কি ভালো? এদিকে আমার যখন জোয়ান বয়স ছিল তখন আমার খোঁড়া পতিদেবতাটি আমাকে মারতে মারতে আধমরা ক'রে ফেলত। মারত অকারণে, অমনি-অমনি। মারার মতো কোন অপরাধই করি নি। নিজেই আজেবাজে কাজ করে আসত, আর ঝাল ঝাড়ত আমার ওপরে। হয়ত বাড়ি ফিরল রাত কাবার ক'রে দিয়ে ভোরবেলায় – আমি কেঁদেকেটে চেঁচিয়ে যা তা গালমন্দ করতে লাগলাম – অমনি সেও আমাকে ধরে ইচ্ছে মতো কিলচড়ঘুসি বসিয়ে দিল। . . . মাসখানেক ধরে সারা গায়ে কালশিটে পড়ে থাকত। কিন্তু সয়েছি ত সে সব। ছেলেপুলেগুলোকেও মানুষ করেছি। বাড়ি ছেড়ে পালানোর চিন্তা একবারও মাথায় আসে নি। গ্রিশ্‌কার গুণগান করতে আমি যাচ্ছি নে, তবে ও যেমন মানুষ তাতে ওর সঙ্গে একেবারে ঘর করা চলে না এমন নয়। ওই কালনাগিনীটা না থাকলে আমাদের গাঁয়ের সেরা কসাক হত গ্রিশ্‌কা। মাগী ওকে নির্ঘাত তুক করেছে।'

নাতালিয়া অনেকক্ষণ ধরে চলতে চলতে আপন মনে কী যেন ভাবে। বলে, 'এ নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই নে, মা। গ্রিগোরি আসুক, তখন দেখা যাবে কী করব। . . . হয়ত নিজেই চলে যাব, হয়ত বা ও-ই আমাকে তাড়িয়ে দেবে। এখনকার মতো আপনাদের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি নে।'

ইলিনিচ্‌না খুশি হয়ে বলল, 'এই কথাটা অনেকক্ষণ আগে বললেই ত পারতে! ভগবান করুন সব যেন ভালোয় ভালোয় শেষ হয়। ও তোমায় কখখনো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না। ওকথা মনেও স্থান দিও না। তোমাকে আর ছেলেপুলেদের

ও কত ভালোবাসে। অমন কথা ও চিন্তা করতে পারে? না না, সে হতে পারে না। অক্সিনিয়ার জন্যে তোমাকে ছেড়ে দেবে এ হতে পারে না। পরিবারে নিজেদের মধ্যে কত কিছুই ত হতে পারে, তাই না? এখন ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরলে হয়।...'

'ওর মরণ আমি চাই নে।...তখন রাগের মাথায় আমি বলে ফেলেছিলাম।... ওই বলে আমাকে আর খোঁটা দেবেন না।... মন থেকে ওকে কী আর ফেলে দিতে পারি? কিন্তু এ ভাবে জীবন কাটানোও যে বড় কঠিন!'

'লক্ষ্মী মেয়েটি আমার! আমি কি আর বুঝি নে? তবে ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করা ঠিক নয়। ঠিকই বলেছ, ওসব কথা আর নয়! আর তুমিও, খ্রীষ্টের দোহাই, বুড়োকে এখুনি কিছু বোলো না। এটা ওর ব্যাপার নয়।'

'আমি একটা কথা আপনাকে বলতে চাই।... গ্রিগোরির সঙ্গে থাকব কি থাকব না এখনও তার কোন ঠিক নেই, কিন্তু ওর ছেলেমেয়ে আর পেটে ধরার ইচ্ছে আমার নেই। যে দুটো আছে তাদের নিয়ে যে কী করব তা-ই জানি নে।... কিন্তু এদিকে আমি এখন পোয়াতী হয়েছি মা।...'

'ক মাস হল?'

'তিন মাস।'

'তাহলে এটাকে নিয়ে কী করবে? চাও বা না চাও পেটে যখন ধরেছ তখন বিয়োতে হবেই তোমাকে।'

'না,' নাতালিয়া দৃঢ়স্বরে বলল। 'আজই আমি বুড়ি কাপিতোনভ্‌নার কাছে যাচ্ছি। ও আমার পেট খালাস ক'রে দেবে।... আরও কাউকে কাউকে করেছে ও।'

'গর্ভ নষ্ট করা? বেহায়া নির্লজ্জ, অমন কথা মুখে আনতে পারলে কী করে?' ইলিনিচ্‌না রেগে বিরক্ত হয়ে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। অবাক হয়ে গালে হাত দেয়। আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে। এমন সময় পেছনে গাড়ির চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ আর কাদার মধ্যে ঘোড়ার খুরের ছপাত্ ছপাত্ শব্দ শোনা গেল। কে যেন 'হুট হুট' করে হাঁক পেড়ে ঘোড়া চালিয়ে আসছে।

ইলিনিচ্‌না আর নাতালিয়া চলতে চলতে উঁচু করে তোলা ঘাগরার কিনারা ছেড়ে দিয়ে রাস্তা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়। গাড়ি চালিয়ে মাঠ থেকে ফিরছিল বুড়ো ফিলিপ বেস্‌খ্লেবনভ। ওদের পাশাপাশি আসতে ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরল।

'উঠে বোসো গো মেয়েরা, ঘরে পৌঁছে দিই। খামোকা কাদা ঘাঁটতে যাবে কেন?'

'তা যা বলেছ। আছাড় খাবার ভয়ে পা টিপে টিপে চলতে গিয়ে প্রাণ জেরবার হয়ে গেল,' খুশি হয়ে ইলিনিচ্‌না বলল। সে-ই প্রথম গিয়ে উঠে বসল বড় গাড়িটার মধ্যে।

* * *

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ইলিনিচ্না ঠিক করল নাতালিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলবে, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে পেটের সন্তান নষ্ট করার কোন দরকার নেই। বাসন ধুতে ধুতে, তার মতে যেগুলো সবচেয়ে মোক্ষম যুক্তি, মনে মনে আওড়াতে লাগল সেগুলো। এমনকি এও ভাবল যে নাতালিয়ার সিদ্ধান্তের কথা বুড়োকে জানাবে। শোকে পাগল হয়ে ছেলের বৌ যে এমন বোকার মতো কাজ করতে যাচ্ছে সেটা বুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করার জন্য বুড়োর সাহায্য দরকার। কিন্তু ইলিনিচ্না যতক্ষণ ঘরের কাজকর্ম গোছাচ্ছিল সেই ফাঁকে নাতালিয়া নিঃশব্দে তৈরি হয়ে কখন বেরিয়ে পড়েছে ঘর ছেড়ে।

'নাতালিয়া কোথায়?' ইলিনিচ্না জিজ্ঞেস করল দুনিয়াশ্‌কাকে।

'একটা পুঁটলি নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।'

'কোথায়? কী বলে গেল? কিসের পুঁটলি?'

'আমি তার কী জানি মা? একটা পরিষ্কার ঘাগরা আর আরও কী সব ওড়নায় রেখে পুঁটলি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল, কিছুই বলল না।'

'হায় আমার পোড়া কপাল!' দুনিয়াশ্‌কাকে অবাক করে দিয়ে অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে ইলিনিচ্না। ধপ ক'রে বসে পড়ে বেঞ্চিতে।

'কী হল মা? ভগবান তোমার ভালো করুন, কাঁদছ কেন?'

'আঃ, আচ্ছা নাছোড়বান্দা মেয়ে ত! আমায় জ্বালাতে আসিস নে। ও তোর কাজ নয়। কী বলে গেল? জিনিসপত্র যখন গোছগাছ করতে লাগছিল তখন আমায় বললি না কেন?'

দুনিয়াশ্‌কা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমায় নিয়ে মহাবিপদ ত! কেমন করে জানব যে তোমাকে বলা দরকার? চিরকালের মতো চলে গেছে নাকি? হয়ত গেছে তার মাকে দেখতে। এতে কাঁদার কী আছে? - আমার ত মাথায় ঢুকছে না বাপু!'

দারুণ উদ্বেগ নিয়ে ইলিনিচ্না অপেক্ষা ক'রে থাকে কখন নাতালিয়া ফিরবে। বুড়ো বকাঝকা আর চোটপাট করতে পারে সেই ভয়ে তাকে আর কিছু না জানানোই ঠিক করে।

সূর্য ডুবে যেতে স্তেপের মাঠ থেকে গোরুঘোড়ার পাল ঘরে ফিরল। গ্রীষ্মকালের স্বল্পস্থায়ী ছায়া নেমে এলো। গ্রামে এখানে ওখানে একটা দুটো করে বাতি জ্বলে উঠল। কিন্তু নাতালিয়ার তখনও দেখা নেই। মেলেখভদের বাড়িতে সকলে সন্ধের খাবার খেতে বসেছে। উৎকণ্ঠায় ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল ইলিনিচ্না। সূর্যমুখীর তেলে ভাজা পেঁয়াজের সঙ্গে সেমাইয়ের ঝোল পরিবেশন করছিল সে। বুড়ো

চামচটা তুলে নিয়ে বাসী বুটির টুকরো ঝুরঝুর করে ভেঙে নিল তাতে। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে সেগুলো চালান করে দিল মুখের ভেতরে। টেবিলের ধারে যারা বসে ছিল অন্যমনস্ক ভাবে তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নাতালিয়া কোথায়? খেতে ডাকলে না যে ওকে?'

'ও বাড়ি নেই,' অর্ধস্ফুট স্বরে ইলিনিচ্না বলল।

'কোথায় গেছে?'

'হয়ত মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেছে, ওখানেই আছে।'

'ঢের হয়েছে থাকা। বাড়ির নিয়মকানুন জানার কথা এতদিনে। . . .' বিড়বিড় ক'রে বিরক্তি প্রকাশ করল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

রোজকার মতো আজও সে মহা উৎসাহে হুপহাপ ক'রে খেয়ে চলল। পাশে বসে ছিল মিশাত্কা। মাঝে মাঝে চামচটা উল্টো করে টেবিলের ওপর রেখে বুড়ো টেরিয়ে টেরিয়ে উৎসাহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, রুক্ষ স্বরে বলে, 'এদিকে একটু মাথাটা ঘোরা ত রে খোকা, তোর মুখটা মুছে দিই। তোদের মা'টা যে উচ্ছন্নে গেল। তোদের দেখার কোন লোকও নেই রে। . . .' কড়া পড়া প্রকাণ্ড কালো হাতের তেলো দিয়ে মুছে দেয় নাতির গোলাপী নরম ছোট ঠোঁটদুটো।

চুপচাপ খাওয়া সেরে সবাই আসন ছেড়ে উঠে পড়ে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হুকুম দেয়, 'বাতি নিভিয়ে দাও। তেল বেশি নেই, খামোকা খরচ করার দরকার নেই।'

'দরজায় খিল দেব?' ইলিনিচ্না জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ খিল এঁটে দাও।'

'কিন্তু নাতালিয়া যদি আসে?'

'যদি আসে ত টোকা দেবে। কে বলতে পারে, হয়ত ভোর অবধি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াবে। এ এক ভালো কায়দা ধরেছে যা হোক! তুই বুড়ি ডাইনী, অমন চুপচাপ থেকেই ত ওর মাথাটা খেয়েছিস। . . . হুঃ কী বুদ্ধি দেখ, রাত করে বেড়াতে বেরিয়েছেন! আসুক না, সকালে আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব। দারিয়ার পদ হয়েছে! . . .'

ইলিনিচ্না জামাকাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়ল। আধঘণ্টা শুয়ে থাকল, নীরবে এপাশ ওপাশ করল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সবে ভেবেছে উঠে বেরিয়ে কাপিতোনভ্নার কাছে যাবে, এমন সময় বাইরে জানলার কাছে কার যেন ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ইতস্তত পা ফেলে চলার আওয়াজ শুনতে পায়। বুড়ি তড়াক ক'রে, তার এই বয়সের পক্ষে বেশ চটপট লাফিয়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি বার বারান্দায় ছুটে আসে, সদর দরজা খুলে দেয়।

নাতালিয়ার মুখখানা মড়ার মতো ফেকাসে। সিঁড়ির রেলিং ধরে কষ্টেসৃষ্টে

ধাপ বয়ে উঠে আসছে সে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ওর চুপসে যাওয়া মুখ, কোটরে বসা চোখদুটো আর যন্ত্রণায় কোঁচকানো ভুরুজোড়া স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ভারী জখম হওয়া একটা জন্তুর মতো টলতে টলতে চলছে সে। যেখানে যেখানে তার পা পড়ছে সেখানে সেখানে ফুটে উঠছে কালচে রক্তের ছাপ।

ইলিনিচ্‌না নীরবে ওকে জড়িয়ে ধরে বারান্দায় টেনে আনল। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে নাতালিয়া বলল, 'বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে? মা, আমার পেছনের রক্তের ওই দাগগুলো মুছে দিন। ... দেখছেন কী দাগ পড়েছে রক্তের! ...'

'এ কী করলে তুমি?' কান্না চাপতে চাপতে অর্ধস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ইলিনিচ্‌না।

নাতালিয়া হাসতে চেষ্টা ক'রে, কিন্তু হাসির বদলে করুণ ভাবে বিকৃত হয়ে ওঠে ওর মুখ।

'চেঁচাবেন না। ... বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে দেবেন দেখছি। ... যাক এবারে মুক্তি পেলাম। আমার প্রাণটা জুড়াল এখন। ... কিন্তু রক্ত বড্ড বেশি পড়ছে। ... গলগল করে পড়ছে কাটা পাঁঠার মতো। ... হাতটা বাড়িয়ে দিন মা। ... আমার মাথা ঘুরছে।'

ইলিনিচ্‌না দরজায় খিল দিল। কাঁপা কাঁপা হাতে অনেকক্ষণ ধরে যেন অচেনা বাড়িতে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে থাকে। কিছুতেই খুঁজে পায় না দরজার হাতলটা। পা টিপে টিপে নাতালিয়ার হাত ধরে তাকে বড় শোবার ঘরে নিয়ে আসে। দুনিয়াশ্‌কাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। দারিয়াকে ডেকে আলো জ্বালে। রান্নাঘরের দরজাটা খোলা। সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের একটানা নাসিকাগর্জন। ছোট্ট পলিউশ্‌কা মিষ্টি করে ঠোঁটে চুমকুড়ি কেটে ঘুমের ঘোরে কী যেন বিড়বিড় করে বলল। বড় নিবিড় বাচ্চাদের ঘুম, কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটে না তাদের ঘুমের!

ইলিনিচ্‌না যখন বালিশ ফাঁপিয়ে বিছানা ঠিকঠাক করছে নাতালিয়া তখন বেঞ্চিতে বসে পড়েছে, শক্তি হারিয়ে নিস্তেজ মাথাটা রেখেছে টেবিলের ধারে। দুনিয়াশ্‌কা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইলিনিচ্‌না ধমক দিয়ে উঠল।

'সরে যা বলছি, নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার! দূর হয়ে যা এখান থেকে! এ তোর নাক গলানোর ব্যাপার নয়।'

দারিয়া ভুরু কুঁচকে একটা ভিজে ন্যাকড়া নিয়ে বারান্দায় চলে যায়। নাতালিয়া অনেক কষ্টে মাথা তুলে বলল, 'বিছানা থেকে পরিষ্কার চাদরখানা সরিয়ে নিন। ... বরং চটকাপড় বিছিয়ে দিন। ... অমনিতেই নোংরা ক'রে ফেলব সব। ...'

'চুপ করে থাক!' ইলিনিচ্‌না হুকুম দিল। 'জামাকাপড় খুলে শুয়ে পড়। খারাপ লাগছে তোমার? জল এনে দিই?'

'কষ্ট পাচ্ছি নে।... আমাকে একটা পরিষ্কার সেমিজ আর একটু জল এনে দিন।'

নাতালিয়া জোর করে উঠে দাঁড়াল। অস্থির পায়ে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। একমাত্র তখনই ইলিনিচ্‌নার নজরে পড়ল ওর ঘাগরাটা রক্তে জবজবে হয়ে গেছে, ভারী হয়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। নাতালিয়া যখন নীচু হয়ে বৃষ্টিতে ভেজা কাপড়ের মতো ঘাগরার কিনারাটা চিপল, কাপড় ছাড়তে লাগল তখন বুড়ি আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

ইলিনিচ্‌না ডুকরে উঠে বলল, 'তুমি যে একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছ গো!'

চোখ বুজে দমকে দমকে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে কাপড় ছাড়তে থাকে নাতালিয়া। ইলিনিচ্‌না ওর দিকে একবার তাকিয়ে মন স্থির করে ফেলে, রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের ঘুম ভাঙায়, বলে, 'নাতালিয়ার অসুখ করেছে।... অবস্থা খারাপ, মারা যেতে বসেছে।... এক্ষুনি ঘোড়া জুতে সদরে চলে যাও, ডাক্তার ডেকে আন।'

'কী সব আবোল তাবোল মতলব ঠাউরেছ? কী হয়েছে ওর? অসুখ করেছে? রাত ক'রে একটু কম ঘুরে বেড়ালেই পারে!...'

বুড়ি সংক্ষেপে জানিয়ে দিল কী ব্যাপার। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ক্ষিপ্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে সালোয়ারের বোতাম আঁটে। শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

'ওরে হতচ্ছাড়ি! ওরে খানকির মেয়ে! ভেবেছিস কী, অ্যাঁ? কে তোকে করতে বলেছে ও কম্ম? দাঁড়া মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি এখুনি!...'

'আরে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ডেকরা মিনসে! যাচ্ছ কোথায়?... ওখানে যেয়ো না বলছি। ওর এখন তোমার কথায় কান দেবার মতো অবস্থা নয়! মাঝখান থেকে ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে দেবে! বলছি উঠোনে চলে যাও, ঘোড়া জুতে চটপট বেরিয়ে পড়!' ইলিনিচ্‌না বুড়োকে আটকাতে গেল। কিন্তু বুড়ো তাকে গ্রাহ্য না করে শোবার ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লাথি মেরে হাঁ করে খুলে দিল দরজাটা।

'বেশ কাজ করেছিস, শয়তানের বেটি!' চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে সে গর্জন ক'রে ওঠে।

'অমন কোরো না, বাবা! ভেতরে এসো না! খ্রীষ্টের দোহাই ভেতরে এসো না!' গা থেকে কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে ফেলা জামাটা বুকের ওপর চেপে ধরে তীক্ষ্ণ গলায় নাতালিয়া চিৎকার ক'রে ওঠে।

যা নয় তাই বলে গালিগালাজ করতে করতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কোর্তা, টুপি আর ঘোড়ার সাজ খুঁজতে থাকে। এত সময় নিতে থাকে যে দুনিয়াশ্‌কা আর সহ্য করতে না পেরে হুড়মুড় করে রান্নাঘরের ভেতরে ছুটে এসে ঝাঁঝিয়ে ওঠে বাপের ওপর।

'শিগ্‌গির বেরিয়ে পড়। কী অমন হাঁটকে বেড়াচ্ছ গুয়ের পোকার মতো। বৌদি মরতে বসেছে এদিকে ঘণ্টা কাবার করে দিচ্ছে তৈরি হতে। কী মানুষ। কি আমার বাপ। যেতে যদি না চাও সে কথা বললেই ত পার। আমিই না হয় ঘোড়া জুতে নিয়ে যাই সদরে।'

'কী? তোর মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? বলি লাগাম ছিড়ল কবে তোর? এখন তোর হুকুম নিতে হবে আমায়! বাপের ওপর এমন হম্বিতম্বি! হতচ্ছাড়া মেয়ে!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হাতে ধরা কোর্তাটা নেড়ে মেয়ের ওপর একটা ঝাপটা মেরে বিড়বিড় করে বকতে বকতে উঠোনে বেরিয়ে পড়ল।

বুড়ো বেরিয়ে যাবার পর বাড়ির সকলে যেন খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দারিয়া দুমদাম করে চেয়ার বেঞ্চি সরিয়ে মেঝে মুছতে লাগল। বুড়ো চলে যাবার পর দুনিয়াশ্‌কাকে তার মা শোবার ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল। সে এখন নাতালিয়ার শিয়রে বসে মাথার বালিশ ঠিক করে দিচ্ছে, জল খেতে দিচ্ছে ওকে। পাশের ঘরে বাচ্চারা ঘুমিয়ে ছিল। ইলিনিচ্‌না মাঝে মধ্যে উঠে গিয়ে ওদের দেখে আসছে, শোবার ঘরে ফিরে এসে গালে হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে নাতালিয়াকে দেখছে, সখেদে মাথা নাড়ছে।

নাতালিয়া চুপচাপ শুয়ে আছে। বালিশের ওপর ওর মাথাটা এপাশ-ওপাশ করছে। চুলের গোছা আলুথালু, ঘামে জবজব করছে। রক্তবন্যায় ভেসে যাচ্ছে নাতালিয়া। আধ ঘণ্টা বাদে বাদে ইলিনিচ্‌না ওকে সাবধানে তুলে ধরে চাপ চাপ রক্তে ভেজা চাদর নীচ থেকে বার করে ফের পেতে দিচ্ছে পরিষ্কার চাদর।

প্রতি ঘণ্টায় নাতালিয়া ক্রমেই বেশি করে দুর্বল হয়ে পড়ছে। মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর সে চোখ খুলল, জিজ্ঞেস করল, 'ভোরের আলো হতে বেশি দেরি নেই বুঝি?'

'এখনও দেরি আছে,' বুড়ি ওকে সান্ত্বনা দেয়। মনে মনে ভাবে, 'তার মানে, বাঁচবে বলে মনে হয় না! ভয় পাচ্ছে ছেলেপুলেদের চোখের দেখা না দেখেই বুঝি চলে যেতে হবে। ...'

যেন ওর অনুমানকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যই নাতালিয়া আস্তে করে বলল, 'মা, মিশাত্‌কা আর পলিউশ্‌কাকে একটু জাগিয়ে দেবেন ...'

'কী বলছ গো মা লক্ষ্মী! মাঝরাতে ওদের ঘুম ভাঙানোর কী দরকার?

তোমার এই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যাবে, কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। . . . কেন মিছিমিছি ওদের জাগানো?'

'ওদের একবার দেখতে চাই। . . . বড্ড খারাপ লাগছে আমার।'

'ভগবান তোমার সহায় হোন! কী বলছ গো তুমি? এই ত বাবা এসে গেল বলে, সঙ্গে ডাক্তারবাবুও এসে যাবেন, তোমায় সারিয়ে তুলবেন। আহা বেচারি, তুমি বরং একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর না।'

'কিসের ঘুম আমার!' বিরক্তির আভাস ফুটে ওঠে নাতালিয়ার উত্তরে। এর পর অনেকক্ষণ সে চুপ ক'রে থাকে। নিঃশ্বাস যেন আগের চেয়ে স্বাভাবিক হ'য়ে আসে।

ইলিনিচ্‌না নিঃশব্দে দেউড়ির ধাপের কাছে বেরিয়ে আসে। তার কান্না আর বাধা মানে না। কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে লাল ক'রে যখন সে ভেতরের ঘরে ফিরে এলো ততক্ষণে ভোরের আলোর সাদা আভা দেখা দিতে শুরু করেছে। দরজার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হতে নাতালিয়া চোখ খুলে আবার জিজ্ঞেস করল, 'এখুনি কি ভোরের আলো দেখা দেবে?'

'হ্যাঁ, আলো দেখা দিতে শুরু করেছে।'

'ঝুলকোটখানা দিয়ে আমার পাদুটো ঢেকে দাও . . .'

দুনিয়াশ্‌কা ভেড়ার চামড়ার ঝুলকোটটা ওর পায়ের ওপর ছড়িয়ে দিল, গরম কম্বলটা দু'পাশে ভালো করে গুঁজে দিল। নাতালিয়ার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল। এরপর ইলিনিচ্‌নাকে কাছে ডেকে বলল, 'আমার পাশে এসে বসুন মা। আর তুমি দুনিয়াশ্‌কা, দারিয়া তুমিও, একটুক্ষণের জন্যে বাইরে যাও। আমি মা'র সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই। . . . ওরা গেছে?' চোখ না খুলেই নাতালিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, গেছে।'

'বাবা আসেন নি এখনও?'

'এই এলো বলে। তোমার কি আরও খারাপ লাগছে?'

'না, ওই একই রকম। . . . আমি যা বলতে চাই শুনুন। . . . আমি শিগ্‌গিরই মরতে যাচ্ছি, মা। . . . আমার মন তা-ই বলছে। আমার শরীর থেকে কত রক্ত বেরিয়ে গেছে . . . ওঃ কী ভয়ানক! দারিয়াকে বলুন, উনুনে যখন আঁচ দেবে তখন যেন বেশি করে জল চাপায়। . . . আপনি নিজে আমার লাশ গোসল করিয়ে দেবেন। আমি চাই না, বাইরের কেউ . . .'

'নাতালিয়া! অমন কথা বলছ কী করে বাছা! কেন বলছ মরণের কথা? ঈশ্বর করুণাময়। তার দয়ায় ঠিক সেরে উঠবে তুমি।'

দুর্বল ভঙ্গিতে হাত নেড়ে শাশুড়ীকে ইশারায় চুপ করতে বলল নাতালিয়া।

তারপর বলল, 'আমায় বাধা দেবেন না।... কথা বলতে অমনিতেই কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি বলতে চাই... আবার আমার মাথা ঘুরছে। জলের কথা আমি বলেছিলাম কি আপনাকে? আমার, আমার বেশ জোর আছে তাহলে।... কাপিতোনভ্না অনেক আগেই কাজটা সেরেছিল, সেই যখন দুপুরের খাবারের পর গিয়ে হাজির হই।... বেচারি নিজেই ঘাবড়ে গিয়েছিল।... ইশ্ অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে আমার শরীর থেকে।... এখন সকাল অবধি বেঁচে থাকতে পারলে হয়।... বেশি করে জল গরম করবেন।... যখন মরব তখন শুদ্ধ থাকতে চাই। মা গো, আপনি আমাকে ওই সবুজ ঘাগরাটা পরিয়ে দেবেন, ওই যে যেটার পাড়ে নকশা তোলা। গ্রিশা ভারী পছন্দ করত আমাকে ওটা পরতে দেখলে। আর পপ্লিনের জামাটা।... তোরঙ্গের ভেতরে, ওপরে, ডান দিকের কোণে, শালটার ঠিক নীচেই আছে।... আমি মারা যাবার পর ছেলেমেয়েদুটোকে যেন আমাদের বাড়িতে দিয়ে আসে।... মাকে ডেকে আনতে লোক পাঠালে পারতেন, এখুনি যেন এসে পড়ে।... বিদায় নিতে হবে আমাকে। তলা থেকে চাদরখানা সরিয়ে নিন। একেবারে ভিজে গেছে।...'

নাতালিয়ার পিঠের নীচে হাত দিয়ে একটু উঁচু ক'রে তুলে ধরে বিছানার চাদরটা সরিয়ে দিল ইলিনিচ্না। কোন রকমে বিছিয়ে দিল নতুন আরেকটা চাদর। নাতালিয়া শুধু ফিসফিস করে বলতে পারল, 'আমায় পাশ ফিরিয়ে... শুইয়ে দিন!' পরক্ষণেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

জানলা দিয়ে উঁকি মারছে ভোরের সুনীল আলো। বালতি ধুয়ে মেজে নিয়ে দুনিয়াশ্কা উঠোনে গেল গোরু দুইতে। ইলিনিচ্না জানলাটা হাট করে খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাজা রক্ত আর পোড়া কেরোসিনের গন্ধে ভারাক্রান্ত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল গরমকালের সকালের প্রাণজুড়ানো, তাজা কনকনে এক ঝলক ঠাণ্ডা। চেরীগাছের পাতায় পাতায় চোখের জলের মতো টলমল করছে শিশিরবিন্দু। হওয়ায় সেগুলো ঝরে পড়েছে জানলার আলিসার ওপর। শোনা যাচ্ছে পাখিদের প্রথম কাকলি, গোরুর হাম্বা ডাক আর রাখালের হাতের পাচনির সপাত সপাত আওয়াজ।

নাতালিয়ার জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলে জিভের ডগা দিয়ে রক্তহীন পাণ্ডুর শুকনো ঠোঁটদুটো চাটে, জল চায়। এখন আর বাচ্চাদের কথা বলছে না, তার নিজের মার কথাও বলছে না। সব তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে – এবং বোঝাই যাচ্ছে, চিরকালের জন্য।

ইলিনিচ্না জানলা বন্ধ করে বিছানার কাছে এগিয়ে আসে। এক রাতের মধ্যে কী ভয়ঙ্কর পালটে গেছে নাতালিয়া! আগের দিনও সে ছিল যৌবনদীপ্ত

মুকুলিত আপেল গাছের মতো – সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, সবলা। কিন্তু এখন ওর গালদুটো দেখাচ্ছে দন পারের পাহাড়ের খড়িমাটির চেয়েও সাদা। নাকটা ধারাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁটদুটো এই অল্পখানিকক্ষণ আগের উজ্জ্বল সতেজ ভাব হারিয়ে পাতলা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন অনেক কষ্টে দাঁতের দু'পাটির মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করছে। একমাত্র চোখেই রয়ে গেছে আগেকার সেই ঔজ্জ্বল্য। তবু তাদের ভাব যেন এখন অন্য রকম। নতুন, অপরিচিত ভীতিকর কী যেন একটা জেগে ওঠে নাতালিয়ার চোখে, যখন দুর্জ্ঞেয় কোন এক শক্তির আজ্ঞাবলে নীলচে পাতাজোড়া সামান্য তুলে ঘরের চারধারে চোখ বুলাতে বুলাতে মুহূর্তের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে তাকায় ইলিনিচ্‌নার দিকে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। রাত জেগে টাইফাস জ্বরের রুগী আর আহতদের চিকিৎসা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ডাক্তার। ঘুম জড়ানো চোখে আড়িমুড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামল, গাড়ির আসন থেকে পুলিন্দাটা তুলে নিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। দেউড়ির কাছে এসে তেরপল কাপড়ের বর্ষাতিটা খুলল, রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে লোমশ হাতদুটো ধুল। দুনিয়াশ্‌কা একটা জগ থেকে ওর আঁজলায় জল ঢেলে দিচ্ছিল। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বার দুয়েক চোখও টিপল। তারপর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। আগেই সবাইকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে মিনিট দশেক নাতালিয়ার শয্যার কাছে কাটাল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ও ইলিনিচ্‌না রান্নাঘরে বসে থাকে।

শোবার ঘর ছেড়ে ওরা দু'জনে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম দেখছেন?'

'খারাপ।'

'নিজের ইচ্ছেয় একাজ করেছে?'

'নিজেরই ভেবে বার করা।' সরাসরি উত্তর এড়িয়ে যায় ইলিনিচ্‌না।

'গরম জল নিয়ে আসুন, চটপট!' দরজার ফাঁক দিয়ে উস্কোখুস্কো চুলভর্তি মাথাটা বার ক'রে ডাক্তার হুকুম দিল।

জল যখন গরম হতে থাকল সেই সময় ডাক্তার রান্নাঘরে এসে ঢুকল। বুড়োর নীরব প্রশ্নের উত্তরে হতাশ ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

'দুপুর নাগাদ শেষ হয়ে যাবে। প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে। কিছুই করার নেই। গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচকে খবর দেওয়া হয়েছে?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কোন জবাব না দিয়ে তড়বড় ক'রে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বারান্দায় বেরিয়ে সেখান থেকে উঠোনে নেমে গেল। দারিয়া দেখতে

পেল বুড়ো চালাঘরের ছাঁচতলায় ফসলকাটা-কলের পেছনে গিয়ে গত বছরের জমানো খাটের স্তূপের ওপর মাথা রেখে হাউ-হাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে।

ডাক্তার আরও আধ ঘণ্টা খানেক রইল। দেউড়ির ধাপের ওপর বসে সকালের উঠন্ত সূর্যের কিরণে ঝিমুতে লাগল। সামোভারে জল ফুটে উঠতে আবার এসে ভেতরের ঘরে ঢুকল। নাতালিয়াকে ক্যাম্ফর ইঞ্জেকশন দিয়ে বেরিয়ে এসে খানিকটা দুধ চাইল। অনেক কষ্টে হাই চেপে দু'গেলাস দুধ খাবার পর সে বলল, 'এখন ফেরত দিয়ে আসুন। সদরে রুগী আর জখম হওয়া লোকজন-আমার পথ চেয়ে বসে আছে। তাছাড়া এখানে আমার করারও কিছু নেই। কোন কিছুতেই কাজ হবে না। গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচের কাজে লাগতে পারলে খুবই খুশি হতাম আমি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে কি, সে ক্ষমতা আমার নেই। আমাদের কাজ অতি সামান্য - আমরা শুধু রুগীদের সারিয়ে তুলি, কিন্তু মরা মানুষ বাঁচিয়ে তুলতে এখনও শিখি নি। আপনাদের বাড়ির বৌটির এমন হাল ক'রে ছেড়ে দিয়েছে যে যা নিয়ে লোকে বাঁচতে পারে তার কিছুই আস্ত রাখে নি। জরায়ু ছিঁড়ে ফালাফালা, এতটুকু জায়গা অবশিষ্ট নেই। দেখে মনে হয় লোহার চিমটে জাতীয় কিছু ব্যবহার করেছিল বুড়ি। আমাদের ঘোর অজ্ঞতা, একেবারেই কহতব্য নয়!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গাড়িতে খানিকটা খড় ফেলে দিল, দারিয়াকে ডেকে বলল, 'ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। দনের কাছে নামার সময় জল দিতে ভুলো না ঘুড়ীটাকে।'

ডাক্তারকে টাকা দিতে গেলে ডাক্তার দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করল সে টাকা নিতে। বুড়োকে লজ্জা দিয়ে বলল, 'অমন কথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। আপনজন হয়ে কিনা টাকা দিতে এসেছ! সরিয়ে নাও বলছি! আমায় কৃতজ্ঞতা জানানোর কী আছে? তার কোন কথাই উঠতে পারে না। তোমাদের ছেলের বৌকে যদি দাঁড় করাতে পারতাম তাহলে অবিশ্যি অন্য কথা।'

সকাল প্রায় ছয়টা নাগাদ নাতালিয়া অনেকটা ভালো বোধ করতে লাগল। হাতমুখ ধোবার জল চাইল, দুনিয়াশ্‌কা আয়না ধরতে আয়নার সামনে চুল আঁচড়াল। কেমন যেন নতুন এক আলোর ঝিলিক চোখে খেলিয়ে বাড়ির সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল, জোর করে হাসল।

'এই ত এইবার আমি সেরে উঠতে শুরু করেছি! আমি ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, এই বুঝি শেষ, আর বাঁচব না। . . . কিন্তু বাচ্চারা এতক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছে কেন? দুনিয়াশ্‌কা, দেখে এসো ত ওরা জেগেছে কিনা।'

নাতালিয়ার ছোট বোন আগ্রিপিনাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার মা লুকিনিচ্‌না।

মেয়েকে দেখে বুড়ি কেঁদে ফেলল। কিন্তু নাতালিয়া উত্তেজিত হয়ে বারবার ক'রে বলতে থাকে, 'তুমি কাঁদছ কেন গো মা? আমার অবস্থা ত ততটা খারাপ নয়। ... তোমরা আমাকে কবর দিতে এসেছ নাকি? আচ্ছা বল দেখি, অত কান্নাকাটির কী হয়েছে?'

আগ্রিপিনা অলক্ষ্যে মাকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিতে ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে লুকিনিচ্না চটপট চোখের জল মুছে ফেলল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'না না, তুই বলিস কি বাছা? চোখের জল ফেলাটা আমার একেবারেই বোকামি। তোর দিকে তাকাতেই বুকটা এমন মোচড় দিয়ে উঠল ... কত বদলে গেছিস রে তুই! ...'

মিশাত্কার গলা আর পলিউশ্কার হাসি কানে যেতে একটা হাল্কা গোলাপী আভা খেলে যায় নাতালিয়ার গালে।

'ওদের এখানে ডাক! শিগ্গির ডেকে আন এখানে!' নাতালিয়া অনুনয় করে বলল। 'জামাকাপড় না হয় পরে পরবে!'

প্রথম এসে ঢোকে পলিউশ্কা। চৌকাটের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ছোট ছোট হাতের মুঠি দিয়ে ঘুমজড়ানো চোখ রগড়াতে থাকে।

নাতালিয়া হেসে বলল, 'তোর মায়ের অসুখ করেছে রে। ... আয় রে সোনার টুকরো আমার, আমার কাছে আয়!'

বড়রা সবাই গম্ভীর হয়ে বেঞ্চিতে বসে আছে। পলিউশ্কা অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তাদের। মা'র কাছে এসে বিরক্তির সুরে বলল, 'আমায় জাগালে না কেন? ওরা সব এখানে এসেছে কেন?'

'ওরা আমায় দেখতে এসেছে। কিন্তু তোকে জাগাতে যাব কেন বল ত?'

'আমি তোমায় জল এনে দিতে পারতাম, তোমার কাছে বসতে পারতাম। ...'

'যা এবারে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে প্রার্থনা করতে বোস গে, তারপর এসে বসিস আমার কাছে।'

'কিন্তু সকালের খাবার তুমি খাবে ত?'

'জানি না। বোধহয় না।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমার খাবার এখানে এনে দেব। কেমন, মামণি?'

'ঠিক ওর বাপের মতন। তবে মনটা ওর মতন নয়, আরও নরম ...' ক্ষীণ হাসি হেসে নাতালিয়া বলল। যে ভাবে মাথাটা হেলিয়ে কম্বলখানা পায়ের ওপর টেনে নিল তাতে মনে হল বুঝি শীত করছে।

ঘন্টাখানেক বাদে নাতালিয়ার অবস্থা খারাপের দিকে গড়াল। আঙুলের ইশারায় ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে জড়িয়ে ধরল তাদের, ক্রুশ চিহ্ন এঁকে আশীর্বাদ করল, চুমু খেল। মাকে বলল ওদের ওখান থেকে বাড়িতে নিজের কাছে নিয়ে

যেতে। আগ্রিপিনার ওপর ছেলেমেয়েদের ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে লুকিনিচ্না নিজে থেকে গেল মেয়ের কাছে।

নাতালিয়া চোখ বুজে ঘোরের মধ্যে বলে, 'আমি ওকে আর দেখতে পাব না।. . .' তারপর আবার কী যেন মনে হতে ধড়মড় করে বিছানায় শরীরটা একটু উঁচু ক'রে তোলে। 'মিশাত্কাকে ফিরিয়ে আন!'

আগ্রিপিনা জলভরা চোখে ছেলেটাকে শোবার ঘরে ঠেলে দেয়। নিজে রান্নাঘরে ঢুকে আপন মনে বিড়বিড় করে বিলাপ করতে থাকে।

মেলেখভ বংশের আর সকলের মতো থমথমে রুক্ষ ভাব মিশাত্কার দৃষ্টিতে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল সে বিছানার কাছে। মায়ের মুখে যে দারুণ একটা পরিবর্তন এসেছে তাতে মা হয়ে উঠেছে যেন প্রায় অজানা, অপরিচিত এক মানুষ। নাতালিয়া ছেলেকে কাছে টেনে নিল, অনুভব করল ছোট্ট মিশাত্কার বুকের ভেতরটা ফাঁদে পড়া চড়ুই পাখির মতো বড় জোরে জোরে ধুকপুক করছে।

'আরেকটু কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়া, বাপ আমার! আরও কাছে আয়!' নাতালিয়া অনুনয় করল।

মিশাত্কার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে কী যেন বলল। তারপর ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকাল। ঠোঁটদুটো কাঁপছিল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বেশ জোর করে মুখে করুণ যন্ত্রণাকাতর হাসি ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'ভুলে যাবি না ত? বলবি ত?'

'ভুলব না।. . .' মায়ের হাতের তর্জনীটা ধরে নিজের ছোট্ট উষ্ণ মুঠিটার ভেতরে সজোরে চেপে ধরল মিশাত্কা। মুহূর্তের জন্য চেপে ধরে রেখে পরে ছেড়ে দিল। বিছানার কাছ থেকে সরে এলো সে, কেন যেন পা টিপে টিপে, দু'হাতে শরীরের ভার সামলাতে সামলাতে।. . .

নাতালিয়া দুয়ার পর্যন্ত ওকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল। পরে নীরবে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুল।

দুপুরে সে মারা গেল।

সতেরো

ফ্রন্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে দু'দিন নানা ভাবনাচিন্তা আর স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে গ্রিগোরির মন।. . . নিজের শোক আর নাতালিয়ার নিরন্তর চিন্তা মাথায় নিয়ে স্তেপের মাঠে যাতে একা থাকতে না হয় এইজন্যই সে সঙ্গে

নিয়েছিল প্রোখর জিকভকে। স্কোয়াড্রন যেখানে ছাউনি ফেলেছে সেই জায়গা ছেড়ে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রোখরের সঙ্গে শুরু করে দিল লড়াইয়ের গল্প - অস্ট্রিয়ার ফ্রন্টে বারো নম্বর রেজিমেন্টে তারা কী ভাবে একসঙ্গে কাজ করেছিল, কেমন করে রুমানিয়াতে অভিযান চালিয়েছিল, জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল - সে সবই মনে করল একে একে। কথা সে বলে চলেছে অবিরাম, ওর নিজের আর দলের বন্ধুবান্ধবদের জীবনে নানা ধরনের মজার মজার যে-সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল সেই সব মনে করে হাসতে থাকে।

গ্রিগোরির এই অস্বাভাবিক বাচালতায় অবাক হয়ে গিয়ে সহজসরল প্রকৃতির প্রোখর জিকভ প্রথম প্রথম হতভম্ব হয়ে আড়চোখে তাকায় তার দিকে। পরে যখন বুঝতে পারল যে বহুকাল আগেকার স্মৃতিকথা জুড়ে দিয়ে গ্রিগোরি আসলে গুরুভার চিন্তার বোঝা থেকে নিজের মনোযোগ সরিয়ে রাখতে চাইছে তখন সেও কথাবার্তা জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে - এমনকি এ ব্যাপারে একটু যেন অতিরিক্ত উৎসাহেরই পরিচয় দেয়। একবার চের্নিগোভ হাসপাতালে ওকে যে পড়ে থাকতে হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে চলে। সেই সময় গ্রিগোরির দিকে দৈবাৎ নজর পড়ে যেতে প্রোখর দেখতে পায় ওর রোদে পোড়া তামাটে গাল বয়ে অজস্র ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। . . . বিনয় ক'রে কয়েক গজ পিছিয়ে রইল সে। আধ ঘণ্টাখানেক পিছন পিছন চলল। শেষে আবার পাশাপাশি এসে অর্থহীন আজেবাজে কতকগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ জুড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু গ্রিগোরি আর কথাবার্তায় যোগ দিল না। এই ভাবে দুপুর অবধি ওরা দু'জন চুপচাপ পাশাপাশি রেকাবে রেকাব ঠেকিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল।

গ্রিগোরি মরিয়া হয়ে ঘোড়া ছুটাচ্ছিল। গরম সত্ত্বেও ও কখনও বড় বড় কদমে কখনও বা বেশ জোর কদমে ঘোড়া হাঁকায়। শুধু মাঝে মাঝে চলার বেগ কমিয়ে হাঁটার মতো ক'রে আনে। থামে সে সেই বেলা দুপুরে, যখন সূর্যের খাড়া কিরণ অসহ্য জ্বালুনি ধরিয়ে দিতে শুরু করেছে। গ্রিগোরি একটা গিরিখাতের মধ্যে ঘোড়া থামিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে, জিন খুলে দিয়ে তাকে চরতে ছেড়ে দেয়। নিজে একটা ছায়ামতো জায়গা দেখে উপুড় হয়ে সেখানে শুয়ে পড়ে। এই ভাবে শুয়ে থাকে, যতক্ষণ না গরম পড়ে আসে। একবার ওরা ঘোড়াগুলোকে জই খেতে দিয়েছিল, কিন্তু ওদের খাওয়াবার সময়ের কোন ধার ধারছিল না গ্রিগোরি। এমনকি ওদের যে ঘোড়াগুলো দীর্ঘ পথ চলায় অভ্যস্ত ছিল প্রথম দিনের শেষেই তারা ভীষণ রোগা হয়ে গেল। গোড়ার দিকে ওদের যে অক্লান্ত ক্ষিপ্রগতি ছিল এখন আর তা রইল না। প্রোখর বিরক্ত হয়ে ভাবে, 'এ ভাবে বোকার মতো চালালে ঘোড়াগুলো ত মারা পড়বে দেখছি! এমন করে

ঘোড়া চালাতে আছে? ওর আর কী? নিজের ঘোড়াটাকে খাটিয়ে মেরে ফেললে যে কোন সময় আবার আর একটা ঠিক যোগাড় করে নেবে। কিন্তু আমি? আমি কোথায় পাব? হারামজাদাটা হয়রান করে মেরে ফেলবে ঘোড়াগুলোকে। পরে তাতারস্কি পর্যন্ত এতটা পথ আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে, নয়ত বেতে হবে অন্য কারও গাড়িতে বা ঘোড়ায় চেপে।'

পর দিন সকালে ফেদসেয়েভস্কায়া জেলার একটা গ্রামের কাছে আসার পর ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। শেষকালে গ্রিগোরিকে বলে ফেলল, 'তুমি কোন দিন ঘর-গেরস্থালি করেছ বলে ত মনে হয় না।... নইলে এতটুকু জিরোতে না দিয়ে কেউ এমন ভাবে দিন-রাত ঘোড়া হাঁকায়? ঘোড়াগুলোর কী হাল হয়েছে একবার চেয়ে দেখ। এসো অন্তত সাঁঝের বেলায় ওদের একটু ভালো ক'রে দানাপানি দেওয়া যাক।'

গ্রিগোরি অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'এগিয়ে চল! পেছনে পড়ে থাকা চলবে না!'

'আমি তোমার সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না। আমারটা শেষ হতে চলেছে। একটু জিরিয়ে নিলে হয় না?'

গ্রিগোরি কোন জবাব দিল না। আধ ঘণ্টা মতো ওরা একটিও বাক্যবিনিময় না ক'রে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলতে থাকে। শেষকালে প্রোখর দৃঢ় ভাবে জানিয়ে দিল, 'এসো ওদের অন্তত একটু দম নিতে দেওয়া যাক! এ ভাবে আমি আর এগোচ্ছি না! শুনতে পাচ্ছ?'

'ঠেলে নিয়ে যাও, ঠেলে নিয়ে যাও!'

'কিন্তু আর কতদূর ঠেলব? যতক্ষণ না পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে?'

'কোন কথা নয়!'

'একটু দয়া কর গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! আমার ঘোড়াটাকে আমি খোয়াতে চাই নে। কিন্তু ব্যাপারটা সেদিকেই গড়াচ্ছে।...'

'ধুত্তোর! থাম তাহলে। যেখানে ভালোমতো ঘাস আছে এমন একটা জায়গা খুঁজে বার কর।'

* * *

গ্রিগোরির খোঁজে খোপিওর প্রদেশের জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে টেলিগ্রাম যখন ওর কাছে পৌঁছুল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।... নাতালিয়ার কবর হয়ে যাওয়ার তিন দিন পরে বাড়ি এসে পৌঁছুল গ্রিগোরি। বাড়ির গেটের সামনে সে ঘোড়া থেকে নামল। দুনিয়াশ্‌কা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভেতর

থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। গ্রিগোরি পা চালাতে চালাতেই ওকে জড়িয়ে ধরে ভুরু কুঁচকে বলল, 'ঘোড়াটাকে একটু ভালো ক'রে হাঁটিয়ে আন ত। ... আরে অমন হাউহাউ করে কাঁদিস নে!' তারপর প্রোখরের দিকে ফিরে বলল, 'বাড়ি চলে যাও। দরকার হলেই ডেকে পাঠাব।'

মিশাত্‌কা আর পলিউশ্‌কার হাত ধরে ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেউড়ির কাছে বেরিয়ে এসেছিল ইলিনিচ্‌না।

ছেলেমেয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় গ্রিগোরি বলল, 'কাঁদিস নে! চোখের জল নয়! ওরে আমার সোনারা! তোদের ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল? ওরে, থাম থাম। ... আমাদের পথে বসিয়ে দিয়ে গেল রে তোদের মা! ...'

এদিকে নিজে অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল, বাপের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল।

'রাখতে পারলাম না রে ...' বলেই পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খোঁড়াতে খোঁড়াতে বার-বারান্দায় চলে গেল।

ইলিনিচ্‌না ছেলেকে ভেতরের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে নাতালিয়ার কথা বলে। সবটুকু বলার ইচ্ছে বুড়ির ছিল না। কিন্তু গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে, 'বাচ্চা না বিয়ানোর চিন্তাটা মাথায় এলো কেন? তুমি কি কিছু জান?'

'জানি।'

'কী ব্যাপার?'

'এর আগে ও গিয়েছিল তোর ... তোর ওই ওর কাছে। ... আক্সিনিয়া ওকে সব বলেছিল। ...'

'আচ্ছা, এই ব্যাপার!' গ্রিগোরির মুখ গাঢ় লাল হয়ে ওঠে। চোখ নামিয়ে নেয় সে।

ভেতরের ঘর থেকে সে যখন বেরিয়ে এলো তখন যেন আগের চেয়ে বুড়ো আর ফেকাসে হয়ে গেছে। নীলচে ঠোঁটদুটো নিঃশব্দে থর থর ক'রে কাঁপছে। টেবিলের ধারে বসে পড়ে ছেলেমেয়েদের কোলে বসিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে আদর করতে থাকে। তারপর থলের ভেতর থেকে ধুলোবালিমাখা ছাইরঙা একটুকরো মিছরি বার করে হাতের তেলোর ওপর রেখে ছুরি দিয়ে ভেঙে মুখ কাচুমাচু ক'রে হেসে বলে, 'তোদের জন্যে এছাড়া আর কিছুই আনতে পারি নি রে। ... বুঝতেই পারছিস কেমন তোদের বাপ। ... আচ্ছা, এবারে একছুটে উঠোনে চলে গিয়ে দাদুকে ডেকে আন দেখি।'

'কবর দেখতে যাবি ত?' ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করল।

'সে পরে হবে 'খন এক সময়। ... যে মারা গেছে তার ত আর মনে

করার কোন উপায় নেই।... মিশাত্‌কা আর পলিউশ্‌কা ঠিক ছিল ত? ঠিক আছে এখন?'

'প্রথম দিন বেজায় কেঁদেছিল, পলিউশ্‌কাই অবিশ্যি বেশি।... এখন ওরা যেন নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে নিয়েছে, আমাদের সামনে আর ওর কথা বলে না। কিন্তু কাল রাতেই শুনেছিলাম মিশাত্‌কার চাপা কান্না - বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে যাতে কেউ শুনতে না পায়। আমি কাছে গিয়ে শুধোলাম, 'কী হল রে সোনা আমার? আমার কাছে শুবি?' ও বলল, 'না ঠাম্মা, ও কিছু নয়। আমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠেছিলাম।' ওদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বল, ওদের একটু আদর কর।... কাল সকালে, শুনতে পেলাম, বারান্দায় ওরা দুটিতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। পলিউশ্‌কা বলছে, 'মা আমাদের কাছে আবার ফিরে আসবে। মা'র বয়স ত কম। যাদের বয়স কম তারা মোটেই মরে না।' অবুঝ শিশু, কিন্তু তাহলেও ওদের বুকেও বাজে, বড়দের মতোই ব্যথা বাজে।... তোর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে? দাঁড়া, এখনই কিছু খাবারদাবারের যোগাড় করি। কী হল, চুপ ক'রে রইলি কেন?'

গ্রিগোরি ভেতরের ঘরে ঢুকল। এই যেন প্রথম এসে পড়েছে এখানে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চারধারের দেয়ালগুলো দেখতে দেখতে ওর নজর এসে ঠেকে পরিপাটি বিছানা আর সেখানে থাবড়া দিয়ে ফুলিয়ে রাখা বালিশগুলোর ওপর। এই বিছানাতেই মারা গেছে নাতালিয়া, এখানে শুয়ে শুয়েই সে উচ্চারণ করেছিল তার শেষ কথাগুলো।... গ্রিগোরি মনে মনে কল্পনা করতে লাগল বিদায় নেওয়ার সময় নাতালিয়া বাচ্চাদুটোকে চুমু খাচ্ছে, হয়ত বা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে আশীর্বাদও করেছিল ওদের। আবার সে বুকের ভেতরে অনুভব করে একটা তীক্ষ্ণ হুল ফুটানো বেদনা, কানের ভেতরে চাপা ভোঁ ভোঁ আওয়াজ - যেমনটা হয়েছিল টেলিগ্রামে নাতালিয়ার মৃত্যুসংবাদ পড়ে।

ঘরের প্রত্যেকটা ছোটখাটো জিনিস মনে করিয়ে দিচ্ছে নাতালিয়াকে। ওর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলার নয়, বড় যন্ত্রণাদায়ক। গ্রিগোরি কেন যেন একে একে সবগুলো ঘর ঘুরে ঘুরে দেখে। তারপর তাড়াতাড়ি করে প্রায় ছুটে চলে যায় বাইরে সিঁড়ির দিকে। বুকের ভেতরের সেই ব্যথাটা যেন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কপালে জমে উঠেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। ভয় পেয়ে বুকের বাঁ দিকটা হাতে চেপে ধরে সে ধাপ বয়ে নীচে নেমে আসে, মনে মনে ভাবে, 'ওঃ আমায় যে একেবারে হয়রান করে ছাড়ল!'

দুনিয়াশ্‌কা ঘোড়াটাকে উঠোনে হাঁটাচ্ছিল। গোলাঘরের কাছে এসে ঘোড়া আর মুখের লাগাম মানতে চায় না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, মাটি শুঁকতে থাকে।

গলাটা লম্বা ক'রে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ওপরের ঠোঁট টেনে তুলে হলদে দাঁতের পাটি বার করে। তারপর নাক ঝেড়ে সামনের পাদুটো বাঁকাতে থাকে আনাড়ির মতো। দুনিয়াশ্‌কা ওর মুখের লাগাম টেনে ধরে। কিন্তু ঘোড়া তাতে বাগ মানে না। মাটিতে শুয়ে পড়ার যোগাড় করে।

'শুয়ে পড়তে দিস নে!' আস্তাবল থেকে চেঁচিয়ে ওঠে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। 'দেখতে পাচ্ছিস না ওর পিঠে জিন চাপানো আছে? জিনটা খুললি না কেন? হাঁদা মেয়ে কোথাকার!'

বুকের ভেতরে যে তোলপাড় কাণ্ড হচ্ছে তখনও তা শুনতে শুনতে ধীরেসুস্থে গ্রিগোরি এগিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে। জিনটা পিঠ থেকে খুলে নিয়ে দুনিয়াশ্‌কার দিকে চেয়ে সাধ্যাতীত শক্তিতে কাষ্ঠ হাসি হাসল।

'বাবা গোলমাল শুরু করেছে বুঝি?'

'সেই আগের মতোই,' মুচকি হেসে জবাব দেয় দুনিয়াশ্‌কা।

'আর একটুখানি হাঁটা লক্ষ্মী বোনটি।'

'এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে গায়ের ঘাম। আচ্ছা ঠিক আছে আরও একটুখানি হাঁটাই।'

'ওকে একটু গড়িয়ে নিতে দে, বাধা দিস নে।'

'আচ্ছা দাদা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

'নয়ত কী? তুই কী ভাবলি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রিগোরি বলে।

ভাইয়ের প্রতি সমবেদনায় বিচলিত হয়ে ওর কাঁধে চুমু খায় দুনিয়াশ্‌কা। তারপর কী কারণে যে চোখে জল এসে যেতে বিব্রত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, ঘোড়াটাকে গোয়ালঘরের উঠোনের দিকে নিয়ে যায়।

গ্রিগোরি বাপের কাছে যায়। বাপ তখন আস্তাবল থেকে ঘোড়ার নাদ চেঁছে পরিষ্কার করছে।

'তোর বাহনটার থাকার জায়গা পুছিয়ে দিচ্ছি।'

'বললেই ত পারতে। আমি নিজে সাফ করে নিতে পারতাম।'

'কী যে বলিস! আমি কি একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছি? আমি হলেম গিয়ে সেকেলে গাদা বন্দুকের মতো। কিছুতেই কোন ক্ষয় হবার নয় আমার! আরও খানিকটা লাফ ঝাঁপ করার ইচ্ছে আছে। কাল ভাবছি রাই কাটতে যাব। তুই কত দিন থাকবি বলে এসেছিস?'

'এক মাস।'

'বাঃ, তাহলে ত ভালোই হল! মাঠে যাবি ত? কাজের মধ্যে থাকলে মনটা অনেকখানি হালকা থাকবে। . . .'

'আমি নিজেও তা-ই ভাবছিলাম।'

হাতের বিদেকাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে- দিয়ে জামার হাতায় মুখের ঘাম মুছে আন্তরিক সুরে বুড়ো বলল, 'চল, বাড়ির ভেতরে যাই, একটু কিছু খাওয়া যাক। যা-ই বলিস না কেন, এর হাত থেকে, এই শোকের হাত থেকে মুক্তি কোথাও নেই। পালাবার উপায় নেই, মরেও বাঁচন্ নেই। এই হল দুনিয়ার নিয়ম। . . .'

খাবার বেড়ে ইলিনিচ্না যখন একটা পরিষ্কার তোয়ালে এগিয়ে দেয় ওকে গ্রিগোরি আবার মনে মনে ভাবে, 'আমাদের পরিবেশন করত নাতালিয়া . . .' মনের উত্তেজনা লুকানোর জন্য সে চটপট খেতে শুরু করে দিল। বাপ ভাঁড়ার থেকে একগোছা খড় দিয়ে মুখে ছিপি আঁটা একটা কুঁজোয় করে ঘরে চোলাই ভোদকা নিয়ে আসতে গ্রিগোরি কৃতজ্ঞতাভরে তাকায় তার দিকে।

'যে আর আমাদের মধ্যে নেই তার আত্মার শান্তি হোক,' জোর দিয়ে বলল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

একেক গেলাস করে ওরা খেল। বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে আবার দুটো গ্লাস ভরে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এক বছরের মধ্যে আমাদের পরিবারের দু'-দু'জন চলে গেল। . . . যমের নজর পড়েছে আমাদের বাড়ির ওপর।'

'এসব কথা আর নয়, বাবা!' গ্রিগোরি অনুনয় করে বলে।

এক নিঃশ্বাসে দ্বিতীয় গ্লাস শেষ ক'রে অনেকক্ষণ ধরে এক টুকরো শুকনো মাছ চিবোয় গ্রিগোরি, অপেক্ষা করতে থাকে কখন নেশাটা মাথায় চড়ে ওর একরোখা চিন্তাটাকে চাপা দেয়।

'এ বছরে রাইয়ের ফলন হয়েছে ভালো। আমাদের ফসল সকলের সেরা!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বড়াই ক'রে বলল। কিন্তু বাপের এই অহঙ্কারের মধ্যে, তার গলার এই স্বরের মধ্যে গ্রিগোরির বুঝতে বাকি থাকে না একটা চেষ্টাকৃত কৃত্রিমতা।

'আর গম?'

'গম? হিম লেগে একটু নষ্ট হয়েছিল বটে, তবে একেবারে মন্দ বলা যায় না - পনেরো-বিশ মণ হবে। ওরা গার্লোভ্কা গম বুনেছে তাদের ফলন যা দারুণ হয়েছে! কিন্তু আমাদের কপাল এমনই মন্দ যে ও গম আমরা বুনি নি। তবে আমার তাতে তেমন আফশোসও নেই। চারদিকে এমন ধ্বংসকাণ্ড, তার মধ্যে ও ফসল দিয়ে আমি কী করব? পারামোনোভের গোলায় নিয়ে যেতে পারব না, নিজেদের গোলায়ও ধরে রাখতে পারব না। ফ্রন্ট এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কমরেডরা সব চেঁছেমুছে নিয়ে চলে যাবে, কুটোটিও বাদ দেবে না। কিন্তু তুই চিন্তা করিস নে, ওই ফসল ছাড়াও আমাদের যা আছে তাতে দু'বছর দিব্যি কুলিয়ে যাবে। ভগবানের কৃপায়, আমাদের গোলাঘরগুলো ঠাসা। তাছাড়া এখানে

ওখানেও কিছু আছে. . .' বুড়ো ধূর্তের মতো চোখ টিপে বলল, 'দারিয়াকে জিজ্ঞেস করেই দ্যাখ, দুর্দিনের কথা ভেবে আমরা কতটা পুঁতে রেখেছি মাটির তলায়। গর্তটা তোর মাথা সমান হবে, আর দু'হাত ছড়ালে যতটা হবে তার দেড়গুণ চওড়া – সবটা চুড়োচুড়ি ভরতি! যে বিশ্রী দিনকাল পড়েছে তাইতে আমরা একটু গরিব হয়ে পড়েছি এই যা। নইলে আমরাও ভালো গেরস্থ ছিলাম। . . .' নিজের রসিকতায় বুড়ো নিজেই মাতালের মতো হেসে উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার-নিজের মর্যাদা বজায় রেখে হাত বুলিয়ে দাড়িগাছা পাট করল। কাজের লোকের ভঙ্গিতে ভারিক্কি গলায় বলল, 'তুই হয়ত তোর শাশুড়ির কথা ভাবছিস। তাহলে তোকে বলি, তাকেও আমরা ভুলি নি। ওদের দরকারের সময় যতদূর পারি সাহায্য করেছি। ওর মুখের কথা পড়তে না পড়তে পরদিনই আমি একগাড়ি বোঝাই করে দানা পাঠিয়ে দিয়েছি – ওজন ক'রেও দেখি নি। আমাদের নাতালিয়া, ভগবান ওর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন, এতে দারুণ খুশি হয়েছিল, একথা জানতে পেরে কেঁদেই ফেলেছিল। . . . আয় খোকা, আরও এক গেলাস ক'রে খাওয়া যাক। এখন আমার আনন্দ বলতে রয়ে গেলি একমাত্র তুই!'

'আচ্ছা ঢাল,' গ্রিগোরি রাজী হয়ে গ্লাসটা বাড়িয়ে দেয়।

এমন সময় মিশাত্‌কা কাত হয়ে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলো টেবিলের দিকে। বাপের হাঁটু বয়ে উঠে কোলে চেপে বসে বাঁ হাতখানা দিয়ে আনাড়ির মতো তার গলা জড়িয়ে ধরে জোরে ঠোঁটে চুমু গেল।

'এটা কিসের জন্যে রে খোকা?' শিশুর ছলছল চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তে বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করে গ্রিগোরি। নিঃশ্বাস চেপে থাকে যাতে চোলাই মদের গন্ধ ছেলের মুখে এসে না লাগে।

মিশাত্‌কা মৃদুস্বরে বলল, 'মা যখন অসুখ হয়ে শোবার ঘরে শুয়ে ছিল. . . তখনও বেঁচে ছিল. . . আমায় ডেকে তোমাকে এই কথাগুলো বলতে বলেছিল: 'বাবা এলে আমার হয়ে ওকে চুমু দিস, বলিস যেন তোদের ভালোমতো যত্ন করে। . . .' আরও কী যেন সব বলেছিল, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। . . .'

গেলাস নামিয়ে রেখে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল গ্রিগোরি। ঘরের মধ্যে নেমে এলো অস্বস্তিকর দীর্ঘ নীরবতা।

'নে ধর, খাবি ত?' নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'না, আমার আর দরকার নেই।' গ্রিগোরি ছেলেকে হাঁটু থেকে নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় বার-বারান্দার দিকে।

'একটু দাঁড়া খোকা, মাংস পড়ে রইল যে। সেদ্ধ মুরগী আছে, সরা পিঠে আছে!' উনুনের দিকে ছুটে যায় ইলিনিচ্‌না। কিন্তু গ্রিগোরি ততক্ষণে

সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে উঠোনে ঘুরে ঘুরে গোরুর খাটাল আর ঘোড়ার আস্তাবলটা ভালো করে দেখল গ্রিগোরি। ঘোড়াটার দিকে তাকাতে মনে মনে ভাবল, চান করানো দরকার ওটাকে। গিয়ে দাঁড়াল চালাঘরের ছাঁচতলায়। মাঠের ফসল কাটার জন্য যে কলটা ঠিক ক'রে রাখা হয়েছিল তার পাশে দেখতে পেল পাইন কাঠের কিছু কুচি, চিলতে আর এক টুকরো তক্তা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। গ্রিগোরি বুঝতে পারল বাপ নাতালিয়ার জন্য কফিন তৈরি করেছিল এখানে। তাড়াতাড়ি বাড়ির দেউড়ির দিকে পা বাড়াল।

ছেলের পীড়াপীড়িতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে অগত্যা তড়িঘড়ি মাঠে যাওয়ার আয়োজন করতে হল। ফসলকাটার কল ঘোড়ায় জুড়ে, সঙ্গে ছোট এক পিপে জল নিয়ে বাপ ব্যাটায় সে রাত্রেই রওনা দিল মাঠের দিকে।

আঠারো

নাতালিয়াকে গ্রিগোরি নিজের ধরনে ভালোবাসত বলে কিংবা ছয় বছর একসঙ্গে ঘর ক'রে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলেই হোক গ্রিগোরি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল। তবে নাতালিয়ার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী মনে হওয়াও তার কষ্টের আরও একটি কারণ। নাতালিয়া যদি বেঁচে থাকতে তার শাসানিকে কাজে পরিণত করত – ছেলেপুলেদের নিয়ে সত্যি সত্যিই মা'র কাছে চলে যেত, যদি সে অবিশ্বস্ত স্বামীর সঙ্গে কোন রফা না করে তার প্রতি প্রবল ঘৃণা নিয়ে ওখানেই মারা যেত, তাহলে সম্ভবত এই ক্ষতির বোঝা গ্রিগোরির এতটা দুর্বিষহ মনে হত না, হয়ত অনুশোচনায় তার মন এমন তিলে তিলে দগ্ধাত না। কিন্তু ইলিনিচ্‌নার কথা থেকে সে জানতে পেরেছে যে নাতালিয়া ওর সব দোষ ক্ষমা করে গেছে, ওকে ভালোবেসেছে, ওর কথা মনে করেছে শেষ মুহূর্ত অবধি। এতে গ্রিগোরির কষ্ট আরও বেড়ে গেল, অবিরাম তিরস্কারে পীড়িত হতে লাগল তার বিবেক। অতীতকে নতুন ক'রে দেখতে এবং সেখানে নিজের আচরণকে বিচার করতে হল তাকে। . . .

এমন এক সময় গেছে যখন গ্রিগোরি তার স্ত্রীর প্রতি নিস্পৃহ উদাসীনতা ছাড়া, এমনকি বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারত না। কিন্তু গত কয়েক বছর হল সে ওকে অন্য ভাবে দেখতে থাকে। নাতালিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওর আচরণের এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ ছেলেপুলেরা।

গত কয়েক বছর হল ওদের প্রতি যে প্রবল পিতৃস্নেহ তার জেগে উঠেছে শুরুতে তা ছিল না। আগে যখন অল্প দিনের মেয়াদে বাড়ি ফিরত তখন সে ওদের আদর করত, যত্ন করত অনেকটা যেন কর্তব্যের খাতিরে, যেন ওদের মা'র মনে আনন্দ দেওয়া হবে বলে। এদিকে নিজে কিন্তু এর কোন চাহিদা ত অনুভব করতই না, বরং নাতালিয়াকে, তার মাতৃস্নেহের উদ্দাম প্রকাশকে একটা বিস্ময় ভরা অবিশ্বাস নিয়ে লক্ষ না ক'রে পারত না। চিৎকার চেঁচামেচিতে ওস্তাদ এই ক্ষুদে প্রাণীগুলোকে কেউ যে এমন আত্মভোলা হয়ে ভালোবাসতে পারে এটা সে বুঝে উঠতে পারত না। নাতালিয়া তখনও বুকের দুধ খাওয়াত বাচ্চাদের। সেই সময় কতবারই না বিরক্ত হয়ে বিদ্রূপ ক'রে গ্রিগোরি তাকে বলেছে: 'অমন পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে পড় কেন বল ত? বাচ্চা চেঁচাল কি চেঁচাল না অমনি তুমি দু'পায়ে খাড়া। রাগে ফুল্লুক, একটু না হয় কাঁদাকাটি করলই, চোখের জলে ত আর সোনা ঝরে পড়ছে না বাপু!' ছেলেমেয়েরাও ওর প্রতি কম উদাসীন ছিল না। কিন্তু ওরা যত বড় হতে লাগল বাপের ওপর ওদের টানও তত বাড়তে লাগল। বাচ্চাদের ভালোবাসা গ্রিগোরির মনকেও নাড়া দেয়, সেই অনুভূতি আবার আগুনের ফুলকির মতো নাতালিয়ার ওপরও এসে পড়ে।

আক্সিনিয়ার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর গ্রিগোরি কখনও স্ত্রীকে ছাড়ার কথা তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবে নি। এমন কি আক্সিনিয়ার সঙ্গে আবার মিল হওয়ার পরেও আক্সিনিয়া যে কখনও তার সন্তানদের মায়ের স্থান নিতে পারে এমন চিন্তা কখনই তার মনে উদয় হয় নি। ওদের দু'জনের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে নিজের মতো করে ভালোবেসে দু'জনের সঙ্গেই যদি বাস করা যেত তাতে ওর আপত্তি ছিল না। কিন্তু এখন স্ত্রীকে হারিয়ে হঠাৎ যেন অনুভব করল আক্সিনিয়ার সঙ্গে একটা দূরত্ব আর তার বিরুদ্ধে চাপা বিক্ষোভ, যেহেতু সে ওদের সম্পর্কের কথা ফাঁস ক'রে দিয়ে নাতালিয়াকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে।

মাঠের কাজে গিয়ে নিজের শোকের কথা ভুলে থাকবে বলে ভেবেছিল গ্রিগোরি – সে চেষ্টা যতই করুক না কেন, ওই চিন্তাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফসলকাটা কল ছেড়ে নামে না। খেটে খেটে নিজেকে হয়রান ক'রে ফেলে, তবু নাতালিয়ার চিন্তা ওর মন থেকে যায় না। ওর স্মৃতিতে জেগে ওঠে, জোর ক'রে এসে অধিষ্ঠান করে ওদের দু'জনার যৌথ জীবনের, বহুকাল আগেকার নানা ঘটনা – অনেক সময় নেহাৎই তুচ্ছ ঘটনা আর আলাপের কথা। আত্মাবহ স্মৃতির বাঁধনটা একবার খুলে দিলেই হল, অমনি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে নাতালিয়ার জীবন্ত হাসিমুখ। মনে পড়ে যায় ওর মূর্তি, ওর চলন, হাত দিয়ে চুল ঠিক করার কায়দা, ওর হাসি, গলার আওয়াজের বিশেষ ভঙ্গিটুকু। . . .

তিন দিনের দিন ওরা যবের ফসল কাটতে শুরু করল। বেলা যখন ভর দুপুর, যখন পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘোড়াগুলোকে থামিয়েছে তখন গ্রিগোরি ফসলকাটা কলের পেছনের আসন ছেড়ে নেমে আসে, খাটো বিদেকাঠিটা কলের পাটাতনের ওপর রেখে দিয়ে বলে, 'ঘণ্টাখানেকের জন্যে বাড়ি যেতে চাই বাবা।'

'কেন?'

'বাচ্চাগুলোর জন্যে মন যেন কেমন করছে। ...'

বুড়ো সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে বলল, 'তা যা না। আমরা এর মধ্যে বেশ কিছু তুলে ডাঁই করে রাখব।'

গ্রিগোরি তৎক্ষণাৎ কল থেকে নিজের ঘোড়াটা খুলে নিয়ে তাতে চেপে বসল, খোঁচা খোঁচা হলুদ নাড়ার ওপর দিয়ে কদমচালে ঘোড়া চালিয়ে চলল সদর রাস্তার দিকে। 'বলিস যেন তোদের ভালোমতো যত্ন করে! ...' ওর কানে বাজতে থাকে নাতালিয়ার গলার আওয়াজ। চোখ বন্ধ করে, হাতের লাগাম ছেড়ে দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যায় গ্রিগোরি, পথঘাটের বালাই না রেখে ইচ্ছেমতো যেতে দেয় ঘোড়াটাকে।

গাঢ় নীল আকাশের বুকে এখানে ওখানে প্রায় নিশ্চল হয়ে ভাসছে হাওয়ায় ছড়ানো ইতস্তত মেঘখণ্ড। নাড়াগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে দাঁড়কাকের দল। ওরা দল বেঁধে ফসলের গাদার ওপর এসে বসছে। যে-সমস্ত বাচ্চা কাকের সদ্য পালক গজিয়েছে, যারা এখনও ঠিকমতো ডানায় ভর দিয়ে উড়তে ভরসা পাচ্ছে না, ধাড়িরা ঠোঁটে করে খাবার এনে তাদের মুখে তুলে দিচ্ছে। বিরাট ফসল কাটা মাঠটা ওদের কা-কা রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

গ্রিগোরির ঘোড়াটা পথের ধার দিয়ে চলার চেষ্টা করছে। চলতে চলতে মাঝে মধ্যে কলমিশাক ছিঁড়ে মুখে পুরে চিবুচ্ছে। ঠন ঠন বেজে উঠছে মুখের কড়া। বার দুয়েক দূরে অন্য ঘোড়াদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে সে চিঁহিহি ডেকেছে। সেই সময় গ্রিগোরি সম্বিত ফিরে পেয়ে ওকে তাড়া দেয়, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে স্তেপের মাঠ, ধুলোভরা রাস্তা। এখানে ওখানে পড়ে আছে হলুদ রঙের ফসলের গাদা, পাক ধরা জোয়ারের সবজে বাদামী একেক ফালি জমি।

গ্রিগোরি বাড়ি পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই এসে হাজির হল খ্রিস্তোনিয়া। মুখখানা থমথম করছে। এই গরমের মধ্যেও পরনে তার বনাত কাপড়ের উঁচু কলারওয়ালা ব্রিটিশ উর্দি আর ঘোড়সওয়ারের চওড়া ব্রিচেস। এসেছে সে সদ্য চাঁছা এক প্রকাণ্ড অ্যাশ কাঠের লাঠিতে ভর দিয়ে। গ্রিগোরিকে সম্ভাষণ জানাল সে।

'দেখতে এলাম। তোমাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনলাম। নাতালিয়া মিরোনভ্‌না তাহলে কবর হয়েছে?'

প্রশ্নটা যেন কানেই যায় নি এমন ভান ক'রে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী ক'রে ফ্রন্ট ছেড়ে এখানে এলে?' খ্রিস্তোনিয়ার বিরাট শরীরটা সামান্য কুঁজো হয়ে বেয়াড়াগোছের দেখাচ্ছে তাকে। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে গ্রিগোরি লক্ষ করছিল ওর এই মূর্তি।

'জখম হওয়ার পর সেরে ওঠার জন্যে বাড়ি পাঠিয়েছে। এক সঙ্গে দুটো বুলেট পেটের চামড়া আড়াআড়ি ঘসটে ভেতরে চলে গিয়েছিল। এখনও ভেতরেই রয়ে গেছে, পেটের নাড়ির কাছে কোথাও আটকে আছে হতচ্ছাড়া গুলিগুলো। এই জন্যেই লাঠিতে ভর দিয়ে চলতে হচ্ছে আমাকে। দেখছ না?'

'এ ভাবে কোথায় ঘায়েল হলে?'

'বালাশোভের কাছে।'

'দখল করতে পেরেছে আমাদের ফৌজ? তুমি গুলি খেলে কী করে?'

'ব্যাপারটা হল গে এই যে আমরা আক্রমণ করতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, বালাশোভ দখলে এসেছে পভোরিনোও। দখল যারা করেছে তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।'

'তাহলে বল, কাদের সঙ্গে, কোন্ ইউনিটে ছিলে? আমাদের গাঁয়ের কারা কারা ছিল তোমার সঙ্গে। বোসো, তামাক খাও।'

নতুন একজন মানুষের দেখা পেয়ে, যার সঙ্গে ওর নিজের দুঃখের কোন সম্পর্ক নেই এমন একজন বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবে গ্রিগোরি খুশি হল। ওর সমবেদনায় গ্রিগোরির কোন প্রয়োজন নেই বিবেচনা ক'রে খ্রিস্তোনিয়া খানিকটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল। উৎসাহের সঙ্গে, তবে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল বালাশোভ দখলের আর ওর নিজের জখম হওয়ার কাহিনী। প্রকাণ্ড একটা চুরুট ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জলদগম্ভীর কণ্ঠে সে বলতে থাকে, 'আমরা তখন একটা সূর্যমুখী-ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছি। এদিকে হল কি ওরা আমাদের ওপর দমাদ্দম ঝাড়ছে মেশিনগান আর কামানের গোলা তাছাড়া রাইফেল যে আছেই সে আর বলে দিতে হবে না। আমি লোকটা অমনিতেই সকলের চোখে পড়ার মতন - চলেছি সারের মধ্যে, মুরগীর দলে হাঁসের মতো - যত নীচুই হই না কেন, আমাকে ঠিক চোখে পড়ে তাই গুলি আমায় নাগাল পেল। তবে একটা ভালো বলতে হবে যে আমি মাথায় অনেকটা উঁচু, একটু যদি খাটো হতাম তাহলে নির্ঘাত মাথায় এসে লাগত! উড়তে উড়তে বুলেটগুলোর গতি কমে এসেছিল বলে রক্ষে। কিন্তু এমন ভাবে এসে বিঁধল যে আমার পেটের ভেতরটা ভীষণ মোচড় দিয়ে উঠল। দুটোই গরম - ওঃ গনগনে গরম! - যেন সবে উনুন থেকে ঠিকরে পড়ল। দু'হাতের থাবা দিয়ে চেপে ধরলাম জায়গাটা। টের পাচ্ছি ভেতরে বিঁধে আছে, চামড়ার

নীচে দুটো ডেলার মতো, একটা আরেকটার খুব কাছে, নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। আমি আঙুল দিয়ে টিপলাম, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন পড়ে গেলাম। ভাবলাম এ কী বাজে রসিকতা রে বাবা। চুলোয় যাক এমন ঠাট্টা ইয়ারকি। বরং শুয়েই থাকি, নইলে আরও চটপট আরেকটা আবার কোথা থেকে ছুটে এসে হয়ত এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে চলে যাবে। তাই পড়েই থাকি আর কি। থেকে থেকে ওগুলো, মানে ওই বুলেটগুলো ছুঁয়ে দেখি। তখনও এখানে বিঁধে আছে – একেবারে পাশাপাশি। আমি ত ভয়ে কাঁটা। – ভাবি হায় হায়, হতচ্ছাড়া বুলেটগুলো যদি পেটের একেবারে ভেতরে গিয়ে সেঁধোয়, তাহলে কী হবে? পেটের নাড়ির ভেতরে চলে ফিরে বেড়াবে তখন ডাক্তার কী ভাবে খুঁজে পাবে ওগুলো? আমার কাছেও তেমন সুখের হবে না। আর মানুষের শরীল, এমন কি এই আমার শরীলটাও দলদলে – বুলেটগুলো তাই পেটের বড় নাড়ি অবধি চলাফেরা করতে থাকবে – ডাকহরকরার ঘণ্টার মতো ঝুনঝুন করে বাজতে থাকবে। তাহলেই চিত্তির! শুয়ে শুয়ে একটা সূর্যমুখীর মাথা ছিঁড়ে নিয়ে বীচি বার ক'রে খাই। আবার ভয়ও লাগছে দারুণ। আমাদের সারি ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। যা হোক, আমাদের ফৌজ ওই বালাশোভ দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই আমি এসে জুটলাম আমাদের দলের সঙ্গে। তারপর পড়ে রইলাম তিশানস্কায়ার মিলিটারী হাসপাতালে। ডাক্তারটি সেখানে ছিল বেশ ছটফটে, চড়ুই পাখিটির মতো আর কি। আমায় খালি জিজ্ঞেস করে, 'ওগুলো বার করে দেব নাকি হে পেট কেটে?' কিন্তু আমি কি আর অতই বোকা? শুধোই, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু ওটা কি পেটের একেবারে ভেতরে গিয়ে সেঁধোতে পারে?' সে বললে, 'না তা পারে না।' আমি তখন ভাবলাম তাহলে আর কাটাছেঁড়া করতে দিচ্ছি না! ওসব খেল্ আমার জানা আছে! কেটে বার ক'রে দেবে, তারপর ঘা শুকানোর আগেই আবার ফিরে যাও তোমার ইউনিটে। আমি বললুম, 'না ডাক্তারবাবু ও আমি করতে দিচ্ছি নে। ওগুলো থাকলে আমার বরং ভালোই লাগবে। ওগুলো নিয়ে আমি বাড়ি যেতে চাই, বৌকে দেখাব। তাছাড়া এমন কিছু ওজন নয় যে আমার অসুবিধে হবে।' লোকটা আমায় যা নয় তাই বলে গালাগাল করল, বাড়িতে আসার ছুটি দিল এক হপ্তার।'

এই সাদামাঠা কাহিনীটা শুনে গ্রিগোরি হাসল, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায়, কোন্ রেজিমেন্টে গিয়ে পড়লে?'

'চার নম্বরে। ওটা একটা মেলানো মেশানো রেজিমেন্ট।'

'আমাদের গাঁয়ের কে কে আছে তোমার সঙ্গে?'

'আনিকুশ্কা, বেস্খ্লেব্নভ, আকিম কলোভেইদিন, সিওম্কা মিরোশ্নিকভ, তিখন গর্বাচেভ – অনেকে আছে।'

'তা কসাকদের খবর কী? কোন নালিশ নেই?'

'অফিসারদের ওপর বিরক্ত হয়ে আছে আর কি। হাড় বজ্জাতদের সব ধরে ধরে বসিয়েছে – আমাদের অতিষ্ঠ ক'রে ছাড়ল। ওরা প্রায় সবাই বুশী, কসাক বলতে কেউ নেই।'

কথা বলতে বলতে খ্রিস্তোনিয়া তার গায়ের উর্দির খাটো আস্তিনটা টেনে নামায়, হাঁটুতে হাত বুলাতে বুলাতে বিলিতি প্যান্টের মিহি বনাত কাপড়টা এমন আশ্চর্য হয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে যেন নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছে না।

'তবে আমার পায়ের জুতো আর মিলল না!' অন্যমনস্ক ভাবে সে বলল। 'ইংরেজ রাজত্বে ওখানকার লোকজনের মধ্যে এমন ডাগড়াই পা কারও নেই। . . . আমরা গম বুনি, গমের রুটি খাই। কিন্তু ওখানে বোধহয় রাশিয়ার মতোই লোকে শুধু রাই খেয়ে থাকে। এরকম পা আর ওদের কোত্থেকে হবে? আমাদের পুরো দলটাকে জামাকাপড় দিয়েছে, জুতো দিয়েছে, খোশবাই সিগেরেট দিয়েছে, তবু ভালোর ত কোন লক্ষণ দেখছি না। . . .'

'কেন, খারাপটা কিসে?' গ্রিগোরি জানতে চাইল।

খ্রিস্তোনিয়া মুচকি হেসে বলল, 'বাইরে থেকে দেখতে ভালোই, কিন্তু ভেতরটা একেবারেই ঝাঁঝরা। জানো, কসাকরা আবার বেঁকে বসেছে – লড়াই করতে চাইছে না। কী হবে এই লড়াই থেকে বল ত? ওরা বলাবলি করছে যে খোপিওর জেলা ছেড়ে আর এক পাও এগোবে না। . . .'

খ্রিস্তোনিয়াকে বিদায় দেওয়ার পর একটু চিন্তাভাবনা করে গ্রিগোরি সিদ্ধান্ত নিল: 'আর হপ্তাখানেক বাড়িতে কাটিয়েই ফ্রণ্টে চলে যাব। এখানে থাকলে মন খারাপ ক'রে মারা যেতে হবে।' সন্ধ্যা পর্যন্ত ও বাড়িতেই কাটিয়ে দিল। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যেতে মিশাত্কাকে নলখাগড়া দিয়ে একটা হাওয়া কল বানিয়ে দিল, চড়ুই ধরার একটা ফাঁদ বানাল। মেয়ের জন্য নিপুণ হাতে একটা ছোট্ট রথ তৈরি ক'রে দিল – সেটার চাকা ঘোরে, সামনের ডাণ্ডাটা চমৎকার রঙচঙ করা। নেকড়া দিয়ে পুতুল বানানোরও চেষ্টা করল, কিন্তু সে কাজে কোন সুবিধা করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত দুনিয়াশ্‌কার সাহায্য নিয়ে ওটা তৈরি হল।

এর আগে ছেলেমেয়েদের ওপর এতটা মনোযোগ গ্রিগোরি কখনও দেয় নি। তাই প্রথম প্রথম ওরা ওদের বাপের এই সব খেয়ালে তেমন একটা আস্থা রাখতে পারে নি। কিন্তু পরে আর মুহূর্তের জন্যও ওর সঙ্গ ছাড়ে না। এমন কি সন্ধ্যার দিকে গ্রিগোরি যখন মাঠে যাওয়ার যোগাড় করছে তখন মিশাত্কা কোন রকমে চোখের জল চেপে জানিয়ে দিল, 'তুমি বরাবরই অমনি কর। আস

অল্প সময়ের জন্যে, তারপর চলে যাও আমাদের ছেড়ে।... তোমার ফাঁদ, হাওয়া কল, চটপটি সব নিয়ে যাও! কিচ্ছু চাই নে আমি!'

গ্রিগোরি তার বিশাল হাতের মুঠোয় ছেলের কচি কচি দুটো হাত চেপে ধরে বলল, 'তাই যদি হয় তাহলে আয় একটা কাজ করি আমরা - তুই হলি গিয়ে একজন কসাক - চল্ আমার সঙ্গে মাঠে যাবি। আমরা ঘব তুলব, তুলে গাদা করব। তুই দাদুর সঙ্গে কাটার কলে বসে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবি। কত ফড়িং ওখানে ঘাসের ভেতরে। কত রকমের পাখি পাহাড়ী খাতের ভেতরে! তবে পলিউশকা থাকবে বাড়িতে ওর ঠাম্মার সঙ্গে। ও নিশ্চয়ই রাগ করবে না আমাদের ওপর। ও হল মেয়ে। মেয়েদের কাজ ঘর ঝাঁট দেওয়া, ছোট্ট বালতিতে করে দন থেকে ঠাম্মার জন্যে জল বয়ে আনা। মেয়েদের কাজের কি আর অন্ত আছে? রাজী?'

'এক শ' বার!' খুশিতে চিৎকার করে ওঠে মিশাত্কা। এমন কি যে মজাটা হবে মনে মনে তা কল্পনা ক'রে চকচক ক'রে ওঠে ওর দুই চোখ।

ইলিনিচ্না আপত্তি করতে গিয়েছিল।

'কোথায় নিয়ে যাবি ওকে? কী যে সব উদ্ভট খেয়াল তোর, বুঝি নে বাপু! কোথায় ঘুমোবে ও? ওখানে কে নজর রাখবে ওর ওপর? ভগবান না করুন, ঘোড়ার কাছাকাছি গেলে চাঁট খেতে পারে। যদি সাপে কাটে? বাপের সঙ্গে যাস নে রে যাদু আমার, বাড়িতে থাক!' নাতির দিকে ফিরে বলে সে।

কিন্তু মিশাত্কার চোখদুটো সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে যায়। দপ্ করে ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলে ওঠে দু'চোখ - ওর দাদু চটে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। ছোট ছোট দু'হাতে মুঠো পাকিয়ে কাঁদ কাঁদ গলা চড়িয়ে চিৎকার ক'রে বলল, 'তুমি চুপ কর ঠাম্মা!... আমি যাবই যাব! বাবা বাবা গো, ওর কথা শুনো না!...'

গ্রিগোরি হাসতে হাসতে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়, মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ও ঘুমোবে আমার সঙ্গে। এখেন থেকে আমরা যাব আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে, ও পড়বে না ঘোড়ার পিঠ থেকে। ওকে জামাকাপড় পরিয়ে তৈরি ক'রে দাও মা। ঘাবড়ানোর কিছু নেই - ওর কোথাও এতটুকু আঁচড় লাগবে না। কাল সন্ধেনাগাদ জলজ্যান্ত বাড়ি ফিরিয়ে আসব।'

এই ভাবে গ্রিগোরি আর মিশাত্কার মধ্যে বন্ধুত্বের শুরু।

তাতারস্কিতে গ্রিগোরি যে দু'সপ্তাহ কাটিয়েছিল তার মধ্যে আক্সিনিয়াকে সে দেখেছিল মাত্র তিনবার। তাও আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য। আক্সিনিয়া তার সহজাত বুদ্ধি আর কৌশলে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে যে গ্রিগোরির নজরে না আসাই ওর পক্ষে ভালো। স্বাভাবিক মেয়েলি

উপলব্ধিতে ও আন্দাজ করতে পারে গ্রিগোরির মনমেজাজ, বুঝতে পারে অসতর্ক ভাবে অকালে যে-কোন অনুভূতির প্রকাশ ওর প্রতি গ্রিগোরিকে বিরূপ করে তুলতে পারে, ওদের দু'জনের মাঝখানের সম্পর্কের ওপর কালো ছায়া ফেলতে পারে। সে অপেক্ষা করে থাকে গ্রিগোরি কখন নিজে থেকে ওর সঙ্গে কথা বলে। গ্রিগোরির ফ্রন্টে রওনা দেওয়ার আগের দিন ঘটল সেই ঘটনাটা। মাঠ থেকে গাড়ি বোঝাই ফসল নিয়ে গ্রিগোরি বাড়ি ফিরছিল। বেলা শেষ হয়ে এসেছে। স্তেপের মাঠের দিকে যে-গলিটা পড়ে তার একেবারে শেষে গোধূলির আলো-আঁধারিতে আক্সিনিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দূর থেকে আক্সিনিয়া ওকে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল, একটু যেন হাসলও। ওর হাসিতে ছিল কিসের যেন একটা প্রত্যাশা আর শঙ্কার ভাব। ওর নমস্কারের জবাবে গ্রিগোরিও মাথা নোয়াল বটে, কিন্তু কোন কথা না বলে নীরবে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারল না।

'কেমন আছ?' অজ্ঞাতসারেই লাগাম টেনে ধরে ঘোড়ার পায়ের লঘু গতি কমিয়ে এনে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'ভালোই আছি গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ।'

'তোমাকে আজকাল দেখা যায় না যে বড়?'

'মাঠের কাজে ছিলাম। . . . একা ঘরসংসারের ঝক্কি সামলাতে হচ্ছে।'

গ্রিগোরির সঙ্গে গাড়িতে বসে ছিল মিশাত্‌কা। হয়ত এই কারণেই গ্রিগোরি আর ঘোড়া থামাল না, আক্সিনিয়াকেও আর কথাবার্তা বলে ধরে রাখল না। গাড়ি চালিয়ে কয়েক গজ দূরে সরে যাবার পর ডাক শুনতে পেয়ে মাথা ঘোরাল। দেখতে পেল আক্সিনিয়া বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে। পথের ধার থেকে একটা ডেইজী ফুল ছিঁড়ে নিয়ে উত্তেজিত ভাবে তার পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করল, 'গাঁয়ে কি আরও বেশ কিছু দিন থাকবে?'

'কালই চলে যাচ্ছি।'

আক্সিনিয়া মুহূর্তের জন্য যে ভাবে ইতস্তত করল তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল আরও কিছু জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ওর ছিল। কিন্তু কেন কে জানে জিজ্ঞেস করল না - হাতটা নাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল গোরু চরানোর মাঠের দিকে। একবার ফিরেও তাকাল না।

উনিশ

আকাশ মেঘে ছেড়ে গেছে। ঝিরি ঝিরি - যেন চালুনিতে ছাঁকা হয়ে মিহি গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে। কচি ঘাস, লম্বা লম্বা আগাছা আর স্তেপের মাঠের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা বুনো কাঁটাঝোপগুলো বৃষ্টিতে চিকচিক করছে।

এত তাড়াতাড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে প্রোখরের মন-মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। সে নীরবে চলেছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে। সারা রাস্তা একটা কথাও বলে নি গ্রিগোরির সঙ্গে। সেভাস্তিয়ানভ্স্কি গ্রাম পার হওয়ার পর তিনজন ঘোড়সওয়ার কসাকের সঙ্গে ওদের দেখা। জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াগুলোকে গুঁতো মারতে মারতে নিজেদের মধ্যে মহা উৎসাহে কথা বলতে বলতে ওরা সার বেঁধে পথ চলছিল। ওদের মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক, কটা রঙের দাড়ি, গায়ে ঘরে বোনা কাপড়ের ছাইরঙা কোর্তা। দূর থেকে গ্রিগোরিকে দেখে চিনতে পেরে গলা চড়িয়ে তার সঙ্গীদের বলল, 'আরে এ যে দেখছি ভাই মেলেখভ!' গ্রিগোরির পাশাপাশি এসে বাদামী রঙের বিরাট ঘোড়াটাকে লাগাম টেনে রুখল সে।

'নমস্কার গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ!' লোকটা সম্ভাষণ জানাল গ্রিগোরিকে।

'নমস্কার!' গ্রিগোরি জবাব দিল। বৃথাই মনে করার চেষ্টা করল কোথায় দেখেছে কটা দাড়িওয়ালা গোমড়ামুখো এই কসাকটাকে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লোকটা হালে জুনিয়র কর্ণেটের পদে উঠেছে। কেউ যাতে তাকে সাধারণ কসাক সেপাই বলে মনে না করে তার জন্য মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তাটার ওপরেই সেলাই করে লাগিয়েছে আনকোরা কাঁধপটি।

ঘোড়া চালিয়ে গ্রিগোরির একেবারে কাছ ঘেঁসে এসে আগুনের মতো লালচে লোমে ঢাকা চওড়া হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'চিনতে পারলে না ত?' মুখ থেকে ভক ক'রে গ্রিগোরির নাকে এসে লাগল ভোদ্‌কার উদ্‌গারের উগ্র গন্ধ। বোকা-বোকা গোছের আত্মপ্রসাদে ঝলমল করছে সদ্য জুনিয়র কর্ণেটের পদে ওঠা লোকটার মুখখানা। কুতকুতে নীল চোখদুটি জ্বলজ্বল করছে, কটা রঙের গোঁফের তলায় ঠোঁটের ফাঁকে বিগলিত হাসি।

মোটা বনাত কাপড়ের চাবাড়ে কোর্তা পরা এই অফিসারটির আনাড়ি ধরনের চেহারা দেখে গ্রিগোরির মজা লাগে। কৌতুকের ভাবটা গোপন ক'রে না রেখে সে জবাব দেয়, 'না, চিনতে পারলাম না ত! তুমি যখন সাধারণ সেপাই ছিলে তখন হয়ত দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে।... মাত্র কিছু দিন হল জুনিয়র কর্ণেট হয়েছ, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ! মাত্র এক হপ্তা হল হয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কুদিনভের দপ্তরে – যত দূর মনে পড়ে ভগবৎ জন্মকীর্তন* পরবের কাছাকাছি

* ২৫ মার্চ তারিখে পালনীয় খ্রীষ্টীয় উৎসববিশেষ। ঐ তারিখে দেবদূত গেব্রিয়েল কুমারী মেরীকে যিশুর জন্মবার্তা জ্ঞাপন করেন বলে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস। – অনুঃ

কোন এক সময়। সেই সময় তুমি আমাকে একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলে। মনে করতে পারছ না? . . .' এই ত্রিফন। আস্তে আস্তে করে এগিয়ে চল, আমি তোমাদের নাগাল ধরছি!' দলের কসাকরা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে দেড়েল তাদের উদ্দেশে হেঁকে বলল।

বেশ খানিকটা চেষ্টা ক'রে গ্রিগোরি মনে করতে পারল কোন্ পরিস্থিতিতে এই কটা রঙের দাড়িওয়ালা জুনিয়র কর্ণেটের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। এমন কি মনে করতে পারল লোকটার ডাকনাম দু'কড়ি, তার সম্পর্কে ফুদিনভের মন্তব্য 'গুলি করতে ওস্তাদ – একটা গুলিও ফস্‌কায় না ব্যাটাচ্ছেলে! রাইফেল দিয়ে ছুটন্ত খরগোস গুলি করে মারে, লড়াইয়ের মাঠে বেপরোয়া, শত্রুপক্ষের সুলুক ভালোই এনে দিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিতে একেবারে কচি বাচ্চা।' বিদ্রোহের সময় দু'কড়ি একটা স্কোয়াড্রনের পরিচালনায় ছিল। সেই সময় কোন একটা অপরাধ ক'রে বসায় কুদিনভ তাকে সাজা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু গ্রিগোরি মাঝখানে এসে বাধা দিতে দু'কড়িকে মাফ করে দেওয়া হয়, স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের পদ থেকে তাকে আর ছাড়ান হয় না।

'ফ্রন্ট থেকে ফিরছ বুঝি?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক বলেছ। নভোখোপিওরস্ক থেকে ছুটিতে যাচ্ছি। ক্রোশ পঞ্চাশেক পথ ঘুরে মাঝে স্লাশ্চেভস্কায়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার গুষ্টের আত্মীয়স্বজন আছে কিনা। তুমি আমার ভালো করেছিলে সেটা বেশ মনে আছে গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। তোমার একটু সেবা করতে চাই, দয়া করে ফিরিয়ে দিয়ো না আমায়, কেমন? আমার এই থলেতে দু'বোতল নির্ভেজাল মাল আছে – এখনই সাবাড় করা যাক, কী বল?'

গ্রিগোরি সরাসরি আপত্তি জানাল। কিন্তু লোকটা একটা বোতল উপহার হিশেবে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে সেটা নিল।

'ওঃ সে যা কাণ্ড হল ওখানে! কসাকরা আর অফিসাররা দু'হাতে জিনিসপত্র লুটেছে!' বড়াই করে দু'কড়ি বলতে থাকে। 'বালাশোভেও আমি ছিলাম। জায়গাটা দখল করার পর প্রথমেই আমরা ছুটলাম রেললাইনের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখি সারি সারি রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সবগুলো লাইনই বোঝাই। একটা ওয়াগনে চিনি, আরেকটাতে মিলিটারীর জামাকাপড়, অন্যটাতে নানা রকম দামী দামী জিনিসপত্র। কসাকদের মধ্যে কেউ কেউ চল্লিশ প্রস্ত করে জামাকাপড় নিয়েছে। তারপর ইহুদিগুলোকে ধরে যা ঝাড় দেওয়া হল না সেটা দেখার মতন। হাসির ব্যাপার বটে। আমারই দলের এক ব্যাটা চালাক চতুর, ইহুদীগুলোর কাছ থেকে আঠারোটা ট্যাকঘড়ি যোগাড় করে। তার মধ্যে দশটাই সোনার। শালার

পো শালা সেগুলো সব সারা বুকে ঝোলায়। ঠিক যেন এক বিরাট বড়লোক ব্যবসাদার! আর ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে আংটি সে যা পেয়েছিল তার কোন লেখাজোকা নেই! একেক আঙুলে দুটো তিনটি ক'রে।...'

দু'কড়ির জিনের থলেগুলো জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে ফুলে আছে। সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ওগুলোতে কী আছে?'

'টুকিটাকি নানা রকমের জিনিস আর কি।...'

'এও লুটের মাল?'

'কী যে বল! লুটের হতে যাবে কেন? লুট ত আমি করি নি - আইনমাফিক যোগাড় করেছি। আমাদের রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার বলল, 'শহর যদি দখল করতে পার তাহলে দু'দিনের জন্যে শহর তোমাদের হাতে। যা খুশি তাই করতে পার।' আমি অন্যদের চেয়ে খারাপ হলাম কিসে? সরকারী যা যা জিনিস হাতের কাছে পেয়েছি, নিয়েছি।... অন্যেরা আরও খারাপ কাজ করেছে।'

'ভালো লড়িয়ে তোমরা!' হাতানোর ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী জুনিয়ার কর্ণেটটিকে বিতৃষ্ণাভরে নিরীক্ষণ করতে করতে গ্রিগোরি বলল, 'তুমি আর তোমার মতো যত লোকজন পুলের নীচে ওত পেতে বসে থেকে রাহাজানি করতে ওস্তাদ। লড়াই করার উপযুক্ত তোমরা নও! যুদ্ধটা তোমাদের কাছে লুটতরাজ ছাড়া আর কিছু নয়। যত সব হারামজাদার দল! নতুন কারবার ফেঁদে বসেছে! তোমার আর তোমাদের রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের ছালচামড়া যে এর জন্যে একদিন ছাড়িয়ে নেওয়া হতে পারে একথা কি কখনও তোমার মনে হয় না?'

'কিসের জন্যে?'

'যা কিছু করেছ সে সবের জন্যে!'

'কে ছাড়াবে ছালচামড়া?'

'কোন ওপরওয়ালা।'

বিদ্রূপের হাসি হেসে দু'কড়ি বলল, 'কিন্তু ওদের নিজেদেরই ত কোন ঠিক নেই! আমরা না হয় মালপত্র বোঝাই করেছি জিনের থলেতে, নয়ত নিয়ে যাচ্ছি ছোটখাটো গাড়িতে ক'রে, কিন্তু ওরা যে একেকজন গাড়ি গাড়ি বোঝাই মাল পাচার ক'রে দিচ্ছে।'

'তুমি কি দেখেছ?'

'দেখি নি? - কী যে বল! আমি নিজে এরকম মালবোঝাই গাড়ি সঙ্গে ক'রে পৌঁছে দিয়ে এসেছি ইয়ারিজেনস্কায়ায়। একটা গাড়ি বোঝাই শুধু রুপোর থালাবাসন, বাটি আর চামচ! কোন কোন অফিসার হামলা করতে এসেছিল। বলে, 'কী নিয়ে যাচ্ছ? দেখাও দেখি হে!' যেই বলি অমুক জেনারেলের নিজের সম্পত্তি, অমনি সুরসুর ক'রে সরে পড়ে।'

'কে সেই জেনারেলটা শুনি?' চোখ কুঁচকে, বিচলিত ভাবে লাগামজোড়া হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

দু'কড়ি ধূর্তের মতো হেসে জবাব দিল, 'নামটা তার ভুলে গেছি। . . . আহা, কী যেন নামটা? . . . হা ভগবান, মনে করতে দাও! নাঃ, মনে করতে পারছি না! একদম মনে আসছে না। কিন্তু তোমার বাপু অমন গালাগাল করার কোন মানে হয় না গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। মাইরি বলছি, সব্বাই তাই করে! আমি ত তবু অন্যদের তুলনায় নেকড়ের দলে ভেড়ার বাচ্চার মতো। আমি নিয়েছি খুবই সামান্য। আর সবাই লোকজনকে রাস্তার মাঝখানে ন্যাংটো ক'রে কেড়েকুড়ে নিয়েছে, আর ইহুদী মেয়েগুলোকে যেখানেই পেয়েছে ধরে ধরে ইজ্জত নষ্ট ক'রে ছেড়েছে! আমি ওসব কাজে যাই নি। আমার নিজের বিয়ে করা বৌ আছে ঘরে। সে কী বৌ! বৌ ত নয়, যেন একটা তেজী ঘোড়া! না, না, তোমার অমন ক'রে খোঁচা দেওয়ার কোন মানে হয় না বাপু। আরে দাঁড়াও না, চললে কোথায়?'

গ্রিগোরি নিস্পৃহ ভাবে মাথা নাড়িয়ে দু'কড়ির কাছ থেকে বিদায় নিল। 'আমার পেছন পেছন চলে এসো!' প্রোখরকে এই হুকুম দিয়ে কদমচালে ঘোড়া ছেড়ে দিল।

রাস্তায় আরও ঘন ঘন দেখা হয়ে যেতে লাগল যারা ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল এমন সব কসাকের সঙ্গে। কেউ একা একা চলেছে, কেউ বা দল বেঁধে। অনেক সময় জুড়িগাড়িও চোখে পড়ে। গাড়ির মালপত্র তেরপল অথবা মোটা কাপড়ে ঢাকা, যত্ন করে বাঁধাছাঁদা। পেছন পেছন রেকাবের ওপর খাড়া হয়ে দুলকি চালে ঘোড়া চালিয়ে আসছে কসাকরা। তাদের পরনে গরমকালের আনকোরা ফৌজী জামা আর লালফৌজীদের খাকীরঙের পাতলুন। কসাকদের ধুলোমাখা, রোদেপোড়া মুখগুলো সজীব, হাসিখুশি। কিন্তু গ্রিগোরির সামনাসামনি পড়ে যেতেই সেপাইদের কথাবার্তা থেমে যায়, পল্টনী কায়দায় টুপির কানাতে হাত ঠেকিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বেশ খানিকটা দূরে চলে আসার পর তবেই নিজেদের মধ্যে ফের কথাবার্তা শুরু করে।

দূর থেকে লুটের মালবোঝাই গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ারদের দেখে প্রোখর ঠাট্টা করে বলে, 'ওই যে চলেছে সদাগরের দল।'

তবে সকলেই যে বোঝাই লুটের মাল নিয়ে ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে এমন নয়। একটা গ্রামে ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়ানোর জন্য ওর কুয়োর কাছে এসে থামতে পাশের বাড়ির আঙিনা থেকে গ্রিগোরির কানে ভেসে এলো গানের আওয়াজ। নিখুঁত ছেলেমানুষী সুরেলা গলার আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছিল যারা গান গাইছে তারা সব অল্পবয়সী কসাক।

বালতি দিয়ে জল তুলতে তুলতে প্রোখর বলল, 'কেউ বোধহয় পল্টনে যাচ্ছে, তাকে বিদায় জানাচ্ছে।'

আগের দিন নির্জলা এক বোতল মদ খাওয়ার পর খোঁয়ারি ভাঙার ব্যাপারে প্রোখরের কোন আপত্তি ছিল না। তাই ঘোড়াগুলোকে তাড়াতাড়ি ক'রে জল খাওয়ানোর পর একটু হেসে সে প্রস্তাব করল, 'আচ্ছা পান্তেলেয়েভিচ, ওখানে গেলে কেমন হয়? একই যাত্রায় আমাদেরও হয়ত দু'-এক পাত্তর জুটে যেতে পারে? বাড়ির চালা অবশ্য নলখাগড়ার খড়ে ছাওয়া, তবে লোক ওরা শাঁসাল বলেই মনে হয়।'

'নলখাগড়াটাকে' কী ভাবে বিদায় দেওয়া হচ্ছে দেখার জন্য যেতে রাজী হল গ্রিগোরি। ঘোড়াদুটোকে বেড়ার গায়ে বেঁধে সে আর প্রোখর উঠোনে গিয়ে ঢুকল। চালাঘরের ছাঁচতলায় গোল কতকগুলো চাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে চারটে ঘোড়া। পিঠে জিন চাপানো। গোলাঘর থেকে একটা লোহার কুনকেতে কানায় কানায় ভরতি যইয়ের দানা নিয়ে বেরিয়ে এলো একটি ছেলে। ঘোড়াগুলো চিঁহিঁহিঁ ডাক ছাড়ছিল। গ্রিগোরির দিকে এক ঝলক চেয়ে ছেলেটা এগিয়ে গেল সেই দিকে। বাড়ির পেছন দিক থেকে ভেসে আসছে গানের কলি। খুব চড়া কাঁপা কাঁপা গলায় সপ্তমের সুরে একজন ধরেছে:

> নাই সে পথে মানুষজন,
> যায় না হেঁটে কেউ কখন . . .

তামাকের ধোঁয়ায় খসখসে একটা মোটা হেঁড়ে গলা শেষ কথাগুলোর ধুয়া ধরে মিলিয়ে যাচ্ছে সপ্তমের সুরের সঙ্গে। তারপরে আবার একসঙ্গে এসে জুটছে নতুন আরও কতকগুলো গলা। সব মিলে গুরু গম্ভীর, স্বচ্ছন্দ সকরুণ সুরে বয়ে চলে গানের প্রবাহ। দেখা দিয়ে গায়কদের গানে বাধা দেওয়ার কোন ইচ্ছে গ্রিগোরির ছিল না। প্রোখরের জামার আস্তিন ছুঁয়ে ফিসফিস ক'রে তাই সে বলল, 'সবুর কর। দেখা দেওয়ার দরকার নেই। ওদের গানটা শেষ হোক।'

'এটা পল্টনে বিদায় দেবার কোন ব্যাপার নয় দেখছি। ইয়েলান্স্কায়ার কসাকদের গানের ধারাটা এরকম। ওরাই এরকম গায় বটে। ব্যাটারা গান গাইতেও পারে বেশ!' প্রোখর তারিফ করল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বিরক্ত হয়ে থুতুও ফেলল। রকম সকম দেখে ও বুঝতে পেরেছে যে মদ খাওয়ার আশাটা আর পূরণ হচ্ছে না।

যুদ্ধে এক কসাক ভুল ক'রে ফেলে নিজের কী বিপদ ডেকে এনেছিল মিষ্টি সপ্তমের সুরে গানখানা তার আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিয়ে গেল:

সেই যে পথে মানুষ ঘোড়া যায় নি কোন কালে
কসাক সেনা যাচ্ছে সেথায় হালে।
একটি ঘোড়া চার পা তুলে ছুটছে সবার শেষে।
চেরকেস্ট্রীয় জিনখানা তার পড়ল বুঝি খসে।
ডান কানেতে ঝুলছে ঘোড়ার মুখের রাশের দড়ি,
রেশমী দড়ির লাগাম পায়ে করছে জড়াজড়ি।
তার পেছনে ছুট দিয়েছে দলের কসাক-ছোঁড়া।
মানছে না বশ বড় সাধের ঘোড়া।
কসাক বলে, পায় পড়ি তোর ওরে,
এই বিপদে যাস নে ফেলে মোরে,
দুশমনেরা এখন বুঝি নাগাল আমার ধরে . . .

গানে মুগ্ধ হয়ে বাড়ির চুনকাম করা রোয়াকে ঠেস দিয়ে গ্রিগোরি দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোড়ার ডাক বা গলির ভেতর দিয়ে গাড়ি চলাচলের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ – কিছুই ওর কানে যাচ্ছিল না। . . .

ওপাশ থেকে গান শেষ করার পর গায়কদের মধ্যে একজন কেশে বলল, 'গানটা তেমন জমল না। চলনসই গোছের হল আর কি! তা যাক গে, আমরা যেমন পারি গেয়েছি। এখন তোমরা ঠাকুমা-দিদিমারা সেপাইদের রাস্তায় চলার মতো আরও কিছু দাও গো। খাওয়াদাওয়া ত ভগবানের কৃপায় ভালোই হল। কিন্তু রাস্তায় মুখে দেবার মতো কিছুই নেই যে আমাদের। . . .'

গ্রিগোরির যেন ধ্যান ভঙ্গ হল। ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে গেল। দেউড়ির নীচের ধাপে বসে ছিল চারজন ছোকরা কসাক। ওদের চার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ার যত বৌ-ঝি বুড়ি আর বাচ্চাকাচ্চার দল। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে ছুটে এসেছিল ওরা। শ্রোতারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, নাক ঝাড়ছে, রুমালের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছে। দেউড়ির কাছে আসতে আসতে গ্রিগোরি শুনতে পেল লম্বামতন একজন বুড়ি কথা বলছে। বুড়ির চোখদুটো কালো, তার কঠিন ম্লান মুখখানায় ফুটে উঠেছে দেবীপটের মতো সৌন্দর্য। বুড়ি টানাটানা করুণ সুরে বলছিল, 'ওরে আমার বাছারা! কী সুন্দর কী দুঃখের গানই যে তোরা গাইলি! তোদের সকলেরই নিশ্চয় মা আছে। তারাও নিশ্চয় ছেলের কথা ভাবে, লড়াইয়ে কেমন ক'রে তারা মারা যাচ্ছে এই ভেবে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে।' এমন সময় গ্রিগোরি সম্ভাষণ জানাতে তার চোখের হলদে সাদা অংশটা ঝলকে উঠল। উত্তরে হঠাৎ রেগে গিয়ে সে বলল, 'আর এই যে তুমি, কর্তামশাই, তুমি কিনা এই ফুলের মতো নিষ্পাপ ছেলেগুলোকে ঠেলে দিচ্ছ মরণের মুখে? লড়াইয়ে পাঠিয়ে মেরে ফেলছ?'

'আমরা নিজেরাই মরছি বুড়ি মা,' বিষণ্ণ মুখে জবাব দিল গ্রিগোরি। একজন অজানা অফিসার এসে পড়াতে কসাকরা অপ্রতিভ হয়ে চটপট উঠে দাঁড়াল, সিঁড়ির ধাপের ওপরে রাখা এঁটো থালাবাসনগুলো পায়ে ঠেলে সরিয়ে ফৌজী জামা, কাঁধের বেল্ট তলোয়ারের কোমরবন্ধ সব ঠিকঠাক করে নিল। ওরা যখন গান গাইছিল তখনও রাইফেল ওদের কাঁধেই ছিল। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় তারও বয়স বছর পঁচিশেকের বেশি নয়।

সেপাইদের তরতাজা তরুণ মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

ওদের মধ্যে একজন - যার নাকটা বোঁচা, চোখদুটো হাসি-হাসি - ইতস্তত ক'রে উত্তর দিল, 'আমাদের ইউনিট হল গে . . .'

'না না, আমি জিজ্ঞেস করছি কোথাকার লোক তোমরা? কোন্ জেলার? এখানকার না?'

'ইয়েলান্‌স্কায়ার। আমরা ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি হুজুর।'

ছেলেটির গলা শুনে গ্রিগোরি চিনতে পারল ও-ই ছিল মূল গায়েন। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আসল গাইয়ে তুমিই না?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ চমৎকার কিন্তু তোমার গলাটা! কিন্তু কী উপলক্ষে গাইলে বল ত? মনের আনন্দে নাকি? তোমাদের দেখে ত মনে হয় না যে তোমরা মদ খেয়ে নেশার ঘোরে আছ।'

ঢ্যাঙামতন এক ছোকরা, সামনের বাদামী চুলের উদ্ধত ঝুঁটিখানা পরিপাটি আঁচড়ানো, ধুলোর ছাইরঙা প্রলেপ পড়েছে, রোদেপোড়া তামাটে দুই গালে যার লাল আভা, আড়চোখে বুড়িদের দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ হাসি হাসল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিল, 'আনন্দের আর কী থাকতে পারে? . . . অভাবের তাড়নায় আমাদের গান গাইতে হয়। মনের আনন্দে কাটালে এ তল্লাটে তেমন একটা ভালো খাবারদাবার জোটে না। বড় জোর শুকনো একটুকরো রুটি - এর বেশি কিছু নয়। তাই মাথা খাটিয়ে আমরা এই পন্থা বার করেছি। গান শুরু করলেই মেয়েরা সব ছুটে আসে শুনতে। আমরা বেশ করুণ দেখে কোন গান শুরু করি; ওদের মন গলে যায় - খাবারদাবার নিয়ে আসে - কেউ একটুকরো চর্বি, কেউ একবাটি দুধ, নয়ত আরও কোন খাবার। . . .'

'আমরা হলেম গিয়ে অনেকটা পুরুতঠাকুরের মতো হুজুর। গান গেয়ে গেয়ে মুলোটা কলাটা আদায় ক'রে বেড়াই।' বন্ধুদের দিকে চোখ টিপে হেসে ওদের দলের গায়েনটি বলে। কুতকুত করতে থাকে তার হাসি-হাসি চোখদুটো।

কসাকদের একজন বুক-পকেট থেকে তেলচিটে এক টুকরো কাগজ বার ক'রে গ্রিগোরির সামনে মেলে ধরল।

'এই যে আমাদের ছুটি মঞ্জুর করে এই কাগজটা দেওয়া হয়েছে।'

'ও দিয়ে আমার কী হবে?'

'আপনার সন্দেহ হতে পারে, ভাবতে পারেন আমরা পল্টন থেকে পালিয়ে এসেছি।'

গ্রিগোরি বিরক্ত হয়ে বলল, 'ও তুমি দেখিও যখন কোন পিটুনী বাহিনীর সঙ্গে দেখা হবে।' কিন্তু তা সত্ত্বেও যাবার আগে উপদেশ দিল, 'রাতে রাতে ঘোড়া চালিয়ে যেও। দিনের বেলায় বরং কোথাও থেমে জিরিয়ে নিও।... তোমাদের ওই কাগজের তেমন কোন দাম নেই। ওতে বিপদে পড়ারই সম্ভাবনা বেশি।... ছাপ দেওয়া নেই ত?'

'আমাদের স্কোয়াড্রনে কোন সীলমোহর নেই।'

'কাল্মিকদের হাতে যদি বেতের বাড়ি না খেতে চাও তাহলে আমার উপদেশটা মনে রেখো!'

গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রোশখানেক দূরে ঠিক রাস্তার ধারে যে ছোট বনটি এসে পড়েছে, তার তিন শ' গজ দূরে থাকতে গ্রিগোরি ফের আরও দু'জন ঘোড়সওয়ারকে মুখোমুখি আসতে দেখল। তারা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল, ভালোমতো নিরীক্ষণ করল। পরমুহূর্তেই চটপট ক'রে ঘুরে বনের ভেতরে ঢুকে গেল।

'ওদের সঙ্গে কোন কাগজপত্র নেই,' প্রোখর রায় দিল। 'দেখলে না কেমন খাঁ ক'রে বনের ভেতরে ঢুকে গেল? কোন্ হতচ্ছাড়া ওদের মাথার দিব্যি দিয়েছে দিনে দুপুরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে?'

পথে আরও কয়েকজন লোক গ্রিগোরি আর প্রোখরকে দেখে রাস্তা ছেড়ে উলটো দিকে মোড় নিয়ে চটপট পালাতে লাগল। একজন বেশ বয়স্ক কসাক, পায়দল বাহিনীর সেপাই, চুপিচুপি বাড়ির পথ ধরেছিল। ওদের দেখামাত্রই ঝপ করে সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে পড়ল, আলের ধারে খরগোসের মতো থাপটি মেরে পড়ে রইল। লোকটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রোখর রেকাবে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল, 'এই দেশোয়ালী ভাই, কী ভাবে লুকোতে হয় তাও জান না? মাথাটা ত লুকোলে, কিন্তু ওদিকে তোমার পাছা দেখা যাচ্ছে যে!' তারপর রাগের ভান ক'রে হঠাৎ গাঁক গাঁক ক'রে চেঁচিয়ে উঠল: 'অ্যাই, বেরিয়ে এসো বলছি! দেখি তোমার কাগজপত্র!'

কসাক যখন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মাথা নীচু করে সূর্যমুখী ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল তখন প্রোখর হাসিতে ফেটে পড়ল। লোকটাকে তাড়া

করার জন্য ঘোড়াও হাঁকানোর উদ্যোগ করছিল সে। কিন্তু গ্রিগোরি ওকে থামিয়ে দিল।

'আঃ ওসব কী বোকামি হচ্ছে? মরুক গে ব্যাটা। যতক্ষণ না দম ফুরোবে ততক্ষণ ও ভাবেই দৌড়ুতে থাকবে। নয়ত অমনিতে ভয়েই মারা যাবে। . . .'

'কী যে বল! শিকারী কুকুর লেলিয়ে দিয়েও ত ওকে ধরা যাবে না। এখন ও পড়িমরি ক'রে আরও তিন-চার ক্রোশ পথ ঠিক ছুটে যাবে। সূর্যমুখী ক্ষেতের ভেতর দিয়ে কেমন ক'রে দৌড় লাগাল দেখলে না! এমন সময় মানুষ অত জোরে কী করে ছুটতে পারে ভাবতেই অবাক লাগে।'

পলাতকদের সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কতকগুলো কটূ মন্তব্য করল প্রোখর। বলল, 'চলছে কাতারে কাতারে। যেন বস্তা ঝাড়া দিতে বেরিয়ে পড়েছে। তুমি দেখে নিও পান্তেলেয়েভিচ শিগগিরই হয়ত দেখা যাবে কেবল তুমি আর আমি দু'জনে ফ্রন্ট সামলাচ্ছি। . . .'

গ্রিগোরি যত ফ্রন্টের কাছাকাছি আসতে থাকে ততই তার চোখের সামনে আরও প্রকট হয়ে ওঠে দন ফৌজের দুর্নীতির চিত্র। ওদের মধ্যে এই দুর্নীতির সূত্রপাত ঠিক সেই মুহূর্তে যখন বিদ্রোহীদের সাহায্যেপুষ্ট হয়ে আর্মি উত্তর ফ্রন্টে বিরাট সাফল্য অর্জন করতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তার ইউনিটগুলো চূড়ান্ত আক্রমণে নেমে প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ ভাঙা ত দূরের কথা, মারমুখী আক্রমণের চাপে পড়লে নিজেরা তা ঠেকানোর পর্যন্ত ক্ষমতা হারিয়েছে।

জেলা-সদরে আর গ্রামগুলোতে যেখানে যেখানে ফ্রন্টের কাছাকাছি সৈন্য মজুত রাখা হয়েছে, সেখানে অফিসাররা দিন রাত মদের নেশায় চুর হয়ে পড়ে থাকে। পেছনের এলাকায় এখনও পাঠানো যায় নি এরকম সমস্ত লুটের সম্পত্তিতে ঠাসা জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে ভেঙে পড়ছে নানা ধরনের মালগাড়ি। ইউনিটগুলোতে শতকরা ষাট ভাগের বেশি সেপাই নেই। কসাকরা যে যার ইচ্ছেমতো ছুটিতে চলে যাচ্ছে। কাল্‌মিকদের নিয়ে তৈরি পিটুনী বাহিনীগুলো স্তেপের মাঠঘাট চষে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দলে দলে পল্টন ছেড়ে চলে যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। পিটুনী বাহিনীর সাধ্য কি সেই বিপুল বন্যাস্রোতকে রোধ করে! সারাতভ প্রদেশের যে সমস্ত গ্রাম কসাকদের অধিকারে এসেছে সেখানে তারা বিদেশী রাজ্যের অধিকারী বিজেতাদের মতো আচরণ করছে। স্থানীয় জনসাধারণের ওপর লুঠতরাজ চালাচ্ছে, মেয়েদের ধর্ষণ করছে, মজুত শস্য নষ্ট করছে, গোরুভেড়া জবাই করছে। একেবারে অল্পবয়সী ছেলেছোকরা আর পঞ্চাশ বছর বয়সের বুড়োদের দিয়ে পল্টনের দল ভারী করা হচ্ছে। রিজার্ভ স্কোয়াড্রনগুলোর সেপাইরা যুদ্ধে যেতে তাদের অনিচ্ছা খোলাখুলি প্রকাশ করছে। যে-সমস্ত ইউনিট ভরোনেজের দিকে পাঠানো হচ্ছে

সেখানকার কসাক সেপাইরা সরাসরি তাদের অফিসারদের হুকুম মানতে অস্বীকার করছে। গুজব শোনা যাচ্ছিল যে ফ্রন্টলাইনে অফিসারদের খুন হওয়ার ঘটনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বাল্যশোভের কাছাকাছি একটা ছোট গ্রামে এসে গ্রিগোরি যখন রাতের আশ্রয় নেওয়ার জন্য থামল তখন গোধূলি নেমে এসেছে। পল্টনে ডাক পড়ার উপযোগী বয়োজ্যেষ্ঠ কসাকদের নিয়ে তৈরি চার নম্বর বিশেষ স্কোয়াড্রন আর তাগানরোগ রেজিমেন্টের একটা ইঞ্জিনীয়র কম্পানি গ্রামে বাসোপযোগী সমস্ত বাড়িঘর দখল ক'রে ফেলেছে। রাতের আস্তানা খুঁজতে অনেক সময় লেগে গেল গ্রিগোরির। রাতটা ওরা মাঠে কাটিয়ে দিতে পারত। সচরাচর তা-ই করত ওরা। কিন্তু রাত হতে না হতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তার ওপর প্রোখরের আবার শুরু হয়ে গেছে তার নিত্যকার ব্যাধি ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি। রাতে মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাঁই খুঁজে বার করা একান্তই দরকার। গ্রামের শেষ প্রান্তে পপ্‌লার গাছে ঘেরা একটা বিরাট বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কামানের গোলায় অচল একটা সাঁজোয়া গাড়ি। পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরি পড়ে দেখল গাড়ির সবুজ গায়ে আঁচড় কেটে লেখা আছে 'ঘৃণ্য শ্বেতরক্ষীদের মৃত্যু চাই।' তার নীচে লেখা 'প্রতিহিংসাকারী'। বাড়ির উঠোনে ঘোড়ার খুঁটির কাছে নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে ঘোড়াগুলো। লোকজনের গলার আওয়াজ কানে আসছে। বাড়ির পেছনে, বাগানে একটা ধুনি জ্বলছে। গাছপালার সবুজ মাথার ওপর ধোঁয়া উড়ছে। আগুনের আভায় কতকগুলো কসাক মূর্তিকে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে ধুনির কাছে। বাতাসে ধুনি থেকে ভেসে আসছে জ্বলন্ত খড়কুটো আর শুয়োরের পোড়া লোমের গন্ধ।

গ্রিগোরি ঘোড়া থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

লোকজনে ভর্তি নীচু ছাতওয়ালা একটা ঘরের ভেতরে ঢুকে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির মালিক কে?'

চুল্লীর গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিল বেঁটেখাটো একজন চাষী। জায়গা থেকে না নড়েই গ্রিগোরির দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বলল, 'আমি। কী চাই আপনার?'

'রাতটা আপনার এখানে কাটাতে দেবেন? আমরা দু'জন আছি।'

বেঞ্চিতে শুয়ে ছিল এক বয়স্ক কসাক। গ্রিগোরির কথা শুনে লোকটা বিরক্ত হয়ে গজগজ ক'রে বলল, 'আমরা অমনিতেই গাদাগাদি হয়ে আছি তরমুজের বীচির মতো।'

'আমার কোন আপত্তি নেই, তবে আমাদের এখানে বড্ড বেশি গাদাগাদি,' অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বাড়ির মালিক বলল।

'কোন রকমে জায়গা ক'রে নেব 'খন। বৃষ্টির মধ্যে বাইরে রাত কাটাই কী

ক'রে? আমার আর্দালি আবার অসুস্থ।' গ্রিগোরি জোরাজুরি করে।

বেঞ্চিতে যে কসাকটি শুয়ে ছিল সে অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল, বেঞ্চের ওপর উঠে বসে পাদুটো ঝুলিয়ে গ্রিগোরিকে নিরীক্ষণ করল। এবারে গলার স্বর পালটে বলল, 'হুজুর, বাড়ির লোকজন মিলে আমরা চৌদ্দজন আছি দুটো ছোট ছোট ঘরে। আরেকটা ঘর নিয়ে আছে একজন ইংরেজ অফিসার। তার সঙ্গে দু'জন ব্যাটম্যান, তাছাড়া আমাদের একজন অফিসারও আছে।'

কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা এক কসাক, কাঁধপটি দেখে সিনিয়র সার্জেন্ট বলেই মনে হয়, আগ বাড়িয়ে পরামর্শ দিল, 'দেখুন না, হয়ত ওদের ওখানেও জায়গা পেয়ে যেতে পারেন?'

'না, বরং এখানেই থাকি। জায়গা আমার বেশি লাগবে না। মেঝেতে শোবো। তোমাদের কোন অসুবিধা করব না,' বলতে বলতে গায়ের গ্রেটকোটটা খুলে হাতের তেলো দিয়ে চুল পাট ক'রে নিয়ে গ্রিগোরি বসে পড়ে টেবিলের ধারে।

প্রোখর বেরিয়ে গেল ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করতে।

পাশের ঘরের লোকেরা সম্ভবত ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল। মিনিট পাঁচেক বাদে ওদের ঘরে এসে ঢুকল ফিটফাট সাজগোজ করা ছোটখাটো চেহারার এক লেফ্‌টেনান্ট।

'আপনি রাতের আস্তানা খুঁজছেন?' গ্রিগোরির দিকে ফিরে সে বলল। ওর পদমর্যাদাসূচক কাঁধপটির ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে একগাল হেসে প্রস্তাব দিল, 'আমাদের কাছে, আমরা যে ঘরে আছি সেখানে চলে আসুন। আমি আর ব্রিটিশ আর্মির লেফ্‌টেনান্ট মিস্টার ক্যাম্পবেল - আমরা' আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ওখানে অনেকটা আরামে থাকতে পারবেন। আমার নাম শ্চেগ্‌লোভ। আপনার নামটা?' লোকটা গ্রিগোরির সঙ্গে করমর্দন করল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ফ্রন্ট থেকে আসছেন? ও, ছুটির পর বাড়ি থেকে ফিরছেন? আসুন আসুন! আপনাকে অতিথি হিশেবে পেয়ে আমরা খুশি হব। আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে? আপনাকে আপ্যায়ন করার মতো ভালোমন্দ কিছু জিনিস আমাদের আছে।'

লেফ্‌টেনান্টের উঁচু কলারওয়ালা আঁটো ফৌজী জামাটা হাল্‌কা সবুজ রঙের চমৎকার বনাত কাপড়ের তৈরি। বুকের ওপর দোল খাচ্ছে সেন্ট জর্জ ক্রস। ছোট্ট মাথার চুলের সিঁথিটা নিখুঁত, বুটজোড়া সযত্নে পালিশ করা। হাল্‌কা তামাটে রঙের নিখুঁত কামানো মুখ, চমৎকার গড়ন। তার আপাদমস্তক সর্বত্র থেকে ফুটে বেরুচ্ছে পরিচ্ছন্নতা আর কী যেন একটা সুগন্ধী ফুলের অডিকলোনের ভুরভুরে গন্ধ। বারান্দায় সৌজন্যের খাতিরে গ্রিগোরিকে আগে যেতে দিয়ে সতর্ক ক'রে বলল, 'দরজা বাঁ দিকে। দেখবেন, ওখানে কিছু কাঠের বাক্স আছে। হোঁচট খাবেন না।'

গ্রিগোরিকে অভ্যর্থনা জানাল তরুণ চেহারার এক লম্বা যুবক লেফ্‌টেনান্ট। ওপরের ঠোঁটে একটা তেরছা কাটার চিহ্ন, ফুরফুরে কালো গোঁফের রেখা তা ঢাকতে পারে নি। ছাইরঙা চোখদুটির মাঝখানে ব্যবধান স্বল্প। বুশী লেফ্‌টেনান্টটি তার সামনে গ্রিগোরির পরিচয় দিল, ইংরেজিতে কী যেন বলল। ইংরেজ লেফ্‌টেনান্ট অতিথির হাত ঝাঁকাল। একবার আগন্তুকের দিকে আরেকবার বুশী লেফ্‌টেনান্টের দিকে তাকাল। কয়েকটা কথা বলে ইঙ্গিতে বসতে বলল ওদের।

ঘরের মাঝখানে সারি সারি চারটে ক্যাম্পখাট। এক কোনায় স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে কোথাকার কতকগুলো কিটব্যাগ আর চামড়ার স্যুটকেস। একটা তোরঙ্গের ওপর পড়ে আছে গ্রিগোরির অপরিচিত ধরনের একখানা লাইট মেশিনগান, দূরবীনের খাপ, কার্তুজের বাক্স আর একটা কার্বাইন, যার কুঁদোটা ঘসে ঘসে কালো হয়ে গেছে কিন্তু নলটা একেবারে আনকোরা, ঝকঝকে হালকা ময়ূরকণ্ঠী রঙের।

ইংরেজ লেফ্‌টেনান্ট গ্রিগোরির দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রীতিভরে চাপা গম্ভীর গলায় কী যেন বলল। বিজাতীয় ভাষার শব্দগুলো গ্রিগোরির কানে অদ্ভুত ঠেকল। তার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারল না। তবে কথাগুলো যে ওর সম্পর্কেই হচ্ছে এটা অনুমান করতে পেরে খানিকটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। বুশী লেফ্‌টেনান্টটি একটা স্যুটকেসের ভেতরে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। হাসি-হাসি মুখ ক'রে ইংরেজ লেফ্‌টেনান্টের কথাগুলো শোনার পর বলল, 'মিস্টার ক্যাম্পবেল বলছেন কসাকদের উনি খুব সম্মান করেন। ওঁর মতে, কসাকরা চমৎকার ঘোড়সওয়ার আর সিপাই। কিছু খাবেন কি? মদ খান আপনি? উনি বলছেন কি, বিপদ অচেনা মানুষজনকে কাছে টেনে আনে। . . . ধুর, যত সব আজেবাজে কথা বলে লোকটা!' স্যুটকেসের ভেতর থেকে কতকগুলো টিনের খাবারদাবার আর দুটো ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করল সে। তখনও দোভাষীর কাজ ক'রে চলেছে। 'উনি বলছেন উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়াতে কসাক-অফিসাররা ওকে খুব আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন। সেখানে ওঁরা বিশাল এক পিপে দনের মদ শেষ করেন। সবাই মদ খেয়ে গড়াগড়ি যান। হাইস্কুলের কিছু মেয়ের সঙ্গে মহা ফুর্তিতে দিন কাটে। বুঝতেই পারছেন, যেমন হয়ে থাকে আর কি। উনি মনে করেন ওঁকে যে আতিথেয়তা দেখানো হয়েছিল অন্তত সেই পরিমাণ আতিথেয়তা দিয়ে তা শোধ করা ওঁর একান্ত কর্তব্য। তাতে উনি প্রীত হবেন। এই অত্যাচার আপনাকে সহ্য করতে হবে। আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। . . . আপনি মদ খান?'

'ধন্যবাদ। তা খাই,' বলতে বলতে গ্রিগোরি অস্বস্তিভরে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিজের হাতদুটো। রাস্তার ধুলোবালি আর ঘোড়ার লাগামে বিশ্রী নোংরা হয়ে ছিল।

বুশী লেফটেনান্ট টিনের খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে নিপুণ হাতে একটা ছুরি দিয়ে কেটে খুলল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'জানেন লেফ্‌টেনান্ট, এই ইংরেজ বুনো শুয়োরটি আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে ছাড়ল। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মদ খেয়ে চলেছে। যে ভাবে গিলছে তার কোন জবাব নেই। মদ খেতে আমার নিজের তেমন একটা আপত্তি নেই। কিন্তু এরকম বাড়াবাড়ি মাত্রায় খাবার অভ্যেস আমার নেই। অথচ এই লোকটি . . .' বলতে বলতে মুচকি হেসে ইংরেজটির দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরিকে অবাক ক'রে দিয়ে বিশ্রী রকম মুখ খারাপ ক'রে যোগ করল, 'সর্বক্ষণ গলায় ঢেলেই চলেছে — এমন কি খালি পেটেও।'

ইংরেজ লেফ্‌টেনান্ট হেসে মাথা নাড়ল, ভাঙা ভাঙা বুশীতে বলল, 'টা টা। . . . বহুৎ আচ্ছা। . . . আপনার ভালো হোক। . . .'

গ্রিগোরি হেসে উঠে মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের গোছা পেছনে সরিয়ে নেয়। ছোকরাদুটিকে ওর বেশ ভালোই লাগছিল। আর বিশেষ করে এই যে ইংরেজ লেফ্‌টেনান্টটি অর্থহীন হাসি হাসছে, যার বুশী শুনলে পিলে চমকে যায়, সে ত এক কথায় অতি খাসা।

টেবিলে রাখার জন্য গেলাস মুছতে মুছতে বুশী লেফ্‌টেনান্টটি বলল, 'আজ দু'হপ্তা হল বেকার এই লোকটির সঙ্গে আমার ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কেমন লাগে বলুন? আমাদের দু'নম্বর কোর্-এর সঙ্গে যে-সমস্ত ট্যাঙ্ক আছে উনি আমাদের লোকজনকে সেগুলো চালানো শেখান। আমাকে ওঁর দোভাষী হিশেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমি অনর্গল ইংরেজি বলতে পারি এই হল আমার অপরাধ। . . . আমাদের লোকেরাও মদ খায়, কিন্তু এরকম নয়। এর মদ খাওয়া — সে যে কী জিনিস, কে জানে বাপু! দেখবেন কী ক্ষমতা ওঁর। ওঁর একারই রোজ অন্তত পক্ষে চার থেকে পাঁচ বোতল ব্র্যাণ্ডি লাগে। মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে সবটুকু খেয়ে ফেলবেন, কিন্তু মাতাল কখনও হবেন না। অত মাত্রায় খাবার পরও কাজ ঠিক চালিয়ে যাবে। আমার জেরবার হয়ে গেল। আমার পাকস্থলীতে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে, মনমেজাজ রোজই খিচড়ে থাকে। আমার সারা শরীর মদে এমন টইটম্বুর হয়ে আছে যে এখন আমি জ্বলন্ত প্রদীপের সামনে পর্যন্ত বসতে ভয় পাই। . . . কী হয়েছে যে ছাই!' বলতে বলতে দুটো গেলাস কানায় কানায় ভরতি করল, নিজের জন্য যৎসামান্য ঢালল একটা গেলাসে।

ইংরেজটি চোখের ইশারায় গেলাসটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে, চঞ্চল হয়ে কী যেন সব বলতে লাগল। বুশী সঙ্গীটি অনুনয়ের ভঙ্গিতে বুকে হাত রেখে সংযত হেসে ইংরেজিতে উত্তর দিল। ওর কালো রঙের প্রসন্ন চোখে মাত্র কয়েক লহমার জন্য থেকে থেকে জ্বলে উঠছিল ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। গ্রিগোরি গেলাস হাতে

নিয়ে দিলদরাজ আপ্যায়নকারীদের গেলাসের সঙ্গে ঠেকিয়ে ঢক ক'রে খেয়ে ফেলল।

'বাঃ!' ইংরেজ লেফ্‌টেনান্ট তারিফ ক'রে বলে। তারপর নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে অবজ্ঞাভরে তাকায় তার সঙ্গীর দিকে।

ইংরেজ লেফ্‌টেনান্টের রোদে পোড়া বড় বড় তামাটে হাতদুটো টেবিলের ওপর পড়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায় একজন খেটে খাওয়া লোকের হাত। হাতের উলটো পিঠের লোমকূপগুলো গাড়ির তেলে কালো হয়ে বুজে আছে, ঘন ঘন পেট্রোলের সংস্পর্শে আসার ফলে হাতের আঙুলগুলো খসখসে, পুরনো কাটাছেঁড়ার দাগে বিচিত্র দেখাচ্ছে। শুধু মুখখানা তার বেশ ঘসামাজা, পুরুষ্টু, লাল টকটকে। হাত আর মুখের মধ্যে বৈষম্য এত বেশি যে গ্রিগোরির মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল লেফ্‌টেনান্ট বুঝি বা মুখোস পরে আছে।

'আপনি আমায় উদ্ধার করলেন,' দুটো গেলাস কানায় কানায় ভরতি করে রুশী লেফটেনান্ট বলল।

'উনি কি একা একা খান না?'

'তাহলে আর বলছি কি! সকালে একা একাই খেতে শুরু করেন, কিন্তু সন্ধেবেলা আর সঙ্গী ছাড়া চলে না। আচ্ছা, আসুন খাওয়া যাক!'

'জিনিসটা বেশ কড়া।...' গ্রিগোরি গেলাসে সামান্য চুমুক দিল। কিন্তু ইংরেজটি আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে বাকিটা গলায় ঢেলে দিল।

'উনি বলছেন, আপনার বেশ হিম্মত আছে। আপনার মদ খাওয়ার ধরনটা উনি তারিফ করছেন।'

'আপনার সঙ্গে চাকরিটা বদলাবদলি করে নিতে পারলে আমার আপত্তি ছিল না,' গ্রিগোরি হেসে বলল।

'আমি হলফ ক'রে বলতে পারি দু'হপ্তা পরে আপনি পালিয়ে যেতেন।'

'এমন একটা ভালো কাজ ছেড়ে?'

'অন্তত আমার ত ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।'

'ফ্রণ্টে আরও খারাপ অবস্থা!'

'এও ফ্রণ্টের চেয়ে কোন অংশে ভালো নয়। ওখানে গুলি নয়ত গোলার টুকরো লেগে খতম হওয়ার সম্ভাবনা আছে - তাও সব সময় নয়। কিন্তু এখানে থাকলে নিয়মিত ভাবে মাত্রাতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে চিরকালের জন্যে বেহেড হওয়া অবধারিত। এই যে কৌটোর এই ফলগুলো একটু চেখে দেখুন। একটু হ্যাম খেয়ে দেখুন।'

'ঠিক আছে। এই ত খাচ্ছি।'

'ইংরেজরা এসব ব্যাপারে ওস্তাদ। ওরা তাদের আর্মির লোককে আমাদের মতো খাওয়ায় না।'

'আমরা খাওয়াই নাকি? আমাদের আর্মিকে ত চরে খেতে হয়।'

'দুঃখের বিষয়, কথাটা সত্যি। কিন্তু এই ভাবে সেপাইদের সেবা করার যে পন্থা তা বেশি দূর চলতে পারে না – বিশেষত তাদের যদি জনসাধারণের ধনসম্পত্তি যথেচ্ছ লুটতরাজের অধিকার দেওয়া হয়, একাজের জন্য যদি কোন শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে।...'

গ্রিগোরি মনোযোগ দিয়ে লোকটিকে লক্ষ করল, জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কত দূর যাচ্ছেন?'

'আমরা যে একই পথে যাচ্ছি! ও কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?' ইতিমধ্যে ইংরেজ লেফ্‌টেনান্ট বোতলটা হাত ক'রে কখন এক ফাঁকে তার সঙ্গীটির গেলাস ভরতি করে দিয়েছে।

'এবারে শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত না খেয়ে আর কোন উপায় নেই আপনার,' মৃদু হেসে গ্রিগোরি বলল।

'শুরু হয়ে গেল!' গেলাসের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল লেফ্‌টেনান্ট। হালকা রক্তিমাভা খেলে গেল তার সারা গালে।

ওরা তিনজনেই গ্লাস ঠোকাঠুকি করে নিঃশব্দে পান করল।

'পথ ত আমাদের একই, তবে সবাই এক ভাবে যাচ্ছে না,' থালায় পিছলে যাওয়া একটা এপ্রিকট কাঁটা দিয়ে ধরার নিষ্ফল চেষ্টা করতে করতে ভুরু কুঁচকে আবার কথা শুরু করল গ্রিগোরি। 'কেউ কাছেপিঠে কোথাও নেমে যাবে, কেউ বা আরও দূরে যাবে। ট্রেনের যাত্রীর মতো আর কি।...'

'আপনি কি শেষ স্টেশন অবধি যাচ্ছেন না?'

গ্রিগোরি বুঝতে পারছিল ওর নেশা ধরতে শুরু করেছে, কিন্তু নেশার ঘোর এখনও ওকে কাবু করতে পারে নি। হেসে জবাব দিল, 'শেষ পর্যন্ত যাবার যে টিকিট কাটব সে পুঁজি আমার নেই। আপনার আছে কি?'

'আমার অবস্থা অবশ্য অন্য – যদি ট্রেন থেকে নামিয়েও দেয় তবু স্লিপার ধরে পায়ে হেঁটে শেষ অবধি যেতে হবে।'

'তাহলে আপনার যাত্রা শুভ হোক! আসুন, এই ইচ্ছা ক'রে আরও এক পাত্তর খাওয়া যাক!'

'আর উপায় কী? আরম্ভটাই যা কষ্টের।...'

ইংরেজ লেফ্‌টেনান্ট তার সঙ্গী আর গ্রিগোরির সঙ্গে গ্লাস ঠোকাঠুকি ক'রে নিঃশব্দে মদ খেয়ে চলল, খাবার প্রায় ছুঁলই না। তার মুখে পাটকিলে রঙ ধরেছে,

চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, দেহের ভঙ্গিতে দেখা দিয়েছে একটা ইচ্ছাকৃত মন্থরতা। দ্বিতীয় বোতলটা শেষ হওয়ার আগেই কষ্ট করে সে উঠে দাঁড়াল, দৃঢ় পায়ে স্যুটকেসের কাছে এগিয়ে গিয়ে স্যুটকেস খুলে তিনটে ব্র্যাণ্ডির বোতল নিয়ে এলো। সেগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটিয়ে গম্ভীর গলায় কী যেন বলল:

'মিস্টার ক্যাম্পবেল বলছেন যে আমাদের সুখের মাত্রাটা আরও টানা দরকার। চুলোয় যাক লোকটা। আপনি কী বলেন?'

'তা টানা যেতে পারে,' গ্রিগোরি আপত্তি জানাল না।

'কিন্তু কত দূর চলতে পারে! লোকটার দেহটাই ইংরেজের, ভেতরে ভেতরে যেন রুশী সদাগর। আমার মনে হয় এর মধ্যেই হয়ে এসেছে আমার। . . .'

'আপনাকে দেখে ত মনে হয় না,' টিপ্পনী কাটল গ্রিগোরি।

'কী যা তা বলছেন! আমি এখন বড় দুর্বল, একটা অবলা কুমারী মেয়ের মতো। . . . কিন্তু বোধশক্তি আমার এখনও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে - এমন কি পুরোমাত্রায় আছে!'

শেষ গ্লাসটি পান করার পর বেশ খানিকটা ঘোর লেগেছে লেফ্‌টেনান্টের। কালো চোখদুটোতে একটা তৈলাক্ত চকচকে ভাব এসেছে, সামান্য টেরাতে শুরু করেছে দুই চোখ। মুখের মাংসপেশী শিথিল হয়ে এসেছে, ঠোঁটজোড়া যেন তার নিজের আয়ত্তের প্রায় বাইরে চলে গেছে, গালের বিবর্ণ ঢিবির তলায় দপ দপ করে শিরা কাঁপতে শুরু করেছে।

ব্র্যাণ্ডির প্রতিক্রিয়া নিদারুণ হয়ে দেখা দিয়েছে লেফ্‌টেনান্টের ওপর। সে যেন চোখে সর্ষেফুল দেখছে।

'আপনি এখনও দস্তুরমতো ফর্মে আছেন। খেয়ে খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই কিছুতেই কিছু হয় না আপনার,' গ্রিগোরি জোর দিয়ে বলে। তার নিজেরও বেশ নেশা ধরেছে। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল যে এখনও আরও অনেকখানি টানার ক্ষমতা রাখে।

লেফ্‌টেনান্ট খুশি হয়ে ওঠে:

'সত্যি বলছেন? না না, গোড়ার দিকে আমি খানিকটা নেতিয়ে পড়েছিলাম। তবে এখন - যত খুশি বলেন খেতে পারি। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি - যত খুশি। আপনাকে আমার বেশ লাগছে লেফ্‌টেনান্ট। আপনার মধ্যে মনোবল আর আন্তরিকতা বলতে যা বোঝায় সে রকম বস্তু যেন উপলব্ধি করা যায়। এটা আমার ভালো লাগে। আসুন এই বেহেড মাতালটার জন্মভূমির কথা মনে ক'রে খাওয়া যাক। লোকটা একটা গোঁয়ারভেড়া জাতীয় জীব হলে কী

হবে, ওর দেশটা ভালো। 'অহো ব্রিটানিয়া করহ শাসন, জলধিতরঙ্গ করহ শাসন।'* খাওয়া যাক তাহলে? তবে সবটা একসঙ্গে নয়। আপনার জন্মভূমির গৌরবের কথা মনে করে, মিস্টার ক্যাম্পবেল।' লেফটেনান্ট মরিয়ার মতো হয়ে চোখমুখ কুঁচকে পান করল, পরক্ষণেই এক টুকরো হ্যামে কামড় বসিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আহা সে কী দেশ, বুঝলেন? আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আমি ওখানে বাস করে এসেছি। . . . আচ্ছা, খাওয়া যাক!'

'নিজের মা, সে যা-ই হোক না কেন, অন্যের মায়ের চেয়ে আপন।'

'ও নিয়ে তর্কাতর্কি ক'রে কোন কাজ নেই। আসুন খাওয়া যাক।'

'ঠিক আছে, যা বলেন।'

'আমাদের এই দেশে যে পচন ধরেছে তাকে ঘসে তুলতে হলে চাই তলোয়ার আর আগুন। অথচ আমাদের কোন শক্তি নেই। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের নিজেদের দেশ বলেও কিছু নেই। মরুক গে ছাই। লালদের সঙ্গে যে আমরা এঁটে উঠতে পারব ক্যাম্পবেল বিশ্বাস করে না।'

'বিশ্বাস করে না?'

'তাহলে আর বলছি কী? আমাদের আর্মি সম্পর্কে ওর ধারণা ভালো নয়। লালদের খুব প্রশংসা করে।'

'লড়াই করেছে কখনও?'

'করে নি আবার! লালেরা ত ওকে ধরেই ফেলেছিল প্রায়। ধুত্তোর ব্র্যান্ডি।'

'কড়া। নির্জলা স্পিরিট জাতীয় আরকের মতোই কড়া?'

'অতটা ঠিক নয়। ক্যাম্পবেলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে ঘোড়সওয়ার দল। নইলে ধরাই পড়ত। ঘটনাটা ঘটেছিল জুকভ গ্রামের কাছাকাছি। লালেরা সেই সময় আমাদের একটা ট্যাঙ্ক ছিনিয়ে নেয়। . . . আপনাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার?'

'এই কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী মারা গেছে।'

'কী সাংঘাতিক। ছেলেপুলে আছে?'

'তা আছে।'

'আপনার বাচ্চাদের কুশল কামনা ক'রে খাই। আমার ওসব বালাই নেই। বলা যায় না, হয়ত বা আছে। যদি থাকেও সম্ভবত কোথাও রাস্তার ঘাটে খবরের কাগজ ফিরি করে বেড়াচ্ছে। . . . ক্যাম্পবেলের আবার বিলেতে ওর বাগানবাড়ি

---

* ব্রিটেনের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান। ১৭৪০ সালে রচিত। প্রথম পংক্তি: 'Rule Britannia, Britannia, rule the waves!' – অনু:

আছে। নিয়ম করে সপ্তাহে দু'বার সে তার প্রেয়সীকে চিঠি লেখে। লেখে সম্ভবত রাজ্যের হাবিজাবি কথা। আমি, বলতে গেলে, ওকে ঘেন্না করি। কী বললেন?'

'না, কিছু বলছি না ত? আচ্ছা লালদের ও শ্রদ্ধা করে কেন?'

"শ্রদ্ধা করে' কে বলল?'

'আপনিই ত বললেন।'

'হতেই পারে না! শ্রদ্ধা করে না, শ্রদ্ধা করতে পারে না। আপনি ভুল করছেন! আচ্ছা ওকে জিজ্ঞেস ক'রেই দেখা যাক না।'

ক্যাম্পবেল বেশ মনোযোগ দিয়ে তার নেশাগ্রস্ত ও পাণ্ডুর সঙ্গীর কথাগুলো শুনল। অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলল। গ্রিগোরি ওকে শেষ করতে না দিয়ে আর ধৈর্য ধরে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কী বকবক করছে?'

'ওদের পায়দল সৈন্যদের ছালবাকলের জুতো পায় দিয়ে ট্যাঙ্কের ওপর হামলা চালাতে দেখেছে। এটা কি যথেষ্ট নয়? বলছে জনসাধারণকে হারানো সম্ভব নয়। বোকা আর কাকে বলে। ওর কথায় বিশ্বাস করবেন না।'

'কেন করব না?'

'আদৌ করবেন না।'

'কিন্তু, কেন?'

'লোকটা মাতাল হয়ে গেছে। আবোল তাবোল বকছে। জনসাধারণকে হারানো সম্ভব নয় – এর অর্থ কী? ... তার একটা অংশকে নিকেশ ক'রে দেওয়া যায়, বাদবাকিদের পথে বসানো যায়। ... কী বললাম আমি? না না, পথে বসানো কী বলছি? পথে আনা যায়। ক'টা খাওয়া হল আমাদের এই নিয়ে?' বলতে বলতে লেফ্‌টেনান্টের মাথাটা টেবিলে রাখা হাতের ওপর ধপ করে পড়ে গেল। তার কনুইয়ের ঠেলায় টিনের খাবারের একটা কৌটো উলটে পড়ে গেল। টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মিনিট দশেক সে বসে রইল।

জানলার বাইরে অন্ধকার রাত। খড়খড়ির গায়ে ঘনঘন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে চড়বড় আওয়াজ তুলছে। দূরে কোথায় যেন গুরুগুরু ডাক শোনা যাচ্ছে। মেঘের ডাক না তোপের আওয়াজ গ্রিগোরি বুঝতে পারল না। সিগারের নীলচে ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে আছে ক্যাম্পবেল। একটু একটু ক'রে চুমুক দিয়ে ব্র্যাণ্ডি খাচ্ছে। কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে ক্যাম্পবেলের সঙ্গীটিকে জাগাল গ্রিগোরি। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা ওকে জিগ্‌গেস কর ত, লালেরা আমাদের হারিয়ে দেবে এমন কথা ও ভাবছে কেন।'

'গোল্লায় যাক!' বিড়বিড় করে উঠল বুশী লেফ্‌টেনান্ট।

'না না, জিগ্‌গেস করই না।'

'গোল্লায় যাক! চুলোয় যাও বলছি।'

'কী বলছি কী তোমাকে? জিজ্ঞেস কর।'

লেফ্‌টেনাণ্ট মিনিটখানেক ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে গ্রিগোরির দিকে। হিক্কা তুলতে তুলতে ক্যাম্পবেলকে কী যেন বলে। ক্যাম্পবেল মনোযোগ দিয়ে ওর কথাগুলো শুনল। কিন্তু এর পরই লেফ্‌টেনাণ্ট আবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আঁজলা ক'রে পেতে রাখা দু'হাতের ওপর ঢলে পড়ে তার মাথাটা। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ক্যাম্পবেল তার সঙ্গীর দিকে তাকাল, গ্রিগোরির জামার আস্তিন ধরে টানল, নীরবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। এপ্রিকটের একটা বিচি টেবিলের মাঝখানে টেনে আনল, তার পাশে যেন তুলনা করার খাতিরে নিজের হাতের বিরাট তালুটাকে বেড়া দেওয়ার মতন ক'রে দাঁড় করিয়ে রাখল। জিভ দিয়ে আলটাকরায় একটা টুসকি মেরে ওটাকে হাত দিয়ে ঢেকে দিল।

'হুঃ, বড় চালাক ভেবেছে নিজেকে! ও ত আমি নিজেই বুঝি। তোমাকে বলে দিতে হবে কেন? . . .' গ্রিগোরি চিন্তিত ভাবে বিড়বিড় ক'রে বলে। টলতে টলতে অতিথিপরায়ণ ইংরেজ লেফ্‌টেনাণ্টকে সে জড়িয়ে ধরল, দস্তুরমতো অঙ্গভঙ্গি করে টেবিল দেখিয়ে ইঙ্গিতে তার বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করল, মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ! এবারে চলি। হ্যাঁ তোমাকে কী বলি জান? যত তাড়াতাড়ি পার বাড়ি চলে যাও। নইলে এখানে তোমার মাথাটা খসবে। আমি তোমাকে ভালো কথাই বলছি। বুঝতে পারছ? আমাদের ব্যাপারে তোমাদের মাথা গলানোর কোন মানে হয় না। বুঝেছ? চলে যাও, দোহাই তোমার চলে যাও। নয়ত তোমার দফা রফা হবে এখানে।'

ইংরেজ লেফ্‌টেনাণ্ট উঠে দাঁড়াল। সেও মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল, উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে শুরু ক'রে দিল। তার দোভাষী ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে অসহায় ভঙ্গিতে সেদিকে তাকাতে তাকাতে লোকটা অমায়িক ভঙ্গিতে বার কয়েক গ্রিগোরির পিঠ চাপড়াল।

গ্রিগোরি অতি কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে দরজার ছিটকিনি খুঁজে বার করল, দরজা খুলে টলতে টলতে দেউড়িতে বেরিয়ে এলো। তেরছা হয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ছাঁট ওর মুখের ওপর এসে লাগল। বিজলির চমকে আলোকিত হয়ে উঠল প্রশস্ত উঠোনটা, সে আলোয় দেখা গেল একটা ভিজে চাড়ি, বাগানের গাছপালার চকচকে পাতাগুলো। দেউড়ির ধাপ বয়ে নামতে নামতে গ্রিগোরি পা পিছলে পড়ে গেল। যখন উঠতে যাচ্ছিল তখন ওর কানে গেল কতকগুলো কণ্ঠস্বর।

'অফিসারগুলো কি এখনও মদ চালিয়ে যাচ্ছে?' বার-বারান্দায় দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে কে যেন জিজ্ঞেস করল।

সর্দিবস্য ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তরে চাপা হুমকির সুরে বলল, 'ওরা মদ খাবে। প্রাণ ভরে খাবে। . . . যতক্ষণ না নিজেরা ফুরিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ চালিয়ে যাবে।'

বিশ

উনিশ শ' আঠারো সালের মতো এবারেও খোপিওর প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দন ফৌজ তার মারমুখী শক্তি হারিয়ে ফেলল। দনের উজান এলাকার কসাকরা এবং কতকাংশে খোপিওরের কসাকরাও দন প্রদেশের সীমানা পেরিয়ে আর লড়াই করতে চাইছে না। ওদিকে লাল ফৌজের ইউনিটগুলোও নতুন করে সেনাবলের সরবরাহ পেয়ে তাদের প্রতিরোধ বাড়িয়ে তুলেছে। তারা এখন এমন একটা এলাকায় তৎপর হয়ে উঠেছে যেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সহানুভূতি আছে ওদের ওপর। ফের আত্মরক্ষার লড়াইতে নামতে কসাকদের কোন আপত্তি নেই। এই কিছুদিন আগেও নিজেদের প্রদেশের সীমানার মধ্যে যে রকম একরোখা হয়ে তারা লড়াই করেছে দন ফৌজের সেনাপতিমণ্ডলীর কোন ফন্দি ফিকিরই আর ওদের সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারল না। অথচ ওই অংশে প্রতিপক্ষের তুলনায় ওদের বাহিনী ছিল বেশি শক্তিশালী। লড়াইয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এখন নয় নম্বর রেড আর্মির সম্বল মাত্র ১১০০ জন সঙীনধারী পদাতিক সৈন্য, ৫০০০ জন তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার আর ৫২টি তোপ। এদিকে কসাকদের আছে মোট ১৪৪০০ জন সঙীনধারী পদাতিক, ১০৬০০ জন তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার, আর তাদের কামানের সংখ্যাও ৫৩টি।

একটু আধটু বেশি যা তৎপরতা তা পাশের দিকগুলোতে - বিশেষত স্বেচ্ছাসেবী দক্ষিণ কুবান ফৌজের ইউনিটগুলো যেখানে সক্রিয়। একই সঙ্গে জেনারেল রাঙ্গেলের পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর একটা অংশ ইউক্রেনের অনেকখানি ভেতরে ভালো ভাবে এগিয়ে যেতে থাকায় ১০ নম্বর লাল ফৌজের ওপর জোর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। লাল ফৌজের ওই অংশকে কোণঠাসা ক'রে দিয়ে ভয়ঙ্কর লড়াই করতে করতে তারা এগিয়ে চলেছে সারাতভের দিকে। ২৮শে জুলাই তারিখে কুবান ঘোড়সওয়ার বাহিনী কামিশিনের একেবারে কাছ ঘেঁসে চলে এলো, সেখানকার প্রতিরক্ষায় যারা ছিল তাদের একটা বড় অংশকে বন্দী করল। দশ নম্বর আর্মি যে পাল্টা-আক্রমণের উদ্যোগ নিয়েছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হল। দুঃসাহসিক কৌশল খাটিয়ে কুবান-তেরেক মিলিত ঘোড়সওয়ার ডিভিশন ঘুরে দশ নম্বর ফৌজের বাঁ পাশে চলে আসায় বিপদ সূচনা করল। ফলে তাদের বাহিনীর

কর্তৃপক্ষ ইউনিটগুলোকে বর্জেন্‌কোভো - স্যাতিশেভো - লাল দরী - কামেন্‌কা-বাখোয়ে লাইনে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। ইতিমধ্যে দশ নম্বর ফৌজের সেনাবল ১৮০০০ পদাতিক, ৮০০০ ঘোড়সওয়ার আর ১৩২টি তোপে দাঁড়িয়েছে; বিরুদ্ধপক্ষ স্বেচ্ছাসেবী কুবান বাহিনীর সেনাবল তখন ৭৬০০ পদাতিক, ১০৭৫০ ঘোড়সওয়ার, সেই সঙ্গে ৬৮টি কামান। এছাড়াও শ্বেতরক্ষীদের ছিল ট্যাঙ্ক বাহিনী। তাদের হাতে বেশ কিছু সংখ্যক এরোপ্লেনও ছিল যা দিয়ে ওরা নজর রাখার কাজ চালাত, আবার সরাসরি লড়াইও চালাত। কিন্তু ফরাসী বিমান, ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক, কামান - কোনটাই ব্রাঙ্গেলের কোন কাজে এলো না। কামিশিন ছাড়িয়ে সে আর এগোতে পারল না। এই অংশে একটানা, তুমুল লড়াই চলল। কিন্তু তাতে ফ্রন্ট লাইনের তেমন একটা হেরফের হল না।

জুলাইয়ের শেষে লাল ফৌজ দক্ষিণ ফ্রন্টের সমগ্র কেন্দ্রীয় এলাকা জুড়ে ব্যাপক আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। ত্রথস্কির পরিকল্পনা অনুযায়ী এই উদ্দেশ্যে নয় নম্বর আর দশ নম্বর আর্মিকে মিলিয়ে শোরিনের পরিচালনায় ঝটিকা আক্রমণের একটি দল গড়া হল। পুবের ফ্রন্ট থেকে স্থানান্তরিত ইউনিটগুলো, অর্থাৎ আঠাশ নম্বর ডিভিশন আর সেই সঙ্গে এক কালের সুরক্ষিত কাজান এলাকার একটি ব্রিগেড এবং পঁচিশ নম্বর ডিভিশন আর সুরক্ষিত সারাতভ এলাকার একটি ব্রিগেড সেই দলের মজুত শক্তি হিশেবে মোতায়েন থাকল। এছাড়াও দক্ষিণ ফ্রন্টের সামরিক কর্তৃপক্ষ ফ্রন্টের মজুত শক্তি হিশেবে রাখা বাহিনী আর ৫৬ নম্বর পদাতিক ডিভিশন দিয়ে ঝটিকা আক্রমণের দলটিকে জোরদার করল। এই আক্রমণে মদত দেওয়ার জন্য আট নম্বর আর্মি পুবের ফ্রন্ট থেকে তুলে এনে তার সঙ্গে যুক্ত ৩১ নম্বর পদাতিক ডিভিশন আর সাত নম্বর পদাতিক ডিভিশনের সাহায্যপুষ্ট হয়ে ভরোনেজের দিকে আঘাত হানবে বলে ঠিক করা হয়েছিল।

মূল আক্রমণে নামার কথা ছিল পয়লা থেকে দশই আগস্টের মধ্যে। লাল ফৌজের প্রধান সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনা অনুযায়ী আট নম্বর আর নয় নম্বর আর্মির আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ব্যূহগুলোরও তৎপরতা শুরু হয়ে যাবার কথা। এই ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্ব পড়ল দশ নম্বর আর্মির ওপর। তার ওপর দায়িত্ব ছিল দনের বাঁ তীরে তৎপরতা চালিয়ে উত্তর ককেশাস থেকে প্রতিপক্ষের মূল শক্তির গতিপথ রুদ্ধ করা। পশ্চিমে ১৪ নম্বর আর্মি, একটা অংশের ওপর ভার পড়েছিল চাপলিনো - লোজোভায়া লাইনের দিকে মহা উৎসাহে লোক দেখানো আক্রমণ চালানো।

নয় নম্বর ও দশ নম্বর আর্মির অংশগুলোতে যখন নতুন ক'রে ঢেলে সৈন্য সাজানো হচ্ছে তখন শ্বেতরক্ষিবাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীও প্রতিপক্ষের আক্রমণ-

প্রস্তুতিকে বানচাল ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জেনারেল মামন্তভের ক্যাভাল্‌রী কোর গড়ে তোলার কাজ শেষ করল। তাদের আশা ছিল ফ্রন্টে ভাঙন ধরিয়ে কোরটাকে লাল ফৌজের অনেকখানি পেছনের এলাকায় ঢুকিয়ে দিয়ে হামলা চালাতে পারবে। ত্‌সারিত্‌সিন অংশে ব্রাঙ্গেলের বাহিনীর সাফল্যের ফলে সেই বাহিনীর ফ্রন্ট বাঁ দিকে বাড়ানো সম্ভব হল। তাইতে দন আর্মির ফ্রন্ট অনেকটা ছোট হয়ে এলো। সেখান থেকে কিছু সংখ্যক ঘোড়সওয়ার ডিভিশনও আক্রমণের জন্য পাওয়া গেল। আগস্টের ৭ তারিখে উরিউপিনস্কায়া জেলায় ছয় হাজার তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার সৈন্য, দু'হাজার আট শ' সঙীনধারী পদাতিক আর তিনটি চার কামানওয়ালা গোলন্দাজ দলের সমাবেশ ঘটল। এদিকে দশ তারিখে জেনারেল মামন্তভের পরিচালনায় নতুন করে ঢেলে সাজানো দলটি আট নম্বর আর নয় নম্বর লাল ফৌজের সন্ধিস্থলে ভাঙন ধরিয়ে নোভোখোপিওর্স্ক থেকে তাম্বভের দিকে রওনা দিল।

শ্বেতরক্ষীদের সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক ছিল লাল ফৌজের পেছনের দিকে জেনারেল মামন্তভের কোর ছাড়াও, জেনারেল কনোভালভের ক্যাভালরী কোরও হামলা চালাবে। কিন্তু কনোভালভের কোর্-এর ইউনিটগুলো যে অংশ দখলে রেখেছিল সেখানে লড়াই শুরু হয়ে যাওয়ায় ফ্রন্ট থেকে তাদের সরিয়ে আনা সম্ভব হল না। মামন্তভের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব এই কারণেই সীমাবদ্ধ প্রকৃতির ছিল। তার ওপর সনির্বন্ধ নির্দেশ ছিল যেন কোন বাড়াবাড়ি না করে, মস্কোর দিকে এগোনোর কথা স্বপ্নেও না ভাবে। তার কাজ হবে শত্রুপক্ষের পেছনের অংশে বিভীষিকা সৃষ্টি ক'রে, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা তছনছ ক'রে দিয়ে ফের মূল বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মেলা। অথচ গোড়ায় তার আর কনোভালভের ওপর হুকুম ছিল তারা যেন পুরো ঘোড়সওয়ার ফৌজ নিয়ে লালদের কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশে আর পেছনে প্রচণ্ড আঘাত হানে। পরে একেবারে ডবল মার্চ ক'রে তারা রাশিয়ার গভীরে ঢুকে যাবে, জনসাধারণের ভেতর থেকে সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবাপন্ন লোকজন জুটিয়ে তাদের দিয়ে বাহিনীকে জোরদার ক'রে মস্কো পর্যন্ত অভিযান টেনে নিয়ে যাবে।

মজুত সেনাবলের সহায়তায় আট নম্বর আর্মি তার বাঁ পাশের অবস্থা সামাল দিয়ে উঠল। কিন্তু নয় নম্বর আর্মির ডান পাশ আরও বেশি শোচনীয় হয়ে উঠল। প্রধান ঝটিকা দলের কম্যাণ্ডার শোরিন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল বলে দুই বাহিনীরই পাশগুলোর ভেতরের ফাঁক বুজিয়ে দেওয়া সম্ভব হল বটে, কিন্তু মামন্তভের ঘোড়সওয়ারদের আটকানো গেল না। শোরিনের নির্দেশে মামন্তভের সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলা করার জন্য কির্সানভ এলাকা থেকে ৫৬ নম্বর রিজার্ভ

ডিভিশনকে পাঠানো হল। গাড়ি বোঝাই ক'রে সাম্‌পুর স্টেশনে পাঠানো তার একটি ব্যাটেলিয়ন মামন্তভের কোর্‌-এর এক পাশের এক দলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তাম্বোভ-বালাশোভ রেলপথের অংশকে আড়াল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩৬ নম্বর পদাতিক ডিভিশনের যে ক্যাভালরী ব্রিগেড পাঠানো হয়েছিল তারও ওই একই হাল হল। মামন্তভের বিপুল ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সামনে পড়ে সামান্য লড়াইয়ের পর ব্রিগেডটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

আঠারোই আগস্ট মামন্তভ তড়িৎগতিতে হানা দিয়ে তাম্বোভ দখল ক'রে ফেলল। কিন্তু সে জন্য শোরিনের ঝটিকা দলের মূল অংশের পক্ষে আক্রমণ শুরু করতে কোন অসুবিধা হয় নি, যদিও মামন্তভের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য দল থেকে প্রায় দুটো পদাতিক ডিভিশন ছেড়ে দিতে হয়েছিল। একই সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রন্টের ইউক্রেন অংশেও আক্রমণ শুরু করা হল।

ফ্রন্ট লাইন উত্তরে আর উত্তর-পূর্বে স্তারি ওস্কোল থেকে বালাশোভ পর্যন্ত প্রায় সরল রেখায় ছড়িয়ে ত্সারিত্‌সিনের দিকে একটু স্ফীত হয়ে চলে গিয়েছিল। এখন রেখাটা সোজা হয়ে আসতে লাগল। প্রতিপক্ষের শক্তিপ্রাধান্যের চাপে পড়ে কসাক রেজিমেন্টগুলো দক্ষিণ দিকে পিছু হটতে লাগল। পিছু হটার সময় ঘন ঘন পাল্টা আক্রমণ চালাতে লাগল। দনের মাটিতে ফিরে আসার পর তারা আবার ফিরে পেল তাদের হারানো যুদ্ধক্ষমতা। পল্টন ছেড়ে ফেরার হওয়ার ঘটনা একেবারে কমে গেল। মধ্য দনের জেলাগুলো থেকে নতুন নতুন সৈন্য আসতে থাকায় দল ভারী হতে লাগল। শোরিনের বাহিনী যত বেশি দন ফৌজের এলাকার ভেতরে ঢুকতে থাকে ততই জোরাল আর নির্মম হয়ে ওঠে ওদের প্রতিরোধ। দনের উজান এলাকার যে-সমস্ত জেলা বিদ্রোহ করেছিল সেখানকার কসাকরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সভা সমিতি ক'রে পাইকারী হারে সৈন্য সমাবেশের কথা ঘোষণা করল। তারা মানত করল, কালবিলম্ব না ক'রে ফ্রন্টে রওনা দিল।

অবিরাম লড়াই ক'রে শ্বেতরক্ষীদের তীব্র প্রতিরোধ ঠেলে খোপিওর আর দনের দিকে এগোতে গিয়ে এবং যেখানকার বেশির ভাগ মানুষ খোলাখুলি লাল ফৌজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এমন একটা জায়গায় এসে পড়ে শোরিনের সেনাদল ধীরে ধীরে আক্রমণের উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে লাগল। ইতিমধ্যে আবার কাচালিন্‌স্কায়া আর কোত্‌লুবান জেলার এলাকায় শ্বেতরক্ষীদের সেনাপতিমণ্ডলী তিনটে কুবান-কোর আর ছয় নম্বর পদাতিক ডিভিশন নিয়ে সামরিক কৌশল চালানোর একটা জোরদার দল গড়ে তুলেছিল। দশ নম্বর রেড আর্মি আক্রমণের গতি বিকাশ ক'রে এগিয়ে আসার ব্যাপারে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছে বলে তার ওপরে আঘাত হানা ছিল এর উদ্দেশ্য।

একুশ

এক বছরের মধ্যে মেলেখভদের পরিবারের লোকসংখ্যা কমে অর্ধেকে এসে দাঁড়াল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একদিন যে বলেছিল যমের কুনজর পড়েছে ওদের বাড়ির ওপর, কথাটা মিথ্যে নয়। নাতালিয়াকে কবর দিতে না দিতেই মেলেখভদের বাড়ির প্রশস্ত বড় ঘরটা আবার শ্রাদ্ধবাসরের ধূপধুনো আর নীল ঝুমকো ফুলের গন্ধে ভরে উঠল। গ্রিগোরি ফ্রন্টে চলে যাবার দিন দশেক পরে দারিয়া মারা গেল দনে ডুবে।

সেদিন শনিবার, মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে দুনিয়াশ্‌কার সঙ্গে সে গিয়েছিল স্নান করতে। একটা আনাজ বাগানের কাছে জামাকাপড় খুলল ওরা, অনেকক্ষণ বসে রইল পায়ে দলা নরম ঘাসের ওপর। সকাল থেকেই দারিয়ার মন মেজাজ ভালো ছিল না। বারবার বলছিল মাথা ধরেছে, কেমন যেন অসুস্থ লাগছে। বার কয়েক গোপনে কাঁদলও। . . . জলে নামার আগে দুনিয়াশ্‌কা মাথার চুল খোঁপা ক'রে তার ওপর ওড়নাটা জড়িয়ে বাঁধল। আড়চোখে দারিয়ার দিকে তাকিয়ে দুঃখ করে বলল, 'কী রোগা হয়ে গেছ গো বৌদি! তোমার রগগুলো যে সব বেরিয়ে পড়েছে!'

'শিগ্‌গিরই সেরে উঠব রে।'

'মাথার ব্যথাটা কি গেছে?'

'হ্যাঁ। আয় আমরা এবারে চান ক'রে নিই। বেলা ত আর কম হল না।' বলতে বলতে সে-ই প্রথম ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। মাথাটা ডুবিয়েই আবার ভেসে উঠল, নাক মুখ ঝাড়া দিয়ে জল বার ক'রে মাঝস্রোতে সাঁতরে চলে গেল। খরস্রোতের মধ্যে পড়ে সে ভেসে চলে যেতে লাগল।

দুনিয়াশ্‌কা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখে পুরুষের মতো লম্বা লম্বা টানে ঝপাঝপ হাত ছুঁড়ে এগিয়ে যাচ্ছে দারিয়া। কোমর জলে নেমে দুনিয়াশ্‌কা গা ধোয়, জলে ভেজায় তার বুক আর রোদে তেতে ওঠা নারীসুলভ সুডৌল সবল দুই বাহু। পাশের আনাজ বাগানে অব্‌নিজভদের বাড়ির দুই বৌ বাঁধাকপির ক্ষেতে জল দিচ্ছিল। ওরা শুনতে পেল দুনিয়াশ্‌কা হাসতে হাসতে ডাকছে দারিয়াকে: 'ফিরে এসো বৌদি! নইলে বোয়াল মাছে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে!'

দারিয়া ফিরে আসে। পাঁচ-ছয় গজ সাঁতরে এসে মুহূর্তের জন্য জলের ওপর কোমর অবধি লাফিয়ে ওঠে, মাথার ওপরে দুটো হাত তুলে জড় ক'রে চেঁচিয়ে বলে, 'ওগো মেয়েরা, চললাম আমি!' তারপর তলিয়ে যায় পাথরের মতো।

মিনিট পনেরো বাদে দুনিয়াশ্‌কা ফেকাসে মুখে সেমিজ মাত্র সম্বল ক'রে ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসে।

'দারিয়া জলে ডুবে গেল মা!' হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে সে বলল।

দারিয়ার লাশ উদ্ধার করা গেল সেই পরের দিন সকালে। মাছ ধরার বড় বড় বঁড়শীলাগানো দড়িদড়ার গোছা ফেলে তাই দিয়ে দেহটা টেনে তোলা হল। বুড়ো আর্খিপ পেস্কোভাত্‌স্কভ তাতারস্কির সবচেয়ে পাকা জেলে। দারিয়া যে জায়গায় ডুবেছিল সেখানে স্রোতের মুখে একটু নীচের দিকে ভোরবেলায় সে ছয়খানা বঁড়শীসুদ্ধ দড়ির কিনারা পেতে রেখেছিল। পরে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে সঙ্গে নিয়ে ওগুলো দেখতে গেল। পারে ছেলেপুলে আর মেয়েদের ভিড় জমে গেছে। তাদের মধ্যে দুনিয়াশ্‌কাও ছিল। আর্খিপ যখন দাঁড়ের হাতল দিয়ে চতুর্থ দড়িটা ধরে টান দিল, তারপর নৌকো চালিয়ে ডাঙা থেকে বিশ গজখানেক ভেতরে এগিয়ে গেল তখন দুনিয়াশ্‌কা পরিষ্কার শুনতে পেল সে চাপা গলায় বলছে, 'এখেনেই আছে বলে মনে হচ্ছে।...' বুড়ো আরও সন্তর্পণে দড়ি গোটাতে থাকে। দড়িটা জলের একেবারে তলায় চলে গিয়েছিল, তাই দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যে টানতে তাকে বেশ জোর খাটাতে হচ্ছে। এর পর ডান পারের কাছে সাদা মতো কী যেন একটা ভেসে উঠল। দুই বুড়োই ঝুঁকে পড়ল জলের ওপর। নৌকো কাত হয়ে যেতে খানিকটা জলও উঠল। নির্বাক নিস্তব্ধ জনতার কানে পৌঁছুল থপ্‌ করে একটা দেহ নৌকোয় তোলার ভারী শব্দ। সবাই একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মেয়েদের মধ্যে কে একজন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল খ্রিস্তোনিয়া। কড়া গলায় বাচ্চাদের ধমক দিয়ে সে বলল, 'এই, তোরা সব গেলি এখান থেকে!' চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দুনিয়াশ্‌কা দেখতে পেল আর্খিপ গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে নিপুণ হাতে নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসছে পারের দিকে। পারের কাছে খড়ি মাটির পলি ভেঙে কড়কড় আওয়াজ তুলে শেষকালে ঘ্যাস করে মাটিতে এসে ঠেকল নৌকোটা। নৌকোর ভিজে খোলে গাল ঠেকিয়ে পড়ে আছে দারিয়ার নিষ্প্রাণ দেহ, হাঁটুদুটো গোটানো। তার ফর্সা দেহটা সামান্য নীলচে হয়ে এসেছে, তাতে কেমন যেন একটা গাঢ় নীল আভা ধরতে শুরু করেছে সবে। এখানে ওখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বঁড়শী বেঁধার গভীর দাগ। পায়ের মোজা বাঁধার ফিতেটা যেমনকার তেমন রয়ে গেছে – স্নান করার আগে নিশ্চয়ই খুলতে ভুলে গিয়েছিল। ফিতের কাছাকাছি, হাঁটুর একটু নীচে, তামাটে রঙের রোগা পায়ের ডিমের ওপরে একটা টাটকা ছড়ে যাওয়ার গোলাপী দাগ – অল্প অল্প রক্তও বেরোচ্ছে সেখান থেকে। বঁড়শীর মুখটা পায়ের ওপর লেগে পিছলে গিয়ে একটা বাঁকা ছেঁড়ার দাগ রেখে গেছে।

বুকের সামনের আঁচলখানা হাতের মুঠোয় ডেলা পাকিয়ে ধরে বিকারগ্রস্তের মতো কাঁপতে কাঁপতে দুনিয়াশ্‌কাই প্রথম এগিয়ে গেল দারিয়ার দিকে, সেলাই-খোলা একটা থলি দিয়ে ঢেকে দিল তাকে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভীষণ ব্যস্তসমস্ত হয়ে সালোয়ার গুটিয়ে নৌকোটাকে শুকনো মাটিতে টেনে তুলতে লাগল। খানিক পরেই গাড়ি এসে গেল। দারিয়াকে মেলেখভদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল।

ভয় আর ঘেন্নার ভাব কাটিয়ে উঠে দুনিয়াশ্‌কা দারিয়ার ঠাণ্ডা লাশটাকে স্নান করাতে সাহায্য করল মাকে। দনের গভীর তলদেশের স্রোতধারার হিম যেন লেগে রয়েছে তার গায়ে। দারিয়ার সামান্য ফুলে ওঠা মুখে আর জলে ধোওয়া বিবর্ণ চোখের ম্রিয়মাণ ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা অপরিচিত, কঠিন। ওর চুলের ভেতরে চিকচিক করছে রুপোলী বালিকণা, গালে ভিজে সুতোর মতো লেগে আছে জলের গাঢ় সবুজ শেওলা। দু'পাশে ছড়ানো হাতদুটো বেঞ্চি থেকে এমন অসহায় ভাবে ঝুলে আছে, সেই ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা ভয়ঙ্কর প্রশান্তির আভাস যে সেদিকে চোখ পড়তেই দুনিয়াশ্‌কা তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যে দারিয়া এই সেদিনও হাসিঠাট্টা করেছিল, জীবনকে এত ভালোবাসত তার সঙ্গে এই মৃত দারিয়ার এত অমিল দেখে অবাক হয়ে যায়, ভয়ে চমকে ওঠে দুনিয়াশ্‌কা। এরপরও দারিয়ার স্তন আর পেটের পাথরের মতো কঠিন শীতলতা, তার শক্ত আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের টান টান ভাবটা মনে করে অনেক দিন পর্যন্ত দুনিয়াশ্‌কার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠত, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সব কিছু ভোলার চেষ্টা করত। ওর ভয় হত দারিয়ার মরা চেহারাটা রাতের পর রাত ঘুমের মধ্যে দেখা দেবে। তাই সপ্তাহখানেক সে ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে এক বিছানায় শুল। শোয়ার আগে রোজ সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে, মনে মনে তাঁর কাছে মিনতি জানিয়েছে, 'হে ভগবান! ও যেন স্বপ্নে আমায় দেখা না দেয়। হে ভগবান, আমাকে রক্ষে কর।'

অব্‌নিজভদের বাড়ির দুই বৌ সেই যে শুনে ফেলেছিল দারিয়ার চিৎকার: 'ওগো মেয়েরা চললাম!' – তারা যদি সে কথা গল্প ক'রে বলে না দিত তাহলে নির্ঝঞ্ঝাটে চুপচাপ ওর সৎকার হয়ে যেত। কিন্তু পাদ্রী ভিস্‌সারিওন যখন জানতে পারলেন ওর এই শেষ চিৎকারের কথা, যার স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় দারিয়া আত্মহত্যা করেছে, তখন তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে আত্মঘাতিনীর সৎকার তিনি করতে পারবেন না। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খেপে উঠল।

'কেন, করবে না কেন? ওর কি ধর্মে দীক্ষা হয় নি?'

'আত্মঘাতিনীর কবর আমি দিতে পারব না। আইনের নিষেধ আছে।'

'তাহলে ওর কবর হবে কী ভাবে? বলতে চাও, কুকুরের মতো?'

'আমি বলতে চাই, যে ভাবে খুশি, যেখানে তোমার খুশি - কিন্তু গোরস্থানে চলবে না - সেখানে সৎ খ্রীষ্টানদের কবর আছে।'

'দোহাই তোমার, পায়ে পড়ি!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ এবারে অনুনয় বিনয় শুরু করে দেয়। 'এমন লজ্জার ব্যাপার আমাদের পরিবারে আর কখনও হয় নি।'

'ও আমার দ্বারা হবে না, পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। একজন আদর্শ ধর্মভীরু যজমান বলে তোমায় ভক্তিশ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি পারব না। বড় সেবাইতের কানে গেলে আমার বিপদ এড়ানোর কোন উপায় নেই।' পাদ্রী গোঁ ধরে থাকে।

অপমান আর কাকে বলে! পাদ্রীর গোঁ ভাঙার কত রকম চেষ্টাই না পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ করল! কথা দিল আরও বেশি ক'রে দক্ষিণা দেবে, নিকোলাই মার্কা খাঁটি চাঁদির টাকা দেবে। এমন কি একটা কচি ভেড়ার বাচ্চাও ভেট দিতে চাইল। শেষকালে এত সাধাসাধিতেও কোন কাজ হল না দেখে বুড়ো হুমকির আশ্রয় নিল।

'গির্জের গোরস্থানের বাইরে আমি ওকে কবর দিতে যাচ্ছি নে। ও আমার এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো রাস্তার মেয়ে নয়। আমাদের বাড়ির বৌ। ওর স্বামী লালদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে, একজন অফিসার ছিল। ও নিজে সেন্ট জর্জ মেডেল পেয়েছিল। আর তুমি কিনা আমায় আজেবাজে কথা শোনাচ্ছ। না ঠাকুরমশাই ওটি চলবে না, আমার মান সম্মান বজায় রেখে ওকে কবর দিতে হবে! যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ ও ঘরেই পড়ে থাক, আর আমি এই ফাঁকে চট করে জানিয়ে দিয়ে আসি জেলা-সদরের আতামানকে। তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলবেন!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ নমস্কার না জানিয়েই পাদ্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। মেজাজটা এত চড়ে গিয়েছিল যে বের হওয়ার সময় দড়াম করে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তবে হুমকিটা কাজে দিল। আধ ঘণ্টা বাদে পাদ্রীর কাছ থেকে একজন লোক এসে জানিয়ে গেল যে ফাদার ভিস্‌সারিওন তার সহকারীকে নিয়ে এখনই আসছেন।

দারিয়াকে বিধিমতো গোরস্থানে পেত্রোর পাশেই কবর দেওয়া হল। কবর খোঁড়ার সময় নিজের কবরের জন্যও একটা জায়গা পছন্দ হয়ে গেল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের। কোদাল চালাতে চালাতে আশপাশটা চেয়ে দেখতে দেখতে তার মনে হল এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হতে পারে না, খোঁজার কোন অর্থও হয় না। পেত্রোর কবরে এই সেদিন যে পপ্‌লার গাছটা পোঁতা হয়েছিল তার কচি ডালপালা কবরের মাথার ওপর সরসর আওয়াজ তুলছে। ইতিমধ্যেই আসন্ন শরতের ম্রিয়মাণ বিষণ্ণ হলদে রঙের ছোপ লেগেছে গাছটার মাথায়। ভাঙা

বেড়া দিয়ে ভেতরে ঢুকে কবরগুলোর মাঝখান দিয়ে বাছুরের দল তাদের চলার পথ করে নিয়েছে। বেড়ার কাছ ঘেঁষে রাস্তা চলে গেছে হাওয়া কলের দিকে। মৃতদের আত্মীয়স্বজনের সযত্ন হাতে পোঁতা গাছগুলো – ম্যাপল, বনঝাউ আর বাবলা জাতীয় গাছপালা, সেই সঙ্গে বুনো কাঁটাগাছও – সতেজ সবুজ হয়ে উঠে স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের কাছাকাছি পাকিয়ে পাকিয়ে উদ্দাম গতিতে গজিয়ে উঠেছে স্বর্ণলতা, জ্বলজ্বল করছে দেরিতে ফোটা হলুদ ফুল, শীষ তুলে দাঁড়িয়েছে বুনো জই, দানার ভারে নুইয়ে পড়েছে শ্যামাধান। ক্রুশগুলো দাঁড়িয়ে আছে আপাদমস্তক নীল লতার সাদর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে। জায়গাটা সত্যি সত্যি বড় আনন্দের। আর শুকনোও।

বুড়ো কবর খুঁড়তে খুঁড়তে মাঝে মাঝে কোদাল রেখে ভিজে কাদামাটির ওপর বসে তামাক খাচ্ছিল আর ভাবছিল মৃত্যুর কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সময়টা বড় বেয়াড়া – বুড়োরা যে শান্তিতে নিজেদের ভিটেতে মরবে এবং যে মাটিতে তাদের বাপ ঠাকুর্দা শেষ শয্যা নিয়েছে সেখানে আশ্রয় নেবে সে দিনকাল আর নেই। . . .

দারিয়ার কবর হয়ে যাওয়ার পর মেলেখভদের বাড়িটা আরও নিঝুম হয়ে গেল। ওরা ফসল গাড়িতে করে আনে, মাড়াইয়ের উঠোনে কাজ করে, তরমুজ ক্ষেত থেকে প্রচুর তরমুজ তোলে। গ্রিগোরির কাছ থেকে খবরের প্রত্যাশায় থাকে, কিন্তু গ্রিগোরি সেই যে ফ্রন্টে চলে গেল তার পর থেকে ওর আর কোন খবরই নেই। ইলিনিচ্না বেশ কয়েকবার বলেছিল, 'বাচ্চাদের কোন খোঁজখবর পর্যন্ত করে না হতভাগাটা! বৌ মরেছে, এখন আর আমাদের কাউকে দরকার নেই ওর। . . .' এরপর আরও ঘন ঘন কসাক সেপাইরা দেখাসাক্ষাতের জন্য গ্রামে আসতে থাকে। গুজব চলতে থাকে যে বালাশোভ ফ্রন্টে কসাকরা মার খেয়েছে, এখন তারা পিছু হটছে দনের দিকে। তাদের আশা সেখানে জলা জায়গার আড়ালে মাথা বাঁচিয়ে শীতকাল পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিন্তু শীতকালে যে কী হবে সে সম্পর্কে কোন রাখঢাক না করেই লড়াই ফেরতা সকলে বলাবলি করে: 'দন যেই জমে বরফ হয়ে যাবে অমনি লালেরা আমাদের ধাওয়া করবে, সোজা সাগরে ঠেলে নিয়ে যাবে!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মহা উৎসাহে মাড়াইয়ের কাজ করে চলেছে। দেখে মনে হয় দনের উপকূল এলাকায় যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে তাতে বিশেষ আমল সে দিচ্ছে না। কিন্তু যা ঘটছে সে সম্পর্কে উদাসীন থাকাও সম্ভব নয়। আরও বেশি করে সে ইলিনিচ্না আর দুনিয়াশ্‌কাকে বকাঝকা করতে থাকে। ফ্রন্ট এগিয়ে আসছে জানতে পেরে মেজাজ আরও রুক্ষ হয়ে উঠেছে তার। প্রায়ই ঘর

গেরস্থালির এটা ওটা বানানো বা মেরামতের কাজে সে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু হাতের কাজে একটু গোলমাল হয়ে গেলেই চটে গিয়ে কাজ ছেড়ে দেয়। থুতু ফেলে, গালিগালাজ করতে করতে মাড়াই-উঠানে ছুটে যায়, সেখানে গিয়ে মনের জ্বালা জুড়োয়। দুনিয়াশ্‌কা একাধিকবার এরকম ক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখেছে তার বাপকে। একদিন পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ একটা জোয়াল ঠিক করতে বসেছিল। কাজে ঠিক জুত পাওয়া যাচ্ছিল না, হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গিয়ে বুড়ো একটা কুড়োল তুলে নিয়ে জোয়ালটাকে কুপিয়ে কুপিয়ে স্রেফ চেলাকাঠ বানিয়ে ছাড়ল। সেই একই কাণ্ড হল ঘোড়ার জোয়ালের গলবন্ধনী মেরামত করতে গিয়ে। সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপের আলোয় চামড়া সেলাইয়ের সুতো পাকিয়ে নিয়ে ঘোড়ার গলবন্ধনীর ছিঁড়ে যাওয়া সেলাইটা জুড়তে শুরু করেছিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। সুতো পচা ছিল বলেই হোক কিংবা বুড়ো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল বলেই হোক পর পর দু'বার পটপট ক'রে ছিঁড়ে গেল। ব্যস, আর যায় কোথায়! ভীষণ গালিগালাজ করতে করতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল জায়গা ছেড়ে। জলচৌকিটা উলটে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল চুল্লীর কাছে, তারপর কুকুরের মতো গরগর ক'রে ডাক ছাড়তে ছাড়তে দাঁত দিয়ে গলবন্ধনীর চামড়ার আস্তরখানা ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে লাগল। শেষকালে মোরগের মতো লাফঝাঁপ দিয়ে সেটাকে পায়ে মাড়াতে লাগল। ইলিনিচ্‌না সকাল সকাল শুতে গিয়েছিল। গোলমাল শুনে ভয়ে ধড়মড় ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কিন্তু কাণ্ডকারখানা দেখে সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না। এক ধমক লাগিয়ে দিল বুড়োকে।

'হতচ্ছাড়া মিনসে! বুড়ো হয়ে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল নাকি? গলার বাঁধনটা তোমার কী ক্ষতি করেছে বল ত?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ক্ষিপ্ত চোখদুটো পাকিয়ে তাকাল গিন্নির দিকে, গর্জন ক'রে উঠল।

'চো-ও-প! হারামজাদী!' বলেই গলবন্ধনীর একটা ছেঁড়া টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল বুড়ির দিকে।

হাসি চাপতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল দুনিয়াশ্‌কার। বুলেটের মতো সাঁ ক'রে ছুটে সে বেরিয়ে গেল বার-বারন্দায়। এদিকে বুড়ো খানিকটা দাপাদাপি ক'রে শেষকালে ঠাণ্ডা হয়ে এলো। রাগের মাথায় গিন্নিকে যা নয় তাই বলে ফেলেছিল, তাই ক্ষমা চাইল। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোঁত ঘোঁত করল। অলক্ষুণে গলবন্ধনীটার ছেঁড়া টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মনে মনে ভাবল ওগুলো এখন আর কোন্‌ কাজে লাগবে? রাগে এরকম মাথা

গরম তার প্রায়ই হতে থাকে। কিন্তু ইলিনিচ্না তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, বুড়োকে বাধা দেওয়ার অন্য একটা উপায় খুঁজে পেয়েছে সে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যেই রাগে অন্ধ হয়ে গালিগালাজ ওগড়াতে ওগড়াতে ঘরের কোন দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস ভাঙতে শুরু করে অমনি বুড়ি শান্ত ভাবে অথচ বেশ গলা উঁচিয়েই বলে, 'ভাঙো, ওগো যত খুশি ভাঙো। আরেকটা যোগাড় ক'রে নেবার মতো সাধ্যি কি আর আমাদের হবে না?' এমন কি ধ্বংসলীলায় তার সঙ্গে হাতও লাগায়। এতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মুহূর্তের জন্য ফ্যালফ্যাল ক'রে গিন্নির দিকে তাকায়, কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট হাতড়ায়। শেষকালে তামাকের বটুয়াটা খুঁজে পেয়ে হতভম্ব হয়ে এক কোনায় কোথাও বসে পড়ে তামাক ধরিয়ে বিপর্যস্ত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করার চেষ্টা করে, নিজের রগচটা স্বভাবের জন্য মনে মনে নিজেকে শাপশাপান্ত করে আর লোকসানের হিসাব কষতে থাকে। একবার একটা ছয় মাসের শুয়োরছানা আনাজ বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে পড়তে বুড়োর অসংযত রাগের শিকার হল সেটা। বেড়ার একটা খুঁটির ঘায়ে শুয়োরছানাটার পিঠই ভেঙে দিল সে। মিনিট পাঁচেক বাদে সেটা কাটা হওয়ার পর একটা গজাল দিয়ে লোম ছাড়াতে ইলিনিচ্নার হাঁড়িমুখের দিকে চেয়ে কাচুমাচু হয়ে খানিকটা খোশামোদের সুরে বলল, 'আরে এই শুয়োরের বাচ্চাটাই যত অনর্থের মূল। শয়তানের ধাড়ি, টাঁসাই উচিত ছিল ওটার। বছরের এই সময়টাতেই ত যত রাজ্যের মড়ক লাগে ওদের। তা থাক গে, এখন অন্তত আমাদের পেটে যাবে। নইলে খামোকাই যেত। ঠিক বলি নি গো? আরে অমন আষাঢ়ের মেঘের মতো মুখ করে আছ কেন? জাহান্নামে যাক হতভাগা শুয়োর! তাও যদি শুয়োরের মতো শুয়োর হত। নামেই শুয়োরের বাচ্চা। খোঁটা দিয়ে কেন, শিকনি ঝেড়েই মেরে ফেলা যেত ওটাকে। কী পাজীর পাঝাড়া! গোটা চল্লিশেক আলুর ঝাড় উপড়ে ফেলেছে গো!'

'হুঃ তোমার ওই আলুর গাছই ত বাপু সারা আনাজ বাগানে তিরিশটার বেশি ছিল না,' মৃদু গলায় শুধরে বলল ইলিনিচ্না।

'ওই হল। যদি চল্লিশটা থাকত তাহলে চল্লিশটাই তছনছ ক'রে দিত – এমনই নচ্ছাড় ওটা! ভগবানের দয়ায় আমরা রেহাই পেয়ে গেছি অমন শত্তুরের হাত থেকে!' না ভেবেচিন্তেই জবাব দিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

বাপ বিদায় নেওয়ার পর ছেলেমেয়েরা মনমরা হয়ে থাকে। ইলিনিচ্না ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই ওদের দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারে না। ওরাও নিজের মনে সারাদিন বাগানে বা মাড়াই উঠোনের কোথাও খেলা করে। একদিন দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর মিশাত্কা উধাও হয়ে গেল। ফিরে

যখন এলো ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে। কোথায় ছিল ইলিনিচ্‌নার এই প্রশ্নের উত্তরে মিশাত্‌কা বলল যে সে দনের ধারে অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে খেলছিল। কিন্তু পলিউশ্‌কা সঙ্গে সঙ্গে সব ফাঁস করে দিল।

'মিছে কথা বলছে ঠাম্মা। আক্সিনিয়া মাসীর কাছে গিয়েছিল।'

'তুই কী ক'রে জানিস?' খবরটায় যেমন বিরক্ত তেমনি আশ্চর্য হয়ে ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করল।

'আমি ওকে ওদের বাড়ির উঠোনের বেড়া ডিঙিয়ে আসতে দেখেছি।'

'সত্যি সেখানে ছিলি তাহলে? বল্ সোনা আমার! অমন লাল হয়ে উঠলি কেন?'

মিশাত্‌কা ঠাকুমার চোখে চোখ রেখে উত্তর দিল, 'আমি তোমায় সত্যি বলি নি ঠাম্মা।... আমি দনের ধারে যাই নি, আক্সিনিয়া মাসীর কাছে ছিলাম।'

'কেন ওখানে গিয়েছিলি?'

'আমায় ডেকেছিল, তাই গিয়েছিলাম।'

'তাহলে মিথ্যে ক'রে বললি কেন যে জেলেদের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলি?'

মিশাত্‌কা মুহূর্তের জন্য মাথা হেঁট ক'রে রইল পরে খুদে খুদে অকপট চোখদুটো তুলে ফিসফিস ক'রে বলল, 'তুমি বকা দেবে, তাই ভয় পেয়েছিলাম।'

'বকা দিতে যাব কেন রে? না না।... কিন্তু ডেকেছিল কেন? কী করছিলি তুই ওর ওখানে?'

'কিছুই না। আমায় দেখে চেঁচিয়ে বললে, 'আয় না আমার কাছে।' আমি কাছে যেতে আমায় ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল, চেয়ারে বসাল।...'

'তারপর?' মনে যে উত্তেজনার ঝড়টা উঠছিল কৌশলে সেটা গোপন ক'রে অধৈর্যভরে জানতে চাইল ইলিনিচ্‌না।

'ঠাণ্ডা সরা পিঠে খেতে দিলে। তারপর এই যে এটাও দিলে,' বলতে বলতে মিশাত্‌কা পকেট থেকে এক টুকরো মিছরি বার ক'রে গর্বভরে দেখাল। আবার পকেটে পুরে ফেলল।

'তোকে কী বলল ও? কিছু জিগ্‌গেস করল কি?'

'বলল আমি যেন মাঝে মাঝে দেখা করতে যাই, নয়ত একা একা বড় খারাপ লাগে ওর। আমাকে জিনিস-টিনিস দেবে বলেছে। আর বলল ওর কাছে যে গিয়েছিলাম কাউকে যেন একথা না বলি। বলল, তোর ঠাকুমা শুনলে আবার বকাবকি করবে।'

'আচ্ছা, তলে তলে এত!' মনের রাগটা কোন রকমে চাপতে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ইলিনিচ্‌না বলে। 'তা তোকে কিছু জিগ্‌গেস করেছিল কি?'

'হ্যাঁ, করেছিল।'

'কী জিগ্‌গেস করেছিল? বল্ না ভাই লক্ষ্মীটি, ভয় পাস নে!'

'জিগ্‌গেস করল বাবার জন্যে আমার মন খারাপ হয় কিনা। আমি বললাম হ্যাঁ মন খারাপ করে। আরও জানতে চাইল বাবা কবে আসবে, তার খবর কী। আমি বললাম, জানি নে। বাবা লড়াই করছে। পরে আমায় কোলে বসিয়ে একটা রূপকথা বললে।' উৎসাহে মিশাত্‌কার চোখদুটো চকচক ক'রে ওঠে। হেসে বলল, 'বেশ গল্প কিন্তু। ভানিয়া নামে একটা ছেলের কথা। হাঁসেরা তাকে পিঠে করে নিয়ে উড়ে গিয়েছিল। ডাইনী বুড়িও আছে আবার।'

ইলিনিচ্‌না ঠোঁট চেপে মিশাত্‌কার কথাগুলো শুনে গেল। শেষকালে কড়া গলায় বলল, 'ওর কাছে আর যেয়ো না দাদুভাই, গিয়ে কাজ নেই। কোন রকম উপহার-টুপহারও নিয়ো না ওর কাছ থেকে। না নেওয়াই ভালো। তোমার দাদু শুনলে কিন্তু আস্ত রাখবে না। ভগবান না করুন তোমার দাদু যদি জানতে পারে তাহলে পিঠের ছালচামড়া তুলে নেবে। আর যাবে না, লক্ষ্মীটি!'

কিন্তু কড়া হুকুম সত্ত্বেও দু'দিন বাদে মিশাত্‌কা ফের গেল আস্তাখভদের বাড়িতে। ইলিনিচ্‌না তা টের পেল মিশাত্‌কার জামার ওপর নজর পড়তে। জামার ছেঁড়া হাতাটা সেদিন সকালে বুড়ি সেলাই করে ওঠার অবকাশ পায় নি। কিন্তু এখন সেটা নিপুণ হাতে রিফু করা। কলারের ওপর ঝকঝক করছে একটা নতুন সাদা ঝিনুকের বোতাম। দুনিয়াশ্‌কা মাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত, তাই তার পক্ষে দিনের বেলায় বাচ্চার জামা রিফু করা যে সম্ভব নয় তা ইলিনিচ্‌নার জানা ছিল। তিরস্কারের সুরে সে জিজ্ঞেস করল, 'আবার পড়শীদের বাড়ি গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ ...' হতভম্ব হয়ে মিশাত্‌কা বলল। পরক্ষণেই যোগ করল, 'আর যাব না ঠাম্মা। তুমি আমায় আর বোকো না। ...'

ইলিনিচ্‌না তখন ঠিক করল আক্সিনিয়ার সঙ্গে কথা বলবে। তাকে সরাসরি জানিয়ে দেবে যে মিশাত্‌কাকে যেন বিরক্ত না করে, এটা ওটা উপহার দিয়ে আর রাজ্যের রূপকথা বলে তার মন ভোলানোর চেষ্টা না করে। মনে মনে ভাবে: 'নাতালিয়াকে পৃথিবী থেকে সরিয়েছে, হতচ্ছাড়ী এখন মতলব করছে একটু একটু করে বাচ্চাগুলোকে ভজানোর, যাতে ওদের হাত ক'রে গ্রিগোরিকে বাগানো যায়। কালসাপিনী আর কাকে বলে। স্বামী বেঁচে থাকতে আমার ছেলের বৌ হতে চায়। ... সে চালাকি খাটবে না। তাছাড়া অমন পাপের পর গ্রিশ্‌কা কি আর ওকে নেবে?'

গ্রিগোরি যখন বাড়িতে এসেছিল তখন যে সে আক্সিনিয়ার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত এই ব্যাপারটা তার চোখে - মায়ের অন্তর্ভেদী আর ঈর্ষাকাতর সতর্ক দৃষ্টিতে ঠিকই পড়েছিল। সে বুঝেছিল গ্রিগোরির এই আচরণের

কারণ লোকনিন্দার ভয় নয়, কারণ এই যে স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য সে আক্সিনিয়াকেই দায়ী মনে করেছিল।

ইলিনিচ্না‌র মনে মনে আশা ছিল যে নাতালিয়ার মৃত্যুতে গ্রিগোরি আর আক্সিনিয়ার মধ্যে চিরকালের মতো বিচ্ছেদ ঘটবে, আক্সিনিয়া কোন দিনই মেলেখভদের পরিবারে স্থান পাবে না।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা দনের ঘাটের কাছে আক্সিনিয়াকে দেখতে পেয়ে ইলিনিচ্না তাকে ডাকল।

'এদিকে এসো ত দেখি, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। . . .'

আক্সিনিয়া বালতি নামিয়ে রেখে শান্ত ভাবে এগিয়ে এসে নমস্কার জানাল।

পড়শীর মুখখানা সুন্দর হলেও ইলিনিচ্নার দু'চক্ষের বিষ। সন্ধানী দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে ইলিনিচ্না শুরু করল, 'পরের ছেলেপুলেকে তোমার অমন টানার চেষ্টা কেন বল ত? ছেলেটাকে কাছে ডেকে নিয়ে ওর সঙ্গে কী এত কথাবার্তা তোমার? কে তোমায় বলেছে ওর জামা রিফু ক'রে দিতে আর এটা-সেটা উপহার দিতে? তুমি কি ভেবেছ ওর মা নেই বলে দেখাশোনা করারও কেউ নেই? তোমাকে ছাড়া চলবে না নাকি? তোমার কি বিবেক বলে কিছু নেই? চক্ষু লজ্জারও কোন বালাই নেই দেখছি!'

'আমি আপনাদের কী ক্ষতি করেছি? আমায় অমন গালাগাল করছেন কেন ঠানদি?' জ্বলে উঠল আক্সিনিয়া।

'কী ক্ষতি মানে? তুমি নিজে নাতালিয়াকে কবরে পাঠিয়েছ, এর পর নাতালিয়ার ছেলেকে ছোঁবার কোন অধিকার তোমার আছে বলতে চাও?'

'আপনি বলছেন কী ঠানদি! একটু বুঝে শুনে কথা বলবেন। কে ওকে কবরে পাঠিয়েছে? নিজেই নিজের মরণের কারণ হয়েছিল।'

'কেন, তোমার জন্যে নয় বলতে চাও?'

'সে আমি জানি নে।'

'কিন্তু আমি জানি!' উত্তেজিত হয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে ইলিনিচ্না।

'চেঁচাবেন না ঠানদি। আমি আপনার ছেলের বৌ নই যে আমার ওপর চোটপাট করবেন। এর জন্যে আমার স্বামী আছে।'

'তোমার হাড়হদ্দ আমার জানা আছে! তোমার মনের ইচ্ছে কি তাও জানি! আমার ছেলের বৌ নও, তবে হওয়ার শখ আছে। প্রথমে ছেলেমেয়েদের পটিয়ে তারপর গ্রিশ্‌কাকে হাত করার মতলব!'

'আপনার ছেলের বৌ হতে আমার বয়েই গেছে। আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারেই লোপ পেয়েছে দেখি ঠানদি। আমার স্বামী বেঁচে আছে।'

'তাহলে আর বলছি কি। জলজ্যান্ত স্বামী থাকতেই ত তাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটাকে ধরার মতলবে আছ।'

আক্সিনিয়া রীতিমতো ফেকাসে হয়ে গিয়ে বলল, 'জানি না আমার ওপর আপনি অমন চোটপাট শুরু ক'রে দিলেন কেন। আমার গায়ে কাদাই বা ছুঁড়ছেন কেন।... কারও ওপরে আমি কখনও জোর খাটাতে যাই নি, সে ইচ্ছেও আমার নেই। আর আপনার নাতিকে আমি যা বলেছিলাম তাতে খারাপটা কী দেখলেন? আপনি নিজেই জানেন যে আমার ছেলেপুলে নেই, পরের ছেলেপুলেদের দেখে আনন্দ পাই। তাতে মনটা একটু হালকা হয়। তাই ওকে ডেকেছিলাম।... কী আর এমন জিনিস ওকে দিয়েছি। দেবার মধ্যে দিয়েছি ত মাত্র এক টুকরো মিছরি। তাকে কি আর কিছু দেওয়া বলে। তাছাড়া এটা ওটা দিয়ে ওকে লোভ দেখিয়ে আমার লাভই বা কী? ভগবান জানেন, আপনি এসব কী আজেবাজে বকছেন!'

'ওর মা বেঁচে থাকতে ওকে ত কখনও ডাক নি। নাতালিয়া যেই মরল অমনি তোমার দরদও উথলে উঠল!'

'নাতালিয়া থাকতেও ও আমার ঘরে অনেকবার এসেছে।' আক্সিনিয়া হাসল। কিন্তু ওর হাসিটা তেমন চোখে পড়ার মতো হল না।

'মিছে কথা বোলো না। নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার।'

'ওকে জিগ্‌গেস করেই দেখুন না, তারপর না হয় আমায় মিথ্যেবাদী বলবেন।'

'সে যা-ই হোক না কেন, আর যেন কখনও ওকে ফুঁসলে ঘরে ডেকে আনার সাহস না হয়। ভেবো না এই ক'রে তুমি গ্রিগোরির মন পাবে। ওর বৌ তোমাকে কখনও হতে হচ্ছে না – এটা তোমার জেনে রাখা ভালো।'

এবারে রাগে আক্সিনিয়ার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। ভাঙা গলায় সে বলল, 'চুপ করলে! তোমার পরামর্শ ও নিতে আসছে না। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না!'

আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল ইলিনিচ্‌নার। কিন্তু আক্সিনিয়া নীরবে ঘুরে চলে গেল বালতির কাছে। ঝট করে বাঁকটা কাঁধের ওপর তুলে নিল, খানিকটা জল চলকে ফেলে তাড়াতাড়ি শুঁড়িপথ ধরে চলে গেল।

এর পর থেকে মেলেখভদের বাড়ির কারও সঙ্গে পথে দেখা হলে সে আর নমস্কার জানায় না। দৃষ্টিকটু ধরনের অহঙ্কারের ভাব নিয়ে নাকের পাটা ফুলিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কিন্তু মিশাত্‌কাকে কোথাও দেখতে পেলে ভয়ে ভয়ে চারপাশ একবার ভালো ক'রে দেখে নেয়, ধারেকাছে কেউ না থাকলে তার কাছে ছুটে আসে, নীচু হয়ে তাকে বুকে টেনে নেয়। মেলেখভ বংশধারার সেই গম্ভীর কালো ছোট ছোট চোখ আর রোদে পোড়া ছোট্ট কালো কপালটায় চুমু খায়,

হেসে কেঁদে অসংলগ্ন ভাবে ফিসফিস ক'রে বলতে থাকে: 'ওরে আমার প্রাণের বাছা, আমার গ্রিগোরির ছেলে! সোনা আমার! তোর জন্যে আমার প্রাণ কাঁদে যে। দেখছিস কী বোকা তোর আক্সিনিয়া মাসীটা! ওঃ কী বোকা!' এরপর অনেকক্ষণ আক্সিনিয়ার ঠোঁটে লেগে থাকে একটা হাসির কাঁপন। বাচ্চামেয়ের মতো খুশিতে ঝলমল করতে থাকে ওর সজল চোখদুটো।

* * *

আগস্টের শেষাশেষি পল্টনে সামিল হতে হল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে। তাতারস্কির যে-সমস্ত কসাক হাতিয়ার ধরতে পারে ওই একই সময়ে তার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সকালে গ্রাম ছেড়ে ফ্রণ্টে চলে গেল। গ্রামে পুরুষদের মধ্যে রয়ে গেল শুধু অক্ষম ও পঙ্গু লোকজন, অল্পবয়সী ছেলেরা আর প্রাচীন বয়োবৃদ্ধের দল। এবারে সৈন্য সমাবেশ হয় পাইকারী হারে। যারা নিঃসন্দেহে পঙ্গু তারা ছাড়া ডাক্তারী কমিশনে একজনও ছাড়া পেল না।

গাঁয়ের মোড়লের কাছ থেকে জমায়েতের জায়গায় হাজির হওয়ার হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তাড়াতাড়ি গিন্নী নাতি-নাতনী আর মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিল। কঁকাতে কঁকাতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে দু'বার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, বিগ্রহের সামনে ক্রুশচিহ্ন এঁকে প্রণাম সেরে বলল, 'এবার চলি তাহলে বাছারা আমার! আর হয়ত আমাদের দেখা হবে না – অন্তত সেই রকমই মনে হচ্ছে। বুঝিবা শেষ সময়ই ঘনিয়ে এলো। যা হোক তোমাদের ওপর আমার বরাত রইল: দিন রাত খেটে ফসল ঝাড়াই মাড়াই কর, বর্ষার আগেই শেষ করার চেষ্টা কোরো। দরকার হলে মুনিষ খাটিও। শরৎকাল নাগাদ যদি না ফিরি ত আমাকে ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিও। যতটা সাধ্যে কুলোয় ততটা জমি চাষ কোরো। রাই বুনবে – অন্তত বিঘে পাঁচেক ত বটেই। দেখো গিন্নি, বুঝেশুনে কাজ চালাবে, হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থেকো না! আমি আর গ্রিগোরি ফিরে আসি আর না-ই আসি, ফসলের দরকার এখন তোমাদের সবচেয়ে বেশি হবে। যুদ্ধ যুদ্ধই, কিন্তু ফসল ছাড়া বাঁচাও কঠিন। যাক, ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন!'

বুড়োর সঙ্গে সঙ্গে ইলিনিচ্না বারোয়ারিতলা অবধি এলো। শেষ বারের মতো তাকিয়ে দেখল খ্রিস্তোনিয়ার পাশাপাশি জোর পা চালিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ির পিছন পিছন চলেছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। তারপর সামান্য ফুলে ওঠা চোখদুটো বুকের আঁচলে মুছে বাড়ির দিকে রওনা দিল, একবারও পিছন

ফিরে তাকাল না। মাড়াই-উঠোনে তার জন্য পড়ে আছে বিছানো গম – অর্ধেক ঝাড়াই করা। উনুনে দুধ চাপানো আছে। ছেলেমেয়েগুলোর সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। বুড়ির আরও অজস্র টুকিটাকি কাজ বাকি। তাই সে রাস্তায় একবারও না থেমে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। পথে কদাচিৎ এক আধজন মেয়েমানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে কথাবার্তার মধ্যে না গিয়ে নীরবে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানায়। নেহাৎ সেরকম চেনাপরিচিত কেউ যখন সমবেদনা জানিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সেপাইকে বিদায় দিয়ে এলে তাহলে?' – তখন জবাবে শুধু মাথা নাড়ে।

* * *

কয়েক দিন বাদে ভোরবেলা গোরু দুইয়ে সেগুলোকে গলির ভেতরে ছেড়ে দেওয়ার পর ইলিনিচ্‌না উঠোনে ফিরতে যাবে, এমন সময় কেমন যেন একটা অস্পষ্ট চাপা গুরু গুরু শব্দ তার কানে এলো। ভালো করে তাকিয়ে দেখার পর আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও দেখতে পেল না। খানিকক্ষণ পরে আবার সেই গর্জন।

বুড়ো রাখাল গোরুর পালকে এক জায়গায় জড় করতে করতে বলল, 'বাদ্যি শুনতে পাচ্ছ ঠাকরুন?'

'কিসের বাদ্যি?'

'ওই যে শুধুই গুড়গুড় আওয়াজ তুলছে।'

'তা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না কিসের হতে পারে।'

'শিগ্‌গিরই টের পাবে। ওই ওপার থেকে যখন গাঁয়ের ওপর এসে পড়তে থাকবে তখনই টের পাবে। কামানের আওয়াজ গো, কামানের আওয়াজ ওটা। আমাদের গাঁয়ের বুড়োদের কাউকে আর আস্ত রাখছে না।'

ইলিনিচ্‌না ক্রুশচিহ্ন এঁকে নীরবে ফটক ঠেলে ভেতরে চলে গেল।

তারপর থেকে চার দিন ধরে একটানা কামানের গর্জন চলল। বিশেষ করে শোনা যায় ভোরবেলায়। উত্তর-পুব কোণ থেকে হাওয়া বইতে শুরু করলে দিনের বেলাতেও শোনা যায় দূরের লড়াইয়ের আওয়াজ। মাড়াই উঠোনে মেয়েরা তখন মুহূর্তের জন্য কাজ থামিয়ে ক্রুশ-প্রণাম করে, আপন লোকজনের কথা মনে হতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ফিসফিস ক'রে ভগবানের নাম জপে। তারপর আবার মাড়াইয়ের জায়গায় পাথরের বেলনগুলো ঘুরতে থাকে। ঘোড়া আর বলদগুলোকে চালানোর কাজে যে ছেলের দল থাকে তারা হাঁকডাক ক'রে সেগুলোকে ঠেলা মারে। ঝাড়াই কলের ঘর্ঘর আওয়াজ ওঠে। কাজের দিন চলে তার অবধারিত নিয়মে।

আগস্টের শেষ হলে কী হবে দিনগুলো আশ্চর্য রকমের ভালো আর শুকনো খটখটে। গ্রামের মাথার ওপর ধুলোয় উড়ছে ভুষির কণা, বাতাসে ঝাড়াই করা রাইয়ের খড়ের মিষ্টি গন্ধ। সূর্য মায়াদয়া না ক'রে তাপ দিচ্ছে। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই টের পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন শরতের পদধ্বনি। গোরু চরানোর মাঠে ময়ূরকণ্ঠী রঙের সোমরাজ ফেকাসে হয়ে এসেছে, ধূসর সাদা-সাদা দেখাচ্ছে। দনের ওপারে বনঝাউয়ের মাথায় লেগেছে হলুদের ছোপ। বাগিচায় পাকা আপেলের গন্ধ আরও তীব্র হয়ে উঠছে। দূর দিগন্তে শরতের স্বচ্ছতা। ফসলের শূন্য ক্ষেতে ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে বাসাবদলকারী সারসের প্রথম ঝাঁক।

হেটম্যান সড়ক দিয়ে দিনের পর দিন পশ্চিম থেকে পুবের দিকে চলেছে মালটানা গাড়ি, দনের খেয়াঘাটের দিকে বয়ে নিয়ে চলেছে সামরিক রসদ। দন পারের গ্রামগুলোতে শরণার্থীদের ভিড়। ওরা বলে, কসাকরা লড়াই করতে করতে পিছু হটছে। কেউ কেউ আবার এই বলে বুঝ দিচ্ছে যে পিছু হটাটা একেবারেই ইচ্ছাকৃত - আসলে ওদের মতলব লালদের লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা, পরে সময় বুঝে ঘিরে ফেলে খতম করা। তাতারস্কি গ্রামের কেউ কেউ চুপি চুপি সরে পড়ার উদ্যোগ করে। ঘোড়া আর বলদগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে রাতের বেলায় দামী দামী জিনিস ভরা সিন্দুক আর ফসল মাটিতে পুঁতে ফেলে। কামানের গর্জন প্রায় স্তব্ধ হয়ে আসছিল, এমন সময় পাঁচই সেপ্টেম্বর আবার নতুন তেজে শুরু হয়ে গেল। এখন সে আওয়াজ স্পষ্ট আর ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। লড়াই চলেছে দনের বারো-তেরো ক্রোশ দূরে, তাতারস্কির উত্তর-পুব দিকে। পরদিন পশ্চিমে উজানের এলাকাতেও গর্জন ওঠে। ফ্রন্ট অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে দনের দিকে।

গ্রামের বেশির ভাগ লোকই চলে যাবার যোগাড় করছে জানতে পেরে ইলিনিচ্না মেয়েকে বলল যে তাদেরও এই বেলা সরে পড়া উচিত। কেমন যেন একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে, ভেবাচেকা লেগে গেছে তার। ঘর গেরস্থালি নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে চলে যাবে, নাকি বাড়িতেই থাকবে? ফ্রন্টে যাবার আগে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মাড়াইয়ের কথা, জমি চাষ করা আর গোরুবাছুর দেখাশোনা করার কথা খুবই বলেছিল; কিন্তু ফ্রন্ট তাতারস্কির কাছে চলে এলে কী করতে হবে সে সম্পর্কে একটা কথাও বলে নি। সাবধানের মার নেই ভেবে ইলিনিচ্না শেষকালে ঠিক করল দুনিয়াশ্কা আর ছেলেমেয়েদুটোকে, ঘরের বেশি দামী জিনিসপত্র যা আছে তাই দিয়ে গ্রামের কারও সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে, আর নিজে ভিটে আগলে পড়ে থাকবে। এমন কি লালেরা গ্রাম দখল ক'রে ফেললেও বাড়ি ছেড়ে যাবে না।

সতেরোই সেপ্টেম্বর ভোর রাতে হুট ক'রে বাড়ি এসে হাজির হল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। কাস্তানস্কায়া জেলার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে সারাটা পথ পায়ে হেঁটে এসেছে সে। শ্রান্ত ক্লান্ত, মেজাজটাও বেজায় চড়ে আছে। আধঘন্টাখানেক জিরোবার পর টেবিলে খেতে এসে বসল। এমন গবগব করে খেতে শুরু করল যে ইলিনিচ্না জীবনে কখনও ওকে অমন ভাবে খেতে দেখে নি। আধগামলা নিরিমিষ বাঁধাকপির ঝোল দেখতে দেখতে সাবাড় হয়ে গেল। তারপর সে হামলে পড়ল কাউনের জাউয়ের ওপর। ইলিনিচ্না আশ্চর্য হয়ে গালে হাত দিয়ে বলল, 'হা ভগবান, এ তুমি কেমন ক'রে খাচ্ছ গো! দেখে মনে হয় যেন তিন দিন না খেয়ে আছ!'

'তুমি ভাবলে খেয়েছি নাকি? বোকা বুড়ি কোথাকার! গত তিন দিন হল একটা দানাও পেটে পড়ে নি!'

'সে কী! তোমাদের তাহলে খেতে দেয় না ওখানে?'

'ওখানে খাওয়ানো হয় শয়তানের নিয়মে!' মুখে একগাদা খাবার গুঁজে বিড়ালের মতো গরগর করতে করতে জবাব দেয় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। 'যেমন হাতাতে পার তেমনি পেটে পোরো। কিন্তু আমি চুরি চামারি করতে এখনও শিখি নি। ছেলেছোকরারা ও কাজ করতে পারে। বিবেক বলতে ওদের কানাকড়িও নেই।... এই পোড়ার লড়াইয়ের বাজারে ওরা চুরি বাটপারিতে যেরকম হাত পাকিয়েছে তা দেখে আঁতকে উঠতে হয়! পরে অবিশ্যি গা সওয়া হয়ে যায়। যা দ্যাখে তা-ই হাতায়, টেনে নিয়ে যায়।... লড়াই ত নয়, যেন ভগবানের রোষ!'

'তুমি কিন্তু একবারে অতটা খেয়ো না বাপু। কিছু একটা বিপদ আপদ না হয়ে বসে আবার। দ্যাখ পেটটা ফুলে যে একেবারে জয়ঢাক!'

'চোপ্ রও! দুধ নিয়ে এসো। হ্যাঁ, দেখো, একটা বড় মালসায় ক'রে!'

না খেতে পেয়ে বুড়োর যে কী মারাত্মক দশা হয়েছে তা দেখে ইলিনিচ্না কেঁদেই ফেলল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জাউটা সাবাড় করার পর ইলিনিচ্না জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি একেবারেই ফিরে এলে?'

'সে দেখা যাবে 'খন...' দায়সারা গোছের জবাব দিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'তোমাদের, বুড়োদের বাড়িতে ছাড়ল বুঝি?'

'কাউকেই ছাড়ে নি। ছাড়বে কি। এদিকে লালেরা যে ঠেলে দনের দিকে চলে এলো বলে। আমি নিজেই ছেড়ে চলে এসেছি।'

'এর জন্যে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না?' ইলিনিচ্না ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'যদি ধরে তাহলে দিতে হবে বৈ কি।. . .'

'তাহলে কি তুমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে নাকি?'

'তুমি কি ভেবেছিলে আমি নেচে কুঁদে বেড়াব, এর ওর বাড়ি ঘুরে বেড়াব? আরে রামো, বুদ্ধির ঢেঁকি! গোমুখ্যু!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ রেগে মেগে থুতু ফেলল। কিন্তু বুড়ি সহজে দমবার পাত্রী নয়।

'ওঃ কী পাপ ক'রেই এসেছি! তোমায় ধরতে আসবে, তাহলে ত আরও বিপদ হবে আমাদের।. . .'

'তা রাইফেল কাঁধে স্তেপের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ধরা পড়ে জেলে যাওয়াও ভালো,' ক্লান্ত স্বরে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলে। 'আমি ত আর জোয়ান ছোকরা নই যে দিনে দশ-বারো ক্রোশ ক'রে দৌড়ঝাঁপ করব, ট্রেঞ্চ খুঁড়ব, ছুটে হামলা চালাব, মাটিতে হামা দিয়ে চলব, তারপর আবার গুলি থেকে গাও বাঁচাব। গা বাঁচাতে হয় শয়তানে বাঁচাক! আমারই এক পল্টনের সাথী – ক্রিভায়া রেচ্কা থেকে লোকটা – গুলি এসে ধাঁ ধাঁ ক'রে লাগল তার বাঁ কাঁধের একটু নীচে – একবারও পা ছোঁড়ার অবসর পেল না। এতে আনন্দ পাবার তেমন কোন কারণ দেখি না।'

রাইফেল আর কার্তুজের থলেটা বুড়ো বাইরে বয়ে নিয়ে গিয়ে ভুষির গাদার ভেতরে লুকিয়ে রাখল। বনাত কাপড়ের কোর্তাটা কোথায় গেল ইলিনিচ্না জানতে চাইলে সে চোখ মুখ কুঁচকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল, 'ওটা ছিঁড়ে ফাতাফাতা হয়ে গিয়েছিল। মানে, সত্যি বলতে গেলে কি ফেলে দিয়েছি। শুমিলিন্স্কায়া জেলা-সদর পেরোনোর পর আমাদের ওপর এমন চাপ পড়ল যে সব ফেলে দিয়ে আমরা পাগলের মতো পালাতে লাগলাম। তখন কি আর একটা মোটা সুতীর কাপড়ের কোট নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়!. . . যাদের ভারী লোমের কোট ছিল সে সবও তারা ফেলে দিয়েছে।. . . ও কোর্তা দিয়ে তোমার কী মুণ্ডুটা হবে? ও কথা তোমার এখন মনেই বা আসে কী ক'রে? তাও যদি সেটা ভালো হত। তা ত নয় – ভিখিরির পরার যুগ্যি।. . .'

আসলে কিন্তু কোর্তাটা ভালোই ছিল, বেশ নতুন ছিল। কিন্তু বুড়ো যা কিছু খোয়ায়, ওর কথায় তার কোনটাই কাজের নয়। নিজেকে এ ভাবে সান্ত্বনা দেওয়া বুড়োর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বুড়ির তা জানা ছিল। তাই কোর্তাটার গুণ নিয়ে সে আর তর্ক করল না।

রাতের বেলায় বাড়ির সকলে একসঙ্গে বসে ঠিক করল ইলিনিচ্না আর

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ শেষ মুহূর্ত অবধি বাচ্চাদের নিয়ে বাড়িতেই থাকবে, ধন সম্পত্তি আগলাবে, ঝাড়াই করা ফসল মাটিতে পুঁতে রাখবে। আর দুনিয়াশ্‌কা একজোড়া বুড়ো বলদে টানা গাড়িতে সিন্দুক-তোরঙ্গ চাপিয়ে নিয়ে চলে যাবে চির্‌-এর ধারে লাতিশেভ গ্রামে, তাদের আত্মীয়দের কাছে।

কিন্তু এই পরিকল্পনা পুরোপুরি কাজে লাগানো তাদের ভাগ্যে আর সম্ভব হয়ে উঠল না। দুনিয়াশ্‌কাকে পরের দিন সকালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এদিকে দুপুরে সাল্‌-স্তেপ এলাকা থেকে কাল্‌মিক কসাকদের একটা পিটুনী বাহিনী তাতারস্কি গ্রামে এসে ঢুকল। গ্রামের কেউ নিশ্চয় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে বাড়ি ফিরে আসতে দেখেছিল। পিটুনী বাহিনী গ্রামে ঢোকার এক ঘণ্টার মধ্যে চারজন কালমিক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হল মেলেখভদের উঠোনে। ঘোড়সওয়ারদের দেখে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বেশ কায়দা করে আশ্চর্য রকম চটপট চিলেকোঠায় গিয়ে উঠে পড়ল। আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এলো ইলিনিচ্‌না।

সুঠাম দেহ এক কাল্‌মিক – মাঝবয়সী, কাঁধে সিনিয়র সার্জেণ্টের পটি লাগানো – ঘোড়া থেকে নেমে ইলিনিচ্‌নার পাশ কাটিয়ে ফটকের পাল্লা ঠেলে ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বুড়ো কোথায়?'

'কোথায় আবার থাকবে? লড়াইয়ে গেছে,' রুক্ষস্বরে জবাব দিল ইলিনিচ্‌না।

'বাড়ির ভেতরে নিয়ে চল। খুঁজে দেখি।'

'খুঁজে দেখার কী আছে?'

'তোমার বুড়োকে খুঁজে দেখব। ছি ছি কী লজ্জার কথা! বুড়ো মানুষ হয়ে অমন মিছে কথা!' তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়াতে নাড়াতে জোয়ান চেহারার সার্জেণ্টটি বলে। সঙ্গে সঙ্গে ঘন এক পাটি সাদা দাঁত বার করে হাসে।

'অমন দাঁত বার করিস নে! মেলেচ্ছ কোথাকার! বললাম যে নেই! তার ওপরে আবার কী কথা!'

'ওসব বাচলামি ছাড়, বাড়ির ভেতরে নিয়ে চল। যদি না নিয়ে যাও আমরা নিজেরাই গিয়ে ঢুকব,' বুড়ির গালাগালে অসন্তুষ্ট কাল্‌মিক কড়া গলায় এই কথা বলে তার বাঁকা পাদুটো অনেকখানি ফাঁক ক'রে গট গট ক'রে এগিয়ে গেল বাড়ির দেউড়ির দিকে।

সবগুলো ঘর ওরা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখল, নিজেদের মধ্যে কাল্‌মিক ভাষায় কী সব বলাবলি করল। এর পর দু'জন চলে গেল পেছনের আঙিনাটা দেখতে। আরেকজন – বেঁটে মতন, এত তামাটে তার গায়ের রং যে কালোই বলা যায়, মুখে বসন্তের দাগ, নাকটা খাঁদা – দু'পাশে চমৎকার লাল ডোরা দেওয়া সালোয়ারখানা গুটিয়ে ভেতরের বারান্দায় ঢুকে গেল। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে

ইলিনিচ্না দেখে কাল্মিক লাফিয়ে দু'হাতে চালের আড়া আঁকড়ে ধরে কৌশলে ওপরে উঠে গেল। পাঁচ মিনিট পরে ওই রকমই কায়দা ক'রে সে সেখান থেকে লাফিয়ে নামল। তার পেছন পেছন কঁকাতে কঁকাতে সাবধানে নামছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ – সারা গায়ে কাদামাটি মাখা, দাড়িতে মাকড়সার জাল জড়ানো। বুড়ি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'খুঁজে বার করল শেষকালে হারামজাদারা। কেউ নির্ঘাত লাগিয়েছিল। . . .'

পাহারা দিয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে পাঠানো হল কার্গিনস্কায়া জেলা-সদরে। সেখানেই কোর্ট মার্শাল চলছিল। ইলিনিচ্না খানিকটা কাঁদল। আবার নতুন ক'রে তোপের গর্জন শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে দনের ওপার থেকে মেশিনগানের কটকট আওয়াজ। কান পেতে শোনার পর গোলাঘরে গিয়ে ঢুকল। ফসলের খানিকটাও অন্তত লুকিয়ে না ফেললে নয়।

বাইশ

চৌদ্দজন ফেরারী সেপাই ধরা পড়েছে। এখন তারা বিচারের প্রতীক্ষায়। বিচার সংক্ষিপ্ত, নির্মম। সেশনের বিচারপতি একজন বেশ বয়স্ক কসাক-মেজর। আসামীকে তার নাম পদবী, পদ, ইউনিটের নম্বর, কতদিন পালিয়ে ছিল ইত্যাদি জিজ্ঞেস করছে নীচু গলায়, আদালতের অন্য সদস্যদের সঙ্গে গোটা কয়েক বাক্যবিনিময়ের পর রায় জানিয়ে দিচ্ছে। সদস্য বলতে দু'জন লোক – একজন এক হাত-কাটা এক কর্ণেট, আরেকজন ভোগবিলাসীর মতো চেহারা, গোঁফওয়ালা, ফুলোমুখ এক সার্জেন্ট-মেজর। বেশির ভাগ ফেরারীকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে চাবুকের ঘা মেরে। বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যে একটা খালি বাড়ি আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে। সেখানে কাল্মিকরা আদালতের নির্দেশ প্রয়োগ করছে। জঙ্গী দন আর্মির মধ্যে ফেরারীদের সংখ্যা বড় বেড়ে গেছে। এত বেশি বেড়ে গেছে যে এবারে আর ১৯১৮ সালের মতো প্রকাশ্যে, জনসমক্ষে তাদের চাবুক মারা চলছে না।

পাঁচ জনের পর ডাক পড়ল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের। দুশ্চিন্তায় তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেছে। এটেনশনের ভঙ্গিতে দু'পাশে হাত রেখে সে দাঁড়াল বিচারকের টেবিলের সামনে।

'পদবী?' আসামীর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল মেজর।

'মেলেখভ, হুজুর।'

'নাম, বাপের নাম?'

'পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, হুজুর।'

মেজর এবারে কাগজ থেকে চোখ তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বুড়োর দিকে।

'সাকিন?'

'ভিওশেনস্কায়া জেলার তাতারস্কি গ্রাম হুজুর।'

'লেফটেনান্ট গ্রিগোরি মেলেখভের বাবা হন না ত আপনি?'

'ঠিকই ধরেছেন, হুজুর।' ওর বুড়ো শরীরটা এ যাত্রা হয়ত চাবুকের হাত থেকে রেহাই পেল এই ভেবে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ যেন সঙ্গে সঙ্গে একটু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের তোপসানো মুখ থেকে ছুঁচ ফোটানো দৃষ্টি না সরিয়েই মেজর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি লজ্জা হয় না একটুও?'

এই কথা শুনে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মিলিটারী আইনকানুন লঙ্ঘন ক'রে বাঁ হাত বুকের ওপর রেখে কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল, 'হুজুর, মেজর সাহেব, চাবুক মেরে সাজা আমায় দেবেন না, দয়া করুন! আপনার জন্যে চির জীবন আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব। আমার দুটো ছেলে. . . বিবাহিত। . . . বড়টি লাল ফৌজের হাতে মারা গেছে। . . . নাতিপুতি আছে আমার। এমন নড়বড়ে বুড়ো মানুষকে কি বেত না মারলেই নয়?'

'আমরা বুড়োদেরও শেখাই কী ভাবে পল্টনে কাজ করতে হয়। তুমি কি ভেবেছিলে ফৌজ থেকে পালানোর জন্যে তোমায় মেডেল দেওয়া হবে?' কথার মাঝখানে ওকে বাধা দিয়ে বলল হাত-কাটা কর্ণেট। স্নায়বিক বিকারগ্রস্তের মতো অল্প অল্প কাঁপছিল তার ঠোঁটের কোনা।

'মেডেল দিয়ে আমার আর কী হবে? . . . আপনারা আমাকে আমার ইউনিটে পাঠিয়ে দিন। আমি কথা দিচ্ছি সৎ ভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করব। . . . আমি নিজেই জানি নে কেন পালিয়েছিলাম। হয়ত শয়তান ভর করেছিল আমার ওপর।' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ওর মাড়াই না করা ফসল, নিজের খোঁড়া পা আর ছেড়ে আসা ঘর গেরস্থালি নিয়ে ছাড়া-ছাড়া আরও কী সব বলে যায়। কিন্তু মেজর হাত নেড়ে ইশারা ক'রে ওকে চুপ করিয়ে দেয়, কর্ণেটের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে তার কানে কানে গুজগুজ করে কী সব বলে। কর্ণেট সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দিকে ফিরল মেজর।

'বেশ। আপনার যা বলার ছিল সব বলা হয়ে গেছে? আপনার ছেলেকে আমি চিনি। তার বাপ যে এমন হতে পারে এই ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ইউনিট থেকে আপনি পালিয়েছিলেন কবে? এক-হপ্তা আগে? লাল ফৌজ আপনাদের গ্রাম দখল ক'রে আপনার ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিক এটাই কি আপনার

ইচ্ছে? অল্পবয়সী কসাকদের সামনে এই নমুনা তুলে ধরছেন আপনি? আইনত আমাদের উচিত বিচার ক'রে আপনাকে দৈহিক সাজা দেবার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আপনার ছেলে যেহেতু একজন অফিসার তার সম্মানের কথা চিন্তা করেই সেই কলঙ্কের বোঝা থেকে রেহাই দিলাম আপনাকে। আপনি কি সাধারণ পদে ছিলেন?'

'হ্যাঁ হুজুর।'

'কোন পদে?'

'জুনিয়র সার্জেণ্ট হুজুর।'

'ও পদ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল।' এবারে 'তুমিতে' নেমে এসে মেজর গলা চড়াল, রুক্ষস্বরে হুকুম দিল: 'এক্ষুনি ইউনিটে চলে যাও! স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কাছে গিয়ে জানাও যে কোর্ট মার্শালের অর্ডারে তোমার সার্জেণ্ট র‍্যাঙ্ক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধে বা আগেকার যুদ্ধে কোন পুরস্কার জুটেছিল? . . . ভাগো!'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। গির্জার চুড়োটা চোখে পড়তে ক্রুশ-প্রণাম ঠুকল। পথঘাটের কোন পরোয়া না ক'রে টিলার ওপর দিয়ে সোজা রওনা দিল বাড়ির দিকে। ফসল-তোলা মাঠে নাড়াগুলো গজিয়ে খোঁচা খোঁচা বেরিয়ে আছে। তার ওপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে সে মনে মনে ভাবে: 'না, এবারে আর ও ভাবে লুকোব না! এমন জায়গায় লুকোব যে তিনটে কাল্‌মিক-স্কোয়াড্রন পাঠাক না কেন - কারও বাপের সাধ্যি হবে না আমাকে খুঁজে বার করে!'

স্তেপের মাঠে আসার পর সে ঠিক করল রাস্তা দিয়ে চলাই বরং ভালো - নয়ত কোন সৈন্যদল ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তাকে দেখে কৌতূহলী হতে পারে। 'ঠিক ভেবে বসবে আমি পল্টন ছেড়ে পালিয়েছি। কোথায় কোন্ সেপাইদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে - তখন আর কোন বিচারের বালাই না রেখে বেতের বাড়ি বসিয়ে দেবে,' আপন মনে চিন্তা করতে করতে বুড়োর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কথাগুলো। ক্ষেত থেকে এবার সে গিয়ে ওঠে গরমকালে গাড়ি চলার রাস্তার ওপর। রাস্তাটা এই সময় পরিত্যক্ত। দু'ধারে ঘন হয়ে গজিয়েছে চেটাল পাতাওয়ালা লম্বা লম্বা আগাছা। এখন কেন যেন নিজেকে আর ফেরারী বলে মনে হচ্ছে না তার।

দনের যত কাছাকাছি আসতে থাকে ততই ঘন ঘন দেখা হয়ে যেতে থাকে উদ্বাস্তুদের গাড়িগুলোর সঙ্গে। বসন্তকালে দনের বাঁ ধারে বিদ্রোহীদের পিছু হটার সময় যা ঘটেছিল এবারেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। স্তেপের মাঠের সমস্ত দিক জুড়ে ঘর গেরস্থালির জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে চলেছে মালগাড়ি আর স্লিটলগাড়ি। ঘোড়সওয়ার দলের কুচকাওয়াজের মতো পালে পালে গোরু চলেছে

ডাক ছাড়তে ছাড়তে। সেই সঙ্গে ধুলো উড়িয়ে ছুটছে ভেড়ার পাল। গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ, ঘোড়ার ডাক, লোকজনের হাঁকডাক, অসংখ্য খুরের খটখট আওয়াজ, ভেড়ার ডাক, ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি – সব মিলিয়ে স্তেপের শান্ত বিস্তার একটানা উদ্বেগজনক কোলাহলে ভরে উঠেছে।

'কোথায় চললে দাদু? পেছনে ফিরে যাও। লালেরা আমাদের পেছন পেছন তাড়া ক'রে আসছে!' মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অচেনা একজন কসাক পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে চিৎকার ক'রে বলল।

'বাজে কথা বললেই হল! কোথায় তোমার লালেরা?' থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'দনের ওপারে। ভিওশেন্স্কায়ার কাছাকাছি এসে পড়েছে। তুমি কিনা ওদের কাছেই যাচ্ছ?'

কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আবার পথ চলতে শুরু করে। সন্ধ্যানাগাদ সে এসে পৌঁছুল তাতারস্কির কাছে। পাহাড় থেকে নামার সময় মনোযোগ দিয়ে চারদিকটা দেখে নেয়। গ্রামটা আশ্চর্য রকম খাঁ খাঁ করছে। রাস্তায় ঘাটে জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই। ঘরবাড়ি পরিত্যক্ত নিস্তব্ধ, জানলা দরজার খড়খড়ি আঁটা। না মানুষের গলার আওয়াজ, না গোরু বাছুরের ডাক – কোনটাই শোনা যায় না। শুধু দনের একেবারে ধারে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে লোকজন। কাছে আসতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দেখতে পেল অস্ত্রশস্ত্রধারী কসাকদল বজরা বার করে বয়ে নিয়ে চলেছে গ্রামে। তাতারস্কির লোকেরা যে তাদের গ্রাম ছেড়েছে, পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। সাবধানে গলির ভেতরে ঢুকে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। ইলিনিচ্না আর নাতি-নাতনিরা রান্নাঘরে বসে ছিল।

'এই ত দাদুও এসে গেছে!' ছুটে গিয়ে দু'হাতে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে মিশাত্কা।

আনন্দে কেঁদে ফেলে ইলিনিচ্না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে, 'তোমাকে যে আবার দেখতে পাব সে ভরসা ছিল না। দ্যাখ, তুমি যা-ই বল না কেন গো, আমি কিন্তু আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে রাজী নই! যাক গে সব পুড়ে ছারখার হয়ে, আমি বাপু খালি ঘরদোর পাহারা দিতে পারব না। প্রায় সবাই গাঁ ছেড়ে চলে গেছে, শুধু আমিই বোকার মতো নাতি-নাতনিদের নিয়ে পড়ে আছি। এক্খুনি ঘোড়া জোত। যেদিকে দু'চোখ চায় চলে যাব! হ্যাঁ গো, ওরা তোমায় ছেড়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'একেবারে?'

'একেবারে, যতক্ষণ না ধরা পড়ি। . . .'

'এখানে ত আর লুকোতেও পারবে না। আজ সকালে ওপার থেকে লালেরা যখন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল তখন যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যতক্ষণ গুলিগোলা চলল ততক্ষণ বাচ্চাদের নিয়ে আমি মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরে বসে রইলাম। এই এখুনি খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের। কসাকরা এসেছিল, দুধ চাইল, আমাদের এখান থেকে চলে যেতে পরামর্শ দিল।'

'আমাদের গাঁয়ের কসাক নয় নিশ্চয়?' জানলার চৌকাঠের তক্তায় সদ্য বুলেট লেগে যে ফুটো হয়েছিল সেটা ভালো ক'রে দেখতে দেখতে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ জানতে চাইল।

'না, বাইরের কসাক। খোপিওরের লোক বলেই মনে হয়।'

'তাহলে চলে যাওয়াই দরকার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

সন্ধের দিকে ঘুঁটের গাদার নীচে একটা গর্ত ক'রে তার ভেতরে সে সাত বস্তা গম রেখে বেশ যত্ন ক'রে গর্ত বুজিয়ে দিল, ওপরে ঘুঁটে গাদা ক'রে এনে রাখল। বেশ খানিকটা অন্ধকার হয়ে আসতে গাড়িতে ঘোড়া জুতল। দু'খানা শীতের কোট, এক বস্তা ময়দা, কিছুটা কাউন আর বাঁধাছাঁদা ক'রে একটা ভেড়া গাড়িতে তুলল, দুটো গোরুই বেঁধে নিল গাড়ির পেছনে। ইলিনিচ্‌না আর বাচ্চাদের গাড়িতে বসিয়ে ফিরে বলল, 'আচ্ছা এবারে তাহলে ভগবানের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়া যাক!'

উঠোন থেকে বেরিয়ে এসে লাগামজোড়া বুড়ির হাতে তুলে দিয়ে ফটকটা বন্ধ ক'রে দিল। একেবারে সেই টিলা অবধি গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলল। সারাক্ষণ ফোঁস ফোঁস করতে করতে কোর্তার আস্তিনে চোখের জল মুছতে লাগল।

তেইশ

শোরিনের ঝটিকা বাহিনীর ইউনিটগুলো দশ ক্রোশ মার্চ ক'রে সেপ্টেম্বরের সতেরো তারিখে দনের একেবারে কাছে এসে পৌঁছুল। আঠারো তারিখের সকালে মেদ্‌ভেদিৎসার মোহানা থেকে কাজানস্কায়া জেলা-সদর অবধি সর্বত্র লাল ফৌজের কামান গর্জে উঠল। গোলন্দাজদলের ছোটখাটো এই প্রস্তুতিপর্বের পর পদাতিক দল বুকানোভ্‌স্কায়া, ইয়েলানস্কায়া ও ভিওশেনস্কায়া জেলা এবং দন-পারের গ্রামগুলো দখল ক'রে ফেলল। সেই দিনেই দনের বাঁ পারের পঞ্চাশ ক্রোশেরও বেশি

এলাকার মধ্যে শ্বেতরক্ষীদের কোন চিহ্ন রইল না। কসাক স্কোয়াড্রনগুলি পিছু হটে গেল, বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে দন পার হয়ে আগের থেকে তৈরি ক'রে রাখা ঘাঁটিতে ফিরে গেল। খেয়া পার হওয়ার সমস্ত রকম উপায় ওদের হাতে ছিল। কিন্তু ভিওশেনস্কায়ার সেতুটা লাল ফৌজের প্রায় দখলে চলে গিয়েছিল। কসাকরা সময় থাকতেই পুলের কাছে খড় বিছিয়ে তক্তায় কেরোসিন ঢেলে রেখে দিয়েছিল যাতে পিছু হটতে হলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়। আগুন ধরাতে যাবে, এমন সময় ওদের একজন আড়কাটি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে খবর দিল যে ৩৭ নম্বর রেজিমেন্টের একটা স্কোয়াড্রন পেরেভোজ্‌নি গ্রাম থেকে ভিওশেনস্কায়ার পারানী ঘাটের দিকে যাচ্ছে। পিছিয়ে পড়ে থাকা স্কোয়াড্রনটা টগবগিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে যখন পুলের কাছে এসে পৌঁছুল ততক্ষণে লাল ফৌজের পদাতিক দল জেলা-সদরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। মেশিনগানের গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও তারই মধ্যে কসাকরা শেষ পর্যন্ত পুলে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যেতে পারল। তবে ওদের দশ জনেরও বেশি মানুষ এবং সেই সংখ্যক ঘোড়াও হতাহত হল।

সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি নয় নম্বর রেড আর্মির বাইশ ও তেইশ নম্বর ডিভিশনের রেজিমেন্টগুলো দনের বাঁ তীরে তাদের দখল করা গ্রাম আর জেলা-সদরগুলো ধরে রেখেছিল। দু'পক্ষের মাঝখানে ব্যবধান বলতে যে জলভাগ, বছরের এই সময়টাতে তা বড় জোর এক শ' ষাট গজ এমনকি কোথাও কোথাও মাত্র ষাট গজ চওড়া। পার হওয়ার কোন সক্রিয় চেষ্টা লালেরা করে নি। কোথাও কোথাও যেখানে হাঁটুজল সেখানে তারা হেঁটে দন পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাড়া খেয়ে ফিরে যায়। এই অংশে সারা ফ্রন্ট জুড়ে দু'সপ্তাহ ধরে দু'তরফে রাইফেল আর কামানের তুমুল গোলাগুলি বিনিময় চলেছে। কসাকরা তীরের উঁচু টিলাগুলো দখল ক'রে রাখায় এলাকাটার ওপর তারা আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল। প্রতিপক্ষ দনের মুখে এসে জমা হতেই তাদের ওপর তারা গোলাবর্ষণ করছে। দিনের বেলায় দনের দিকে এগোতে দিচ্ছে না। কিন্তু এই অংশে কসাক-স্কোয়াড্রনগুলো যাদের নিয়ে তৈরি তারা লড়াইয়ে একেবারেই আনাড়ি (সেপাই বলতে বুড়ো হাবড়ার দল আর সতেরো থেকে উনিশ বছর বয়সের ছেলেছোকরা)। তাই তারা নিজেরাও দন পার হয়ে লালদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাঁ তীর ধরে আক্রমণ চালানোর কোন লক্ষণ দেখাল না।

পিছু হটে দনের ডান পারে চলে আসার পর প্রথম দিন কসাকদের আশঙ্কা ছিল এই বুঝি লাল ফৌজের দখল করা গ্রামগুলোতে ঘরবাড়ি জ্বলতে থাকবে। কিন্তু ওরা দারুণ অবাক হয়ে গেল যখন বাঁ পারে সামান্য এতটুকু ধোঁয়ার রেখাও দেখা গেল না। শুধু তা-ই নয়, গ্রামের যে-সমস্ত লোক রাতের বেলায় এপারে

চলে এসেছে তারাও বলছে যে লাল ফৌজীরা কোন ধনসম্পত্তি লুটপাট করছে না। এমনকি যে সব খাবারদাবার নিচ্ছে তা সে তরমুজ হোক আর দুধই হোক সে বাবদ কড়ায় গণ্ডায় পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে সোভিয়েত টাকায়। এতে কসাকদের মনে ধন্ধ লেগে গেল। ভীষণ ভেবাচেকা খেয়ে গেল তারা। তাদের ধারণা ছিল যে বিদ্রোহের পর লাল ফৌজীরা সবগুলো বিদ্রোহী গ্রামগঞ্জকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। আশঙ্কা ছিল যারা পেছনে রয়ে গেল তাদের, বিশেষত পুরুষদের ত নিশ্চয়ই নির্মম ভাবে খতম করবে। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেল লালেরা নির্বিবাদী সাধারণ মানুষদের কাউকে স্পর্শ করছে না। হাবভাব দেখে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোন মতলব তাদের আছে বলে মনেও হয় না।

আঠারো তারিখ ভোর রাত্রে ভিওশেন্স্কায়ার উলটো দিকে একটা চৌকির খোপিওর-কসাকরা শত্রুপক্ষের এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ কী খোঁজ নিয়ে দেখবে বলে ঠিক করল। এক গলাবাজ কসাক মুখের কাছে দু'হাত চোঙার মতো ক'রে ধরে চিৎকার ক'রে বলল, 'ওরে লাল রক্তচোষারা! আমাদের বাড়িঘর পোড়াচ্ছিস না যে? দেশলাই নেই নাকি তোদের কাছে? তাহলে সাঁতরে চলে আয়, আমরা' তোদের দেবো!'

অন্ধকারের ভেতর থেকে উঁচু গলায় একজন উত্তর দিল, 'তোদের ঠিক জায়গায় ধরতে পারি নি আমরা, নইলে বাড়িঘরসুদ্ধই পুড়িয়ে মারতাম!'

'দিনকাল কি এতই খারাপ যাচ্ছে? আগুন জ্বালানোর মালমশলাও পাওয়া যাচ্ছে না?' খোপিওরের লোকটি মজা ক'রে চেঁচিয়ে বলল।

ওপার থেকে শান্ত সুরে খুশি গলায় উত্তর এলো: 'এদিকে আয় সাদা খানকীর বাচ্চা! আমরা তোর প্যান্টের ঝাঁপে এমন গরম ঢেলে দেবো যে সারা জীবন চুলকিয়ে মরবি!'

দুই চৌকির মধ্যে অনেকক্ষণ নানা রকম কটুকাটব্য আর গালিগালাজ বিনিময় হল। দু'-একটা গুলিও চালাচালি হল। পরে সব শান্ত হয়ে এলো।

দুটো আর্মি কোর নিয়ে কাজান্স্কায়া – পাভ্‌লভ্স্ক অংশে দন ফৌজের যে মূল শক্তির সমাবেশ ঘটেছিল, অক্টোবরের প্রথম দিকে তা আবার আক্রমণ শুরু ক'রে দিল। আট হাজার বেয়নেটধারী পদাতিক আর ছয় হাজারের বেশি তলোয়ারধারী ঘোড়সওয়ার নিয়ে তৈরি তিন নম্বর দন আর্মি কোর পাভ্‌লভ্স্কের কাছে জোর খাটিয়ে দন পার হল, ছাপ্পান্ন নম্বর রেড ডিভিশনকে পিছু হটিয়ে দিয়ে পূবের দিকে সফল যাত্রা শুরু করল। এর কিছুকাল পরেই কনোভালভের দু'নম্বর কোরও দন পার হল। তার দলে ঘোড়সওয়ার বেশি থাকার ফলে তার পক্ষে শত্রুঘাঁটির অনেকটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে মারাত্মক আঘাত হানা সম্ভব হল।

এ যাবৎ রিজার্ভ হিশেবে যে একুশ নম্বর লাল পদাতিক ডিভিশনকে রাখা হয়েছিল তাকে কাজে নামানো হলে তিন নম্বর দন কোর্-এর অগ্রগতি খানিকটা ব্যাহত হলেও কসাক বাহিনীগুলোর মিলিত আক্রমণের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে শুরু করা ছাড়া আর কোন উপায় তার রইল না। ১৪ই অক্টোবর দু'নম্বর কসাক কোর তুমুল লড়াই ক'রে চৌদ্দ নম্বর লাল পদাতিক ডিভিশনকে ভেঙে প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস ক'রে দিল। এক সপ্তাহের মধ্যে দনের বাঁ পার থেকে একেবারে ভিওশেনস্কায়া জেলা-সদর অবধি খালি ক'রে লাল ফৌজ সরে গেল। যেখানে আক্রমণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া যেতে পারে এরকম অনেকখানি জায়গা দখলে আসার পর কসাক বাহিনীগুলো নয় নম্বর রেড আর্মির ইউনিটগুলোকে লুক্কিওভো – শিরিন্‌কিন – ভরবিওভ্‌কা ফ্রণ্টে ঠেলে সরিয়ে দিল। এর ফলে নয় নম্বর আর্মির তেইশ নম্বর ডিভিশন ভিওশেনস্কায়া থেকে পশ্চিমের দিকে ক্রুশ্‌লোভ্‌স্কি গ্রামে তাড়াতাড়ি ফ্রণ্ট সরিয়ে এনে ঢেলে সাজাতে বাধ্য হল।

ক্রেত্‌স্কায়া জেলার কাছাকাছি জায়গায় এক নম্বর দন কোর্ ছিল। জেনারেল কনোভালভের দু'নম্বর কোর্-এর প্রায় একই সঙ্গে তারাও নিজের অংশে জোর খাটিয়ে দন পার হল।

লাল ফৌজের বাঁ পাশের বাইশ আর তেইশ নম্বর ডিভিশনের সামনে এখন ঘেরাও হয়ে পড়ার সমূহ বিপদ। এটা বুঝতে পেরে দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রন্টের সেনাপতিমণ্ডলী নয় নম্বর আর্মিকে ইকোরেৎস নদীর মোহানা থেকে বুতুর্‌লিনভ্‌কা, উস্‌পেনস্কায়া আর তিশানস্কায়ার ভেতর দিয়ে কুমিল্‌জেনস্কায়া বরাবর ফ্রণ্ট লাইনে সরে আসার হুকুম দিল। কিন্তু আর্মি এই লাইনে টিকে থাকতে পারল না। পাইকারী হারে জোর করে সৈন্য সংগ্রহের ফলে আলাদা আলাদা ভাবে যে সব অসংখ্য কসাক-স্কোয়াড্রন এসে জুটেছিল তারা ডান তীর থেকে দন পার হয়ে দু'নম্বর কসাক কোর্-এর নিয়মিত বাহিনীগুলোর সঙ্গে মিলে দ্রুত গতিতে লাল ফৌজকে ঠেলে দিতে লাগল উত্তরের দিকে। ২৪ থেকে ২৯শে অক্টোবরের মধ্যে শ্বেতরক্ষীরা ফিলোনোভো ও পভোরিনো জেলা আর নোভোখোপিওরস্ক শহর দখল ক'রে ফেলল। কিন্তু অক্টোবরে দন ফৌজের এই সাফল্য যত বিরাটই হোক না কেন, কসাকদের মধ্যে উপলব্ধি করা যাচ্ছে না আগের সেই আত্মবিশ্বাস, যা সেবার বসন্তকালে বিজয় অভিযানের সময় প্রদেশের উত্তর সীমান্তের দিকে তাদের এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছিল। লড়াইয়ের সারির বেশির ভাগ লোকই বুঝতে পারছিল যে এ সাফল্য সাময়িক, বড়জোর শীতকালটা তারা টিকে থাকতে পারবে।

দক্ষিণ ফ্রণ্টে কমরেড স্তালিনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যখন দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিবিপ্লবকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তাঁর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা (দন প্রদেশের ভেতর

দিয়ে না গিয়ে দন্‌বাসের ভেতর দিয়ে অভিযান চালানো) কার্যকরী হতে শুরু করল তখন থেকে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেল। ওরিওল-ক্রোমি অংশের ব্যাপক যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদলের পরাজয় এবং ভরোনেজ অংশে বুদিওন্নির ঘোড়সওয়ার দলের চমকপ্রদ তৎপরতা সংগ্রামের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করে দিল। নভেম্বরে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী দন ফৌজের বাঁ পাশ সম্পূর্ণ খালি ক'রে দিয়ে দক্ষিণ দিকে সরে গেল। তার ফলে পুরো কসাক ফৌজকেই পিছু হটতে হল।

চব্বিশ

আড়াই সপ্তাহ পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ সপরিবারে নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিল লাতিশেভ গ্রামে। যেই শুনতে পেল লাল ফৌজ দনের দিকে পিছু হটে গেছে, অমনি বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হল। গ্রাম তখনও ক্রোশ দেড়েক দূরে, এমন সময় দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব নিয়ে সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

'নাঃ এমন টিকিস টিকিস করে চলা আর সহ্য হয় না বাপু! এই হতচ্ছাড়া গোরুগুলোর জন্যে গাড়ি জোরে হাঁকানও যাবে না। কেন যে মরতে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম! ওরে দুনিয়াশ্‌কা, তোর বলদদুটোকে থামা। গোরুগুলোকে তোর গাড়িতে বেঁধে নে। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি গিয়ে ব্যাপার দেখে আসি। হয়ত গিয়ে দেখব সেখানে কেবল ছাইয়ের গাদা পড়ে আছে। ...'

দারুণ অস্থির হয়ে পড়ে সে। নিজের ছোট গাড়ি থেকে বাচ্চাদের তুলে বসিয়ে দেয় দুনিয়াশ্‌কার প্রশস্ত গাড়িতে, বাড়তি মালপত্রও সেখানে সরিয়ে দেয়। হালকা হয়ে এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে ঘর্ঘর ক'রে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়। আধক্রোশখানেক পথ যেতে না যেতে ঘুড়ীটা ঘামতে শুরু করে। মনিব এর আগে কখনও এমন নির্দয় ব্যবহার করে নি ওর ওপর। হাত থেকে চাবুক না নামিয়ে অবিরাম হাঁকিয়ে চলে।

গাড়ির দু'পাশ আঁকড়ে ধরে ঝাঁকুনির চোটে যন্ত্রণায় চোখমুখ কুঁচকে ইলিনিচ্‌না বলে, 'ঘুড়ীটার দফা রফা ক'রে ছাড়বে দেখছি! অমন পাগলের মতো ছোটাচ্ছ কেন?'

'আমি মরলে ত আর আমার শোকে কাঁদতে যাচ্ছে না! ... এই চল্‌ চল্‌, হারামজাদী! ঘাম ছুটছে! ... ওদিকে হয়ত গিয়ে দেখব আমাদের বাড়ির খুঁটিগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই. ..' দাঁতে দাঁত চেপে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলে।

ওর ভয় কিন্তু অমূলক। বাড়িখানা আস্তই দাঁড়িয়ে আছে। তবে প্রায় সবক'টা জানলাই ভাঙা। দরজার পাল্লাটা কব্জা থেকে খসে পড়েছে। দেয়ালগুলো বুলেটে

ঝাঁঝরা। উঠোনের সর্বত্র অবহেলিত, পরিত্যক্ত ভাব। আস্তাবলের একটা কোনা গোলায় একেবারে ধসে গেছে। দ্বিতীয় আরেকটা গোলা কুয়োর কাছে পড়ে একটা অগভীর গর্ত সৃষ্টি করেছে। কুয়োর কাঠামো ছত্রাকার। কপিকলটা ভেঙে দু'-আধলা। যে বৃদ্ধ থেকে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পালিয়ে গিয়েছিল সে নিজে হানা দিয়েছিল ওর বাড়িতে, ধ্বংসের বীভৎস চিহ্ন রেখে চলে গেছে। কিন্তু ঘর গেরস্থালির আরও বেশি ক্ষতি করেছে খোপিওরের কসাকরা, যারা এই গ্রামে ঘাঁটি করেছিল। গোরুর খাটালে তারা বেড়া টেনে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, এক মানুষ সমান গভীর ট্রেঞ্চ খুঁড়ে রেখেছে। বাড়তি কাজের ঝামেলা থেকে গা বাঁচাতে গিয়ে গোলাঘরের দেয়াল ভেঙে তার গুঁড়ি দিয়ে ট্রেঞ্চ মজবুত করেছে। মেশিনগানের গুলি ছোঁড়ার জন্য ফোকর বানাতে গিয়ে পাথরের দেয়াল ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে। ঘোড়াগুলোকে যথেচ্ছ খাইয়ে অর্ধেক বিচালির গাদা নষ্ট করেছে। কঞ্চির বেড়ায় আগুন লাগিয়েছে। বাইরের হেঁসেলটা পায়খানা হিশেবে ব্যবহার ক'রে তার আর কিছু অবশিষ্ট রাখে নি। . . .

বসতবাড়ি আর বাইরের বাড়িঘরের এই দুর্দশা দেখে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মাথায় হাত দিয়ে বসল। লোকসানকে খাটো ক'রে দেখার যে একটা অভ্যাস পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের বরাবর ছিল এবারে কিন্তু সেটা তাকে ছাড়তে হল। সারা জীবন ধরে যা কিছু সঞ্চয় করেছে আজ কোন মুখে সে বলবে যে ওগুলো কেবল ভাঙচুরেরই যোগ্য, কানাকড়িও দাম নেই ওদের? গোলাঘর ত আর তুচ্ছ একটা বনাত কাপড়ের কোট নয়, সেটা তৈরি করতে কম খরচ হয় নি ওর।

'দেখে কে বলবে যে কোন কালে গোলাঘর ছিল!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিনিচ্না বলল।

'সে যে কী গোলাঘরই ছিল . . .' পান্তেলেই চটপট বলে ওঠে। কিন্তু কথাটা আর শেষ করতে পারে না। হতাশ ভাবে হাত নাড়া দিয়ে চলে যায় মাড়াই উঠোনে।

বুলেট আর গোলার টুকরো লেগে বাড়ির দেওয়ালগুলো ঝাঁঝরা, ক্ষতবিক্ষত, একেবারে শ্রী ছাঁদহীন। দেখলে মনে হয় পোড়ো বাড়ি। ঘরগুলোর মধ্যে সোঁ সোঁ ক'রে বাতাস বইছে। টেবিলে, বেঞ্চে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। . . . অনেক সময় লেগে গেল সব কিছু গোছগাছ ক'রে নিতে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পরের দিন ঘোড়ায় জেলা-সদরে চলে গেল। সেখানে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে চেনাশোনা এক কম্পাউণ্ডারকে ধরে এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট বার ক'রে নিল যে পায়ের একটা ব্যামোর ফলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের হাঁটার ক্ষমতা নেই, তার দস্তুরমতো চিকিৎসা প্রয়োজন। এই সার্টিফিকেটের জোরে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ফ্রন্টে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে

গেল। কাগজটা সে গাঁয়ের মোড়লকে দেখিয়েছে। এর পর থেকে যখনই সে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে যায় তখন নিজের অবস্থাটা বেশ ভালো করে বোঝানোর জন্য একটা লাঠিতে ভর দিয়ে পালা ক'রে একবার এ পায়ে আরেকবার ও পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে।

লোকজন পিছু হটার পর আবার ফিরে এসে যে ঝামেলা আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ল তাতারস্কির জীবনে তেমন আর কখনও দেখা যায় নি। খোপিওরের কসাকরা বাড়িঘর থেকে জিনিসপত্র বার ক'রে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রেখেছিল – লোকে তাই বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিজেদের জিনিসপত্র খুঁজে বার করছে, স্তেপের মাঠে আর খাতের ভেতরে খোঁজ করছে দলছাড়া গোরুবাছুরের। প্রথম যে দিন তাতারস্কির ওপর কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হয় সেই দিনই গ্রামের উজান এলাকার শেষ সীমানা থেকে তিন শ' ভেড়ার একটা পাল অদৃশ্য হয়ে যায়। রাখালের কথা থেকে জানা গেল ভেড়ার পালটা যখন চরে বেড়াচ্ছিল সেই সময় একটা গোলা তাদের সামনে ফেটে পড়ে, তাইতে ভেড়াগুলো ভয়ে দিশেহারা হয়ে তাদের বেঁড়ে মোটা লেজ নাড়াতে নাড়াতে উর্ধ্বশ্বাসে স্তেপের মাঠের মধ্যে ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা ফিরে আসার এক সপ্তাহ পরে গ্রামের বারো-চৌদ্দ ক্রোশ দূরে ইয়েলান্‌স্কায়া জেলা-সদরের কাছে সেগুলোর সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু তাড়িয়ে নিয়ে আসার পর যখন বাছাই করা শুরু হল তখন দেখা গেল অর্ধেক ভেড়াই অন্য জেলার পালের, তাদের কানে অচেনা কাদের যেন চিহ্ন মারা। গোনাগুনতির পর দেখা গেল নিজেদের পঞ্চাশটারও বেশি ভেড়ার কোন পাত্তা নেই। বগাতিরিওভদের একটা সেলাইকল খুঁজে পাওয়া গেল মেলেখভদের অলাজে বাগানে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তার গোলাঘরের টিনের চালটা বার করল আনিকুশ্‌কার মাড়াই উঠোন থেকে। আশেপাশের গ্রামগুলোরও এই একই অবস্থা। এর পরেও অনেকদিন ধরে দন পারের কাছের ও দূরের এলাকার অনেক গ্রাম থেকে লোকজন তাতারস্কিতে এসেছে, আরও অনেক দিন ধরে দেখাসাক্ষাতের সময় প্রায়ই শোনা গেছে: 'একটা পাটকিলে গাই দেখেছ – বাঁ শিংটা ভাঙা, চাঁদকপালে?' 'এক বছরের একটা এঁড়ে বাছুর – কালচে বাদামী রঙের – ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের এখানে এসে পড়ে নি ত?' – এমনি সব প্রশ্ন।

সন্দেহ নেই একাধিক এঁড়ে বাছুর কসাক স্কোয়াড্রনগুলোর রসুইগাড়িতে বড় বড় কড়ায় সেদ্ধ হয়ে যথাস্থানে চালান হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মালিকরা আশায় বুক বেঁধে বেশ কিছুকাল স্তেপের মাঠ চষে বেড়ায়, যতক্ষণ না এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসে যে, জিনিস হারালেই যে খুঁজে পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ পল্টনের কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার পর সদ্য

উৎসাহে বার বাড়ি আর বেড়া ঠিকঠাক করতে লেগে গেল। মাড়াই উঠোনে তখনও বেশ কিছু ঝাড়াই-মাড়াই না করা ফসলের গাদা পড়ে ছিল। পেটুক ইঁদুরগুলো তার ওপর দিয়ে অবাধে ঘুরঘুর করছে। কিন্তু বুড়ো মাড়াইয়ের কাজে হাত লাগাল না। উঠোনটা বেড়া ছাড়া হয়ে পড়ে আছে, গোলাঘর বলতে কিছু নেই, গোটা খামারটা বিধ্বস্ত, নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত এই অবস্থায় কী ক'রে ও কাজে হাত দেওয়া যায়? তাছাড়া এ বছর শরৎকালে আবহাওয়া এখনও ভালো চলছে। তাই মাড়াইয়ের কাজে তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন নেই।

দুনিয়াশ্‌কা আর ইলিনিচ্‌না বাড়িঘরের দেয়ালে পলেস্তারা লাগায়, চুনকাম করে, সাময়িক ভাবে বেড়া লাগানো এবং গেরস্থালির আরও নানা কাজে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে সব রকমে সাহায্য করে। কোন রকমে কাচ যোগাড় ক'রে জানলায় লাগানো হল। বাইরের রান্নাঘর আর ইঁদারাটাও পরিষ্কার করা হল। বুড়ো নিজে কুয়োর ভেতরে নেমেছিল। সম্ভবত সেখানেই তার ঠাণ্ডা লেগেছিল। এক সপ্তাহ ধরে হাঁচি-কাশি চলেছে, ঘামে ভেজা জামা গায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু এক নাগাড়ে বসে দু'বোতল ঘরে-চোলাই মদ টানার পর গরম চুল্লির তাকের ওপরকার বিছানায় একটু শুয়ে যেই উঠল অমনি কর্পূরের মতো উধাও হয়ে গেল তার রোগ।

গ্রিগোরির কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই। শুধু অক্টোবরের শেষে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ দৈবক্রমে জানতে পেল গ্রিগোরি বেশ সুস্থই আছে, নিজের রেজিমেণ্টের সঙ্গে ভরোনেজ প্রদেশের কোথাও আছে। গ্রিগোরির রেজিমেণ্টের এক আহত সেপাই ওদের গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, তার মুখে বুড়ো এই খবরটা পায়। খবর পেয়ে দারুণ খুশি হয়ে ওঠে। আনন্দের আতিশয্যে লাল লঙ্কা দিয়ে ঘরে চোলাই সঞ্জীবনী সুরার শেষ বোতলটাও সাবাড় ক'রে দেয়। তারপর সারা দিন তার বকবকানি আর থামে না। জোয়ান মোরগের মতো বুক ফুলিয়ে চলে, পথ-চলতি যাকেই দেখে তাকে থামিয়ে বলে: 'ওহে খবর শুনেছ তোমরা? আমাদের গ্রিগোরি ত ভরোনেজ দখল ক'রে ফেলেছে। শোনা যাচ্ছে চাকরীতে ওর নাকি আরও উন্নতি হয়েছে, আবার একটা ডিভিশন চালানোর ভার পেয়েছে - বলা যায় না, একটা কোর্‌-এরও হতে পারে। ওর মতন একটা লড়িয়ে খুঁজে পাওয়া ভার। সে ত তুমি নিজেও জান। ...' নিজের আনন্দের ভাগ অন্যকে দেওয়ার অদম্য তাগিদে আর খানিকটা বড়াই করার উদ্দেশ্যেও বটে, বুড়ো বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে যায়।

গ্রামের লোকেরা উত্তরে বলে, 'হ্যাঁ, তোমার ছেলে একজন বীরপুরুষ বটে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খুশি হয়ে চোখ টেপে।

'বীরপুরুষ হবে না ত কী? কার ছেলে দেখতে হবে না? বললে বড়াই করা হবে না, জোয়ান বয়সে আমিই বা ওর চেয়ে কম ছিলাম কিসে! এই পা'টাই যত গণ্ডগোল বাধিয়েছে, নইলে এই এখনও দেখিয়ে দিতাম আমার ক্ষ্যামতা! ডিভিশনের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু একটা স্কোয়াড্রন কী ভাবে চালাতে হয় তা আমি ভালোই দেখিয়ে দিতে পারতাম। আমাদের মতো বুড়োদের আরও বেশি ক'রে লড়াইয়ে নিলে অনেক আগেই মস্কো আমাদের হাতে চলে আসত অথচ কাণ্ড দেখ, এক জায়গায় পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, বুন্দী চাষাভুষোগুলোর সঙ্গে কোনমতে এঁটে উঠতে পারছে না।...'

শেষ যে লোকটির সঙ্গে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের সেদিন কথাবার্তা হয় সে হল বুড়ো বেস্‌খ্লেব্‌নভ। মেলেখভদের বাড়ির পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ তাকে থামানোর এ সুযোগ হাতছাড়া করল না।

'এই যে ফিলিপ আগেভিচ! একটু দাঁড়াও দেখি! কেমন চলছে? ভেতরে এসোই না, একটু গল্পসল্প করি।'

বেস্‌খ্লেব্‌নভ এগিয়ে এসে নমস্কার জানায়।

'আমার গ্রিশ্‌কা কী রকম তাক লাগিয়ে দিচ্ছে শুনেছ?' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলে।

'না ত! কী ব্যাপার!'

'আরে, আবার ওকে ডিভিশনের ভার দিয়েছে! কী বিরাট দায়িত্ব ওর ওপরে বল ত!'

'ডিভিশন?'

'হ্যাঁ, পুরো একটা ডিভিশন!'

'বল কী!'

'তাহলে আর বলছি কি! ওকে দেবে না ত কাকে দেবে? তোমার কী মনে হয়?'

'সে আর বলতে!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ উৎফুল্ল হয়ে সঙ্গীর দিকে তাকায়। সোৎসাহে চালিয়ে যায় বড় মধুর, প্রাণজুড়ানো আলোচনা।

'ছেলে আমার সবাইকে সত্যি সত্যি অবাক ক'রে দিলে। মেডেল আর ক্রসে বুক বোঝাই – এ কি চাট্টিখানি কথা বাপু? তাছাড়া কতবার জখম হয়েছে, গোলা ফাটার শব্দে মাথায় ধন্ধ লেগেছে ওর – তার কোন ঠিক ঠিকানা আছে নাকি? অন্য কেউ হলে কোন্ কালে মরে ভূত হয়ে যেত। কিন্তু ওর কিছুই নয় – হাঁসের ডানায় জল লাগার মতো। না, এখনও প্রশান্ত দনের মাটিতে সত্যিকারের কসাক একেবারে শেষ হয়ে যায় নি!'

'হ্যাঁ শেষ হয়ে যায় নি। শেষ হয়ে যায় নি বটে, তবে তাদের দিয়ে লাভ আর তেমন কীই বা হচ্ছে?' বাচাল বলে বুড়ো বেস্‌খ্লেব্‌নভের তেমন একটা পরিচয় না থাকলেও কী যেন ভাবতে ভাবতে সে দুম্‌ ক'রে বলে বসল।

'অ্যাঁ, লাভ তেমন কী হচ্ছে মানে? লালদের কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে দেখেছ? একেবারে সেই ভরোনেজের ওপারে। মস্কোর কাছাকাছি চলে এলো বলে।...'

'আসতে যেন বড় বেশি দিন লাগিয়ে দিচ্ছে।...'

'অত তাড়াহুড়ো করলে কি আর চলে, ফিলিপ আগেভিচ। একবার ভেবে দেখ, লড়াইয়ের মধ্যে তাড়াহুড়োয় কোন কাজই করা যায় না। যত কর তাড়াতাড়ি ভুল হবে বাড়াবাড়ি। সব কাজ করতে হয় ধীরেসুস্থে, ম্যাপ দেখে, তারপর ওই যে ওরা যাকে পেলান-টেলান বলে সে রকম আরও কত কিছু দেখেশুনে।... রাশিয়ায় চাষাভুষোর দল ত পিলপিল করছে, কিন্তু আমরা কসাকরা কয়জন? মাত্র গোটাকতক!'

'সবই মানলাম। কিন্তু আমাদের সেপাইরা বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। শীতকাল নাগাদ ফের অতিথি আসতে পারে, তৈরি হয়ে থাকতে হবে। লোকে এই কথাই বলছে।'

'এখুনি যদি মস্কো ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারে তাহলে ওরা আবার এখানে এসে হানা দেবে - একথা তুমি ঠিকই বলেছ।'

'তুমি কি ভাবছ নিতে পারবে?'

'নিতে পারা ত উচিত। কিন্তু সবই ভগবানের হাতে। আমাদের লোকেরা পারবে না বলছ? আমাদের বারোটা কসাক ফৌজের সবগুলো পায়ে খাড়া। তাও পারবে না বলতে চাও?'

'কে জানে ছাই! কিন্তু তোমার কী হল? লড়াইয়ের সাধ মিটে গেল নাকি?'

'আমি আর কিসের লড়িয়ে এখন বল? আমার পায়ের যদি রোগ না থাকত তাহলে শত্তুরের সঙ্গে কী ভাবে লড়তে হয় দেখিয়ে দিতাম ওদের! আমরা বুড়োরা হলাম শক্ত জাতের লোক!'

'লোকে যে বলে এই শক্ত জাতের বুড়োরাই নাকি লালদের তাড়া খেয়ে হুড়মুড় করে ওপার থেকে এমন ছুট লাগিয়েছিল যে কারও গায়ে একটা খাটো লোমের কোট অবধি ছিল না, ছুটতে ছুটতে গা থেকে সব কিছু খুলে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। উদোম হয়ে ছুটেছে। সকলে এই বলে হাসাহাসি করছে যে স্তেপের সারাটা মাঠ নাকি পশুলোমের কোর্তায় হলদে হয়ে গিয়েছিল - ঠিক যেন হলুদ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে!'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ আড়চোখে বেস্‌স্লেব্‌নভের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'আমি বলব এসব একদম বাজে কথা। হয়ত বা কেউ বোঝা হালকা করার জন্যে গায়ের জামাকাপড় ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু লোকে সেটাকেই এক শ' গুণ বাড়িয়ে বানিয়ে বানিয়ে যা নয় তাই বলবে। হুঃ মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তা, নয়ত লোমের কোর্তাই হল – এটাকে তুমি একটা বিরাট ব্যাপার বলছ। বলি, মানুষের জীবনের দাম তার চেয়ে বেশি কি না? তাছাড়া কাপড়চোপড় প'রে চটপট দৌড়ানো কি আর যে-কোন বুড়ো মানুষের কম্ম? এই হতচ্ছাড়া লড়াইয়ে শিকারী কুকুরের ঠ্যাং চাই। কিন্তু আমার কথাই ধর না কেন – অমন ঠ্যাং আমি কোত্থেকে পাব? কী নিয়ে তুমি অমন দুঃখু করছ ফিলিপ আগেভিচ? ভগবান মাপ করুন, কিন্তু বলতে পার তোমার কোন পিণ্ডিতে লাগবে ওগুলো, মানে ওই কোর্তাগুলো? ব্যাপারটা লোমের কোর্তা নিয়ে নয়, কিংবা ধরলামই না হয় মোটা সুতীর কাপড়ের কোর্তা – তা নিয়েও নয়। আসল কথাটা হল দুশমনকে মোক্ষম ঘায়েল করতে পারা – ঠিক কথা বলছি কিনা আমি? আচ্ছা, এবারে এসো তাহলে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সময়েরই খেয়াল ছিল না। এদিকে কত যে কাজ পড়ে আছে! তোমার বাছুরটা কি পেলে? এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছ? কোন পাত্তা পেলে না? তাহলে আর দেখতে হবে না, খোপিওরের কসাকরা হজম ক'রে দিয়েছে। মরণও হয় না হারামজাদাগুলোর! তবে লড়াইয়ের কথা যদি বল, ও নিয়ে মনের মধ্যে কোন সন্দ রেখো না – আমাদের কসাকরা ওই চাষী ব্যাটাদের নির্ঘাত সুজুত করবে!' এই বলে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গুরুগম্ভীর চালে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দেউড়ির দিকে চলল।

কিন্তু 'চাষী ব্যাটাদের' সুজুত করা তেমন সোজা কাজ মনে হল না। . . . কসাকরা তাদের শেষবারের হামলার সময় ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে পারল না। ঘণ্টাখানেক বাদেই খারাপ খবর শুনতে পেয়ে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের অত ভালো মেজাজটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। কাঠের গুঁড়ি কেটে শুয়োর চারধারের বেড়টা বানাচ্ছিল, এমন সময় কানে এলো নারীকণ্ঠের আর্তনাদ আর মরার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ। আওয়াজটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ব্যাপার কী জেনে আসতে দুনিয়াশ্‌কাকে পাঠাল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

'যা দেখি জেনে আয় কে মারা গেল,' কাঠ কাটার গুঁড়িটায় কুড়ুল গেঁথে রেখে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল।

খানিক বাদেই দুনিয়াশ্‌কা ফিরে এসে খবর দিল ফিলোনোভো ফ্রন্ট থেকে তিনজন নিহত কসাককে নিয়ে আসা হয়েছে। তারা হল আনিকুশ্‌কা, খ্রিস্তোনিয়া আর সতেরো বছর বয়সের এক ছোকরা, গ্রামের শেষপ্রান্তে যার বাড়ি। খবর

শুনে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হতবাক। মাথার টুপি খুলে ক্রুশ-প্রণাম ঠুকল।

'অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক ওদের! কী চমৎকার কসাকই না ছিল।' খ্রিস্তোনিয়ার কথা ভেবে সখেদে সে বলে। তার মনে পড়ে যায় এই ত সেদিন সে আর খ্রিস্তোনিয়া একসঙ্গে তাতারস্কি থেকে রওনা হয়েছিল জমায়েতের ঘাঁটিতে।

কাজ ওর মাথায় উঠল। আনিকুশ্‌কার বৌ এমন ভাবে চেঁচিয়ে কাঁদছে যেন কেউ ওকে ছুরি মেরেছে। এমন সুরে বিলাপ শুরু ক'রে দিয়েছে, তা শুনে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম। নারী কণ্ঠের এই বুক-ফাটা কান্না যাতে শুনতে না হয় তাই সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়ে পেছন থেকে দরজাটা এঁটে বন্ধ ক'রে দেয়। ভেতরের ঘরে দুনিয়াশ্‌কা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ইলিনিচ্‌নাকে বৃত্তান্ত বলে যাচ্ছে।

'...একবার তাকিয়ে দেখলাম... যা দেখলাম মা গো মা!... আনিকুশ্‌কার মাথা বলতে প্রায় কিছুই নেই। মাথার জায়গায় থেঁতলান থকথকে খানিকটা কী যেন! ওঃ কী সাংঘাতিক! আর সে যা বিশ্রী গন্ধ! কোশখানেক দূর থেকেও পাওয়া যায়।... কেন যে ওরা ওকে বাড়িতে নিয়ে এলো – কে জানে? আর খ্রিস্তোনিয়া চিত হয়ে শুয়ে আছে গোটা গাড়িটা জুড়ে, পাদুটো ওর লম্বা কোটের পেছন থেকে নীচে ঝুলছে।... খ্রিস্তোনিয়া পরিষ্কার, সাদা ধবধবে, ঠিক যেন দুধের ফুটন্ত ফেনা! খালি ডান চোখের নীচে একটা ফুটো – এই এতটুকুন – একটা তামার পয়সার সমান হবে। কানের পেছনে দেখা যাচ্ছে জমাট বেঁধে আছে রক্তের চাপ।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভীষণ জোরে থুতু ফেলে বেরিয়ে চলে গেল উঠোনে। কুড়ুল আর বৈঠা তুলে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল দনের দিকে।

রান্নাঘরের কাছে মিশাত্‌কা খেলছিল। বুড়ো চলতে চলতেই তাকে ডেকে বলল, 'লক্ষ্মী দাদু আমার, তোর ঠাকুমাকে বলিস আমি দনের ওপারে শুকনো ডালপালা কাটতে চললাম। শুনছিস?'

দনের ওপারে বনে শান্ত স্নিগ্ধ শরৎ নেমে এসেছে। পপ্‌লার গাছ থেকে খসখস শব্দে ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। বনগোলাপের ঝোপগুলো দাঁড়িয়ে আছে যেন আগুনের শিখায় গা জড়িয়ে, অল্পস্বল্প পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল বীজফলগুলো আগুনের ছোটছোট জিভের মতো লকলক করছে। ওক গাছের ছালবাকলে পচন ধরেছে – তার তীব্র কটু গন্ধ সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়েছে বনের সর্বত্র। কাঁটাফলের গাছগুলো ঘন হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে জড়াজড়ি করে আছে, তার লতানে ডালপালার বুনুনীর তলায় কায়দা ক'রে রোদ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে ধোঁয়াটে ময়ূরকণ্ঠীরঙের পাকা ফলের থোকাগুলো। মরা ঘাসের ওপর, যেখানে

ছায়া পড়েছে, দুপুর অবধি লেগে থাকে শিশিরবিন্দু, ঝিলমিল করে রুপোলি ছোঁয়াচে মাকড়সার জাল। সে শান্তি ভঙ্গ করে শুধু ব্যস্তসমস্ত কাঠঠোকরার অবিরাম একটানা ঠকঠক শব্দ আর বুনো ফলের ঝোপের ভেতরে দোয়েল-শ্যামাদের কিচিরমিচির।

বনের নির্বাক নিস্তব্ধ কঠোর সৌন্দর্য পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের মনে প্রশান্তির ভাব এনে দিল। মাটির ওপর ঝরাপাতার ভিজে চাদর দু'পায়ে টেনে তুলতে তুলতে ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলে আর মনে মনে ভাবে: 'এই ত জীবন! এই সেদিনও ওদের দেহে প্রাণ ছিল, আর আজ কিনা ওদের গোসল দেওয়া হচ্ছে। কী একজন কসাকই না মারা পড়ল! মনে হয় এই মাত্র সেদিনকার কথা। এসে আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে গেল, দারিয়াকে জল থেকে তোলার সময় দনের পারে দাঁড়িয়ে ছিল। আহা ক্রিস্তোনিয়া রে! তোর কপালেও শেষ কালে শত্রুরের বুলেট জুটল। আর আনিকুশ্‌কা।... কী ফূর্তিবাজই ছিল। মদ খেতে, হাসিঠাট্টা করতে ভালোবাসত। কিন্তু এখন সব শেষ – ও এখন একটা লাশ।...' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের মনে পড়ে গেল দুনিয়াশ্‌কার কথাগুলো। আশ্চর্যরকম পরিষ্কার ভাবে স্মৃতিতে ভেসে উঠল আনিকুশ্‌কার চেহারাটা – গোঁফ-দাড়িছাড়া মাকুন্দোধরনের, হাসি-হাসি মুখখানা। কিছুতেই ধারণা করা যায় না এখনকার প্রাণহীন আনিকুশ্‌কাকে, যার মাথাটা এমন থেঁতলে গেছে যে চেনার কোন উপায় নেই। বেস্‌খ্লেব্‌নভের সঙ্গে আলাপের কথা মনে পড়তে নিজেকে ধিক্কার দেয় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ: 'গ্রিগোরিকে নিয়ে অত বড়াই ক'রে খামোকাই ভগবানের চোখে অপরাধী হলাম আমি। হয়ত গ্রিগোরিও এখন বুলেটের ঠোক্কর খেয়ে কোথাও পড়ে আছে? ভগবান না করুন। অমন যেন না হয়। তাহলে এই বুড়ো বয়সে আমাদের দেখবে কে?'

ঝোপের ভেতর থেকে একটা খয়েরী রঙের বন মোরগ ডানা ঝটপটিয়ে বেরিয়ে আসতে ভয়ে চমকে ওঠে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে পাখিটার কাত হয়ে দ্রুতগতিতে আকাশে ওড়া, তারপর এগিয়ে চলে। একটা ছোট ডোবার ধারে শুকনো ডালপালার গোটা কয়েক ঝাড় দেখতে পেয়ে তার বেশ মনে ধরে যেতে সেগুলো কাটতে লেগে গেল। কাজ করতে করতে কেবলই চেষ্টা করতে থাকে কিছু না ভাবার। এক বছরের মধ্যে এতগুলো প্রিয়জন আর চেনাজানা মানুষকে মরণ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে যে সে কথা ভাবতে গিয়ে ওর মনটা ভার হয়ে ওঠে। সমস্ত বিশ্বসংসার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসে, যেন একটা কালো পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়।

বিষণ্ণ চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য সে জোরে জোরে নিজের সঙ্গে

নিজেই কথা বলে: 'এই যে এই কোণটা কাটা যাক। বেশ ভালো ডালগুলো! চমৎকার বেড়া হবে।'

অনেকক্ষণ কাজ করার পর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ গায়ের কোর্তা খুলে ফেলল। কাটা ডালপালার স্তূপের ওপর বসে বুক ভরে নিশ্বাসের সঙ্গে নিস্তেজ পাতার ঝাঁঝাল গন্ধ টেনে নিতে থাকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে হালকা নীল ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশায় জড়ানো দিগন্তের দিকে, শরতের সোনালি ছোঁয়াচ লাগা, শেষ সাজে ঝলমলে দূরের ছোট ছোট বনঝাড়ের দিকে। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো ম্যাপল ঝাড়। অবর্ণনীয় তার সাজ। শরতের হিমেল রোদে সর্বাঙ্গ ঝলমল করছে। সিঁদুরে লাল পাতার ভারে নুয়ে পড়া ছড়ানো ডালগুলো দেখলে মনে হয় যেন রূপকথার কোন পাখি ডানা মেলেছে – মাটি ছেড়ে আকাশে উঠবে বলে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে তারিফ করে। তারপর দৈবাৎ ডোবার দিকে চোখ পড়তে স্বচ্ছ স্থির জলের মধ্যে দেখতে পায় বড় বড় কতকগুলো কাতলা মাছের কালো পিঠ। মাছগুলো জলের এতটা ওপরে এসে সাঁতার কাটছে যে তাদের লাল লেজের ঝাপ্‌টানি আর পাখনা চোখে পড়ে। সবসুদ্ধ গোটা আষ্টেক হবে। কখনও শাপলার সবুজ পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে, পরক্ষণেই আবার ভেসে উঠছে পরিষ্কার জলে, বেতসের জলে ডোবা ভিজে পাতাগুলো চেপে ধরছে। শরতের মুখে ডোবাটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে, মাছগুলোকে ধরতে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কোন কারণ নেই। এদিক ওদিক খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর পাশের বিলের ধারে কারও ফেলে দেওয়া একটা ঝুড়ি ওর চোখে পড়ল। ঝুড়ির তলাটা ভাঙা। ডোবার ধারে ফিরে এসে পাতলুন খুলে ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে হি-হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে, জলে নেমে কাজে লেগে যায়। হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে ডুবে যায়। জল ঘোলা ক'রে ডোবার ধারের জল ঠেলে হাঁটতে থাকে, ঝুড়িটা নামিয়ে তার কিনারা দিয়ে জলের তলা চেপে ধরে, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখে। আশা ক'রে এই বুঝি ছলাত ছলাত ক'রে ঘাই মারে বিশাল একটা মাছ। ওর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সার্থক হল। তিন তিনটে কাতলা সে ধরে ফেলল। একেকটা সের পাঁচেক হবে। কিন্তু মাছ ধরা আর বেশিক্ষণ চালান গেল না – ঠাণ্ডায় ওর খোঁড়া পা'টায় খিচ ধরতে থাকে। যা ধরেছে তাতেই ও সন্তুষ্ট। ডোবা থেকে উঠে এসে ঘাসপাতা দিয়ে পা মুছে পাতলুন পরে আবার ডালপালা কাটতে শুরু করে শরীরটাকে গরম করার জন্য। একেই বলে কপালজোর। আচমকা প্রায় আধমনখানেক মাছ ধরা যার তার ভাগ্যে জোটে না! মাছ ধরতে পেরে বেশ আনন্দ হল, বিষাদের ভাবটা কেটে গেল। আবার ফিরে এসে বাকি মাছগুলো ধরবে এই আশায় ঝুড়িটা একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখল। কচি শুয়োরছানার

মতো নধর, সোনালি রঙের কাতলাগুলোকে সে যে ভাবে ডাঙায় তুলল তা কারও চোখে পড়ল কিনা এই ভয়ে সতর্ক ভাবে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। শুধু তার পরেই ডালের সঙ্গে বেঁধানো মাছগুলো আর কাঠের বোঝাটা তুলে নিয়ে ধীরেসুস্থে হাঁটা দিল বনের দিকে।

পরিতৃপ্তির হাসি হেসে ইলিনিচ্‌নাকে বুড়ো মাছ ধরার ব্যাপারে তার ভাগ্যের কথা বলে। লালচে তামার চলচল লাবণ্য মাখানো মাছগুলোকে আরও একবার প্রাণ ভরে দেখে। কিন্তু ওর পুলকের ভাগ নেওয়ার মতো মনের অবস্থা ইলিনিচ্‌নার ছিল না। যারা মারা গিয়েছে তাদের দেখতে গিয়েছিল সে। সেখান থেকে আসার পর মন ভার হয়ে আছে, চোখ জলে ভরে উঠেছে।

'আনিকেইকে একবার দেখতে যাবে না গো?' বুড়ি জিজ্ঞেস করল।

'না, যাব না। মরা মানুষ কোন দিন দেখি নি নাকি? দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেলাম। আর নয়।'

'একবার গেলে পারতে কিন্তু। কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছে। লোকে বলবে শেষ দেখা দেখতেও এলো না।'

'আঃ ছাড় দেখি আমাকে। খ্রীষ্টের দোহাই। সে আমার ছেলেপুলের ধর্মবাপও নয়, কিছুই নয়। শেষ দেখা দেখতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না!' ক্ষিপ্ত হয়ে খেঁকিয়ে ওঠে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ।

কবর দেওয়ার সময়ও সে গেল না। সে দিন সকাল হতে দনের ওপারে চলে গেল। সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে দিল। বনে থাকতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঘণ্টার আওয়াজ ওর কানে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার টুপি খুলে ক্রুশ-প্রণাম করল। কিন্তু পরক্ষণেই পুরুতের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠল। এতক্ষণ ধরে গির্জার ঘণ্টা বাজানোর কোন মানে হয়? একবার ক'রে ঘণ্টা বাজালেই ত চুকে যেত বাপু। তা নয় ত ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে বাজছে ত বাজছেই। অত ঘণ্টা বাজিয়ে লাভটা কী? শুধু শুধু লোকের মনে কষ্ট দেওয়া, অযথা মনে করিয়ে দেওয়া মৃত্যুর কথা। এই শরৎকালে ঝরা পাতা, নীল আকাশের বুকে কলধ্বনি তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁসের উড়ে যাওয়া, মাটির বুকে লেপটে থাকা মরা ঘাস—এ সব ত অমনিতেই মনে করিয়ে দেয় তার কথা। . . .

নানা রকম গভীর মনোকষ্ট থেকে নিজেকে যতই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুক না কেন পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ, কিছুদিন বাদে নতুন এক আঘাত পেতে হল তাকে। একদিন বাড়িতে সকলে খেতে বসেছে, এমন সময় জানলার দিকে তাকিয়ে দুনিয়াশ্‌কা বলে উঠল, 'লড়াই থেকে আরও একজন কার যেন মড়া নিয়ে এলো। গাড়ির পেছনে পল্টনের জিন বাঁধা ঘোড়া, টানা দড়ি দিয়ে বাঁধা। গাড়ি আস্তে

আস্তে আসছে। একজন গাড়ি চালাচ্ছে। মরা মানুষটা গ্রেটকোটে ঢাকা, পড়ে আছে। আর ওই যে-লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে তার পিঠটা আমাদের দিকে পিছন ফেরানো, তাই বুঝতে পারছি না আমাদের গাঁয়ের না বাইরের লোক . . .' বলতে বলতে দুনিয়াশ্‌কা বেশ মন দিয়ে তাকিয়ে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে ওর গাল কাগজের চেয়েও ফেকাসে হয়ে গেল। 'আরে আরে . . . এ যে . . .' অসংলগ্ন ভাবে ফিসফিসিয়ে ও বলল, পরক্ষণেই হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: 'এ যে গ্রিশাকে নিয়ে আসছে! ওর ঘোড়া যে এটা!' কাঁদতে কাঁদতে সে ছুটে বেরিয়ে গেল বারান্দায়।

ইলিনিচ্‌না টেবিল ছেড়ে উঠতে পারল না। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ কোন রকমে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ফটকের দরজা খোলে প্রোখর জিকভ। দুনিয়াশ্‌কাকে দেউড়ি থেকে ছুটে নেমে আসতে দেখে এক ঝলক তার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণকণ্ঠে বলে, 'অতিথি এসেছে গো। . . . আশা কর নি নিশ্চয়ই?'

'ওগো, আমার দাদামণি গো!' হাত মোচড়াতে মোচড়াতে আর্তনাদ করে ওঠে দুনিয়াশ্‌কা।

ওর চোখের জলে ভেজা মুখটার দিকে তাকিয়ে আর পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে নির্বাক হয়ে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এতক্ষণে যেন প্রোখর বুদ্ধি ক'রে বলতে পারল, 'ভয়ের কিছু নেই। ভয়ের কিছু নেই। ও বেঁচে আছে। টাইফাস জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ অবসন্ন হয়ে দরজার চৌকাঠে পিঠ ঠেকাল।

'বেঁচে আছে!' দুনিয়াশ্‌কা হেসে কেঁদে চিৎকার করে ওকে বলল। 'গ্রিশা আমাদের বেঁচে আছে! শুনতে পাচ্ছ? ওর অসুখ করেছে, তাই বাড়ি নিয়ে এসেছে ওকে! যাও, মাকে গিয়ে বল! বাঃ রে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

'ভয় পেয়ো না পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। ওকে জ্যান্ত নিয়ে এসেছি। শরীরের কথা আর জিগ্‌গেস কোরো না,' মুখের লাগাম ধরে ঘোড়াগুলোকে উঠোনের ভেতরে টেনে আনতে আনতে প্রোখর বলল।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বেসামাল কয়েকটা পা ফেলে শেষকালে সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর ধপ ক'রে বসে পড়ল। ওর পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে দুনিয়াশ্‌কা বাড়ির ভেতরে ছুটল মাকে শান্ত করতে। প্রোখর ঘোড়াগুলোকে দেউড়ির ঠিক কাছেই থামিয়ে তাকাল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের দিকে।

'বসে রইলে যে বড়? একটা চট কাপড়-টাপড় আন। ওকে বাড়ির ভেতরে বয়ে নিয়ে যাই।'

বুড়ো চুপচাপ বসে থাকে। চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল ঝরে। মুখখানা নিথর, একটা পেশীও নড়ছে না মুখের। দু'বার হাত তুলল ক্রুশ-প্রণাম করবে বলে, কিন্তু দু'বারই নামিয়ে ফেলল – তুলে যে কপালে ঠেকাবে সে শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। গলার ভেতরে কী যেন একটা ডেলা পাকিয়ে ঠেলে উঠতে গেল।

'ভয়ে দেখি তোমার বুদ্ধিসুদ্ধিই লোপ পেয়ে গেল,' সহানুভূতি দেখিয়ে প্রোখর বলল। 'নাঃ দোষটা দেখছি আমারই। বুদ্ধি ক'রে কেন যে আগেভাগে কাউকে পাঠাই নি তোমাদের সাবধান করে দেবার জন্যে! আকাট, একেবারেই আকাট দেখছি আমি। হয়েছে, ওঠো ওঠো, প্রকোফিচ। অসুস্থ লোকটাকে তুলে নিয়ে যেতে হয় যে। কোথায় তোমাদের চটকাপড়? নাকি চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাব?'

'একটু রোসো . . .' ফ্যাসফেঁসে গলায় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বলল। 'আমার পাদুটো কেন যেন আর বশে নেই। . . . আমি ভেবেছিলাম বুঝি মারাই গেছে। . . . ভগবানের দয়া। . . . ভাবতেই পারি নি। . . .' বলতে বলতে গায়ের পুরনো রংচটা জামার কলারের বোতামগুলো পটপট ছিঁড়ে ফেলল। কলারের ফাঁকটায় বুক খুলে হাঁ করে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

'ওঠো ওঠো প্রকোফিচ।' প্রোখর তাড়া দেয়। 'আমরা ছাড়া আর কে-ই বা ওকে বয়ে নিয়ে যাবে?'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ বেশ খানিকটা জোর খাটিয়ে দেউড়ির ধাপ বয়ে নীচে নামল। গায়ের গ্রেটকোটটা ঝাঁকিয়ে পেছনে ফেলে সংজ্ঞাহীন গ্রিগোরির শায়িত মূর্তির ওপর ঝুঁকে পড়ল। আবার তার গলায় কী যেন একটা ঠেলে উঠতে থাকে। কিন্তু এবারে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রোখরের দিকে মুখ ফেরায়।

'ওর পাদুটো ধর। আমরা বয়ে নিয়ে যাব।'

গ্রিগোরিকে ওরা ভেতরের ঘরে বয়ে নিয়ে গেল। জুতোজামা খুলে ওকে খাটে শুইয়ে দিল। দুনিয়াশ্‌কা রান্নাঘর থেকে উৎকণ্ঠাভরে চেঁচিয়ে ডাকল।

''বাবা। মা'র শরীর কেমন কেমন করছে। . . . এদিকে এসো একবার'!'

রান্নাঘরের মেঝেতে পড়ে আছে ইলিনিচ্‌না। মুখটা নীল হয়ে গেছে। দুনিয়াশ্‌কা হাঁটু গেড়ে বসে তার মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে।

'ছুটে যা দিকি, কাপিতোনভ্‌না বুড়িকে ডেকে নিয়ে আয়। জলদি। শিরা থেকে রক্ত বার করতে জানে সে। বলবি মা'র খানিকটা রক্ত ফেলা দরকার। যন্তরপাতি যা আছে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসুক।' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হুকুম দিল।

বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে দুনিয়াশ্‌কা। চুল গোছগাছ না ক'রে খালি মাথায় এখন কি সে আর গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ছুটতে পারে? ওড়না তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি মাথা ঢাকতে ঢাকতে সে বলল, 'ইস্‌ বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ।

ভয়ে মরমর! হা ভগবান, এ কী হল! . . . ওদের দেখো বাবা, আমি এই এলাম বলে।'

হয়ত বা আয়নায় উঁকি মেরে নিজেকে এক ঝলক দেখার সাধও দুনিয়াশ্‌কার ছিল। কিন্তু পায়েলেই প্রকোফিয়েভিচ ততক্ষণে ধাতস্থ হয়ে উঠেছে। এমন ভাবে কটমট ক'রে দুনিয়াশ্‌কার দিকে তাকাল যে সে চটপট রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

দৌড়ে গেটের বাইরে আসতে দুনিয়াশ্‌কা দেখতে পেল আক্সিনিয়াকে। আক্সিনিয়ার ফর্সা মুখটাতে রক্তের লেশমাত্র ছিল না। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতদুটো নিষ্প্রাণ হয়ে দু'পাশে ঝুলছে। ওর কালো চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে সেখানে জলের এতটুকু ঝিলিক নেই। কিন্তু তাতে এত বেদনা আর নির্বাক অনুনয় ফুটে উঠছিল যে দুনিয়াশ্‌কা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। নিজেই সে চমকে উঠল যখন নিজের অজানতে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: 'বেঁচে আছে, বেঁচে আছে। ওর টাইফাস জ্বর হয়েছে।' বলেই সে গলির ভেতর দিয়ে জোর কদমে ছুট লাগাল। পীনোন্নত স্তনদুটি লাফাতে থাকায় দু'হাতে চেপে ধরল।

কৌতূহলী মেয়ের দল চারপাশ থেকে তাড়াতাড়ি চলল মেলেখভদের বাড়ির দিকে। তারা দেখতে পেল আক্সিনিয়া ধীরেসুস্থে মেলেখভদের উঠোনের গেট ছেড়ে চলে গেল, তারপর হঠাৎই পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল, সামনে ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

পঁচিশ

সুস্থ হয়ে উঠতে এক মাস লাগল গ্রিগোরির। প্রথম সে বিছানা ছেড়ে উঠল অক্টোবরের শেষ দিকে। ঢ্যাঙা রোগা কঙ্কালসার দেখতে হয়েছে। অনিশ্চিত ভাবে ঘরের মধ্যে কয়েক পা ফেলে এগিয়ে গেল, জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

চালাঘরের খড় ছাওয়া ছাদের ওপর, মাটিতে সদ্য পড়েছে চোখধাঁধানো সাদা তুষারের পাতলা আবরণ। গলিতে স্লেজ চলাচলের দাগ দেখা যাচ্ছে। গাছপালা আর বেড়ার গায়ে ফিনফিনে নীলচে তুষারকণা জমে অস্তগামী সূর্যের কিরণ পড়ে ঝিকমিক করছে, রামধনুর রং ছড়াচ্ছে।

গ্রিগোরি অনেকক্ষণ চেয়ে রইল জানলার বাইরে। আনমনে কী ভাবতে ভাবতে হাসল। অস্থিসার হাতের আঙুল দিয়ে গোঁফে তা দিল। এত চমৎকার শীতকাল ও যেন এর আগে আর কখনও দেখে নি। সবই যেন ওর কাছে

অস্বাভাবিক, নূতনত্বে ভরা, তাৎপর্যপূর্ণ। অসুখের পর ওর দৃষ্টিশক্তি যেন প্রখর হয়ে উঠেছে। এখন ও নিজের আশেপাশে অনেক নতুন নতুন জিনিস দেখতে পায়, অনেক কালের চেনা জানা জিনিসের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ করতে পারে।

গ্রিগোরির আগে যেটা স্বভাবে ছিল না-গাঁয়ে আর ঘর গেরস্থালিতে কী ঘটছে না ঘটছে সবের প্রতি একটা কৌতূহল আগ্রহ-তাও এখন অপ্রত্যাশিত ভাবে জেগে উঠেছে ওর মনে। জীবনের সব কিছু ওর কাছে কেমন যেন নতুন গোপন অর্থবহ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সবেতেই ওর মনোযোগ। নতুন যে জগৎ ওর সামনে দেখা দিয়েছে তার দিকে সে একটু যেন অবাক চোখেই তাকাচ্ছে। ওর ঠোঁটের কোনায় অনেকক্ষণ ধরে লেগে থাকে শিশুর অকপট সরল হাসি। তাতে অদ্ভুত ভাবে বদলে যায় ওর কঠিন মুখাবয়ব, চোখের হিংস্র বন্য ভাবটা। কোমল দেখায় ওর ঠোঁটের কোনার কঠোর ভাঁজগুলো। কখন কখন সে একাগ্র মনোযোগ দিয়ে ভুরু নাচাতে নাচাতে ছেলেবেলা থেকে তার চেনা গৃহস্থালীর নিত্যব্যবহার্য কোন জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তখন তাকে দেখে মনে হয় যেন এই সবে সুদূর এক অচেনা দেশ থেকে এসেছে, সব কিছু এই প্রথম দেখছে। একদিন ওকে চরকাটা নিয়ে চারদিক থেকে ঘুরে ঘুরে নিরীক্ষণ করতে দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেল ইলিনিচ্‌না। ইলিনিচ্‌না ঘরে ঢুকতেই গ্রিগোরি সামান্য অপ্রতিভ হয়ে সেটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

ওর লম্বা হাড়জিরজিরে চেহারাটা দেখে দুনিয়াশ্‌কা ত হেসেই বাঁচে না। গায়ে শুধু অন্তর্বাসটুকু পরা। ভেতরের পাতলুনটা খসে পড়েছে, এক হাতে সেটা চেপে ধরে কুঁজো হয়ে সাবধানে বকের মতো লম্বা সরু সরু ঠ্যাঙ ফেলে ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় সে। বসতে গেলেই ওর ভয় এই বুঝি পড়ে যাবে, তাই হাত দিয়ে একটা কিছু চেপে ধরে। অসুখের সময় ওর যে কালো চুলগুলো বেরিয়েছিল তা এখন পড়ে যাচ্ছে। কপালের সামনে সাদার ছোঁয়াচ লাগা ঘন কোঁকড়া চুলে জট পড়েছে।

দুনিয়াশ্‌কার সাহায্য নিয়ে ও নিজেই মাথাটা কামিয়ে নেয়। বোনের দিকে ফিরে তাকাতেই দুনিয়াশ্‌কার হাত থেকে ক্ষুরটা মাটিতে পড়ে গেল। দু'হাতে পেট চেপে ধরে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

গ্রিগোরি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে কখন ওর হাসি শেষ হয়। কিন্তু শেষ কালে আর না পেরে কাঁপা কাঁপা দুর্বল সরু গলায় বলে ওঠে, 'দ্যাখ, এভাবে চললে কিন্তু শিগ্‌গিরই পস্তাতে হবে তোকে। পরে লজ্জা পেতে হবে তোকে। তুই যে একটা বিয়ের যুগ্যি মেয়ে!' ওর গলার স্বরে একটু আহত ভাব ফুটে ওঠে।

'ওঃ দাদা গো! দাদামণি। নাঃ আমি বরং চলে যাই এখেন থেকে। আর পারি নে। ওঃ তোমাকে যা দেখাচ্ছে না। ঠিক যেন বাগানের কাকতাড়ুয়া!' হাসির ফাঁকে ফাঁকে কোন রকমে দুনিয়াশ্‌কার মুখ থেকে বের হয় কথাগুলো।

'এরকম ভারী অসুখের পর তোর চেহারাটা কেমন হত দেখতে সাধ হয়। নে, ক্ষুরটা তোল! তুললি?'

গ্রিগোরির পক্ষ নিয়ে ইলিনিচ্‌না বিরক্ত হয়ে বলে, 'সত্যিই ত অমন হি হি ক'রে হাসার কী আছে? তুই একটা আচ্ছা বোকা মেয়ে কিন্তু দুনিয়া!'

চোখের জল মুছতে মুছতে দুনিয়াশ্‌কা বলে, 'কিন্তু একবারটি তাকিয়ে দেখই না মা, কেমন হয়েছে ওর চেহারাটা! মাথাটা তরমুজের মতো গোল আর ওরকমই কালচে। এখানে ওখানে ঢিবি বেরিয়ে আছে। . . . উঃ আর পারি নে গো!'

'আয়নাটা দে দেখি!' গ্রিগোরি বলল।

আয়নার ছোট্ট টুকরোটায় নিজের চেহারা দেখে, নিজেই অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকে নিঃশব্দে।

'কেন যে তুই মাথাটা কামাতে গেলি খোকা! যেমন ছিলি তেমনিই ত বেশ ছিল!' অসন্তোষ প্রকাশ করল ইলিনিচ্‌না।

'তুমি কি বলতে চাও আমার টাক পড়ে গেলে ভালো হত?'

'কিন্তু এখন যা তোর চেহারা হয়েছে তাও আহা-মরি কিছু নয়!'

'ধুত্তোর, তোমাদের সকলের নিকুচি করেছি!' কামানোর বুরুশ দিয়ে সাবানের ফেনা ফেটাতে ফেটাতে বিরক্ত হয়ে গ্রিগোরি বলে ওঠে।

বাড়ির বাইরে যাবার কোন উপায় না থাকতে সে এখন অনেকটা সময় বাচ্চাদের নিয়ে কাটায়। তাদের সঙ্গে এটা সেটা নানা বিষয়ে কথা হলেও, নাতালিয়ার প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে। কিন্তু এক দিন ওর গা ঘেঁসে সোহাগ কাড়তে কাড়তে পলিউশ্‌কা জিজ্ঞেস করে বসল, 'আচ্ছা বাবা, মামণি কি আমাদের কাছে আর ফিরে আসবে না?'

'না রে সোনা, ওখান থেকে কেউ ফিরে আসে না। . . .'

'কোত্থেকে? কবরখানা থেকে?'

'মরে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।'

'কিন্তু মা কি একদম মরে গেছে?'

'তা নয় ত কী? একদম মরে গেছে।'

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম কোন সময় হয়ত খুব মন খারাপ হবে আমাদের জন্যে, তখন ফিরে আসবে . . .' ফিসফিস ক'রে এমন ভাবে কথাগুলো বলল যে প্রায় শোনাই যায় না।

'ওর কথা আর ভাবিস নে, সোনা মা আমার,' ভাঙা ভাঙা গলায় গ্রিগোরি বলে।

'কিন্তু কী করে না ভেবে পারব? আচ্ছা যারা মারা যায় তারা কি কখনও দেখতেও আসে না? একটুক্ষণের জন্যেও নয়? একেবারে না?'

'না। যা দেখি, মিশাত্‌কার সঙ্গে খেল গে।' গ্রিগোরি মুখ ঘুরিয়ে নিল। অসুখের ফলে ওর বোধহয় মনের জোরও চলে গেছে। চোখে ওর জল এসে পড়েছিল। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে লুকোবার জন্য অনেকক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে কাচের গায়ে মুখ চেপে রেখে।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যুদ্ধের গল্প করতে ওর ভালো লাগে না। এদিকে মিশাত্‌কার আবার দুনিয়ার যে কোন জিনিসের চেয়ে যুদ্ধের ব্যাপারে বেশি আগ্রহ: লড়াই করে কী ভাবে, লালেরা দেখতে কেমন, কী দিয়ে ওদের মারা হয়, কেন মারা হয় — এই রকম নানা প্রশ্নে প্রায়ই ও তার বাবাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। গ্রিগোরির মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়ে সে বলে, 'দ্যাখ কাণ্ড, আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা! লড়াই তোর যে একেবারে মাথায় ঢুকে গেছে দেখছি! আয় বরং গরমকালে আমরা কী ভাবে ছিপ দিয়ে মাছ ধরব সেই নিয়ে কথা বলা যাক। তোকে একটা ছিপ বানিয়ে দেব? একবার উঠোনে বেরোতে পারলেই হল, ঘোড়ার চুল দিয়ে ছিপের সুতো বানিয়ে দেব তোকে।'

মিশাত্‌কা যুদ্ধের কথা তুললে ও মনে মনে বড় লজ্জা পায়। শিশুর সহজ সরল প্রশ্নের কোন জবাব ও কিছুতেই দিতে পারে না। কেন কে জানে? তার কারণ কি এই নয় যে সে সব প্রশ্নের উত্তর ও নিজেও কখনও নিজের কাছে দেবার চেষ্টা করে নি? কিন্তু মিশাত্‌কার কাছ থেকে রেহাই পাওয়া অত সোজা নয়। মনে হল বেশ মন দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারে বাপের পরিকল্পনার কথা শুনছে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করে: 'আচ্ছা বাবা, যুদ্ধে তুমি মানুষ মেরেছ কখনও?'

'ছাড় দেখি! তুই যে একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে রইলি!'

'মারতে কি খুব ভয় লাগে? আচ্ছা মরলে কি ওদের রক্ত বেরোয়? মুরগীর চেয়ে বেশি, নাকি ভেড়ার চেয়ে বেশি?'

'বললাম না তোকে ওসব কথা আর নয়।'

মিশাত্‌কা মুহূর্তের জন্য চুপ করে। পরে কী ভেবে যেন বলে, 'দাদু এই সেদিন একটা ভেড়া জবাই করেছিল — আমি দেখেছি। ভয় পাই নি আমি।... হয়ত এই একটু ভয় পেয়েছিলাম। তবে সেটা কিছুই নয়।'

'ওকে ভাগা দেখি!' বিরক্ত হয়ে ইলিনিচ্না বলে ওঠে। 'একটা খুনে হতে চলেছে! সত্যিকারের খুনে ডাকাত! মুখে খালি যুদ্ধের কথা — এছাড়া আর কোন

কথাই ও জানে না। আচ্ছা বল্ দেখি রে দাদু আমার, ভগবান ক্ষমা করুন . . . ওই যে হতচ্ছাড়ার লড়াই . . . ও নিয়ে তোর অত কথা বলা কি ঠিক? এদিকে আয় দেখি, এই যে পিঠে নে, কিছুক্ষণ অন্তত চুপ করে থাক।'

কিন্তু যুদ্ধ রোজই তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে যায়। ফ্রন্ট থেকে লড়াই ফেরতা কসাকরা আসে গ্রিগোরির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে। তারা বলে বুদিওন্নির ঘোড়সওয়ার দল শকুরো আর মামন্তভের বাহিনীকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে, ওরিওলের কাছে লড়াইগুলোতে ওরা সুবিধা করতে পারে নি, সমস্ত ফ্রন্ট জুড়ে শুরু হয়েছে ওদের পিছু হটা। তাতারস্কির আরও দু'জন কসাক মারা গেছে গ্রিবানোভকা আর কর্দাইলের লড়াইয়ে। গেরাসিম আখ্‌ভাত্‌কিনকে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। দ্‌মিত্রি গলোশ্চিওকভ টাইফাস জ্বরে ভুগে মারা গেছে। দুটো যুদ্ধে তাদের গাঁয়ের যত কসাক মারা গেছে গ্রিগোরি মনে মনে তার একটা হিসাব কষতে থাকে। দেখা যায় তাতারস্কিতে এমন একটা বাড়ি নেই যেখান থেকে কেউ না কেউ যুদ্ধের বলি হয় নি।

তখনও গ্রিগোরির বাড়ি ছেড়ে বেরোবার ক্ষমতা হয় নি, এমন সময় গ্রামের মোড়ল জেলা-সদরের আতামানের কাছ থেকে লেফটেনান্ট মেলেখভের অবগতির জন্য এই মর্মে একটা হুকুম নিয়ে এলো যে অবিলম্বে সে যেন নতুন করে পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল কমিশনের সামনে হাজির হয়।

গ্রিগোরি বিরক্ত হয়ে বলল, 'তাকে লিখে জানিয়ে দাও হাঁটার ক্ষমতা হলেই আমি নিজে থেকে হাজির হব। মনে করিয়ে দিতে হবে না।'

ফ্রন্ট ক্রমেই দনের আরও কাছে চলে আসতে থাকে। গ্রামে আবার কথা শুরু হয় পিছু হটার। শিগ্‌গিরই সমস্ত বয়স্ক কসাকদের পিছুহটার দলে যোগদানের নির্দেশ জানিয়ে ময়দানে প্রদেশের আতামানের এক হুকুমনামা পড়ে শোনানো হল।

ময়দান থেকে ফিরে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ হুকুমের কথা গ্রিগোরিকে জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায়?'

গ্রিগোরি কাঁধ ঝাঁকায়।

'কী আর করা? যেতেই হবে। হুকুম না পেলেও সবাই যেত।'

'আমি তোর আর আমার কথাই জিজ্ঞেস করছি: আমরা এক সঙ্গে যাব, না কি?'

'একসঙ্গে যাওয়া আমাদের চলবে না। দিন দুয়েকের মধ্যে আমি ঘোড়ায় চেপে জেলা-সদরে যাচ্ছি। জানতে হবে কোন্ কোন্ ইউনিট ভিওশেন্‌স্কায়ার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। তাদের কারও সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু তোমায় পালাতে হবে উদ্বাস্তু হয়ে। নাকি তুমি পল্টনে ভিড়তে চাও?'

'আরে রামো!' পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ঘাবড়ে গিয়ে বলল। 'আমি তাহলে

বুড়ো বেস্‌শ্লেবনভের সঙ্গে যাব। আমায় ওর সঙ্গী হয়ে যেতে বলেছে। বুড়ো লোকটা নিরীহ, ওর ঘোড়াটাও ভালো। আমরা দুটিতে ঘোড়া জুতে পগার পার হব। আমার ঘুড়ীটার গায়েও চর্বি যা জমেছে! কী খাওয়াটাই খেয়েছে হারামজাদী। আর পা যা ছোঁড়ে না, ওঃ ভয়ানক!'

'তাহলে আর কি, চলে যাও ওর সঙ্গে,' গ্রিগোরি সোৎসাহে সায় দিয়ে বলে। 'কিন্তু এখন এসো, তোমরা কোন্ পথে যাবে কথা বলে ঠিক করা যাক। বলা যায় না, হয়ত আমাকেও সেই রাস্তায়ই যেতে হতে পারে।'

গ্রিগোরি ম্যাপ-কেস থেকে রাশিয়ার দক্ষিণের একটা ম্যাপ বার ক'রে কোন্ কোন্ গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হবে বাপকে বিশদ বোঝাল। বুড়ো এতক্ষণ সশ্রদ্ধ ভাবে ম্যাপটা দেখছিল। কিন্তু ছেলে যেই গ্রামগুলোর নাম কাগজে টুকতে যাবে অমনি সে বলে উঠল: 'দাঁড়া, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। এ ব্যাপারে তুই অবিশ্যি আমার চেয়ে ভালো বুঝিস। ম্যাপ বলে কথা – ম্যাপ মিথ্যে বলে না। সোজা পথ দেখায়। কিন্তু কথাটা হল আমার পক্ষে সুবিধের না হলে সে পথ আমি ধরব কেন? তুই বলছিস গোড়ায় যাওয়া উচিত কার্গিনস্কায়ার ভেতর দিয়ে। ওর ভেতর দিয়ে রাস্তা অনেকটা সোজা সে আমি জানি। কিন্তু তা হলে কী হবে, আমায় ঘুরপথেই যেতে হবে।'

'তা কেন? ঘুরপথে যেতে হবে কেন?'

'যেতে হবে এই জন্যে যে লাতিশেভে আমার খুড়তুত বোন আছে। ওর ওখানে আমি নিজে খেতে পাব, ঘোড়ার খাবারও যোগাড় করতে পারব। কিন্তু অচেনা লোকের কাছ থেকে যোগাড় করতে গেলে আমার গাঁটগাচ্চা যাবে। তারপর আরও কথা আছে। তুই বলছিস, ম্যাপ মতো আমার যাওয়া উচিত আস্তাখোভো বসতির দিকে – ওই পথটা অনেকখানি সোজা। কিন্তু আমি যাব মালাখোভ্স্কি দিয়ে। সেখানেও আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন আছে, পল্টনের এক বন্ধুও আছে। এবারেও আমি নিজের খড় খানিকটা বাঁচিয়ে অন্যদের ঘাড়ে চালাতে পারি। বুঝতেই পারছিস, খড়ের গাদা সঙ্গে নেওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া বিদেশ বিভূঁয়ে এমন হতে পারে যে চেয়েচিন্তে যোগাড় করা ত দূরের কথা গাঁটের কড়ি দিয়েও কিনতে পাবে না।'

'আর দনের ওপারে তোমার আত্মীয়স্বজন নেই?' গ্রিগোরি খোঁচা দিয়ে বলল।

'সেখানেও আছে।'

'তাহলে ত সেখানেই যেতে পার!'

'ওসব যা তা কথা তুই আমাকে বলতে আসিস না ত!' অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। 'ঠাট্টা তামাসা বাদ দিয়ে কাজের কথা বল্।

বুদ্ধির জাহাজ হয়েছে দ্যাখ, ঠাট্টার আর সময় পেলে না!'

'আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সময় এটা নয়। পিছু হটতে হয় পিছু হট। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বাড়ি বেড়াবার কথা নয় – এ তোমার পিঠে পার্বণ নয়!'

'আমি কোথায় যাব না যাব সে তোকে বলে দিতে হবে না – আমার নিজের ভালো জানা আছে।'

'জানই যদি তাহলে যাও যেখানে খুশি!'

'তোর বুদ্ধি মতো আমি চলতে যাব কেন? সোজা যায় শুধু গণ্ডারে – জানিস তা? ও ভাবে চললে হয়ত এমন জায়গায় গিয়ে পড়ব যেখানে শীতকালে কোন পথঘাটই নেই। কী সব যা তা পরামর্শ আমাকে দিচ্ছিস একবার ভেবে দেখেছিস? আবার কিনা ডিভিশন চালায়।'

বাপ বেটায় অনেকক্ষণ ধরে কথা কাটাকাটি হল। কিন্তু পরে বেশ করে সব ভেবেচিন্তে গ্রিগোরিকে স্বীকার করতে হল যে বাপের কথার মধ্যে অনেকখানি সারবত্তা আছে বটে। তাই আপসের সুরে বলল, 'রাগ কোরো না বাবা। কোন পথে যেতে হবে তা নিয়ে আমি তোমার ওপর জোরাজুরি করছি না। যেমন খুশি যেতে পার। আমি চেষ্টা করব দনের ওপারে তোমায় খুঁজে বার করতে।'

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ খুশি হয়ে বলে, 'একথা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল তোর! তা নয়ত যা রাজ্যের মতলব, যাবার রাস্তা হ্যানা ত্যানা বাতলে যাচ্ছিস। একথাটা বুঝিস না কেন, ওসব বাতলানো এক জিনিস, কিন্তু ঘোড়ার খাবার না পেলে এক পাও এগোনোর উপায় নেই।'

গ্রিগোরি অসুস্থ থাকতেই কিন্তু বুড়ো একটু একটু করে গাঁ ছাড়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। বেশ যত্ন ক'রে ঘুড়ীটাকে খাইয়েছে, স্লেজ মেরামত করেছে, ফরমাস দিয়ে নতুন একজোড়া ফেল্ট বুট বানিয়েছে, আবার নিজের হাতে তার ওপর চামড়া সেলাই ক'রে লাগিয়েছে যাতে জলকাদায় ভিজে না যায়। আগে ভাগে বাছাই যই দিয়ে থলি ভরতি করে রেখেছে। পিছু হটার ব্যাপারেও সে তৈরি হয়েছে আঁটঘাট বেঁধে সত্যিকারের একজন গেরস্থের মতো। রাস্তায় যা যা দরকার হতে পারে আগে থেকে বুদ্ধি বিবেচনা ক'রে সে সব গুছিয়ে রেখেছে। কুড়ুল, করাত, জুতো মেরামতের সরঞ্জাম, সুতো, বাড়তি সোল, পেরেক, হাতুড়ি, এক গোছা বেল্ট, কিছু দড়ি, এক টুকরো রজন থেকে শুরু করে ঘোড়ার নাল আর গজাল পর্যন্ত এ সবই একটা তেরপলে এমন ভাবে জড়িয়ে রেখেছিল যে দরকার মতো যে-কোন সময়ে স্লেজে ওঠানো যেতে পারে। এমন কি একটা দাঁড়িপাল্লাও সঙ্গে নিচ্ছিল পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। তাই দেখে ইলিনিচ্না যখন জিজ্ঞেস করল পথে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কী হবে, তখন সে এক ধমক লাগিয়ে দিল তাকে।

'তুমি বাপু কিছুই বোঝো না। যত বয়স হচ্ছে ততই বুদ্ধিসুদ্ধি কমছে দেখছি। এত সহজ ব্যাপারটাও তোমার মাথায় ঢোকে না? ঘাসবিচালি ভুষি এসব আমায় ওজনদরে কিনতে হবে না? গজকাঠি দিয়ে মাপতে বল নাকি, অ্যাঁ?'

'ওখানে কি দাঁড়িপাল্লাও নেই নাকি?' ইলিনিচ্না অবাক হয়ে বলে।

পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ক্ষেপে ওঠে: 'ওখানে ওদের দাঁড়িপাল্লা কেমন তা তুমি জানবে কী ক'রে? ওদের সব দাঁড়িপাল্লাতেই হয়ত পাষাণ আছে আমাদের মতো লোকদের ওজনে ঠকানোর জন্যে। এই ত ব্যাপার। ওখানকার লোকজন সব কী চিজ ভালো জানা আছে। কিনবে পনেরো সের আর নগদ টাকায় দাম দাও আধ মনের। প্রতিটি জায়গায় এরকম লোকসান স্বীকার করার চেয়ে নিজের দাঁড়িপাল্লা সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভালো। তাতে ত আর ক্ষতি কিছু নেই। তোমরা দাঁড়িপাল্লা ছাড়াই দিব্যি চালিয়ে দিতে পারবে। ও দিয়ে ছাই কী হবে তোমাদের? পলটনের লোকেরা যদি আসে তারা ওজন না করেই বিচালি নেবে।... ওদের শুধু ঘোড়ার খাবার খুঁজে পেতে বার ক'রে আঁটি বাঁধা বলে কথা। ওসব পিশুছাড়া শয়তান অনেক দেখেছি। ভালো জানা আছে আমার।'

গোড়ায় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ ভেবেছিল একটা ছোটখাটো গাড়িও স্লেজে চাপিয়ে নেবে, যাতে বসন্তকালে আরেকটা কিনতে গিয়ে পয়সা খরচ না করতে হয়, নিজের গাড়িতেই যাওয়া যায়। কিন্তু পরে একটু ভেবেচিন্তে এই সর্বনাশা মতলবটা তাকে ছাড়তে হল।

গ্রিগোরিও তৈরি হতে লাগল। মাউজার পিস্তল আর রাইফেলটা সাফ করল। তার এতকালের বিশ্বস্ত তলোয়ারখানাও ঠিকঠাক ক'রে রাখল। সুস্থ হয়ে ওঠার এক সপ্তাহ পরে নিজের ঘোড়াটাকে দেখতে পেল সে। ঘোড়াটার পশ্চাদ্ভাগের চেকনাই দেখে তার বুঝতে বাকি রইল না যে বুড়ো শুধু নিজের ঘুড়ীটাকেই খাইয়ে দাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট ক'রে তোলে নি। তেজী ঘোড়াটা দাবড়াচ্ছিল। অনেক কষ্টে গ্রিগোরি তার পিঠে উঠে বসল। বেশ খানিকটা চালিয়েও নিল। বাড়ি ফেরার পথে সে দেখতে পেল – সেটা অবশ্য ওর মনের ভুলও হতে পারে – যেন আস্তাখভদের বাড়ির জানলা থেকে কেউ সাদা রুমাল নাড়ছে তার উদ্দেশে।

পঞ্চায়েতে তাতারস্কির কসাকরা ঠিক করল সবাই একসঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। দু'দিন ধরে বাড়ির মেয়েরা কসাকদের পথের জন্য ভালো ভালো সেঁকা আর ভাজা খাবার দাবার তৈরি করল। বারোই ডিসেম্বর গ্রাম ছাড়ার দিন ধার্য হয়েছে। আগের দিন সন্ধ্যায় পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ স্লেজগাড়িতে জই আর

বিচালি তুলে রাখল। ভোর হতে না হতেই গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট চাপাল, শক্ত ক'রে বেল্ট আঁটল, কোমরের পেটিতে দস্তানা জোড়া গুঁজে ভগবানের নাম জপে বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল।

দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড এক সার মালগাড়ি গ্রাম ছেড়ে রওনা দিল পাহাড়ের দিকে। মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল গোরু চরানোর মাঠের ধারে। তারা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল ঝেড়ে বিদায় জানাতে লাগল পুরুষদের। কিন্তু তার পরেই স্তেপের মাঠে মাটি ছুঁয়ে উঠল একটা হিমেল হাওয়া। তুষারের ঘূর্ণিতে ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশার আড়ালে সব ঢাকা পড়ে গেল। পাহাড় বরে গাড়িগুলোর ধীরে ধীরে ওপরে ওঠা বা গাড়ির পাশে পাশে পা ফেলে কসাকদের চলা – কিছুই আর নজরে পড়ে না।

ভিওশেন্‌স্কায়া ছাড়ার আগে আক্সিনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেল গ্রিগোরি। গ্রামে যখন সন্ধ্যার দীপ জ্বলে উঠেছে সেই সময় গ্রিগোরি এলো ওর কাছে। আক্সিনিয়া সুতো কাটছিল। ওর পাশে বসে ছিল আনিকুশ্‌কার বিধবা বৌ, মোজা বুনতে বুনতে গল্প করছিল। ঘরে আরেকজন আছে দেখে গ্রিগোরি সংক্ষেপে আক্সিনিয়াকে বলল, 'একটু বাইরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

আক্সিনিয়া বারান্দায় বেরিয়ে এলে গ্রিগোরি ওর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'পিছু হটছি। আমার সঙ্গে আসবে?'

আক্সিনিয়া অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, কী জবাব দেবে ভাবতে লাগল। মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু গেরস্থালির কী হবে? আর বাড়ি?'

'কারও জিম্মায় রেখে যাও। চলে যাওয়া দরকার।'

'কবে?'

'কাল তোমায় নিতে আসব।'

অন্ধকারের মধ্যে মুচকি হেসে আক্সিনিয়া বলল, 'তোমার মনে আছে, অনেক দিন আগে তোমায় বলেছিলাম, তোমার সঙ্গে দুনিয়ার একেবারে শেষ সীমায় যেতেও আমার আপত্তি নেই। আমি এখনও তেমনই আছি। আমার ভালোবাসায় এতটুকু ফাঁকি নেই। যাব। একবারও ফিরে তাকাব না। কখন তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, বল?'

'কাল সন্ধ্যায়। বেশি কিছু সঙ্গে নিও না। জামাকাপড় আর একটু বেশি করে খাবার দাবার – ব্যস। আচ্ছা, এখনকার মতো চলি।'

'এসো। ভেতরে এলে পারতে না একবার? . . . ও এখনই চলে যাবে। . . . কতকাল তোমায় দেখি নি . . . ওগো, গ্রিশা . . . গ্রিশা আমার। আমি ত ভেবেছিলাম তুমি বুঝি . . . না। থাক, বলব না ওকথা।'

'না, এখন পারছি নে। আমায় এখনই ভিওশেনস্কায়া যেতে হবে। চলি। কাল অপেক্ষা কোরো।'

গ্রিগোরি বারান্দা থেকে নেমে ফটকের দিকে চলে গেল। কিন্তু আক্সিনিয়া তখন দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দায়। মুখে হাসি, ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ওঠে তার দু'গাল। দু'হাতে গাল ঘসতে থাকে সে।

* * *

ভিওশেনস্কায়া থেকে জেলার সরকারী দপ্তর আর সামরিক রসদের গুদামগুলো সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। জেলার আতামানের কাছারিতে গিয়ে ফ্রন্টের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ করল গ্রিগোরি। এড্‌জুটেন্টের কাজ করছিল এক ছোকরা কর্পেট। সে ওকে বলল, 'আলেক্সেয়েভ্‌স্কায়া জেলার কাছে এসে পড়েছে লাল ফৌজ। ভিওশেনস্কায়ার ভেতর দিয়ে কোন্ কোন্ ইউনিট যাবে কিংবা আদৌ কোনো ইউনিট যাবে কিনা আমাদের জানা নেই। আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন, কেউ কিছু জানে না, সবাই পালাতে ব্যস্ত। ... তার চেয়ে আমার পরামর্শ শুনুন, নিজের ইউনিটের খোঁজে অযথা সময় নষ্ট না ক'রে মিলেরোভোতে চলে যান। সেখানেই হয়ত জানতে পারবেন আপনার ইউনিট কোথায় আছে। মোটের ওপর আপনার রেজিমেন্ট রেললাইন ধরে এগোতে থাকবে। শত্রুপক্ষকে দনের কাছে ঠেকানো যাবে কিনা? না, আমার ত তা মনে হয় না। ভিওশেনস্কায়া বিনা যুদ্ধেই ছেড়ে দিতে হবে। কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

বেশ রাত্রে বাড়ি ফিরে এলো গ্রিগোরি। রাত্রের খাবার রান্না করছিল ইলিনিচ্না। সে বলল, 'তোর প্রোখর এসেছে। তুই চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে এসেছিল। বলেছে আবার আসবে। কিন্তু এখনও কেন জানি তার কোন পাত্তা দেখছি না।'

খবর শুনে গ্রিগোরি খুব খুশী। চটপট রাতের খাওয়া সেরে সে চলল প্রোখরের কাছে। গ্রিগোরিকে দেখে ম্লান হেসে সে বলল, 'আমি ত ভাবলাম তুমি বুঝি আমাকে ছাড়াই ভিওশেনস্কায়া থেকে সোজা পিছু হটাদের দলের সঙ্গে রওনা হয়ে গেছ।'

গ্রিগোরি হাসতে হাসতে তার বিশ্বস্ত আর্দালিটির কাঁধে চাপড় মেরে বলল, 'তুমি আবার কোন্ চুলো থেকে এসে হাজির হলে?'

'ফ্রন্ট থেকে। তাও আবার বলে দিতে হবে নাকি?'

'সটকান দিয়েছ নাকি?'

'কী যে বল, বালাই ষাট! আমার মতো একজন বেপরোয়া সেপাই কিনা

পালাবে? এসেছি আইন মাফিক। ভাবলাম তোমাকে ছাড়া অমন ভালো জায়গায় যাব এও কী হয়? একসঙ্গে পাপ করেছি, তাই কিয়ামতের দিনেও এক সঙ্গেই থাকতে হয়! আমাদের অবস্থা ত এখন সঙ্গীন – তা জান কি?'

'জানি। এখন তুমি বল, তোমাকে ওরা ছাড়ল কী করে?'

'সে এক লম্বা গল্প। পরে এক সময় বলা যাবে' খন,' এড়ানোর মতো ক'রে এই কথা বলে আরও গম্ভীর হয়ে যায় প্রোখর।

'রেজিমেন্ট কোথায়?'

'এখন কোথায় আছে আমি তার কী জানি ছাই?'

'তাহলে তুমি কবে এলে ওখান থেকে?'

'হপ্তা দুয়েক আগে।'

'অ্যাদ্দিন তাহলে কোথায় ছিলে?'

'হা ভগবান, এ কী লোকের পাল্লায় পড়লাম! . . .' বিরক্ত হয়ে এই বলে প্রোখর আড়চোখে তাকায় তার বৌয়ের দিকে। 'খালি কোথায়, কী করে আর কেন . . . আরে বাবা, যেখানে ছিলাম সেখানে এখন আর নেই। হল ত? বলেইছি ত তোমাকে বলব, তার মানে বলব। আই মাগী! বলি, ঘরে-চোলাই কিছু আছে? ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা হওয়া বলে কথা, তার খাতিরে দু'-এক ঢোক ত খেতে হয়। আছে নাকি কিছু ঘরে? নেই? তাহলে ছুট্রে যাও, যোগাড় ক'রে নিয়ে এসো। যাবে আর আসবে কিন্তু! সোয়ামী ঘরে না থাকায় পল্টনের শিঙ্খলাটিঙ্খলাগুলো গেছে দেখছি। একেবারে হাতের বাইরে চলে গেছে।'

'অত চেল্লাচেল্লি করছ কেন?' মুখ টিপে হাসতে হাসতে প্রোখরের বৌ বলে। 'আমার ওপর অমন হম্বিতম্বি কোরো না। ভারী ত আমার বাড়ির কর্তা! নয় মাসে ছয় মাসে এক আধ দিনের জন্যে বাড়ি আসে।'

'সব্বাই আমার ওপর চোটপাট করে। কিন্তু আমি যদি তোমার ওপরও চোটপাট না করি তবে কার ওপর করব বল ত? রোসো, আগে জেনারেলের পদে উঠি, তখন আমি অন্যদের ওপর হম্বিতম্বি করতে থাকব। এখনকার মতো তোমাকে মুখ বুজে সইতে হবে। আচ্ছা এবারে যাও দিকি চটপট ধরাচুড়ো গায়ে চাপিয়ে ছোটো!'

বৌ পোশাক পরে চলে যাওয়ার পর প্রোখর তিরস্কারের দৃষ্টিতে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করল।

'তোমার এতটুকু আক্কেল নেই গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। . . . বৌয়ের সামনে আমি তোমায় সব কথা বলি কী করে বল ত? অথচ তুমি বারবার চাপাচাপি

ক'রে যাচ্ছ - কী ব্যাপার, কী বৃত্তান্ত, হ্যানা ত্যানা। তা এখন কেমন আছ? অসুখের পর সেরে উঠেছ ত?'

'তা সেরে উঠেছি। এবারে তোমার নিজের কথা বল। তুমি শালা শয়তানের বাচ্চা কী যেন একটা লুকোচ্ছ। . . . এবারে ঝেড়ে কাশ ত বাপু। কী পাকিয়ে এসেছ? পালালে কী করে?'

'ওঃ সে যা কাণ্ড! পালানোর চেয়েও খারাপ। . . . তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি ত ফিরে গেলাম আমাদের ইউনিটে। আমাকে ওরা স্কোয়াড্রনে, তিন নম্বর ট্রুপে ঠেলে দিল। এদিকে লড়াইয়ে আমার কী দারুণ না উৎসাহ! দু'বার হামলায় নেমেছিলাম। তারপর ভাবলাম, 'এখানে থাকলে শিগ্‌গিরই আমাকে পটল তুলতে হবে। নাঃ, কোন একটা ফাঁক বার করতে হয় রে প্রোখর, নইলে হয়ে গেল! আর দেখতে হবে না!' আবার হবি ত হ এই সময়ই এমন লড়াই বেধে গেল, আমাদের ওপর এমন চাপ এসে পড়ল যে নিঃশ্বাস ফেলারই ফুরসৎ জোটে না আমাদের! লাইনের যেখানে ভাঙন ধরে সেখানেই গুঁজে দেওয়া হয় আমাদের। যেখানে অবস্থা একটু নড়বড়ে সেখানেই ঠেলে দেওয়া হয় আমাদের রেজিমেন্টকে। এক হপ্তার মধ্যে আমাদের স্কোয়াড্রনের এগারোজন কসাক বেমালুম লোপাট হয়ে গেল। আমার মনটা বড় আকুলি বিকুলি ক'রে উঠল। এত আকুলি বিকুলি করতে লাগল যে আমার গায়ে উকুনে বাসা ক'রে ফেলল।' প্রোখর একটা সিগারেট ধরাল। তামাকের থলেটা গ্রিগোরির দিকে বাড়িয়ে ধরে ধীরেসুস্থে বলতে থাকে, 'লিস্কির ঠিক কাছে আমার ওপর পড়ল টহলদারের কাজের। দলে ছিলাম আমরা তিনজন। কদমচালে ঘোড়া চালিয়ে চলেছি টিলার ওপর দিয়ে। এদিক ওদিক চারদিকে চোখ রেখে চলি। এমন সময় দেখি পাহাড়ের খাতের ভেতর থেকে উঠে আসছে এক লাল সেপাই, হাতদুটো তার মাথার ওপর তুলে ধরা। আমরা ছুটে আসছি দেখে লোকটা চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'কসাক ভাইসব, আমি তোমাদের লোক। আমায় মেরো না, আমি তোমাদের দলে ভিড়তে চাই!' কিন্তু আমার ওপর তখন শয়তান ভর করেছিল, তাইতে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেল। কেন যেন রাগে দিশেহারা হয়ে আমি ওর কাছে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বললাম, 'তবে রে শালা, লড়াই করতেই যদি নেমেছিলি তবে আবার ধরা দেওয়া কেন? তুই একটা নোংরা শুয়োর,' এই সেই, আমি বললাম। 'দেখতে পাচ্ছিস না আমরা অমনিতেই কোন রকমে টিকে আছি! আর তুই কিনা ধরা দিয়ে আমাদের দল ভারী করতে এসেছিস?' এই বলে জিনের ওপর থেকেই তলোয়ারের খাপ দিয়ে ওর পিঠে বরাবর কষিয়ে দিলাম একটা ঘা। আমার সঙ্গের অন্য দু'জন কসাকও আমার দেখাদেখি ওকে পেড়ে ধরে

বোঝাতে শুরু করল, 'আচ্ছা বল দেখি একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে পাক খেয়ে ঘোরাঘুরি করে যুদ্ধ করার কি কোন মানে হয়? তোমরা সবাই যদি একসঙ্গে এগিয়ে আসতে তাহলে কবেই না লড়াই চুকে যেত!' আমরা আর কী করে ছাই জানব বল যে এই দলছুট লোকটা একজন অফিসার? দেখা গেল সত্যিই তাই! যেই আমি রাগের মাথায় তলোয়ারের খাপসুদ্ধ দুম ক'রে এক ঘা বসিয়ে দিলাম অমনি ওর মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। মিনমিন ক'রে বলল, 'আমি একজন অফিসার, তোমাদের এতদূর আস্পদ্দা যে আমার গায়ে হাত তোল! পুরনো জামানায় আমি হুসার দলে কাজ করেছি, লালেরা যখন জোর করে পল্টনে লোক ঢোকাচ্ছিল তখন আমি ওদের হাতে পড়ে যাই। আমাকে তোমাদের কম্যাণ্ডারের কাছে নিয়ে চল, সব কথা আমি খুলে বলব তাকে।' আমরা বললাম, 'দেখি তোমার কাগজপত্র।' লোকটা বুক ফুলিয়ে জবাব দিল, 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আমার নেই। তোমাদের কম্যাণ্ডারের কাছে নিয়ে চল আমাকে।'

গ্রিগোরি অবাক হয়ে ওর কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এসব কথা তোমার বৌয়ের সামনে বলতে চাইছিলে নাই বা কেন?'

'কেন বলতে চাইছিলাম না সে জায়গায় এখনও আসি নি। দোহাই তোমার, বাগড়া দিও না কথার মাঝখানে। আমরা ঠিক করলাম ওকে স্কোয়াড্রনে নিয়ে যাব। কিন্তু ওখানেই আমরা ভুল করে বসলাম। আমাদের উচিত ছিল ওখানেই ওকে মেরে ফেলা – তাহলে ব্যাপার চুকে বুকে যেত। আমরা ওকে নিয়ে এলাম যেখানে আনা দরকার। আর তার পর দিনই – কী দেখলাম আমরা? – লোকটাকে ক'রে দেওয়া হয়েছে আমাদের স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার। কেমন লাগে বল দেখি? তারপরই শুরু হয়ে গেল! দিন কয়েক বাদে আমাকে ডেকে সে জিগ্‌গেস করল, 'এই বুঝি তোর এক অখণ্ড রাশিয়ার জন্যে লড়াইয়ের নমুনা, শালা শুয়োরের বাচ্চা? আমায় বন্দী করার সময় তুই কী বলেছিলি মনে আছে?' আমি তখন এটা ওটা নানা অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। আর যেই মনে পড়ে যায় যে আমি তলোয়ারের বাড়ি মেরেছিলাম অমনি রাগে ওর সর্ব্বাঙ্গ যা কাঁপতে থাকে ওরে ব্বাপ্‌স! বলে, 'জানিস আমি হুসার রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ছিলাম, আমি বনেদী ঘরের লোক। আর তুই হারামজাদা, তোর এত দূর সাহস হল যে আমার গায়ে হাত তুললি?' সে একবার ডেকে পাঠালে, দু'বার ডেকে পাঠালে - ও যে আমায় ক্ষমা ঘেন্না ক'রে ছেড়ে দেবে তার কোন আশাই রইল না। ট্রুপ কম্যাণ্ডারকে হুকুম দিয়ে আমাকে যখন তখন চৌকির তদারকী আর পাহারাদারীর বাড়তি কাজে পাঠাতে লাগল। কাজের পর কাজের বোঝা চাপাতে লাগল আমার ঘাড়ে। মানে, মোটের ওপর হারামজাদা

শুয়োরটা আমার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলল। টহলদার দলে আরও যে দু'জন আমার সঙ্গে ছিল লোকটাকে ধরার সময় তাদের ওপরও ওই একই রকম জুলুমবাজী। ছোকরারা যতটা সওয়া যায় সইল, শেষকালে একদিন আমায় ডেকে নিয়ে বলল, 'এসো লোকটাকে খতম ক'রে দিই, নইলে আমাদেরই বাঁচা দায়।' ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবলাম, ঠিক করলাম রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডারকে সব কথা খুলে বলব। কিন্তু খুন করতে কেন জানি বিবেকে বাধল। আমরা যখন তাকে বন্দী করেছিলাম সেই মুহূর্তে খতম করা গেলেও যেত। কিন্তু পরে যেন আমার হাতই উঠল না। . . . বৌ যখন মুরগী জবাই করে তখনই আমি চোখ বুজে ফেলি - আর এ ত জলজ্যান্ত একটা মানুষ খুন করা। . . .'

গ্রিগোরি আবার ওর কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'তা মেরে ফেললে নাকি শেষ পর্যন্ত ?'

'আহা একটু সবুর কর না, সবই জানতে পারবে। তা রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডারকে ত আমি সব খুলে বললাম। হ্যাঁ, সে পর্যন্তও গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কথা শুনে সে হেসে বলল, 'তুমি যখন নিজেই ওকে মেরেছ তখন তোমার রাগ করার কোন মানে হয় না জিকভ। শিঙ্খলার ব্যাপারে ও বেশ কড়া। লোকটা জানে-শোনে, ভালো অফিসার।' চলে এলাম তার কাছ থেকে। এদিকে মনে মনে ভাবি : 'তোমার ওই ভালো অফিসারকে তুমিই মাদুলি ক'রে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াও বাবা! আমি ওর সঙ্গে একই স্কোয়াড্রনে কাজ করতে রাজী নই!' আমাকে অন্য স্কোয়াড্রনে বদলি করার আর্জি জানালাম। তাতেও কোন কাজ হল না। বদলি তারা করল না। তখন আর কোন উপায় না দেখে আমি ঠিক করলাম কেটে পড়ব। কিন্তু কেটে পড়ি কী করে? এক হপ্তার বিশ্রামের জন্যে আমাদের পাঠানো হল ফ্রন্টের পেছনে কাছাকাছি একটা জায়গায়। এখানেও আবার শয়তান ভর করল আমার ওপর। ফের গুলিয়ে দিল আমায়। ভাবলাম গনোরিয়া-টনোরিয়া ধরনের নোংরা একটা কিছু বাধিয়ে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। তাহলে পল্টনের ডাক্তারের খপ্পরে পড়ব। তারপর পিছু-হটা শুরু হয়ে যাবে - ব্যাপারটা ওই দিকেই গড়াচ্ছে কিনা। এবারে জন্মে যা কখনও করি নি তা-ই করতে হল - মেয়েমানুষের পেছন পেছন ঘুরতে লাগলাম। দেখেশুনে যাদের সুবিধের বলে মনে হয় না সে রকম খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু বুঝব কী ক'রে বল? ব্যামো আছে কি না আছে কারও কপালে ত আর লেখা নেই! নাও ঠ্যালা!' প্রোখর রেগেমেগে ভীষণ ভাবে থুতু ফেলে, কান পেতে শোনার চেষ্টা করে বৌ ফিরে আসছে কিনা।

হাসি চাপা দেওয়ার জন্য গ্রিগোরি হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। ওর দু'চোখে হাসির ঝিলিক খেলে যায়। চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'তারপর, পেলে?'

প্রোখর কাঁদো কাঁদো চোখে ওর দিকে তাকায়। মরণাপন্ন বুড়ো কুকুরের মতো করুণ আর শান্ত ভাব ফুটে ওঠে তার দৃষ্টিতে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর সে বলে, 'তুমি কি ভাবছ পাওয়া অতই সোজা? যখন দরকার নেই তখন কোত্থেকে হাওয়ার টানে চলে আসে। আমি একেবারে অকূলে পড়ে গেলাম। অরণ্যে রোদনই সার!'

মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে হাসতে থাকে গ্রিগোরি। মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে, 'ভগবানের দোহাই, আর কষ্ট দিও না। বলি, পেলে শেষকালে?'

প্রোখর আহত স্বরে বলে, 'তোমার কাছে অবিশ্যি হাসির।... অন্যের বিপদে শুধু বোকারাই হাসতে পারে। আমার ত অন্তত তাই মনে হয়।'

'আরে না, আমি হাসছি না।... তারপর কী হল?'

'তারপর আমি বাড়িউলীর মেয়েটার সঙ্গে নটঘট শুরু ক'রে দিলাম। সে ছুঁড়ীর বয়স বছর চল্লিশেক হবে – একটু কমও হতে পারে। সারা মুখ ব্রণে ভরা, আর দেখতে যা – ভগবান রক্ষে কর! – না বলাই ভালো! পড়শীরা আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল কিছু দিন আগে নাকি ঘন ঘন বদ্যির কাছে যাতায়াত ছিল। মনে মনে ভাবলাম, 'তাহলে ত এটাকে দিয়েই আমার কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।' আমিও ঠিক একটা জোয়ান মোরগের মতো ঘুরঘুর করতে লাগলাম ওর চারপাশে। গলা ফুলিয়ে এটা ওটা কত কথাই না বলে ভুলানোর চেষ্টা করি ওকে।... কোত্থেকে যে অত কথা আসে আমি নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাই।' অপরাধীর মতো হাসে প্রোখর। পুরনো স্মৃতি মনে পড়তে একটু যেন উৎফুল্লও হয়ে পড়ে। 'ওকে কথাও দিলাম যে বিয়ে করব। আরও সব আবোল তাবোল নোংরা জিনিস শোনালাম।... যা হোক এই ক'রে ত পটিয়ে-পাটিয়ে হাত করলাম। ব্যাপারটা তখন প্রায় পাপকাজের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ওর সে কী কান্না! আমি ত একথা-সেকথা বলে ওকে বোঝানোর কত চেষ্টা করলাম। শুধোই, 'তোমার কোন অসুখ আছে নাকি? তা থাকলেই বা কি? সে ত বরং আরও ভালো!' এদিকে নিজেরও মনে ভয়। রাত-বিরোতের ব্যাপার, বলা যায় না আওয়াজ শুনতে পেয়ে যদি কেউ ভুষির চালায় এসে ঢোকে! আমি বললাম, 'ভগবানের দোহাই! চেঁচামেচি কোরো না। তোমার যদি কোন অসুখ বিসুখ থাকেই তা হলেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তোমাকে আমি এত ভালোবাসি যে সবেতেই আমি রাজী।' ও তখন বলে, 'ওগো প্রোখর আমার! আমার কোন অসুখ বিসুখ নেই – একটুও নেই। আমি সৎ মেয়ে, আমার ভয় হচ্ছে, তাই আমি কাঁদছি।' বিশ্বাস করবে না গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, যেই না একথা বলা, অমনি আমার

গা দিয়ে যেন কালঘাম ছুটল। মনে মনে ভাবলাম, 'হা ভগবান। এ কী গেরো রে বাবা! শেষকালে এই ছিল কপালে।' আমার গলার স্বর ততক্ষণে পাল্টে গেছে। ধমক দিয়ে বললাম, 'তাহলে বদ্যির কাছে ছুটোছুটি করতিস কেন লক্ষ্মীছাড়া? লোকজনকে এরকম ধোঁকা দেওয়ার কী মানে, অ্যাঁ?' সে বললে, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম, সে ত আমার মুখের দাগ ওঠাবার জন্যে মলম আনতে।' আমার তখন মাথায় হাত। বললুম, 'উঠে পড়, এক্ষুনি দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। হতচ্ছাড়ী, ভগবানের অভিশাপ তুই একটা। তোকে আমার সতীসাধ্বী পেতে ভারী বয়েই গেছে। করব না আমি তোকে বিয়ে।' প্রোখর এবারে থুতু ফেলল আরও জোরে। তারপর অনিচ্ছার সঙ্গেই বলে চলল, 'আমার এত খাটাখাটনি সব জলে গেল। ঘরে ফিরে গিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে সে রাত্তিরেই উঠে গেলাম আরেকটা আস্তানায়। পরে পল্টনের ছোকরারা আমায় টিপে দিল – আমার যা দরকার ছিল তা পেয়ে গেলাম এক বিধবার কাছে। তবে এবারে আমি সরাসরি কাজে নামলাম, স্রেফ জিগ্‌গেস করলাম, 'ব্যামো আছে?' 'এট্টুখানি আছে,' সে বললে। 'ওতেই হবে, আমার মনখানেক দরকার নেই।' এই উব্‌কারটুকুর জন্যে তাকে কেরেন্‌স্কি মার্কা কুড়ি রুবলের একখানা নোট দিলাম। পরের দিন নিজের কৃতিত্বে নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। এর পর পল্টনের ডাক্তারখানায় গিয়ে পড়তেও দেরি হল না। সেখান থেকে সোজা বাড়ি।'

'ঘোড়া না নিয়েই চলে এসেছ নাকি?'

'তা কেন? ঘোড়া না নিয়ে কী করে হবে? ঘোড়ায় চড়েই এসেছি রীতিমতো জঙ্গী কায়দায়। আমি যেখানে চিকিচ্ছেয় ছিলাম পল্টনের ছোকরারা ঘোড়াটাকেও সেখানে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু সেটাই সব নয়। এখন তুমি আমায় পরামর্শ দাও দেখি বৌকে কী বলি। নাকি তার চেয়ে বরং তোমার কাছে গিয়ে রাতটা কাটাই, কী বল? – তাহলে পাপের হাত থেকে বাঁচি।'

'কোন্ কম্মে! বাড়িতেই রাতটা কাটাও। বল তুমি জখম হয়েছ। সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ আছে?'

'হ্যাঁ তা আছে, পল্টনের দেওয়া নিজের একটা বাণ্ডিল আছে।'

'ব্যস, তাহলে কাজে লেগে পড়।'

'বিশ্বাস করবে না,' হতাশ ভাবে প্রোখর বলল। অবশ্য তবু উঠে দাঁড়াল। থলি হাতড়াল। তারপর উঠে চলে গেল ভেতরের ঘরে। সেখান থেকে চাপা গলায় বলল, 'ও ফিরে এলে কথাবার্তা বলে আটকে রেখো। আমি এই এলাম বলে।'

গ্রিগোরি একটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে যাবার মতলবটা ছকে নিতে

থাকে। ঠিক করল, 'ঘোড়াদুটোকে স্লেজগাড়িতে জুতে নেব। বেরিয়ে পড়ব সন্ধ্যার মুখে, যাতে বাড়ির কেউ দেখে না ফেলে যে আক্সিনিয়াকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য পরে সবই জানাজানি হয়ে যাবে। . . .'

'হ্যাঁ স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের কথাটা ত শেষ পর্যন্ত তোমায় বলাই হল না,' খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে টেবিলের ধারে বসে পড়ে প্রোখর। 'আমিও অসুখে পড়লাম, তার ঠিক তিন দিন পরে আমাদের পল্টনের ছোকরাদের হাতে খুন হয়ে গেল।'

'বল কি!'

'মাইরি বলছি! লড়াইয়ের সময় দিল ঝেড়ে পেছন থেকে – ব্যস, খেল খতম! দেখা যাচ্ছে মিছিমিছি আমার এই এত কষ্ট। এখানেই ত আফশোস!'

শিগ্‌গিরই তাতারস্কি ছেড়ে চলে যেতে হবে এই চিন্তায় ডুবে ছিল গ্রিগোরি। তাই অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'দুষ্কর্মটা যে করল তাকে ধরা গেল কি?'

'খোঁজার ফুরসৎ থাকলে ত! এমন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল যে ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাওয়া গেল না। আরে, আমার গিন্নিটি গেল কোথায়? আর ত পারা যায় না! এদিকে মদের তেষ্টা যে মাথায় উঠল! কবে যাবে ভাবছ?'

'কাল।'

'আরেকটা দিন অপেক্ষা করলে হত না?'

'কেন?'

'অন্তত উকুনগুলো ঝেড়ে সাফসুতর হতে পারতাম। ওগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে কি ভালো লাগে?'

'পথেই ঝেড়ে নিও। আর দেরি করা চলে না। লালেরা আর বেশি দূরে নেই – দু'দফায় মার্চ করলেই ভিওশেনস্কায়া।'

'ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়ব?'

'না, রাতের বেলায়। একবার কার্গিনস্কায়ায় গিয়ে পড়তে পারলে হয়, রাতটা ওখানে কাটাব।'

'কিন্তু লালদের খপ্পরে পড়ে যাব না ত?'

'আমাদের তৈরি থাকতে হবে। আরেকটা কথা বলি . . . আমি আক্সিনিয়া আস্তাখভাকে সঙ্গে নেব ভাবছি। তোমার কোন আপত্তি নেই ত?'

'আমার বলার কী আছে? ইচ্ছে হয় দুটো আক্সিনিয়াকে সঙ্গে নাও না কেন। . . . তবে ঘোড়াগুলোর একটু বোঝা হবে এই যা।'

'বোঝা এমন কিছু ভারী নয়।'

'পথে মেয়েমানুষ থাকলে ঝামেলার ব্যাপার। . . . কেন মরতে দরকার ছিল

ওকে নেবার? আমরা নিজেরা নিজেরা থাকলে কোন অসুবিধেই হত না।' প্রোখর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ ফিরিয়ে নিল। 'আমি ঠিক জানতাম তুমি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। এখনও বিয়ের বর সাজার শখ। . . . আচ্ছা, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, চাবুকখানা যে তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল গো!'

'ওসব তোমায় দেখতে হবে না,' ঠাণ্ডা গলায় গ্রিগোরি বলল। 'দেখো বৌয়ের কাছে আবার বেফাঁস বলে বোসো না।'

'আগে কখনও বলেছি নাকি বেফাঁস কথা? বলতেও লজ্জা হল না তোমার? আর বাড়ি? বাড়ি কার ঘাড়ে ফেলে যাবে?'

বারান্দায় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। বাড়ির কর্ত্রী এসে গেছে। তার মাথায় জড়ানো ছাইরঙা ফুরফুরে ওড়নাতে ঝিকমিক করছে তুষারকণা।

'বরফ ঝড় হচ্ছে বুঝি?' আলমারি থেকে গেলাস বার ক'রে প্রোখর বলল। পরে খেয়াল হতে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু এনেছ ত?'

প্রোখরের বৌয়ের গালদুটো লাল টকটক করছে। বুকের কাছ থেকে দুটো বোতল বার ক'রে টেবিলের ওপর রাখল। ঠাণ্ডায় বিন্দু বিন্দু জল জমেছে বোতলের গায়ে।

প্রোখর উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বেশ, এইবারে আমাদের পথের আর কোন বাধা থাকবে না।' ঘরে চোলাই মদটার গন্ধ শুঁকে রায় দিল, 'পয়লা নম্বরী মাল! আর কড়া যা হবে, ওঃ!'

গ্রিগোরি দুটো ছোট গেলাস শেষ করল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

ছাব্বিশ

'লড়াই তাহলে খতম হল! লালেরা আমাদের এমন লাথি ঝাড়ল যে এখন আমরা পাছা ঘসটে পেছোতে পেছোতে সমুদ্রের নোনা জলে গিয়ে পড়ব!' ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ে ওঠার সময় প্রোখর বলল।

নীচে নীল ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশায় জড়ানো তাতারস্কি গ্রাম। গোলাপী হয়ে উঠেছে তুষারধবল দিগন্তরেখা, তার ওপাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। স্লেজগাড়ির পাতের নীচে কড়কড় আওয়াজ তুলছে বরফ। পায়ে পায়ে চলেছে ঘোড়াগুলো। জোড়া ঘোড়ায় টানা স্লেজগাড়িতে জিনের গদিতে পিঠ ঠেকিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে গ্রিগোরি। পাশে বসে আছে আক্সিনিয়া। গায়ে দনের পশুলোমের কোট,

পাড় লাগানো। মাথায় সাদা ফুরফুরে ওড়না। ওড়নার নীচে ঝকঝক করছে, খুশিতে ঝলমল করছে ওর কালো চোখজোড়া। গ্রিগোরি মাঝে মাঝে আড়চোখে ওর দিকে তাকায়। দেখে হিমের ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ গোলাপী আভা ধরা গালটা, ওর ঘন কালো ভুরু আর জমাট তুষারকণামাখা ঢেউ খেল্যানো পালকের তলায় চোখের সাদা অংশের নীলচে ঝিকিমিকি। আক্সিনিয়া প্রাণবন্ত কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বরফের স্তূপে ঢাকা তুষারধবল স্তেপের মাঠ, গাড়ি ঘোড়ার ঘসায় মসৃণ রাস্তা আর ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশায় ডুবুডুবু দূর দিগন্ত। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বের হওয়ার তেমন অভ্যাস ওর না থাকায় সবই ওর কাছে নতুন আর অসাধারণ, সবই ওকে টানে। কিন্তু মাঝে মাঝে চোখ নামিয়ে চোখের পাতায় যখন হিমকণার স্নিগ্ধ শিরশিরে ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করে তখন ওর এত কালের এত সাধের স্বপ্ন যে আজ এমন অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ভাবে সফল হতে চলেছে এই ভেবে মৃদু হাসে। শেষকালে সে গ্রিগোরির সঙ্গে তাতারস্কি ছেড়ে চলেছে দূরে কোথাও, ছেড়ে চলেছে ওর জন্মভূমি, অভিশপ্ত সেই দেশ যেখানে অনেক কষ্ট তাকে সইতে হয়েছে, যেখানে অর্ধেক জীবন ওকে নরকযন্ত্রণা ভোগ ক'রে কাটাতে হয়েছে এমন স্বামীর সঙ্গে যাকে সে ভালোবাসে না, যেখানকার সব কিছু দুঃসহ স্মৃতির ভার ওকে অহরহ পীড়িত করে। সমস্ত শরীর দিয়ে গ্রিগোরির উপস্থিতি উপলব্ধি ক'রে ও হাসে। এ সুখের জন্য যে ওকে কী মূল্য দিতে হয়েছে এখন আর ও তা ভাবে না। ভবিষ্যতে কী হবে সে কথাও ভাবে না। ভবিষ্যৎ ওই স্তেপের মাঠের দূর দিগন্তরেখার মতোই অন্ধকার কুহেলিঢাকা, ওকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে।

দৈবাৎ ফিরে তাকাতে আক্সিনিয়ার হিমে ফুলে ওঠা গোলাপী ঠোঁট হাসিতে কাঁপছে দেখে প্রোখর অপ্রসন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'অমন দাঁত বার করার কী হয়েছে? আহা কী কনে-বৌটি দেখ! ঘর ছাড়তে খুশি আর ধরে না, অ্যাঁ?'

'খুশি হব না ত কী?' উত্তরে আক্সিনিয়া ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

'খুশি হবার মতোই বটে! ... তুমি একটা হাঁদা মেয়েমানুষ! এ যাত্রার শেষ কোথায় তার দেখা নেই এখনও। তাই বলি আগে ভাগে হেসে কাজ নেই। বন্ধ কর তোমার দাঁতের পাটি!'

'আর খারাপ হবার কিছু নেই আমার।'

'তোমাদের দেখলে আমার গা জ্বালা করে ...' বলতে বলতে প্রোখর ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোড়াদুটোর গায়ে চাবুক হাঁকড়ায়।

আক্সিনিয়া হাসতে হাসতে পরামর্শ দেয়, 'তা তুমি মুখ ঘুরিয়ে মুখে আঙুল পুরে রাখ না।'

'এই তোমার আরেকটা বোকামি! মুখে আঙুল পুরে টুঁ শব্দটি না ক'রে আমায় সুমুদ্দুর অবধি এতটা পথ যেতে বল! বলিহারি তোমার বুদ্ধি!'

'তোমার গা জ্বালা করছে কিসে বলতে পার?'

'চুপ ক'রে থাকলেই ত ভালো হত! তোমার সোয়ামীটি কোথায়? পরপুরুষের ল্যাংবোট হয়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে কোন্ চুলোয় চললে? এদিকে স্তেপান যদি এখন গাঁয়ে এসে হাজির হয় তাহলে কী হবে?'

আক্সিনিয়া মুখের ওপর জবাব দিয়ে বলল, 'তোমাকে তাহলে বলি প্রোখর আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না; নইলে তোমার কপালে দুঃখু আছে কিন্তু।'

'তোমাদের ব্যাপারে আমি জড়াতে যাব কেন? কোন্ দুঃখে? যা ভাবি মন খোলসা ক'রে তা বলব তাতেও মানা আছে নাকি? নাকি আমায় তোমাদের গাড়োয়ান হয়ে যেতে হবে? – শুধু ঘোড়ার সঙ্গেই কথা বলব? হুঁঃ, বুদ্ধি দেখ! না, তুমি রাগ কর আর যাই কর আক্সিনিয়া, তোমাকে একটা ভালো ডাল দিয়ে আচ্ছা ক'রে পেটাতে হয়, সেই সঙ্গে হুকুম দেওয়া টুঁ শব্দটি করতে পারবে না! আর আমার কপালের কথা বলছ? ও বলে আমায় ভয় দেখিও না। কপাল আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আমার কপাল এক বিশেষ ধরনের – এমনই যে মোরগ-ডাক ছাড়ে না বটে, কিন্তু ঘুমোতেও দেয় না। ... অ্যাই অ্যাই হতচ্ছাড়াগুলো! ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে কেমন হাঁটছে দেখ, শয়তানের ঝাড়!'

গ্রিগোরি হাসিমুখে ওর কথাগুলো শুনছিল। এবারে আপসের সুরে বলল, 'সবে গাঁ ছেড়ে বেরিয়েছি এরই মধ্যে আর ঝগড়াঝাঁটি কোরো না তোমরা। সামনে অনেক পথ পড়ে আছে, আরও সময় পাবে। তুমি ওর পেছনে লেগেছ কেন প্রোখর বল ত?'

'হুঁঃ আমি ওর পেছনে লাগতে এসেছি!' খাপ্পা হয়ে প্রোখর বলে ওঠে। 'আমার মুখে মুখে অমন চোপা না করলেই পারে! আমার এখন কী মনে হচ্ছে জান, মেয়েমানুষের চেয়ে খারাপ জাত দুনিয়ায় আর হয় না। ওরা হল গিয়ে বিছুটির জাত! ... মেয়েমানুষ ... ওঃ ভাই, কী বলব, ভগবানের সবচেয়ে খারাপ ছিষ্টি! আমি হলে এক এক ক'রে এই বজ্জাতগুলোর সব ক'টার এমন হাল ক'রে ছেড়ে দিতাম যে দুনিয়ায় ওদের তিষ্ঠোতে হত না! এত রাগ আমার এখন জমে আছে ওদের ওপর! কী হল? হাসছ যে? অন্যের বিপদে শুধু বোকারাই হাসতে পারে! লাগামগাছা ধর দেখি, মিনিটখানেকের জন্য একটু নামি।'

প্রোখর বেশ খানিকক্ষণ পায়ে হেঁটে চলে। পরে স্লেজে উঠে আরাম ক'রে বসে। আর কোন কথাবার্তা বলে না।

সে রাতটা ওরা কার্গিনস্কায়ায় কাটাল। পর দিন সকালে জলখাবার সেরে আবার পথে নেমে পড়ল। যখন আবার রাত নেমে এলো ততক্ষণে তারা কুড়ি ক্রোশ মতন রাস্তা পেরিয়ে এসেছে।

বিরাট সারি বেঁধে দক্ষিণের দিকে দলে দলে চলেছে শরণার্থীদের গাড়ি। ভিওশেনস্কায়া জেলার বসতি থেকে গ্রিগোরি যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই কঠিন হয়ে পড়ে রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া। মরোজোভস্কায়ার কাছে আসার পর কসাকদের প্রথম সামরিক ইউনিটগুলোর দেখা মিলতে লাগল। ঘোড়সওয়ারের দল চলেছে। তলোয়ারধারীরা সংখ্যায় মোটে তিরিশ-চল্লিশজন। লম্বা সার বেঁধে চলেছে অগুনতি রসদ গাড়ি। সন্ধ্যানাগাদ গ্রামগুলোতে সব ঘরবাড়ি দখল হয়ে গেছে। কোথাও রাত কাটানো ত দূরের কথা, ঘোড়া রাখার মতো জায়গা পর্যন্ত নেই। ইউক্রেনীয় একটা বসতিতে এসে রাতে মাথা গোঁজার মতো আস্তানার খোঁজে গ্রিগোরি বৃথাই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াল। শেষকালে বাধ্য হয়ে একটা চালাঘরের নীচে রাত কাটাতে হল। তুষারঝড়ের পাল্লায় পড়ে গলা তুষারে গায়ের জামাকাপড় ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। সকাল হতে সেগুলো জমে কাঠ হয়ে যায়, চলতে গেলেই ঝনঝন আওয়াজ করে। প্রায় সারা রাত ওদের তিনজনের কেউই ঘুমোতে পারে নি। কেবল ভোরের আগে আগে উঠোনের পেছনে বিচালি জড় ক'রে ধুনি জ্বেলে তারা গা গরম করতে পেরেছিল।

ভোরবেলায় আক্সিনিয়া ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব করল, 'আজকের দিনটা এখানে থেকে গেলে হত না গ্রিশা? সারা রাত ঠাণ্ডায় কষ্ট পেয়েছি আমরা সবাই, ঘুম প্রায় হয় নি। একটু জিরিয়ে নিতে পারলে বোধহয় ভালো হত – কী বল?'

গ্রিগোরি রাজী হয়ে গেল। অনেক খুঁজে পেতে একটা খালি জায়গা বার করল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসদ গাড়িগুলো আরও দূরের পথ ধরল। কিন্তু শতাধিক আহত আর টাইফাস জ্বরের রুগী নিয়ে যে জঙ্গী হাসপাতালটা এসেছিল সেটাও দিনের বেলাতে রয়ে গেল।

ছোট্ট একটা ঘরে নোংরা মাটির মেঝেতে দশজন কসাক ঘুমিয়ে আছে। একটা সতরঞ্চি আর থলেয় ক'রে কিছু খাবারদাবার ভেতরে নিয়ে এলো প্রোখর। দরজার কাছে খড়বিচালি বিছিয়ে দিল। এক বুড়ো বেহুঁশ হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল, পা ধরে টেনে তাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে খানিকটা কর্কশ শোনালেও মিষ্টি গলায় আক্সিনিয়াকে বলল, 'এখানে শুয়ে পড় আক্সিনিয়া। তোমার ওপর দিয়ে যা ধকলটা গেছে, দেখে চেনাই যায় না তোমাকে।'

রাতের দিকে বসতিটা আবার লোকের ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে গেল। ভোর অবধি গলিতে গলিতে ধুনি জ্বলে। লোকজনের কণ্ঠস্বর, ঘোড়ার ডাক আর

স্লেজগাড়ির পাতের তলায় বরফ ঘসটানোর কড়কড় আওয়াজে ভরে ওঠে জায়গাটা। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই গ্রিগোরি জাগিয়ে দিল প্রোখরকে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'ঘোড়া জোতো। রওনা হতে হয়।'

'এত সকাল-সকাল কেন?' হাই তুলতে তুলতে প্রোখর জিজ্ঞেস করে।

'শুনতে পাচ্ছ?'

জিনের গদিটা বালিশ ক'রে মাথায় দিয়েছিল প্রোখর। সেখান থেকে মাথা তুলতে শুনতে পেল দূর থেকে কামানের চাপা গুরুগুরু গর্জন।

ওরা হাতমুখ ধুয়ে খানিকটা চর্বি খেয়ে নিয়ে যখন রওনা দিল ততক্ষণে বসতিতে সাড়া পড়ে গেছে। গলিতে গলিতে সার দিয়ে স্লেজগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। ভোরের পূর্বক্ষণের আধ: অন্ধকারের মধ্যে কে একজন ভাঙা গলায় চিৎকার ক'রে বলে ওঠে, 'না কবর দিতে হয় তোমরা নিজেরাই দাও। ছয় জনের কবর খুঁড়তে গেলে আমাদের দুপুর গড়িয়ে যাবে!'

'আমগো কি ঠ্যাকা পড়ছে কবর দিবার?' আরেকজন জিজ্ঞেস করল শান্ত গলায়।

'তোমাদের ঘাড়ে দেবে!' ভাঙা গলার যে লোকটা বলছিল সে গলা চড়াল। 'যদি না চাও রইল পড়ে। পড়ে পড়ে পচুক তোমাদের নাকের সামনে। আমার বয়েই গেল!'

'এইডা ক্যামন শাহান কথা অইল ডাক্তার বাবু! আমগো নিজেগোর লোকগুলানেরই কবর দিয়া কুল পাই না, বাইরের যারা মরত্যাছে তাগো লইগ্যা বাইরের লোকেরাই কাম করুক। নিজেরাই দ্যান না ক্যান?'

'চুলোয় যাও! আকাট মুখ্যু কোথাকার! তোমার জন্যে হাসপাতালটা লালদের হাতে তুলে দিতে বল?'

গলিতে গাড়ি ঘোড়ার ভিড় জমে উঠেছিল। গাড়ি চালিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরি বলল, 'মরা মানুষে কারওর দরকার নেই।...'

'যারা বেঁচে আছে তাদেরই কে দেখে তার ঠিক নেই, তুমি বলছ কিনা মরা মানুষের কথা!' প্রোখর বলে উঠল।

* * *

দনের উত্তরের সবগুলো জেলা এগিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে। উদ্বাস্তুদের অসংখ্য গাড়ি ত্সারিত্সিন – লিখায়া রেলপথ পার হয়ে মানিচের কাছাকাছি চলে আসছে। এক সপ্তাহ কেটে গেছে পথে পথে। এর মধ্যে গ্রিগোরি বহু বার অতায়স্কির লোকজনের খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যে-সমস্ত গ্রামের

ওপর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে সেখানে তাতারস্কির কারও পাত্তা মেলে নি। সম্ভবত তারা বাঁ দিক ঘেঁসে চলে গেছে, ইউক্রেনীয় বসতিগুলো এড়িয়ে কসাক পল্লীর ভেতর দিয়ে ওব্লিভ্স্কায়াতে গিয়ে পড়েছে। কেবল তেরো দিনের দিন গ্রিগোরি ওর গ্রামের লোকদের সন্ধানের একটা সূত্র পেল। রেললাইন যখন পেরিয়ে গেছে, এমন সময় একটা গাঁয়ে দৈবাৎ জানতে পেল পাশের বাড়িতেই নাকি ভিওশেন্স্কায়া জেলার এক কসাক টাইফাস জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে। গ্রিগোরি খোঁজ নিতে বেরিয়ে পড়ল রোগী লোকটা ঠিক কোথাকার। নীচু কুঁড়েঘরটার ভেতরে ঢুকে সে দেখতে পেল মেঝেতে শুয়ে আছে বুড়ো অব্নিজভ। তার কাছ থেকে সে জানতে পারল তাতারস্কির লোকেরা গত পরশু দিন এ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। ওদের মধ্যে অনেকে টাইফাস জ্বরে ভুগছে। দু'জন ইতিমধ্যে রাস্তাতেই মারা গেছে, আর অব্নিজভ নিজের ইচ্ছেতেই রয়ে গেছে এখানে।

'যদি সেরে উঠি আর লাল ফৌজের কমরেডরা যদি ক্ষমাঘেন্না ক'রে প্রাণে না মারে আমাকে, তাহলে কোন রকমে ঘরে ফিরে যাব। আর তা না হলে এখানেই মরব। মরতে হলে সব জায়গাই সমান, কোথাও মধুর কিছু নয়,' বিদায়ের সময় গ্রিগোরিকে বুড়ো বলল।

গ্রিগোরি ওর বাপের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু অব্নিজভ জবাব দিল সে কিছুই বলতে পারছে না, কারণ সে একেবারে পেছনের একটা স্লেজগাড়িতে ছিল। মালাখোভ্স্কি গ্রামের পর থেকে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে আর দেখে নি।

পরের বার ওরা যেখানে এসে রাত কাটানোর জন্য থামল সেখানে গ্রিগোরির ভাগ্য প্রসন্ন হল। রাতের আস্তানার খোঁজে প্রথম যে বাড়িতে ঢুকেছিল সেখানেই দেখা হয়ে গেল উজানী চির্ গ্রামের কসাকদের সঙ্গে। ওরা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে সরে গিয়ে জায়গা ক'রে দিল। উনুনের ধারে জায়গা হয়ে গেল গ্রিগোরির। ঘরের ভেতরে গাদাগাদি ক'রে শুয়ে ছিল জনা পনেরো উদ্বাস্তু। তাদের মধ্যে তিনজন টাইফাস জ্বরে ভুগছে, একজন তুষারের আঘাতে জখম। কসাকরা রাতের খাবারের জন্য শুয়োরের চর্বি দিয়ে কাউনের জাউ রান্না করেছে। মহা সমাদরে তারা গ্রিগোরি আর তার সঙ্গীদের তাই দিয়ে আপ্যায়ন করল। প্রোখর আর গ্রিগোরি বেশ তৃপ্তি ক'রে খেল। কিন্তু আক্সিনিয়া খাবার ফিরিয়ে দিল।

প্রোখর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খিদে পায় নি?' গত কয়েক দিন হল কোন এক অজ্ঞাত কারণে আক্সিনিয়ার প্রতি প্রোখরের ব্যবহার বদলে গেছে। আক্সিনিয়ার সঙ্গে ওর কথাবার্তা একটু রুক্ষমতো মনে হলেও ভেতরে ভেতরে তাতে সমবেদনা প্রকাশ পায়।

'কেমন যেন গা গোলাচ্ছে. . .' মাথায় ওড়না জড়িয়ে উঠোনে বেরিয়ে গেল আক্সিনিয়া।

গ্রিগোরির দিকে ফিরে প্রোখর জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, অসুখবিসুখ হল নাকি?'

'কে জানে?' জাউয়ের থালাটা নামিয়ে রেখে গ্রিগোরিও বেরিয়ে যায়।

বুকে হাত চেপে দেউড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল আক্সিনিয়া। ওকে জড়িয়ে ধরে গ্রিগোরি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আক্সিনিয়া লক্ষ্মীটি, কী হল তোমার?'

'গা গোলাচ্ছে, মাথাও ধরেছে।'

'চল, ভেতরে চল, শুয়ে থাকবে।'

'তুমি যাও, আমি এখুনি আসছি।'

ওর গলার আওয়াজ চাপা আর নিষ্প্রাণ, চলাফেরা কেমন যেন নিস্তেজ। ও যখন গরমে তেতে ওঠা গুমোট ঘরের ভেতরে ঢুকল তখন গ্রিগোরি সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, লক্ষ করল ওর গালে লাল টসটসে জ্বরের আভাস ফুটে উঠেছে, দু'চোখ যেমন চকচক করছে সেটা সন্দেহজনক। গ্রিগোরির বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল: বোঝাই যাচ্ছে আক্সিনিয়ার অসুখ করেছে। ওর মনে পড়ল গতকালও আক্সিনিয়া বলছিল যে তার কাঁপুনি লাগছে আর মাথা ঘুরাচ্ছে। শেষ রাত্রে ওর শরীর এত ঘেমে উঠেছিল যে ঘাড়ের ওপর ওর কোঁকড়া চুলের রাশি পর্যন্ত ভিজে জবজব করছিল - মনে হচ্ছিল যেন এই মাত্র নেয়ে উঠেছে। ভোরের আগে আগে ঘুম ভেঙে যেতে গ্রিগোরি সেটা লক্ষ করেছিল। ঘুমন্ত আক্সিনিয়ার মুখের ওপর থেকে অনেকক্ষণ সে তার দৃষ্টি সরাতে পারে নি। কিন্তু পাছে ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে সে আর ওঠে নি।

রাস্তার ধকল সহ্য করার ব্যাপারে আক্সিনিয়া যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। এমনকি প্রোখরকেও উৎসাহ দিয়েছে। প্রোখর প্রায়ই অনুযোগ ক'রে বলত, 'ধুত্তোর এ কি বিচ্ছিরি জিনিস লড়াই! কার এথা থেকে বেরিয়েছিল? সারা দিন ধরে পথ চল, তারপর যখন থামলে, দেখলে রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এ ভাবে হুকুমে চলতে চলতে আমরা যে কোথায় গিয়ে ঠেকব কে জানে?' কিন্তু আজ আক্সিনিয়ারও ধৈর্যে কুলাল না। রাত্রে যখন সবাই শুয়ে পড়েছে তখন গ্রিগোরির মনে হল সে যেন কাঁদছে।

'কী হল তোমার?' গ্রিগোরি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে। 'কোথায় ব্যথা করছে তোমার?'

'অসুখ করেছে আমার। . . . এখন কী হবে? ফেলে যাবে আমায়?'

'কী যে বল! বোকা কোথাকার! কী ক'রে ফেলে যাব তোমায়? কেঁদো না অমন ক'রে। হয়ত পথে ঠাণ্ডা লেগে এরকম হয়েছে। ভয় পাবার কী আছে?'

'ওগো, আমার টাইফাস জ্বর হয়েছে।'

'আবোল তাবোল কথা বোলো না! সে রকম কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তোমার কপালটা ঠাণ্ডা। না না তা হতে পারে না।' গ্রিগোরি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝতে পারল আক্সিনিয়ার ওই টাইফাস জ্বরই হয়েছে। এখন যদি ও রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে তাহলে ওকে নিয়ে কী করা – ভাবতে গিয়ে থই পায় না গ্রিগোরি।

'উঃ এ ভাবে চলা যে কষ্ট!' গ্রিগোরির বুকের কাছে ঘেঁসে চাপা গলায় আক্সিনিয়া বলে। 'রাতের বেলায় মাথা গোঁজার জন্যে লোকজনের কি গাদাগাদি ভিড় দেখ! উকুনে আমাদের খেয়ে ফেলছে গ্রিশা! নিজের দিকে যে নজর দেব সে উপায় নেই – চারদিকে গিজগিজ করছে পুরুষমানুষ। . . . গতকাল চালাঘরের ভেতরে ঢুকে গায়ের কাপড় খুলেছিলাম . . . কত যে উকুন জামায়! . . . হা ভগবান, জীবনে কখনও অমন ভয়ঙ্কর জিনিস দেখি নি! মনে পড়লেই গা ঘিন ঘিন করে, কিছু খেতে পারি নে। . . . কাল দেখেছিলে ওই যে বুড়োটা বেঞ্চিতে ঘুমোচ্ছিল, কত উকুন তার গায়ে? একেবারে ওর জামার ওপরে পিলপিল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।'

'ওসব কথা ভেবো না। ওসব কিসের ছাই ভাবনা তোমাকে পেয়ে বসেছে? উকুন ত কী হয়েছে? পল্টনে ও জিনিস কেউ গ্রাহ্যির মধ্যে আনে না,' বিরক্ত হয়ে ফিসফিসিয়ে গ্রিগোরি বলল।

'আমার সারা গা চুলকোচ্ছে।'

'সবারই চুলকোচ্ছে। কী করা যাবে এখন বল? ওটুকু সইতে হবে। ইয়েকাতেরিনোদারে গিয়ে ভালো করে চান করা যাবে 'খন।'

'কিন্তু পরিষ্কার কিছু গায়ে দেবার উপায় নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আক্সিনিয়া বলল। 'ওগুলোর জ্বালায় আমরা মারা পড়ব গ্রিশা!'

'ঘুমোও, কাল আবার সকাল-সকাল বেরোতে হবে।'

অনেকক্ষণ ঘুম আসে না গ্রিগোরির। আক্সিনিয়াও ঘুমোতে পারে না। পশুলোমের কোটের কিনারা দিয়ে মাথা ঢেকে সে বার কয়েক ফুঁপিয়ে কাঁদল। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গ্রিগোরি যখন পাশ ফিরে মুখোমুখি হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে শুল একমাত্র তখনই ও ঘুমোতে পারল। মাঝরাতে জোর ঠকঠক আওয়াজ হতে গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলার উপক্রম করছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, 'এই কে আছে, দরজা খোল! নইলে দরজা ভেঙে ফেলব কিন্তু! আহা ঘুমোচ্ছে দেখ হারামজাদার দল!'

বাড়ির কর্তা এক প্রৌঢ় নিরীহ্ গোছের কসাক। বারান্দায় বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই? রাত কাটাবার ব্যাপার যদি হয় তাহলে আমাদের এখেনে কোন লাভ হবে না - অমনিতেই ভিড়ে-ভিড়াক্কার, পাশ ফিরে শোবার উপায় নেই।'

'দরজা খোল বলছি!' বাইরে থেকে চিৎকার শোনা যায়।

সামনের ঘরের দরজার পাল্লা হাঁ হয়ে খুলে যেতে হুড়মুড় ক'রে ঘরের ভেতরে এসে ঢোকে পাঁচজন সশস্ত্র কসাক।

'তোমাদের এখানে যারা রাত কাটাচ্ছে তারা কারা?' ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ঠোঁটজোড়া অনেক কষ্টে নেড়ে ওদের ভেতরে একজন জিজ্ঞেস করে। হিমে জমে ঢালাই লোহার মতো কালো হয়ে গেছে লোকটার মুখ।

'এরা বাস্তুহারা। কিন্তু তোমরা কারা?'

কোন জবাব না দিয়ে ওদের মধ্যে একজন ভেতরের ঘরে পা বাড়াল। ঢুকে চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে। বেশ হাত পা ছড়িয়ে শোয়া হয়েছে! কেটে পড় দেখি একখুনি! এখানে সেপাইরা থাকবে এখন। উঠে পড়, উঠে পড়! চটপট কর বলছি, নইলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব বলছি!'

'তুমি কে হে? অমন চেল্লাচেল্লি করছ কেন?' ঘুম জড়ানো ভাঙা ভাঙা গলায় এই কথা বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল গ্রিগোরি।

'আমি কে এই এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে!' কসাকটা গ্রিগোরির দিকে পা বাড়াল। কেরোসিনের বাতির টিমটিমে আলোয় অস্পষ্ট ঝলকে উঠল তার হাতে ধরা রিভলভারের নলটা।

'খুব চটপটে দেখছি! . . .' ওকে ভোলানোর জন্য নকল তোষামোদের সুরে গ্রিগোরি বলল। 'দেখি তোমার খেলনাটা!' বলেই ক্ষিপ্রগতিতে কসাকের হাতের কব্জি চেপে ধরে এত জোরে মুচড়ে দিল যে সে. কাতরে উঠে হাতের মুঠি খুলে ফেলল। ধপ করে মৃদু আওয়াজ তুলে সতরঞ্চির ওপর পড়ে গেল রিভলভারটা। গ্রিগোরি কসাককে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চটপট নীচু হয়ে রিভলভার তুলে নিল। পকেটে পুরে শান্ত গলায় বলল, 'আচ্ছা এবারে এসো, বাত্‌চিত হোক। কোন ইউনিটের লোক তোমরা? এমন চটপটে তোমাদের আর ক'জন আছে হে?'

আচমকা ধাক্কাটা সামলে নিয়ে কসাক চেঁচিয়ে উঠল, 'এই সেপাইরা চলে এসো সব।'

দরজার কাছে এগিয়ে গেল গ্রিগোরি। দরজার পাশের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে চৌকাটে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি উনিশ নম্বর দন রেজিমেন্টের একজন

লেফ্‌টেনান্ট। চুপ্‌। কোন চিৎকার চেঁচামেচি নয়! কে অমন গাঁক গাঁক করছ? কি গো কসাকের পো'রা, অমন মারদাঙ্গা মেজাজ কেন? কাকে তোমরা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করতে চাও? কে তোমাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে? অ্যাবাউট টার্ন ক'রে এখান থেকে কেটে পড় দেখি!'

কসাকদের মধ্যে একজন গলা উঁচিয়ে বলল, 'তুমি গলাবাজি করার কে হে? ওরকম লেফ্‌টেনান্ট ঢের দেখেছি। আমরা কি উঠোনে রাত কাটাব নাকি? জায়গা ছেড়ে চলে যাও বলছি! রিফুজিদের সকলকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার হুকুম আছে আমাদের ওপর, বুঝেছ? এসব কি গোলমাল পাকালে বাপু! তোমাদের মতো লোক আমাদের ঢের দেখা আছে!'

যে লোকটা কথা বলছিল গ্রিগোরি সোজা তার দিকে ধেয়ে এসে দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'না, আমার মতো লোক এখনও দেখ নি। তোমার মতো একটা গাধাকে দুটো গাধা বানিয়ে দিতে বল? চাও ত বানিয়ে দিতে পারি। কী হল, পিছু হটছ যে! এটা আমার রিভলভার নয়, তোমাদের লোকের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। এই নাও, তাকে ফেরত দিও। এখন মেলা দিক না ক'রে চটপট কেটে পড় ত দেখি; নইলে এমন মার শুরু করব যে পিঠের ছালচামড়া আস্ত থাকবে না!' গ্রিগোরি আস্তে করে কসাকটাকে ঘুরিয়ে ঠেলে দিল দরজার দিকে।

ঘোমটা-টুপিতে মাথা মুখ জড়ানো লম্বা চওড়া চেহারার এক কসাক চিন্তিত ভাবে বলল, 'দেবো নাকি এক ঘা কষিয়ে?' লোকটা গ্রিগোরির পেছনে দাঁড়িয়ে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসখুস করছিল। তাইতে চামড়ার সোল দেওয়া বিশাল পশমী জুতো জোড়া ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলছিল।

গ্রিগোরি ওর দিকে মুখ ফেরাল। এবারে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে হাতের মুঠো পাকাল। কিন্তু কসাকটি হাত তুলে বন্ধু ভাবেই বলল, 'আমার কথা শোনো! মহামান্য হুজুর না কী বলে তোমাকে ডাকব জানি নে—সবুর কর, হাতের মুঠি আর নাড়িয়ে কাজ নেই। ঝামেলা পাকানোর ইচ্ছে আমাদের নেই। আমরা চলে যাচ্ছি। তবে বলি কি দিনকাল যা পড়েছে, কসাকদের ওপর অমন তেড়ে ফুঁড়ে না আসাই ভালো। এখন আবার সেই সতেরো সালের মতো কঠিন সময় আসছে। সে রকম কোন বেপরোয়া কসাকদের পাল্লায় পড়লে কী হয় বলা যায় না। তারা তোমাকে দু'খানা নয়, পাঁচখানা ক'রে ছাড়তে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি অফিসার হিশেবে তুমি বেশ ডাকাবুকো, আর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যেন আমাদেরই ঘরের লোক। তাই বলছিলাম কি একটু বুঝেশুনে চল, নইলে ঝামেলায় পড়ে যাবে কিন্তু। ...'

গ্রিগোরি যে লোকটার রিভলভার কেড়ে নিয়েছিল এবারে সে খাপ্পা হয়ে বলল, 'ওসব ধম্মের কথা ওকে শুনিয়ে আর কাজ নেই! চল, পাশের বাড়িতে গিয়ে দেখা যাক।' সে-ই প্রথম পা বাড়াল চৌকাটের দিকে। গ্রিগোরির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপের সুরে বলল, 'তোমাকে নিয়ে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে আমাদের নেই অফিসার সাহেব, নইলে তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম আমরা!'

গ্রিগোরি অবজ্ঞাভরে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'তুই? তুই কিনা আমাকে উচিত শিক্ষা দিবি বলছিস? যা যা নইলে এখুনি প্যান্ট খুলে নেব। হুঃ, ভারী আমার শেখানোর লোক এসেছে! রিভলভারটা ফেরত দিয়ে ভুলই করেছি দেখছি। তোর মতো বীরপুরুষদের রিভলভার নিয়ে ঘুরে না বেরিয়ে ভেড়ার লোম আঁচড়ানোর বুরুশ নিয়ে ঘোরা উচিত!'

কসাকদের মধ্যে একজন – লোকটা এতক্ষণ কোন কথাবার্তার মধ্যে যোগ দেয় নি – এবারে প্রসন্ন হাসি হেসে বলল, 'চল ভাই চল। মরুক গে! ময়লা ঘেঁটে কাজ নেই - গন্ধ ছাড়বে।'

গালাগাল দিতে দিতে, বরফে জমে যাওয়া বুট জুতোর দুমদাম আওয়াজ তুলে কসাকরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গ্রিগোরি বাড়ির কর্তাকে কড়া হুকুম দিয়ে বলল, 'খবরদার, দরজা খুলবে না। ধাক্কাধাক্কি ক'রে শেষকালে চলে যাবে। তাও যদি না যায় আমায় ডেকো।'

চির্-এর উজান এলাকার যে-সমস্ত লোক গোলমাল শুনে জেগে উঠেছিল তারা চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল।

একজন বুড়ো ফোঁস ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নাঃ আইন-শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়েছে! অফিসারের সঙ্গে শুয়োরের বাচ্চোরা সব এমন ভাবে কথা বলে। . . . আগেকার দিন হলে কী হত বল ত? সোজা ঘানি ঠেলতে পাঠিয়ে দিত!'

'আরে কথাবার্তা বলা কী বলছ? দেখলে না, পারলে লড়াই করে! ওই যে ঘোমটা-টুপি ঢাকা আখাম্বা শাল গাছের মতো ওই লোকটা বলল না, 'দেবো নাকি এক ঘা কষিয়ে?' বোঝ, কেমন বেপরোয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাটারা!'

একজন কসাক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদের অমনি অমনি ছেড়ে দিচ্ছ গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ?'

গ্রেটকোটে গা মুড়ি দিয়ে এতটুকু বিরক্ত না হয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মনে মনে হাসছিল গ্রিগোরি। সে উত্তর দিল, 'কী করতে বল ওদের নিয়ে? ওরা এখন সব রকম শাসনের বাইরে, কারও বশ মানে না। এক-একটা চোর বাটপারের দল, দেখাশোনা করার কেউ নেই। কে ওদের বিচার করবে,

কেই বা ওদের ওপরওয়ালা? যার বেশি জোর সে-ই ওদের ওপরওয়ালা। ওদের গোটা দলটার মধ্যে একজনও কেউ অফিসার আছে বলে ত আমার মনে হয় না। এরকম স্কোয়াড্রন আমি আগেও দেখেছি - যাদের বলতে গেলে কোন চালচুলোই নেই! যাক গে, এবারে ঘুমানো যাক!'

আক্সিনিয়া নীচু গলায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'কেন তুমি ওদের সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলে বল ত গ্রিশা? ভগবানের দোহাই, ওরকম লোকদের সঙ্গে ঝামেলা বাধাতে যেয়ো না! ওরা এমনই তিরিক্ষে লোকজন, বলা যায় না, মেরেও ফেলতে পারে।'

'ঘুমোও ঘুমোও। কাল খুব সকাল-সকাল উঠতে হবে কিন্তু। কেমন বোধ করছ এখন? একটু ভালো লাগছে কি?'

'একই রকম।'

'মাথা ধরা আছে?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় আর বোধহয় উঠতে পারব না। . . .'

আক্সিনিয়ার কপালে হাত রাখল গ্রিগোরি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'উঃ পুড়ে যাচ্ছে! উনুনের মতো গনগন করছে। তাহলেও ভয় পাবার কিছু নেই। তোমার স্বাস্থ্য ভালো আছে, সেরে উঠবে।'

আক্সিনিয়া চুপ করে রইল। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। কয়েকবার রান্নাঘরে ঢুকল, বিশ্রী বিস্বাদ গরম জল খেল। বমি-বমি আর মাথা ধরা ভাবটা কাটানোর চেষ্টা করতে করতে আবার শুয়ে পড়ল সতরঞ্চির ওপরে।

সে রাতে আস্তানার খোঁজে আরও চারটে দল হানা দিয়েছিল। তারা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে দরজায় ঘা মারে, খড়খড়ি খোলে, জানলায় খটখট আওয়াজ করে। বিদায় নেয় একমাত্র তখনই যখন গ্রিগোরির শেখানো-পড়ানো মতো বাড়িওয়ালা বারান্দা থেকে গালিগালাজ করতে করতে চেঁচিয়ে বলে, 'এখান থেকে সরে যাও! ব্রিগেডের সদর ঘাঁটি এটা!'

ভোরবেলায় গ্রিগোরি আর প্রোখর ঘোড়া জুতল। আক্সিনিয়া কষ্টেসৃষ্টে জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এলো। সূর্য উঠছে। বাড়িঘরের মাথার ওপরকার চিমনি থেকে গলগল করে নীল আকাশের দিকে ছুটে চলেছে ময়ূরকণ্ঠী রঙের ধোঁয়ার রেখা। নীচ থেকে সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে অনেক উঁচুতে আকাশের বুকে ঝুলছে ছোট্ট এক টুকরো গোলাপী মেঘ। চালাঘরের ছাদে আর বেড়াগুলোর গায়ে ঘন হয়ে জমে আছে জমাট তুষারকণা। ঘোড়াগুলোর গা থেকে ধোঁয়া উঠছে।

আক্সিনিয়াকে স্লেজগাড়িতে উঠে বসতে সাহায্য ক'রে গ্রিগোরি। জিজ্ঞেস করে, 'শুয়ে থাকবে কি? তাতে হয়ত খানিকটা ভালো লাগবে।'

গ্রিগোরির কথা মেনে নিয়ে মাথা ঝাঁকায় আক্সিনিয়া। গ্রিগোরি ওর পাদুটো সযত্নে ঢেকে দিতে তার দিকে নীরবে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি মেলে তাকায়। চোখ বোজে।

দুপুরবেলায় বড় সড়ক ছেড়ে ক্রোশখানেক দূরে নোভো-মিখাইলোভ্‌স্কয়ে বসতিতে যখন তারা ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাওয়ানোর জন্য এসে থামল তখন আর স্লেজ ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই আক্সিনিয়ার। গ্রিগোরি ওকে হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। বাড়িউলী বিছানা ক'রে দিয়ে আতিথেয়তার পরিচয় দিয়েছিল।

আক্সিনিয়া ফেকাসে হয়ে গিয়েছে দেখে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে, 'তোমার খুব খারাপ লাগছে নাকি গো?'

অনেক কষ্টে চোখ মেলে আক্সিনিয়া, ঝাপসা চোখে একবার তাকায় গ্রিগোরির দিকে, পরক্ষণেই আবার ডুবে যায় অর্ধবিস্মৃতির ঘোরে। গ্রিগোরি কাঁপা কাঁপা হাতে ওর মাথা থেকে ওড়নাটা সরাল। আক্সিনিয়ার গালদুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা, কিন্তু কপাল পুড়ে যাচ্ছে। রগের দু'পাশের ঘাম ঠাণ্ডায় জমে বরফের কাঠির মতো হয়ে আছে। সন্ধ্যার দিকে আক্সিনিয়া জ্ঞান হারাল। এর আগে সে জল খেতে চেয়েছিল, ফিসফিস করে বলেছিল, 'জল, শুধু ঠাণ্ডা বরফগলা জল।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার অস্পষ্ট ভাবে বিড়বিড় ক'রে উঠেছিল, 'গ্রিশাকে ডাক।'

'আমি এখেনে। কী চাই তোমার আক্সিনিয়া সোনা?' গ্রিগোরি ওর হাতখানা তুলে নিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে আনাড়ির মতো বুলোয়।

'ওগো, আমায় ছেড়ে যেয়ো না!'

'তোমায় ছেড়ে যাব না। ওকথা কেন ভাবছ তুমি?'

প্রোখর জল এনে দিল। তামার মগের কিনারায় শুকনো ঠোঁট ঠেকিয়ে তৃষ্ণায় কাতর আক্সিনিয়া কয়েক ঢোক জল খেল, তারপর কাতরে উঠল। ওর মাথাটা ঢলে পড়ল বালিসের ওপর। মিনিট পাঁচেক পরে জড়িতকণ্ঠে অসংলগ্ন কথা শুরু হয়ে গেল। গ্রিগোরি শিয়রে বসে ছিল, ধরতে পারল ওর মাত্র কয়েকটা কথা: 'কাপড়চোপড় কাচতে হবে . . . একটু নীল যোগাড় করে আন . . . তাড়ার কিছু নেই . . .' ওর জড়িত কথাগুলো ফিসফিসানিতে নেমে এলো। প্রোখর মাথা ঝাঁকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'তখনই বলেছিলুম না, ওকে সঙ্গে নিও না! এখন আমরা কী করব? হা ভগবান এ যে এক শাস্তিবিশেষ! এখানেই রাতটা কাটাব নাকি আমরা? কী হল, কালা হয়ে গেলে নাকি? বলি রাতটা কি এখানেই কাটাব, নাকি এগোব?'

গ্রিগোরি চুপ করে থাকে। ঘাড় গুঁজে বসে থাকে। আক্সিনিয়ার ফেকাসে মুখ থেকে তার দৃষ্টি সরে না। বাড়ির গিন্নি মহিলাটি ভালোই, বেশ অতিথিবৎসলও।

চোখের ইশারায় আক্সিনিয়াকে দেখিয়ে মৃদুস্বরে প্রোখরকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর বৌ বুঝি? ছেলেপুলে আছে?'

'ছেলেপুলে আছে, সব আছে। শুধু সৌভাগ্যটাই নেই আমাদের,' বিড়বিড় ক'রে প্রোখর বলল।

উঠোনে বেরিয়ে গেল গ্রিগোরি। স্লেজের ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট টানল। আক্সিনিয়াকে এখানেই রাখা দরকার। আর বেশি দূর যাবার চেষ্টা করতে গেলে ওর মরণ ডেকে আনা হবে। এটা গ্রিগোরি স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। বাড়ির ভেতরে ঢুকে আবার সে বসল শয্যার পাশে।

'রাতটা কি তাহলে এখানেই কাটাব?' প্রোখর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। হয়ত কালকের দিনটাও হতে পারে।'

খানিক বাদে বাড়ির কর্তা এসে হাজির হল। বেঁটেখাটো হাড় জিরজিরে এক চাষী। চোখদুটো ধূর্ত-ধূর্ত, চারদিকে ছটফট ক'রে ঘুরছে। হাঁটু পর্যন্ত একটা পা নেই। কাঠের পা'টা ঠকঠক ক'রে খোঁড়াতে খোঁড়াতে খোশ মেজাজে টেবিলের কাছে এসে গায়ের কোটটা খুলল। অপ্রসন্ন ভাবে আড়চোখে প্রোখরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'প্রভু তাহলে অতিথি জুটিয়ে দিলেন? কোত্থেকে?' উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে বৌকে হুকুম দিল, 'চটপট কিছু খাবার দাবার এনে দাও। খিদেয় মরে যাচ্ছি।'

অনেকক্ষণ ধরে গোগ্রাসে খেতে লাগল। ওর ছটফটে চোখের দৃষ্টি থেকে থেকে প্রোখরের ওপর আর বিছানায় পড়ে থাকা আক্সিনিয়ার নিশ্চল দেহের ওপর পড়ছিল। ভেতরের ঘর থেকে গ্রিগোরি বেরিয়ে এসে কর্তাকে নমস্কার জানাল। লোকটা তার উত্তরে নীরবে মাথা নাড়ল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পিছু হটছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'লড়াইয়ের সাধ মিটে গেল নাকি হুজুর?'

'অনেকটা তাই-ই।'

'ইনি কে? আপনার স্ত্রী নাকি?' মাথা নাড়িয়ে আক্সিনিয়ার দিকে দেখাল বাড়ির কর্তা।

'হ্যাঁ।'

'ওকে খাটে শোয়াতে গেলে কী বলে? আমরা নিজেরা শোবো কোথায় তাহলে?' অসন্তুষ্ট ভাবে গিন্নির দিকে ফিরে তাকায় সে।

'অসুখ করেছে গো! বড় মায়া হচ্ছিল।'

'মায়া! সকলের ওপর অত মায়া দেখালে যাবে কোথায়? ওরা যে কাতারে

কাতারে আসছে! আপনারা ভিড় করে আমাদের অসুবিধে সৃষ্টি করছেন হুজুর। . . .'

বাড়ির কর্তা-গিন্নির দিকে ফিরে বুকে হাত রেখে গ্রিগোরি বলল, 'ওগো ভালো মানুষেরা! ভগবানের দোহাই, বিপদে আমায় একটু সাহায্য কর। ওকে আর দূরে নিয়ে যাওয়া চলে না, নিতে গেলে পথেই মারা যাবে। তোমাদের এখানে থাকতে দাও। ওকে দেখাশোনা করার জন্যে যত টাকা বল আমি দেবো, সারা জীবন মনে রাখব তোমাদের দয়ার কথা। . . . 'না' কোরো না, এইটুকু দয়া কর!' গ্রিগোরির স্বরে ফুটে ওঠে ক্ষমাপ্রার্থনার সুর, প্রায় কাকুতি-মিনতি। অথচ এটা ছিল ওর স্বভাবের বাইরে।

কর্তা প্রথমে ওকে সরাসরি হাঁকিয়ে দিল এই অজুহাত দেখিয়ে যে রোগীর সেবাযত্ন করার মতো সময় তার নেই, তাছাড়া রোগী ঘরে থাকলে ওদের নিজেদের থাকারই অসুবিধে হবে। পরে খাওয়া শেষ ক'রে সে বলল, 'বুঝতেই ত পারছেন মাগনা কে আর সেবাযত্নের ভার নিতে যাবে? তা দেখাশোনার জন্যে আপনি কত দিতে রাজী? আমাদের এই ঝামেলা পোয়ানোর জন্যে কত পর্যন্ত দিতে আপনার আপিত্তি হবে না?'

গ্রিগোরি তার কাছে যত টাকা ছিল সবগুলো পকেট থেকে বার ক'রে এগিয়ে দিল কর্তার দিকে। লোকটা একটু ইতস্তত করে দন সরকারের ব্যাঙ্ক নোটের তাড়াটা হাতে নিল। আঙুলে থুতু লাগিয়ে গুনে দেখল। তারপর বলল, 'জার-মার্কা টাকা নেই আপনার কাছে?'

'না।'

'কেরেনস্কি রুবল নেই? এগুলোর ওপর তেমন একটা ভরসা করা যায় না। . . .'

'কেরেনস্কি রুবল নেই। বল ত আমার ঘোড়াটা রেখে যেতে পারি।'

লোকটা অনেকক্ষণ ভাবনাচিন্তা করল, শেষকালে চিন্তিত ভাবে বলল, 'না। ঘোড়া অবিশ্যি আমি নিতে পারতাম। আমাদের চাষীদের ঘরে ঘোড়ার চেয়ে দরকারী জিনিস আর কী হতে পারে? কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে তাতে ও দিয়ে কোন কাজ হবে না। সাদারা যদি নাও নেয় ত লালেরা কেড়ে নেবে, কাজে লাগানোর কোন সুযোগই পাব না। ওই ত এক খুনখুনে বুড়ী মাদী ঘোড়া আমার, একটা ঠ্যাং খোঁড়া, কোন রকমে ধুঁকছে - কবে চোখের পলকে ওটার গলায় দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে না কে বলতে পারে এমন কথা?' একটু চুপ ক'রে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে সে। পরে অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে যোগ করে, 'আপনি ভাববেন না যে আমি লোকটা বেজায় লোভী। ভগবান রক্ষে করুন! কিন্তু নিজেই বিচার ক'রে দেখুন হুজুর, উনি হয়ত একমাস কিংবা তারও বেশি বিছানায় পড়ে থাকবেন তখন এটা দাও, ওটা নাও - কত ঝক্কি। তার ওপর

আবার খাওয়া দাওয়াও - রুটিটা, দুধটা, একটা দুটো ডিম, এক আধ টুকরো মাংস - এ সবেই ত পয়সা লাগে, ঠিক বলছি কিনা? তাছাড়া জামাকাপড় কাচা, ওকে চান করানো হ্যান ত্যান আরও হাজারো কাজ আছে।... আমার মাগ কোথায় ঘর-গেরস্থালি দেখছিল, তা নয় ত এখন তাকে রুগীর দেখাশোনা করতে হবে। সে বড় হ্যাপার কাজ! না, অমন কিপ্‌টেমি করবেন না, আরও কিছু ছাড়ুন। আমি অথব্ব মানুষ, একখানা পা নেই দেখতেই পাচ্ছেন। আমার কি আর রোজগারের ক্ষমতা আছে? কাজ করারই বা কী ক্ষমতা আছে আমার? ভগবান যা জুটিয়ে দেন তাতেই নুনে ভাতে চালাই।...'

ভেতরে ভেতরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল গ্রিগোরি। মুখে বলল, 'আমি কিপ্‌টেমি করছি না গো ভালোমানুষের পো। আমার যা টাকা ছিল সব দিয়ে দিয়েছি। টাকা ছাড়াও আমার চলে যাবে। আর কী চাও আমার কাছ থেকে?'

'হুঃ সব টাকা দিয়ে দিয়েছেন বললেই হল!' বাঁকা হেসে অবিশ্বাসের সুরে লোকটা বলল। 'আপনি যা মাইনে পান তাতে কয়েক বস্তা টাকা আপনার থাকা উচিত।'

গ্রিগোরির মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। সে বলল, 'আমায় সরাসরি বল দেখি, রোগীকে তোমরা রাখবে, নাকি রাখবে না?'

'না, আপনি যদি টাকাকড়ির ব্যাপারে ওরকম বিবেচনা করেন তাহলে ওঁকে আমাদের কাছে রেখে যাবার কোন কারণ দেখি না।' কথার সুরে স্পষ্টই বোঝা গেল বাড়ির কর্তা রীতিমতো আহত হয়েছে। 'তাছাড়া ব্যাপারটা অত সহজও নয়।... অফিসারের বৌ বলে কথা। পাড়াপড়শীরা জেনে ফেলবে। তারপর আপনার পেছন পেছন কমরেডরা এলে ত হয়েই গেছে। তারা জানতে পেলে আমাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া শুরু ক'রে দেবে।... না, সেক্ষেত্রে আপনি ওঁকে নিয়েই যান বরং। হয়ত পাড়াপড়শীদের কেউ রাজী হলেও হতে পারে।' বেশ খানিকটা আক্ষেপের ভাব ক'রেই গ্রিগোরিকে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে তামাকের বটুয়া বার ক'রে সে সিগারেট পাকাতে থাকে।

গ্রিগোরি গ্রেটকোটখানা গায়ে চাপিয়ে প্রোখরকে বলল, 'ওর কাছে একটুখানি থাকো। আমি দেখি অন্য কোথাও জায়গা পাওয়া যায় কিনা।'

দরজার ছিটকিনিতে সে হাত দিয়েছে এমন সময় বাড়ির কর্তা তাকে আটকাল।

'একটু দাঁড়ান হুজুর। অত তাড়া কিসের? আপনি কি ভাবছেন বেচারি মহিলার জন্যে আমার মনে দুঃখু হয় না? বড়ই দুঃখু হয়। আমি নিজে পল্টনের চাকরী করতাম। মিলিটারীতে আপনার যা পদ আর খেতাব তার ওপর আমার যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। এই টাকার ওপর আপনি কি আর কিছুই যোগ করতে পারেন না?'

~

এবারে প্রোখর আর নিজেকে সামলাতে পারে না। রাগে তার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। গর্জন করে ওঠে সে, 'আর আবার কী দেবে তোকে, হতভাগা ল্যাংড়া কাল কেউটে কোথাকার! তোর আরেকটা পাও ভেঙে দিতে হয় - ওইটুকুই যা যোগ করার! গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, তুমি আমায় অনুমতি দাও, দিই ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধোলাই লাগিয়ে, তারপর আক্সিনিয়াকে তুলে নিয়ে এখেন থেকে চলে যাই। ব্যাটা পাষণ্ডের একশেষ, জাহান্নামে যাক! . . .'

প্রোখর এক নিঃশ্বাসে ঝড়ের মতো কথাগুলো বলে গেল। লোকটা ওর একটা কথায়ও বাধা না দিয়ে মন দিয়ে শুনল, শেষকালে বলল, 'আপনারা মিছিমিছি আমায় অপমান করছেন সেপাই দাদারা! এ হল দেয়া-নেয়ার ব্যাপার। এখানে রাগারাগি গালিগালাজের কোন মানে হয় না। আমার ওপর অমন চোটপাট করছ কেন কসাকের পো? আমি কি টাকাপয়সার কথা বলেছি? আমি যে যোগ করার কথা বলেছি সেটা মোটেই টাকাকড়ির কথা ভেবে বলি নি। আমি বলছিলাম কি, আপনাদের কাছে হয়ত কোন বাড়তি অস্তর-টস্তর থাকতে পারে - এই ধরুন রাইফেল বা রিভলভার ওই গোছের কিছু। . . . আপনাদের কাছে এখন ওসব থাকা না-থাকা সমান। কিন্তু আমাদের কাছে, বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে, দামী সম্পত্তি। বাড়ি আগলাতে গেলে হাত্তিয়ার অবিশ্যিই রাখতে হয়। এই কথাই না আমি বলতে চাচ্ছিলাম! টাকাকড়ি যা দিচ্ছিলেন তাই দিন, সেই সঙ্গে একটা রাইফেল যোগ করুন - ব্যস চুকে গেল! আপনার মুগীকে নিশ্চিন্তে রেখে যেতে পারেন। আমরা তাকে ঘরের লোকের মতোই দেখাশোনা করব, ক্রুশ ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বলছি।'

প্রোখরের দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরি মৃদুস্বরে বলল, 'আমার রাইফেলটা ওকে দাও, কার্তুজগুলোও দাও। তারপর গাড়িতে ঘোড়া জোতো গে। আক্সিনিয়া থেকেই যাক। . . . ভগবান আমার বিচার করবেন, কিন্তু ওকে তাই বলে মরণের মুখে টেনে নিয়ে যেতে পারি নে আমি!'

সাতাশ

একঘেয়ে নিরানন্দ দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। আক্সিনিয়াকে ফেলে আসার পর থেকে গ্রিগোরির যেন আশেপাশের কোন কিছুর ওপরই কোন আগ্রহ নেই ভোরবেলায় স্লেজগাড়িতে চেপে বসে, তুষারাচ্ছন্ন সীমাহীন বিস্তীর্ণ স্তেপের মাঠের ওপর দিয়ে চলে, আবার সন্ধ্যা হতেই খোঁজে রাতের আস্তানা, মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে শুয়ে পড়ে। এই ভাবে চলে দিনের পর দিন। ফ্রন্ট এদিকে ক্রমাগত

দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু সেখানে কী ঘটছে না ঘটছে সেই নিয়ে এখন আর ওর কোন আগ্রহ নেই। সে বুঝতে পারছিল যে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ বলতে আর কিছু নেই, বেশির ভাগ কসাকেরই নিজেদের জেলা রক্ষা করার উৎসাহটুকুও ফুরিয়ে গেছে। সব দিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে দেখলে শ্বেতরক্ষীদের শেষ অভিযান সমাপ্তির মুখে। দনের পারেই যখন টিকে থাকতে পারে নি, তখন কুবানে টিকে থাকার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

যুদ্ধ-শেষ হয়ে আসছে। দ্রুত ও অনিবার্যগতিতে ঘনিয়ে আসছে পরিসমাপ্তি। কুবানের কসাকরা হাজারে হাজারে ফ্রন্ট ছেড়ে বাড়ি ছুটছে। দনের কসাকদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। যুদ্ধে আর মহামারীতে শক্তি খুইয়ে, তিন-চতুর্থাংশ সেনাবল হারিয়ে স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল সাফল্যে অনুপ্রাণিত লাল ফৌজের চাপ একা ঠেকাবে সে ক্ষমতা এখন আর তার নেই।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে গুজব, কুবানের লোকপরিষদ রাদার সদস্যদের ওপর জেনারেল দেনিকিনের নৃশংস নির্যাতনের ফলে কুবানে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এও শোনা যাচ্ছে যে কুবান স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করছে। ইতিমধ্যে লাল ফৌজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নাকি এই মর্মে কথাবার্তা চলছে যে সোভিয়েত বাহিনীকে বিনা বাধায় ককেশাসের দিকে যেতে দেওয়া হবে। আরও একটা জোর গুজব চালু হয়েছে – কুবান আর তেরেক জেলার কসাকরা যেমন দন কসাকদের ওপর তেমনি স্বেচ্ছাসেবীদের ওপরও বেজায় খাপ্পা এবং দন ডিভিশন আর কুবানের 'দণ্ডবৎ' সৈন্যদের মধ্যে নাকি করেনোভ্‌স্কায়ার কাছে কোথাও এই প্রথম একটা বড় রকমের খণ্ডযুদ্ধও হয়ে গেছে।

গ্রিগোরি যেখানে যেখানে থামে সেখানেই বেশ মন দিয়ে লোকজনের কথাবার্তা শোনে আর শ্বেতরক্ষীদের চূড়ান্ত পরাজয় যে অনিবার্য ক্রমেই যেন তার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে তার মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগে যে শ্বেতরক্ষীদের এই যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন শক্তিগুলো মনোবল হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের মধ্যে হানাহানি শুরু করেছে হয়ত শেষ পর্যন্ত বিপদের মুখে পড়ে তারা সকলে একজোট হয়ে লাল ফৌজের বিজয় গৌরবে এগিয়ে আসার পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে, পাল্টা আঘাত হেনে তাকে হটিয়ে দেবে। কিন্তু রস্তোভ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর ওর সে আশাও তিরোহিত হল। বাতাইস্কের কাছাকাছি তুমুল লড়াইয়ের পর লালেরা নাকি পিছু হটতে শুরু করেছে এই গুজবে গ্রিগোরির এখন আর বিশ্বাস হয় না। নিষ্ক্রিয়তার ফলে সে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে কোন একটা সামরিক দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়লেও হয়। কিন্তু প্রোখরকে মনের ইচ্ছা জানাতে সে রীতিমতো বেঁকে বসে।

'তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি দেখছি একেবারেই লোপ পেয়ে গেল, গ্রিগোরি পান্তেলে-য়েভিচ!' রেগে গিয়ে প্রোখর বলে উঠল। 'আমাদের কী দায় পড়েছে ওই নরককুণ্ডে ঝাঁপ দেবার? খেল খতম হয়ে গেছে, সে ত তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ। তাহলে আমরা বেঘোরে জানটা দিতে যাব কেন? কোন দুঃখে? নাকি তুমি ভেবেছ আমরা দু'জনে মিলে ওদের সাহায্য করতে পার? যতক্ষণ না আমাদের গায়ে হাত পড়ছে, জোরজার ক'রে পল্টনে ঢোকাচ্ছে ততক্ষণ যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এ পাপ থেকে দূরে সরে পড়ার চেষ্টা করা উচিত। তা নয় ত তোমার মাথায় যত সব ছাইভস্ম চিন্তা! আর নয়, এবারে বুড়োদের মতো চুপচাপ সরে পড় বাপু। আমরা দু'জনে গত পাঁচ বছরে অমনিতেই অনেক লড়াই করেছি, এখন অন্যেরা চেষ্টা করে দেখুক গে! আবার লড়াইয়ের ময়দানে ঘুরে বেড়াতে হবে এর জন্যেই কি অত কষ্ট ক'রে ব্যারামটা বাধিয়েছিলাম? না, অনেক হয়েছে! মাথায় থাক তোমার ওই উপদেশ! লড়াই ক'রে ক'রে আমার এমন অরুচি ধরে গেছে যে এখন লড়াইয়ের নামে উলটে বমি আসে! তোমার যদি সাধ থাকে ত তুমি নিজে যাও, আমি রাজী নই। আমি বরং হাসপাতালে যাব। যথেষ্ট হয়েছে!'

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গ্রিগোরি বলল, 'বেশ, তুমি যা ভালো বোঝ তা-ই হবে। আগে কুবান যাই, তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।'

প্রোখর তার নিজের পন্থা চালিয়ে যেতে লাগল। কোন একটা বড় জনবসতিতে এলেই সে ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডার খুঁজে বার করে, পাউডার বা মিক্‌সচার যোগাড় করে। কিন্তু রোগ সারানোর ব্যাপারে তার তেমন একটা গরজ দেখা যায় না। পাউডারের একটা পুরিয়া খেয়ে বাকিগুলো সযত্নে পায়ে মাড়িয়ে বরফের মধ্যে নষ্ট ক'রে ফেলে। গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করলে সে তার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে বলে যে অসুখ সারানোর কোন ইচ্ছে ওর নেই। কোন রকমে চাপা দিয়ে রাখলেই হল। একমাত্র তা হলেই নতুন ক'রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রশ্ন উঠলে ওর পক্ষে সৈন্যদল থেকে রেহাই পাওয়া সহজ হবে। ভেলিকোক্নিয়াজেস্কায়া জেলা-সদরে এক বেশ অভিজ্ঞ কসাক ওকে হাঁসের পা সেদ্ধ ক'রে তাই দিয়ে ক্বাথ বানিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিল। এর পর থেকে যে কোন গ্রামে বা জেলা-সদরে ঢুকলে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই প্রোখর জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা মশাই দয়া ক'রে বলবেন কি, আপনাদের এখানে কেউ হাঁস পোষে?' অবাক হয়ে স্থানীয় লোকটি যখন বলে যে হাঁস এখানে কেউ পোষে না এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অজুহাতও দেখায় যে যেহেতু কাছে-পিঠে কোন জলা নেই, তাই হাঁস পোষার কোন প্রশ্নই ওঠে না, তখন প্রোখর তাকে নিদারুণ তাচ্ছিল্য ক'রে বলে ওঠে,

'আরে ছোঃ, তোমরা আবার মানুষ। জীবনে বোধ হয় কখনও কোন হাঁসের ডাক শোনো নি! স্তেপের মাঠের যত সব গোরু ঘোড়ার দল।' তারপর গ্রিগোরির দিকে ফিরে তিক্ত আক্ষেপের সুরে যোগ করে, 'কার মুখ দেখে যে আজকে উঠেছিলাম। কপালে ভালো কিছু দেখছি না! ওদের কাছে যদি হাঁস থাকত তাহলে টাকাকড়ির কোন মায়া না করে যে কোন দামে একটা কিনতাম, নয়ত চুরি করতাম, তাহলে আমি ভালোর দিকে যেতে পারতাম। আমার অসুখটার যে এখন বড় বাড়াবাড়ি দেখছি। গোড়ার দিকে মজার ব্যাপার ছিল যা হোক, শুধু রাস্তায় ঘুমোতে পারতাম না এই আর কি। কিন্তু এখন দেখছি হতচ্ছাড়া রীতিমতো আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্লেজের ওপরে দু'দণ্ড সুস্থির হয়ে বসে থাকা যায় না!'

গ্রিগোরির কাছ থেকে কোন সমবেদনার আভাস না পেয়ে প্রোখর চুপ ক'রে যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। একেক সময় রাগে গুম মেরে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটি কথাও না বলে মুখ বুজে পথ চলতে থাকে।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে দিনগুলো গ্রিগোরির কাছে ক্লান্তিকর দীর্ঘ বলে মনে হয়। তার চেয়েও বেশি দীর্ঘ মনে হয় শীতের অন্তহীন রাতগুলো। বর্তমান নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার আর অতীতের স্মৃতিচারণের প্রচুর অবকাশ ছিল তার। স্মৃতির ভাণ্ডারে অনেকক্ষণ ধরে সে হাতড়ে বেড়ায় জীবনের সেই বিচিত্র বছরগুলি। দ্রুত উধাও হয়ে গেছে সেগুলো। ওর জীবনে ভালো কিছু দিতেও পারে নি। স্লেজ গাড়িতে বসে কবরের নৈঃশব্দ্যে পরিপূর্ণ, তুষারাচ্ছন্ন স্তেপের ধু ধু প্রান্তরের দিকে ঝাপসা চোখে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে অথবা রাতে লোকজনের ভিড়ে ঠাসাঠাসি কোন গুমোট ছোট্ট ঘরে চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে শুয়ে সারাক্ষণ সে ভাবে একই কথা – আক্সিনিয়ার কথা। অসুস্থ অচেতন আক্সিনিয়াকে ছেড়ে আসতে হয়েছে কোথাকার কোন এক অচেনা অজানা গ্রামে। মনে পড়ে আত্মীয়স্বজনের কথা যাদের সে ফেলে রেখে এসেছে তাতারস্কি গ্রামে। . . . ওখানে দনের পারে সোভিয়েত শাসন কায়েম হয়েছে। গ্রিগোরি বারবার উদ্বেগে পীড়িত হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে: 'আমার জন্যে মাকে আর দুনিয়াশ্‌কাকে কি ওরা কষ্ট দেবে?' পরক্ষণেই নিজেকে প্রবোধ দেয় এই কথা মনে ক'রে যে পথে একাধিক বার শুনেছে লাল ফৌজীরা শান্ত ভাবে মার্চ ক'রে চলেছে, দখল-করা এলাকার লোকজনের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করছে। উদ্বেগ ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে। ওর বুড়ি মাকে ওর কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে সেই চিন্তাটা এখন অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত আর সম্পূর্ণ যুক্তিহীন মনে হয় ওর কাছে। ছেলেমেয়েদের কথা মনে হতে মুহূর্তের জন্য গ্রিগোরির বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে। ওর ভয় হয় টাইফাস জ্বরের কবল থেকে ওরা রেহাই পাবে

না। তবু যত ভালোই ওদের বাসুক না কেন এটাও সে উপলব্ধি করতে পারছিল যে নাতালিয়া মারা যাওয়ার পর আর কোন শোকই এখন তাকে তেমন প্রবল ভাবে নাড়া দিতে পারবে না। . . .

সাল্‌-এর এক গঞ্জ এলাকায় ঘোড়াদের একটু বিশ্রাম দিতে মনস্থ ক'রে সে আর প্রোখর চার দিন কাটিয়ে দিল।

সেই সময় এর পর কী করা উচিত তাই নিয়ে একাধিকবার ওদের মধ্যে আলোচনা হয়। যেদিন তারা ওখানে পৌঁছয় সেই দিনই প্রোখর জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাদের লোকেরা কুবানে ফ্রন্ট ধরে রাখতে পারবে, নাকি পিছু হটে ককেশাসের দিকে চলে যাবে? তোমার কী মনে হয়?'

'জানি নে। কিন্তু তাতে তোমার কী এসে যায় বল?'

'বাঃ বললে বটে একখানা কথা! এসে যায় না কেমন? আমাদের যদি ঠেলতে ঠেলতে মেলেচ্ছদের দেশে, তুর্কীদের রাজ্যের কোথাও নিয়ে ফেলে তখন কী দশা হবে? ঠেলা বেরিয়ে যাবে না!'

'আমি তোমার দেনিকিন নই, তাই কোথায় আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে আমায় প্রশ্ন কোরো না,' বিরক্ত হয়ে গ্রিগোরি জবাব দেয়।

'জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে গুজব শুনলাম কুবান নদীর ধারে নাকি আবার জান বাঁচানোর লড়াই শুরু হবে, তারপর বসন্তকাল নাগাদ যে যার বাড়ির পথ ধরতে পারবে।'

'কে সেই জান বাঁচানোর লড়াইটা করবে?' বিদ্রূপভরে হেসে জিজ্ঞেস করে গ্রিগোরি।

'কেন, কসাক আর ক্যাডেটরা - তারা ছাড়া আর কে?'

'যত রাজ্যের বাজে কথা! তুমিও ভাবতে পারলে! চার ধারে কী সব ঘটছে দেখেও দেখতে পাচ্ছ না নাকি? সবাই যে যার মতো যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সরে পড়তে ব্যস্ত। কে যাবে শত্রুদের ঠেকাতে?'

প্রোখর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ওঃ বন্ধু, আমাদের অবস্থা যে কাহিল সে কি আর আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি নে? তবু কেন যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না . . . আচ্ছা সে যা-ই হোক, আমাদের যদি জাহাজে চড়ে নয়ত চার হাত পায়ে কাঁকড়ার মতো হামা দিয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে গিয়ে উঠতে হয় তাহলে তুমি কী করবে? যাবে?'

'তুমি যাবে?'

'আমার কথা হল এই: তুমি যেখানে আমিও সেখানে। সবাই যদি যায় তাহলে আমি একাই বা পড়ে থাকি কী করে?'

'আমিও তাই মনে করি। ভেড়ার পালে যখন ভিড়েছি, তখন পালের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে হয়। . . .'

'কিন্তু ওই ভেড়ার পাল বোকামি ক'রে তোমাকে কোন্ চুলোয় ঠেলে নিয়ে যাবে তার কী ঠিক আছে?' . . . না না ওসব মস্‌করা ছাড়! কাজের কথা বল!'

'ছাড় দেখি! আর ভাল্লাগে না বাপু! সময়ে দেখা যাবে 'খন। আগে থাকতেই ওই নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে কী হবে?'

'আচ্ছা বাবা, ঘাট হয়েছে! আর তোমায় প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করছি না,' প্রোখর দোষ কবুল করে।

কিন্তু পর দিনই ওরা ঘোড়াগুলো দলাইমলাই করতে গেলে প্রোখর আবার ফিরে আসে আগের কথাবার্তায়।

'সবুজ দলের* নাম শুনেছ?' ত্রিশূল-বিদেকাঠির হাতলটা খুঁটিয়ে দেখার ভান ক'রে সাবধানে প্রোখর জিজ্ঞেস করে।

'শুনেছি। তারপর কী?'

'এই যে সবুজ, এরা কারা? কাদের পক্ষে এরা?'

'লালদের।'

'তাহলে ওদের 'সবুজ' বলে কেন?'

'কে জানে বাপু! হয়ত বনে বাদাড়ে লুকিয়ে থাকে, তাইতে ওই নাম হয়েছে।'

'আমরা দু'জনে 'সবুজ' হয়ে গেলে কেমন হয়?' অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে ইতস্তত ক'রে প্রোখর প্রস্তাব দেয়।

'আমার তেমন একটা ইচ্ছে নেই।'

'আচ্ছা 'সবুজ' ছাড়া আর কি সে রকম কেউ নেই, যাদের সঙ্গে ভিড়ে চটপট বাড়ি ফেরা যেতে পারে? সবুজ বল নীল বল, ওই যে ডিমের কুসুমের মতো হলুদ রঙ বা যা-ই বল না কেন আমার কাছে সব শালাই সমান। লোকগুলো যদি লড়াইয়ের বিরুদ্ধে হয় আর সেপাইদের বাড়ি যেতে দেয় তাহলেই হল – কোন রঙে আমার এতটুকু আপিত্তি নেই। . . .'

'সবুর কর, হয়ত সে রকম দল গজালেও গজাতে পারে,' গ্রিগোরি উপদেশ দেয়।

জানুয়ারীর শেষে কুয়াশাচ্ছন্ন বরফগলা এক দুপুরে গ্রিগোরি আর প্রোখর এসে পৌঁছুল বেলায়া গ্লিনা পল্লীতে। হাজার পনেরো উদ্বাস্তু এসে ভিড় করেছে

---

* গৃহযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় যে সমস্ত লোক শ্বেতরক্ষীদের বাহিনীতে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বনেজঙ্গলে গা ঢাকা দেয় তারা সচরাচর এই নামে অভিহিত হত। ১৯১৯ - ১৯২০ সালে 'লাল-সবুজের' দল কৃষ্ণসাগর ও ক্রিমিয়া অঞ্চলে শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে গেরিলা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। – অনুঃ

ইউক্রেনীয় বসতিটিতে। তার মধ্যে অর্ধেকই আবার টাইফাস জ্বরের রুগী। খাটো ঝিলিতি গ্রেটকোট, পশুলোমের খাটো কোর্তা আর ককেশীয় লম্বা কোর্তা পরে ঘোড়ার খাবার আর আস্তানার খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কসাকরা। নানা দিকে ছুটোছুটি করছে ঘোড়সওয়ার আর গাড়ির দঙ্গল। ডজন ডজন হাড় জিরজিরে ঘোড়া বাড়ির উঠোনে জাবনার সামনে দাঁড়িয়ে করুণ ভাবে খড়বিচালি চিবুচ্ছে। রাস্তায় ঘাটে অলিতে গলিতে চোখে পড়ে পরিত্যক্ত স্লেজগাড়ি, মালগাড়ি আর গোলা বারুদের বাক্স। একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বেড়ার গায়ে বাদামী রঙের একটা উঁচু ঘোড়া বাঁধা থাকতে দেখে প্রোখর নিরীক্ষণ ক'রে বলল, 'আরে এ যে আমাদের আন্দ্রেই ভায়ার ঘোড়া দেখছি! তার মানে আমাদের গাঁয়ের লোকেরাও এখানে।' প্রোখর চটপট স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢুকল খোঁজ নিতে।

কয়েক মিনিট পরে গ্রেটকোটখানা বোতাম না এঁটেই গায়ে ফেলে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো প্রোখরের পড়শী আর জ্ঞাতি ভাই আন্দ্রেই তোপলস্কোভ। প্রোখরের সঙ্গে গম্ভীর চালে সে এগিয়ে গেল স্লেজগাড়ির দিকে, ঘোড়ার ঘামের বোটকা গন্ধ লাগা কালো হাতখানা বাড়িয়ে দিল গ্রিগোরির দিকে।

'গাঁয়ের লোকজনের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছ নাকি?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে।

'সবাই মিলে একই দুর্ভোগ ভোগ করছি।'

'তা রাস্তায় কী রকম এলে?'

'কী রকম বুঝতেই পারছ।... একেকবার রাতের থাকার জায়গায় একজন দু'জন করে মানুষ আর ঘোড়াও ফেলে আসতে হচ্ছে।...'

'আমার বাবা সুস্থ শরীরে বেঁচে বর্তে আছে ত?'

গ্রিগোরির মাথার ওপর দিয়ে দূরে কোথায় দৃষ্টি মেলে দিয়ে তোপলস্কোভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'খবর খারাপ গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ।... খুব খারাপ।... বাপের নামে প্রার্থনা কর ভগবানের কাছে। গতকাল সন্ধেবেলায় ঈশ্বরের শ্রীচরণে ঠাঁই নিয়েছেন। তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই।...'

গ্রিগোরি ফেকাসে হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কবর দেওয়া হয়ে গেছে?'

'বলতে পারছি নে। আজ ওখানে যাই নি। চল, বাড়িটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।... ডান দিক ধরে চল ভায়া, কোণের দিক থেকে ডান হাতে তিনটে বাড়ির পরে যে বাড়িটা।'

টিনের চাল দেওয়া বড়সড় বাড়িটার কাছে আসার পর প্রোখর বেড়ার কাছে ঘোড়াগুলোকে থামাল। কিন্তু তোপলস্কোভ বাড়ির উঠোনে গাড়ি ঢোকাতে বলল।

'এখানেও বেশ গাদাগাদি, প্রায় জনা কুড়ি লোক। তবে কোন রকমে জায়গায় কুলিয়ে যাবে,' এই বলে ফটক খোলার জন্য সে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল স্লেজগাড়ি থেকে।

গরমে তেতে উঠেছে ঘরটা। গ্রিগোরিই প্রথম ভেতরে ঢুকল। মেঝেতে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে শুয়ে বসে আছে গ্রামের পরিচিত লোকজন। কেউ জুতো কেউ বা ঘোড়ার সাজ মেরামত করছে। পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের স্লেজের যে সঙ্গী হয়েছিল সেই বুড়ো বেস্‌স্লেবনভ সমেত তিনজন কসাক টেবিলের ধারে বসে ঝোল খাচ্ছিল। গ্রিগোরিকে দেখে কসাকরা উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে ওর সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণের জবাব দিল।

মাথার টুপি খুলে ঘরের চারধারে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গ্রিগোরি বলল, 'বাবা কোথায়?'

'বড় খারাপ খবর আমাদের। . . . পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মারা গেছে,' লম্বা কোর্তার হাতায় মুখ মুছে মৃদুস্বরে বেস্‌স্লেবনভ বলল। হাতের চামচ নামিয়ে রেখে ক্রুশ-প্রণাম করল। 'গতকাল আমাদের মায়া ত্যাগ ক'রে চলে গেল। তার আত্মার শান্তি হোক!'

'জানি। কবর দেওয়া হয়ে গেছে?'

'না, এখনও হয় নি। আমরা আজ ওকে কবর দেবার উদ্‌যোগ করছিলাম। এখন এই এখানেই আছে। ভেতরের বড় ঘরটা ঠাণ্ডা, তাই ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই যে এদিকে এসো।' পাশের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বেস্‌স্লেবনভ বলল, 'মরা মানুষের সঙ্গে এক ঘরে কসাকরা কেউ রাত কাটাতে চায় না। গন্ধের জন্যে অসোয়াস্তি হয়। তাছাড়া জায়গাটা ওর পক্ষে ভালোও। বাড়ির লোকেরা এ ঘরটা গরম করে না।'

খোলামেলা ঘরটাতে তিসিবীজ আর ইঁদুরের ঝাঁঝাল গন্ধ। একটা কোনার সমস্তটা জুড়ে গাদা মেরে পড়ে আছে জোয়ার আর তিসি। একটা বেঞ্চের ওপর আটা আর মাখনের কতকগুলো পিপে। ঘরের মাঝখানে সতরঞ্চির ওপর পড়ে আছে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ। বেস্‌স্লেবনভকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে গ্রিগোরি ঘরে ঢুকে বাপের কাছে এসে দাঁড়াল।

বেস্‌স্লেবনভ চাপা গলায় বলল, 'দু'হপ্তা অসুস্থ ছিল। সেই মেচেত্‌কার কাছেই টাইফাস জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। হায়, কোথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হল তোমার বাবাকে! . . . এই ত আমাদের জীবন। . . .'

গ্রিগোরি সামনে ঝুঁকে পড়ে বাপকে দেখে। অসুখে পালটে গেছে ওর সেই পরিচিত প্রিয় মুখের রেখাগুলো। তাকে দেখাচ্ছে অন্যরকম, অদ্ভুত, অচেনা।

ফেকাসে গালদুটো তোপসানো, খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়িতে ছেয়ে আছে। বসে যাওয়া মুখটার ওপরে অনেকখানি ঝুলে আছে গোঁফজোড়া। চোখদুটো আধবোজা। চোখের নীলচে সাদা অংশের সেই ঠিকরে পড়া প্রাণোচ্ছলতা, দীপ্তি আর নেই। বুড়োর নীচের চোয়ালখানা ঝুলে পড়েছে, সেখানে একটা লাল মাফলার বাঁধা। সেই লালের ওপরে কোঁকড়া দাড়ি যেন আরও রুপোলি, আরও সাদা দেখাচ্ছে।

শেষ বারের মতো প্রিয়জনের মুখখানা মনোযোগ দিয়ে দেখে স্মৃতিপটে এঁকে নিতে চায় গ্রিগোরি। তাই হাঁটু গেড়ে পাশে বসে। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই ভয়ে ঘৃণায় সে যেন শিউরে উঠল: পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচের চোখের কোটর আর গালের ভাঁজে থিকথিক করছে উকুন, তার মোমের মতো ছাই রঙ ধরা মুখের ওপর সেগুলো পিলপিল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবন্ত চলমান উকুনের পর্দায় ছেয়ে গেছে সারা মুখ। দাড়ির মধ্যে, ভুরুর লোমের মধ্যে গিজগিজ করছে। নীল রঙের কোর্তার শক্ত কলারে ধূসর আস্তরণের মতো লেগে আছে বোঝাই উকুন। . . .

* * *

দোআঁশ মাটি হিমে জমে লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। গ্রিগোরি এবং আরও দু'জন কসাক মিলে শাবল দিয়ে সেই মাটি খুঁড়ল। কয়েকটা তক্তার ভাঙা টুকরো পড়েছিল। প্রোখর সেগুলো জুড়ে কোন রকমে একটা কফিন তৈরি করল। দিনের শেষে পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচকে বয়ে নিয়ে এসে স্তাভ্রোপোলের ভিনদেশী মাটিতে ওরা কবর দিল। ঘন্টাখানেক পরে গ্রামের ঘরে ঘরে যখন বাতি জ্বলে উঠেছে তখন গ্রিগোরি বেলায়া গ্লিনা ছেড়ে রওনা দিল নোভোপক্রোভস্কায়ার দিকে।

করেনোভস্কায়া জেলা-সদরে যখন ওরা এলো তখন গ্রিগোরির শরীর খারাপ লাগতে শুরু করল। ডাক্তারের খোঁজে প্রোখরের অর্ধেক বেলা কেটে গেল। শেষ কালে খুঁজে পেতে বার করল অর্ধেক মাতাল এক সামরিক ডাক্তারকে। অনেক কষ্টে বলে কয়ে তাকে রাজী করিয়ে সে নিয়ে এলো ওদের আস্তানায়। গ্রেটকোট না খুলেই ডাক্তার পরীক্ষা করল গ্রিগোরিকে, নাড়ি টিপে দেখল, তারপর দৃঢ়স্বরে রায় দিল, 'দ্বিতীয় দফায় টাইফাস জ্বরের প্রকোপ। আমার পরামর্শ এই যে লেফ্‌টেনান্ট মশাই, যাত্রা বন্ধ রাখুন। নইলে পথের মাঝখানেই মারা যাবেন।'

'লালদের অপেক্ষায় থাকতে হবে?' বাঁকা হাসি হাসে গ্রিগোরি।

'তা ধরা যেতে পারে লালেরা এখনও বেশ দূরে আছে।'

'কাছে আসবে।'

'তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু থেকে যাওয়াই আপনার পক্ষে ভালো হবে। দুটো মন্দের মধ্যে আমার মতে এটাই বেছে নেওয়া ভালো – তুলনায় কম মন্দ।'

'না, যেমন করে হোক যেতেই হবে আমাকে,' দৃঢ়স্বরে এই বলে গ্রিগোরি ফৌজী জামাটা গায়ে আঁটতে থাকে। 'আমায় কোন ওষুধ দেবেন কি?'

'তা যান, আপনার যেমন খুশি। আমার কাজ আপনাকে পরামর্শ দেওয়া – বাকিটা আপনার ইচ্ছে। ওষুধের কথা যদি বলেন সবচেয়ে ভালো ওষুধ হল বিশ্রাম আর সেবা যত্ন। আপনাকে কিছু ওষুধের নাম লিখে দিতে পারতাম, কিন্তু ডাক্তারখানা এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আমার নিজের কাছেও ক্লোরোফর্ম আয়োডিন আর স্পিরিট ছাড়া কিছু নেই।'

'অন্তত স্পিরিটই দিন।'

'কোন আপত্তি নেই আমার। রাস্তায় আপনি অমনিতেই মরবেন, তাই স্পিরিটে কোন হেরফের হবে না। আপনার আর্দালিকে আমার সঙ্গে আসতে বলুন। হাজার গ্রাম দেব 'খন। আমি লোকটা খারাপ নই। . . .' ডাক্তার টুপিতে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট ক'রে টলতে টলতে ঘর ছেড়ে বের হল।

প্রোখর স্পিরিট নিয়ে ফিরে এলো। কোত্থেকে জোড়া ঘোড়ার এক ঝরঝরে মালগাড়ি যোগাড় ক'রে এনেছে*, তাতে ঘোড়া জুতল। ঘরে ঢুকে বিষণ্ণ ব্যাঙ্গের সুরে জানাল, 'গাড়ি তৈরি হুজুর!'

আবার শুরু হল সেই অসহ্য একঘেয়ে একটানা দিনগুলো।

ককেশাসের পাহাড়তলী থেকে কুবান এলাকায় দ্রুত ধেয়ে আসছে দক্ষিণের বসন্ত। স্তেপের সমতল ভূমিতে চমৎকার বরফ গলতে শুরু করেছে। জায়গায় জায়গায় সরেস কালোমাটির চাপড়া বেরিয়ে চকচক করছে, বসন্তের বরফগলা জলের স্রোত মধুর কলতান ক'রে ছুটে চলেছে। রাস্তায় এখানে ওখানে খানাখন্দ জেগে উঠেছে। দূরের নীল দিগন্তে বসন্তের উজ্জ্বল ছোঁয়া লেগেছে। আরও গভীর, আরও নীল আর উষ্ণ আমেজভরা হয়ে উঠেছে কুবানের উদার আকাশ।

দু'দিন পরেই শীতে বোনা গমের ক্ষেত সূর্যের দিকে চোখ মেলে চাইল। চষা মাটির ওপর এসে পড়েছে সাদা কুয়াশা। বরফ গলে গিয়ে বেরিয়ে পড়া রাস্তায় ঘোড়াগুলো এখন ছপছপ ক'রে চলছে। তাদের খুরের ওপরকার লোম অবধি কাদায় ডুবে যায়, খানাখন্দে পা আটকে যায়। শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে কষ্ট করে

* বসন্তকাল আসন্ন। বরফ গলতে শুরু করল আর স্লেজগাড়িতে চলবে না, তখন চাকার গাড়ি দরকার। – অনুঃ

চলে, ঘামে শরীর থেকে ভাপ উঠতে থাকে। প্রোখর বেশ গোছাল লোক। ওদের লেজগুলো উঁচু করে বেঁধে দিয়েছে। প্রায়ই সে গাড়ি থেকে নেমে পাশে পাশে চলে। অনেক কষ্টে কাদার ভেতর থেকে পা টেনে টেনে বার করে আর গজগজ ক'রে বলে, 'কাদা ত নয়, এ যেন আলকাতরা। চটচট করছে, মাইরি বলছি! এক ঠাঁই থেকে আরেক ঠাঁই যাবার মাঝখানে ঘোড়াগুলোর গায়ের ঘাম শুকোবে তার উপায় কি!'

গ্রিগোরি চুপচাপ শুয়ে থাকে। ভেড়ার চামড়ার কোর্তা মুড়ি দিয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু কথা বলার সঙ্গী ছাড়া চলতে প্রোখরের বেজায় লাগে, তাই কখনও গ্রিগোরির পা কখনও বা জামার হাতা টেনে বলে, 'ওঃ কী এঁটেল এখানকার কাদা! নেমে একবার পরখ করেই দেখ না! নাঃ আসুখে পড়তে বাপু ভালোও লাগে তোমার!'

'চুলোয় যা!' গ্রিগোরির ফিসফিসানি প্রায় শোনাই যায় না।

পথে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে প্রোখর জিজ্ঞেস করে, 'এর পরে কাদা কি আরও ঘন, নাকি এই একই রকম?'

লোকে হাসতে হাসতে ঠাট্টা ক'রে ওর কথার জবাব দেয়। কিন্তু একজন জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে যে দুটো কথা বলতে পেরেছে এতেই প্রোখর খুশি। আরও কিছুক্ষণ সে চুপচাপ চলতে থাকে, ঘন ঘন ঘোড়া থামায়, নিজের বাদামী রঙের কপাল থেকে বড় বড় ঘামের ফোঁটা মোছে। কদাচিৎ কোন ঘোড়সওয়ার ওদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকলে প্রোখর লোভ সামলাতে না পেরে তাকে থামিয়ে নমস্কার জানায়, জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছে, নিবাস কোথায়। শেষকালে বলে, 'খামোকাই যাচ্ছ। ওদিকে আর বেশি দূর যাওয়া অসম্ভব। কেন? আরে বাবা, ওখানে যা কাদা! ওদিক থেকে যারা আসছিল তারাই বললে কিনা! ঘোড়ার বুক অবধি ডুবে যায়। গাড়ির চাকা ঘোরে না, আর যারা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে তাদের মধ্যে যারা একটু বেঁটে তারা রাস্তার মাঝখানেই পড়ে পাঁকে ডুবে যায়। যাঃ মিথ্যে বলতে যাব কেন? আমি যদি মিথ্যে বলি ত নেড়ী কুত্তার বাচ্চা হই। আমরা যাচ্ছি কেন, শুধোচ্ছ? আমাদের যে উপায় নেই! সঙ্গে নিয়ে চলেছি অসুস্থ এক পুরুতমশাইকে - এনার আবার কোন মতেই থাকা চলে না লালদের সঙ্গে। . . .'

বেশির ভাগ ঘোড়সওয়ারই প্রোখরের ওপর তেমন রাগ না দেখিয়ে হালকা মেজাজে কিছু গালিগালাজ করে এগিয়ে চলে। কেউ কেউ আবার এগিয়ে যাওয়ার আগে মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখে, তারপর বলে, 'বোকা গাধারাও কি দল ছেড়ে পিছু হটছে? তোমাদের জেলায় সবাই তোমারই মতো নাকি?'

কিংবা ওই ধরনের আরও কিছু মন্তব্য করে, তবে কোন অংশেই কম অপমানসূচক নয়। কেবল নিজের জেলার লোকজনের দল থেকে পিছিয়ে পড়া এক কুবান কসাক প্রোখরের ওপর বেজায় চটে গেল আজেবাজে কথা বলে তাকে আটকে রাখার জন্য। প্রোখরের কপালের ওপর চাবুক কষিয়ে দেয় আর কি! কিন্তু প্রোখর আশ্চর্য চটপট গাড়িতে উঠে বসে সতরঞ্চির তলা থেকে কার্বাইন বন্দুকখানা বার ক'রে কোলের ওপর রাখল। কুবানের লোকটা মুখ খিস্তি ক'রে সরে গেল। প্রোখর হো হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। গলা ফাটিয়ে ওর পেছন পেছন চিৎকার করে বলল, 'হুঁ হুঁ এ বাবা তোমার ত্সারিত্সিন নয় যে ভুট্টাক্ষেতের ভেতরে লুকিয়ে জান বাঁচাবে! ওরে মাথা মোটা! আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে আসছিলি যে বড়! এই এদিকে ফিরে আয় বলছি ভুট্টার ছাতুখোর, তীতুর ডিম! কোথায় খাপ খুলতে এসেছিলি? তোর ওই ঢিলে আলখাল্লা আরও ওপরে তোল, নইলে কাদায় মাটি হয়ে যাবে যে! লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে দেখ ব্যাটা! মাগীরও বাড়া! শালা বাড়তি টোটা নেই তাই বেঁচে গেলি। নইলে দিতাম ঝেড়ে তোর ওপর। চাবুক ফেলে দে, শুনছিস!'

বিনা কাজে, একঘেয়েমিতে প্রোখরের মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। তাই যেমন ভাবে পারে মজা করে।

এদিকে যেদিন থেকে রোগে পড়েছে সেদিন থেকেই গ্রিগোরির দিনগুলো যেন কাটতে থাকে স্বপ্নের ঘোরে। মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। আবার তার জ্ঞান ফিরে আসে। অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে কাটানোর পর একবার যখন চেতনা ফিরে এসেছে সেই রকম এক মুহূর্তে প্রোখর তার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

গ্রিগোরির ঘোলাটে চোখ কাতর ভাবে নিরীক্ষণ করতে করতে সে বলল, 'এখনও বেঁচে আছ?'

ওদের মাথার ওপর সূর্য কিরণ দিচ্ছে। আকাশের গাঢ় নীলিমার বুকে কখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে কখনও বা মখমল কালো ভাঙা রেখায় প্রসারিত হয়ে কলরব করতে করতে কালো ডানা মেলে উড়ে চলেছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। তেতে ওঠা মাটি আর কচি ঘাসের গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে। গ্রিগোরি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে, পরম আগ্রহে বুক ভরে টেনে নেয় বসন্তের প্রাণ জুড়ানো বাতাস। প্রোখরের কণ্ঠস্বর তার কানে ক্ষীণ হয়ে বাজে। আশেপাশের সব কিছু মনে হয় কেমন যেন অবাস্তব, অবিশ্বাস্য রকমের ছোট আর দূরের। পেছনে দূরত্বের জন্য অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কামানের চাপা গুমগুম আওয়াজ। ধারে কাছে কোথাও সমান মাপা তালে ঝনঝন বেজে চলেছে লোহা বাঁধানো চাকা, কানে আসছে ঘোড়ার নাকঝাড়া আর চিহিহি ডাক, লোকজনের গলার আওয়াজ। ধক ক'রে নাকে এসে

লাগে সেঁকা রুটি, খড় আর ঘোড়ার ঘামের ঝাঁঝাল গন্ধ। কিন্তু এসবই গ্রিগোরির আচ্ছন্ন চৈতন্যে পৌঁছায় যেন অন্য এক জগৎ থেকে। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে সে শোনার চেষ্টা ক'রে প্রোখরের গলার আওয়াজ, অনেক কষ্টে বুঝতে পারে প্রোখর তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'দুধ খাবে?'

গ্রিগোরি কোন রকমে জিভ নেড়ে শুকনো ঠোঁট চাটে, মুখের ভেতরে উপলব্ধি করে পরিচিত টাটকা স্বাদের তরল পদার্থের ঘন শীতল ধারা। কয়েক ঢোক গেলার পর ও দাঁতে দাঁত চাপে। প্রোখর ফ্লাস্কের ছিপি আঁটে, আবার ঝুঁকে পড়ে গ্রিগোরির ওপর। প্রোখর তাকে কী বলছে তা ততটা ভালো ক'রে শুনতে না পেলেও কতকটা যেন ওর ঠোঁট নাড়া দেখেই গ্রিগোরি বুঝতে পারে ওর প্রশ্ন: 'এখানে থেকে গেলেই তোমার ভালো হত না কি? বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে তোমার পক্ষে, তাই না?'

গ্রিগোরির মুখে যন্ত্রণা আর উদ্বেগের ভাব ফুটে ওঠে। আরও একবার প্রাণপণে সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জড় ক'রে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমায় নিয়ে চল... যতক্ষণ মারা না যাচ্ছি...'

প্রোখরের মুখ দেখে গ্রিগোরি অনুমান করতে পারে ওর কথা সে শুনতে পেরেছে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বোজে। অচৈতন্য অবস্থাকে স্বস্তি হিসেবে মেনে নিয়ে কোলাহল মুখর অশান্ত এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে দূরে বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে ডুবে যায়।

আঠাশ

আবিনৃস্কায়া জেলা-সদর অবধি যেতে রাস্তায় গ্রিগোরির কেবল একটা ঘটনার কথাই মনে আছে। একবার সূচীভেদ্য রাতের অন্ধকারে ভয়ঙ্কর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। রাস্তায় পাশাপাশি সারি বেঁধে অনেকগুলো গাড়ি চলেছে। লোকজনের গলার আওয়াজ গাড়ির চাকার অবিরাম চাপা ঘর্ঘর আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছিল গাড়ির সারিটা বিরাট। গ্রিগোরি যে গাড়িতে চলেছে সেটা আছে সারির মাঝামাঝি কোথাও। ঘোড়াগুলো পায়ে পায়ে চলেছে। প্রোখর ঠোঁট দিয়ে আওয়াজ করছে, মাঝে মধ্যে সর্দি বসা ভাঙা গলায় হাঁক পাড়ছে: 'এই, এইও!' সঙ্গে সঙ্গে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে। গ্রিগোরি শুনতে পায় চামড়ার চাবুকের মৃদু শিস, টের পায় ঘোড়াগুলোর চামড়ার ফিতের বাঁধনে আরও জোরে টান পড়ছে, কড়কড় আওয়াজ ক'রে উঠছে জোয়ালের ডাণ্ডা, আরও তাড়াতাড়ি ছুটছে

গাড়ি, মাঝে মাঝে হাল্‌কা গাড়িখানার পিছনে ডাণ্ডাটা ঠোকর খেয়ে ঠকঠক আওয়াজ তুলছে।

গ্রিগোরি অনেক কষ্টে ভেড়ার চামড়ার কিলামাটা গায়ে টেনে নিয়ে চিত হয়ে শোয়। কালো আকাশের বুকে বাতাসের তাড়া খেয়ে নিবিড় কালো মেঘের রাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে চলেছে দক্ষিণের দিকে। কদাচিৎ কখনও সেই মেঘের ছোট্ট কোন ফোকরে পলকের জন্য দপ করে ফুলকি তুলে উধাও হয়ে যায় নিঃসঙ্গ একটা তারা। পরক্ষণেই আবার দুর্ভেদ্য আঁধারে ঢাকা পড়ে যায় স্তেপের প্রান্তর। টেলিগ্রাফের তারে বাতাসের করুণ সাঁই সাঁই আওয়াজ ওঠে। মাটির বুকে মুক্তোদানার মতো ছড়িয়ে পড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি হালকা বৃষ্টি।

রাস্তার ডান দিক ধরে এগিয়ে চলেছে ঘোড়সওয়ার সৈন্যদলের একটা সারি। গ্রিগোরির কানে আসে ওর দীর্ঘকালের পরিচিত একটা ছন্দ – তালে তালে ঝনঝন বেজে চলেছে কসাকদের আঁটসাঁট করে বাঁধা সরঞ্জাম, সেই রকমই সমতালে কাদার ওপর ছপাত্‌ ছপাত্‌ উঠছে আর পড়ছে অসংখ্য ঘোড়ার খুর। গেছে অন্তত দুটো স্কোয়াড্রন, কিন্তু এখনও কানে বাজছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। খুব সম্ভব রাস্তার ধার দিয়ে চলেছে একটা রেজিমেন্ট। হঠাৎ সামনে নীরব স্তেপের মাঠের মাথার ওপর পাখির মতো ডানা মেলে আকাশে উঠল কোন এক গাইয়ে দলের গায়েনের রুক্ষ ধরনের পুরুষালী গলা।

> ছোট্ট নদী কামিশিন্‌কা, তীরে পরম সুখে,
> সারাতভে, ভাই রে, আহা, ধু ধু মাঠের বুকে . . .

অসংখ্য গলার প্রবল উচ্ছ্বাস একসঙ্গে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলল প্রাচীন কসাক গানে। কিন্তু সবার ওপরে ছাপিয়ে ওঠে এক দোহারের আশ্চর্য সুন্দর সবল, সপ্তমের সুর। মিলিয়ে যাওয়া খাদের গলাগুলো ছাড়িয়ে সেই সপ্তমের সুর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন তখনও শিহরণ তুলছে, বুকের ভেতরে এসে বাজছে। কিন্তু ততক্ষণে গায়েন আবার ধরেছে:

> ছিল সেথায়, দিব্যি ভালো
> দন, গ্রেবেন আর ইয়াইকের স্বাধীন কসাক যত . . .

গ্রিগোরির বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। . . . হঠাৎ একটা কান্না ঠেলে উঠে কাঁপিয়ে দেয় ওর শরীর। কান্নার আবেগে বুজে আসে ওর গলা।

কান্নাটা জোর করে চাপতে চাপতে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কখন গায়েন আবার শুরু করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ ঠোঁট নেড়ে আওড়াতে থাকে আবাল্য পরিচিত সেই গানের কথাগুলো:

নেতা তাদের ইয়ের্মাক সে - তিমফেইয়ের ব্যাটা,
মেজর তাদের নাম আস্তাশ্‌কা - লাভ্রেন্তির সে ব্যাটা . . .

গাড়ির ভেতরে ততক্ষণ কসাকদের মধ্যে যে কথাবার্তা চলছিল গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা থেমে গেছে। গাড়োয়ানরাও আর হাঁকডাক ক'রে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে না। হাজার হাজার গাড়ি গভীর, সজাগ নিঃশব্দতার মধ্যে এগিয়ে চলেছে। শুধু গায়েন যখন গানের একেকটি কলির শুরুর শব্দগুলো জোর দিয়ে উচ্চারণ করে একমাত্র সেই ফাঁকেই শোনা যায় গাড়ির চাকার ঘর্ঘর আর জলকাদার মধ্যে ঘোড়ার খুরের ছপছপ আওয়াজ। যুগ-যুগান্ত পেরিয়ে অন্ধকার স্তেপভূমির বুকে বেঁচে আছে, আধিপত্য করছে এক প্রাচীন গান। সাদামাঠা, সহজ সরল ভাষায় সে গানে প্রকাশ পেয়েছে কসাকদের স্বাধীন মুক্ত পূর্বপুরুষদের কথা – যাদের প্রবল বিক্রম কোন এক কালে জারের বাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছিল, যারা হালকা ডাকাতে পানসিতে চেপে দনে আর ভোল্‌গায় ঘুরে বেড়াত, জারের জাহাজ লুট করত, সদাগর, রাজপুরুষ আর অভিজাত শাসকদেরও 'বাজিয়ে দেখত', যারা দূর সাইবেরিয়াও জয় করেছিল। . . . আজ বিষণ্ণ নীরবতার মধ্যে সেই পরাক্রমের মহাগীতি শুনছে স্বাধীন মুক্ত কসাকদের উত্তরপুরুষেরা, যারা রুশ জনগণের সঙ্গে কলঙ্কজনক যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

রেজিমেন্টটা চলে গেল। গাড়ির সারিগুলোকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে গায়কের দল। কিন্তু তারপরও অনেকক্ষণ ধরে মন্ত্রমুগ্ধ নীরবতার মধ্যে চলতে থাকে গাড়িগুলো। কোন গাড়িতে কারও কোন কথাবার্তা শোনা যায় না। ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে হাঁক ডাকও শোনা যায় না। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বহু দূর থেকে ভেসে আসে, দনের কূলপ্লাবী বন্যার মতো বিপুল বিস্তারে ছড়িয়ে পড়ে সেই গান।

ভাবনা সবাই এখন থেকে ভাবে:
হায় রে সুখের গ্রীষ্মঋতু এই ত গেল বলে।
শীত যে ওরে কঠিন বড়, কোন্‌ মুলুকে যাই?
বলতে পার কোথায় কাটাই ভাই?
ইয়াইকের রাস্তা সে যে অনেকখানি পড়ে,

ভোল্‌গা, সেথায় গেলে বুঝি ডাকাত বলে ধরে।
কাজান শহর? কখ্‌খনো নয় – সেথায় ইভান রাজা,
করাল ইভান ভাসিল্যেভিচ্‌ দেবেই দেবে সাজা।

গায়কদের গলা আর শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু সপ্তমের সেই গলাটা এখনও বাজছে, নামতে নামতে আবার ওপরে উঠছে। এখনই ওই একই রকম উদ্বেগাকুল বিষণ্ণ নীরবতার মধ্যে সকলে কান পেতে শোনে সেই গান।

. . . স্বপ্নের ঘোরে গ্রিগোরির যেন মনে হতে থাকে একটা উষ্ণ ঘরের ভেতরে ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখ না খুলেই সমস্ত শরীর দিয়ে সে টের পায় পরিষ্কার বিছানার চাদরের আরামদায়ক টাটকা ভাব। নাকে এসে ঠেকে কোনো ওষুধের ঝাঁঝাল গন্ধ। প্রথমে ওর মনে হয়েছিল বুঝি কোন মিলিটারী-হাসপাতালে আছে। কিন্তু পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে পুরুষকণ্ঠের অসংযত অট্টহাসি, বাসনের ঝনঝন আওয়াজ। মাতাল কণ্ঠের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। কার যেন একটা চেনা-চেনা মোটা গলা ফেটে পড়ল: 'আহা তোমারও যেমন বুদ্ধি! আমাদের ইউনিট কোথায় সেটা খুঁজে বার করা উচিত ছিল। আমরাও সাহায্য করতে পারতাম। নাও, টুক ক'রে খেয়ে ফেল ওটা। অমন হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন ছাই?'

মাতালের মতো কাঁদো কাঁদো গলায় প্রোখর জবাব দিল, 'হা ভগবান! কী করে জানব বল? ওর সেবাযত্ন করা কি আমার পক্ষে অতই সোজা ছিল মনে কর তোমরা? খাবার চিবিয়ে ওর মুখে তুলে দিয়ে খাইয়েছি একটা কচি বাচ্চার মতো। দুধ? – তাও খাইয়েছি অল্প অল্প ক'রে মুখে ঢেলে। ভগবানের দিব্যি! রুটি চিবিয়ে ওর মুখে গুঁজে দিয়েছি। মাইরি বলছি! তলোয়ারের ডগা দিয়ে দাঁতকপাটি খুলে খাইয়েছি। . . . একবার ত মুখে দুধ ঢালতে বিষম ঠেকে মারা যায় আর কি! একবার ভেবে দেখ!'

'কাল চান করিয়েছিলে?'

'চান করিয়েছি, যন্তর দিয়ে চুলও কেটেছি। যেটুকু টাকাপয়সা ছিল দুধ আর খাবারের পেছনে সব খরচ হয়ে গেছে। ভেবো না টাকাপয়সার কথা ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। চুলোয় যাক ওসব! কিন্তু খাবার চিবিয়ে হাতে ক'রে খাইয়ে দেওয়া – কী মনে হয় বল? ভাবছ অতই সহজ? যদি বল সহজ তাহলে কিন্তু তোমার ওই খেতাব-টেতাবের কোন পারোয়া না ক'রে মেরেই বসব তোমাকে!'

প্রোখর, খার্লাম্পি ইয়েরমাকোভ আর পেত্রো বগাতিরিওভ এসে ঢুকল গ্রিগোরির ঘরে। পেত্রো বগাতিরিওভের মুখখানা লাল টকটক করছে। দামী আস্ত্রাখান ভেড়ার

লোমের লম্বা টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে সরানো। প্লাতোন রিয়াবচিকভ এবং আরও দু'জন অচেনা কসাকও ছিল।

'ও চোখ মেলেছে!' পাগলের মতো চিৎকার করে টলতে টলতে ইয়েমাকোভ ছুটে যায় গ্রিগোরির দিকে।

বেপরোয়া স্বভাবের, খোশমেজাজী প্লাতোন রিয়াবচিকভ হাতের বোতল ঝাঁকিয়ে কেঁদে কেটে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'ওরে গ্রিশা! গ্রিশা আমার! মনে পড়ে চির্ নদীর ধারে আমাদের আমোদ-ফুর্তি? আর কী সেই লড়াই করেছিলাম! কোথায় গেল আমাদের সেই তেজ? জেনারেলরা এ কী খেলা খেলছে আমাদের নিয়ে? কী দশা তারা করল আমাদের আর্মির? ব্যাটারা সব মরুক গে! জ্ঞান ফিরে এসেছে? নাও এক ঢৌক খাও, সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে যাবে! একেবারে খাঁটি জিনিস বাবা!'

'অনেক কষ্টে তোমায় খুঁজে পেয়েছি আমরা!' বিড়বিড় ক'রে বলল ইয়েমাকোভ। আনন্দে ঝলমল ক'রে ওঠে ওর তেল চকচকে কালো চোখদুটো। গ্রিগোরির বিছানায় ধপ করে বসে পড়তে বিছানাটা অনেকখানি দেবে যায় ওর ভারে।

কষ্ট ক'রে চোখ ঘুরিয়ে পরিচিত কসাকদের মুখগুলো এক এক ক'রে দেখতে দেখতে অর্ধস্ফুটস্বরে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোথায়?'

'ইয়েকাতেরিনোদার দখল করেছি আমরা! শিগ্গিরই হুড়হুড় ক'রে এগিয়ে যাব। খাও গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, খাও ইয়ার! উঠে পড়, ভগবানের দোহাই, তোমাকে পড়ে থাকতে দেখে সহ্য হচ্ছে না আমার!' বলতে বলতে গ্রিগোরির পায়ের ওপর পড়ে যায় রিয়াবচিকভ। বগাতিরিওভ নিঃশব্দে হাসছিল। ওদের মধ্যে তাকেই যা একটু প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল। চট করে রিয়াবচিকভের কোমরের বেল্ট ধরে অবলীলাক্রমে তাকে তুলে ধরল সে, তারপর সাবধানে মেঝেয় নামিয়ে দিল।

'আরে আরে ওর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে নাও! সবটা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে যে!' শঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে ইয়েমাকোভ। গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে আকর্ণবিস্তৃত মাতালের হাসি হেসে বলে, 'জান, আমরা আমোদ ফুর্তি করছি কেন? অনেক দিন ধরে ত বিরক্তির জন্যেই খাচ্ছিলাম, কিন্তু এই এখানে এসে অন্যের ঘাড় ভাঙা গেল। . . . আমরা মদের ভাঁড়ার লুট করেছিলাম, যাতে লালদের হাতে না পড়ে। . . . ওঃ সে যা কাণ্ড! স্বপ্নেও ভাবা যায় না! রাইফেলের গুলি ছোঁড়া হল একটা চৌবাচ্চার গায়ে। চৌবাচ্চা ফুটো হয়ে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে এলো খাঁটি মদ। গোটা চৌবাচ্চাটাই গুলি মেরে ঝাঁঝরা ক'রে ফেলল সেপাইরা। একেকজন ক'রে দাঁড়িয়ে গেল গুলির একেকটা ফুটোর সামনে। কেউ মাথার টুপি বাড়িয়ে ধরে, কেউ বালতি, কেউ ফ্লাস্ক। কেউ কেউ আবার আঁজলা

ভরে সোজা ওখান থেকেই মেরে দিল। ... দু'জন ভলান্টিয়ার সেপাই ভাঁড়ার পাহারা দিচ্ছিল, তাদের ওখানেই কেটে ফেলা হল। ভেতরে ঢোকার পরই শুরু হয়ে গেল আসল মজা! এক ব্যাটা কসাকের পো আমার সামনেই চৌবাচ্চার ওপরে উঠে গেল। ঘোড়ার খাবারের গামলাটা করে সোজা ওখান থেকে মদ তুলে আনার মতলব। কিন্তু ব্যাটা পা ফস্‌কে ভেতরে পড়ে গিয়ে ডুবল। মেঝেটা ছিল সিমেন্টের। দেখতে দেখতে হাঁটু অবধি মদের স্রোত উঠে ঘর ভাসিয়ে দিল। সবাই তার ভেতরেই ঘুরে বেড়ায়, ঝুঁকে পড়ে ঘোড়া যেমন নদীতে জল খায় তেমনি মদ খেতে থাকে একেবারে পায়ের কাছ থেকে, তারপর সেখানেই শুয়ে গড়াগড়ি যায়। ... সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! কিন্তু না হেসেও থাকা যায় না! একজন কেন, বেশ কয়েকজন সেখানে হাবুডুবু খেয়ে মরবে। আমরাও ছিটেফোঁটা ভাগ নিলাম। আমাদের আর কতটা দরকার বল! এই বালতি পাঁচেকের একটা পিপে গড়াতে গড়াতে নিয়ে এলাম। ওতেই আমাদের দিব্যি কুলিয়ে যাবে। চালাও ফূর্তি! অমনিতেই গেছে আমাদের শান্ত দন। প্রাতোনটা ত আরেকটু হলেই ওখানে ডুবে মরছিল। ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। সকলে ওর ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যেতে লাগল। বার দুয়েক হাবুডুবু খেয়ে দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি! অনেক কষ্টে ওকে ওখান থেকে টেনে বার করি। ...'

ওদের সকলের মুখ থেকে ভক ভক করে বেরোচ্ছে ভোদকা পেঁয়াজ আর তামাকের উগ্র গন্ধ। সামান্য বমি-বমি আর মাথা ঘোরার ভাব টের পেল গ্রিগোরি। ওর যন্ত্রণাকাতর মুখে দুর্বল হাসি ফুটে ওঠে। চোখ বুজল সে।

ইয়েকাতেরিনোদারে সপ্তাহখানেক বগাতিরিওভের জানা শোনা এক ডাক্তারের বাড়িতে শুয়ে কাটাল গ্রিগোরি। অসুখের পর ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল। তারপর প্রোখরের ভাষায়, 'গায়ে মাস লাগা শুরু হল'। ওরা যখন আবিন্‌স্কায়া জেলায় এসে পৌঁছল তখনই পিছু হটার এই এতদিনের মধ্যে গ্রিগোরি প্রথম ঘোড়ায় চাপল।

* * *

নোভোরসিইস্কে জাহাজে করে লোকজন সরানো হচ্ছে। রাশিয়ার পকেটভারী লোকজন, জমিদার, জেনারেলদের পরিবার আর প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্মীদের তুরস্কে পাঠানো হচ্ছে। প্রতিটি জাহাজ-ঘাটায় দিন রাত চলেছে জাহাজ বোঝাইয়ের কাজ। শিক্ষানবিশ অফিসাররা উদ্যোগ নিয়ে দল বেঁধে কুলির কাজ করছে। জাহাজের খোলগুলো খেতাবী আর বনেদী উদ্বাস্তুদের বাক্স প্যাটরা আর সামরিক সরঞ্জামে বোঝাই করছে।

দন আর কুবানের কসাকদের পিছনে ফেলে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ইউনিটগুলো অনেক আগেই নোভোরসিইস্কে পালিয়ে চলে এসেছিল। তারা যাত্রী জাহাজে উঠতে শুরু করেছে। 'এম্পারার অফ ইণ্ডিয়া' নামে একটা ব্রিটিশ ড্রেডনট বন্দরে এসে ভিড়তে স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের লোকজন বুদ্ধি ক'রে আগেভাগে সেটা দখল করে ফেলেছিল। লড়াই চলছে তন্নেল্‌নায়ার কাছাকাছি। হাজার হাজার উদ্বাস্তুতে শহরের রাস্তাঘাট ছেয়ে গেছে। মিলিটারী ইউনিটগুলোর আসার আর বিরাম নেই। জেটির কাছে ভিড়ের চাপে অবর্ণনীয় অবস্থা। নোভোরসিইস্কের আশেপাশের চুনাপাথরের পাহাড়ের ঢালে পালে পালে চরে বেড়াচ্ছে ফেলে যাওয়া হাজার হাজার ঘোড়া। জাহাজ-ঘাটার লাগোয়া রাস্তাগুলোতে স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে কসাকদের ঘোড়ার জিন, সাজসরঞ্জাম আর সামরিক রসদ। এর কোনটারই এখন আর কারও দরকার নেই। শহরে গুজব ছড়িয়েছে একমাত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর লোকজনকেই জাহাজে তোলা হবে, দন আর কুবানের কসাকদের মার্চ করে যার যার মতো যেতে হবে জর্জিয়ায়।

পঁচিশে মার্চ সকালে গ্রিগোরি আর প্রাতোন রিয়াব্‌চিকভ জাহাজ-ঘাটায় খোঁজ নিতে গেল দু'নম্বর দন কোর্-এর সেপাইদের জাহাজে নেওয়া হবে কিনা। তার কারণ এর আগের দিন সন্ধ্যায় কসাকদের মধ্যে গুজব ছড়িয়েছিল, যে সব দন-কসাকদের এখনও অস্ত্রশস্ত্র আর ঘোড়া আছে জেনারেল দেনিকিন নাকি তাদের সকলকে ক্রিমিয়ায় চালান করার হুকুম জারী করেছেন।

সাল্ প্রদেশের কাল্‌মিকরা গিজগিজ করছে জাহাজ-ঘাটায়। মানিচ আর সাল্ থেকে পালে পালে উট আর ঘোড়া নিয়ে এসেছে তারা। নিজেদের আস্তানা কাঠের গুমটি-ঘরগুলো পর্যন্ত বয়ে এনেছে সমুদ্রের ধারে। ভেড়ার চর্বির বোটকা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। গ্রিগোরি আর রিয়াব্‌চিকভ ভিড় ঠেলতে ঠেলতে জাহাজ-ঘাটায় নোঙর করা একটা বিরাট যাত্রী-জাহাজের গ্যাঙওয়ের ঠিক মুখে এসে দাঁড়াল। মার্কভ ডিভিশনের অফিসারদের একটা দলের পাহারায় আছে জায়গাটা। কাছে জাহাজে ওঠার অপেক্ষায় ভিড় জমিয়েছে দন কসাকদের একটা গোলন্দাজ দল। খাকি রঙের তেরপলে ঢাকা কামানগুলো রয়েছে জাহাজের গলুইয়ে। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে এগিয়ে কালো গোঁফওয়ালা জোয়ানগোছের এক সার্জেন্ট-মেজরকে সামনে পেয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোন্ ব্যাটারী ভাই?'

সার্জেন্ট-মেজর গ্রিগোরির দিকে আড়চোখে তাকাল। অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিল, 'ছত্রিশ নম্বর।'

'কার্গিনের?'

'হ্যাঁ।'

'লোকজন তোলার ভার এখানে কার ওপর?'

'ওই যে দাঁড়িয়ে আছে রেলিঙের কাছে - কর্ণেল-টর্ণেল কেউ হবে।'

গ্রিগোরির জামার আস্তিন ধরে টেনে রিয়াব্‌চিকভ রেগে বলল, 'ধুত্তোর! এখেন থেকে চল দেখি! ওদের কাছ থেকে কিছু বার করতে পারবে ভেবেছ? লড়াইয়ের বেলায় আমরা। এখন আমরা . . . কেউ নই। . . .'

সারি বাঁধা গোলন্দাজদলটির দিকে চোখ টিপে সার্জেন্ট-মেজর হেসে বলল, 'তোমাদের কপাল ভালো হে! অফিসার সাহেবদের পর্যন্ত ওরা নিচ্ছে না।'

জাহাজে যাত্রী তোলার দেখাশোনা যে কর্ণেলটা করছিল সে তরতর ক'রে গ্যাঙওয়ে দিয়ে নীচে নেমে আসছিল। তার পেছন পেছন পড়িমরি ক'রে ছুটছে এক টাক-মাথা কর্মচারী। লোকটার গায়ে দামী লোমের কোট, বোতাম খোলা। সীলের চামড়ার টুপিটা বুকে চেপে ধরে অনুনয়-বিনয় ক'রে সে কী সব বলছে। তার ঘামে ভেজা মুখ আর দৃষ্টিক্ষীণ চোখে এমন একটা কাতর ভাব যে কর্ণেল বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রূক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

'আমি ত আপনাকে একবার বলেই দিয়েছি! আমায় জ্বালাবেন না, নয়ত এক্ষনই আপনাকে ডাঙায় নামিয়ে দিতে বলব! আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার ওসব ছাইপাঁশ কোন্ চুলোয় রাখব আমরা? আপনি কি চোখের মাথা খেয়েছেন? কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না? একেবারেই গেছেন দেখছি! হ্যাঁ হ্যাঁ, নালিশ করুন গে, দোহাই আপনার, করুন! ইচ্ছে হয় খোদ জেনারেল দেনিকিনের কাছে গিয়েই করুন! বলেছি পারব না - তার মানে পারব না। আপনি রুশ ভাষা বোঝেন না নাকি?'

নাছোড়বান্দা কর্মচারীটির হাত থেকে রেহাই পেয়ে গ্যাঙওয়ে দিয়ে নেমে যখন সে গ্রিগোরির পাশ দিয়ে যেতে গেল সেই সময় গ্রিগোরি তার পথ আটকাল। টুপিতে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করে উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'অফিসারদের জাহাজে ওঠার হক আছে?'

'এই জাহাজে হবে না। এখানে আর জায়গা নেই।'

'তাহলে কোন্‌টাতে, বলতে পারেন?'

'সরানোর কাজের জন্যে যে অফিস আছে সেখানে গিয়ে খোঁজ নিন।'

'সেখানে আমরা গিয়েছিলাম। কেউ কিছু জানে না।'

'আমিও জানি নে। যেতে দিন আমাকে!'

'কিন্তু ছত্রিশ নম্বর ব্যাটারীকে ত আপনি ওঠাচ্ছেন! তাহলে আমাদের জন্যে জায়গা নেই কেন?'

'যেতে দেবেন কিনা আমাকে? আমাকে কি খবরাখবরের দপ্তর পেয়েছেন?' কর্ণেল আস্তে ক'রে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল গ্রিগোরিকে। কিন্তু গ্রিগোরি শক্ত হয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। দপদপ করে জ্বলতে নিভতে থাকে তার চোখে নীলচে ফুলকি।

'এখন বুঝি আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে আপনাদের কাছে? আগে প্রয়োজন হত তাই না? হাত সরিয়ে নিন, আমাকে ঠেলে সরাতে পারবেন না।'

গ্রিগোরির চোখের দিকে একবার তাকাল কর্ণেল, চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। মার্কভ-দলের সেপাইরা আড়াআড়ি রাইফেল ঠেকিয়ে অতি কষ্টে গ্যাঙওয়ের মুখে ভিড়ের চাপ সামাল দিচ্ছে। গ্রিগোরির কাঁধের ওপর দিয়ে ওপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কর্ণেল ক্লান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোন্ ইউনিটের?'

'আমি বারো নম্বর দন রেজিমেন্টের, আর যারা আছে তারা অন্যান্য নানা রেজিমেন্টের।'

'আপনারা কত জন?'

'জনা দশেক।'

'পারব না। জায়গা নেই।'

রিয়াবচিকভ দেখতে পেল গ্রিগোরির নাকের পাটা কাঁপছে। চাপা গলায় গ্রিগোরি বলে উঠল, 'শালা হারামজাদা, চালাকির জায়গা পাও না! আছ ত লড়াইয়ের পেছনে, নোংরা উকুন কোথাকার। এক্ষুনি ছাড় বলছি, নইলে...'

'গ্রিশাটা এক্ষুনি ওদের মজা দেখাবে!' হিংস্র উল্লাসে মনে মনে রিয়াবচিকভ ভাবল। কিন্তু মার্কভ বাহিনীর দু'জন সেপাই রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ভিড় ঠেলে পথ ক'রে কর্ণেলকে উদ্ধার করতে দ্রুত ছুটে আসছে দেখে গ্রিগোরিকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য ওর জামার আস্তিন ধরে টানল।

'ওকে আর ঘাঁটিও না গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! চল সরে পড়ি।...'

কর্ণেলের মুখ ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল। গ্রিগোরিকে সে বলল, 'আপনি একটা ইডিয়ট। আপনার এই আচরণের জন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে!' মার্কভ বাহিনীর লোকদু'জন ইতিমধ্যে কাছে চলে আসতে তাদের দিকে ফিরে সে বলল, 'এই যে এই মৃগীরোগীটাকে শান্ত করুন ত মশায়! এখানে আইনশৃঙ্খলার দিকে একটু নজর রাখবেন ত! কম্যাণ্ডান্টের সঙ্গে আমার জরুরী কাজ রয়েছে, এদিকে কিনা আমাকে যত উটকো লোকের রাজ্যের দরবার শুনতে হবে!...' গ্রিগোরির পাশ কাটিয়ে চট করে এক ফাঁকে সরে পড়ে কর্ণেল।

নীল রঙের লম্বা কোর্তার কাঁধে লেফ্‌টেনান্টের তকমা আঁটা, ইংরেজ কায়দায়

নিখুঁত গোঁফ ছাঁটা, মার্কভ বাহিনীর একজন ঢ্যাঙা লোক সোজা এগিয়ে এসে গ্রিগোরির সঙ্গে নিবিড় হয়ে দাঁড়াল।

'কী চাই আপনার? আইনশৃংখলা ভঙ্গ করছেন কেন?'

'যা চাই তা হল জাহাজে জায়গা।'

'আপনার ইউনিট কোথায়?'

'জানি না।'

'আপনার কাগজপত্র দেখান।'

পাহারাদারদের মধ্যে আরেকজন – ফুলো ফুলো ঠোঁট অল্পবয়সী এক ছোকরা, নাকে পাঁশনে চশমা আঁটা – ফাটা হেঁড়ে গলায় বলল, 'ওকে বরং গার্ড হাউসে নিয়ে যান ভিসোৎস্কি। মিছে সময় নষ্ট করবেন না।'

লেফ্‌টেনান্ট মন দিয়ে গ্রিগোরির কাগজপত্র দেখে তাকে ফেরত দিল।

'আপনার ইউনিট খুঁজে বার করুন। আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি এখান থেকে চলে যেতে। তোলার কাজে ব্যাঘাত করবেন না। যারাই এখানে আইনশৃংখলা ভাঙবে, তোলার কাজে বাধা সৃষ্টি করবে, আমাদের ওপর হুকুম আছে পদের কোন বাছবিচার না করে তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করার।' লেফ্‌টেনান্ট শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর রিয়াবচিকভের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গ্রিগোরির দিকে ঝুঁকে ফিসফিস ক'রে বলল, 'আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি। ছত্রিশ নম্বর ব্যাটারীর কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলুন, ওদের পালার মধ্যে ঢুকে যান তাহলেই জাহাজে চাপতে পারবেন।'

লেফ্‌টেনান্টের নীচু গলার কথাগুলো রিয়াবচিকভের কানে গিয়েছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, 'তুমি কার্গিনের কাছে চলে যাও। আমি ততক্ষণে ছুটে গিয়ে চটপট আমাদের সকলকে নিয়ে আসছি। তোমার সম্পত্তির মধ্যে জিনিসের থলেটা ছাড়া আর কী আনতে বল?'

'চল একসঙ্গেই যাই,' উদাসীন ভাবে গ্রিগোরি বলল।

পথে এক চেনা কসাকের সঙ্গে দেখা। সেমিওনভ্‌স্কি গ্রামের লোক। তেরপল ঢাকা একটা বিশাল মালগাড়ি বোঝাই করে সেঁকা রুটি নিয়ে সে যাচ্ছিল জাহাজ-ঘাটার দিকে। রিয়াবচিকভ তাকে ডাকল।

'এই যে ফিওদর, কী খবর? চললে কোথায়?'

'আরে প্লাতোন যে! গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! নমস্কার! আমাদের রেজিমেন্টের রাস্তার খোরাক যোগাচ্ছি। সেঁকে আনতে কম ঝামেলা নাকি! নইলে রাস্তায় হরিমটর খেয়ে থাকতে হত। . . .'

গাড়িটা ততক্ষণে থেমে গিয়েছিল। গ্রিগোরি কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বুটি কি ওজন করা? নাকি গোনা?'

'ধুৎ! কার দায় পড়েছে গুনতে? কেন, তোমাদের বুটি চাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'নাও তাহলে?'

'ক'টা নিতে পারি?'

'যতটা বইতে পার। আমাদের যথেষ্ট আছে!'

গ্রিগোরি একের পর এক বুটি নিচ্ছে দেখে রিয়াবচিকভ আশ্চর্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'অত বুটি নিয়ে তুমি কী করবে ভাই?'

'দরকার আছে।' গ্রিগোরির সংক্ষিপ্ত উত্তর।

লোকটার কাছ থেকে দুটো থলি চেয়ে নিয়ে সে তার মধ্যে বুটিগুলো ভরল। উপকারের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাল। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিয়াবচিকভকে বলল, 'ধর বয়ে নিয়ে যাই।'

'তুমি এখানে শীতকালটা কাটাবে বলে ভেবেছ নাকি!' কাঁধের ওপর থলেটা ফেলে কৌতুকভরে জিজ্ঞেস করল রিয়াবচিকভ।

'আমার জন্যে না।'

'তাহলে কার জন্যে?'

'ঘোড়ার জন্যে।'

রিয়াবচিকভ ঝট ক'রে রাস্তার মাঝখানে মাটিতে ফেলে দেয় থলেটা, হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ঠাট্টা করছ?'

'না, ঠিকই বলছি।'

'তার মানে তুমি . . . তুমি কী ভেবেছ বল দেখি? থেকে যেতে চাও? তাই কি?'

'ঠিকই ধরেছ। তোলো তোলো থলেটা। চল। ঘোড়াটাকে খাওয়াতে হবে না। ওটা গামলা চিবিয়ে চিবিয়ে ত আর আস্ত রাখে নি। ঘোড়া এখনও কাজে লাগবে। পায়ে হেঁটে ত আর পল্টনের কাজ চলে না। . . .'

আস্তানা পর্যন্ত একটি কথাও না বলে রিয়াবচিকভ এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে থলি বদলায় আর কঁকিয়ে কঁকিয়ে চলে। ফটকের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের আর সকলকে বলবে? উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে খানিকটা ক্ষুণ্ণ ভাবে বলে, 'এটা কিন্তু তুমি বেশ একটা চাল দিলে ভাই : . . . কিন্তু আমাদের কী হবে?'

উদাসীনতার ভান করে গ্রিগোরি জবাব দেয়, 'সে তোমাদের যা খুশি। ওরা আমাদের নিচ্ছে না যে। আমাদের সবার জায়গা দিতে পারছে না। পারছে না

যখন, দরকার নেই। কোন্ দুঃখে আমরা উপর-পড়া হয়ে ওদের কাছে চাইতে যাব? থেকেই যাব আমরা। দেখি ভাগ্যে কী হয়। আরে, যাও না ভেতরে! দরজার গায়ে সেঁটে গেলে যে!'

"অমন কথাবার্তা শুনে সেঁটেই যেতে হয়। . . . চোখেমুখে এমন অন্ধকার দেখছি যে ফটকই নজরে পড়ছে না। বেশ কাণ্ড যা হোক! তুমি আমার মাথার চাঁদিতে মোক্ষম ঘা বসিয়ে দিয়েছ গ্রিশা। কিছু ভাবতেই পারছি না আমি। আমি ত ভাবছিলাম, 'এত রুটি নিয়ে ও করবেটা কী?' এখন আমাদের আর সকলে জানতে পারলে মুষড়ে পড়বে। . . .'

'তুমি নিজে কী মনে কর? থাকবে না?' গ্রিগোরি কৌতূহল প্রকাশ করে।

'কী যে বল!' আঁতকে ওঠে রিয়াব্চিকভ।

'একবার ভেবে দেখ।'

'ভাবার কিছু নেই! খালি পেলেই হল – সুট্ করে উঠে পড়ব। একটি কথাও নয়। কার্গিনের ব্যাটারীতে ভিড়ে ওদের সঙ্গে চলে যাব।'

'ভুল করছ।'

'আহা কী কথাই না শোনালে! আমার কাছে আমার মাথার অনেক দাম ভাই। লালেরা এসে আমার মাথায় ওদের তলোয়ার পরখ করুক ওর মধ্যে আমি নেই।'

'আহা ভেবেই দেখ না প্লাতোন! ব্যাপারটা বড়ই . . .'

'আর বোলো না! আমি চললাম এখুনি।'

'সে তোমার যা খুশি। আমি তোমায় সাধাসাধি করতে যাব না,' বিরক্ত হয়ে গ্রিগোরি বলে। নিজেই প্রথম পা বাড়ায় দেউড়ির পাথুরে সিঁড়ির ধাপে।

ইয়েমাকোভ, প্রোখর বা বগাতিরিওভ ওদের কেউই আস্তানায় ছিল না। বাড়িউলী বেশ বয়স্ক এক কুঁজো আর্মানী মহিলা। সে বলল, কসাকরা বাইরে বেরিয়েছে, বলে গেছে শিগ্গিরই ফিরে আসবে। গ্রিগোরি বাইরের পোশাক না খুলেই মোটা মোটা টুকরো ক'রে একটা বড় রুটি কেটে চালাঘরে ওদের ঘোড়াগুলোর কাছে চলে গেল। রুটির টুকরোগুলো সমান দু'ভাগে ভাগ ক'রে এক ভাগ তার নিজের আরেক ভাগ প্রোখরের ঘোড়ার সামনে ঢেলে দিল। জল আনবে বলে বালতিটা সবে হাতে নিয়েছে এমন সময় দরজার সামনে রিয়াব্চিকভের আবির্ভাব ঘটল। গ্রেটকোটের কোঁচড়ে ক'রে বড় বড় ভাঙা রুটির টুকরো সাবধানে বয়ে এনেছে সে। রিয়াব্চিকভের ঘোড়া তার মনিবের আগমন টের পেয়ে সামান্য চিঁহিহি ডাক ছাড়ল। কোন কথা না বলে রিয়াব্চিকভ চুপচাপ গ্রিগোরির পাশ দিয়ে চলে গেল। তাই দেখে গ্রিগোরি মৃদু হাসল। গামলায় রুটির টুকরোগুলো ঢালতে ঢালতে গ্রিগোরির দিকে না তাকিয়ে রিয়াব্চিকভ বলল, 'দোহাই তোমার,

অমন দাঁত বার কোরো না। ব্যাপারটা যদি এরকমই দাঁড়ায় তাহলে আমার ঘোড়াটাকেও ত খাওয়াতে হবে। . . . তুমি ভাবছ আমার যাবার বড় সাধ? ওই হতভাগা জাহাজে ওঠা মানে নিজেকে নিজের ঘাড়ে ধাক্কা মারা। এ ছাড়া আর কী? কিন্তু শিয়রে শমন। . . . তাই না তাড়া। মাথা ত ঘাড়ে একটাই আছে। ভগবান না করুন, সেটাও যদি কাটা যায় তাহলে আরেকটা ত আর গজাবে না দ্যাখ দ্যাখ ক'রে। . . .'

প্রোখর আর বাকি কসাকদের ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। ইয়েমাকোভ বিরাট এক বোতল ডাক্তারী স্পিরিট নিয়ে এসেছে। প্রোখরের হাতে একটা বস্তা, তাতে হলদে ঘোলাটে তরল পদার্থে ভরা সীল করা কতকগুলো শিশি।

'হুঁ হুঁ, গতর খাটিয়ে রোজগার ক'রে এনেছি বাবা! সারা রাতের মতো নিশ্চিন্তি,' বড়াই ক'রে বলল ইয়েমাকোভ। আঙুল দিয়ে বোতলটা দেখিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে বলল, 'এক মিলিটারীর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। আমাদের ধরলে, গুদামের বেবাক ওষুধপত্তর জাহাজ-ঘাটায় তুলে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। মুটেরা বেঁকে বসেছে, কাজ করতে চাইছে না। শুধু ক্যাডেটরা গুদামঘর থেকে মাল টেনে বার করছিল, আমরাও ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। ডাক্তার এই স্পিরিট দিয়ে আমাদের মজুরী শুধুল। আর ওই শিশিগুলো প্রোখর কখন এক ফাঁকে হাতিয়েছে। মাইরি বলছি! মিথ্যে বললে আমার জিভ খসে যাবে!'

'কিন্তু কী আছে ওগুলোর মধ্যে?' রিয়াবচিকভ কৌতূহল প্রকাশ করল।

'এ ভাই ডাক্তারী স্পিরিটের চেয়েও খাঁটি মাল!' একটা শিশি ঝাঁকিয়ে আলোর সামনে ধরে প্রোখর দেখল কালো কাচের ভেতরে ঘন তরল পদার্থের বুদ্বুদ উঠছে। আত্মপ্রসাদের সুরে শেষে সে বলল, 'এ হল সবচেয়ে দামী বিলিতি মদ। শুধু রুগীদের দেওয়া হয় – ইংরেজি জানা এক ছোকরা ক্যাডেট আমায় বলেছিল। ইস্টিমারে উঠে বসে গলায় ঢেলে জ্বালাযন্ত্রণা জুড়োব, গান ধরব 'আহা মোর আজন্মের দেশ!' একেবারে ক্রিমিয়া পর্যন্ত সারা পথ যাব আর শিশিগুলো সুমুদ্দুরের জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

'যাও যাও, শিগগির গিয়ে চেপে বোসো। তোমার জন্যে ইস্টিমার দেরি করছে, ছাড়তে পারছে না। বলছে, কোথায় গেল আমাদের সেই বীরপুঙ্গব প্রোখর জিকভ? ওকে ছাড়া আমরা যে যেতে পারছি নে!' ঠাট্টা করে রিয়াবচিকভ বলে। একটু চুপ থেকে তামাকের ধোঁয়ায় হলদে ছোপ ধরা আঙুল দিয়ে গ্রিগোরিকে দেখিয়ে আবার বলে, 'এই যে ও মত পালটেছে যাবার ব্যাপারে। আমিও।'

'যাঃ!' প্রোখর হাঁ হয়ে যায়। এত আশ্চর্য হয়ে যায় যে আরেকটু হলেই ওর হাত থেকে শিশিটা পড়ে যাচ্ছিল।

'সে কী? এসব আবার তোমাদের মাথায় কী ঢুকল?' ভুরু কুঁচকে গ্রিগোরির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ইয়েমাকোভ জিজ্ঞেস করে।

'আমরা যাব না ঠিক করেছি।'

'কেন?'

'তার কারণ, আমাদের জায়গা হবে না।'

'আজ নেই – কাল হবে,' বগাতিরিওভ জোর দিয়ে বলে।

'জাহাজ-ঘাটায় গিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কী হয়েছে?'

'দেখেছ, ওখানে কী কাণ্ড হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'খালি ত হ্যাঁ-হ্যাঁ করে যাচ্ছ! নিজেই যখন দেখেছ তখন আর তোমাকে বলে বোঝানোর কী আছে? ওরা শুধু আমাদের দু'জনকে - আমাকে আর রিয়াবচিকভকে নিচ্ছিল, তাও আবার একজন ভলাণ্টিয়ার বলল কার্গিনের ব্যাটারীতে গিয়ে লাইন দিতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই।'

বগাতিরিওভ সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ব্যাটারী তাহলে স্টিমারে ওঠে নি এখনও?'

গোলন্দাজরা এখনও ওঠার জন্য সারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুনে সে তৎক্ষণাৎ যাবার জন্য তৈরি হতে থাকে। ভেতরের কিছু জামাকাপড়, বাড়তি সালোয়ার আর ফৌজী জামা থলের ভেতরে পুরল, কিছু রুটিও নিল, তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল।

'থেকে যাও পেত্রো।' ইয়েমাকোভ পরামর্শ দেয়। 'ভেঙে আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না আমাদের।'

কোন জবাব না দিয়ে বগাতিরিওভ তার ঘর্মাক্ত হাতখানা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল। চৌকাঠে দাঁড়িয়েই নীচু হয়ে নমস্কার জানাল।

'ভালো থেকো সবাই। ভগবানের ইচ্ছে হলে আবার আমাদের দেখা হবে।' বলেই সে ছুটে বেরিয়ে যায়।

বগাতিরিওভ চলে যাওয়ার পর ঘরের ভেতরে অনেকক্ষণের মতো নেমে আসে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। ইয়েমাকোভ রান্নাঘরে গিয়ে বাড়ির গিন্নির কাছ থেকে চারটে গেলাস চেয়ে এনে চুপচাপ তাতে স্পিরিট ঢালে। ঠাণ্ডা জলে ভরা একটা বিরাট তামার কেট্‌লি টেবিলে রেখে শুয়োরের চর্বি কাটে। ওই রকম মুখ

বুজেই সে টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে টেবিলের ধারে বসে, মিনিট কয়েক ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে নিজের পায়ের দিকে। পরে কেটলির নলে সরাসরি মুখ লাগিয়েই খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'কুবানের সর্বত্রই দেখছি জলে কেরোসিনের গন্ধ। এটা কী রকম ব্যাপার?'

কেউই জবাব দেয় না ওর কথার। রিয়াবৃচিকভ পরিষ্কার এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তলোয়ারের ভিজে স্যাঁতসেঁতে ধারটা মুছে সাফ করে। গ্রিগোরি ওর প্যাটরাটা হাতড়ায়। প্রোখর অন্যমনস্ক ভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ন্যাড়া পাহাড়ের ঢালে ছড়িয়ে আছে ঘোড়ার পাল।

'বসে যাও হে, খাওয়া যাক।' ইয়ের্মাকোভ কারও জন্য অপেক্ষা না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক গেলাস গলায় ঢেলে দেয়, জল খেয়ে সেটা ভেতরে পাচার করে দেয়। গোলাপী রঙের এক টুকরো শুয়োরের চর্বি চিবুতে চিবুতে খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে গ্রিগোরির দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'লাল কমরেডরা আমাদের ধরে ধরে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে না ত?'

'মেরে ত আর সবাইকে শেষ করতে পারবে না। হাজার হাজার লোক এখানে থেকে যাবে,' গ্রিগোরি জবাব দেয়।

ইয়ের্মাকোভ হাসে। 'সকলকে নিয়ে মাথাব্যথা আমার নেই। আমার চিন্তা নিজের চামড়া বাঁচানো নিয়ে।'

বেশ খানিকটা পরিমাণ পেটে পড়তে ওদের কথাবার্তার মধ্যে আগের চেয়ে খুশির ভাব ফুটে ওঠে। আরও কিছুক্ষণ পরে আচমকা আবির্ভাব ঘটে বগাতিরিওভের। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে, মুখখানা থমথম করছে। চৌকাঠের কাছেই আনকোরা নতুন ঝিলিতি গ্রেটকোটের পুরো একটা গাঁটরি দুম করে নামিয়ে রেখে কোন কথা না বলে ওপরের পোশাক ছাড়তে লাগল।

'আসতে আজ্ঞা হোক মশায়!' মাথা নুইয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে নমস্কার জানাল প্রোখর।

ওর দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি হানল বগাতিরিওভ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দেনিকিনের যত লোক আর ওই শালার ইয়ের বাচ্চাগুলো . . . পায়ে ধরে সাধলেও আর যাচ্ছি নে। সারিতে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠাণ্ডায় জমে মরে গেলাম – কিন্তু কোন কাজ হল না। ঠিক আমার কাছে এসেই কেটে গেল। আমার আগে দু'জন দাঁড়িয়ে ছিল, একজনকে ছাড়ল, আরেকজন বাদ পড়ে গেল। ব্যাটারীর অর্ধেক রয়ে গেছে। বলি, এটা কীরকম ব্যাপার, অ্যাঁ?'

'আমাদের মতো লোকের সঙ্গে এই হল ওদের ব্যবহার।' হো হো করে হেসে উঠে কানায় কানায় ভরতি ক'রে বগাতিরিওভের জন্য গেলাসে স্পিরিট

ঢেলে দিল ইয়ের্মাকোভ। খানিকটা ছল্‌কে পড়ে গেল। 'নাও নাও হে, দুঃখের ভারটা নেমে যাবে! নাকি তুমি অপেক্ষা করবে কবে তোমায় সাধতে আসবে? জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখ। জেনারেল ক্রাস্নভ তোমাকে নিতে আসছেন না ত?'

বগাতিরিওভ চুপচাপ দাঁতের ফাঁক দিয়ে স্পিরিট টানতে থাকে। হাসিঠাট্টা করার মতো মেজাজ ওর একেবারেই ছিল না। কিন্তু ইয়ের্মাকোভ আর রিয়াব্‌চিকভ ততক্ষণে নিজেরা আধা-মাতাল ত হয়েইছে, বুড়ি বাড়িউলীটিকেও ঠেসে মদ খাইয়েছে। এখন ওদের মধ্যে কথা হচ্ছে একজন অ্যাকর্ডিয়ান-বাজিয়েকে কোন জায়গা থেকে ধরে আনা যায় কিনা।

'তোমরা বরং স্টেশনে যাও,' বগাতিরিওভ ওদের পরামর্শ দিল। 'ওখানে ওয়াগনে জিনিসপত্র গাদা করা হচ্ছে। মালগাড়ি বোঝাই উর্দি।'

'তোমার ওই উর্দি দিয়ে আমাদের কী ঘোড়ার ডিম হবে?' ইয়ের্মাকোভ খেঁকিয়ে ওঠে। 'তুমি যে কোটগুলো এনেছ ওতেই আমাদের কুলিয়ে যাবে। বাড়তি কিছু থাকলে অমনিতেই কেড়ে নেবে, বুঝলে পেত্রো? শালা বেজন্মা কুত্তা! আমরা এখন ভাবছি লালদের কাছে যাব, বুঝেছ? আমরা হলেম গিয়ে কসাক - তাই নয় কি? লালেরা যদি প্রাণে আমাদের না মারে তা হলে আমরা ওদেরই সেবা করতে যাব! আমরা দন-কসাক! খাঁটি কসাক রক্ত আমাদের শরীরে, এতটুকু মিশেল নেই। আমাদের কাজ তলোয়ার চালানো। জান, আমি কেমন তলোয়ার চালাতে পারি? এক কোপে বাঁধাকপির মতো নামিয়ে দিতে পারি। উঠে দাঁড়াও, তোমার ওপর পরখ ক'রে দেখি। আরে অমন নেতিয়ে পড়লে কেন? কার ওপর কোপ বসাতে হবে তাতে আমাদের কী এসে যায়? তলোয়ার চালাতে পারলেই হল। কী বল মেলেখভ, ঠিক বলছি কিনা?'

'আঃ ছাড় দেখি আমাকে!' ক্লান্ত ভাবে হাত নেড়ে গ্রিগোরি বলে।

তোরঙ্গের ওপর তলোয়ারটা পড়ে ছিল। রক্তচক্ষু মেলে আড়চোখে তাকিয়ে সেটা তুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায় ইয়ের্মাকোভ। বগাতিরিওভ রাগ না দেখিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মিনতি ক'রে বলল, 'ওহে বীর সেপাই, অত গরম দেখিও না। নইলে আমি তোমায় ঠাণ্ডা করে দেবো এক্ষুনি। নিজের মান সম্মান রেখে খাও, কোনো আপত্তি নেই। তুমি একজন অফিসার সেটা খেয়াল রাখবে ত!'

'তোমার ওই অফিসারের গুষ্টির কাঁথায় আগুন! ভারী বয়ে গেছে আমার! ও কথা আর মনে ক'রে দিও না! তুমি নিজেও ত তাই। এসো আমি তোমার কাঁধপটি টেনে ছিঁড়ে ফেলি, কেমন? পেত্রো, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, এই একটু . . . একটুখানি সবুর কর, একখুনি খুলে ফেলছি।'

মৃদু হেসে বেসামাল বন্ধুকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বগাতিরিওভ বলল, 'এখনও সময় হয় নি। পরে সময় পাওয়া যাবে অনেক।'

ভোর অবধি মদ খায় ওরা। সেই সন্ধ্যাবেলাই কোথা থেকে অচেনা কসাকরা এসে জুটেছিল। ওদের একজনের সঙ্গে আবার দুই থাকওয়ালা এক অ্যাকর্ডিয়ান বাজনা। ইয়েৰ্মাকোভ 'কসাক' নাচ নাচে। নাচতে নাচতে শেষকালে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। ওকে সকলে টেনে সরিয়ে দেয় ঘরের এক কোনায়, তোরঙ্গের কাছে। সেখানেই দু'পা ফাঁক করে মাথাটা বেয়াড়া ধরনে পেছনে হেলিয়ে খালি মেঝের ওপর তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল পর্যন্ত চলে ওদের ফুর্তিহীন আসর। দৈবাৎ মুখচেনা উটকো যে সব লোক মদের আসরে এসে জুটেছিল তাদের মধ্যে এক বয়স্ক কসাকও ছিল। লোকটা মাতাল হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কুমশাৎস্কায়াতে বাড়ি আমার।... একেবারে জেলা-সদরে! কী সব বলদই না ছিল আমাদের! দাঁড়িয়ে শিঙের নাগাল পাওয়া যায় না! ঘোড়াগুলো সব ছিল সিংহের মতো। কিন্তু এখন আমাদের গেরস্থালির কী রইল? থাকার মধ্যে আছে একটা ঘেয়ো মাদী কুকুর! তা সেটাও এই টাঁসল বলে। খাওয়ানোর মতো কিছু নেই।...' ছেঁড়াখোঁড়া লম্বা চেরকেসীয় কোর্তা পরা এক কুবান-কসাক বাজনদারকে এক ককেশীয় বাজনার ফরমাস দিল। বাজনার তালে তালে ছবির মতো হাত ছুঁড়ে এত আশ্চর্য হালকা পা ফেলে সে মেঝের ওপর ঘুরতে লাগল যে দেখে গ্রিগোরির মনে হচ্ছিল লোকটার বুটের তলা বুঝি চটা-ওঠা নোংরা মেঝে এতটুকু স্পর্শ করছে না।

মাঝরাতে কসাকদের মধ্যে কে একজন কোত্থেকে যেন দু'খানা সরুগলা, উঁচুমতন মাটির কুঁজো নিয়ে এলো। সেগুলোর গায়ে রংজ্বলা আবছা লেবেল আঁটা, মুখের ছিপি গালা দিয়ে সীলমোহর করা। লাল টকটকে গালার মোহর থেকে ঝুলছে সীসের বড় বড় সীল। একটা পাত্র অনেকক্ষণ ধরে হাতে ধরে থাকে প্রোখর, অনেক কষ্টে ঠোঁট নাড়িয়ে বিড়বিড় করে পড়ার চেষ্টা করে লেবেলের বিদেশী লেখাগুলো। ইয়েৰ্মাকোভ জেগে উঠেছিল খানিকক্ষণ আগে। প্রোখরের হাত থেকে পাত্রখানা নিয়ে সে মাটিতে রাখে। খাপ থেকে তলোয়ার খোলে। প্রোখর হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসার আগেই ইয়েৰ্মাকোভ ঝপাং করে তেরছা এক কোপ মেরে কুঁজোর গলাটার চার ভাগের এক ভাগ উড়িয়ে দিল। জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'যার যার পাত্তর বাড়িয়ে দাও!'

অদ্ভুত সুগন্ধ মদটার। ঘন দরদরে, একটু তেতো স্বাদ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উজাড় হয়ে যায় সে মদ। এর পরও অনেকক্ষণ ধরে বিভোর হয়ে রিয়াবচিকভ জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করে, বিড়বিড় ক'রে বলে, 'এ ত মদ

নয়, এ যে ঠাকুরের প্রসাদ – অমৃত! শুধু মরার আগে, জীবনে একবারই খেতে হয় এই জিনিস। তাও সকলের জন্যে নয় - একমাত্র তাদেরই জন্যে যারা জীবনে কখনও তাস পাশা খেলে নি, তামাকের গন্ধ পর্যন্ত শোঁকে নি, মেয়েমানুষ ছোঁয় নি। . . . এক কথায় গুরুঠাকুরদের খাবার জিনিস!' ঠিক এই সময় প্রোখরের মনে পড়ে গেল ওর থলেতে ডাক্তারী মদের কিছু শিশি পড়ে আছে।

'দাঁড়াও প্যাতোন! আগে থাকতেই অত প্রশংসা ক'রে কাজ নেই! আমার কাছে যে মাল আছে সেটা এর চেয়েও ভালো হবে! ও ত ভুষোমাল। হ্যাঁ মদ যদি বলতে হয় ত গুদাম থেকে যে মালটা আমি এনেছি, বুঝলে? মধুর সোয়াদ আর ধুনোর ভুরভুরে গন্ধ। বলা যায় না হয়ত তার চেয়েও ভালো? এ তোমার ভাই কোন পাদ্রী গুরুঠাকুরের নয় - সোজা কথায়, খোদ জারের! আগের দিনে রাজা-রাজড়ারা খেতেন। এখন আমাদের ভাগে পড়েছে। . . .' খুব জাঁক ক'রে একটা শিশি সে খুলল।

পানের ব্যাপারে রিয়াবচিকভ বরাবরই একটু বেশি লোভী। এক ঢোকে সে আধ গেলাস ঘন হলুদ ঘোলাটে তরল পদার্থ গলায় ঢেলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো।

'এ ত মদ নয়, এ যে কার্বলিক!' ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল সে। ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাসের বাকি মদটুকু প্রোখরের জামায় ঢেলে দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল গলি বারান্দায়।

মাতাল গলার হৈ হট্টগোল ছাপিয়ে গলা চড়ানোর চেষ্টা করে প্রোখর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে সে, 'মিছে কথা বলছে হারামজাদা! এ হল বিলিতি মদ। এক নম্বরী মাল! ওর কথা কেউ বিশ্বাস কোরো না ভাই!' বলেই সে এক ঢোকে পুরো এক গেলাস গলায় ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রিয়াবচিকভের চেয়েও ফেকাসে হয়ে গেল ওর মুখ।

'কী? কী রকম?' প্রোখরের চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে উঠতে নাকের পাটা ফুলিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ইয়েমাকোভ জানতে চাইল। 'জারের মদ? কড়া? মিষ্টি? বল্ শালা শয়তান, নয়ত এ বোতল এখুনি তোর মাথায় ভাঙব!'

নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে মাথা নাড়ে প্রোখর, হেঁচকি তোলে। তারপর চটপট ছুটে বেরিয়ে যায় রিয়াবচিকভের পিছু পিছু।

হাসতে হাসতে দম আটকে যাবার দশা হয় ইয়েমাকোভের। রহস্য ক'রে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। বেরিয়ে যায় উঠোনে। মিনিটখানেক পরে সে ঘরে ফিরে আসে। ওর হো হো হাসিতে চাপা পড়ে যায় আর সকলের গলা।

'তোমার আবার কী হল?' ক্লান্ত ভাবে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে। 'অমন বোকার মতো হি হি করে হাসছ কেন? বলি পেয়েছ কী?'

'ওঃ ভাই, গিয়ে দেখে এসো, দুটোতে কেমন করে পেটের নাড়িভুঁড়ি উলটে বার করছে! ওরা কী খেয়েছিল জান?'

'কী?'

'বিলিতি এক উকুন-মারা ওষুধ!'

'কী সব বাজে কথা!'

'মাইরি বলছি! আমি নিজে গুদামে গিয়েছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বোধহয় মদ। ডাক্তারকে জিগ্‌গেস করলাম, 'এ কী জিনিস ডাক্তার সাহেব?' উনি বললেন 'ওষুধ।' আমি জিগ্‌গেস করলাম, 'আচ্ছা, এটা শোক দুঃখ ভুলানোর দাওয়াই নয় ত? স্পিরিটে তৈরি কোন আরক নয় ত?' উনি বললেন, 'আরে রামো! এগুলো পাঠিয়েছে আমাদের মিত্রশক্তি। উকুন মারার ওষুধ। বাইরে লাগানোর জন্য মালিশ, গলায় ঢালার জিনিস একেবারেই নয়।'

গ্রিগোরি বিরক্ত হয়ে তিরস্কার ক'রে বলল, 'সেকথা তাহলে ওদের আগে বল নি কেন হারামজাদা?'

'মরুক গে, শয়তানগুলো ধরা দেওয়ার আগে শুদ্ধ হয়ে নিক। টেঁসে নিশ্চয়ই যাবে না!' হাসতে হাসতে ইয়েমাকোভের চোখে জল এসে গিয়েছিল। চোখের জল মুছে খানিকটা হিংস্র উল্লাসের সঙ্গেই যোগ করল, 'তাছাড়া খাবেও একটু কমসম। যে ভাবে খাচ্ছিল তাতে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেবিল থেকে গেলাস তোলারই সময় পাওয়া যাচ্ছিল না যে! ওরকম লোভীদের শিক্ষে হওয়া উচিত! যাক গে, আমরা খাব কি? নাকি একটু সবুর করব? এসো আমাদের সর্বনাশের কথা ভেবেই খাওয়া যাক। কী বল?'

ভোরের ঠিক আগে আগে গ্রিগোরি ঘর থেকে বেরিয়ে দেউড়ির ধাপের ওপর এসে দাঁড়াল। কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট পাকিয়ে ধরাল। কুয়াশায় ভেজা দেয়ালে ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ির ভেতরে তখনও মাতালের হল্লা, অ্যাকর্ডিয়ানের বিষম খাওয়া সুরের ওঠানামা আর উৎকট শিস অবিরাম চলছে। ওস্তাদ নাচিয়েদের কোন ক্লান্তি নেই। সুরের তালে তালে গোড়ালি ঠুকে তারা চটাস চটাস আওয়াজ তুলছে। . . . খাঁড়ির দিক থেকে বাতাসে ভেসে আসছে স্টীমারের সাইরেনের মোটা চাপা গর্জন। জাহাজ-ঘাটায় লোকজনের গলার আওয়াজ মিলেমিশে একটা জমাট কোলাহলের সৃষ্টি হয়েছে। মাঝে মাঝে তা ভেদ ক'রে সোচ্চার হয়ে উঠছে জোর গলার ফৌজী হুকুম, ঘোড়ার ডাক আর রেলের ইঞ্জিনের সিটি। তয়েল্‌নায়া

স্টেশনের দিকে কোথায় যেন লড়াই চলছে। কামানের চাপা গুমগুম আওয়াজ উঠছে। গোলা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ হয়ে কানে ভেসে আসছে মেশিনগানের উন্মত্ত কটকট আওয়াজ। মার্খোত্কা গিরিপথের ওপার থেকে আকাশের অনেকখানি ওপরে ঝাপটা মেরে একটা হাউই উঠে গেল, এক ঝলক আলোর ফুলকি ছড়িয়ে দিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সবুজ আলোর এক মোহময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল পাহাড় পর্বতের কুঁজো পিঠগুলো। পরক্ষণেই আবার মার্চের রাতের পাঁকাল আঁধারের মধ্যে ডুবে গেল পাহাড়গুলো। এবারে আরও স্পষ্ট আরও ঘন ঘন হয়ে উঠল তোপের গর্জন, একটা আরেকটার সঙ্গে প্রায় মিশে যেতে লাগল।

উনত্রিশ

সমুদ্র থেকে নোনা ঠাণ্ডা ভারী বাতাস বইছে। তীরে বয়ে নিয়ে আসছে অজানা-অচেনা ভিনদেশের গন্ধ। কিন্তু দলের লোকদের কাছে শুধু বাতাস কেন, এলোমেলো হাওয়ায় এফোঁড়-ওফোঁড় সমুদ্রতীরের এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে শহরটির সব কিছুই বাইরের, অনাত্মীয়। জাহাজে ওঠার আশায় বাঁধের ওপর একটা বিরাট জটলা পাকিয়ে জমাট ভিড় করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তীরের কাছে ফুঁসছে ফেনিল সবুজ ঢেউয়ের রাশি। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাটির দিকে উঁকি মারল সূর্য, কিন্তু তার কোন তাপ নেই। বন্দরের আশ্রয়ে ধোঁয়া তুলছে ব্রিটিশ আর ফরাসী ডেস্ট্রয়ার। জলের ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ড্রেড্নট্। ধূসর বিভীষিকা সঞ্চার করছে। তার মাথার ওপর ছড়িয়ে আছে ধোঁয়ার চাদর। জাহাজ-ঘাটার সর্বত্র গা ছমছম করা নিস্তব্ধতা। খানিক আগেও শেষ জাহাজটা যেখানে নোঙর করা ছিল সেখানে এখন জলে ভাসছে অফিসারদের ঘোড়ার জিন, বাক্স প্যাটরা, কম্বল, পশুলোমের কোট, লাল গদি আঁটা চেয়ার - এটা ওটা আরও সব ভাঙাচোরা টুকিটাকি, গ্যাঙওয়ে থেকে যেগুলো শেষ মুহূর্তে তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। . . .

ভোরবেলাতেই গ্রিগোরি জাহাজ-ঘাটায় এসেছে। প্রোখরের জিম্মায় ঘোড়াটা রেখে অনেকক্ষণ সে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কাটাল, খুঁজে খুঁজে চেনা মুখ বার করার চেষ্টা করল, উদ্বিগ্ন লোকজনের অসংলগ্ন কথাবার্তা কান পেতে শুনল। ওর চোখের সামনে 'স্ভেতোস্লাভ' স্টীমারের গ্যাঙওয়ের কাছে গুলি ক'রে আত্মহত্যা করল অবসরপ্রাপ্ত এক প্রৌঢ় কর্ণেল - স্টীমারে তার জায়গা মেলে নি বলে।

কর্পেল লোকটা বেঁটেখাটো, ছটফটে স্বভাবের। গালে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। চোখের নীচে ভাঁজ পড়া। ফোলা ফোলা জলভরা দুই চোখ। এই কিছুক্ষণ আগেও সে পাহারাদার দলের সেই অফিসারটির কোমরে বাঁধা হাতিয়ারের বেল্টটা চেপে ধরে আধো আধো করুণ সুরে ফিসফিস ক'রে কী সব বলছিল, নাক ঝাড়তে ঝাড়তে নোংরামতন একখানা রুমাল দিয়ে তামাকের ধোঁয়ায় হলদে ছোপধরা গোঁফ, চোখ আর কাঁপা কাঁপা ঠোঁটদুটো মুছছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎই যেন সে সঙ্কল্প ক'রে বসল। . . . গুলিটা ছোটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্তের মধ্যে একজন চটপটে কসাক মরা মানুষটার উষ্ণ হাত থেকে নিকেলের চকচকে ব্রাউনিং পিস্তলখানা টেনে নিল। হাল্কা ছাইরঙা অফিসারের গ্রেটকোট পরা লাশটাকে একটুকরো কাঠের গুঁড়ির মতো বাক্সের গাদার গায়ে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ওরা। গ্যাঙওয়ের কাছে জনতার ভিড় আরও জমাট আর উত্তাল হয়ে উঠল। আরও প্রচণ্ড গুঁতোগুঁতি মারামারি শুরু হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠল উদ্বাস্তুদের ভাঙা ভাঙা গলার ক্রুদ্ধ চিৎকার।

যখন শেষ স্টীমারটা জেটি থেকে নঙর তুলে দুলতে দুলতে সরে যেতে লাগল তখন ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের ফোঁপানি, উন্মত্ত চিৎকার আর গালিগালাজ শোনা গেল। স্টীমারের ভেঁপুর অল্পক্ষণের গভীর ভরাট গর্জন মিলিয়ে যেতে না যেতেই শেয়ালের চামড়ার কানঢাকা টুপি মাথায় এক কাল্‌মিক ছোকরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টীমারের পেছন পেছন সাঁতরাতে লাগল।

'আর ত্বর সইল না।' কসাকদের মধ্যে কে একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল।

'তার মানে ওর কোনমতেই থাকার উপায় ছিল না,' গ্রিগোরির পাশে যে কসাকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে মন্তব্য করল। 'বোঝাই যাচ্ছে, লালদের হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছে!'

গ্রিগোরি দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে দেখছিল কাল্‌মিক ছোকরাটার সাঁতার কাটা। সাঁতারু আর যেন অত ঘন ঘন দু'হাত চালাতে পারছে না, ওর কাঁধদুটো যেন ক্রমেই ভারী হয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। গায়ের লম্বা চের্কেসীয় কোর্তাখানা জলে ফুলে ঢোল হয়ে ওকে নীচে টানছে। একটা ঢেউয়ের ঝাপটায় কাল্‌মিকের মাথা থেকে শেয়ালের চামড়ার কানঢাকা বাদামী টুপিখানা পেছনে উড়ে কোথায় ভেসে চলে গেল।

'খ্রীষ্টের দুশমন হতভাগাটা ত ডুবে মারা যাবে দেখছি!' ককেশীয় কোর্তা পরা এক বুড়ো দুঃখ ক'রে বলে উঠল।

গ্রিগোরি ধাঁ করে পিছনে ফিরে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে রিয়াবচিকভ আর বগাতিরিওভও ঘোড়া ছুটিয়ে প্রোখরের কাছে চলে এসেছিল।

প্রোখর সোৎসাহে ওদের সঙ্গে কথা বলছিল। গ্রিগোরিকে আসতে দেখে রিয়াব্‌চিকভ জিনে বসেই উসখুস করতে লাগল। তর সইতে না পেরে গোড়ালির গুঁতো মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ওর দিকে। চেঁচিয়ে বলল, 'চটপট কর হে পান্তেলেয়েভিচ!' তারপর গ্রিগোরি কতক্ষণে কাছে আসবে তার অপেক্ষা না ক'রে দূর থেকেই চিৎকার করতে লাগল, 'সময় থাকতে থাকতে চল, এই বেলা আমরা সরে পড়ি। আমাদের আধ স্কোয়াড্রন মতন কসাক এখানে জড় হয়েছে। আমরা গেলেন্‌জিকের দিকে যাব ভাবছি, সেখান থেকে জর্জিয়া। তুমি কী বল?'

গ্রেটকোটের পকেটের অনেকখানি ভেতরে দু'হাত গুঁজে জাহাজ-ঘাটার উদ্দেশ্যহীন জনতার ভিড় কাঁধ দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নীরবে এগিয়ে আসতে থাকে গ্রিগোরি।

'যাবে, কি যাবে না?' কাছ ঘেঁসে চলে এসে নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করে রিয়াব্‌চিকভ।

'না, যাব না।'

'একজন কসাক লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল আমাদের দলে এসে ভিড়েছে। রাস্তাঘাট তার নখদর্পণে। বলছে, 'চোখ বুজে সোজা তিফ্‌লিস অবধি নিয়ে যাব তোমাদের।' চল গ্রিশা। সেখান থেকে যাব তুর্কদের কাছে, কী বল? আরে কোন রকমে জানটা বাঁচাতে হবে ত! শিয়রে শমন আর তুমি কিনা ডাঙায় তোলা মাছের মতো ঝিম্ মেরে গেলে! . . .'

'না, যাব না।' প্রোখরের হাত থেকে ঘোড়ার লাগামখানা নিয়ে বুড়োর মতো ধপ করে জিনের ওপর চেপে বসল গ্রিগোরি। 'যাব না। যাবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া একটু দেরিও হয়ে গেছে আমাদের। . . . ওই যে ওদিকে তাকিয়ে দেখ!'

রিয়াব্‌চিকভ পেছন ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় ক্ষোভে হাত মুঠো ক'রে তলোয়ারের বাঁধনের ঝালরটা ডেলা পাকিয়ে ধরল। টান লেগে সেটা ছিঁড়ে গেল। পাহাড় থেকে ঢালা স্রোতের মতো নেমে আসছে সারি সারি লাল ফৌজী। সিমেন্ট কারখানার কাছাকাছি জায়গায় পাগলের মতো কটকট শব্দে বেজে উঠল মেশিনগানগুলো। সাঁজোয়া ট্রেন থেকে তোপের গোলা এসে পড়তে লাগল সারিগুলো লক্ষ্য করে। আসলান্দি মিল্‌-এর কাছে ফেটে পড়ল প্রথম গোলাটা।

গ্রিগোরিকে একটু উৎফুল্ল দেখাল। গোটা শরীরটা যেন টানটান করে সে হুকুম দিল, 'চল হে, আস্তানায় ফিরে চল সবাই। আমার পেছন পেছন চলে এসো।'

কিন্তু রিয়াব্‌চিকভ গ্রিগোরির ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'না না কাজ নেই! এসো এখানেই থেকে যাই। . . . জান ত, দশে আছে যেইখানে মরণ ভালো সেইখানে। . . .'

'আরে ধুৎ! চল! মরণ আবার কিসের? কী সব আজেবাজে কথা?' বিরক্ত

হয়ে গ্রিগোরি আরও কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সমুদ্র থেকে একটা ভীমগর্জন ভেসে এসে ডুবিয়ে দিল ওর গলার স্বর। ব্রিটিশ ড্রেড্‌নট্‌ 'এম্পারার অফ ইন্ডিয়া' তার মিত্রশক্তি রাশিয়ার উপকূল ছাড়ার সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে বারো ইঞ্চি ব্যাসের কামানগুলো থেকে এক ঝাঁক গোলা ছাড়ল। খাঁড়ি থেকে যে সব স্টীমার ছাড়ছে সেগুলোকে আড়াল দিয়ে শহরের উপকণ্ঠের দিকে লাল ও সবুজ ফৌজের এগিয়ে আসা সারিগুলোর ওপর গোলা ছুঁড়তে লাগল। তারপর লক্ষ্য পালটে গোলা বর্ষণ শুরু ক'রে দিল গিরিখাতের মাথার ওপরে, যেখানে লাল ফৌজের ব্যাটারীগুলো ঘাঁটি গেড়ে ছিল। জাহাজ-ঘাটার কসাকদের ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে ভারী গুমগুম আওয়াজ আর ঘোর গর্জন করে ছুটে যায় ইংরেজ কামানের গোলা।

ঘোড়াটা ভয় পেয়ে প্রায় বসে পড়েছিল। লাগাম জোরে টেনে ধরে অনেক কষ্টে তাকে সামলাল বগাতিরিওভ। গোলাগুলির আওয়াজের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, 'ওঃ কী সাংঘাতিক হাঁকডাক ছাড়ছে ব্রিটিশ তোপগুলো! কিন্তু যা-ই বল না কেন লালদের ওপর এখন ওরকম তম্বি করার কোন অর্থ হয় না। ওদের গুলিগোলায় লাভ কিছু নেই, তর্জনগর্জনই সার!'

'করুক না তম্বি! আমাদের কাছে এখন সবই সমান।' এই বলে গ্রিগোরি মৃদু হেসে ঘোড়া চালিয়ে পথ ধরে এগিয়ে চলল।

রাস্তার একটা মোড় থেকে ঘোড়ার পিঠে প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে খোলা তলোয়ার হাতে গ্রিগোরির মুখোমুখি হয় ছয়জন ঘোড়সওয়ার। সামনের জনের বুকে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্নের মতো লাল শালুর ফিতে আঁটা।

অষ্টম পর্ব

এক

দক্ষিণ থেকে দু'দিন ধরে মৃদু উষ্ণ হাওয়া বইছে। মাঠের বুক থেকে মিলিয়ে গেছে শেষ বরফের চিহ্ন। বসন্তের বরফগলা ফেনিল জলধারার কল্লোল এখন আর নেই, স্তেপের মাঠে চওড়া নালা আর ছোট ছোট নদীর কলোচ্ছ্বাস শেষ হয়েছে। তিন দিনের দিন ভোর বেলায় বাতাস পড়ে গেল, স্তেপের মাঠের ওপর নেমে এলো ঘন কুয়াশা। গত বছরের কাশবনের ঝাড়গুলো রুপোলি শিশিরকণায় ঝলমল করছে। টিলা, পাহাড়ী খাত, গ্রামগঞ্জ, ঘণ্টামিনারের চূড়া, ত্রিভুজাকৃতি পপলার গাছের ঊর্ধ্বগামী ছুঁচালো মাথা – সব ঢাকা পড়ে গেছে একটা দুর্ভেদ্য ধোঁয়া ধোঁয়া সাদা কুহেলির আবরণে। দনের প্রশস্ত স্তেপভূমিতে এসেছে নীল বসন্ত।

অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে আক্সিনিয়া প্রথম বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দেউড়ির ধাপে। বসন্তের মাতাল-করা স্নিগ্ধ মিষ্টি হাওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথা ঘোরানো আর বমি বমি ভারটাকে কাটিয়ে উঠে বাগানের কুয়োটা অবধি গেল। বালতি নামিয়ে রেখে কুয়োর পাটে গিয়ে বসল।

পৃথিবীটা ওর কাছে এখন যেন অন্য রকম, আশ্চর্য নতুন রূপ নিয়ে এসেছে, মায়া সঞ্চার করছে। ঝলমলে চোখ মেলে উত্তেজনাভরে ও চারদিকে চেয়ে দেখে, বাচ্চাদের মতো গায়ের পোশাকের ভাঁজগুলো হাতড়ায়। কুয়াশায় জড়ানো সুদূর বিস্তার, বরফগলা জলে বাগিচার ডুবু ডুবু আপেলগাছগুলো, ভিজে বেড়া, সেই বেড়া ছাড়িয়ে রাস্তায় গত বছরের শরৎকালের গাড়ির চাকার গভীর দাগ যেখানে জলে ধুয়ে গেছে – সবই ওর কাছে অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর ঠেকছে। যেন সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ঘন অথচ স্নিগ্ধ রঙে ফুটে বেরোচ্ছে চারধারের সব কিছু।

কুয়াশার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার এক টুকরো আকাশ উঁকি মারছে। তার শীতল নীলিমায় চোখ ধাঁধিয়ে যায় আক্সিনিয়ার। পচা খড় আর বরফ গলে জেগে ওঠা কালো মাটির সোঁদা গন্ধ ওর এত চেনা এত মধুর যে তার কথা মনে পড়তে

গভীর নিঃশ্বাস নেয় আক্সিনিয়া। ঠোঁটের কোনায় ফুটে ওঠে মৃদু হাসি। কুয়াশায় ঢাকা স্তেপের কোন্ এক প্রান্ত থেকে চাতক পাখির সাদামাঠা গান ওর ভেতরে জাগিয়ে তোলে এক অব্যক্ত বেদনা। এই গান—প্রবাসে শোনা এই ছোট্ট এক টুকরো গানই আক্সিনিয়ার বুকের স্পন্দন যেন বাড়িয়ে দিল, ওর চোখ নিংড়ে বার করল সামান্য দু'ফোঁটা জল।

জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে নিজের অজানতেই বিভোর হয়ে যায় আক্সিনিয়া। সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার, নজর দিয়ে দেখার প্রবল বাসনা জাগে তার। ওই যে ছোট ছোট বুনো ফলের ঝোপগুলো জোলো হাওয়া লেগে কালো হয়ে গেছে ওর ইচ্ছে হয় সেগুলো ছুঁয়ে দেখে। ইচ্ছে হয় আপেলগাছের ময়ূরকণ্ঠী রঙের হালকা মখমলী প্রলেপে ঢাকা ডালটা গালে চেপে ধরে। সাধ হয় বিধ্বস্ত বেড়াটা ডিঙিয়ে পার হয়ে গিয়ে জলকাদা আর পথঘাটহীন জায়গার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতে সেখানে যেখানে চওড়া খাতখানার ওপাশে কুহেলীঘেরা সুদূর বিস্তারের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে রূপকথার রাজ্যের মতো রবিশস্যের সবুজ ক্ষেত।

যে কোন দিন গ্রিগোরি ফিরে আসতে পারে এই আশায় বেশ ক'টা দিন কেটে গেল আক্সিনিয়ার। কিন্তু পরে বাড়ির কর্তার সঙ্গে পাড়াপড়শি যারা দেখা করতে আসে তাদের কথাবার্তা থেকে জানতে পারে যে যুদ্ধ শেষ হয় নি, নোভোরসিইস্ক থেকে বহু কসাক সমুদ্রপথে ক্রিমিয়ায় চলে গেছে। যারা রয়ে গেছে তারা হয় লাল ফৌজে যোগ দিয়েছে নয়ত তাদের পাঠানো হয়েছে খনির কাজে।

সপ্তাহের শেষ দিকে আক্সিনিয়া সম্পূর্ণ মনস্থির ক'রে ফেলল যে বাড়ি ফিরে যাবে। শিগগিরই পথের একজন সঙ্গীও তার জুটে গেল। এক দিন সন্ধ্যাবেলায় বাইরে থেকে টোকা না মেরেই সোজা ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল বেঁটেখাটো গড়নের কোলকুঁজো এক বুড়ো। লোকটার গায়ের বিলিতি গ্রেটকোটটা নোংরা কাদামাখা, সেলাই বরাবর টুটোফাটা। ওর গায়ে সেটা বস্তার মতো ঝুলছে। কোন কথা না বলে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে সে গ্রেটকোটের বোতাম খুলতে লাগল।

অনাহূত অতিথিকে অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে বাড়ির কর্তা জিজ্ঞেস করল, 'এ তোমার কেমনধারা ব্যাপার ভালোমানুষের পো? মুখে একটা 'নমস্কার' বলা নেই, কিছু নেই—হুট করে ঢুকেই গেড়ে বসার মতলব?'

আগন্তুক ততক্ষণে গ্রেটকোট খুলে ফেলেছে গা থেকে। দরজার গোড়ায় সেটা ঝেড়ে বেশ সাবধানে দেয়ালের পেরেকে ঝোলাল। ছোট করে ছাঁটা পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হেসে বলল, 'লক্ষ্মী দাদা আমার, ভগবানের দোহাই, অপরাধ নিও না। যা দিনকাল পড়েছে, তাইতে ঠেকে শিখেছি: আগে

জামাকাপড় খোলো, তারপর জিগ্‌গেস কর রাতে থাকার জায়গা হবে কিনা। নইলে তোমাকে ঢুকতেই দেবে না। লোকজন আজকাল বড় অভদ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, অতিথ-বিতিথ দেখলে খুশি হয় না। . . .'

'আমরা তোমায় কোথায় শুতে দিই বল ত? দেখতেই পাচ্ছ জায়গার বড় অভাব,' এবারে আগের চেয়ে শান্ত ভাবে কর্তা বলল।

'কতটুকুনই বা জায়গার দরকার আমার? আমি এই দোরগোড়াতেই গুটিসুটি মেরে শুয়ে দিব্যি ঘুম দেবো।'

'তুমি কে গো বুড়ো কত্তা? বাস্তুহারা নাকি?' বাড়ীর কর্ত্রী জানতে চাইল।

'ঠিক বলেছ, বাস্তুহারাই বটে। বাস্তু হারিয়ে পালাতে পালাতে সেই সুমুদ্দুর অবধি চলে গিয়েছিলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে নাভিশ্বাস উঠে গেল ভাই, আর পারি নে। তাই ওখেন থেকে এখন গুটিগুটি ফিরে চলেছি বাড়ির পানে,' দোরগোড়ায় উটকো হয়ে বসে জবাবে বলে বাচাল বুড়ো।

'কিন্তু কে তুমি? কোথাকার লোক, তা ত বললে না?' বাড়ির কর্তা তার জেরা চালিয়ে যায়।

বুড়ো পকেট থেকে একটা বড় দরজির কাঁচি বার ক'রে হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে থাকে। ঠোঁটের কোনায় হাসিটা লেগেই থাকে। বলে, 'এই যে এই হল আমার বামুনের পৈতে। নোভোরসিইস্ক থেকে সারাটা পথ একাজ করতে করতেই আসছি। তবে আমার বাড়ি অনেক দূরে - ভিওশেনস্কায়া জেলা ছাড়িয়ে। সুমুদ্রের নোনা জল খেয়ে এখন সেখেনেই যাচ্ছি।'

আক্সিনিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে, 'আরে বুড়ো কত্তা, আমার বাড়িও যে ভিওশেনস্কায়া!'

'বল কি!' বুড়োর অবাক হওয়ার পালা। 'কোথায় দেশের মেয়ের দেখা পেলাম, বোঝ কাণ্ড! অবিশ্যি আজকের দিনে এতে আশ্চিয্যি হবারও কিছু নেই। আমরা এখন ইহুদীদের মতো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছি। কুবানেও এই একই ব্যাপার - কুকুরের পায়ে লাঠি ছুঁড়তে গেছ কি, একজন না একজন দন-কসাকের ওপরে গিয়ে পড়বে। সব জায়গায় গিজগিজ করছে - গুনে শেষ করা যায় না। আর মাটির তলায় কতজনের কবর হয়েছে - তা বোধ হয় আরও বেশি। এই পিছু হটাতে গিয়ে কত কিছুই যে দেখলাম, বুঝলে বাছারা! কী কষ্ট যে লোকে পাচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যায় না! পরশুদিন একটা ইস্টিশানে বসে আছি। আমার পাশে এক বড় ঘরের ভদ্রমহিলা। চোখে চশমা। চশমার ফাঁক দিয়ে নিজের গায়ের উকুন বাছছেন। সারা গায়ে পিলপিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে উকুন। নিজে দু' আঙুলে চিমটি কেটে তুলে আনছেন আর নিজেই চোখমুখ বিকৃত

করছেন – যেন যমটক কোন ফলে কামড় দিয়ে বসেছেন। ছোট ছোট বেচারি উকুনগুলোর একেকটাকে নখে নখে টিপে মারছেন আরও বেশি ক'রে চোখমুখ বিকৃত করছেন – যেন ভেতরের নাড়িভুঁড়ি উলটে আসছে – এতই বিশ্রী লাগছে তাঁর নিজের কাছে! অথচ দেখ, আরেকটা লোক, এত কঠিন প্রাণ যে জলজ্যান্ত একটা মানুষকে খুন করে ফেলবে, এতটুকু মুখ বিকৃত করবে না, বাঁকাবে না। এরকম এক ষণ্ডামার্ক লোক আমার সামনে, তিন তিনটে কাল্মিককে কুপিয়ে কেটে ফেলল, তারপর ঘোড়ার কেশরে তলোয়ারটা মুছে একটা সিগারেট বার করে ধরাল। সোজা ঘোড়া চালিয়ে আমার দিকে আসতে আসতে বললে, 'অমন হাঁ করে কী দেখছ বুড়ো কত্তা? তোমার মাথাটা কেটে ফেলি এই চাও নাকি?' আমি বললাম, 'বল কী। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাছা! আমার মাথাটা যদি কেটে ফেল তাহলে আমি চিবুব কী করে?' এই কথা শুনে লোকটা হো হো করে হেসে উঠল, চলে গেল।'

'যারা মানুষ খুন করে হাত পাকিয়েছে তাদের কাছে এ কাজ উকুন টিপে মারার চেয়ে সহজ। বিপ্লবের দিনে মানুষের জানটা শস্তা হয়ে গেছে,' বাড়ির কর্তা গুরুগম্ভীর ভাবে মন্তব্য করল।

'তা যা বলেছ!' অতিথি সায় দিল। 'মানুষ ত আর গোরুভেড়ার পাল নয়, সব কিছুতেই মানিয়ে নেয়। তাই আমি ওই মহিলাকে জিগ্গেস করলুম, 'আপনি কে বটেন? আপনার চেহারা দেখে ত সাধারণ ঘরের মহিলা বলে মনে হচ্ছে না!' আমার দিকে তাকিয়েই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'আমি মেজর জেনারেল গ্রেচিখিনের স্ত্রী।' মনে মনে ভাবলুম, 'জেনারেল বল, আর মেজরই বল, এখন ত তুমি একটা উকুনের ডিপো। ঘেয়ো কুকুরের মতো অবস্থা তোমার!' আমি তাঁকে বললুম, 'মাপ করবেন মাঠাকরুন, আপনি যদি এই ভাবে আপনার ওই পোকাগুলোকে একটা একটা ক'রে টিপে টিপে মারেন তাহলে এ জীবনে আর শেষ করতে পারবেন না। আপনার হাতের নখগুলো একটাও আস্ত থাকবে না। সবগুলোকে একসঙ্গে নিকেশ করুন!' 'সে কী করে হবে?' আমায় জিজ্ঞেস করলেন। আমি বুদ্ধি দিলাম: 'গায়ের জামাকাপড় খুলে একটা শক্ত জায়গার ওপর বিছিয়ে বোতল দিয়ে ডলা মারুন।' দেখি আমার জেনারেল-গিন্নি চটপট উঠে পড়ে সোজা চলে গেলেন পাম্পঘরের পেছনে। দেখি কি একটা সবুজ কাচের বোতল নিয়ে সেমিজের ওপর এদিক ওদিক ডলা মারছেন – এত চমৎকার যে দেখে মনে হয় বুঝি সারা জীবনই এই কাজ করে এসেছেন! ওঁর কেরামতি দেখে আমি মনে মনে তারিফ করি আর ভাবি: ভগবানের কি অপার মহিমে দেখ না! ওই বিড়বিড়ে পোকাগুলোকে খানদানী লোকজনের ওপরেও

লেলিয়ে দিয়েছেন। মতলবটা হল এই যে শুধু খেটে খাওয়া মানুষদেরই রক্ত চুষবে কেন ওদের মিষ্টি রক্তও একটু আধটু চুষে দেখুক।... ভগবান ত আর বোকা নন। নিজের কাজ ভালোই জানেন। কখন কখন মানুষের ওপর সদয় হয়ে এমন সুন্দর বিধিব্যবস্থা করে দেন যে তার চেয়ে ন্যায্য আর কিছুই হতে পারে না।...'

অনর্গল বকবক করে যায় বুড়ো দর্জিটা। যখন দেখে বাড়ির কর্তা গিন্নি খুব মন দিয়ে তার গল্প শুনছে তখন সে কৌশলে ইশারায় জানিয়ে দেয় যে মজার মজার আরও অনেক গল্প ঝুলি থেকে বার করতে পারত বটে, কিন্তু এখন তার বড় খিদে পেয়েছে আর তাইতে ঘুমও পাচ্ছে।

রাতের খাওয়াদাওয়ার পর মেঝেতে শোবার আয়োজন করতে করতে আক্সিনিয়াকে সে জিজ্ঞেস করল, 'তা হাঁ গো দেশের মেয়ে, আর কত দিন এখানে অতিথ হয়ে কাটাবে বলে ভাবছ?'

'বাড়ি যাবার উদ্‌যুগ করছি বুড়ো কত্তা।'

'তাহলে আর কি, একসঙ্গেই চল যাই। ফূর্তিতে পথ চলা যাবে।'

আক্সিনিয়া তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায়। পর দিন সকালে বাড়ির কর্তা-গিন্নির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধূ ধূ স্তেপপ্রান্তরের বুকে হারিয়ে যাওয়া নিরালা ছোট্ট গ্রাম নোভো-মিখাইলভ্‌স্কি ছেড়ে রওনা হল ওরা দু'জনে।

* * *

বারো দিনের দিন রাতের বেলায় ওরা এসে পৌঁছল মিলিউতিন্‌স্কায়া জেলা-সদরে। বলে কয়ে সেই রাতের মতো তারা বেশ সম্পন্ন গোছের এক বড় বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা ক'রে নিল। সকালে আক্সিনিয়ার সঙ্গীটি ঠিক করল আরও এক সপ্তাহ এই জায়গাতেই কাটিয়ে দেবে, বিশ্রাম নেবে। পাদুটো ঘষায় ঘষায় ছড়ে গেছে, তাও সারানো যাবে। আর চলার মতো অবস্থা তার নেই। বাড়িতে কিছু সেলাইয়ের কাজও জুটে গেল। পেশার কাজ করতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছিল বুড়ো। এবারে তা পেয়ে যেতে জানলার ধারে বেশ জুত ক'রে বসে দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমাজোড়া পরে কাঁচিখানা বার ক'রে চটপট একটা টুটোফাটা পোশাকের সেলাই খুলতে লাগল।

আক্সিনিয়াকে বিদায় দেওয়ার সময় ফূর্তিবাজ বাচাল বুড়ো ক্রুশচিহ্ন এঁকে তাকে আশীর্বাদ করে। হঠাৎই চোখ ছলছল ক'রে ওঠে বুড়োর। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চোখের জল মুছে ফেলে বরাবরের মতোই রসিকতা ক'রে বলে, 'গরজ বড়

বালাই – আপনজন না হলেও পরকে আপন করে দেয়। . . . এই ত দেখছ না, তোমাকে বিদায় দিতেও কেমন কষ্ট হচ্ছে! যাও, একাই চলে যাও বাছা। তোমার পথ দেখানোর লোক দুটো ঠ্যাঙই খোঁড়া হয়ে পড়ে রইল যে! পথে সাবু বার্লির মতো খাওয়া ত আর কম জোটে নি – তাইতে এই হাল। . . . তবু যাই বল না কেন, তোমার সঙ্গে হাঁটাও আমার কম হয় নি। আমার এই সত্তর বছর বয়সের পক্ষে একটু বেশিই বলতে হবে। যদি সুযোগ পাও তাহলে আমার বুড়িকে বোলো তার বকম বকম বুড়োটি বেঁচেবর্তে আছে। হামলদিস্তার হেঁচো খেয়েছে, ঢেঁকির পাড় খেয়েছে তবু প্রাণে বেঁচে আছে। পথ চলতে চলতে ভালোমানুষদের প্যান্ট সেলাই করছে। ঘরে কবে ফিরবে বলা যায় না। . . . তাকে একথাও বোলো, বোকা বুড়ো এখন আর পিছু হটছে না, বাড়ির দিকেই ফিরে আসছে। ফিরে আরাম করবে বলে মুখিয়ে আছে। . . .'

আরও কয়েকটা দিন আক্সিনিয়ার কেটে গেল পথে পথে। বকোভস্কায়া থেকে রাস্তায় গাড়ি ধরে সে তাতারস্কি এসে পৌঁছুল। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে এসেছে। বাড়ির আঙিনার ফটকটা হাট খোলা। ভেতরে ঢুকে এক নজর সে তাকাল মেলেখভদের বাড়ির দিকে। হঠাৎ কান্না ঠেলে উঠে ওর গলা বুজে এলো। . . . শূন্য রান্নাঘরটায় পোড়ো বাড়ির গন্ধ। সেখানে এসে এত দিনের জমে ওঠা তিক্ত মেয়েলী কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। পরে দনের ধারে জল আনতে গেল। উনুন ধরিয়ে টেবিলের ধারে বসল কোলের ওপর দু'হাত রেখে। গভীর চিন্তায় এমন ডুবে ছিল যে দরজা খোলার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজও ওর কানে যায় না। সম্বিৎ ফিরে পায় একমাত্র তখনই যখন ইলিনিচ্‌না ভেতরে ঢুকে অনুচ্চ স্বরে বলে, 'ভালো আছ ত পড়শি? বহুকালের মতো উধাও হয়ে গিয়েছিলে যে ভিনদেশে। . . .'

আক্সিনিয়া ভয়ে চমকে তার দিকে তাকাল, উঠে দাঁড়াল।

'অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? কিছু বলছ না যে? কোন খারাপ খবর আছে নাকি?' ইলিনিচ্‌না ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো, বেঞ্চির কিনারায় বসল। আক্সিনিয়ার মুখের ওপর থেকে তার কৌতূহলী দৃষ্টি আর সরে না।

'না, আমার কাছে আর কিসের খবর থাকবে? . . . আপনি আসবেন ভাবতেই পারি নি। নিজের চিন্তায় ডুবে ছিলাম। খেয়াল করি নি কখন আপনি এসে ঢুকলেন। . . .' হতভম্ব হয়ে আক্সিনিয়া বলল।

'ইস্ কী রোগা হয়ে গেছো! শরীরটা ত কোন রকমে টিকে আছে দেখছি!'

'টাইফাস্ জ্বরে ভুগে উঠলাম যে। . . .'

'আমাদের গ্রিগোরি . . . ওর খবর কী . . . কোথায় ওকে ছেড়ে এলে? বেঁচে আছে?'

আক্সিনিয়া সংক্ষেপে সব বলল। ইলিনিচ্না একটি কথাও না বলে ওর বৃত্তান্ত শুনে গেল। শেষকালে জিজ্ঞেস করল, 'ও যখন তোমাকে ছেড়ে গেল তখন কি ওর অসুখ ছিল?'

'না, অসুখ ছিল না।'

'তারপর আর কোন খবর পাও নি ওর?'

'না।'

ইলিনিচ্না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'যাক। তবু একটা সুখবর দিলে। ভালো হোক তোমার। এদিকে গাঁয়ে ওকে নিয়ে নানা গুজব চলছে। . . .'

'কী বলছে?' আক্সিনিয়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'সবই বাজে কথা আর কী। . . . সকলের কথায় কি আর কান দেওয়া যায়? গাঁয়ের লোকদের মধ্যে একমাত্র ইভান বেস্‌খ্লেব্‌নভ ফিরে এসেছে। গ্রিগোরিকে সে ইয়েকাতেরিনোদারে দেখেছে, অসুস্থ। আর সকলের সব কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।'

'কিন্তু কী বলছে তারা বুড়ি মা?'

'আমরা শুনেছি সিন্‌গিন গাঁয়ের কোন কসাক নাকি বলেছে নোভোরসিইস্ক শহরে লাল ফৌজের লোকেরা গ্রিগোরিকে কেটে ফেলেছে। আমি পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম সিন্‌গিন। হাজার হোক মায়ের প্রাণ ত, স্থির থাকতে পারলাম না। খুঁজে বার করলাম সেই কসাককে। অস্বীকার করলে সে। বলে ওরকম কিছু দেখে নি, শোনেও নি। এ ছাড়াও গুজব রটেছিল ওকে নাকি ওরা জেলখানায় রেখেছিল, সেখানেই টাইফাস জ্বরে ভুগে মারা গেছে। . . .'

ইলিনিচ্না চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ নিজের গাঁট ধরা ভারী হাতদুটো নিরীক্ষণ করতে থাকে। বয়সে বুড়ির মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, তবু মুখখানা প্রশান্ত। শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ছিল সে। কিন্তু আচমকা, কেমন যেন হঠাৎই তার রোদে পোড়া তামাটে গালের ঢিবিতে গাঢ় রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যায়, চোখের পাতা তিরতির ক'রে কাঁপতে থাকে। শুকনো চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে আক্সিনিয়ার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে ভাঙা গলায় সে বলে ওঠে, 'আমি বিশ্বাস করি না। আমার শেষ ছেলেটাকেও হারিয়েছি এ হতেই পারে না। কোন্ অপরাধে ভগবান আমায় শাস্তি দেবেন? . . . আর ক'দিনই বা আমি বাঁচব? শোক তাপ ত অমনিতেই কানায় কানায় ভরে উপছে পড়ছে . . . আর কত। . . .

বেঁচে আছে, গ্রিশা বেঁচে আছে। আমার মন যখন বলছে তখন বেঁচে আছে আমার খোকা।'

আক্সিনিয়া কোন কথা না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

রান্নাঘরে নেমে এলো দীর্ঘ নীরবতা। হঠাৎ কখন দম্‌কা হাওয়ায় বারান্দার দরজাটা হাট খুলে গেল, শোনা যেতে লাগল দনের ওপারে পপ্‌লার বনের ভেতরে বসন্তের বরফগলা জলের চাপা গর্জন, বন্যার জলের ওপর বুনো হাঁসদের আর্তকণ্ঠের ডাকাডাকি।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আক্সিনিয়া চুল্লির গায়ে হেলান দেয়।

'দুঃখ করবেন না বুড়ি মা,' মৃদুস্বরে সে বলে। 'রোগের সাধ্যি কি ওর মতো একজন মানুষকে কাবু করে? লোহার মতো শক্ত সে। অমন লোক মরে না। কনকনে হিমের মধ্যে সারাটা রাস্তা দস্তানা ছাড়া চলেছে। . . .'

'ছেলেপুলেদের কথা বলত?' ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে ইলিনিচ্‌না।

'বলত, আপনার কথাও বলত। ভালো আছে ত ওরা?'

'ভালোই আছে ওরা। ওদের আর কী হবে? কিন্তু পান্তেলেই প্রকোফিয়েভিচ মারা গেছে পিছু হটার সময়। আমরা এখন একা। . . .'

আক্সিনিয়া ক্রুশপ্রণাম করল। বুড়ি যে রকম শান্ত ভাবে স্বামীর মৃত্যুসংবাদটা দিল তাতে ও মনে মনে অবাক হয়ে গেল।

টেবিলে হাতের ভর দিয়ে বেশ কষ্ট করে ইলিনিচ্‌না উঠে দাঁড়াল।

'ওঃ তোমার এখানে যে কতক্ষণ বসে ছিলাম সে খেয়ালই ছিল না। ওদিকে বাইরে বেশ রাত হয়ে এলো যে।'

'তা বসুন না।'

'নাঃ বাড়িতে আবার দুনিয়াশ্‌কা একা রয়েছে। যেতেই হয়।' মাথার ওড়নাটা ঠিক করতে করতে রান্নাঘরের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভুরু কুঁচকে সে বলে, 'তোমার চুলো থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠছে যে। যখন চলে গেলে তখন কাউকে বাড়িতে বসিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা, চলি।' এরপর দরজার কড়ায় হাত দিয়ে পিছন ফিরে না তাকিয়েই বলে ওঠে, 'বাড়িতে একটু গুছিয়ে বসার পর একবার আমাদের এখানে এসে দেখে যেয়ো। গ্রিগোরির কোন খবর-টবর পেলে দিও।'

সেই দিন থেকে মেলেখভদের বাড়ির সঙ্গে আক্সিনিয়ার সম্পর্ক একেবারে পালটে গেল। গ্রিগোরির জীবনের জন্য উৎকণ্ঠা যেন ওদের ঘনিষ্ঠ করে তুলল, ওদের মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে তুলল। পর দিন সকালে আক্সিনিয়াকে উঠোনে দেখতে পেয়ে দুনিয়াশ্‌কা তাকে ডাকল। বেড়ার ধারে এসে আক্সিনিয়ার রোগা

কাঁধে হাত রেখে তাকে জড়িয়ে ধরল, তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি সরল হাসি হাসল।

'ইস, কী রোগা হয়ে গেছো গো! শুধু হাড় ক'খানাই সার দেখছি!'

'যা জীবনটা কেটেছে তাতে রোগা না হয়ে আর কী উপায়!' উত্তরে আক্সিনিয়াও হাসে। ওর পূর্ণ বিকশিত সুন্দর কুমারী মুখটা নিরীক্ষণ করতে করতে ভেতরে ভেতরে একটা ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে।

কেন যেন গলার স্বরটা নামিয়ে দুনিয়াশ্‌কা জিজ্ঞেস করে, 'কাল কি মা তোমার কাছে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ঠিকই ভেবেছিলাম, তোমার কাছে গেছে। গ্রিশার কথা জিগ্‌গেস করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কান্নাকাটি করে নি?'

'না। বুড়ো হলে কী হবে, বেশ শক্ত আছে কিন্তু।'

আস্থাভরে আক্সিনিয়ার দিকে তাকিয়ে দুনিয়াশ্‌কা বলে, 'একটু কান্নাকাটি করতে পারলে বরং ভালো হত, মনটা হাল্‌কা হয়ে যেত।... জান আক্সিনিয়া, এই শীতকালের পর থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। আগের মতো আর নেই। বাবার কথা যখন শুনল, আমি ত ভাবলাম বুঝি একেবারে ভেঙে পড়বে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল পড়ল না। শুধু বলল, 'ওর আত্মার শান্তি হোক। সব দুঃখের শান্তি হল ওর।' সন্ধে পর্যন্ত কারও সঙ্গে একটি কথাও বলল না। আমি কত রকম ভাবে এটা ওটা বলে ওকে বোঝাতে গেলাম, কিন্তু শুধু হাত নেড়ে আমাকে সরিয়ে দেয়, চুপ করে থাকে। সে যে কী চিন্তা আমার। সন্ধেবেলায় গোরুবাছুরগুলোকে তুলে বাইরের উঠোন থেকে ভেতরে ঢুকে আমি জিগ্‌গেস করলাম, 'রাতের খাবার কি কিছু রান্না করব মা?' ততক্ষণে মনটা একটু শান্ত হয়ে এসেছে, কথা বলতে শুরু করল।...' দুনিয়াশ্‌কা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আক্সিনিয়ার কাঁধের ওপর দিয়ে কোথায় যেন উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের গ্রিগোরি কি মারা গেছে? লোকে যা বলছে ঠিকই নাকি?'

'জানি নে ভাই।'

আড়চোখে সন্ধানী দৃষ্টিতে দুনিয়াশ্‌কা তাকায় আক্সিনিয়ার দিকে। আরও গভীর নিঃশ্বাস ফেলে।

'ওর কথা ভেবে ভেবে মা'র আমার কী আকুলি-ব্যাকুলি! ওকে যে 'আমার ছোট খোকা' ছাড়া আর কোন নামেই ডাকে না! কিছুতেই মানতে চায় না যে ও বেঁচে নেই। জান ভাই আক্সিনিয়া, মা যদি জানতে পারে, সত্যি সত্যি ও

মারা গেছে তা হলে শোকে নিজেই মারা যাবে। জীবন বলতে ওর যা ছিল সবই ত গেছে, একমাত্র যা নিয়ে বেঁচে আছে তা হল ওই গ্রিগোরির চিন্তা। নাতি-নাতনিদের ওপরেও তেমন যেন টান আর দেখা যায় না। কাজ করতে গিয়ে হাত চলে না। একবার ভেবে দেখ, এক বছরের মধ্যে আমাদের পরিবারের চার চারটে লোক চলে গেল। . . .'

সমবেদনায় বিচলিত হয়ে আক্সিনিয়া বেড়ার ওপাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে দুনিয়াশ্‌কাকে জড়িয়ে ধরে, ওর গালে সজোরে চুমু খায়।

'তোমার মাকে কাজেকর্মে ব্যস্ত রেখে দিও লক্ষ্মীটি, বেশি দুঃখ করার অবসর দিও না।'

'কিসে ব্যস্ত রাখব বল?' ওড়নার খুঁটে চোখ মোছে দুনিয়াশ্‌কা। অনুনয়ের সুরে বলে, 'আমাদের ঘরে একবার এসো। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ, তাতে হয়ত হালকা হবে ওর মনটা। আমাদের সঙ্গে লুকোচুরির কোন দরকার নেই তোমার!'

'যাব এক সময়। অবিশ্যিই যাব!'

'কাল আমি মাঠে যাব। আনিকুশ্‌কার বিধবা বৌয়ের সঙ্গে মিলেছি। বিঘে কয়েক গম বোনার ইচ্ছে আছে আমাদের। তুমি তোমার নিজের জন্যে কিছু বোনার কথা ভাবছ কি?'

'আচ্ছা গম বোনার লোক ঠাউরেছ যা হোক!' নিরানন্দ হাসি হাসে আক্সিনিয়া। 'বোনার আছে কী আমার? তাছাড়া বুনতে যাবই বা কেন? একা মানুষ - কতটুকু আর দরকার? চালিয়ে নেব কোন রকমে।'

'তোমার স্তেপানের কোন খবর আছে?'

'কোন খবর নেই,' উদাসীন ভাবে আক্সিনিয়া জবাব দেয়। 'ওর জন্যে আমার তেমন মাথাব্যথাও নেই।' নিজের উত্তরটা নিজের কাছেই বেখাপ্পা মনে হয় তার। মনের কথা এই ভাবে নিজের অজানতে মুখ ফসকে বেরিয়ে আসায় সে অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। বিব্রত ভাবটাকে চাপা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আচ্ছা চলি ভাই। ঘরদোর গোছগাছ করার কাজ পড়ে আছে।'

আক্সিনিয়ার অপ্রস্তুত ভাবটা যেন লক্ষই করে নি এরকম ভান করে অন্য দিকে তাকিয়ে দুনিয়াশ্‌কা বলে, 'একটু সবুর কর। বলছিলাম কি তুমি আমাদের সঙ্গে কাজে একটু হাত লাগাও না। মাটি শুকিয়ে খটি হয়ে যাচ্ছে, ভয় হয় শেষ অবধি সামলাতে পারব না। এদিকে গাঁয়ে পুরুষমানুষ বলতে আছে মাত্র দু'জন - তারাও আবার অথর্ব।'

আক্সিনিয়া সাগ্রহে রাজী হয়ে যায়। দুনিয়াশ্‌কাও খুশি হয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে মাঠে যাবার তোড়জোর করতে থাকে।

মাঠের কাজে বের হওয়ার জন্য সারা দিন খুব করে তৈরি হতে থাকে দুনিয়াশ্‌কা। আনিকুশ্‌কার বিধবা বৌয়ের সাহায্যে বোনার বীজ আলাদা ক'রে রাখল, মইটাকে খানিকটা ঠিকঠাক করল, গাড়ির চাকায় তেল দিল, বীজ বোনার যন্ত্রটা মেরামত করল। সন্ধ্যাবেলায় কিছু ঝাড়াই গম ওড়নায় তুলে নিয়ে কবরখানায় গিয়ে পেত্রো, নাতালিয়া আর দারিয়ার কবরের ওপর ছড়িয়ে দিল, যাতে পর দিন সকালে প্রিয়জনদের ওই কবরগুলোর কাছে পাখিরা উড়ে আসে। ওর মনে শিশুর মতো সরল এমন একটা বিশ্বাস ছিল যে মৃত পরিজনেরা পাখিদের খুশির কলতান শুনতে পাবে, শুনে খুশি হবে।

* * *

শুধু ভোরের আগে আগে দন পারের মাটিতে নেমে এসেছিল নিস্তব্ধতা। পপ্‌লারের হালকা সবুজ গুঁড়িগুলো ধুইয়ে, ওকের ঝাড় আর কচি ঝাউগাছগুলোর ডুবু ডুবু মাথা সমান তালে দুলিয়ে দিয়ে থৈ থৈ বনের ভেতরে চাপা কলকল শব্দে জল ছুটে চলেছে। ঝিলের ভরা জলে স্রোতের টানে কাশের ঝাঁকড়া মাথাগুলো সরসর আওয়াজ তুলে ঝুঁকে পড়ছে। সুদূর খাঁড়ির অথৈ বিস্তারের মধ্যে, যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বসন্তের বরফগলা জলরাশি। তারাভরা আকাশের আলো-আঁধারি ছায়া পড়েছে তার বুকে। সেখানে মৃদু ডাকাডাকি করছে বালিহাঁসের দল, ঘুমজড়ানো শিস দিচ্ছে পাতি হাঁসেরা। কদাচিৎ শোনা যায় বাসাবদলকারী যে-সমস্ত রাজহাঁস খোলা জলের বুকে রাত কাটাচ্ছে, রুপোলি তূরীর আওয়াজের মতো তাদের সুমধুর কলতান। কখন কখন অন্ধকারের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে স্বচ্ছন্দ জলবিহারে পরিপুষ্ট দুটো-একটা মাছ। সোনালি ঝিলিমিলি ছড়ানো জলের বুকে ঝিরিঝিরি তরঙ্গ উঠে অনেক দূর গড়িয়ে চলে যায়। সচকিত পাখিদের সতর্ক কলধ্বনি শোনা যায়। পরক্ষণেই আবার নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায় দনের উপকূল। কিন্তু ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যেই পাহাড়ের খড়িমাটির শিরাগুলোতে ফিকে গোলাপী আভা ধরে অমনি মাঠের বুক থেকে একটা হাওয়া ওঠে। স্রোতের উলটো দিকে বয় প্রচণ্ড জোরাল আর ভারী সেই হাওয়া। দনের বুকে ফুঁসে ওঠে কয়েক হাত সমান উঁচু এককেটা ঢেউ। বনের ভেতরে কলকলধ্বনি তুলে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে চলে বানের জল। গাছপালা তার ধাক্কায় এদিক ওদিক দুলছে, আর্তনাদ তুলছে। সারা দিন গর্জাতে থাকে বাতাস, শান্ত হয় গভীর রাতে। বেশ কয়েক দিন ধরে চলে এমনি আবহাওয়া।

স্তেপের মাঠের ওপর ঝুলে আছে লাল-বেগনী রঙের ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াসার

একটা পর্দা। মাটি টান ধরে শুকিয়ে যাচ্ছে, ঘাসের বাড় বন্ধ হয়ে গেছে, চষা জমিতে ফাটল ধরছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাতাসে টেনে উঠছে মাটি। এদিকে তাতারস্কি গ্রামের ফসলী জমিতে প্রায় কোন জনপ্রাণীর দেখা নেই। সারা গ্রামে রয়ে গেছে জনা কয়েক স্থবির বৃদ্ধ। পিছু হটার আশা ছেড়ে যারা ফিরে এসেছে তারা কেউ কাজের উপযুক্ত নয়। বরফে ঠাণ্ডায় তাদের কারও কারও হাত পা খেয়ে গেছে, কেউ বা অসুস্থ। ক্ষেতে কাজ করছে শুধু মেয়েরা আর বাচ্চা ছেলেরা। নির্জন গ্রামের ওপর দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বাতাস ছুটছে। বাড়ির জানলা দরজার খড়খড়ি দুমদাম খোলাবন্ধ হচ্ছে, চালার ওপরের খড়ের গাদা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বুড়োরা বলাবলি করে, 'এবছর আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। মাঠে কাজ করছে শুধু মেয়েরা, তাও আবার তিন বাড়ির মধ্যে এক বাড়ির ফসল বোনা হচ্ছে। বীজ ছাড়া মরা জমিতে ত আর ফসল জন্মাবে না।...'

বাড়ি ছেড়ে মাঠে কাজ করতে বেরিয়ে পরের দিন সূর্যাস্তের আগে আগে আক্সিনিয়া বলদগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে গেল পুকুরের ধারে। বাঁধানো পারের কাছে পিঠে জিন-বাঁধা একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল অবনিজভের দশ বছরের ছেলেটা। ঘোড়াটা ঠোঁট নাড়িয়ে মুখের লেগে থাকা জল চাটছে। ওর মখমলের মতো নরম ধূসর মুখ বয়ে জল গড়াচ্ছে। সওয়ার এদিকে মাটিতে দাঁড়িয়ে দলা দলা শুকনো কাদা তুলে পুকুরের জলে ছুঁড়ছে। ছোট ছোট ঢেউ গোল হয়ে সমানে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাই দেখে মজা পাচ্ছে।

'তুই কোথায় চললি রে ভানিয়াত্‌কা?' আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

'মা'র জন্যে খাবার এনেছিলাম।'

'গাঁয়ের কোন নতুন খবর আছে?'

'না সেরকম কিছু নেই। গেরাসিম দাদু কাল রাতে ইয়া বড় এক কাতলা মাছ ধরেছে ঝাঁকি জাল দিয়ে। আর ফিওদর দাদু পিছু হটতে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে।'

ডিঙ মেরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটা ঘোড়ার মুখে লাগাম আঁটল। ঘাড়ের কেশরের গোছা আঁকড়ে ধরে আশ্চর্য চটপট লাফিয়ে জিনে উঠে বসল। একজন বিচক্ষণ কর্তাগোছের লোকের মতো পুকুরপার থেকে ঘোড়াটা কদমচালে চালাল। কিন্তু খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আক্সিনিয়ার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে এত জোরে ঘোড়া হাঁকাল যে তার রঙজ্বলা নীল জামাটা পিঠের ওপর বুদ্বুদের মতো ফুলে উঠল।

বলদগুলো জল খেতে থাকে। আক্সিনিয়া ততক্ষণে বাঁধানো পারের ওপর শরীরটা ছেড়ে দিয়ে একটু শুয়ে রইল। তারপর ঠিক করল গ্রামে ফিরে যাবে।

মেল্‌নিকভ পল্টনের সেপাই। গ্রিগোরির কোন খবর ও নিশ্চয়ই জানে। বলদগুলোকে ক্ষেতের চালায় নিয়ে এলো আক্সিনিয়া। দুনিয়াশ্‌কাকে বলল, 'একটু গাঁয়ে ফিরতে হচ্ছে। কাল খুব ভোরে আসব।'

'কোন কাজ আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

আক্সিনিয়া ফিরল পর দিন সকালে। বলদগুলোকে জোয়ালে জুতছিল দুনিয়াশ্‌কা। নিশ্চিন্তমনেই একটা শুকনো ডাল হাতে নাড়াতে নাড়াতে আক্সিনিয়া এগিয়ে এলো। অবশ্য ভুরু ওর কোঁচকানো, ঠোঁটের কোনায় বেদনার রেখা ফুটে উঠেছে।

'ফিওদর মেল্‌নিকভ ফিরে এসেছে। গাঁয়ে গিয়ে আমি ওকে জিগ্‌গেস করেছিলাম গ্রিগোরির খবর। কিছুই জানে না,' সংক্ষেপে এই কথা বলে চট ক'রে পিছন ফিরে চলে গেল বীজ বোনার যন্ত্রটার দিকে।

মাঠে বোনার কাজ শেষ হয়ে গেলে আক্সিনিয়া তার ঘর গেরস্থালির কাজে মন দিল। তরমুজ ক্ষেতে তরমুজ লাগাল। কাদার পলেস্তারা লাগিয়ে চুনকাম করে বাড়িটা ঠিকঠাক করল। নিজে যতখানি পারে, যেটুকু খড় বেঁচে ছিল তাই দিয়ে চালাঘরের ছাদ ছেয়ে দিল। কাজের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কেটে যায়। কিন্তু গ্রিগোরির প্রাণের কথা ভেবে উদ্বেগ এক মুহূর্তের জন্যও ওর মন থেকে দূর হয় না। স্তেপানের কথা আক্সিনিয়া ভাবতে চায় না। ওর কেন যেন মনে হয় স্তেপান আর ফিরবে না। কিন্তু যখন কোন কসাক গ্রামে ফেরে তখন প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার স্তেপানকে দেখেছ?' তারপর অবশ্য সাবধানে অল্প অল্প ক'রে জিজ্ঞেসবাদ ক'রে গ্রিগোরির খবর জানার চেষ্টা করে। ওদের সম্পর্কের কথা গ্রামের কারোই জানতে বাকি নেই। এমন কি পরনিন্দা-পরচর্চায় যে সব মেয়ের মহা উৎসাহ তারা পর্যন্ত ওদের নিয়ে আর কোন গালগল্প করে না। তবু নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে আক্সিনিয়া লজ্জা পায়। শুধু কদাচিৎ, যখন বাক্যব্যয়ে কুণ্ঠিত কোন কসাক সেপাই গ্রিগোরির উল্লেখমাত্র করে না তখন চোখদুটো কুঁচকে বেশ খানিকটা বিব্রত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, আমাদের পড়শী গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? ওঁর মা'র বড় চিন্তা। চিন্তায় চিন্তায় একেবারে শুকিয়ে গেলেন। . . .'

দন ফৌজ নোভোরসিইস্কে আত্মসমর্পণ করার পর গ্রামের কোন কসাক গ্রিগোরি বা স্তেপান কাউকেই দেখে নি। শুধু জুনের শেষে স্তেপানের পল্টনের এক সঙ্গী, কলুন্দায়েভ্‌স্কি গ্রামের একজন কসাক দন পেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আক্সিনিয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে-ই ওকে জানাল স্তেপানের খবর।

'স্তেপান ক্রিমিয়ায় চলে গেছে। সত্যি কথাই বলছি তোমাকে। আমি নিজে

ওকে দেখেছি জাহাজে উঠতে। কথা বলার সুযোগ হয় নি ওর সঙ্গে। এত ভিড় ছিল যে ওর কাছে পৌঁছুতে গেলে লোকের মাথার ওপর দিয়ে হাঁটতে হয়।' গ্রিগোরির কথা জানতে চাইলে এড়িয়ে যাবার মতো করে জবাব দিল, 'জাহাজঘাটায় দেখেছিলাম। ধরাচূড়া পরাই ছিল। কিন্তু পরে আর কোন পাত্তা পাই নি। বন্ধু অফিসারকে ধরে মস্কোয় পাঠিয়েছে। কে জানে ও এখন কোথায়? . . .'

এর এক সপ্তাহ পরে তাতারস্কিতে আবির্ভাব ঘটল আহত প্রোখর জিকভের। মিয়েরোভো স্টেশন থেকে স্থানীয় একটা ঘোড়ার গাড়ি ওকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। একথা শোনামাত্র আক্সিনিয়া দুধ দোয়া বন্ধ করে বাছুরটা গাইয়ের কাছে ছেড়ে দিল। চলতে চলতেই মাথায় ওড়না জড়িয়ে নিল, চটপট পা চালাল। এক রকম ছুটই দিল জিকভদের বাড়ির দিকে। পথ চলতে চলতে ভাবে, 'যা জানার প্রোখরই জানে। ও নিশ্চয়ই জানে! কিন্তু কী হবে, যদি বলে গ্রিশা বেঁচে নেই? আমি তা হলে কী করব?' যত ভাবে ততই চলার বেগ কমে আসে। খারাপ সংবাদটা শুনতে হবে এই আতঙ্কে বুকে হাত চেপে ধরে।

প্রোখরের কাটা বাঁ হাতখানা একটা বেঁড়ে টুকরোর মতো। আক্সিনিয়াকে দেখামাত্র একগাল হেসে সেটা সে পেছনে লুকিয়ে ফেলল। ভেতরের বড় ঘরে ওকে ডাকল।

'নমস্কার পল্টনের সাথী! বড় খুশি হলাম তোমায় দেখে। আমরা ত ধরে নিয়েছিলাম ওই গাঁয়েই বোধ হয় তুমি পটল তুললে। ওঃ কী ভারী অসুখেই না পড়েছিলে! . . . কেমন রোগের পাল্লায় পড়েছিলে? লোকের চেহারা-ছবি যা হয় দেখবার মতো! এদিকে সাদা পোলগুলো আমার কী হাল ক'রে ছেড়েছে দেখ। হারামজাদার দল!' প্রোখর ওর খাকী ফৌজী শার্টের গিঁট বাঁধা শূন্য হাতাটা দেখায়। 'বৌ ত দেখেই কেঁদে কেটে একাকার। আমি ওকে বলি, 'ওরে বোকা, অমন চেঁচাস নে। অন্য কত জনের মাথা কাটা গেছে, তাতেও কোন বিকার নেই। আর হাত – সে আর এমন কী! এখুনি কাঠের একখানা লাগিয়ে নেওয়া যাবে। তাছাড়া ওটাতে অন্তত ঠাণ্ডা লাগার কোন ভয় নেই, কাটলেও রক্ত পড়বে না।' একমাত্র অসুবিধে বুঝলে কিনা ভাই, এখনও এক হাতে সব কাজ ঠিক মতো করে উঠতে শিখি নি। প্যান্টের বোতাম লাগাতে পারি না – বোকা কাণ্ড! সেই কিয়েভ থেকে বাড়ি অবধি ঝাঁপ খোলা অবস্থাতেই এলাম। কী লজ্জার কথা। তাই বলি কি উলটো-পালটা সে রকম কিছু যদি আমার দেখ তাহলে কিছু মনে কোরো না। . . . এসো, ভেতরে এসো। বোসো। অতিথ বলে কথা! বৌ এখন ঘরে নেই। ততক্ষণ দুটো গল্পগাছা করা যাক। আবাগীর বেটিকে একটু চোলাই মাল আনতে পাঠিয়েছি। সোয়ামী ঘরে ফিরল ঠুঁটো হাত নিয়ে, এদিকে

খাতির-যত্ন করার মতো কিছুই নেই ঘরে। কর্তারা ঘরে না থাকলে তোমরা সব মেয়েমানুষই সমান। তোমাদের মতো মিনমিনে শয়তানগুলোকে সব জানা আছে আমার হাড়ে হাড়ে।'

'তুমি আমায় অন্তত বল না . . .'

'জানি, জানি! বলছি! প্রথমে তোমাকে নমস্কার জানাতে বলেছে, এই এমনি করে . . .' প্রোখর ঠাট্টা ক'রে মাথা নীচু করল। তারপর মাথাটা তুলে অবাক হয়ে ভুরুজোড়া উঁচিয়ে বলল, 'এই রে! অমন কাঁদছ কেন বোকার মতো? মেয়েমানুষ জাতটাই কেমন যেন গোলমেলে। যদি খবর এলো মারা গেছে তাতে কান্না, আবার যদি জ্যান্ত থাকে তাতেও কান্না। মোছ মোছ, চোখ মোছ! একেবারে ভাসিয়ে দিলে যে! বললাম না বেঁচেবর্তে আছে! মুখখানা ত জৌলুসে ফেটে পড়ছে! হল? নোভোরসিইস্কে আমরা একসঙ্গে কমরেড বুদিওন্নির ঘোড়সওয়ার ফৌজে, চৌদ্দ নম্বর ডিভিশনে ঢুকেছিলাম। আমাদের গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ একটা ঘোড়সওয়ার দলের, মানে গোটা একটা স্কোয়াড্রনের ভার পেয়ে গেল। আমিও অবিশ্যি তার সাথী হয়ে চললাম। মার্চ করতে করতে চলে গেলাম একেবারে কিয়েভের কাছাকাছি। ওঃ আর বোলো না ভাই ওই সাদা পোলগুলোকে যা একচোট দিলাম! যাবার পথে গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ আমায় বলেছিল, 'বন্ধু জার্মান কেটেছি, হরেক অস্ট্রিয়ানদের ওপরও তলোয়ারের ধার পরখ করে দেখেছি। পোলদের মাথার খুলি ওদের চেয়েও শক্ত নাকি? আমার ত মনে হয় আমাদের নিজেদের যে বুশীগুলো আছে তাদের চেয়েও সহজ হবে ওদের ওপর কোপ মারা। তোমার কী মনে হয়?' এই বলে আমার দিকে চোখ টিপে দাঁত বার করে হাসে। লাল ফৌজে ঢুকে ভোল পাল্টে গেছে তার। এখন বেজায় হাসিখুশি, খাসী করা ঘোড়ার মতো চেকনাই দিচ্ছে। অবিশ্যি পারিবারিক ঝগড়াঝাঁটি আমাদের দু'জনের মধ্যে হত না এমন নয়। . . . একদিন ঘোড়ায় চড়ে অনেক পথ চলতে চলতে ওর কাছে এগিয়ে এসে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলাম, 'এখানে একটু থেকে জিরিয়ে নিলে হত না হুজুর – মানে, কমরেড মেলেখভ!' চোখ পাকিয়ে সে যা কটমট ক'রে তাকাল আমার দিকে! বলল, 'তোমার ওসব তামাসা ছাড় বলছি! নইলে খারাপ হয়ে যাবে।' সেদিনই সন্ধেবেলাই কী একটা কাজের জন্য যেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমার মাথায় আবার কী যে শয়তান ভর করল – মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো 'হুজুর . . .' আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে হাত পড়ে গেল মাউজার পিস্তলে! মুখখানা ওর একেবারে ফেকাসে হয়ে গেল। দাঁতগুলো বেরিয়ে গেল নেকড়ের মতো – আর দাঁত ত ওর পাটি ভর্তি - শতখানেকের কম হবে না। আমিও টুক ক'রে ঘোড়ার পেটে পা দাবড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁকিয়ে সেখান

থেকে পিঠটান। আরেকটু হলে আমাকে মেরেই ফেলত। শয়তান আর কাকে বলে!'

'তাহলে হয়ত ছুটি নিয়ে...' আমতা আমতা করতে থাকে আক্সিনিয়া।

'অমন কথাও ভেবো না!' প্রোখর ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে। 'ও বলছে এতকাল যে পাপ করেছে যত দিন না তার প্রায়শ্চিত্তি হচ্ছে তত দিন কাজ চালিয়ে যাবে পল্টনে। আর তা ও করবেও। বোকার গোঁয়ার্তুমি ত - এর মধ্যে কোন কারসাজি নেই।... একটা শহরতলি মতো জায়গায় ও আমাদের টেনে নিয়ে গেল হামলায়। আমার চোখের সামনে চারটে উলান সেপাইকে কেটে শেষ করে দিল। শালা হারামজাদা যে সেই ছোটবেলা থেকেই ন্যাটা। তাই দু'ধার থেকেই ওদের ঠিক নাগাল পায়।... লড়াইয়ের পর বুদিওন্নি নিজে সেপাইদের সারির সামনে এসে ওর হাতে হাত মেলাল। ও আর স্কোয়াড্রনের সকলেও প্রশংসা পেল। কী কাণ্ডই না করে বেড়াচ্ছে তোমার পান্তেলেয়েভিচ!'

আক্সিনিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেল কথাগুলো।... মেলেখভদের উঠোনের কাছে যখন এলো একমাত্র তখনই ওর সংবিৎ ফিরে এলো। বাইরের বারান্দায় দুনিয়াশ্‌কা দুধ ছাঁকছিল। মাথা না তুলেই সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সাঁজা চাইতে এসেছ? ওই দেখ, আমি নিজে নিয়ে যাব বলে কথা দিয়েছিলাম - ভুলে বসে আছি।' কিন্তু আক্সিনিয়ার দিকে নজর পড়তে খুশিতে ডগমগ জলভরা চোখ দেখে আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না দুনিয়াশ্‌কার। কোন কথার দরকার হল না।

দুনিয়াশ্‌কার কাঁধে নিজের তপ্ত মুখখানা চেপে আনন্দে হাঁপাতে হাঁপাতে আক্সিনিয়া ফিসফিসিয়ে বলল, 'বেঁচে আছে, বেঁচে আছে! ভালো আছে!... সবাইকে নমস্কার আর ভালোবাসা জানিয়েছে।... যা! মা'কে গিয়ে বল্‌!'

দুই

যে-সমস্ত কসাক পিছু হটছিল তাদের মধ্যে গরমকাল নাগাদ জনা তিরিশেক ফিরে এলো তাতারস্কি গ্রামে। বেশির ভাগই বুড়ো আর বেশি বয়স্ক রিজার্ভ সেপাই। কিছু অসুস্থ আর আহতের কথা বাদ দিলে জোয়ান আর মাঝবয়সী কসাক বলতে গ্রামে প্রায় কেউ নেই। তাদের একটা অংশ রেড আর্মিতে, বাকিরা সব ভ্রাঙেলের রেজিমেন্টে নাম লিখিয়েছিল। এখন ক্রিমিয়ায় বসে বসে দিন গুনছে, দনের দিকে নতুন অভিযান চালানোর পাঁয়তাড়া কষছে।

পিছু-হটাদের একটা বেশ বড় অংশ চিরকালের জন্য রয়ে গেল ভিনদেশের

মাটিতে; কেউ টাইফাস জ্বরজ্বারিতে মারা গেছে, কেউ বা কুবানের তীরে শেষ সংঘর্ষে মৃত্যুশয্যা নিয়েছে। কিছু লোক দলছুট হয়ে পথ হারিয়ে মানিচের ওপারে স্তেপের মাঠে ঠাণ্ডায় জমে মারা গেছে। দু'জন লাল-সবুজদের হাতে বন্দী হয়েছিল। তাদের কোন খোঁজ খবর নেই। অনেক কসাককেই হারিয়েছে তাতারস্কি। মেয়েরা আশঙ্কায় উদ্বেগে, আশায়-আশায় পথ চেয়ে দিনপাত করে। রোজ সন্ধ্যায় চরানোর মাঠ থেকে গোরুর পাল ফিরিয়ে আনতে গিয়ে তারা হাত দিয়ে চোখের ওপরকার রোদ আড়াল ক'রে চেয়ে থাকে দূরের পানে। কে বলতে পারে সন্ধ্যার ওই বেগনী রঙের ঝাপ্‌সা পর্দায় ঢাকা বড় রাস্তা ধরে দেরিতে ফেরা কোন পথিক দেখা দিল কিনা?

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যদি কোন বাড়ির কর্তা উকুনে বোঝাই হয়ে, ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড় গায়ে, হাড়জিরজিরে শরীর নিয়ে ঘরে ফিরল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে আনন্দের ধুম আর হুলস্থুল পড়ে যায়। সেপাইয়ের নোংরা কালো শরীর ধোয়ার জন্য জল গরম করা হয়, বাপের সেবা করার জন্য বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারা তাদের বাপের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ করে - কখন কী চায় সেদিকে সতর্ক নজর রাখে। বাড়ির গিন্নি আহ্লাদে আটখানা; কখনও টেবিল সাজাতে ছোটে, কখনও বা ছোটে তোরঙ্গ থেকে স্বামীর জন্য পরিষ্কার কাপড়জামা বার করে আনতে। এদিকে এমনই কপাল যে কাপড়জামাগুলোর ছেঁড়া জায়গা রিফু করা নেই। হাতের আঙুলগুলোও কাঁপছে, ছুঁচের ফুটোয় সুতো কিছুতেই গলানো যাচ্ছে না। . . . বাড়ির যে পাহারাদার কুকুরটা দূর থেকে মনিবকে দেখে চিনতে পেরে দোড়গোড়া অবধি ছুটে এসে মনিবের হাত চাটছিল, এই সুখের মুহূর্তে তাকেও ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। এমনকি বাচ্চারা থালা গেলাস ভাঙলে বা দুধ উলটে ফেলে দিলেও রেহাই পেয়ে যায়। তাদের কোন অপরাধেই সাজা হয় না। . . . কর্তা হয়ত তখনও চানের পর জামাকাপড় পরার অবকাশ পায় নি, কিন্তু এর মধ্যে পাড়ার মেয়েদের ভিড়ে ঘর ভরে গেছে। সবাই খোঁজ নিতে আসে তাদের প্রিয়জনদের। তাদের মনে ভয়। হাঁ করে তারা গিলতে থাকে সেপাইয়ের প্রতিটি কথা। কিছুক্ষণ পরে ওই মেয়েমানুষদের মধ্যে হয়ত কেউ একজন চোখের জলে ভেজা মুখের ওপর হাতদুটো চেপে উঠোনে বেরিয়ে আসে, পথের দিশা হারিয়ে অন্ধের মতো গলি দিয়ে চলতে থাকে। দেখতে দেখতে কোন একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরে ওঠে সদ্য বিধবার কান্নার রোল। তার সঙ্গে যোগ দেয় ছোট ছেলেমেয়েদের কচিগলার কান্না। এই ছিল তখনকার দিনের তাতারস্কি। এক বাড়িতে আনন্দের সাড়া জাগল ত অন্য বাড়িতে নামল গভীর শোকের ছায়া।

পর দিন সকালে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বাড়ির কর্তা উঠে পড়ে। নিখুঁত দাড়ি কামিয়েছে সে। বয়স যেন তার বেশ খানিকটা কমে গেছে। ঘর গেরস্থালি ভালো ক'রে দেখার পর সে আপাতত এই মুহূর্তে কোন্ কাজে হাত দিতে হবে ঠিক ক'রে নেয়। সকালের জলখাবারের পর শুরু করে দেয় কাজ। ছুতোরের রেঁদা খোশমেজাজে খসখস আওয়াজ তোলে, নয়ত চালাঘরের ছাঁচতলার শীতল ছায়ায় কোথাও ঠকঠক ঘা পড়ে কুড়ুলের। যেন জানিয়ে দিচ্ছে এ বাড়িতে কাজপাগল পুরুষের একজোড়া নিপুণ হাত আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু ও দিকে যে বাড়িতে লোকে আগের দিন বাপ বা স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল সেখানে বাড়ির ভেতরে আর বাইরের উঠোনে থমথম করছে চাপা নিস্তব্ধতা। শোকে কাতর হয়ে মা নীরবে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে ভিড় করে আছে অনাথ ছেলেমেয়ের দল। রাতারাতি তারা যেন বড় হয়ে গেছে।

গ্রামের কেউ ফিরে এসেছে শুনতে পেলেই ইলিনিচ্না বলে, 'আমাদের ঘরের ছেলে যে কবে ফিরবে! অন্যদের সকলে ফিরে আসছে, কিন্তু আমাদের ছেলের কোন সাড়াশব্দই নেই।'

'জোয়ান কসাকদের যে ছাড়ছে না – এটা তুমি বোঝো না কেন মা?' বিরক্ত হয়ে দুনিয়াশ্‌কা উত্তর দেয়।

'ছাড়ে না কেমন? তিখন গেরাসিমভ তাহলে এলো কেমন করে? গ্রিশার চেয়ে ও এক বছরের ছোট।'

'সে যে জখম হয়েছিল মা!'

'কিসের জখম!' ইলিনিচ্না আপত্তি জানিয়ে বলে। 'গতকালই কামারশালার কাছে দেখলাম। দিব্যি চলছে গটগটিয়ে। জখম হওয়া বলে নাকি ওকে?'

'জখম হয়েছিল। এখন সেরে উঠেছে।'

'আমাদের ছেলেটা ত কতবার জখম হল। ওর সারা গায়ে কাটার দাগ। ওর কি শরীর সারানোর দরকার নেই বলে তোর মনে হয়?'

দুনিয়াশ্‌কা নানা ভাবে মাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে এই সময় গ্রিগোরির ফিরে আসার ভরসা করা উচিত নয়। কিন্তু ইলিনিচ্নাকে কোন কিছু বোঝানো অত সহজ কাজ নয়।

'চুপ কর বোকা মেয়ে।' দুনিয়াশ্‌কাকে সে ধমকে দেয়। আমি তোর চেয়ে কম জানি বলতে চাস? তোর বয়স এখনও কম, তুই কিনা মাকে শেখাতে এসেছিস। বলছি শিগ্‌গিরই আসবে, তার মানে আসবেই। যা যা তোর সঙ্গে বকবক ক'রে বাজে সময় নষ্ট করতে পারি নে বাপু!'

ছেলের জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে বুড়ির ধৈর্যের বাঁধ বুঝি ভেঙে পড়ে।

সুযোগ পেলেই গ্রিগোরির নাম করে। মিশাত্‌কা তার কথার অবাধ্য হলেই হল – সঙ্গে সঙ্গে শাসায়: 'দাঁড়া না বিচ্ছু শয়তান কোথাকার, তোর বাপ আসুক, সব বলে দেবো, তখন টের পাবি ধোলাই কাকে বলে!' জানলার পাশ দিয়ে সদ্য ছই লাগানো কোন গাড়ি চলে যেতে দেখলে বুড়ি দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে আর অবশ্যই বলবে, 'দেখলেই বোঝা যায় গাড়ির মালিক ঘরে রয়েছে, কিন্তু আমাদের বাড়ির ছেলের ঘরে ফেরার নাম নেই। . . .' তামাকের ধোঁয়ার গন্ধ ইলিনিচ্‌না জীবনে কখনও সহ্য করতে পারত না। সিগারেটখোরদের রান্নাঘরে সিগারেট খেতে দেখলে সর্বদাই দূর দূর করে বার ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আজকাল এ ব্যাপারেও সে পালটে গেছে। কখন কখন দুনিয়াশ্‌কাকে বলে, 'যা দেখি, প্রোখরটাকে একটু ডেকে নিয়ে আয়, এসে একটা সিগ্রেট-টিগ্রেট খাক। নইলে সারা বাড়ি জুড়ে কেমন যেন একটা চিমসে মড়া-মড়া গন্ধ। গ্রিশা পলটন থেকে ফিরে আসুক, তখন জ্যান্ত কসাকের গন্ধ পাওয়া যাবে আমাদের বাড়িতে। . . .' রোজ রান্না করার সময় বাড়তি খানিকটা খাবার তৈরি করবে ইলিনিচ্‌না, খাওয়া দাওয়ার পর গরম চুল্লীর ভেতর চাপিয়ে রেখে দেবে এক কড়াই বাঁধাকপির ঝোল। দুনিয়াশ্‌কা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ইলিনিচ্‌না অবাক হয়ে উত্তর দেয়, 'বলিস কি রে! আমাদের সেপাইটি ত আজও ঘরে ফিরতে পারে – তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গরম খাবার পেয়ে যাবে। নইলে গরম করতে এটা সেটা করতে করতে যে সময় লাগবে, ততক্ষণ পেটে খিদে নিয়ে থাকতে বলিস নাকি তাকে? . . .' একদিন তরমুজ ক্ষেত থেকে ফিরে দুনিয়াশ্‌কা দ্যাখে গ্রিগোরির একটা পুরনো কোর্তা আর রঙজ্বলা ফিতে সমেত একটা টুপি রান্নাঘরের পেরেকে ঝুলছে। দুনিয়াশ্‌কা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকাল। মা কেমন যেন কাচুমাচু হয়ে করুণ হাসি হেসে বলল, 'আমি বার করেছি রে দুনিয়াশ্‌কা, তোরঙ্গের ভেতর থেকে। উঠোনে ঢুকতেই নজরে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে বুকটা বেশ হাল্‌কা লাগবে। . . . ও যেন এখানে আমাদের সঙ্গেই আছে। . . .'

গ্রিগোরিকে নিয়ে মা'র কথার যেন আর শেষ নেই। শুনে শুনে দুনিয়াশ্‌কার কান পচে যায়। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে মাকে বকা দিয়ে ওঠে:

'আচ্ছা মা, এক কথা বারবার তোমার কি এতটুকু খারাপ লাগে না? তোমার ওই আলোচনায় সকলকে অতিষ্ঠ ক'রে ছাড়লে। তোমার মুখে শুধু এক কথা: গ্রিশা আর গ্রিশা। . . .'

'নিজের ছেলের কথা বলব তাতে খারাপ লাগবে কেন? তোর নিজের যখন ছেলেপুলে হবে তখন বুঝবি। . . .' নীচু গলায় ইলিনিচ্‌না বলে।

এর পর গ্রিগোরির কোর্তা আর টুপিটা সে রান্নাঘর থেকে নিজের ঘরে নিয়ে

এলো। তারপর বেশ কয়েক দিন ছেলেকে নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করে নি। কিন্তু ঘাস কাটা শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে দুনিয়াশ্‌কাকে সে বলল, 'এই ত গ্রিশার কথা তুললেই তুই রাগ করিস, কিন্তু ওকে ছাড়া আমরা বাঁচব কী করে বল? এই নিয়ে ভেবেছিস কখনও? ঘাস কাটার সময় এগিয়ে আসছে, এদিকে বিদেকাঠির লগিটা পর্যন্ত গড়ে দেবার মতো কোন মরদ আমাদের ঘরে নেই। . . . সব ভেঙেচুরে পড়ছে। আমাদের সাধ্যি কি সামলানো! যে বাড়িতে কত্তা নেই সে বাড়ি কি আবার একটা বাড়ি? . . .'

দুনিয়াশ্‌কা চুপ করে থাকে। ও বেশ বুঝতে পারে ঘর গেরস্থালির কথা ভেবে ওর মা'র আদপেই তেমন মাথা ব্যথা নেই, আসলে এসবই হল গ্রিগোরির প্রসঙ্গ তুলে মন হাল্‌কা করার একটা অজুহাতমাত্র। ছেলের জন্য মনের ব্যথাটা যেন নতুন করে আরও জোরে বাজছে। সেটা লুকানোর আর কোন উপায় নেই। রাতের খাবার সে মুখে তুলল না। দুনিয়াশ্‌কা যখন জিজ্ঞেস করল অসুখ করেছে কিনা, তখন অনিচ্ছাভরে উত্তর দিল, 'বুড়ো হয়ে পড়েছি। . . . গ্রিশার জন্যে বুকে বড় বেদনা। এত কষ্ট হয় যে কিছু আর ভালো লাগে না। পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকাতেও কষ্ট হয়। . . .'

কিন্তু মেলেখভদের ঘর-গেরস্থালির ভার যার ওপর এসে পড়ল সে গ্রিগোরি নয়। . . . ঘাস কাটা শুরু হওয়ার আগে আগে ফ্রন্ট থেকে গ্রামে ফিরে এলো মিশ্‌কা কশেভয়। দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে সে হাজির হল মেলেখভদের বাড়িতে। ইলিনিচ্‌না তখন রান্না করছিল। অতিথি দরজায় টোকা দিল। কোন সাড়া না পেয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। মাথা থেকে পুরনো ফৌজী টুপিখানা খুলে ইলিনিচ্‌নার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'এই যে ইলিনিচ্‌না মাসি, কী খবর? আমাকে আশা কর নি, তাই না?'

'নমস্কার। তুমি আমার কে শুনি, যে তোমাকে আশা করব? লতায় পাতায়ও কোন সম্পর্ক আছে নাকি তোমার সঙ্গে আমাদের?' কশেভয়ের ঘৃণা জাগানো মুখটার দিকে বিতৃষ্ণাভরে চেয়ে রুক্ষস্বরে উত্তর দেয় ইলিনিচ্‌না।

এরকম অভ্যর্থনায় এতটুকু বিচলিত না হয়ে মিশ্‌কা বলল, 'আহা লতায় পাতায় সম্পর্ক না হয় না-ই হল . . . অন্তত চেনা জানা লোক ত।'

'তার বেশি কিছু নয়।'

'কিন্তু এসে একবার দেখা করে যাবার পক্ষে ওটাই যথেষ্ট। তোমাদের কাছে থাকব বলে আমি আসি নি।'

'সেইটেই বাকি ছিল আর কি . . .' এই বলে অতিথির দিকে আর না তাকিয়ে রান্নার কাজে মন দিল ইলিনিচ্‌না।

ইলিনিচ্‌নার কথা গায়ে না মেখে বেশ মন দিয়ে রান্নাঘরের এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে মিশ্‌কা বলল, 'এই দেখতে এলাম কেমন আছ তোমরা সবাই। এক বছরের ওপরে কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই।...'

'তোমার অভাবে খুব একটা দুঃখু পাই নি,' উনুনের ওপর দুমদাম লোহার হাঁড়িকড়াই নাড়াচাড়া করতে করতে ইলিনিচ্‌না ফুঁসে ওঠে।

দুনিয়াশ্‌কা ভেতরের ঘরে ঝাঁট দিচ্ছিল। মিশ্‌কার গলা শুনে ওর মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। একটা কথাও সরল না মুখ দিয়ে। গালে হাত দিল। বেঞ্চিতে বসে পড়ে রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনতে থাকে রান্নাঘরের কথাবার্তা। দুনিয়াশ্‌কার মুখে কখনও গাঢ় রক্তিমাভা খেলে যায়, কখনও বা গালদুটো এমন রক্তশূন্য হয়ে যায় যে ওর পাতলা টিকালো নাকের দু'পাশে সাদা রেখা ফুটে ওঠে। ও শুনতে পায় রান্নাঘরে মিশ্‌কার সজোরে পা ফেলে পায়চারি করার শব্দ। তারপরেই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে মিশ্‌কা একটা চেয়ারে বসল, ফস্‌ ক'রে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। ভেতরের বড় ঘরটাতে সিগারেটের গন্ধ ভেসে এলো।

'শুনলাম তোমাদের বুড়ো কত্তা নাকি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আর গ্রিগোরি?'

ইলিনিচ্‌না অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। শেষকালে অনিচ্ছার ভাবটা এতটুকু গোপন না ক'রে উত্তর দিল, 'লালদের পল্টনে কাজ করছে। তোমার টুপির মতোই একটা তারা লাগিয়েছে টুপিতে।'

'অনেক আগেই লাগানো উচিত ছিল।...'

'সে ওর ব্যাপার।'

মিশ্‌কার গলায় একটা স্পষ্ট উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠল যখন সে জিজ্ঞেস করল, 'আর ইয়েভ্‌দোকিয়া পান্তেলেয়েভ্‌নার* খবর কী?'

'জামাকাপড় পরছে। বড় সকাল-সকাল এসেছ। কোন ভদ্দর সন্তান এমন সাত সকালে কারও বাড়ি আসে না।'

'অভদ্র না হয়ে আর উপায় ছিল না। আসার জন্যে মনটা বড় আকুলি বিকুলি করছিল, তাই এলাম। এখানে অত সময় বাছাবাছির কী আছে?'

'ওঃ মিখাইল, আর চটাস নে ত বাপু।...'

'কিসে আমি চটালুম আপনাকে মাসিমা?'

'তুইই জানিস কিসে!'

---

* দুনিয়াশ্‌কার ভালো নাম। - অনুঃ

'না না বলুন না কেন, কিসে?'

'তোর ওই কথাবার্তার যা ছিরি, তাতে।'

দুনিয়াশ্‌কা শুনতে পেল মিশ্‌কা ভারী নিঃশ্বাস ফেলল। আর সে সামলাতে পারল না। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, পরনের ঘাগরাটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে এলো রান্নাঘরে। জানলার ধারে বসে সিগারেটে সুখটান দিচ্ছিল মিশ্‌কা। হলদে দেখাচ্ছে ওকে। এত রোগা হয়ে গেছে যে দেখে চেনা যায় না। দুনিয়াশ্‌কাকে দেখা মাত্রই ওর ঘোলাটে চোখদুটো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, মুখেও যেন খেলে যায় হালকা গোলাপী আভা। চটপট উঠে দাঁড়িয়ে ভাঙা গলায় সে বলল, 'আরে, এই যে!'

'নমস্কার!' দুনিয়াশ্‌কার গলা প্রায় শোনাই গেল না।

'যা দেখি, জল নিয়ে আয়,' মেয়ের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিল ইলিনিচ্‌না।

মিশ্‌কা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইল কখন দুনিয়াশ্‌কা ফিরে আসে। ইলিনিচ্‌না চুপ করে থাকে। মিশ্‌কাও চুপ। শেষে সিগারেটের পোড়া টুকরোটা আঙুল দিয়ে চেপে নিভিয়ে বলল, 'আমার ওপর অত চটে আছেন কেন মাসি বলুন ত? আমি আপনার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি?'

ইলিনিচ্‌না যে ভাবে উনুনের দিক থেকে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল তাতে মনে হল যেন হুলের খোঁচা খেয়েছে।

'নির্লজ্জ, বেহায়া! কী করে আমাদের বাড়িতে আসতে পারিস! তোর কি এতটুকু চক্ষুলজ্জাও নেই? আবার কিনা জিগ্‌গেস করছিস? আমাকে? খুনে কোথাকার!...'

'আমি খুনে? এ আপনি কী বলছেন?'

'খুনে নয় ত কী? কে খুন করেছিল পেত্রোকে? তুই না?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে? এর পরেও তুই খুনী না বলতে চাস? তুই কিনা আমাদের বাড়িতে আসিস? এসে এমন সৌরসীপাত্রা ক'রে বসিস যেন...' বলতে বলতে ইলিনিচ্‌নার গলা বুজে আসে, চুপ করে যায়। তারপর আবার সামলে নিয়ে বলে চলে, 'আমি ওর মা নই? এরপরও তুই আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিস?'

মিশ্‌কার মুখ রীতিমতো ফেকাসে হয়ে যায়। এই কথা যে উঠবে সে জানত। উত্তেজনায় একটু তোতলাতে তোতলাতে সে বলে, 'চোখ তুলে না তাকানোর ত কোন কারণ দেখি না! পেত্রো যদি আমাকে ধরতে পারত তাহলে আমার মাথার চাঁদিতে চুমু খেত নাকি? সেও ত আমাকে খুন করত। আমরা যে ওই টিলায় সামিল হয়েছিলাম সে কি গলাগলি করার জন্যে? লড়াই বলে কথা।'

'আর বেয়াই কোর্‌শুনভকে? একজন নির্বিরোধী বুড়ো মানুষকে খুন করা – এটাও কি লড়াই?'

'তা নয়ত কী?' মিশ্‌কা অবাক হয়ে যায়। 'আলবত্ত লড়াই! ওসব নির্বিরোধীদের চেনা আছে। ওরকম নির্বিরোধী লোক পাতলুন হাতে নিয়ে ঘরে বসে থাকে, কিন্তু যারা লড়াই করছে তাদের যে কারও চেয়ে ক্ষতি করে অনেক বেশি।... বুড়ো গ্রিশাকার মতো লোকেরাই কসাকদের উসকেছিল আমাদের বিরুদ্ধে। লড়াইটা শুরু হল ত ওদেরই জন্যে। কে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে? ওই ওরা, যাদের বলছ কিনা নির্বিরোধী। আবার বলে কিনা আমি খুনী!... ভালো খুনী পেয়েছ যা হোক! এক সময় একটা ভেড়া বা শুয়োর অবধি আমি জবাই করাতে পারতাম না, জানি এখনও পারব না। একটা প্রাণী মারতেও আমার হাত উঠবে না। অন্যেরা যখন জবাই করে তখন আমি দু'হাতে কান চেপে দূরে সরে পড়ি যাতে চিৎকার শুনতে বা ও দৃশ্য দেখতে না হয়।'

'কিন্তু আমাদের বেয়াইকে মারার বেলায়...'

'রাখুন দেখি আপনার বেয়াই!' বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বলল মিশ্‌কা। 'ওর কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা পাঁটার দুধ দোয়ানোর মতো। তবে ক্ষতিও কম করে নি লোকটা। বললাম বাড়ি থেকে বেরোও, তা বেরোল না, সোজা ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে মোলো। ওদের ওপর... ওই বুড়ো শয়তানগুলোর ওপর আমার হাড়ে হাড়ে রাগ! কোন প্রাণীকে আমি মারতে পারি না – মারলেও বড় জোর রাগের মাথায়। কিন্তু ওরকম নোংরা লোকগুলোকে – মাপ করবেন অমন কথা বলার জন্যে – আপনার ওই বেয়াই বা তার মতো আর কোন শত্তুরকে যত খুশি নিকেশ করতে পারি! ওদের মারতে আমার এতটুকু হাত কাঁপে না। পৃথিবীর কোন উপকারে আসে না ওই দুশমনরা!'

ইলিনিচ্‌না খোঁচা দিয়ে বলল, 'তোর ওই কঠিন প্রাণের জন্যেই শুকিয়ে অমন কাঠ হয়ে গেছিস। বিবেকের দংশন বলে কথা...'

'উঁহু, এতটুকু নয়!' প্রসন্ন হাসি হেসে মিশ্‌কা বলে। 'আপনাদের ওই বুড়োর মতো রদ্দিমালের কথা ভাবতে ভারী বয়ে গেছে আমার বিবেকের! আমি জ্বরে ভুগে কাহিল হয়ে পড়েছি। জ্বরের ঠেলায় আমার শরীরের আর কিছু অবশিষ্ট নেই মা।...'

'আমি আবার তোর মা হলাম কিসে?' তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে ইলিনিচ্‌না। 'কুত্তীকে মা বলে ডাকিস বরং!'

'আমাকে কুত্তীর বাচ্চা বোলো না বলছি!' অলক্ষুণে ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় মিশ্‌কা বলে। 'তোমার সব কিছু সইব এমন দায় আমি নিই নি।

আমি তোমাকে বেশ বোঝার মতো করেই জানিয়ে দিচ্ছি মাসি - পেত্রোর জন্যে আমার ওপর রাগ পুষে রাখার কোন মানে হয় না তোমার। সে নিজেই যা খুঁজেছিল তা-ই পেয়েছে।'

'তুই খুনী! খুনী তুই! বেরিয়ে যা এখেন থেকে! তোর মুখ দেখতেও ঘেন্না হয় আমার!' ইলিনিচ্না নাছোড়বান্দার মতো জোর দিয়ে বলে।

মিশ্‌কা আবার একটা সিগারেট ধরায়। শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করে, 'আর মিত্রি কোর্‌শুনভ - তোমাদের বেয়াইয়ের ছেলে - সে কি খুনী নয়? তাছাড়া গ্রিগোরি? নিজের আদরের ছেলেটির বেলায় চুপ করে রইলে যে বড়? একটা জলজ্যান্ত খুনী, কোন সন্দেহ নেই!'

'আজেবাজে কথা বোলো না!'

'কাল থেকে কোন বাজে কথা বলছি না। কিন্তু তুমিই বল, কে তাহলে সে? আমাদের কত জনকে খুন করেছে সে খবর তুমি রাখ? জান না, তাই বল! যারা যারা লড়াই করেছিল তাদের সবাইকে যদি ওই নাম দাও মাসি, তাহলে আমরা সবাই খুনী। আসল কথাটা হল গিয়ে কিসের জন্যে খুন করেছি, আর কাকে করেছি,' মিশ্‌কা বিজ্ঞের মতো রায় দেয়।

ইলিনিচ্না কোন আমল না দিয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু অতিথির ওঠার কোন নাম নেই দেখে কঠিন গলায় বলে ওঠে, 'হয়েছে! তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই। বাড়ি চলে যাও।'

'আমার বাড়ি বলতে ত এখন পোড়োমন্দির,' কাষ্ঠ হাসি হেসে মিশ্‌কা উঠে দাঁড়ায়।

ওসব গালিগালাজে আর বাক্যবাণে মিশ্‌কা থোড়াই দমবার পাত্র! বেশ পুরু ওর গায়ের চামড়া। কোথাকার কোন এক বুড়ি রাগের মাথায় ওকে যা-তা বলে অপমান করল - তা ও গায়ে মাখতে যাবে কোন্ দুঃখে! ও জানে দুনিয়াশ্‌কা ওকে ভালোবাসে, তাই আর কিছুর তোয়াক্কা সে করে না - বুড়ির ত নয়ই।

পরের দিন সকালে সে আবার এসে হাজির। যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে ইলিনিচ্নাকে নমস্কার জানিয়ে জানলার ধারে এসে বসল। দু'চোখে লক্ষ করতে লাগল দুনিয়াশ্‌কার প্রতিটি চালচলন।

মিশ্‌কার নমস্কারের জবাব না দিয়ে ইলিনিচ্না কটাক্ষ ক'রে বলল, 'বড় ঘন ঘন আসা হচ্ছে যে!'

দুনিয়াশ্‌কার মুখ লাল হয়ে উঠল। একবার জ্বলন্ত চোখে মা'র দিকে তাকাল, পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল। একটি কথাও বলল না। মিশ্‌কা বাঁকা হাসি হেসে বলল, 'তোমায় দেখতে আসি না গো ইলিনিচ্না মাসি। আমার ওপর মিছিমিছিই রাগ করছ।'

'আমাদের বাড়ির রাস্তা একদম ভুলে গেলে ভালো করতে বাপু।'

'কোথায় যাব তাহলে?' একটু গম্ভীর হয়ে মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল। 'তোমাদের বেয়াই বাড়ির ছেলে মিশ্‌কার দয়ায় ত বাড়ির মধ্যে সবেধন নীলমণি একমাত্র আমিই রয়েছি। খালি বাড়িতে কুনো হয়ে কতক্ষণ বসে থাকব বল? তুমি চাও আর না চাও মাসি, তোমাদের বাড়িতে আমি আসবই,' কথাটা শেষ ক'রে দু'ঠ্যাঙ অনেকখানি ছড়িয়ে আরও একটু জুত ক'রে বসল মিশ্‌কা।

ইলিনিচ্‌না ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখল ওকে। ঠিকই এরকম লোককে তাড়ানো অত সোজা নয়। মিশ্‌কার হেলানো মাথাটা, শক্ত করে চাপা দুই ঠোঁট আর কোলকুঁজো গোছের মূর্তির আপাদমস্তক জুড়ে ফুটে উঠেছে ষাঁড়ের মতো একটা একরোখা ভাব।...

মিশ্‌কা চলে যাবার পর বাচ্চাদের উঠোনে পাঠিয়ে দিয়ে দুনিয়াশ্‌কার দিকে ফিরে ইলিনিচ্‌না বলে ওঠে, 'ও যেন এ বাড়িতে আর পা না মাড়ায়। বুঝলি?'

দুনিয়াশ্‌কা অপলক দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকাল। ওর কোঁচকানো চোখের কটমটে চাউনির মধ্যে এক পলকের জন্য ফুটে উঠল মেলেখভবংশের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটা কথা চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, 'না! আসবে! তুমি বললেই হবে নাকি? একশ' বার আসবে!' বলতে বলতে নিজেকে আর সামলাতে না পেরে বুকের আঁচলে মুখ ঢেকে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে যায়।

ভারী নিঃশ্বাস ফেলে ইলিনিচ্‌না বসে পড়ে জানলার ধারে। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে বসে মাথা ঝাঁকায়, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুদূর স্তেপের মাঠের দিকে, যেখানে সূর্যের আলোয় ঝলমলে রুপোলি পাড়ের মতো কচি সোমরাজ ঝোপের সারি আকাশ থেকে মাটিকে আলাদা ক'রে রেখেছে।

দনের পারের কাছে ওদের আনাজ বাগানের বেড়াটা পড়ে গিয়েছিল। সেদিনই সন্ধ্যার আগে আগে ওরা মায় ঝিয়ে মিলে সেটা তুলে বসানোর চেষ্টা করছিল। ইলিনিচ্‌না তখনও আপসের কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না, বিশেষ কোন কথাবার্তাও বলছে না। এমন সময় সেখানে এলো মিশ্‌কা। কোন কথা না বলে দুনিয়াশ্‌কার হাত থেকে কোদালখানা নিল, তারপর বলল, 'ওইটুকুন খুঁড়লে কি আর চলবে? একটু হাওয়া লাগলেই ত তোমাদের বেড়া আবার পড়ে যাবে।' খুঁটির গর্তগুলো আরও গভীর করতে লাগল মিশ্‌কা। তারপর বেড়াটাকে ওঠানোর কাজে হাত লাগাল, খুঁটির সঙ্গে বেড়াটা বেঁধে চলে গেল। পর দিন সকালে সবে চেঁছেছুলে বানানো দু'খানা বিদের ডাণ্ডা আর একখানা আঁকশি নিয়ে এলো। ইলিনিচ্‌নাকে নমস্কার ক'রে কাজের উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'ঘাস কাটার কথা কিছু ভাবছেন কি আপনারা? লোকে এর মধ্যেই দনের ওপারে চলে গেছে ঘাস কাটতে।'

ইলিনিচ্না চুপ করে থাকে। মা'র বদলে উত্তর দেয় দুনিয়াশ্কা।

'আমরা কিসে করে যাব? আমাদের ডিঙিটা সেই শরৎকাল থেকে চালাঘরের নীচে পড়ে আছে। শুকিয়ে একেবারে টুটোফাটা হয়ে গেছে।'

মিশ্কা তিরস্কারের সুরে বলল, 'বসন্তকালেই জলে নামানো উচিত ছিল। ফেঁসো লাগিয়ে ফুটোগুলো মেরামত করলে কেমন হয়? ডিঙি ছাড়া ত তোমাদের চলবে না।'

দুনিয়াশ্কা প্রত্যাশাভরে বিনীত দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকাল। ইলিনিচ্না নীরবে ময়দা ছানতে থাকে – ভাবটা এমন যেন কথাবার্তার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

'ফেঁসো আছে তোমাদের কাছে?' প্রায় নজরে না পড়ার মতো মৃদু হাসি ফুটে ওঠে মিশ্কার মুখে।

ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে থাবাভরা ফেঁসো নিয়ে ফিরে এলো দুনিয়াশ্কা।

দুপুরের খাবার সময় নাগাদ নৌকো মেরামতের কাজ সারা হয়ে গেল মিশ্কার। এবারে রান্নাঘরে এসে ঢুকল সে।

'ডিঙিটা জলে নামিয়ে রেখে এলাম। একটু জল খাক। একটা খুঁটি-টুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ, নইলে কেউ নিয়ে যেতে পারে।' তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তাহলে ঘাস কাটার ব্যাপারটার কী হবে মাসিমা? আপনাদের সঙ্গে হাত লাগাব কি? আমার আর কী? – হাতে কোন কাজ নেই।'

'ওই ওকেই জিগ্গেস কর না।' মাথা নেড়ে দুনিয়াশ্কাকে দেখিয়ে দেয় ইলিনিচ্না।

'আমি এ বাড়ির গিন্নিকে জিগ্গেস করছি।'

'আমি এ বাড়ির গিন্নি নই, সে ত দেখাই যাচ্ছে। . . .'

দুনিয়াশ্কা কেঁদে ফেলল, ভেতরের ঘরে চলে গেল।

'তাহলে ত দেখছি হাত লাগাতেই হয়,' দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে মিশ্কা ঘোষণা করে বলে উঠল। 'তোমাদের ছুতোরের যন্ত্রপাতি সব গেল কোথায়? নতুন বিদেকাঠি বানিয়ে দিতে হয়। পুরনোগুলো কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না।'

চালাঘরের নীচে গিয়ে মিশ্কা আপন মনে শিস দিতে দিতে বাটালি দিয়ে কেটে আঁকশির ফলা বানাতে লেগে যায়। ছোট্ট মিশাত্কা ওর চারধারে ঘুরঘুর ক'রে ঘুরতে থাকে আর অনুনয়ভরে ওর চোখের দিকে তাকায়। বলে, 'মিখাইল কাকা, আমাকে একটা ছোট্ট আঁকশি বানিয়ে দেবে? কেউ আমাকে বানিয়ে দেয় না। ঠাম্মা পারে না, পিসিমণিও পারে না। . . . কেবল তুমি পার। তুমি ভালো পার!'

'দেবো মিতে, সত্যি বলছি দেবো। এখন একটু সরে যাও ত। নয়ত কখন কাঠের চিলতে চোখের ভেতরে গিয়ে পড়বে।' ওকে বুঝ দেওয়ার জন্য কথাগুলো বলতে বলতে মুখ টিপে হাসতে হাসতে কশেভয় অবাক হয়ে ভাবে: 'চেহারার কী মিল দ্যাখ! . . . হুবহু বাপের মতো দেখতে হয়েছে খুদে শয়তানটা! সেই চোখ সেই ভুরু, সেই তেমনি ভাবে ওপরের ঠোঁটটা ওলটায়। . . . একেই বলে কারেসাজি!'

একটা ছোট্ট খেলনার আঁকশি বানানোর কাজে হাত দেয় মিশ্‌কা। কিন্তু শেষ করতে পারে না। ওর ঠোঁট নীল হয়ে ওঠে, হলুদ মুখের ওপর ফুটে ওঠে একটা ক্রুদ্ধ অথচ হালছাড়া ভাব। শিস দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ছুরিটা নামিয়ে রেখে কাঁধ নাচিয়ে কাঁপতে থাকে—যেন শীত লেগেছে।

মিশাত্‌কাকে সে বলল, 'মিখাইলো গ্রিগোরিয়েভিচ, মিতে আমার,* আমাকে কোন একটা চটকাপড়-টাপড় এনে দাও, লক্ষ্মীটি। আমি এখেনে শুয়ে পড়ি।'

'কেন?' মিশাত্‌কার কৌতূহল হয়।

'একটু অসুখ হওয়ার সাধ হয়েছে।'

'কিন্তু কেন?'

'আঃ, আচ্ছা গেড়ো হল দেখছি! একেবারে আঠার মতো লেগে রইল যে! আরে আমার অসুখের সময় হয়েছে! হল ত! যাও এক ছুটে নিয়ে এসো।'

'কিন্তু আমার আঁকশি?'

'পরে শেষ করব।'

মিশ্‌কার সারা শরীর ভীষণ কাঁপতে থাকে। মিশাত্‌কা যে চটকাপড়টা নিয়ে এসেছিল দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে তার ওপর সে শুয়ে পড়ল। মাথার টুপি খুলে মুখ ঢাকল।

'এরই মধ্যে অসুখ শুরু হয়ে গেল তোমার?' করুণ গলায় মিশাত্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'অসুখ হওয়ার জন্যে তৈরি আমি।'

'কিন্তু কাঁপছ কেন?'

'জ্বরে কাঁপছি।'

'তোমার দাঁত অমন ঠকঠক করছে কেন?'

মিশ্‌কা টুপির ফাঁক দিয়ে এক চোখে তার নাছোড়বান্দা ছোট্ট মিতের দিকে

---

* 'মিশ্‌কা' ও 'মিশাত্‌কা' একই 'মিখাইল' নামের অপভ্রংশ। অর্থাৎ দু'জনেরই ভালো নাম মিখাইল। তাই মিশাত্‌কাকে মিশ্‌কা 'মিতে' বলে ডাকে। এখানে ঠাট্টা ক'রে নকল গাম্ভীর্য দেখিয়ে মিশ্‌কা তাকে 'মিখাইলো গ্রিগোরিয়েভিচ' বলে পুরো নামে সম্বোধন করেছে। – অনুঃ

তাকিয়ে একটু হাসে। ওর প্রশ্নের আর কোন জবাব দিল না। মিশাত্‌কা ভয় পেয়ে তার দিকে একবার তাকিয়ে ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

'ঠাম্মা! মিখাইল কাকা চালাঘরে শুয়ে পড়েছে। ভীষণ কাঁপছে, কাঁপতে কাঁপতে লাফিয়ে উঠছে!'

ইলিনিচ্‌না জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল। টেবিলের ধারে সরে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। চুপচাপ কী যেন চিন্তা করতে থাকে। . . .

মিশাত্‌কা অধৈর্য হয়ে তার জামার হাতা ধরে টানল।

'কিছু বলছ না যে ঠাম্মা?'

ইলিনিচ্‌না নাতির দিকে ফিরে কঠিন গলায় বলল, 'যা দেখি দাদুভাই, এই কম্বলটা দিয়ে আয় ওই হতচ্ছাড়া পাষণ্ডটাকে। গা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুক গে। ও হল এক রকমের ব্যামো - পালাজ্বর। তাইতে কাঁপছে। কম্বল নিয়ে যেতে পারবি ত?' আবার সে জানলার কাছে এগিয়ে গেল। উঠোনের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা থাক! রেখে দে! কাজ নেই, নিয়ে গিয়ে।'

দুনিয়াশ্‌কা তার নিজের ভেড়ার চামড়ার কোটখানা দিয়ে কশেভয়কে ঢেকে দিয়েছে। ঝুঁকে পড়ে ওকে কী যেন বলছে। . . .

জ্বরের প্রকোপটা কেটে যাবার পর ঘাস কাটার যোগাড়-যন্তর করতে করতে মিশ্‌কার সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। দেখলেই বোঝা যায় বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে সে। চলাফেরার মধ্যে কেমন একটা জবুথবু আর অনিশ্চিত ভাব ফুটে উঠেছে। তবে আঁকশি সে বানিয়ে দিল মিশাত্‌কাকে।

সন্ধ্যাবেলায় ইলিনিচ্‌না খাবারের আয়োজন করল। টেবিলের ধারে বাচ্চাদের বসিয়ে দুনিয়াশ্‌কার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'যা, ওটাকে ওই . . . কী বলে . . . রাতের খাবার খেতে ডাক।'

মিশ্‌কা এসে খেতে বসল। খাবার আগে কপালে হাত ঠেকিয়ে ক্রুশ-প্রণাম করল না। ক্লান্ত ভাবে জড়সড় হয়ে বসেছে। ওর হলদে মুখের ওপর ক্লান্তির ছাপ, ঘাম গড়িয়ে শুকিয়ে নোংরা হয়ে লেগে আছে। চামচটা মুখের কাছে ধরতে গেলে হাত অল্প অল্প কাঁপছে। খায় সামান্যই, অনিচ্ছাভরে। টেবিলের ধারে আর যারা বসে আছে খেতে খেতে মাঝে মাঝে উদাসীন দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায়। কিন্তু ইলিনিচ্‌না দেখে অবাক হয়ে যায় 'খুনেটার' নিভন্ত চোখের দৃষ্টি যতবার ছোট্ট মিশাত্‌কার ওপর গিয়ে ঠেকছে ততবারই যেন উষ্ণ আলোয় সজীব আর উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। স্নেহে আর পুলকে উচ্ছ্বসিত স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তের জন্য দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে, পরক্ষণেই নিভে যাচ্ছে, আর ঠোঁটের কোনায় অনেকক্ষণ ধরে লেগে থাকছে ক্ষীণ হাসি। তারপর যখন চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তখন আবার

মুখের ওপর নেমে আসছে অনুভূতিহীন উদাসীনতার ছায়া।

ইলিনিচ্‌না এই বারে চোরা চাউনি দিয়ে লক্ষ করতে লাগল কশেভয়কে। এই এখনই তার নজরে পড়ল অসুখে কী দারুণ রোগা হয়ে গেছে সে। ধূলিধূসর ফৌজী জামাটার নীচ থেকে স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে কণ্ঠার হাড়। পিঠটা কুঁজো হয়ে গেছে। রোগা হয়ে যাওয়ায় চওড়া কাঁধের হাড়গুলো যেন চামড়া ফুঁড়ে বেরোচ্ছে। বাচ্চা ছেলের মতো সরু লিকলিকে গলার ওপর কটা রঙের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা কণ্ঠমণিটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। 'খুনেটার' কোলকুঁজো মূর্তি আর কাগজের মতো সাদা মুখখানা ইলিনিচ্‌না যত ভালো করে দেখে ততই বেশি ক'রে ভেতরে ভেতরে যেন একটা অস্বস্তি আর দোমনা ভাব তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে থাকে। যে লোকটাকে এত কাল ঘৃণা ক'রে এসেছে, হঠাৎ তার ওপর একটা অযাচিত করুণা জেগে ওঠে ইলিনিচ্‌নার বুকের ভেতর। এই করুণা মাতৃস্নেহ থেকে উৎসারিত মন-কেমন-করা সেই করুণা যা অতি সবলা নারীকেও বিচলিত করে তোলে। নতুন অনুভূতিকে প্রাণপণ শক্তিতেও চাপতে পারল না সে। একটা রেকাব কানায় কানায় দুধে ভর্তি করে মিশ্‌কার দিকে ঠেলে দিয়ে সে বলে উঠল, 'নে বাবা। ভগবানের দোহাই, ওটুকু খেয়ে নে! যা রোগা হয়ে গেছিস, তোর দিকে তাকালেও গা'টা কেমন করে ওঠে। . . . চমৎকার বিয়ের পাত্র যা হোক!'

তিন

গ্রামের লোকজনের মধ্যে কশেভয় আর দুনিয়াশ্‌কাকে নিয়ে কথা বলাবলি শুরু হয়ে গেছে। একবার ঘাটের কাছে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দুনিয়াশ্‌কার দেখা হতে রীতিমতো বিদ্রূপের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো, মিখাইলকে বুঝি মুনিষ রেখেছ? তোমাদের উঠোন ছেড়ে যে তার নড়ারই নাম নেই। . . .'

মেয়ের শত অনুনয় বিনয়েও ইলিনিচ্‌না তার গোঁ ছাড়ে না। বলে, 'যত হাতে পায়েই ধরিস না কেন, ওর হাতে তোকে তুলে দিতে পারব না! আমার আশীর্বাদ তোরা কোন দিন পাবি নে!' কিন্তু দুনিয়াশ্‌কা যখন জানিয়ে দিল যে কশেভয়ের বাড়ি গিয়ে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লেগে গেল তখন ইলিনিচ্‌না অগত্যা তার মত বদলাল।

ঘাবড়ে গিয়ে সে বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দ্যাখ! ছেলেপুলেগুলোকে নিয়ে আমি একা চালাব কী ক'রে? আমরা যে পথে বসে যাব!'

'সে তুমি যা-ই বল না কেন মা, গাঁয়ের সকলের কাছে হাসির খোরাক হয়ে

আর থাকা চলে না.' তোরঙ্গ থেকে নিজের যত জামাকাপড় আর অন্যান্য জিনিস বার করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে মৃদুস্বরে দুনিয়াশ্‌কা বলল।

ইলিনিচ্‌না অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়াল, তারপর থপথপ্ ক'রে পা টেনে টেনে সামনের কোনায় বিগ্রহের দিকে এগিয়ে এলো।

বিগ্রহ নামিয়ে ফিসফিস ক'রে সে বলল, 'ঠিক আছে মা। তা-ই যদি ঠিক ক'রে থাকিস তাহলে ভগবান তোর সহায় হোন। এদিকে আয়!'

দুনিয়াশ্‌কা চটপট হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ইলিনিচ্‌না বিগ্রহ হাতে ধরে ওকে আশীর্বাদ ক'রে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'এই বিগ্রহ সাক্ষী রেখেই আমার মা আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।... ওঃ তোর বাবা যদি এখন তোকে দেখতেন।... তোর মনে আছে কী বলেছিলেন তোর পছন্দের কথা শুনে? আমার পক্ষে এ যে কী কঠিন, ভগবানই জানেন।...' বলতে বলতে চুপ করে যায় ইলিনিচ্‌না, নীরবে ঘুরে বারান্দায় বেরিয়ে যায়।

গির্জায় যাতে বিয়ের অনুষ্ঠান না হয় তার জন্য মিশ্‌কা কত চেষ্টাই না করল, কনেকে কত করে বোঝাল – কিন্তু একরোখা মেয়ে নিজের জিদ ঠিক বজায় রাখল। ওজর আপত্তি চেপে গিয়ে রাজী হতে হল মিশ্‌কাকে। মনে মনে পৃথিবীর সব কিছুকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে সে বলির পাঁঠার মতো তৈরি হতে লাগল অনুষ্ঠানের জন্য। রাতের বেলায় পাদ্রী ভিস্‌সারিওন একটা পোড়ো গির্জায় মধ্যে বিয়ের মন্ত্র পড়ে ওদের বিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানের পর নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়ে উপদেশছলে তিনি বললেন, 'ওহে ছোকরা সোভিয়েত কমরেড, জীবনটা কী রকম দেখলে ত! গত বছর তুমি নিজের হাতে আমার ঘরে আগুন দিয়েছিল। মানে বাড়িটাকে আমার সঁপে দিয়েছিলে অগ্নিদেবতার কাছে। কিন্তু আজ তোমারই বিয়ের মন্ত্র পড়তে হল আমাকে।... সাধে কি আর বলে, যেই ডালে বসে আছ সেই ডাল কাটতে যেয়ো না। তা যাক গে, তোমার যে জ্ঞান ফিরেছে এবং তুমি যে আবার খ্রীষ্টের মন্দিরের পথ ফিরে পেয়েছ তাতে আমি খুশি, মনে প্রাণে খুশি।'

এটা আর মিশ্‌কা সহ্য করতে পারল না। নিজের দুর্বলতার কথা ভেবে নিজের ওপর নিজেরই রাগ হচ্ছিল তার। ক্ষোভে লজ্জায় সে গির্জাতে সারাক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু পাদ্রীটা রাগ পুষে রেখেছে দেখে আড়চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। দুনিয়াশ্‌কা যাতে না শুনতে পায় এমনি ভাবে ফিসফিস ক'রে জবাব দিল, 'আফশোসের কথা এই যে তখন গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। নইলে বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও পুড়িয়ে মারতাম। বুঝেছ ত?'

আচমকা এই জবাবে পাদ্রী হতভম্ব হয়ে গেলেন। মিশ্‌কার দিকে তাকিয়ে

ঘন ঘন চোখ পিটপিট করতে থাকেন। এদিকে নববধূর পোশাকের হাতা ধরে টান মেরে মিশ্‌কা কঠিন স্বরে বলে, 'চলে এসো!' তারপর মিলিটারী বুটের জোর খটখট আওয়াজ তুলে দরজার দিকে এগোয়।

এই নিরানন্দ বিয়ের উৎসবে কোন গানের ব্যবস্থা ছিল না, গলা ফাটিয়ে গান গীতও হল না। বিয়েতে প্রোখর জিকভ মিতবর ছিল। পরের দিন সে ঘন ঘন থুতু ছিটিয়ে আক্সিনিয়ার কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করল।

'কি বিয়েই দেখলাম আর বোলো না গো! গির্জেতে মিখাইল বিড়বিড় ক'রে পাদ্রীকে কী যেন বলল, তক্ষুনি বাবাজীর মুখ চুন হয়ে গেল। আর বিয়ের খাবার বলতে কী ছিল? এরকম কখনও দেখেছ? ভাজা মুরগী আর খানিকটা ঘোল। . . . এক ফোঁটা চোলাই মালও যদি দিত শয়তানরা! গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ যদি দেখত কেমন হল ওর আদরের বোনের বিয়েটা! . . . নির্ঘাত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ত! না ভাই অনেক হয়েছে! এখন থেকে ওসব নতুন ঢঙের বিয়েতে আমি আর যাচ্ছি নে। কুকুরের বিয়েতেও এর চেয়ে বেশি আমোদ করা যায়। সেখানে অন্তত কুত্তাগুলো নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে, হল্লা হয় অনেক। আর এখানে? – না আছে মদ, না মারপিট! জাহান্নামে যাক নচ্ছার নাস্তিকগুলো! বিশ্বাস করবে না, ওই বিয়ের পর মন মেজাজ আমার এমন খিঁচড়ে গিয়েছিল যে সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি। শুয়ে শুয়ে এমন ছটফট করেছি আর গা চুলকেছি যেন আমার ভেতরে কেউ কতকগুলো ডাঁশ ছেড়ে দিয়েছে। . . .'

কশেভয় যে দিন থেকে মেলেখভদের বাড়িতে অধিষ্ঠিত হল সেদিন থেকে ওদের ঘর-গেরস্থালির চেহারাই একেবারে পালটে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে সে বেড়াটা ঠিক ক'রে ফেলল, স্তেপের মাঠ থেকে গাড়িতে করে খড় বয়ে এনে মাড়াই-উঠোনে পাট ক'রে রাখল, খড়ের গাদার ওপরটা নিপুণ হাতে আঁচড়ে সমান ক'রে দিল। ফসল তোলার জন্য তৈরি হতে হবে। তাই ফসল তোলা যন্ত্রের তাক আর ডানাগুলো নতুন ক'রে বানাল। মাড়াইয়ের জায়গাটা সযত্নে পরিষ্কার করল। পুরনো ঝাড়াই কলটা মেরামত করল, ঘোড়ার সাজও ঠিকঠাক করল। মনে মনে ওর ইচ্ছে ছিল একজোড়া বলদ বদলে একটা ঘোড়া আনাবে। বেশ কয়েকবার দুনিয়াশ্‌কাকে বলেওছে, 'একটা ঘোড়া আমাদের দরকার। এই জোড়া খুরওয়ালা মহাপুরুষদের দিয়ে গাড়ি চালানো এক শাস্তিবিশেষ।' গুদামঘরে এক বালতি সাদা আর নীল রঙ পেয়ে যেতে ঠিক ক'রে ফেলল রঙজ্বলা পুরনো খড়খড়িগুলো রঙ করতে হবে। মেলেখভদের বাড়ি যখন জানলার উজ্জ্বল নীলে ঝলমল করে পৃথিবীর দিকে তাকাল তখন মনে হল বুঝি তার যৌবন ফিরে এসেছে।

বেশ উদ্যোগী গেরস্থই বলতে হয় মিশ্‌কাকে। পালাজ্বরে মাঝে মাঝে ভুগলেও হাত গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র সে নয়। ওর সব রকম কাজে সাহায্য করে দুনিয়াশ্‌কা।

বেশি দিন হল বিয়ে না হলেও এরই মধ্যে দুনিয়াশ্‌কার চেহারা চোখে লাগার মতো সুন্দর হয়ে উঠেছে। কাঁধে আর নিতম্বে যেন মাংস লেগেছে। ওর চোখে আর হাঁটাচলার ভঙ্গিতে, এমনকি চুল বাঁধার কায়দাতেও যেন নতুন কী একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আগে ওর চলাফেরার মধ্যে যে স্বাভাবিক আনাড়িপনা, ছেলেমানুষী চপলতা আর ছটফটে ভাব ছিল এখন তার কোন চিহ্ন নেই। মুখে হাসি নিয়ে প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে শান্ত ভাবে সে চেয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে। আশেপাশের আর কোন কিছু ওর নজরে পড়ে না। নবদম্পতির সুখ চিরকালই মোহান্ধ।

যত দিন যাচ্ছে ইলিনিচ্‌না তত বেশি ক'রে টের পায় একটা ভয়ঙ্কর, মর্মন্তুদ নিঃসঙ্গতা যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাকে গ্রাস করতে। যে বাড়িতে সে তার প্রায় সারাটা জীবন কাটিয়ে এসেছে সেখানে এখন সে বাড়তি লোক। দুনিয়াশ্‌কা আর তার স্বামী এমন ভাবে কাজে লেগেছে যেন তারা কোন খালি জায়গায় তাদের নীড় বাঁধছে। ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে ওরা কোন বিষয়ে পরামর্শ করে না, ঘর-সংসারের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিতে গেলে তার অনুমতিও চায় না। বুড়িকে বলার মতো কোন মিষ্টি কথাও যেন ওরা খুঁজে পায় না। কেবল খেতে বসার সময় তার সঙ্গে ওদের মামুলী দুটো চারটে বাক্যবিনিময় হয়। তারপর ইলিনিচ্‌না আবার একা, একা-একাই ডুবে থাকে তার নিরানন্দ চিন্তাভাবনায়। মেয়ের সুখ তাকে আনন্দ দেয় না। বাড়িতে বাইরের একজন লোকের উপস্থিতি অসহ্য লাগে। জামাই তার কাছে সেই আগের মতো বাইরের লোক হয়েই রইল। অমনিতেই জীবনটা তার দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এক বছরের মধ্যে এতগুলো প্রিয়জনকে হারিয়ে দুঃখে বেদনায় জর্জরিত হয়ে করুণ অবস্থায় তার দিন কাটছে। তার বয়স বেড়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে সে। অনেক শোক সে পেয়েছে – বড় বেশিই বা হবে। শোক ঠেকাবার মতো আর শক্তি তার নেই। এখন অন্ধবিশ্বাসের মতো তার মনের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেঁথে বসেছে – বড় ঘন ঘন মেলেখভদের পরিবারের কাছে দর্শন দেওয়া যমের যেন একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই আরও একাধিকবার ওদের পুরনো বাড়ির চৌকাট ডিঙোবে তা আর বিচিত্র কি! দুনিয়াশ্‌কার বিয়ে মেনে নেওয়ার পর ইলিনিচ্‌নার আর একটিই মাত্র ইচ্ছে – গ্রিগোরি ফিরে আসা পর্যন্ত কোন রকমে বেঁচে থাকা, ছেলেপুলেগুলোকে তার হাতে সঁপে দিয়ে চিরকালের মতো চোখ বোজা। দীর্ঘ কঠিন জীবনে এত দুঃখকষ্ট ভোগের পর বিশ্রামের এটুকু অধিকার নিশ্চয়ই তার আছে।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনগুলোর যেন আর শেষ নেই – কিছুতেই কাটতে চায় না।

প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। কিন্তু এই জ্বলুনি ধরা রোদও যেন ইলিনিচ্‌নার শরীরে তাপ সঞ্চার করতে পারে না। ঠাঠা রোদের মধ্যে রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নিথর হয়ে বসে থাকে দেউড়ির ধাপে। আশেপাশের কোন কিছু সম্পর্কে তার কোন বিকার নেই। এখন আর সে আগের সেই ব্যস্তসমস্ত উৎসাহী গৃহকর্ত্রী নয়। কিছু করতে আর মন চায় না। এখন সবই মনে হয় অপ্রয়োজনীয়, অনুপযোগী। তাছাড়া আগেকার মতো খাটাখাটনি করবে সে শক্তিও তার নেই। অনেক সময় বহু বছরের খাটুনিতে কড়া-পড়া হাতদুটো সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আর মনে মনে বলে, 'যাক আমার হাতে যা কাজ করার ছিল, সেরেছে। ... এখন বিশ্রাম নিতে হয়। ... অনেক কাল ত বাঁচলাম ... আর নয়। ... শুধু গ্রিশার আসা পর্যন্ত কোন রকমে বেঁচে থাকা। ...'

মাত্র একবারই ইলিনিচ্‌নার মধ্যে ফিরে এসেছিল আগেকার প্রাণোচ্ছলতা - তাও অল্প কালের জন্য। জেলা-সদর থেকে ফেরার পথে প্রোখর এসেছিল। দূর থেকেই সে চেঁচিয়ে বলে, 'খাওয়াতে হবে কিন্তু, ইলিনিচ্‌না দিদিমা! ছেলের চিঠি এনেছি!'

বুড়ি ফেকাসে হয়ে যায়। তার কাছে এখন চিঠি মানেই নির্ঘাত নতুন কোন দুর্ভাগ্যের সংবাদ। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত, তাও আবার আধখানা জায়গা জুড়ে আছে ভালোবাসা নমস্কারাদির পর্ব। একমাত্র শেষে কয়েকটা ছত্র লিখে গ্রিগোরি জানিয়েছে যে শরৎকাল নাগাদ কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি আসার চেষ্টা করবে। প্রোখর যখন চিঠিটা পড়া শেষ করল তারপর বেশ খানিকক্ষণ আনন্দে ইলিনিচ্‌নার মুখে কোন কথা ধরে না। ওর বাদামী রঙের মুখের ওপর দিয়ে গালের গভীর বলিরেখা বয়ে গড়িয়ে পড়ে মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু চোখের জল। মাথা হেঁট করে জামার হাতায় আর খসখসে হাতে সে চোখের জল মোছে। কিন্তু তারপরও মুখ বয়ে অজস্র ধারে, ঘন ঘন উষ্ণ বারিধারার মতো চোখের জল বুকের আঁচলে বিচিত্র ফোঁটা ফোঁটা দাগ ধরিয়ে টপটপ ক'রে ঝরে পড়ে। মেয়েদের চোখের জল প্রোখরের ভালো ত লাগেই না - সোজা কথায়, তার একদম বরদাস্ত হয় না। তাই বিরক্তি গোপন না ক'রে ভুরু কুঁচকে সে বলে ফেলল, 'এঃ একেবারে ভাসিয়ে দিলে যে গো দিদিমা! অমন ভিজে জিনিস তোমাদের মেয়েমানুষদের কাছে কত আছে বলতে পার? ... কোথায় খুশি হবে তা নয় কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিলে। যাক গে, চললাম আমি। আর নয়। তোমাকে দেখে তেমন আনন্দ পাচ্ছি নে।'

ইলিনিচ্‌নার টনক নড়ে, প্রোখরকে আটকায়।

'বাছা আমার, এমন খবরের জন্যে ... এ আমার কী হল? ... দাঁড়াও, কিছুই খাওয়াব না এ কী করে হয়? ...' অসংলগ্ন ভাবে বিড়বিড় করতে থাকে

বুড়ি। অনেক কাল আগে তোরঙ্গের মধ্যে একটা বোতল লুকিয়ে রেখেছিল। সেইটা খুঁজে বার করে।

প্রোখর বসে পড়ে, গোঁফে তা দেয়।

'এই আনন্দের দিনে তুমি একটু খাবে ত আমার সঙ্গে?' প্রোখর জিজ্ঞেস করে। পরক্ষণেই দুশ্চিন্তা হয় তার। মনে মনে ভাবে, 'দ্যাখো কাণ্ড, আবার শয়তান ভর করেছে আমার জিভের ডগায়! ভাগ করে খেতে হবে, এদিকে বোতলে হয়ত আছেই এই এতটুকু তলানি। . . .'

ইলিনিচ্‌না খেতে রাজী হল না। চিঠিটা সন্তর্পণে ভাঁজ ক'রে বিগ্রহের কুলুঙ্গিতে রেখে দিল। কিন্তু কী যেন মনে হতে আবার তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ হাতে রাখল, তারপর বুকের কাছে গুঁজে রেখে জোরে চেপে ধরল।

দুনিয়াশ্‌কা মাঠ থেকে ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটা পড়ল। হেসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওঃ যত তাড়াতাড়ি আসতে পারে ততই ভালো। নয়ত মা, তোমার শরীরের যা হাল হয়েছে - দেখে চেনা যায় না তোমাকে।'

ইলিনিচ্‌না হিংসেভরে মেয়ের কাছ থেকে চিঠিটা কেড়ে নিল, ফের লুকিয়ে রাখল বুকের কাছে। দু'চোখে খুশি উপচে পড়ছে। একটু হেসে আধখানা চোখ বুজে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যেমন থাকার তেমনি আছি। আজকাল কুকুর-বেড়ালেও আমার নাম করে না। কিন্তু ছোট ছেলে ত মনে করেছে মাকে! ভক্তি সম্মান দেখিয়েছে, ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়েছে তার আদরের মামণিকে। কত ভালোবাসা জানিয়েছে আদরের ছেলেমেয়েদের। আর তোর কথাও ভোলে নি রে! . . . কী হল? অমন হাসছিস যে? হাঁদা কোথাকার! একেবারে হাঁদা মেয়ে রে তুই, দুনিয়াশ্‌কা!'

'আমার কি হাসতেও মানা নাকি মা? কোথায় চললে তুমি?'

'যাই বাগানে গিয়ে আলুক্ষেতে একটু নিড়েনী দিয়ে আসি।'

'কাল আমি নিজে যাব। ঘরেই বসে থাক না বরং। এই বল শরীর খারাপ শরীর খারাপ। এদিকে হঠাৎ কোত্থেকে কাজ টেনে বার করলে।'

'না আমি যাব। . . . বড় আনন্দ আমার। একটু একা থাকতে চাই,' অল্পবয়সী মেয়ের মতো চটপট মাথায় ওড়না জড়াতে জড়াতে ইলিনিচ্‌না তার মনের গোপন ইচ্ছা জানাল।

সবজি বাগানে যাবার পথে সে আক্সিনিয়ার কাছে গেল। প্রথমে ভদ্রতার খাতিরে এটা ওটা নানা কথা বলে শেষকালে চিঠিটা বার করল।

'ছেলে আমার চিঠি লিখেছে গো। মাকে বড় খুশি করেছে। ছুটিতে বাড়ি আসবে জানিয়েছে। নাও পড়শী পড়, আমি আরও একবার শুনি।'

এর পর থেকে আক্সিনিয়াকে প্রায়ই পড়তে হয় এই চিঠিখানা। সন্ধ্যাবেলা ইলিনিচ্না আসে, রুমালে জড়ানো হলদে খামটা বার করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'পড় দেখি মা আক্সিনিয়া। আমার বুকটা আজ কেমন যেন ভার ভার লাগছে। স্বপ্নে আমি ওকে দেখলাম – এই ছোট্টটি, যেমনটি ছিল যখন ইস্কুলে পড়তে যেত তখন। ...'

কালে কপিং পেন্সিলে লেখা অক্ষরগুলো ধেবড়ে গেল। কতকগুলো শব্দ ত একেবারে পড়াই যায় না। কিন্তু তাতে আক্সিনিয়ার কোন অসুবিধা হত না। চিঠিটা তাকে এত ঘন ঘন পড়তে হত যে ওটা তার এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। আরও পরে চিঠির পাতলা কাগজটা যখন একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে তখন আক্সিনিয়া পুরো চিঠির বৃত্তান্ত শেষ ছত্র পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে যেত।

সপ্তাহ দুয়েক পরে ইলিনিচ্না অসুস্থ বোধ করল। দুনিয়াশ্‌কা তখন মাড়াইয়ের কাজে ব্যস্ত। মেয়েকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনার ইচ্ছে ইলিনিচ্নার ছিল না। কিন্তু রান্নার কাজ যে নিজে করবে সে সাধ্যও তার হল না।

'আজ আমি উঠতে পারছি না। তুই একা চালিয়ে নে যা হোক করে,' মেয়েকে সে বলল।

'তোমার কি খারাপ লাগছে মা?'

পুরনো জামার কুঁচিগুলো হাত দিয়ে পাট করতে করতে চোখ না তুলেই ইলিনিচ্না জবাব দিল, 'সারা শরীরে বেদনা। ... ভেতরটা যেন একেবারে ভেঙেচুরে যাচ্ছে। আমার যখন কম বয়স ছিল তখন তোর বাপ একেক সময় ভয়ঙ্কর রেগে মেগে আমাকে মারতে শুরু করত। আর হাতের মুঠিগুলো ত তার ছিল লোহার মতো। ... কোন কোন সময় একটা হপ্তা পড়ে থাকতাম মড়ার মতো। এখনও হয়েছে ঠিক সেই রকম – আমার ভেতরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে মারধোর খেলে যেমন হয়। ...'

'তোমার জামাইকে তাহলে পাঠাই ডাক্তার ডাকতে?'

'তার কোন দরকার নেই। কোন রকমে খাড়া হয়ে যাব।'

পরের দিন সত্যি সত্যিই খাড়া হল ইলিনিচ্না। উঠোনে একটু হাঁটাচলাও করল। কিন্তু সন্ধ্যানাগাদ আবার শুয়ে পড়ল। মুখটা সামান্য ফোলা, চোখের কোলও ফুলোফুলো। রাতে সে বেশ কয়েক বার হাতে ভর দিয়ে উঁচু ক'রে রাখা বালিশ থেকে মাথা তুলেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়েছে – নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। পরে দম আটকানো ভাবটা কেটে গেল। এখন সে চুপচাপ চিত হয়ে শুয়ে থাকতে পারে, এমনকি বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারে। কয়েক দিন কেমন যেন একটা প্রসন্ন বৈরাগ্য আর প্রশান্তির মধ্যে কেটে যায়। একা থাকতে

ইচ্ছে হয় তার। আক্সিনিয়া যখন তাকে দেখতে আসে তখন সে দু'-এক কথায় তার প্রশ্নের উত্তর দেয়। আক্সিনিয়া চলে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ সময় উঠোনে খেলা করছে আর দুনিয়াশ্‌কাও যে কদাচিৎ ওর ঘরে আসে, নানা রকম কথা জিজ্ঞেস করে ওকে উত্যক্ত করছে না এতেই সে খুশি। কোন সমবেদনা বা সান্ত্বনার এতটুকু প্রয়োজন তার আর নেই। এমন এক সময় এসেছে যখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একা থাকা, কেন না নিজের জীবনের অনেক স্মৃতি মনে করাতে হবে তাকে। আধবোজা চোখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকে সে, এতটুকু নড়াচড়া করে না। শুধু ফুলো ফুলো আঙুলগুলো দিয়ে কম্বলের ভাঁজগুলো হাতড়াতে থাকে। সমস্ত জীবনটা ওর চোখের সামনে দিয়ে সরে যেতে থাকে তখন।

কী আশ্চর্য রকমের সংক্ষিপ্ত আর দীন হীন মনে হয় এই জীবনটা। কত বেদনা আর শোকদুঃখ যে ছিল তার মধ্যে সে কথা স্মরণ করতে মন চায় না। স্মৃতি আর চিন্তাভাবনা কেন যেন ঘুরে ফিরে বারবার চলে যায় গ্রিগোরির কাছে। কারণ হয়ত এই যে লড়াইয়ের শুরু থেকে এই এতকালের মধ্যে গ্রিগোরির জন্য তার দুশ্চিন্তা মন থেকে কখনও দূর হয় নি। এখন জীবনের সঙ্গে তার নিজের যতটুকু সম্পর্ক সে কেবল গ্রিগোরির সঙ্গে সম্পর্কেরই সূত্রে। অথবা এমনও হতে পারে যে কালগতিকে বড় ছেলে আর স্বামীর জন্য তার আর্তি ম্লান হয়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে। যারা মারা গেছে তাদের কথা এখন কদাচিৎ মনে পড়ে। তাদের কেবল দেখতে পায় যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ধূসর কুয়াসার ভেতরে। নিজের যৌবন, বিবাহিত জীবনের কথা মনে করতে তেমন ইচ্ছে হয় না তার। যেন কোন প্রয়োজনই ছিল না ওসবের। সবই যেন চলে গেছে বড় দূরে। সেগুলো করার মধ্যে না আছে কোন আনন্দ, না কোন স্বস্তি। শেষ দিকের স্মৃতিচারণের সময় অতীতের দিকে ফিরতে গেলে কঠোর আর সাত্ত্বিক উপলব্ধিতে ভরে ওঠে তার মন। কিন্তু 'ছোট খোকা' তার স্মৃতিতে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় – এত স্পষ্ট, যেন ধরা ছোঁয়া যায়। আবার ওর কথা মনে হওয়ামাত্র ইলিনিচ্‌না শুনতে পায় কেমন বেড়ে ওঠে বুকের স্পন্দন। শেষকালে আবার শুরু হয় সেই দম আটকানো ভাবটা। মুখটা যেন কালিতে লেপে যায়। অনেকক্ষণ সে পড়ে থাকে অচৈতন্য হয়ে। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হয়ে আসতে আবার ওর কথা ভাবে। নিজের শেষ পুত্রসন্তানটিকে সে ভোলে কী করে? ...

একদিন ভেতরের বড় ঘরে শুয়ে ছিল ইলিনিচ্‌না। জানলার বাইরে কিরণ দিচ্ছে মধ্য দিনের সূর্য। আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে চোখ ধাঁধান নীলিমার মধ্যে হাওয়ায় কেশর ফুলিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা সাদা মেঘখণ্ড। চাপা

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে শুধু ফড়িংয়ের একঘেয়ে একটানা ঝিঁঝি ডাক। বাইরে জানলার ঠিক নীচে যবের মতো দেখতে বুনো গাছ আর শ্যামাধানের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির ভিতের গায়ে লেপ্‌টে টিকে আছে বাথুয়া শাকের গাছগুলো – অর্ধেক এলিয়ে পড়লেও রোদের তাতে পুড়ে যায় নি। সেই ঝাড়ের মধ্যেই আস্তানা গেড়ে তান জুড়ে দিয়েছে ফড়িংগুলো। ইলিনিচ্‌না কান পেতে শোনে তাদের অবিরাম ঝিঝি ডাক। রোদে তপ্ত ঘাসের গন্ধ ভেতরের ঘরে ঢুকে তার নাকে এসে লাগে। মুহূর্তের জন্য স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মতো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আগস্টের রোদে পোড়া স্তেপপ্রান্তর, গমক্ষেতে ফসল কাটার পর সোনালি নাড়া আর ময়ূরকণ্ঠী রঙের আবছা কুয়াশায় ঢাকা কাঁচা নীল আকাশ। . . .

ইলিনিচ্‌না পরিষ্কার দেখতে পায় সোমরাজ লতা ঢাকা আলপথে বলদ চরছে। গাড়ির মাথায় তেরপলের ছই। ফড়িংগুলোর ফাটা ফাটা ঝিঁঝি আওয়াজ শোনে, সোমরাজের তেতো ঝাঁঝাল গন্ধে নিশ্বাস নেয়। . . . নিজেকেও দেখতে পায় সে – অল্পবয়সী, সুন্দর সুঠাম। . . . ওই ত সে চলেছে ত্রস্ত পায়ে ক্ষেতের চালার দিকে। মাঠের নাড়াগুলো খরখর করছে তার পায়ের তলায়, ফুটছে মোজা-ছাড়া পায়ের ডিমে। গরম হাওয়ায় শুকিয়ে যাচ্ছে ঘাগরার নীচে গোঁজা জামাটার ঘামে ভেজা পিঠের দিকটা। রোদে পুড়ে যাচ্ছে ঘাড়। লাল টকটক করছে মুখখানা, রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে যেতে ঝাঁ ঝাঁ করছে দু'কান। একটা হাত বাঁকিয়ে দুধে টসটসে টানটান ভারী স্তনদুটোকে সে ধরে রেখেছে। একটা বাচ্চার ফোঁপানি কান্না শুনে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে, চলতে চলতে ব্লাউজের বোতাম খুলছে।

রোদে-হাওয়ায় শুকনো তার ঠোঁটদুটো কাঁপে, ঠোঁটের কোনায় হাসি ফুটে ওঠে যখন গাড়িতে ঝোলানো দোলনা থেকে কোলে তুলে নেয় রোদে পোড়া একরত্তি খোকা তার আদরের গ্রিশাকে। গলার ক্রুশ-ঝোলানো ঘামে ভেজা ডুরিটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সে তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে মাই গুঁজে দেয়, চাপা দাঁতের ফাঁকে ফিসফিস ক'রে বলে, 'সোনা আমার, মানিক আমার। আমার চাঁদের কণা! না খাইয়ে তোকে মেরে ফেলল তোর মা'টা। . . .' ছোট্ট গ্রিশ্‌কা তখনও অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছে, মাই চুষছে, খুদে খুদে দাঁত দিয়ে মাইয়ের বোঁটা কামড়াচ্ছে, ব্যথা ধরিয়ে দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে শান পাথরে ঘসে কাস্তে শানাচ্ছে গ্রিশ্‌কার বাপ। নওজোয়ান, কালো গোঁফজোড়া। চোখের নামানো পাতার ফাঁক দিয়ে ইলিনিচ্‌না দেখতে পায় তার মুখের হাসি আর হাসি-হাসি দু'চোখের নীলচে সাদা ডেলা। . . . গরমে ইলিনিচ্‌নার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, গালে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। চোখের সামনে আলো ম্লান হয়ে আসে। . . .

সম্বিৎ ফিরে আসতে চোখের জলে ভেজা মুখের ওপর হাত বুলায় ইলিনিচ্‌না।

অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে কষ্ট পায়। থেকে থেকে ভীষণ ভাবে দম আটকে আসে। সময় সময় চৈতন্য হারিয়ে ফেলে।

সন্ধ্যার পর দুনিয়াশ্‌কা আর তার স্বামী শুয়ে পড়েছে। সেই সময় ইলিনিচ্‌না তার শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে আঙিনায় বেরিয়ে পড়ল। পাল থেকে একটা গোরু ছুটে হারিয়ে যাওয়ায় সেটাকে বেশ অন্ধকার পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করার পর বাড়ি ফিরছিল আক্সিনিয়া। দেখতে পেল ইলিনিচ্‌না টলতে টলতে ধীরে ধীরে পা ফেলে মাড়াই উঠোনে গেল। আক্সিনিয়া অবাক হয়ে ভাবল, 'অসুস্থ শরীর নিয়ে ওখানে গেল কেন?' সাবধানে নিজেদের বাড়ির উঠোন আর মেলেখভদের মাড়াই উঠোনে মাঝখানের বেড়ার কাছে এগিয়ে এসে সে মাড়াই উঠোনে উঁকি মারল। পূর্ণিমার চাঁদ আলো দিচ্ছে। স্তেপের মাঠ থেকে হাওয়া ছুটে আসছে। মাড়াইয়ের দুড়মুশ পেটানো সমান জায়গাটার ওপর আঁটি বাঁধা খড়ের গাদার ছায়া পড়েছে গাঢ় হয়ে। দু'হাতে বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে ইলিনিচ্‌না তাকিয়ে আছে স্তেপের মাঠের দিকে, যেখানে দুর্গম দূর আকাশের তারার মতো দপ দপ ক'রে জ্বলছে ঘেসেড়েদের জ্বালানো আগুনের কুণ্ড। আক্সিনিয়া পরিষ্কার দেখতে পেল জোছনার নীলচে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ইলিনিচ্‌নার সামান্য ফোলা মুখখানা। মাথায় জড়ানো কালো ওড়নার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে একগোছা সাদা চুল।

ইলিনিচ্‌না তাকিয়ে রইল ধূ ধূ প্রান্তরের আবছা নীলিমার দিকে। তারপর যেন তার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন ভাবে নীচু গলায় ডাকল, 'গ্রিশ্‌কা! ওরে খোকা আমার!' একটু চুপ ক'রে থেকে এবারে অন্য সুরে আরও নীচু আর ধরা গলায় বলল, 'বুকের ধন আমার!'

প্রাণ আকুলি বিকুলি করা এক দুর্বোধ্য আতঙ্কের উপলব্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে শিউরে ওঠে আক্সিনিয়ার সর্বাঙ্গ। চট করে বেড়ার ধার থেকে সরে এসে সে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

সেই রাতে ইলিনিচ্‌না বুঝতে পারল শিগগিরই সে মারা যাবে, মৃত্যু তার শিয়রে এসে খাড়া হয়েছে। ভোরবেলায় তোরঙ্গ থেকে গ্রিগোরির একটা জামা বার ক'রে ভাঁজ ক'রে বালিশের তলায় রাখল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর যে পোশাক তাকে পরানো হবে সেটাও ঠিক ক'রে রাখল।

সকালে দুনিয়াশ্‌কা রোজকার মতো মাকে দেখতে এলো। বালিশের তলা থেকে গ্রিগোরির সযত্নে ভাঁজ করা জামাখানা বার ক'রে নীরবে দুনিয়াশ্‌কার দিকে বাড়িয়ে ধরল ইলিনিচ্‌না।

'এটা কী?' অবাক হয়ে দুনিয়াশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'গ্রিশ্‌কার জামা। . . . জামাইকে দিস, পরুক। ওর গায়ের জামাটা ত পুরনো, ঘামে পচে গেছে বোধ হয়। . . .' প্রায় অস্ফুটস্বরে ইলিনিচ্‌না বলল।

দুনিয়াশ্‌কা দেখতে পেল তোরঙ্গের ওপরে মা'র কালো ঘাগরা, জামা আর কাপড়ের চটিজোড়া - শেষ যাত্রার সময় মরা মানুষকে যা যা পরানো হয়। দেখে ফেকাসে হয়ে গেল ওর মুখ।

'এসব মরার পোশাক গুছিয়ে রেখেছ কেন মা? ভগবানের দোহাই, সরিয়ে রেখে দাও! ভগবান তোমার সহায় হোন! এখনও মরার কথা ভাববার সময় হয় নি তোমার।'

'না, না, সময় হয়ে এসেছে . . .' ফিসফিস করে বলল ইলিনিচ্‌না। 'আমার পালা এসেছে। . . . বাচ্চাগুলোকে আগলে রাখিস। যতদিন গ্রিগোরি না ফিরছে ততদিন লক্ষ রাখিস। . . . বুঝতে পারছি, আমি আর ততদিন বাঁচব না . . . নাঃ ওর আসা পর্যন্ত আর সবুর করতে পারলাম না। . . .'

দুনিয়াশ্‌কা যাতে তার চোখের জল দেখতে না পায় তাই দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ইলিনিচ্‌না। ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকল।

তিন দিন পরে ইলিনিচ্‌না মারা গেল। ইলিনিচ্‌নার সমবয়স্কা অন্য স্ত্রীলোকেরা কবর দেওয়ার আগে তার দেহ স্নান করাল, কবরের পোশাক পরিয়ে ভেতরের বড় ঘরে টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখল তাকে। সন্ধ্যাবেলায় আক্সিনিয়া এলো তাকে শেষ বিদায় দিতে। ছোটখাটো চেহারার এই মৃত বৃদ্ধার শান্ত সংযত স্নিগ্ধ মৃত মুখের মধ্যে আগেকার সেই গর্বিত, তেজস্বিনী ইলিনিচ্‌নার মুখের আদল খুঁজে পাওয়া শক্ত। ঠাণ্ডা হলদেটে কপালে ঠোঁট ছোঁয়াতে গিয়ে আক্সিনিয়া লক্ষ করল মাথার সাদা ঘোমটার তলা থেকে বেরিয়ে পরা তার সেই পরিচিত অসংযত পাকা চুলের গোছা আর একেবারে অল্পবয়সী মেয়ের মতো ছোট্ট গোল কানের গহ্বরটা!

দুনিয়াশ্‌কার সম্মতি পেয়ে আক্সিনিয়া বাচ্চাদের নিজের কাছে নিয়ে গেল। নতুন ক'রে মৃত্যুর দেখা পেয়ে ওরা ভয় পেয়ে গেছে। মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে ওদের। আক্সিনিয়া ওদের খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় নিজের কাছে নিয়ে শুল। ওরা দুটিতে নিঃশব্দে দু'দিক থেকে ওর গা ঘেঁসে শুয়ে আছে। ওর প্রিয় জনের এই সন্তানদের জড়িয়ে ধরতে একটা অদ্ভুত উপলব্ধি আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল আক্সিনিয়াকে। ওদের মন কিছু একটা দিয়ে ভালো করে তোলা দরকার, মরা ঠাকুমার চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখা দরকার। তাই আক্সিনিয়া অর্ধস্ফুটস্বরে বলতে শুরু করল ছোটবেলায় শোনা রূপকথার গল্প। বেচারি অনাথ ছেলে ভানিউশ্‌কার গল্পটার শেষ দিকে এসে সে চাপাগলায় সুর করে বলে:

ও হাঁসেরা, রাজহাঁসেরা
আমায় নিয়ে চল্‌
তোদের সাদা পাখার ভরে।
সেই সুদূরে চল্‌
আমার আপন ঘরে
যে দেশ সবার সেরা . . .

গল্পটা শেষ করার আগেই শুনতে পেল সমান তালে তালে একটানা নিশ্বাস ফেলছে বাচ্চারা। মিশাত্‌কা শুয়ে আছে খাটের কিনারায়, আক্সিনিয়ার কাঁধে নিবিড় ভাবে মুখ গুঁজে। ছেলেটার মাথাটা হেলে ছিল, তাই আক্সিনিয়া কাঁধটা একটু নাড়িয়ে সন্তর্পণে ওর মাথা ঠিক করে দিল। হঠাৎ কেমন যেন একটা নিষ্করুণ ব্যাকুলতা ওর বুকের ভেতরটা ভেঙে খান খান করে দিতে লাগল। ভীষণ আক্ষেপে গলা বুজে এলো। মনের সমস্ত ভার আর তিক্ততা ঝরিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কান্নার দমকে দমকে কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু চোখের জলটুকু পর্যন্ত মুছতে পারল না – গ্রিগোরির ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে আছে ওর দু'বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে, তাদের ঘুম ভাঙাতে চাইল না আক্সিনিয়া।

চার

ইলিনিচ্‌নার মৃত্যুর পর কশেভয় এবাড়ির একমাত্র কর্তা, সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়াল। তাই এটাই আশা করা গিয়েছিল যে এখন থেকে সে আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে ঘর-গেরস্থালির অবস্থা ফেরানোর কাজে হাত দেবে, বাড়-বাড়ন্ত ক'রে তোলার দিকে নজর দেবে। কিন্তু কাজে তা দেখা গেল না। যত দিন যায় কাজের ব্যাপারে মিশ্‌কার উৎসাহে ততই ভাঁটা পড়তে থাকে। এখন সে ক্রমেই ঘন ঘন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, সন্ধ্যাবেলায় বেশ অন্ধকার পর্যন্ত বাড়ির দাওয়ায় বসে সিগারেট টানে, আপন মনে কী যেন ভাবে। স্বামীর এই পরিবর্তন দুনিয়াশ্‌কার নজরে না পড়ে পারল না। বেশ কয়েক বার সে অবাক হয়ে লক্ষ করেছে যে-মিশ্‌কা আগে সব কিছু ভুলে থেকে দারুণ উৎসাহে কাজ করত একেক সময় হঠাৎই যেন বলা নেই কওয়া নেই, কুড়ুল বা রেঁদা ছেড়ে দিয়ে এক কোনায় বসে বসে বিশ্রাম করে। ক্ষেতের কাজে, রবিশস্য বুনতে গিয়েও সেই একই ব্যাপার হল। হয়ত দু'-এক খেপ চক্কর দিল, তারপরই বলদগুলোকে থামিয়ে সে সিগারেট পাকায়, অনেকক্ষণ ধরে চষা জমিতে বসে বসে সিগারেট ফোঁকে, ভুরু কোঁচকায়।

বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রখর বাস্তববুদ্ধি পেয়েছিল দুনিয়াশ্‌কা। স্বামীর এই ভাবান্তর দেখে তার দুশ্চিন্তা হল। মনে মনে ভাবল, 'উৎসাহটা বেশিদিন টিকল না দেখছি।... হয় অসুখ করেছে, নয়ত স্রেফ কুড়েমিতে ধরেছে। অমন স্বামীকে নিয়ে বিপদে পড়তে হবে দেখছি। যে কেউ দেখলে ভাববে পরের বাড়িতে আছে। দিনের অর্ধেক সময় বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে, বাকি অর্ধেক সময় গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে। কাজের ত কোন ফুরসৎ নেই।... ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ব্যাপারটা বোঝা দরকার। এমন ভাবে ধীরেসুস্থে কথা পাড়তে হবে যাতে রাগ না করে। ঘর-সংসার নিয়ে এরকম যদি আর বেশি দিন চলতে থাকে তাহলে এ জীবনে আর অভাব অনটন ঘুচবে না।...'

একদিন দুনিয়াশ্‌কা সাবধানে ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যেন আর আগের মতো নেই। কী হয়েছে বল ত? – কোন অসুখবিসুখ হয় নি ত?'

'কিসের অসুখ! অসুখ ছাড়াই ঘেন্না ধরে গেল!' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিয়ে বলদগুলোকে ঠেলা মেরে বোনার কাজে মন দিল মিশ্‌কা।

দুনিয়াশ্‌কা বিবেচনা ক'রে দেখল এরকম জিজ্ঞেসবাদ আর করতে না যাওয়াই ভালো। আসল কথা হল কি স্বামীকে শেখানো – মেয়েমানুষের কম্ম নয়। তাই এখানেই সে কথাবার্তার ইতি হল।

দুনিয়াশ্‌কার সব রকম অনুমানই ভুল ছিল। আগেকার মতো উদ্যম নিয়ে মিশ্‌কার কাজ করার পক্ষে এখন একমাত্র বাধা হচ্ছে ওর এই ধারণা যেন বড় বেশি আগেভাগে সে নিজের গাঁয়ে থিতু হয়ে বসে গেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই এই ধারণা ওর মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বসছে। স্থানীয় খবরের কাগজে ফ্রন্টের খবর পড়ে কিংবা সন্ধ্যায় লাল ফৌজের ভেঙে দেওয়া দলগুলোর কসাকদের মুখে গল্প শুনে মিশ্‌কা ক্ষুণ্ণ মনে ভাবে: 'বড় তাড়াতাড়ি জড়িয়ে পড়লাম ঘরসংসার নিয়ে! অত তাড়ার কোন দরকার ছিল না।' কিন্তু ওকে যা বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে তা হল গ্রামের লোকদের মনোভাব। ওদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে শীতকাল আসতে না আসতে সোভিয়েত শাসনক্ষমতা খতম হবে, ভ্রাঙ্গেল নাকি ক্রিমিয়ার তাম্রিয়া থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং মাখ্‌নোর* সঙ্গে মিলে ইতিমধ্যেই রস্তোভের দিকে এগিয়ে আসছে, আর মিত্রশক্তি নাকি নোভোরসিইস্কে বিশাল এক বাহিনী নামিয়েছে।... একের পর এক গুজব ছড়াতে থাকে গ্রামে – সেগুলোর একটা আরেকটার চেয়ে উদ্ভট। বন্দীশিবির আর খনিতে

---

* নেস্তোর মাখ্‌নো (১৮৮৯ - ১৯৩৪) – গৃহযুদ্ধের সময় দক্ষিণ ইউক্রেনে প্রতিবিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা। ১৯২১ সালে রুমানিয়ায় পলায়ন করে। – অনুঃ

মেয়াদ শেষ করার পর যে সব কসাক ফিরে এসেছে গরমকালটা তারা গ্রামের বাড়িতে খেয়ে দেয়ে মোটা হয়েছে। গ্রামের আর সবাইকে তারা এড়িয়ে চলে। রাতের বেলায় ঘরে চোলাই মদ খায়, নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করে, আর মিশ্‌কার সঙ্গে দেখা হলে উদাসীনতার ভান ক'রে জিজ্ঞেস করে, 'খবরের কাগজ-টাগজ পড় কশেভয়? তা বল দেখি র‍্যাঙ্গেলকে কি শিগ্‌গিরই খতম করতে পারবে ওরা? আচ্ছা এই যে শোনা যাচ্ছে মিত্রশক্তি নাকি আমাদের ওপর আবার চাপ দিচ্ছে এটা কি সত্যি না বাজে কথা?'

এক রবিবার সন্ধ্যাবেলায় প্রোখর 'জিকভ এলো। মিশ্‌কা তখন সবে ক্ষেত থেকে ফিরেছে। দেউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে হাতমুখ ধুচ্ছিল। দুনিয়াশ্‌কা ঘটি করে জল ঢেলে দিচ্ছিল ওর হাতে, হাসিমুখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল স্বামীর রোদে পোড়া রোগা ঘাড়টা। প্রোখর নমস্কার করে দেউড়ির নীচের ধাপে বসল, জিজ্ঞেস করল, 'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচের কোন খবর আছে?'

'না,' দুনিয়াশ্‌কা উত্তর দিল। 'চিঠিপত্র লেখে না।'

'কেন, তার জন্যে মন খারাপ লাগছে নাকি?' হাতমুখ মুছে গম্ভীর মুখে প্রোখরের চোখের দিকে তাকাল মিশ্‌কা।

প্রোখর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জামার খালি হাতাটা ঠিক ক'রে নিল।

'তা আর বলতে! পল্টনের চাকরী বরাবর একসঙ্গে করে এলাম।'

'নতুন ক'রে আবার চালানোর ইচ্ছে আছে নাকি?'

'কী চালানোর কথা বলছ?'

'কী আবার ... পল্টনের চাকরী।'

'আমাদের চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়েছে।'

'আমি ত ভাবলাম তুমি হা পিত্যেশ ক'রে তার পথ চেয়ে বসে আছ - কবে আবার চাকরীতে গিয়ে ঢুকবে,' আগের মতোই গম্ভীর মুখে মিশ্‌কা বলে চলে। 'আবার লড়াই করবে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে। ...'

'অমন কথা কেন বলছ মিখাইল?' ক্ষুব্ধস্বরে প্রোখর বলল।

'কেন বলব না? গাঁয়ে যে সব কানাঘুষো চলছে তা ত শুনতে পাচ্ছি।'

'আমাকে কি কখনও সে রকম বলতে শুনেছ? কোথায় শুনেছ বলতে পার?'

'তুমি নয় ঠিকই, কিন্তু তোমার আর গ্রিগোরির মতো লোকেরা বলছে। তারা সবাই 'নিজেদের লোকজন' কবে এসে তাদের উদ্ধার করবে সেই আশায় দিন গুনছে।'

'আমি কোন 'নিজেদের লোকজনের' আশায় নেই। আমার কাছে সবাই সমান।'

'এই যে সবাই সমান তোমার কাছে, এটাও খারাপ। এসো, বাড়ির ভেতরে এসো। রাগ কোরো না, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।'

প্রোখর অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেউড়ির ধাপ বয়ে উঠল। বারান্দার চৌকাট ডিঙোতে ডিঙোতে বলল, 'কিন্তু তোমার ও ঠাট্টাগুলো ভাই তেমন মজার নয়। . . . পুরনো কথা ভুলে যাওয়া উচিত। অতীতের জন্যে খেসারত ত আমাকে দিতে হয়েছে।'

'পুরনো কথা একেবারে ভুলে গেলে চলবে কেন?' টেবিলের ধারে বসতে বসতে নীরস গলায় মিশ্‌কা বলল। 'বোসো আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবে আজ।'

'বেশ ভাই। সব ভোলা যায় না, সে ত ঠিকই। এই যে হাতখানা খুইয়েছি – ভুলতে পারলে ত খুশিই হতাম। কিন্তু ভুলে থাকার কোন উপায় নেই। প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয়।'

দুনিয়াশ্‌কা টেবিল সাজাচ্ছিল। স্বামীর দিকে না তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তুমি বলতে চাও যারা সাদাদের দলে ছিল তাদের কখনও ক্ষমা করা যায় না?'

'তুমি তাহলে কী ভেবেছিলে?'

'আমি ভেবেছিলাম পুরনো দোষ যারা দেখে তাদের চোখ থাকবে না – কথায় ত তা-ই বলে।'

মিশ্‌কা নিস্পৃহ গলায় বলে, 'সে হয়ত তোমার সুসমাচারে বলে। কিন্তু আমার ত মনে হয় মানুষকে তার কাজের জবাবদিহি অবশ্যই করতে হবে।'

'সরকার কিন্তু এ ব্যাপারে কোন কথা বলে না,' মৃদুস্বরে দুনিয়াশ্‌কা বলে।

বাইরের লোকের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করার ইচ্ছে তার ছিল না। প্রোখরকে নিয়ে মিখাইলের ঠাট্টাটা ওর খাপছাড়া মনে হতে, তাছাড়া ভাইয়ের সঙ্গে খোলাখুলি যে শত্রুতার ভাব দেখাল তার জন্যও মনে মনে মিখাইলের ওপর সে বিরক্ত হয়েছিল।

'সরকার তোমাকে কিছুই বলছে না। তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে সরকারের আলোচনা করার কিছু নেই। কিন্তু সাদাদের চাকরী যারা করছে সোভিয়েত আইনের কাছে তাদের কৈফিয়ত দিতেই হবে।'

'তার মানে, আমাকেও কৈফিয়ত দিতে হবে?' প্রোখর জানতে চায়।

'তুমি হলে গিয়ে একটা গোবেচারী লোক। একটু খাওয়া আর একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেই সন্তুষ্ট। আর্দালিদের কেউ জিগ্‌গেস করতে যাবে না। কিন্তু গ্রিগোরি বাড়ি ফিরে এলে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। বিদ্রোহের ব্যাপারে আমরা জেরা করব তাকে।'

দুনিয়াশ্‌কার দু'চোখে ঝিলিক খেলে যায়। দুধের বাটি টেবিলে রেখে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি জেরা করবে নাকি?'

'হ্যাঁ আমিও জেরা করব,' শান্ত গলায় মিশ্‌কা জবাব দেয়।

'তোমার কিছু করার নেই এ ব্যাপারে! . . . তুমি ছাড়াও জেরা করার লোক

অনেক পাওয়া যাবে। লাল ফৌজে কাজ ক'রে সে ছাড় পেয়ে গেছে। . . .'

দুনিয়াশ্কার গলা কেঁপে উঠল। বুকের সামনের কাপড়ের ঝালর আঙুলে জড়াতে জড়াতে সে বসে পড়ল। বৌয়ের উত্তেজনার ভাবটা বুঝি মিশ্কার নজরে পড়ল না। তাই আগের মতোই শান্ত গলায় সে বলে চলল, 'জেরা করতে আমারও আগ্রহ হবে বৈ কি! আর ছাড় পাওয়ার কথা যদি বল . . . একটু সবুর কর। . . . ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে সে তার যোগ্য কিনা। আমাদের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে সে। এখন মেপে দেখতে হবে কাদের রক্ত পাল্লায় বেশি ভারী। . . .'

দুনিয়াশ্কার সঙ্গে বিবাহিত জীবনে এতকালের মধ্যে এই প্রথম মতের অমিল ওদের। রান্নাঘরে নেমে এসেছে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। মিশ্কা চুপচাপ দুধ খায়, থেকে থেকে তোয়ালে দিয়ে ঠোঁট মোছে। প্রোখর সিগারেট টানে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে দুনিয়াশ্কাকে। তারপর ঘর গেরস্থালির কথা পাড়ে। আরও আধ ঘণ্টাখানেক বসে। যাওয়ার আগে বলে, 'কিরিল গ্রোমভ ফিরে এসেছে। শুনেছ?'

'না। কোত্থেকে?'

'লাল ফৌজ থেকে। সেও এক নম্বর ঘোড়সওয়ার দলে ছিল।'

'ও-ই না তার আগে মামন্তভের দলে কাজ করত?'

'ঠিকই বলেছ।'

'বাহাদুর লড়িয়ে ছিল বটে।' মিশ্কা বাঁকা হাসি হাসল।

'কিসের বাহাদুর! লুটের ব্যাপারে পয়লা নম্বর ছিল। ও কাজে হাত পাকিয়েছিল।'

'শুনেছি বন্দীদের নাকি কেটে ফেলত এতটুকু মায়া মমতা না দেখিয়ে। জুতোজোড়া নেওয়ার জন্যে মেরে ফেলত। শুধু জুতোজোড়ার জন্যে মানুষ খুন?'

'হ্যাঁ সে রকম শুনেছি বটে,' প্রোখর সমর্থন জানাল ওর কথায়।

মিশ্কা বিনয়ের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'তাকেও ক্ষমা করতে বল নাকি? ঈশ্বর তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করেছেন, আমাদেরও তাই করতে হুকুম দিয়েছেন, তাই বলতে চাও?'

'কী আর বলব . . . কিন্তু কী করবে ওর এখন?'

'আমি হলে কিছু একটা করতাম।' মিশ্কা চোখ কোঁচকায়। 'এমন অবস্থা ক'রে ছাড়তাম যাতে ওর আত্মারাম খাঁচাছাড়া না হয়ে যায় না! তবে অমনিতেই ও রেহাই পাবে না। ভিওশেন্স্কায়াতে জরুরী কমিশন* হয়েছে, সেখানে বাছাধন জামাই আদর পাবে।'

* ১৯১৭–১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিশেষ সংস্থা। - অনুঃ

প্রোখর হেসে বলল, 'কথায় বলে না, কুঁজো কবরে গেলে সিধে হয় – সেটা তাহলে ঠিকই। এখন যে লাল ফৌজ থেকে ফিরে এসেছে তাতেও সঙ্গে এনেছে লুটের মাল। ওর বৌটি আমার গিন্নির কাছে বড়াই ক'রে বলছিল মেয়েদের একটা দামী কোট এনেছে, আরও নাকি দামী দামী পোশাক আশাক আর নানা রকমের জিনিসপত্র এনেছে। মাস্‌লাকের ব্রিগেডে ছিল, সেখান থেকে বাড়ি ফিরেছে। নির্ঘাত পলটন থেকে ফেরার হয়েছে। হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে এসেছে।'

'কী হাতিয়ার?' মিশ্‌কা জানতে চাইল।

'বুঝতেই পারছ কী হতে পারে: একটা মাথা-কাটা কার্বাইন বন্দুক, ধর একখানা পিস্তল বা ওই রকম আরও কিছু।'

'সোভিয়েতের অফিসে নাম রেজিস্ট্রি করতে গিয়েছিল কিনা জান?'

প্রোখর হো হো করে হেসে হাত নাড়িয়ে বলল, 'ওকে ওখানে গলায় দড়ি বেঁধেও টেনে নিয়ে যেতে পারবে না! আমি দেখতে পাচ্ছি ও পালানোর তালে আছে। আজ-কালের মধ্যে বাড়ি থেকে সটকান দেবে। কিরিলকে দেখ গিয়ে, হাবভাব দেখে মনে হয় লড়াই করার কথা এখনও সে ভাবছে। তুমি কিনা আমাকে দুষছিলে। না ভাই, ঢের লড়াই করেছি, আর নয়। লড়াইয়ের সাধ আমার ঘুচে গেছে।'

শিগ্‌গিরই প্রোখর চলে গেল। এর খানিকক্ষণ বাদে মিশ্‌কাও ঘর ছেড়ে উঠোনে বের হল। দুনিয়াশ্‌কা বাচ্চাদের খাইয়ে দাইয়ে সবে শুতে যাবে, এমন সময় মিশ্‌কা ঘরে এসে ঢুকল। চটে মোড়া কী একটা জিনিস ওর হাতে।

'এখন আবার কোন্ চুলোয় চললে?' দুনিয়াশ্‌কার গলায় ঝাঁঝের আভাস।

ভালোমানুষের মতো হেসে মিশ্‌কা বলল, 'যে পণ পেয়েছিলাম, তাই বার করলাম।'

সযত্নে জড়ানো মোড়কটা খুলে সে একে একে বার করে একটা রাইফেল, কার্তুজে ঠাসা একটা থলে, একখানা পিস্তল আর দুটো হাতবোমা। বেঞ্চির ওপর সেগুলো সাজিয়ে রেখে একটা থালায় সাবধানে খানিকটা কেরোসিন ঢালে।

'এসব কোত্থেকে?' ভুরু তুলে ইশারায় অস্ত্রগুলো দেখাল দুনিয়াশ্‌কা।

'এগুলো আমার। ফ্রন্ট থেকে আনা।'

'কোথায় রেখেছিলে?'

'যেখানেই রাখি না কেন, পুরোপুরি ভালো ভাবে রাখতে পেরেছি।'

'তোমার পেটে পেটে এত! ... কিছুই বল নি? বৌয়ের কাছেও গোপন কর?'

ব্যাপারটা যেন কিছু না এরকম ভাব ক'রে মিশ্‌কা হেসে বেশ তোয়াজের সুরেই বলল, 'জানার কী দরকার গো তোমার? এটা মেয়েদের ব্যাপার নয়। এ

সম্পত্তি যেমন আছে তেমনি পড়ে থাকতে দাও না, কোন ক্ষতি ত নেই।'

'কিন্তু বাড়িতে নিয়ে এলে কী বলে? এই না তুমি আইন মেনে চলছ, সব জান।... এর জন্যে আইনের কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না?'

মিশ্‌কার মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে।

'তুমি একটা বোকা! কিরিল গ্রোমভ যখন হাতিয়ার নিয়ে আসে তার মানে সোভিয়েত সরকারের ক্ষতি, কিন্তু আমি যখন নিয়ে আসি তখন সোভিয়েত সরকারের লাভ বই ক্ষতি নেই। বুঝতে পারছ তুমি? কার কাছে আমি জবাবদিহি করতে যাব? কী যে ছাই আবোল তাবোল বক ভগবানই জানেন। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড় গে, যাও।'

মিশ্‌কার মতে, যা একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে তা-ই সে নিয়েছে। শ্বেতরক্ষীদের যারা অবশিষ্ট আছে তারা যদি হাতিয়ার নিয়ে ফিরে আসতে থাকে তাহলে ওকে সতর্ক হতে হয় বৈ কি! রাইফেল আর পিস্তলটা সে সযত্নে সাফ করল। পর দিন সকালে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই পায়ে হেঁটে ভিওশেন্‌স্কায়া রওনা দিল।

ফৌজী থলেতে পথের জন্য খাবার দাবার ভরতে ভরতে দুনিয়াশ্‌কা খানিকটা বিরক্ত হয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি আমার কাছে সব চেপে রাখ। ক'দিনের জন্যে যাচ্ছ, কোন্ কাজে যাচ্ছ অন্তত সেটাও ত বলবে, না কি? আমার পোড়া কপাল! এ কী জীবন হল আমার! যাবার জন্যে তৈরি – কিন্তু একটা কথাও বলছে না মুখ ফুটে!... তুমি কি আমার স্বামী, না কি যখন খুশি গলায় পরার মালা?'

'ভিওশেন্‌স্কায়াতে ফৌজী কমিশনের অফিসে যাচ্ছি। আর কী বলব তোমাকে? ফিরে আসি, তখন সব জানতে পারবে।'

ফৌজী থলেটা হাতে নিয়ে মিশ্‌কা দনের দিকে নেমে গেল। ডিঙিতে উঠে বসে ঝপাঝপ দাঁড় টেনে ওপারে চলল।

• • •

ভিওশেন্‌স্কায়াতে মিশ্‌কাকে পরীক্ষা করার পর কমিশনের ডাক্তার সংক্ষেপে তাকে বললেন, 'যাই বলুন না কেন কমরেড লাল ফৌজের সেপাই হয়ে কাজ করা আপনার চলবে না। ম্যালেরিয়া আপনার শরীর একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে। চিকিৎসা করান, নয়ত অবস্থা খারাপ হবে। আপনার মতো লোককে দরকার নেই লাল ফৌজের।'

'তাহলে কী রকম লোক দরকার শুনি? দু'বছর কাজ করলাম, আর এখন হয়ে গেলাম ফালতু?'

'আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার সুস্থ লোকজন। সুস্থ হয়ে উঠুন – তাহলে আপনিও কাজে লাগবেন। প্রেসক্রিপশন ধরুন, ওষুধের দোকানে গিয়ে কুইনিন নিন।'

'হুম্, বুঝলাম।' ফৌজী জামাটা গায়ে দেওয়ার সময় একটা ছটফটে ঘোড়ার ঘাড়ে জোয়াল লাগানোর মতো হাল হল তার। জামার গলার ভেতর দিয়ে মাথা বার করতে দস্তুরমতো ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হল। প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে সে রাস্তায় বেরিয়ে এলো, সোজা হাঁটা দিল পার্টির প্রাদেশিক কমিটির দপ্তরে।

. . .তাতারস্কিতে মিশ্‌কা যখন ফিরে এলো তখন সে গ্রামের বিপ্লবী কমিটির সভাপতি। বৌকে তাড়াতাড়ি দুটো কথায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে বলল, 'এই বারে দেখে নেব।'

'কী ব্যাপার বল ত?' দুনিয়াশ্‌কা অবাক হয়ে যায়।

'সেই একই ব্যাপার।'

'আহা বলবে ত?'

'আমাকে সভাপতি করেছে। বুঝেছ?'

দুনিয়াশ্‌কা ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পেরে গালে হাত দেয়। একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল সে মিশ্‌কাকে। কিন্তু মিশ্‌কা ওর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ময়লা খাকি ফৌজী জামার ওপর বেল্টটা ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে সোজা চলল গ্রাম সোভিয়েতের অফিসের দিকে।

সেই শীতকাল থেকে সোভিয়েতের সভাপতি হয়ে বসে ছিল বুড়ো মিখেয়েভ। চোখে কম দেখে, কানেও কালা। নিজের কাজ তার কাছে বড় ভারী ঠেকছিল। কশেভয়ের কাছে যখন শুনল যে তার বদলি এসেছে তখন তার আনন্দের আর অবধি রইল না।

'এই যে ভাইটি রইল কাগজপত্র, আর এই রইল গ্রাম কমিটির শীলমোহর। সব বুঝে নাও, ভগবানের দোহাই,' অকৃত্রিম আনন্দে ক্রুশ প্রণাম ক'রে হাতে হাত ঘসতে ঘসতে সে বলল। 'চার কুড়ি বয়স হতে চলল আমার। জীবনে কখনও কোন চাকরি বাকরি করি নি। এখন এই বুড়ো বয়সে কিনা আটকে পড়লাম। . . . এসব তোমাদের মতো ছেলেছোকরাদেরই সাজে। আমার কম্ম নাকি? না পাই চোখে ভালো দেখতে, না পাই কানে ভালো শুনতে। . . . কোথায় ঠাকুর দেবতার নাম করব, তা নয় আমায় বসিয়ে দিল সভাপতির চেয়ারে। . . .'

মিশ্‌কা জেলা-সদরের বিপ্লবী কমিটির পাঠানো হুকুমনামা আর নির্দেশগুলোর

ওপর একবার চটপট চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সেক্রেটারী কোথায়?'

'অ্যাঁ?'

'ধুত্তোর! বলি সেক্রেটারী কোথায়?'

'সিকেটারী? ব্যাই বুনতে গেছে। মাথায় বাজ পড়ুক তার, হপ্তায় একবারের বেশি এখানে আসে না। জেলা-সদর থেকে মাঝে মাঝে কাগজপত্তর এনে সেগুলো পড়ে দেখতে হয়-তখন তার টিকিটি খুঁজে পাওয়া ভার। দরকারী কাগজ যেমনকার তেমন পড়েই থাকে-কতদিন যে পড়া হয় না কে জানে। আর আমি ত লেখাপড়ায় একেবারে বকলম! কষ্টেসিষ্টে নাম সই করাটা শিখেছি। পড়তে একদম পারি না। পারার মধ্যে পারি সীল মারতে। . . .'

ভুরু কুঁচকে কশেভয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বিপ্লবী কমিটির অফিস ঘরটা। নোংরা ক্ষতবিক্ষত দেয়ালে শোভা পাচ্ছে মাছি বসার দাগধরা পুরনো ঝরঝরে একখানা মাত্র পোস্টার।

অপ্রত্যাশিত ভাবে কাজ থেকে ছাড়া পাওয়ার আনন্দে বুড়ো এত খুশি যে ন্যাকড়ায় জড়ানো সীলমোহরটা কশেভয়ের হাতে দিতে গিয়ে সাহস ক'রে একটি রসিকতাও ক'রে ফেলল।

'আমাদের দপ্তরের সমস্ত সম্পত্তি বলতে এই। তহবিল বলতে কানাকড়িও নেই। আর মোড়লের দণ্ড ধরার পাট ত সোভিয়েত আমলে উঠেই গেছে, নিয়ম নেই। যদি চাও ত আমার এই বুড়োর হাতের লাঠিগাছা দিতে পারি,' এই বলে ফোকলা হাসি হেসে অ্যাশ কাঠের লাঠিটা বাড়িয়ে দিল মিশ্‌কার দিকে। বহুকালের হাতের ঘসায় চকচকে দেখাচ্ছিল লাঠির বাঁটখানা।

কিন্তু ঠাট্টা তামাশার মেজাজ কশেভয়ের ছিল না। আরও একবার অযত্নে অবহেলায় হতশ্রী ঘরখানার ওপর চোখ বুলাল, তারপর ভুরু কুঁচকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা বুড়ো কত্তা, এবারে ধরে নেওয়া যেতে পারে তোমার কাছ থেকে কাজের ভার আমি বুঝে নিলাম। এবারে কোন কথা না বলে এখেন থেকে চুপচাপ সরে পড় ত বাপু।' বুড়োকে বোঝানোর জন্য চোখের ইশারায় দরজাটা দেখিয়ে দিল সে।

তারপর টেবিলের ধারে বসল। কনুইদুটো অনেকখানি ফাঁক করে টেবিলে রেখে অনেকক্ষণ একা বসে রইল। দাঁতে দাঁত চেপে রইল। ওর নীচের চোয়ালখানা উঁচিয়ে রইল সামনের দিকে। হা ভগবান, এত দিন কোন্ ভূত ঢুকেছিল ওর মাথায়! ঘাড় গোঁজ করে মাটি কুপিয়ে গেছে, একবারও মাথা তুলে দেখার বা শোনার চেষ্টা করে নি ওর আশেপাশে সত্যি সত্যি কী ঘটছে। . . . নিজের ওপরে, চারপাশের সমস্ত কিছুর ওপরে যা রাগ হচ্ছিল বলে বোঝানো যায় না।

টেবিলের ধার থেকে উঠে দাঁড়াল মিশ্‌কা। গায়ের ফৌজী জামাটা ঠিক ক'রে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপেই দূরের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠল, 'দাঁড়াও বাছাধনেরা সোভিয়েত সরকার কাকে বলে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব!'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শেকল তুলে ভালো ক'রে দরজা বন্ধ করে দিল। বারোয়ারি তলার ভেতর দিয়ে পা বাড়াল বাড়ির দিকে। গির্জার কাছে আসতে উঠতি বয়সের ছেলে আন্দ্রেই অব্‌নিজভের সঙ্গে দেখা হতে বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে ওর নমস্কারের প্রত্যুত্তরে মাথা ঝুঁকিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ কী যেন মনে হতে ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'এই আন্দ্রেই! দাঁড়াও দেখি! একটু এদিকে এসো!'

আন্দ্রেই ছেলেটা একটু লাজুক গোছের। মাথার চুল পাট রঙের। চুপচাপ মিশ্‌কার দিকে এলো সে। বড় মানুষের মতো খাতির দেখিয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মিশ্‌কা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছিলে? ওই দিকটাতে? ও, বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি? কাজে? তা বেশ, বেশ। একটা কথা তোমাকে জিগ্‌গেস করতে যাচ্ছিলাম আমি। আচ্ছা তুমি ত বোধ হয় প্রাইমারীর উঁচু ক্লাস শেষ করেছিলে, তাই না? বাঃ বেশ! আপিসের কাজকম্ম কিছু জান?'

'কী ধরনের?'

'এই সচরাচর যেমন হয় আর কি। কোনটা জমা পড়ছে কোনটা যাচ্ছে. . . এরকম নানা ধরনের। জান?'

'কিসের কথা বলছ কমরেড কশেভয়?'

'মানে আপিস–কাছারির কাগজপত্তর যেমন হয়। জান সে সব কাজ? কোনটা আসছে, কোনটা বা যাচ্ছে, এছাড়াও অবিশ্যি আরও নানা রকমের আছে।' মিশ্‌কা আন্দাজে আঙুল নাড়িয়ে গুনতে যায়, তারপর ছেলেটার জবাবের অপেক্ষা না ক'রে বেশ জোর দিয়ে বলে ওঠে, 'যদি না জান পরে ঠিক শিখে ফেলবে। আমি এখন গাঁয়ের বিপ্লবী কমিটির সভাপতি। তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে – তোমাকে আমি সেক্রেটারী ক'রে নিলাম। এখুনি চলে যাও বিপ্লবী কমিটির আপিস ঘরে, কাজকম্ম দেখেশুনে নাও – সব টেবিলে আছে। আমি এই ফিরলাম বলে। বুঝলে?'

'কমরেড কশেভয়!'

মিশ্‌কা অধৈর্য ভাবে হাত নেড়ে ওর ওজর আপত্তি নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, 'বাকি সব কথাবার্তা পরে হবে। এখন গিয়ে কাজের ভার নাও গে।' ধীরে ধীরে মাপা পায়ে মিশ্‌কা এগিয়ে চলে রাস্তা ধরে।

বাড়ি ফিরে সে নতুন সালোয়ার পরল। জেবের ভেতরে পিস্তলখানা পুরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা সযত্নে পাট করতে করতে বৌকে বলল,

'একটু কাজে বেরোচ্ছি। কেউ যদি জিগ্গেস করে সভাপতি মশাই কোথায় তা হলে বোলো শিগ্গিরই ফিরবে।'

সভাপতির পদ বলে কথা - কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে।... মিশকা গুরুগম্ভীর গদাইলস্করি চালে পা ফেলে চলে। ওর চলার ধরনটা এমন অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে গ্রামের লোকজন তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ওর যাওয়া। একটা গলির ভেতরে প্রোখর জিকভের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেতে প্রোখর তামাসা ক'রে ওকে সম্মান দেখিয়ে পিছু হটে বেড়ার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'আরে মিখাইল, তোমাকে দেখে যে চেনার উপায় নেই! কাজের দিনে অমন ফুলবাবুটি সেজে বেরিয়েছ - যেন কুচকাওয়াজে চলেছ।... আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসার সাধ হয়েছে নাকি অ্যাঁ?'

'কতকটা তা-ই,' অর্থপূর্ণ ভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মিখাইল উত্তর দেয়।

গ্রোমভদের বাড়ির ফটকের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তামাকের বটুয়ার জন্য পকেট হাতড়াল। পেছনের প্রশস্ত আঙিনা, বার বাড়িতে গেরস্থালির ছড়ানো ছিটানো দালানকোঠা আর জানলাগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।

কিরিল গ্রোমভের মা সবে বারন্দা থেকে নেমে আসছিল। পেছন দিকে হেলে একটা গামলা ভরে কাটা কুমড়োর ফালি বয়ে আনছিল গোরু শুয়োরগুলোকে খাওয়ানোর জন্য। মিশ্কা সসম্ভ্রমে তাকে নমস্কার জানিয়ে দেউড়ির দিকে পা বাড়াল।

'কিরিল বাড়ি আছে মাসিমা?'

'আছে, আছে। ভেতরে চলে যাও,' একপাশে সরে গিয়ে বুড়ি বলল।

বারান্দার মুখটা অন্ধকার। আধা অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দরজার হাতলটা খুঁজে পেল মিশ্কা।

কিরিল নিজে বসার ঘরের দরজা খুলল। খুলেই এক পা পিছিয়ে গেল। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো, মুখে হাসি, একটু যেন নেশা ধরেছে। মিশ্কার ওপর চট্ করে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এই যে আরও একজন সেপাই। ভেতরে এসো কশেভয়, বোসো, বসে যাও আমাদের সঙ্গে। এই একটু আধটু মদ খাচ্ছি আমরা।...'

'তোমাদের বাড়বাড়ন্ত হোক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অক্ষয় হোক।' বাড়ির কর্তার সঙ্গে করমর্দন করল মিশ্কা। টেবিলের ধারে যে-সমস্ত অতিথি বসে ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল।

বোঝাই যাচ্ছে ওর আসাটা সময় মতো হয় নি। মিখাইলের অচেনা এক কসাক কোনায় গড়াগড়ি যাচ্ছিল। ইয়া চওড়া কাঁধ লোকটার। হাতের গেলাসটা

সরিয়ে রেখে চকিতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকাল কিরিলের দিকে। টেবিলের উলটো দিকে বসে ছিল কোর্‌শুনভদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় সেমিওন আখ্‌ভাত্‌কিন। মিখাইলকে দেখে সে ভুরু কুঁচকে চোখ সরিয়ে নিল।

বাড়ির কর্তা মিশ্‌কাকে বসতে বলল।

'নেমন্তন্নের জন্যে ধন্যবাদ।'

'না না তুমি বোসো। রাগ কোরো না। আমাদের সঙ্গে দু'-এক ঢোঁক খেয়ে যাও।'

মিশ্‌কা টেবিলের ধারে এসে বসল। বাড়ির কর্তার হাত থেকে ঘরে চোলাই মদের গেলাসটা নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'তোমার ঘরে ফেরা উপলক্ষে কিরিল ইভানভিচ!'

'শুনে ভালো লাগল ভাই। তুমি কি অনেক দিন হল ফিরেছ পলটন থেকে?'

'তা অনেক দিন হল। ইতিমধ্যে স্থিতু হয়ে বসেও গেছি।'

'শুনছি স্থিতু হয়ে বসেছ, বিয়েও নাকি করেছ। আরে অমন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? নাও, পুরোটা খেয়ে ফেল।'

'আর ইচ্ছে নেই ভাই। তোমার সঙ্গে আমার একটু কাজের কথা ছিল।'

'ও চালাকি ছাড়! ওটি চলবে না ভাই! আজ কোন কাজের কথা নয়। আজ ইয়ার বকসিদের সঙ্গে আমোদফূর্তি করছি। যদি কাজের কথা থাকে ত কাল এসো।'

মিশ্‌কা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শান্ত ভাবে হেসে বলল, 'ব্যাপারটা নেহাৎই সামান্য। তবে সবুর করারও উপায় নেই। বাইরে এসো না এক মিনিটের জন্যে।'

কিরিল তার সযত্নে চুমরানো কালো গোঁফে তা দিতে থাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষকালে উঠে দাঁড়ায়।

'এখানেই বলে ফেল না কেন যা বলার? দল ছেড়ে ওঠার কি খুবই দরকার আছে?'

'না, বাইরে চল', জেদ ধরে থাকলেও সংযত ভাবে মিশ্‌কা বলে।

'আরে যা যা ওর সঙ্গে বাইরে! অত বচসায় কাজ কি?' মিশ্‌কার অচেনা সেই চওড়া কাঁধওয়ালা কসাকটা বলল।

কিরিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। উনুনের ধারে কাজে ব্যস্ত ছিল ওর বৌ। ফিসফিস ক'রে তাকে বলল, 'এখেন থেকে একটু বাইরে যাও ত কাতেরিনা!' এবারে বেঞ্চে বসে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'কত দিন হল তুমি বাড়ি ফিরেছ?'

'কেন? কী হয়েছে?'

'বলি কদ্দিন হল বাড়িতে আছ?'

'এই চার দিন হল মনে হচ্ছে।'

'বিপ্লবী কমিটির আপিসে দেখা করেছিলে?'

'না এখনও করি নি।'

'আর ভিওশেন্স্কায়ার মিলিটারী কমিসারিয়েটের কাছে হাজির হবার কথা ভেবেছ কি কখনও?'

'তোমার মতলবটা কী বল ত? কাজের ব্যাপারে এসেছ ত কাজের কথাই বল না কেন?'

'কাজের কথাই বলছি আমি।'

'তাহলে চুলোয় যাও! তুমি কোথাকার কোন্ মাতব্বর এসেছ হে যে তোমার কাছে আমি কৈফিয়ত দিতে যাব?'

'আমি বিপ্লবী কমিটির সভাপতি। তোমার ইউনিটের কাগজ দেখাও আমাকে।'

'এ-ই ব্যা-পা-র!' টেনে টেনে বলল কিরিল। নেশার ঘোর অনেকটা কেটে যেতে মিখাইলের চোখের মণিতে ধারাল দৃষ্টি বিঁধিয়ে আবার বলে উঠল, 'এই তাহলে ব্যাপার তোমার!'

'হ্যাঁ ব্যাপার তা-ই বটে। দাও তোমার কাগজপত্তর!'

'আজই যাব সোভিয়েতের আপিসে। সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'এখুনি দাও!'

'কোথায় যেন তুলে রেখেছি, খুঁজে বার করতে হবে।'

'খুঁজে বার কর।'

'না এখন খুঁজতে যাব না। বাড়ি যাও মিখাইল। বেশি হাঙ্গামা না বাধিয়ে পথ দেখ।'

'তোমার সঙ্গে হাঙ্গামাটা ছোট করেই সারব। . . .' মিশ্‌কা ডান পকেটে হাত গলাল। 'কোটটা পরে নাও!'

'ছাড় দেখি মিখাইল! আমার গায়ে হাত দিও না বলছি!'

'বলছি চল!'

'কোথায়?'

'বিপ্লবী কমিটির আপিসে।'

'যাবার তেমন ইচ্ছে নেই।' কিরিলের মুখ ফেকাসে হয়ে গেছে, কিন্তু কথাগুলো সে বলল কৌতুকের হাসি হেসে।

বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে মিশ্‌কা পকেট থেকে নাগান পিস্তলখানা বার করে নল উঁচিয়ে ধরল।

'যাবে কি যাবে না?' নীচু গলায় সে জিজ্ঞেস করল।

কিরিল নীরবে বড় ঘরের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু মিশ্‌কা ওর পথ আগলে দাঁড়াল, চোখের ইশারায় বার-বারান্দার দরজা দেখিয়ে দিল।

যেন কিছুই হয় নি এই রকম ভাব ক'রে কিরিল চেঁচিয়ে বলল, 'ভাই সব, আমাকে বোধ হয় ধরে নিয়ে চলল। আমাকে ছাড়াই ভোদকা শেষ কর তোমরা!'

ভেতরের ঘরের দরজা হাঁ হয়ে খুলে গেল। আখ্‌ভাত্‌কিন চৌকাট ডিঙিয়ে আসার জন্য পা ফেলছিল, কিন্তু পিস্তল তার দিকে উঁচিয়ে আছে দেখে চট করে পিছিয়ে চলে গেল দরজার আড়ালে।

'চলে এসো,' মিশ্‌কা হুকুম করল কিরিলকে।

কিরিল হেলেদুলে বাইরের দরজার দিকে এগোল, অলস ভাবে দরজার হাতলটা ধরল। কিন্তু তারপরই আচমকা তড়াক ক'রে বারান্দা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে সশব্দে দরজাটা পেছন থেকে বন্ধ করে দেউড়ির সিঁড়ি থেকে এক লাফ মারল। নীচু হয়ে ঝুঁকে ও যখন উঠোনের ভেতর দিয়ে বাগানের দিকে ছুটছিল সেই সময় মিশ্‌কা বার দুয়েক ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু লক্ষ্য ফসকাল। বাঁ হাতটা বাঁকিয়ে কনুইয়ের ওপর পিস্তলের নল রেখে দু'পা অনেকখানি ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে মিশ্‌কা সযত্নে লক্ষ্য স্থির করল। তৃতীয় গুলিটার পর কিরিল যেন হোঁচট খেল কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে অনায়াসে লাফিয়ে বেড়া টপকে চলে গেল। মিশ্‌কা দেউড়ি ছেড়ে ছুটল। ওর পেছন পেছন বাড়ির ভেতর থেকে রাইফেলের গুলি ছোটার একটা দমকা ফাটা আওয়াজ এলো। সামনে চালাঘরের সাদা চুনকাম করা কাদামাটির দেয়ালে বুলেটটা লাগতে ঝুরঝুর ক'রে বেশ খানিকটা ভাঙা পাথরের ধূসর টুকরো ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কিরিল স্বচ্ছন্দে দ্রুত ছুটছে। আপেলগাছের সবুজ মাথাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঝলক দিচ্ছে তার ঝুঁকে পড়া মূর্তিটা। মিশ্‌কাও লাফিয়ে বেড়া ডিঙোল, কিন্তু পড়ে গেল। শুয়ে শুয়েই পলায়মান কিরিলকে লক্ষ্য ক'রে আরও দু'বার গুলি ছুঁড়ল। তারপর মুখ ফেরাল বাড়ির দিকে। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে কিরিলের মা। চোখের ওপর হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। মিখাইল বুদ্ধিহারা হয়ে মনে মনে ভাবল, 'কোন কথাবার্তা না বলে ওকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা উচিত ছিল!' আরও কয়েক মিনিট সে শুয়ে থাকল বেড়ার ধারে, শুয়ে শুয়ে বাড়িটা দেখতে লাগল, অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো ধীরে ধীরে হাঁটুতে লেগে থাকা কাদা তুলে পরিষ্কার করতে লাগল। শেষকালে উঠে দাঁড়িয়ে কষ্টেসৃষ্টে বেড়াটা ডিঙোল, পিস্তলের নলটা নামিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

পাঁচ

কিরিল গ্রোমভের সঙ্গে সঙ্গে আখ্‌ভাত্‌কিন আর সেই যে অচেনা কসাকটিকে গ্রোমভদের বাড়িতে কশেভয় দেখেছিল সেও গা ঢাকা দিয়েছে। রাতে গ্রাম থেকে উধাও হল আরও দু'জন কসাক। ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে দনের জরুরী কমিশনের একটা ছোটখাটো দল তাতারস্কিতে এসেছিল। জনাকয়েক কসাককে তারা ধরপাকড় করল। চারজন কোন দলিলপত্র ছাড়াই পল্‌টন ছেড়ে চলে এসেছিল। ভিওশেন্‌স্কায়ায় শাস্তিদানের জন্য বিশেষ কম্পানিতে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কশেভয় সারাদিন বিপ্লবী কমিটির ঘরে বসে কাটায়। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে ঘরে ফিরে আসে। গুলিভরা রাইফেলটা খাটের কাছে রাখে, নাগান পিস্তলখানা বালিশের তলায় গুঁজে জামাকাপড় না বদলেই বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিরিলের সঙ্গে সেই ঘটনার দু'দিন বাদে দুনিয়াশ্‌কাকে সে বলল, 'আমরা বরং দরদালানেই শুই না কেন?'

'কেন গো?' দুনিয়াশ্‌কা অবাক হয়ে যায়।

'জানলা দিয়ে কেউ গুলি ছুঁড়তে পারে। খাটটা জানলার কাছেই।'

দুনিয়াশ্‌কা বিনা বাক্যব্যয়ে খাট টেনে নিয়ে এলো দরদালানে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা সে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এই ভাবেই খরগোসের মতো ভয়ে ভয়ে কাটাতে হবে? শীত এসে পড়বে, তখনও এখানেই মাথা গুঁজে থাকতে হবে নাকি?'

'শীতের এখনও অনেক দেরি। তবে আপাতত থাকতে হবে।'

''আপাতত' বলতে কতকাল?'

'যতদিন কিরিল হতভাগাটাকে টিট করতে না পারছি!'

'সে তোমার কাছে মাথা পেতে দেবার জন্যে বসে আছে আর কি!'

'কোন এক সময় পেতে দিতেই হবে।' আত্মপ্রত্যয় ফুটে ওঠে কশেভয়ের জবাবে।

কিন্তু ওর হিসাবে ভুল ছিল। কিরিল গ্রোমভ আর তার সঙ্গী সাথীরা দনের ওপারে কোন এক জায়গায় গিয়ে লুকিয়েছিল। মাখ্‌নোর দল এগিয়ে আসছে খবর পেয়ে তারা আবার দন পার হয়ে ডান তীরে চলে আসে। সেখান থেকে তারা রওনা দিল ক্রাসনকুত্‌স্কায়া জেলা-সদরের দিকে, কেন না কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল মাখ্‌নোর দলের অগ্রবর্তী বাহিনীগুলো নাকি ওখানেই অবস্থান করছে। রাত্রে কিরিল গ্রামে এসেছিল। রাস্তায় দৈবাৎ প্রোখরের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে কশেভয়কে সে তার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে একথাও বলে দেয় যে শিগ্‌গিরই অতিথির আশা করতে পারে। পরদিন সকালে প্রোখর সে খবর মিশ্‌কাকে জানাল।

প্রোখরের মুখে বৃত্তান্ত শোনার পর মিশ্‌কা বলল, 'বেশ ত, আসুক ফিরে!

একবার পার পেয়েছে, তাই বলে পরের বার আর পালাতে হচ্ছে না। ওদের মতো লোকদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয় সে শিক্ষা আমি ওর কাছ থেকে পেয়েছি। সেজন্য ওকে ধন্যবাদ।'

সত্যি সত্যি দনের উজান এলাকার সীমানায় মাখনোর আবির্ভাব ঘটেছিল। ভিওশেনস্কায়া থেকে ওর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য একটা পদাতিক ব্যাটেলিয়ন পাঠানো হয়েছিল। কন্‌কোভ গ্রামের কাছে ছোটখাটো এক লড়াইয়ে ব্যাটেলিয়নটা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কিন্তু প্রদেশের কেন্দ্রের দিকে না গিয়ে সে এগিয়ে গেল মিল্লেরোভো রেল স্টেশনের দিকে। স্টেশনের খানিকটা উত্তরে রেল লাইন পার হয়ে স্তারোবেল্‌স্কের পথ ধরল। শ্বেতরক্ষী কসাকদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় যারা ছিল তারা ওর সঙ্গে ভিড়ে গেল। কিন্তু বেশির ভাগই রয়ে গেল বাড়িতে। কী হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কশেভয় সেই একই রকম সজাগ হয়ে দিন কাটাচ্ছে, গ্রামের সমস্ত ঘটনার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে যাচ্ছে। তবে তাতারস্কির জীবনযাত্রা এই সময় খুব একটা সুখের ছিল না। অভাব অনটনের ফলে যে সমস্ত দুর্গতি তাদের ভোগ করতে হচ্ছে তার জন্য চুটিয়ে তারা সোভিয়েত সরকারকে গালাগাল করছে। গ্রামে সম্প্রতি যে ক্রেতা সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে তার ছোট্ট দোকানটাতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সাবান, চিনি, নুন, কেরোসিন, দেশলাই, তামাক, গাড়ির চাকার তেল এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কোনটাই নেই। দোকানের হা-হা খালি তাকের ওপর শোভাবর্ধন ক'রে পড়ে থাকে দামী আস্‌মোলভ সিগারেটের প্যাকেট আর কিছু লোহা-পেরেক ধরনের জিনিসপত্র। মাসের পর মাস সেগুলোর সচরাচর কোন খদ্দের থাকে না।

গ্রামের লোকেরা রাতের বেলায় ডিবেতে করে কেরোসিনের জায়গায় গাওয়া ঘি বা চর্বি জ্বালায়। দোকানে কেনা তামাকের বদলে লোকে ঘরে তৈরী তামাক ব্যবহার করছে। দেশলাইয়ের বদলে এখন সর্বত্র চলছে চকমকি আর তাড়াতাড়িতে কামারের তৈরি লোহা-কাঠি। আগুন যাতে তাড়াতাড়ি ধরে তার জন্য সূর্যমুখীর ছাই আর ফুটন্ত জল মিশিয়ে তাতে আগুন ধরানোর নুড়ো সেদ্ধ করা হয়। কিন্তু লোকের অভ্যাস না থাকায় এত করেও আগুন পাওয়া শক্ত। অনেক বার বিপ্লবী কমিটির দপ্তর থেকে বাড়ি ফেরার পথে মিশ্‌কা লক্ষ করেছে কোন একটা গলির ভেতরে সিগারেটখোররা গোল হয়ে একটা জায়গায় বসে একসঙ্গে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে আর চাপা গলায় খিস্তি খেউড় করতে করতে বলছে, 'সোভিয়েত সরকার, আগুন দাও!' শেষকালে ওদের একজন হয়ত কষ্টেসৃষ্টে ফুলকি ক'রে শুকনো নুড়োর ওপর ফেলতে পেরেছে, নুড়োটা একটু জ্বলে

উঠেছে – অমনি সকলে মিলে মহা উৎসাহে সেই ধিকিধিকি আগুনের কণায় ফুঁ দিতে শুরু করল। উটকো হয়ে চুপচাপ বসে তারা সিগারেট ফোঁকে আর স্থানের খবরাখবর চালাচালি করে। সিগারেট পাকানোর কাগজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। গির্জার পাহারাঘর থেকে নথিপত্রের সমস্ত খাতা একে একে খোয়া গেল। সেগুলো সিগারেটের আগুনে চলে যাবার পর নিজেদের ঘরের কাগজপত্র ছেঁড়া শুরু ক'রে দিল কসাকরা। বাচ্চাদের পাঠশালার পুরনো বইপুঁথি, এমনকি বুড়োদের শাস্ত্রের পুঁথি পর্যন্ত বাদ গেল না।

মেলেখভদের এককালের খামারবাড়িতে প্রোখর জিকভের বেশ ঘনঘন যাওয়া আসা। মিখাইলের কাছ থেকে সে সিগারেটের কাগজ চেয়ে নেয়। দুঃখ ক'রে বলে, 'গিন্নির তোরঙ্গের ডালার ভেতরটায় পুরনো খবরের কাগজ সাঁটা ছিল। টেনে খুলে নিয়ে তাই দিয়ে তামাক পাকিয়ে টেনেছি। বাইবেলের 'নতুন বিধান' ঘরে ছিল – ওরকম একটা ধম্মের বই – তাও ফুঁকে দিয়েছি। তারপর 'পুরাতন বিধান' ফুঁকে শেষ করলাম। সাধুসন্তরা ওসব পুঁথি ত খুব বেশি লিখে যেতে পারেন নি। গিন্নির একটা কুলুজী ছিল – জ্যান্ত মরা সমস্ত জ্ঞাতিগোত্রের নাম তাতে লেখা – সেটাও শেষ করে দিয়েছি। এখন কী করি? বাঁধা কপির পাতা দিয়ে সিগারেট পাকাতে বল নাকি? নাকি ভাঁটুই পাতা দিয়ে সিগারেটের কাগজ বানাব? না, মিখাইল তোমার যা খুশি বল – একখানা খবরের কাগজ আমায় দিতেই হবে। সিগারেট না খেলে আমার চলে না। জার্মান যুদ্ধের সময় আমি কখন কখন কয়েক ছটাক তামাকের বদলে আমার বরাদ্দ রুটি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছি।'

সে বছর শরৎকালে তাতারস্কির জীবনযাত্রা মোটেই সুখের ছিল না।... গাড়ির চাকায় তেল না পড়ায় চলার সময় ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তোলে। বুটজুতো আর ঘোড়ার সাজ আলকাতরার পালিশের অভাবে শুকিয়ে ফেটে চরচর করে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ হল নুনের অভাব। আড়াই সের নুনের জন্য তাতারস্কির কসাকদের একটা বেশ পুরুষ্টু ভেড়া ছেড়ে দিতে হল ভিওশেনস্কায়ার হাটে। সোভিয়েত সরকারের এই অরাজকতাকে শাপশাপান্ত করতে করতে তারা বাড়ি ফিরল। এই হতচ্ছাড়া নুন মিখাইলকেও কম ঝামেলায় ফেলে নি।... একবার গ্রামের বুড়োকর্তারা ওর অফিসে এলো।

ওদের একজন বলল, 'গাঁয়ে নুন নেই সভাপতি মশাই।'

'মশাই-টশাই আজকাল আর নেই,' তাকে শুধরে দিল মিশকা।

'ভুল হয়ে গেছে, অপরাধ নিও নি। পুরনো অভ্যেস কিনা। তা মশাই ছাড়া চলা যেতে পারে, কিন্তু নুন ছাড়া যে আর চলে না।'

'কী করতে বলেন বুড়ো কর্তারা?'

'তুমি, সভাপতি, একটু চেষ্টা-চরিত্তির ক'রে দেখ যাতে নুন আসে। গোরুর গাড়ি ক'রে মানিচ থেকে এতটা পথ ত আমরা আনতে পারি নে।'

'সদরে এ ব্যাপারে খবর পাঠিয়েছি। সেখানে সকলের জানা আছে। শিগ্‌গিরই কিছু পাঠানোর কথা।'

'এ যে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা!' মাটির দিকে তাকিয়ে একজন বুড়ো বলল।

মিশ্‌কা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রাগে মুখ লাল করে দু'পকেট উলটে দেখায়।

'আমার কাছে নুন নেই। দেখতে পাচ্ছ? আমি নিজে সঙ্গে নিয়ে বেড়াই না। আমার হাত উপুড় করলেও বের হবে না। বুঝলে ত বুড়ো কর্তারা?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কানা বুড়ো চুমাকোভ অবাক হয়ে তার একমাত্র চোখ দিয়ে সকলকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কোথায় গেল এই নুন? আগে পুরনো সরকারের আমলে ও নিয়ে কেউ কোন কথাই তোলে নি। সব জায়গায় স্তূপ হয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু এখন কোথাও এক চিমটিও খুঁজে পাবে না।...'

মিশ্‌কা এবারে খানিকটা নরম হয়ে বলল, 'আমাদের সরকারের এখানে কিছু করার নেই। এর জন্যে কেউ যদি দোষী হয় সে হল আগেকার সরকার, ক্যাডেটদের সরকার। ওই সরকারই সব জায়গায় এমন ভাঙন ধরিয়ে রেখেছে যে নুন বয়ে আনার গাড়ি পর্যন্ত পাবার উপায় নেই! সমস্ত রেল লাইন ভেঙেচুরে দিয়েছে, ওয়াগনগুলোর অবস্থাও তাই।...'

কেমন করে শ্বেতরক্ষীরা পিছু হটার সময় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে, কলকারখানা উড়িয়ে দেয়, গুদাম পুড়ায়, মিশ্‌কা অনেকক্ষণ ধরে বুড়োদের তার বৃত্তান্ত দিল। এর কিছু কিছু লড়াইয়ের সময় সে নিজের চোখে দেখেছিল, কিছু অন্যের মুখে শোনা। বাকিটুকু সে সোৎসাহে বানিয়ে বলল - একমাত্র উদ্দেশ্য ওর সাধের সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া। লোকের নিন্দার হাত থেকে এই সরকারকে বাঁচানোর জন্য সে কারও মনে কোন ব্যথা না দিয়ে নানা রকম চালাকি খাটিয়ে অম্লানবদনে মিথ্যে বলে যায় আর নিজের মনে যুক্তি দেয়: 'ওই হারামজাদাগুলোর নামে যদি একটু আধটু বানিয়েই বলি তাতে এমন কী ক্ষতি? অমনিতেই ওরা শূয়োরের বাচ্চা - তাই এতে ওদের লোকসান কিছু হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের লাভ।...'

'তোমরা ভাবছ এই বুর্জোয়াগুলো কাঠের পুতুল নাকি? ওরা মুখ্যু নয়! হাজার হাজার টনের চিনি আর নুনের বিরাট মজুত সমস্ত রাশিয়া থেকে যোগাড়

করে আগেভাগেই তারা ক্রিমিয়াতে নিয়ে চলে গেছে। এখন সেখেন থেকে জাহাজে বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে অন্য সব দেশে - বিক্রি করবে।' বলতে বলতে চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে মিশ্‌কার।

'বলতে চাও চাকার তেলও ওরা নিয়ে চলে গেছে?' অবিশ্বাসের সুরে বলল কানা চুমাকোভ।

'তা নয়ত কী দাদু? তুমি কি ভেবেছ তোমার জন্যে রেখে যাবে? হুঃ তোমার কথা বা খেটে খাওয়া যে-কোন মানুষের কথা ভাবতে ভারী বয়ে গেছে ওদের। ওরা ওই চাকার তেল বেচার লোকও পেয়ে যাবে। ওরা পারলে একটা জিনিসও সঙ্গে নিতে বাদ দিত না, যাতে এখানকার মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়।'

বুড়োদের একজন সায় দিয়ে বলল, 'সেটা অবিশ্যি ঠিক। বড়লোকদের সবারই বড় খাই! সেই আদ্যিকাল থেকে সকলে দেখে আসছে যত ধনী তত লোভী। যখন প্রথম পিছু হটা শুরু হল সেই সময় ভিওশেন্‌স্কায়ার এক বণিক তার সমস্ত সম্পত্তি, একেবারে শেষ কুটোটা পর্যন্ত গাড়িতে তুলেছিল। এদিকে লালেরা একেবারে কাছে চলে এসেছে, তখনও সে গাড়ি ছাড়ে না, লোমের কোট গায়ে বাড়ির চারধারে দৌড়োদৌড়ি করে আর সাঁড়াশি দিয়ে দেয়ালের পেরেক তোলে। বলে, 'ওই হতভাগাগুলোর জন্যে একটাও পেরেক রেখে যাব না।' তাই চাকার তেলও যে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তাতে আর বিচিত্র কি।'

কথাবার্তার শেষে বুড়ো মায়্রায়েভ ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞেস করল, 'সে যাই হোক, নুন ছাড়া আমাদের কী করে চলবে বল?'

মিশ্‌কা হুঁশিয়ার হয়ে পরামর্শ দিল, 'এখনকার মতো মানিচে কিছু গাড়ি পাঠাতে পার। এর মধ্যে আমাদের মজুররা শিগ্‌গিরই নতুন নুন তুলে ফেলবে।'

'লোকে ও দিকে যেতে চায় না। কাল্‌মিকদের উৎপাত আছে, হ্রদ থেকে নুন তুলতে দেবে না আমাদের। ওরা আমাদের বলদ কেড়ে নিয়ে যায়। আমার এক চেনা লোক ওখান থেকে একমাত্র চাবুকখানা হাতে ক'রে ফিরে আসতে পেরেছে। রাতে ভিলিকোক্নিয়াজেস্কায়া ছাড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্র হাতে তিনজন কাল্‌মিক ঘোড়ায় চেপে এসে ওর গাড়ির বলদগুলোকে খুলে নিয়ে পালায়। গলার কাছে ইশারায় হাত চালিয়ে বলে, 'চুপ ক'রে থাক বাপ, নইলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে।...' এর পর কে যাবে বল?'

'অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।' চুমাকোভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বুড়োদের যা হোক ক'রে বুঝ দেওয়া গেল, কিন্তু বাড়িতে ওই নুনের জন্যই দুনিয়াশ্‌কার সঙ্গে বেশ একচোট হয়ে গেল। মোট কথা ওদের দু'জনের সম্পর্ক তেমন ভালো যাচ্ছে না।...

শুরু হয় সেই স্মরণীয় দিনটি থেকে যখন প্রোখরের সামনে সে গ্রিগোরির কথা তোলে। মতের সেই ছোট্ট অমিলটুকু মন থেকে মুছে যায় নি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় খেতে বসে মিশ্‌কা বলল, 'তোমার বাঁধাকপির ঝোল যে একদম আলুনি গো গিন্নি! ওই যে কথায় বলে, আলুনি হলে আছে পাতে, নুন-পোড়া হলে পড়বে পিঠে - সেই ব্যাপার নাকি?'

'তোমার এই সরকারের রাজত্বে নুন পোড়া কখনও হবে না। ঘরে কতটা নুন আছে সে খবর রাখ?'

'কতটা?'

'দু'মুঠোখানেক।'

'অবস্থা খারাপ।' মিশ্‌কা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'বুদ্ধিমান লোকেরা সেই গরমকালেই মানিচে গিয়েছিল নুন আনতে। কিন্তু তোমার তা নিয়ে ভাবার ফুরসৎ কোথায়?' তিরস্কার করল দুনিয়াশ্‌কা।

'কিসে চেপে যেতাম আমি? সবে বিয়ে করেছি তোমাকে, বিয়ের প্রথম বছরে তোমাকে গাড়িতে জুতলে ভালো দেখায় না। এদিকে সত্যিকারের বলদ বলতে . . .'

'তোমার ওই রসিকতা অন্য সময়ের জন্যে তুলে রেখো। আলুনি খাবার যখন গিলতে হবে তখন বোঝা যাবে রসিকতা কাকে বলে।'

'আমার ওপর অমন তেরিয়া হয়ে উঠলে কেন? কোথা থেকে নুন আনতে বল আমায়? তোমরা মেয়েমানুষের জাতটা যে কী . . . দাও দাও আর দাও . . . উগড়ে দিলেও দাও। নিকুচি করেছি তোমার নুনের! যদি না থাকে, কোথা থেকে আনব আমি?'

'অন্যেরা গাড়ি চালিয়ে মানিচে গিয়েছিল। তাদের এখন নুন আছে, দরকারী সবই আছে। আর আমরা বসে বসে আলুনি আর টক খাবার চিবুব। . . .'

'কোন মতে চলে যাবে। শিগ্‌গিরই নুন এসে যাবার কথা। ও জিনিসের কী আর অভাব আছে আমাদের?'

'কোন জিনিসেরই অভাব নেই তোমাদের।'

'তোমাদের মানে?'

'মানে, লালদের।'

'তুমি তাহলে কী?'

'যা দেখছ তাই। যত ছেঁদো কথা তোমাদের: 'আমাদের কোন জিনিসের অভাব হবে না। সবাই সমান হয়ে ধনদৌলতে গড়াগড়ি যাব। . . .' ধনদৌলতের নমুনা ত দেখতেই পাচ্ছি - খাবারে নুনটুকুও জোটে না।'

মিশ্‌কা শঙ্কিত হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়, ফেকাসে হয়ে যায় ওর মুখ।

'কী ব্যাপার তোমার দুনিয়া? এসব তুমি কী বলছ? অমন বলা কি ঠিক?'

কিন্তু দুনিয়াশ্‌কার ততক্ষণে সংযমের বাঁধ ভেঙে গেছে। ক্ষোভে দুঃখে তারও মুখ ফেকাসে হয়ে গেছে। এবারে সে গলা চড়িয়ে চিৎকার শুরু ক'রে দিল।

'কী ঠিক তাহলে? অমন হাঁ ক'রে চেয়ে কী দেখছ? সভাপতিমশাইয়ের জানা আছে কি যে নুনের অভাবে লোকের দাঁতের মাড়ী ফুলতে শুরু ক'রে দিয়েছে? লোকে নুনের বদলে কী খাচ্ছে জান? নোনা বিলের মাটি খুঁড়ে আনছে। নেচায়েভ টিলার ওপাড়ে চলে যাচ্ছে সেই মাটির জন্যে। রান্না খাবারে মিশিয়ে খাচ্ছে। সে কথা শুনেছ কি?'

'সবুর কর। অমন চেঁচিও না। শুনেছি।. . . তারপর।'

দুনিয়াশ্‌কা গালে হাত দিল।

'এর পরও শুনতে চাও?'

'এর মধ্যে দিয়েই কোন রকমে কাটাতে ত হবে?'

'কাটাতে হয় তুমি কাটাও গে।'

'আমি ত কাটাতে পারব, কিন্তু তুমি. . . তোমার ওই মেলেখভ বংশের চরিত্র যে একেবারে বেরিয়ে পড়েছে।. . .'

'কী সেই চরিত্র?'

'বিপ্লবের দুশমনী করার চরিত্র, আবার কী।' অস্ফুট স্বরে বলে মিশ্‌কা উঠে পড়ে টেবিল ছেড়ে। চোখ তুলে তাকাতে পারে না স্ত্রীর দিকে। মাটিতে চোখ নামিয়ে রাখে। ঠোঁটদুটো অল্প অল্প কেঁপে ওঠে যখন সে বলে, 'ফের যদি অমন ভাবে কথা বল তাহলে আমাদের আর একসঙ্গে থাকা চলবে না – একথাই জেনে রেখো। তোমার কথাগুলো দুশমনের কথা।. . .'

দুনিয়াশ্‌কা প্রতিবাদে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মিশ্‌কা চোখ টেরিয়ে তাকাল, মুঠো পাকানো হাতখানা তুলে চাপা গলায় বলল, 'চুপ!'

ভয়ের কোন লক্ষণ দেখা যায় না দুনিয়াশ্‌কার মধ্যে। কৌতূহল গোপন না ক'রে ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখে মিশ্‌কার মুখখানা। কিছুক্ষণ বাদে শান্ত হয়ে খুশি গলায় বলে, 'যাক গে, চুলোয় যাক। কী সব আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে এত কথা কাটাকাটি আমাদের। নুন ছাড়াও আমাদের চলে যাবে।' একটু চুপ ক'রে থাকে, তারপর ওর যে মুখ টিপে হাসাটা মিশ্‌কার এত পছন্দ সেই হাসি হেসে বলে, 'রাগ কোরো না গো। আমাদের মেয়েজাতের ওপর অমন যদি কথায় কথায় রাগ কর তা ধরে রাখার ত কোন ঠাঁই হবে না তোমার বুকের ভেতরে।

বুদ্ধির দোষে কী বলতে কী বলে ফেলেছি তা কি ধরতে আছে? . . . কফ সেদ্ধ খাবে নাকি ঘোল খাবে?'

বয়স কম হলে কী হবে, সাংসারিক বুদ্ধিতে দুনিয়াশ্‌কা এখনই বেশ পাকা। তর্কের সময় কখন গোঁ ধরে থাকা যায় আর কখনই বা হার মেনে নিয়ে পিছু হটতে হয় তা ওর জানা ছিল।

এই ঘটনার সপ্তাহ দুয়েক বাদে গ্রিগোরির কাছ থেকে একটা চিঠি এলো। চিঠিতে সে লিখেছে গ্রাসেল ফ্রন্টে সে আহত হয়েছিল, সেরে ওঠার পর খুব সম্ভব মিলিটারী থেকে খারিজ হবে। চিঠির বক্তব্য স্বামীকে জানিয়ে দুনিয়াশ্‌কা সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি আসছে? তাহলে আমাদের থাকার কী ব্যবস্থা হবে?'

'আমার বাড়িতে উঠে যাব আমরা। ও একাই এখানে থাক। বিষয়সম্পত্তি ভাগাভাগি ক'রে নেওয়া যাবে।'

'একসঙ্গে থাকা আমাদের চলবে না। দেখেশুনে মনে হয় আক্সিনিয়াকে বিয়ে করবে।'

'থাকা সম্ভব হলেও তোমার ভাইয়ের সঙ্গে এক বাড়িতে আমি অমনিতেই থাকতাম না,' সাফ কথা জানিয়ে দিল মিশ্‌কা।

দুনিয়াশ্‌কা অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকাল।

'কেন বল ত?'

'কেন, তা ত জানই।'

'কেন না সাদাদের দলে ছিল?'

'ঠিক ধরেছ।'

'ওকে তুমি ভালোবাস না। . . . কিন্তু তোমরা যে বন্ধু ছিলে!'

'বয়ে গেছে আমার ওকে ভালোবাসতে! বন্ধু ছিলাম আমরা, কিন্তু সে বন্ধুত্ব ঘুচে গেছে।'

দুনিয়াশ্‌কা বসে বসে চরকায় সুতো কাটছিল। ঘরঘর একটানা শব্দে ঘুরছিল চরকার চাকা। সুতোটা ছিঁড়ে গেল। হাতের তেলোয় চাকা ধরে থামিয়ে সুতোটা জুড়ে দিতে দিতে দুনিয়াশ্‌কা স্বামীর দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফিরে এলে কসাকদের কাছে যে চাকরী করেছিল তার জন্যে ওকে বিপদে পড়তে হবে নাকি?'

'বিচার হবে। ফৌজী আদালত বিচার করবে।'

'বিচারে কী সাজা হতে পারে?'

'সেটা আমি জানি নে বাপু। আমি ত আর হাকিম নই।'

'গুলি ক'রে মারার হুকুম দিতে পারে?'

বিছানায় মিশাত্‌কা আর পলিউশ্‌কা ঘুমিয়ে ছিল। কান পেতে ওদের সমান

তালে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে সেই দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে মিশ্‌কা জবাব দিল, 'তা পারে।'

আর কোন প্রশ্ন করল না দুনিয়াশ্‌কা। পর দিন সকালে গোরু দোয়ানোর পর সে আক্সিনিয়ার কাছে গেল।

'শিগ্‌গিরই গ্রিশা আসছে। তুমি শুনে হয়ত খুশি হবে তাই খবরটা দিতে এলাম তোমাকে।'

জলপূর্ণ লোহার কড়াইটা নীরবে বসিয়ে রেখে আক্সিনিয়া দু'হাতে বুক চেপে ধরল। ওর মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল। তাই দেখে দুনিয়াশ্‌কা বলল, 'অত খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার উনি বলছেন আদালতের বিচার থেকে রেহাই পাবে না। বিচারে কী সাজা হবে ভগবান জানেন।'

আক্সিনিয়ার ছলছল আর উজ্জ্বল দুই চোখে মুহূর্তের জন্য ভয়ের আভাস ফুটে ওঠে।

'কেন?' কাটা কাটা সুরে সে জিজ্ঞেস করল। দেরি করে হলেও যে হাসি তার ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠেছিল সেটা কোন মতেই সরাতে পারল না।

'বিদ্রোহের জন্যে। আরও যা যা করেছে সব কিছুর জন্যে। . . .'

'বাজে কথা। ওর বিচার হতে পারে না। তোমার মিখাইল কিছুই জানে না। আহা কোথাকার আমার ওঝা এলেন।'

'হয়ত হবে না।' দুনিয়াশ্‌কা একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, 'আমার ভাইয়ের ওপর দারুণ রাগ ওর। . . . মনটা যা ভার হয়ে আছে সে জন্যে – তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না! ভাইয়ের কথা ভেবে ভয় হচ্ছে। আবার জখম হয়েছিল। . . . জীবনটা বড় এলোমেলো ওর। . . .'

'এখন ফিরে এলেই হয়। ছেলেপুলেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাব আমরা,' উত্তেজিত হয়ে আক্সিনিয়া বলল।

কেন যেন মাথায় জড়ানো ওড়নাটা সরিয়ে নিয়েছিল সে। ফের সেটা মাথায় জড়াল। যে ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল কিছুতেই তা দমন করতে না পেরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে বেঞ্চির ওপর থালাবাসনগুলো এধার ওধার সরাতে থাকে।

আক্সিনিয়া যখন বেঞ্চিতে বসে বুকে ঝোলানো পুরনো ছেঁড়া কাপড়খানার ভাঁজগুলো হাঁটুর ওপর সমান করতে লাগল তখন দুনিয়াশ্‌কা লক্ষ করল ওর হাত কাঁপছে।

দুনিয়াশ্‌কার গলার কাছে কী যেন একটা ঠেলে উঠল। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল একা কোথাও বসে কেঁদে মনটা একটু হাল্কা করে।

নীচু গলায় সে বলল, 'মা আর ওকে দেখার জন্যে বেঁচে রইল না।... আচ্ছা আমি চলি। উনুনে আঁচ দিতে হবে আবার।'

বারান্দায় আক্সিনিয়া আনাড়ির মতো চটপট ওর গালে চুমু খেল, তারপর ওর হাতখানা ধরে হাতেও চুমু খেল।

'খুশি ত?' ভাঙা ভাঙা নীচু গলার দুনিয়াশ্‌কা জিজ্ঞেস করল।

'এই একটু আর কি।... অল্প একটুখানি,' কাঁপা কাঁপা হাসি আর তামাসার আড়ালে উদ্‌গত চোখের জল চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে আক্সিনিয়া।

ছয়

মিল্লেরোভো স্টেশনে পল্টন থেকে ছাড় পাওয়া একজন লাল ফৌজী কম্যাণ্ডার হিশেবে গ্রিগোরিকে স্থানীয় একটা গাড়ি ধরিয়ে দেওয়া হল। বাড়ি যাওয়ার পথে প্রতিটি ইউক্রেনীয় বসতিতে সে ঘোড়া বদল করতে করতে চলল। পুরো একদিন গাড়ি চালিয়ে উজানী দন এলাকার সীমানায় এসে পৌঁছুল। প্রথম যে কসাক গ্রামটা পড়ল সেখানকার বিপ্লবী কমিটির সভাপতি - অল্প কিছুদিন হল পল্টন-ফেরত এক ছোকরা লাল ফৌজী - তাকে বলল, 'আপনার গাড়িতে জোতার জন্যে ঘোড়া দিতে পারছি না, কমরেড কম্যাণ্ডার। বলদ দিয়ে চালিয়ে নিতে হবে আপনাকে। ঘোড়া আমাদের সারা গাঁয়ে একখানা। সেটাও আবার তিন ঠ্যাঙে। পিছু-হটার সময় সব ঘোড়া ফেলে রেখে আসা হয়েছে কুবানে।'

টেবিলের ওপর আঙুল বাজাতে বাজাতে সন্ধানী দৃষ্টিতে ছটফটে সভাপতির হাসিখুশি ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'হয়ত ওই ঘোড়াতেই যা হোক ক'রে পৌঁছে যাব।'

'পৌঁছুতে পারবেন না। এক হপ্তা ধরে চললেও না। আহা আপনি অমন ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমাদের বলদগুলো বেশ ভালো, তাড়াতাড়ি চলতে পারে। তাছাড়া অমনিতেও ভিওশেন্‌স্কায়াতে একটা গাড়ি পাঠাতে হত আমাদের। টেলিফোনের তার পাঠাতে হবে - এই লড়াইয়ের পর থেকে আমাদের এখানে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। দেখছেন ত, গাড়ি আপনাকে বদলও করতে হচ্ছে না - এক গাড়িতেই সোজা বাড়ি পৌঁছে যাবেন।' বাঁ চোখটা কোঁচকাল সভাপতি। তারপর ধূর্তের মতো চোখ মটকে একটু হেসে যোগ করল, 'সবচেয়ে ভালো বলদ আপনাকে দিচ্ছি আমরা, আর গাড়োয়ান পাচ্ছেন এক জোয়ান বিধবা।... আছে আমাদের এখানে যে জিনিস - স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না। তার সঙ্গে পথ

চললে নজরই করতে পারবেন না কোন্ ফাঁকে বাড়ি পৌঁছে গেছেন। আমি নিজে পলটনে ছিলাম, তাই লড়াইয়ের সময় এরকম কত জিনিসের দরকার হয় সব জানা আছে আমার।'

গ্রিগোরি মনে মনে হিসাব ক'রে দেখল। পথচলতি গাড়ী ধরার আশা করাটা বোকামি হবে। পায়ে হেঁটে অনেক দূরের পথ। বলদ জুতে যেতে রাজী হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

এক ঘণ্টা পরে গাড়ি এসে হাজির। ঝরঝরে পুরনো গাড়ির চাকাগুলো করুণ আর্তনাদ তুলছে। ছইয়ের পেছনটা বলতে বেরিয়ে আছে কতকগুলো ভাঙাচোরা টুকরো। কোন মতে খানিকটা খড় গাদা ক'রে বিছানো, সেগুলোও এদিক ওদিক ঝুলছে। ছন্নছাড়া জিনিসটার দিকে বিতৃষ্ণাভরে তাকিয়ে গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল, 'এই অবস্থায় এসেছি আমরা শেষকালে!' বলদদুটোর পাশে চাবুক দোলাতে দোলাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলছে গাড়ির মেয়েমানুষ গাড়োয়ানটি। দেখতে বাস্তবিকই ভালো, গড়নটাও বেশ। তবে একটু বেমানান তার দেহের উচ্চতার তুলনায় বড় বেশি স্ফীত বুকটা। আর গেলে চিবুকের ওপর তেরছা কাটা দাগটা যেন তার খুব ভালো অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে না, রোদে পোড়া তামাটে লাল অল্পবয়সী মুখখানার ওপর যেন খানিকটা বয়সের ছাপও ফেলেছে। নাকের খাঁজে কতকগুলো দানার মতো ছড়িয়ে আছে সোনালি রঙের ছোট ছোট মেচেতার দাগ।

মাথার ওড়নাটা ঠিক ক'রে নিয়ে সে চোখ কুঁচকে গ্রিগোরিকে ভালো মতো নিরীক্ষণ করে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে বুঝি?'

গ্রিগোরি দেউড়ির ধাপ থেকে উঠে দাঁড়াল। গ্রেটকোটখানা গায়ে জড়িয়ে নিল।

'হ্যাঁ। তার-টারগুলো উঠিয়েছ?'

'আমি তুলতে যাব কোন্ দুঃখে?' খনখনে গলায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কসাক-মেয়েটা। 'রোজ রোজ গাড়ি চালাতে হচ্ছে, খেটে মরতে হচ্ছে! কী পেয়েছে ওরা আমাকে? নিজেরাই তুলুক ওই তার। যদি না তোলে ত খালি গাড়িই চালিয়ে নিয়ে যাব!'

তা হলেও তারের বাণ্ডিলগুলো টেনে টেনে গাড়িতে তোলে। সেই সঙ্গে গলা চড়িয়ে সভাপতির আদ্যশ্রাদ্ধ করে। তবে তাতে রাগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। থেকে থেকে আড়চোখে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি হানে গ্রিগোরির দিকে। সভাপতি সর্বক্ষণ মুখ টিপে হাসে, বিধবাটির দিকে যে ভাবে তাকায় তাতে তারিফের ভাব চাপা থাকে না। কখন কখন গ্রিগোরিকে চোখ টেপে, যেন বলতে চায়, 'দেখছ কেমন সব মেয়েমানুষ আছে আমাদের এখানে! তুমি কিনা বিশ্বাস করছিলে না!'

গ্রামের ওপারে বহুদূর বিস্তৃত ম্লান ধূসর স্তেপের মাঠ। চষা জমি থেকে রাস্তা পার হয়ে গড়াতে গড়াতে আসছে ময়ূরকণ্ঠী রঙের ধোঁয়ার একটা ধারা। চাষীরা শুকনো ঝোপঝাড় আর রঙজ্বলা শণের ফেঁসোয় আগুন দিয়েছে। ধোঁয়ার গন্ধ গ্রিগোরির মনে জাগিয়ে তুলল করুণ স্মৃতি। এক সময় সেও শরতের নির্জন স্তেপভূমিতে গিয়ে ক্ষেতে লাঙল দিয়েছে, রাতের বেলায় কালো আকাশের বুকে তাকিয়ে দেখেছে তারার মিটিমিটি, কান পেতে শুনেছে আকাশের বুকে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাওয়া হাঁসের ঝাঁকের কলকণ্ঠ। . . . গ্রিগোরি অস্থির হয়ে খড়ের গাদার ওপরে এপাশ ওপাশ করল, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল গাড়োয়ান-মেয়েটার দিকে।

'বয়স কত হল গো তোমার?'

'তা এই ষাট হতে চলল,' একচোখে হেসে ঢং করে জবাব দিল মেয়েটা।

'না, না, ঠাট্টা নয়।'

'একুশ চলছে।'

'অথচ বিধবা?'

'হ্যাঁ।'

'স্বামীর কী হল?'

'মারা গেছে লড়াইয়ে।'

'কত দিন?'

'এই দু'বছর হতে চলল।'

'বিদ্রোহ যখন চলে তখন?'

'না, তার পরে, শরৎকালের মুখে।'

'তাহলে চলছে কী করে?'

'কোন মতে চলছে।'

'একঘেয়ে লাগে না?'

বেশ মন দিয়ে গ্রিগোরিকে সে একবার দেখে নিল। মাথার ওড়নাটা ঠোঁটের ওপর চাপা দিয়ে হাসি লুকাল। ওর গলাটা আরও চাপা শোনাল, তাতে যেন নতুন কিসের টান ফুটে উঠল যখন সে বলল, 'কাজের সময় একঘেয়ে লাগার কোন ফুরসৎ নেই।'

'কিন্তু স্বামী নেই বলে একঘেয়ে লাগে না?'

'আমি শাশুড়ীর কাছে থাকি। ঘরসংসারের প্রচুর কাজ।'

'কিন্তু স্বামী ছাড়া চলছে কী করে?'

মুখ ফিরিয়ে সে তাকাল গ্রিগোরির দিকে। তার রোদে পোড়া গালের ঢিবির

ওপর খেলে গেল রক্তোচ্ছ্বাস। দু'চোখে লালচে স্ফুলকি দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

'কী বলতে চাও?'

'যা বলার তা ত বললামই।'

ঠোঁটের ওপর থেকে ওড়নাটা সরিয়ে সে টেনে টেনে বলল, 'তা সে জিনিসের কোন অভাব নেই। ভালো লোকজনের কি আর কমতি আছে দুনিয়ায়?' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে যোগ করল, 'স্বামীর সঙ্গে মেয়েমানুষের জীবনের সোয়াদ আর তেমন পেলাম কই? মাত্র এক মাস এক সঙ্গে কাটাতে পেরেছিলাম। তারপর ওকে পল্টনে নিয়ে গেল। ওকে ছাড়াই চালিয়ে নিই কোন মতে। এখন তাও একটু সহজ হয়েছে - জোয়ান কসাকরা গাঁয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু আগে অবস্থা খারাপ ছিল। . . . এই রোঁয়া ওঠা বুড়ো, হট্ হট্! এই হল ব্যাপার সেপাইজী! এমনই আমার জীবন!'

গ্রিগোরি চুপ ক'রে গেল। অমন রঙ্গ ক'রে কথা বলার আর প্রবৃত্তি হল না ওর। শুরু করেছিল বলে বরং আফশোসই হল।

সমান তালে পা ফেলে মন্থরগতিতে চলেছে বিশাল আকারের হৃষ্টপুষ্ট বলদদুটো। একটার ডান শিঙখানা কোন এককালে ভেঙে দুমড়ে গিয়েছিল, এখন সেটা গজিয়ে বাঁকা হয়ে কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে। গ্রিগোরি কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে আছে। চোখ আধ বোজা। ছেলেবেলায় এবং পরে বড় হয়ে যে সব বলদ নিয়ে তাকে কাজ করতে হয়েছে গ্রিগোরির মনে পড়তে লাগল তাদের কথা। ওদের প্রত্যেকেরই রঙ, দেহের আকার আর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের, এমনকি শিঙের আকারেও প্রত্যেকের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এক সময় মেলেখভদের বাড়িতে ঠিক এরকমই বিকৃত চেহারার একটা বলদ দেখা গিয়েছিল - সেটারও শিঙটা ছিল দোমড়ানো এক পাশে হেলে পড়া। বদমেজাজী আর ধূর্ত সেই বলদটা সব সময় টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাত, লাল টকটকে, সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় ছাওয়া চোখের সাদা অংশটা ভাঁটার মতো ঘোরাত আর পেছন দিক থেকে কেউ ওর কাছে এগোতে গেলে তাকে লাথি মারার চেষ্টা করত। চাষের মরশুমে কাজের পর সন্ধ্যাবেলায় যখন বলদগুলোকে স্তেপের মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হত তখন ওটার সব সময় ফিকির থাকত দলছুট হয়ে বাড়ির দিকে যাবার। তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হল জঙ্গলে কিংবা দূর পাহাড়ের কোন খাতের ভেতরে লুকিয়ে পড়ত। অনেক সময়ই গ্রিগোরিকে ঘোড়ায় চড়ে সারাদিন স্তেপের মাঠে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ওটার সন্ধানে। হারানো বলদের খোঁজ আর কখনও পাওয়া যাবে কিনা ভেবে সে যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে তখন কোন সরু গিরিখাতের একেবারে

তলায় দুর্ভেদ্য ঘন কাঁটাঝোপের মধ্যে কিংবা চারদিকে ডালপালা ছড়ানো কোন বুড়ো জংলা আপেল গাছের ছায়ায় কোথাও হঠাৎ তাকে আবিষ্কার করেছে। এক শিঙওয়ালা শয়তানটা খোঁটা আলগা ক'রে ফেলার কায়দা জানত, রাতের বেলায় শিঙ দিয়ে গোয়াল ঘরের ফটকের শেকল খুলে বাইরে চলে যেত, সাঁতরে দন পার হয়ে ঘাসজমিতে ঘুরে বেড়াত। এক সময় ওটার জন্য অনেক কষ্ট আর হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে গ্রিগোরিকে।...

'তোমার ওই এক শিঙ-ভাঙা বলদটা কেমন? শান্ত ত?'

'হ্যাঁ শান্ত। কিন্তু সে কথা জিগ্‌গেস করছ কেন?'

'না, অমনি।'

''অমনি' একটা বেশ কথা, যদি আর কিছু বলার না থাকে,' ঠাট্টা ক'রে হেসে বলল মেয়েটা।

গ্রিগোরি চুপচাপ হজম ক'রে যায়। অতীতের কথা, শান্তিময় জীবন আর কাজের কথা, যুদ্ধের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই এরকম সবই ভাবতে ওর বেশ লাগছিল। তার কারণ এই দীর্ঘ সাত বছরের যুদ্ধ ওর মনকে যে পরিমাণ বিষিয়ে দিয়েছে তা বলার নয়। যুদ্ধের সামান্যতম স্মৃতি, পল্টনের কাজের সঙ্গে যে কোন ঘটনা মনে পড়লেই ওর ভেতরে ভেতরে কেমন যেন লাগে, গা গুলিয়ে ওঠে, চাপা বিরক্তিতে ভরে ওঠে মনটা।

যুদ্ধের পালা সে চুকিয়ে দিয়েছে। আর নয়। সে এখন বাড়ি ফিরছে, শেষকালে কাজেকর্মে মন দেবে, ছেলেপুলেদের নিয়ে, আক্সিনিয়াকে নিয়ে থাকবে বলে। ফ্রন্টে থাকতেই সে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছিল আক্সিনিয়াকে ঘরে তুলবে, যাতে ওর বাচ্চাদের মানুষ করার ভার নেয়, সব সময় ওর পাশে পাশে থাকে। এরও একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়। যত তাড়াতাড়ি করতে পারা যায় ততই মঙ্গল।

গ্রিগোরি বিভোর হয়ে ভাবে বাড়িতে এসেই গ্রেটকোট আর বুটজুতো ছেড়ে আরামের চটিজোড়া পায়ে দেবে, কসাক কায়দায় সাদা পশমী মোজার ভেতরে সালোয়ারের পায়া গুঁজবে, গরম জামার ওপর ঘরে বোনা মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তাখানা চাপিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে মাঠে চলে যাবে। দু'হাতে লাঙলের হাতল চেপে ধরে ভিজে মাটির ওপর দিয়ে লাঙলের রেখা ধরে তার পেছন পেছন যেতে যেতে যখন নাকের পাটা ফুলিয়ে ভাঙা মাটির তাজা সোঁদা গন্ধ আর ফালে ওপড়ানো ঘাসের চাপড়ার তেতো সুবাস বুক ভরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নেবে তখন কী ভালোই না লাগবে! ভিনদেশে মাটি আর ঘাসের গন্ধ আলাদা। পোল্যাণ্ডে, ইউক্রেনে আর ক্রিমিয়ায় সে কতবারই না সোমরাজের লম্বা ডাঁটি

ছিঁড়ে দু'হাতে ডলে শুঁকে দেখেছে, উদাস মনে ভেবেছে, 'নাঃ সে গন্ধ নয়, একেবারে অন্য। . . .'

এদিকে গাড়োয়ান-মেয়েটির বেজায় লাগছিল। কথাবার্তা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল তার। বলদগুলোকে তাড়া দেওয়া বন্ধ করে বেশ জুত ক'রে বসল। চাবুকের চামড়ার ঝালরটা নাড়া চাড়া করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্রিগোরিকে দেখল, একাগ্র চিন্তায় আচ্ছন্ন ওর মুখখানা আর আধবোজা চোখদুটো লক্ষ করল। মনে মনে ভাবে, 'চুল পাকা, কিন্তু বয়স ত তেমন বেশি নয়। কেমন যেন অদ্ভুত গোছের। থেকে থেকে চোখ কোঁচকাচ্ছে। কেন কোঁচকাচ্ছে? দেখে মনে হয় এমনই বেহাল অবস্থা যেন বিরাট ঝড় বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। . . . তবে দেখতে শুনতে মন্দ নয়। শুধু চুলগুলো যা একটু বেশি পাকা, আর গোঁফও প্রায় সবটাই পাকা। কিন্তু অমনিতে মন্দ নয়। এত কী ভাবছে? প্রথমে যেন একটু ফষ্টিনষ্টি শুরু করার তালে ছিল, কিন্তু পরে কেন যেন মিইয়ে গেল। বলদটার কথাই বা কেন জিগ্‌গেস করল? আলাপ করার মতো কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না নাকি? নাকি লজ্জা পাচ্ছে? তা ত মনে হয় না। চোখের দৃষ্টি বেশ কড়া। নাঃ ভালো কসাক, তবে কেমন যেন অদ্ভুত। মরুক গে যা, থাক মুখ বুজে। কুঁজো কোথাকার! ভারী আমার বয়ে গেছে তোর জন্যে! আমি নিজেও মুখ বুজে থাকতে পারি! বৌয়ের কাছে যাচ্ছিস, তাই বুঝি আর তর সইছে না! যাক, থাক গে মুখ বন্ধ ক'রে যত খুশি!'

গাড়ির ছইয়ের কিনারায় পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে গুনগুন ক'রে সে গানের সুর ভাঁজতে থাকে।

গ্রিগোরি মাথা তুলে সূর্যের দিকে তাকাল। বেলা পড়তে তখনও অনেক দেরী। রাস্তার ধারে গোমড়ামুখো সান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে গত বছরের শুকনো একটা কাঁটাগাছ। সেটার ছায়া হাতখানেক লম্বা। বেলা দুটোর বেশি বেজেছে বলে মনে হয় না।

যেন কোন এক মায়ামন্ত্রবলে শ্মশানের নিস্তব্ধতার মধ্যে পড়ে আছে স্তেপের প্রান্তর। সূর্যের তেমন তেজ নেই। মৃদুমন্দ হাওয়ায় নিঃশব্দে নড়ে উঠছে রোদে পোড়া শুকনো লালচে বাদামী ঘাস। আশেপাশে কোথাও না শোনা যায় পাখির কলকাকলি না মেঠো ইঁদুরের শিস। শীতল ফিকে নীল আকাশে কোন বাজ বা চিল উড়তে দেখা যায় না। শুধু একবার রাস্তার ওপর দিয়ে চট করে সরে গেল একটা ধূসর ছায়া। মাথা না তুলেই গ্রিগোরি শুনতে পেল বড় বড় ডানা ঝাপটানোর ভারী আওয়াজ। ধূসর ময়ূরকণ্ঠী রঙের একটা বাস্টার্ড পাখির ডানার নীচের সাদা পালকগুলো সূর্যের আলোয় ঝলকাচ্ছে। পাখিটা উড়তে উড়তে গিয়ে বসল দূরের

একটা টিলার কাছে। সেখানে সূর্যের আলো থেকে আড়াল পড়া একটা গভীর খাত নীল-বেগনি রঙের আলো-আঁধারি মেশানো দূর দিগন্তের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে গেছে। একমাত্র শরতের শেষেই গ্রিগোরি এরকম বিষণ্ণ সুগভীর নিস্তব্ধতা লক্ষ করেছে। তখন তার মনে হত যেন শুকনো ঘাসের ওপর শোনা যাচ্ছে হাওয়ায় স্তেপের মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে ভাঙা ডালপালার কুটো উড়িয়ে নিয়ে যাবার সরসর আওয়াজ।

ওর মনে হচ্ছিল পথের বুঝি আর শেষ নেই। পথ এঁকেবেঁকে চলেছে পাহাড়ে গা ঘেঁষে। কখনও নেমে গেছে পাহাড়ের খাতে, কখনও বা আবার কোন ঢিবির মাথায় গিয়ে উঠছে। যেদিকে তাকাও না কেন সেই এক দৃশ্য – সর্বত্র স্তেপের নির্জন ধু ধু চারণভূমি।

একটা ঢালু খাতের গায়ে কালো মেপ্‌লের একটা ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। দেখে গ্রিগোরির চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রথম তুষারের ছোঁয়ায় তার পাতাগুলো ঝলসে ঝলমল করছে, লালচে ধোঁয়ার মতো দেখাচ্ছে – যেন ধিকি ধিকি জ্বলছে নিভন্ত ধুনির ছাই ছিটানো একেকটা কয়লার টুকরো।

'তোমার নামটা কী গো?' চাবুকের বাঁট দিয়ে আস্তে ক'রে গ্রিগোরির কাঁধ ছুঁয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

গ্রিগোরি চমকে উঠে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। মেয়েটি অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

'গ্রিগোরি। তোমার নাম?'

'আমার নাম কিছু একটা।'

'চুপ ক'রে থাকলেই ত পারতে 'কিছু একটা'।'

'হাঁপ ধরে গেল চুপ ক'রে থাকতে থাকতে! আদ্দেকটা দিন চুপ করে আছি, গলাটা শুকিয়ে কাট হয়ে গেল। তুমি কেন অমন মুখ গোমড়া করে আছ গো খুড়ো?'

'কেন, আনন্দ হওয়ার কী আছে?'

'বাড়ি ফিরছ, আনন্দ হবে না?'

'আমার আনন্দের বয়স চলে গেছে।'

'আহা কোথাকার আমার বুড়ো কত্তা এলেন! এত কম বয়সে তোমার চুলে অমন পাক ধরল কী করে?'

'সব জানতে হবে বুঝি তোমাকে? . . . জীবনটা আমার বড় চমৎকার ছিল কিনা – তাই।'

'বিয়ে হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। তোমারও তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে ফেলা দরকার গো 'কিছু একটা'।'

'কেন, তাড়াতাড়ির কী আছে?'

'বড় বেশি ঢলানি তুমি।...'

'তাতে খারাপটা কী?'

'খারাপ হতেও পারে। এরকম একজন ঢলানিকে জানতাম আমি। সেও বিধবা ছিল। লীলেখেলা করতে করতে শেষকালে নাক খসে পড়ার অবস্থা হল।...'

'ও মা গো! কী সাংঘাতিক!' কপট ভয়ের ভাব দেখিয়ে সকৌতুকে বলে উঠল সে। পরক্ষণেই কাজের কথা পাড়ার মতো ক'রে যোগ করল, 'আমাদের বিধবাদের ব্যাপার হল নেকড়ের ভয় যদি কর তাহলে বনে গিয়ে কাজ নেই।'

গ্রিগোরি ওর দিকে তাকায়। কুঁদফুলের মতো সাদা দু'সারি দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে হাসছে। ওপরের ঠোঁটখানা একটু বেঁকে উঠে গেছে, তিরতির ক'রে কাঁপছে। চোখের পাতা নামানো। তার তলা থেকে ঝিলিক দিচ্ছে দুষ্টুমি ভরা দুটো চোখ। গ্রিগোরি নিজের অজ্ঞাতসারে হেসে ফেলে, মেয়েটার উষ্ণ সুডৌল হাঁটুর ওপর হাত রাখে।

'আহা বেচারা! কী কষ্ট গো তোমার, 'কিছু একটা'!' দরদ দেখিয়ে সে বলল। 'কুড়ি বছরও বয়স নয়, এর মধ্যেই তোমার জীবনটা ছারখার হয়ে গেল।...'

মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটার খুশির চিহ্নমাত্র উধাও হয়ে গেল। রূঢ় ভাবে গ্রিগোরির হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। ভুরু কোঁচকাল। মুখটা তার এমন লাল হয়ে উঠল যে নাকের খাঁজের ওপরকার মেচেতার ছোট ছোট দাগগুলো পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল।

'দরদ দেখাতে হয় বাড়ি ফিরে গিয়ে বৌকে দেখিও। অমনিতেই অমন দরদী লোকের অভাব নেই আমার। তোমাকে ছাড়াও চলে যাবে!'

'আরে অত চটছ কেন? একটু সবুর কর!'

'চুলোয় যাও তুমি!'

'তোমার জন্যে দুঃখু হয়েছিল তাই বললাম।'

'তোমার ওই দুঃখু নিয়ে যাও তুমি...' দেখা গেল চাষাড়ে ভাষায় খিস্তিখেউড় করার দিব্যি অভ্যেস আছে মেয়েটার। দপ্ করে জ্বলে ওঠে ওর আঁধার হয়ে আসা চোখদুটো।

গ্রিগোরি ভুরু উঁচায়। বিব্রত হয়ে বিড়বিড় ক'রে বলে, 'নিজেকে ভাব কী, অ্যাঁ? কিছু বলার জো নেই! একেবারে লাগামছাড়া!'

'আর তুমি কী? উকুন ভরা কোট গায়ে আমার ধোয়া তুলসী পাতাটি! হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের মতো লোকদের ঢের দেখা আছে আমার! বিয়ে থা কর হ্যানা ত্যানা কত ভালো ভালো কথা! এতটা ছটফটানি তোমার কবে থেকে?'

'খুব বেশি দিন নয়!' গ্রিগোরি মৃদু হেসে বলল।

'তুমি আমায় অত ধর্মোপদেশ দিতে আস কোন্ আক্কেলে! ও কাজের জন্যে আমার শাশুড়ী আছেন।'

'হয়েছে, হয়েছে। অত চটার কী হল তাই বলে? আচ্ছা বোকা মেয়েমানুষ দেখছি। ও ত অমনি কথার কথা বলেছিলাম,' আপসের সুরে গ্রিগোরি বলল। 'ওই যে দ্যাখ দ্যাখ, আমাদের কথার ঠেলায় বলদদুটো যে এখন রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়েছে।'

গাড়ির খড়বিচালির গাদায় আরেকটু আরাম ক'রে গা এলিয়ে দিতে দিতে গ্রিগোরি এক ঝলক তাকাল ফূর্তিবাজ বিধবাটির দিকে। তার চোখে জল দেখতে পেল। মনে মনে ভাবল, 'এ যে আরেক গেড়ো! নাঃ, মেয়েমানুষের জাতটাই এরকম!' ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি আর বিরক্তিও অনুভব করল।

গ্রেটকোটের একটা ধার টেনে মুখ ঢেকে চিত হয়ে শুয়ে ছিল সে। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম যখন ভাঙল ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। আকাশে সন্ধ্যার ম্লান তারাগুলো মিটিমিটি জ্বলছে। খড়ের তাজা গন্ধে মন আনন্দে মেতে ওঠে।

মেয়েটি বলল, 'বলদগুলোকে খাওয়াতে হয়।'

'বেশ ত গাড়ি থামাও তাহলে।'

গ্রিগোরি নিজে বলদদুটোকে জোয়াল থেকে খুলে দিল। জিনিসপত্রের থলে হাতড়ে টিনের কৌটোর মাংস আর রুটি বার করল। একগাদা শুকনো আগাছা ভেঙে জড় ক'রে গাড়ির কাছে এনে আগুন জ্বালাল।

'বসে পড় গো 'কিছু একটা', খেয়ে নাও। হয়েছে, আর রাগ করতে হবে না।'

মেয়েটা আগুনের কাছে এসে বসল। একটি কথাও না বলে ঝুলি ঝেড়ে একটা রুটি আর বাসি রঙধরা চর্বির একটা ডেলা বার করল। খেতে খেতে কমই কথা হল। তবে কথায় আর ঝাঁঝ ছিল না। এর পর মেয়েটি গাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ধুনির আগুন যাতে নিভে না যায় তাই বলদের শুকনো গোবরের কয়েকটা টুকরো গ্রিগোরি ছুঁড়ে দিল ওর ভেতরে। মিলিটারী কায়দায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল আগুনের ধারে। থলের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে তারাগুলোর মিটিমিটি। অসংলগ্ন ভাবে ভাবতে থাকে ছেলেমেয়েদের কথা, আক্সিনিয়ার কথা। শেষকালে কখন এক সময় তার ঝিমুনি আসে। ঘুম ভেঙে যায় একটা চাপা মেয়েলি গলার আওয়াজে।

'ঘুমোচ্ছ নাকি সেপাই বাবাজী? ঘুমোচ্ছ না জেগে আছ?'

গ্রিগোরি মাথা উঠিয়ে তাকাল। তার পথের সঙ্গিনীটি কনুইয়ে ভর দিয়ে গাড়ি থেকে ঝুঁকে পড়ে ডাকছে। নীচ থেকে নিভু নিভু ধুনির অস্পষ্ট আলোয়

আলোকিত হয়ে উঠেছে ওর মুখখানা। তাইতে গোলাপী আর তরতাজা দেখাচ্ছে। মাথার ওড়নার লেস্-বোনা কিনারাটা আর দাঁতের পাটি সাদা ঝকঝক করছে। আবার হাসে সে – যেন ওদের মধ্যে কখনও কথা কাটাকাটি হয় নি। ভুরু নাচিয়ে বলে, 'আমার ভয় হচ্ছে ওখানে ঠাণ্ডায় জমে যাবে। মাটি ঠাণ্ডা যে। যদি তেমন শীত লাগে আমার কাছে চলে এসো। আমার ওপরের কোটটা গরম খু-উ-ব গরম! আসবে?'

গ্রিগোরি একটু ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দেয়, 'না রে ভাই দরকার নেই। বছর দুয়েক আগে যদি হত তাহলে হয়ত. . . না, জমে যাব কেন? আগুনের ধারেই ত আছি।'

মেয়েটিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'সে তোমার যেমন খুশি,' বলেই কোটটা মাথার ওপর টেনে মুড়ি দেয়।

কিছুক্ষণ পরে গ্রিগোরি উঠে দাঁড়াল। নিজের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিল। ও মনে মনে ঠিক করল পায়ে হেঁটেই যাবে, তাতে ভোরের দিকে তাতারস্কিতে পৌঁছুতে পারবে। পল্‌টনের চাকরী থেকে খারিজ হওয়া তার মতো একজন কম্যাণ্ডারের পক্ষে দিনে দুপুরে জোড়া বলদে টানা গাড়ি চড়ে গ্রামে ফেরাটা দৃষ্টিকটু হবে। ও ভাবে ফিরলে কত কথা আর হাসিঠাট্টাই না হবে!

মেয়েটাকে জাগাল সে।

'আমি হেঁটেই চললাম। মাঠের ভেতরে একা থাকতে তোমার ভয় করবে না ত?'

'না। ভয়ডর কাকে বলে আমি জানি নে। তা ছাড়া কাছে পিঠেই গাঁ আছে। কী ব্যাপার, আর তর সইছে না বুঝি?'

'ঠিক ধরেছ। আচ্ছা চলি গো 'কিছু একটা'। আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু মনে কোরো না, কেমন?'

গ্রেটকোটের কলার তুলে দিয়ে গ্রিগোরি পথে নামল। তুষার পড়তে শুরু করেছে। প্রথম তুষারকণা এসে পড়ল ওর চোখের পাতায়। উত্তর দিক থেকে বাতাস বইছে। উত্তুরে হাওয়ার কনকনে নিঃশ্বাসে চেনা বরফের প্রাণ জুড়ানো মিষ্টি গন্ধ যেন টের পেল গ্রিগোরি।

* * *

কশেভয় জেলা-সদরে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এলো। ও যখন গাড়ি চালিয়ে বাড়ির ফটকের দিকে আসতে থাকে সেই সময় জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছিল দুনিয়াশ্‌কা। তাড়াতাড়ি ওড়নাটা কাঁধের ওপর ফেলে উঠোনে নেমে এলো।

ফটকের কাছে এসে উৎকণ্ঠা আর প্রতীক্ষায় ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'গ্রিশা সকালবেলা এসে পৌঁছেছে।'

'তোমার আনন্দে আমিও খুশি,' খানিকটা কৌতুক মিশিয়ে সংযত কণ্ঠে মিশ্‌কা জবাব দিল।

শক্ত করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রান্নাঘরে এসে ঢুকল সে। ওর চোয়ালের মাংসপেশীগুলো কাঁপছিল। গ্রিগোরির কোলে জাঁকিয়ে বসে ছিল পলিউশ্‌কা। পিসি ওকে যত্ন ক'রে পরিষ্কার জামা পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। গ্রিগোরি বাচ্চাকে সাবধানে মাটিতে নামিয়ে রোদে পোড়া বিরাট তামাটে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে গেল ভগ্নীপতির দিকে। মিখাইলকে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। কিন্তু মিখাইলের চোখে হাসির বদলে উদাসীন আর বিরূপ ভাব লক্ষ করে নিজেকে সামলে নিল।

'এই যে মিশা, কী খবর?'

'এই ত। খবর ভালো ত?'

'কতকাল দেখা সাক্ষাৎ নেই! যেন একযুগ হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, তা অনেক কাল হল বটে। . . . ভালোই করেছিস ঘরে ফিরে এসে।'

'ভালো লাগছে তোর কথা শুনে। . . . আমরা তাহলে এখন কুটুম হলাম?'

'না হয়ে আর উপায় ছিল কি? . . . তোর গালে ওই রক্তের দাগটা কোত্থেকে?'

'ও কিছু নয়। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ক্ষুরে কেটে গেছে।'

টেবিলের ধারে বসে ওরা দু'জনে দু'জনকে লক্ষ করতে থাকে নীরবে। দু'জনেরই মনে মনে অস্বস্তি আর দূরত্বের অনুভূতি। ওদের মধ্যে এখনও গুরুতর কথাবার্তা হওয়া বাকি আছে। কিন্তু ঠিক এখন সেটা সম্ভব নয়। মিখাইল যথেষ্ট সংযম বজায় রেখে শান্তগলায় ঘর গেরস্থালির কথা, গ্রামে যে-সমস্ত অদল বদল ঘটেছে সে সবের কথা বলে যেতে থাকে।

গ্রিগোরি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। এবারে শীতের এই প্রথম তুষারপাত। নীলচে তুষারে মাটি ছেয়ে গেছে। আপেল গাছগুলোর ডালপালা ন্যাড়া। মিখাইলের সঙ্গে এ ভাবে দেখা হয়ে যাবে এটা সে কখনও ভাবতে পারে নি। . . .

খানিক পরে মিশ্‌কা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বারান্দায় এসে শান পাথরে বেশ ভালো করে ছুরি শানাল। দুনিয়াশ্‌কাকে সে বলল, 'দেখি একটা ভেড়া জবাই করার জন্যে কাউকে ডেকে আনা যায় কিনা। বাড়ির কর্তাকে ঠিকমতো আদর আপ্যায়ন করতে হয় ত। দৌড়ে যাও ত, কিছু ঘরে-চোলাই জিনিস নিয়ে এসো। না, সবুর কর, প্রোখরকে গিয়ে বল, মাটি খুঁড়ে হোক, যে

করে হোক, ঘরে-চোলাই মদ যেন নিয়ে আসে। একাজটা ও ভালো পারবে। সন্ধেবেলায় আমাদের এখানে খেতে বোলো ওকে।'

দুনিয়াশ্‌কা খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। নীরব কৃতজ্ঞতাভরে স্বামীর দিকে তাকায়। 'হয়ত সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে। . . . আরে লড়াই ত শেষ হয়ে গেছে, এখন আর কী নিয়ে ঝগড়াবিবাদ থাকতে পারে? প্রভু ওদের সুবুদ্ধি দিন!' আশায় বুক বেঁধে মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে প্রোখরের বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

আধঘন্টাও কাটে নি, এমন সময় ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রোখর এসে হাজির।

'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! . . . ভাই রে আমার! তোমাকে যে আবার দেখতে পাব ভাবতে পারি নি, আশাই করতে পারি নি!' কাঁদো-কাঁদো উঁচু গলায় চিৎকার করতে করতে সে বলল। চৌকাটে হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলেই চোলাই মদের হাঁড়িখানা ভেঙে ফেলেছিল!

গ্রিগোরিকে জড়িয়ে ধরে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে কাঁদতে হাতের মুঠো দিয়ে চোখের জল মুছল সে। জলে ভেজা গোঁফজোড়া হাত বুলিয়ে ঠিক ক'রে নিল। গ্রিগোরির গলার কাছেও কী একটা যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিল। বিচলিত হয়ে বিশ্বস্ত আর্দালির পিঠে আনাড়ির মতো চাপড় মেরে অসংলগ্ন ভাবে বিড়বিড় ক'রে বলল, 'তাহলে দেখা হল! . . . তোমার দেখা পেয়ে ভালো লাগছে প্রোখর। বড় ভালো লাগছে! আরে বুড়ো খোকা, চোখের জল ফেলার কী আছে? বসে থেকে থেকে গেঁতো হয়ে গেলে নাকি? নাটবল্টুগুলো সব ঢিলে হয়ে গেছে, তাই না? হাতের অবস্থা কীরকম? আরেকটা হাত বৌ ছিঁড়ে ফেলে নি ত?'

প্রোখর ফোঁত ক'রে নাক ঝাড়ল। ওপরের কোটটা খুলল।

'আমরা বুড়ো-বুড়িতে এখন পায়রার মতো জুটি বেঁধে দিব্যি আছি। আরেকটা হাত এই যে দেখছ, আস্ত আছে। আর অন্যটা, যেটা সাদা পোলগুলো কেটে নিয়েছিল, গজাতে শুরু করেছে। মাইরি বলছি। বছর খানেকের মধ্যেই ওখানে নতুন আঙুল দেখা দেবে,' জামার শূন্য আস্তিনটা নাড়াতে প্রোখর তার স্বাভাবিক ফূর্তির মেজাজে বলে উঠল।

যুদ্ধ তাদের শিখিয়েছে হাসির আড়ালে সত্যিকারের উপলব্ধিকে চাপা দিতে, যেমন রুটির সঙ্গে তেমনি কথার মধ্যেও আলুনি ভাব দূর করার জন্য বেশ খানিকটা নুন ছিটোতে। গ্রিগোরিও তাই একই রকম তামাসার সুরে জিজ্ঞেসবাদ ক'রে চলল।

'কেমন দিনকাল কাটছে হে বুড়ো ছাগল? লাফ ঝাঁপ কেমন চলছে?'

'বুড়ো হলে যেমন হয় - টিকিস টিকিস ক'রে চলছে।'

'আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর এর মধ্যে আর কিছু জুটিয়েছ?'

'কিসের কথা বলছ?'

'সেই যে গত বছর শীতকালে সঙ্গে ক'রে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলে?'

'পান্তেলেয়েভিচ! ভগবান রক্ষে করুন! ওই ঘোড়ারোগে আমার এখন কী দরকার বল? তাছাড়া এখন আমি এই এক হাতে শিকার ধরবই বা কোত্থেকে? এসব তোমাদের মতো, যাদের মাগ বৌ নেই সেই সব ছেলেছোকরাদের পোষায়।... আমার মতো লোকদের এখন সমস্ত যন্ত্রপাতি গিন্নির হাতে তুলে দেওয়া দরকার - তেল দিয়ে চালু রাখতে। চাটুতে অন্তত ছিটেফোঁটা তেল লাগানো চাই না...'

লড়াইয়ের দুই পুরনো সাথী। অনেকক্ষণ ধরে ওরা একে অন্যকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। হাসাহাসি করে। বড় খুশি ওরা এই সাক্ষাতে।

'একেবারে ফিরলে?' প্রোখর জিজ্ঞেস করে।

'একেবারে। আর নয়।'

'কোন পদ পর্যন্ত উঠেছিলে তুমি?'

'রেজিমেন্টে কম্যাণ্ডারের পদেই ছিলাম।'

'তাহলে এত তাড়াতাড়ি তোমায় ছেড়ে দিল যে?'

গ্রিগোরির মুখ কালো হয়ে গেল। সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'আমাকে আর দরকার হল না ওদের।'

'কেন বল ত?'

'জানি না। হয়ত আমার আগের কীর্তিকাণ্ডের জন্যে।'

'কিন্তু বিশেষ বিভাগে অফিসার বাছাইয়ের যে কমিশন সেই ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকেই না তোমাকে নিয়েছিল ওরা? তাহলে আবার পুরনো ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন?'

'ওটাই সব নয়।'

'মিখাইল কোথায়?'

'উঠোনে। গোয়ালঘর সাফ করছে।'

প্রোখর একটু কাছে ঘেঁসে এসে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'প্লাতোন রিয়াবচিকভকে মাসখানেক আগে গুলি ক'রে মেরেছে ওরা।'

'বল কী?'

'সত্যি বলছি। ভগবানের দিব্যি!'

বারান্দায় দরজার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল।

'পরে কথা হবে,' ফিসফিস ক'রে প্রোখর বলল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'তাহলে কমরেড কম্যাণ্ডার, এত বড় একটা আনন্দের দিনে দু'-এক ফোঁটা হবে না? মিখাইলকে ডেকে আনব?'

'যাও, ডাক গে।'

দুনিয়াশ্‌কা টেবিল সাজাল। ভাইকে কী ভাবে খুশি করবে সে ভেবে পায় না। কোলের ওপর পরিষ্কার তোয়ালে বিছিয়ে দিল, নুন দিয়ে জারানো তরমুজের থালাখানা এগিয়ে দিল, বার পাঁচেক গেলাসগুলো মুছল।... দুনিয়াশ্‌কা যে ওকে 'তুমি' না বলে 'আপনি' বলছে তা লক্ষ ক'রে গ্রিগোরি মনে মনে হাসল।

খেতে বসে মিখাইল প্রথম প্রথম গোঁ ধরে থম্ব মেরে থাকে, মন দিয়ে শুনতে থাকে গ্রিগোরির প্রতিটি কথা। মদ সে খেল খুবই সামান্য, তাও অনিচ্ছাভরে। কিন্তু প্রোখর একেকবারে পুরো একেক গেলাস উড়িয়ে দেয়। সমানে বেশি করে লাল হয়ে যেতে থাকে ওর মুখ। হাতের মুঠো দিয়ে বেশ ঘন ঘন পাটরঙা গোঁফে তা দিতে থাকে সে।

ছেলেমেয়েদের খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দুনিয়াশ্‌কা বিরাট একটা থালায় করে ভেড়ার সিদ্ধ মাংস এনে টেবিলে রাখল। গ্রিগোরির কানে কানে বলল, 'দাদা, আমি এক ছুটে গিয়ে আক্সিনিয়াকে ডেকে আনি? আপত্তি নেই ত আপনার?'

গ্রিগোরি নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। ওর মনে হচ্ছিল সারাটা সন্ধ্যা কী ভাবে সে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছটফট করছে তা বোধহয় কারও নজরে পড়ে নি। কিন্তু দুনিয়াশ্‌কা দেখছে দরজায় যেই খুট করে কোন আওয়াজ হয়েছে অমনি গ্রিগোরি চমকে উঠেছে, কান খাড়া করে আড়চোখে দরজার দিকে তাকিয়েছে। বলতে গেলে এমন কোন জিনিস নেই যা দুনিয়াশ্‌কার তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে।

প্রোখর বলল, 'আর কুবানের সেই তেরেশ্চেন্‌কো কি এখনও ট্রুপের কম্যাণ্ডার হয়ে পড়ছে?' গেলাসটা সে এমন ভাবে হাতে ধরে রেখেছে যেন তার ভয় পাছে কেড়ে নেয়।

'ল্‌ভোভে মারা গেছে!'

'তার আত্মার শান্তি হোক। ভালো ঘোড়সওয়ার সেপাই ছিল!' প্রোখর তাড়াতাড়ি বুকে হাত ঠেকিয়ে ক্রুশ প্রণাম ক'রে গেলাসে চুমুক দিল। কশেভয়ের জ্বালাধরানো বাঁকা হাসিটা ওর নজরে পড়ল না।

'আর ওই যে যার পদবীটা অদ্ভুত, তার খবর কী? ওই যে ডানপাশে থেকে যে লড়াই করত... দুচ্ছাই, চুলোয় যাক... ব্যাটার নামটাই ভুলে গেলাম -

মাই দাড়ি না কী যেন? সেই যে ঝোঁটিন, বেশ গাঁট্টাগোট্টা, ফুর্তিবাজ। ব্রোদির কাছে যে একটা পোল অফিসারকে আধখানা করে কেটে ফেলল। বেঁচে বর্তে আছে ত?'

'দিব্যি জোয়ান ঘোড়ার মতো দাবড়ে বেড়াচ্ছে! মেশিনগান স্কোয়াড্রনে আছে এখন।'

'তোমার ঘোড়াটা কাকে দিলে?'

'তার আগেই ত অন্য ঘোড়া জুটাতে হয়েছিল আমার।'

'চাঁদ কপালিটা গেল কোথায়?'

'গোলার টুকরো লেগে মারা গেছে।'

'লড়াইয়ে?'

'আমরা তখন একটা ছোট শহরে। চারদিক থেকে গুলিগোলা ছুটছিল। খুঁটি বাঁধা অবস্থাতেই মারা গেল।'

'আহা বড় দুঃখের কথা! কী ভালো ঘোড়াই না ছিল!' প্রোখর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ঠোঁটে গেলাস ঠেকায়।

বারান্দার দরজায় ঝনাৎ করে শেকল খোলার আওয়াজ হল। গ্রিগোরি চমকে উঠল। চৌকাট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে আক্সিনিয়া বিড়বিড় ক'রে বলল, 'নমস্কার!' মাথার ওড়নাটা খুলতে থাকে সে। বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখ গ্রিগোরির মুখের ওপর থেকে আর সরাতে পারে না, ঘন ঘন হাঁপাতে থাকে। টেবিলের কাছে এসে দুনিয়াশকার পাশে সে বসে পড়ল। ওর ফেকাসে মুখের ওপর, চোখের পাতা আর ভুরুর ওপর যে ছোট ছোট বরফের কণা পড়েছিল সেগুলো গলে গলে পড়ছে। চোখদুটো কুঁচকে সে হাতের তেলো দিয়ে মুখ মুছল। গভীর নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে যেন বুকে খানিকটা বল সঞ্চয় করার পর উত্তেজনায় ধাঁধা লাগা গভীর চোখের দৃষ্টি মেলে তাকাল গ্রিগোরির দিকে।

'এই যে আমার পল্টনের সাথী! আক্সিনিয়া দিদি গো! এক সঙ্গে আমরা পিছু হটেছি, এক সঙ্গে উকুনের খোরাক হয়েছি। . . . অবিশ্যি কুবানে আমরা তোমায় ছেড়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু কী আর আমাদের করার ছিল বল?' প্রোখর তার গেলাসটা বাড়িয়ে ধরতে খানিকটা মদ ছলকে পড়ে গেল টেবিলে। 'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচের জন্যে একটু খাও। তার বাড়ি ফিরে আসার জন্য খাও। . . তোমাকে বলেছিলাম না, বহাল তবিয়তে ফিরে আসবে। এই ত, এখন গাঁটের কুড়িটা টাকা ফেলে নাও। বসে আছে দেখ কেমন, যেন কিছুই হয় নি!

প্রোখরের দিকে চোখ ঠেরে হাসতে হাসতে গ্রিগোরি বলল, 'এর মধ্যেই অনেকটা গিলেছে পড়শি। ওর কথায় আর কান দিও না।'

গ্রিগোরি আর দুনিয়াশ্‌কার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে আক্সিনিয়া টেবিল থেকে গেলাসটা সামান্য উঁচু ক'রে ধরল। ওর ভয় হচ্ছিল পাছে লোক দেখে ফেলে ওর হাতের কাঁপুনি।

'আপনার আসার জন্যে গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, আর দুনিয়াশ্‌কা তুমি খুশি হয়েছ বলে।'

'আর তুমি? তুমি দুঃখ পেয়েছ বলে?' হো হো ক'রে হাসতে হাসতে মিখাইলের পাঁজরায় খোঁচা মারল প্রোখর।

আক্সিনিয়ার মুখে গাঢ় রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল। এমন কি তার কানের ছোট লতিদুটোও স্বচ্ছ গোলাপী হয়ে উঠল। রাগে প্রোখরের দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে সে উত্তর দিল, 'আমি? আমারও আনন্দ হয়েছে বলে। . . . ভীষণ আনন্দ হয়েছে।'

এই সরল উত্তরে প্রোখর নিরস্ত্র হয়ে পড়ে, উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়ে পড়ে। ও অনুনয় ক'রে বলে, 'তাহলে চোঁ ক'রে সবটুকু মেরে দাও, ভগবানের দোহাই। সোজাসুজি কথা যদি বলতে জান তাহলে সোজাসুজি খেয়ে ফেলতেও জানা উচিত! কেউ রেখে দিলে আমার বুকে যেন ধারাল ছুরি বাজে।'

আক্সিনিয়া ওদের বাড়িতে বেশিক্ষণ বসল না। ঠিক ততটাই বসল যতটা বসা ভদ্রসম্মত। যতক্ষণ বসে ছিল সেই সময়ের মধ্যে সে কয়েকবার, তাও আবার কয়েক ঝলক, তার প্রিয় মানুষটির দিকে তাকিয়েছে। আক্সিনিয়াকে জোর করে অন্যদের দিকে তাকাতে হচ্ছিল। গ্রিগোরির চোখের দৃষ্টি সে এড়ানোর চেষ্টা করছিল, কেন না উদাসীনতার ভান করা যায় না। আবার বাইরের লোকের সামনে নিজের উপলব্ধি প্রকাশও করা যায় না। একমাত্র একবারই চৌকাটের ওপর যখন সে দাঁড়িয়ে ছিল তখন তার ভালোবাসা আর নিষ্ঠায় ভরপুর দৃষ্টি গ্রিগোরির নজরে পড়েছিল, তাতেই ওর যা বলার সব বুঝে নিয়েছিল গ্রিগোরি। আক্সিনিয়াকে এগিয়ে দিতে সে বেরিয়ে এলো। প্রোখরের ততক্ষণে বেশ নেশা ধরে গিয়েছিল। গ্রিগোরির পিছন পিছন সে চেঁচিয়ে বলল, 'বেশি দেরি কোরো না। তাহলে কিন্তু সবটা খেয়ে নেব আমরা!'

বারান্দায় বেরিয়ে গ্রিগোরি নীরবে আক্সিনিয়ার কপালে আর ঠোঁটে চুমু খেল। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কী খবর আক্সিনিয়া?'

'ওঃ এত কথা বলার আছে! সব কী আর বলা যায়? . . . কাল আসবে?'

'আসব।'

তড়িঘড়ি বাড়ির দিকে চলল আক্সিনিয়া। তাড়াতাড়ি পা চালাল, যেন বাড়িতে তার কত কাজ পড়ে আছে। শুধু নিজের বাড়ির দেউড়ির কাছে আসার পর সে পায়ের গতি মন্থর করে দিল। সিঁড়ির ধাপগুলোতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ওঠে।

সাবধানে সিঁড়ি ভিঙোয় সে। তার ইচ্ছে এখন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ঘরে গিয়ে একা থাকে তার নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে, তার সুখ নিয়ে, যে সুখ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে ধরা দিয়েছে তাকে।

গায়ের জামা আর ওড়নাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আলো না জ্বেলেই সে ভেতরের ঘরে গিয়ে ঢুকল। জানলার খড়খড়ি খোলা ছিল। তার ভেতর দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে রাতের ঘন বেগনি আলো। উনুনের পেছনে একটা ঝিঁঝি পোকা জোরে ঝিঁ ঝিঁ শব্দে ডেকে চলেছে। আক্সিনিয়া অভ্যাসবশত আয়নার দিকে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখতে না পেলেও বুকের কাছে মসলিনের ব্লাউজটার কুঁচিগুলো হাত দিয়ে সমান করল, চুল ঠিক করল। তারপর জানলার কাছে গিয়ে ক্লান্ত ভাবে ধপ ক'রে বেঞ্চে বসে পড়ল।

জীবনে অনেকবারই ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্য প্রতিপন্ন হয় নি, ফলবতী হয় নি। হয়ত এই কারণেই কিছুক্ষণ আগের এই আনন্দের জায়গায় তার নিত্যসঙ্গী উদ্বেগ এসে তাকে ঘা দিচ্ছে। এবারে কোন্ দিকে মোড় নেবে তার জীবন? কী আছে ভবিষ্যতের গর্ভে? মেয়েমানুষের তিক্ত ভাগ্য কি বড় দেরি করে তার ওপর প্রসন্ন হল না?

সারা সন্ধ্যায় যে উত্তেজনার ধকল গেছে তার ফলে এখন ক্লান্ত হয়ে আক্সিনিয়া অনেকক্ষণ বসে রইল শিশির জমাট ঠাণ্ডা কাঁচে গাল চেপে ধরে। সামান্য ব্যথাতুর শান্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে, যে অন্ধকার তুষারের ঠিকরে পড়া আলোয় অতি সামান্য ঝলমল করছে।

* * *

গ্রিগোরি টেবিলের ধারে বসে হাঁড়ি থেকে পুরো এক গেলাস ঢেলে এক ঢোকে খেয়ে ফেলল।

'কেমন? ভালো জিনিস না?' প্রোখর জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। কতদিন খাই নি।'

প্রোখর জোর দিয়ে বলল, 'একেবারে জার নিকোলাই মার্কা, মাইরি বলছি!' টাল খেতে খেতে সামনে নিয়ে সে মিখাইলকে জড়িয়ে ধরল। 'বাছুর যেমন ডোবার জলের কিছুই বোঝে না এসব ব্যাপারে তুমি তার চেয়েও অধম মিশা। একেবারে আনাড়ি। মদের কথা যদি বল আমি কিন্তু ভালো বুঝি। কত রকম আরক সালসা আর মদই না চেখে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে এ জীবনে! এক রকমের মদ আছে ছিপি খুলতে না খুলতে বোতল থেকে পাগলা কুকুরের মতো

ফেনা বেরিয়ে আসে। ভগবান সাক্ষী, আমি মিথ্যে বলছি না। পোল্যাণ্ডে যখন ফ্রন্ট ভেঙে বুদিওন্নির সঙ্গে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সাদা পোলগুলোকে ধরে ধরে খাসী-জবাই করব বলে, তখন হামলা করে এক জমিদারের মহাল দখল করি। মহালের কুঠিটা দোতলা কিংবা তার চেয়েও বেশি উঁচু হবে। উঠোনে কত যে গোরু-ভেড়া শিঙে শিঙ ঠেকিয়ে গাদাগাদি করে আছে, নানা জাতের হাঁস-মুরগী আরও কত সব পাখি চরে বেড়াচ্ছে — থুতু ফেলার পর্যন্ত জায়গা নেই। মানে এক কথায়, জমিদার বাবুটি থাকতেন রাজার হালে। আমাদের দলটা যখন ঘোড়া হাঁকিয়ে মহালে ঢুকে পড়ল সেই সময় কিছু অফিসার বাড়ির কর্তার সঙ্গে বসে খানাপিনা করছিল। আমরা যে আসব ভাবতেই পারে নি। ওদের সকলকে কেটে সাফ ক'রে দেওয়া হল — কাউকে বাগানে কাউকে বা সিঁড়িতে। খালি একজনকে আমরা বন্দী করলাম। হোমরা চোমরা অফিসার। কিন্তু ধরা পড়ামাত্রই গোঁফজোড়া তার ঝুলে পড়ল, ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচের জরুরী তলব পড়ল সদর ঘাঁটিতে। আমরা নিজেরাই তখন রয়ে গেলাম কর্তা হয়ে। নীচের তলার ঘরগুলোতে ঢুকলাম। সেখানে বিরাট টেবিল সাজানো। কী নেই সেই টেবিলে! চোখ ফেরানো যায় না। এদিকে খেতে যে শুরু করব সে সাহসও হচ্ছে না, যদিও পেটে আমাদের সকলেরই দারুণ খিদে। আমরা মনে মনে ভাবছি, 'কে জানে বাবা, যদি সব খাবার বিষ-মেশানো হয়?' আমাদের বন্দীটাও আবার শয়তানের মতো কটমট ক'রে তাকাচ্ছে। আমরা ওকে হুকুম দিলাম, 'খাও!' তা খেল। খাবার তেমন ইচ্ছে না থাকলেও খেল। তারপর বললাম, 'মদ খাও!' তাও গিলল। ধরে বেঁধে প্রত্যেকটা পদ থেকে বেশ খানিকটা ক'রে খাবার আর প্রত্যেক বোতল থেকে এককে গেলাস ক'রে মদ খাওয়ানো হল। অত খাঁটি খেয়ে দ্যাখ-দ্যাখ ক'রে আমাদের চোখের সামনে ব্যাটা ফুলে ঢোল হয়ে যেতে থাকে। এদিকে আমাদের জিভ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে। তারপর যখন দেখা গেল অফিসারটা মরছে না তখন আমরাও শুরু ক'রে দিলাম। খাবার দাবার আর ফেনা ওঠা সেই মদ পেট পুরে একেবারে গলা অবধি খেলাম সবাই। এমন সময় দেখি কি অফিসার ব্যাটার ভেদবমি শুরু হয়ে গেছে। আমরা ভাবলাম, 'এই সেরেছে! শালা হারামির বাচ্চা আমাদের ঠকানোর জন্যে নিজে বিষ-মেশানো খাবারগুলো খেল!' তলোয়ার বাগিয়ে আমরা ছুটে যাই লোকটার দিকে। সে তখন হাত পা ছুঁড়ে চেল্লাতে শুরু করেছে, 'আরে মশাই, আপনাদের দয়ায় যে আমার গুরুভোজন হয়ে গেছে। ঘাবড়াবেন না, খাবার ভালো!' এই শুনে আমরা আবার টেবিলে ফিরে গিয়ে মদ নিয়ে পড়লাম। বোতলের ছিপি ধরে একটু চাপ দাও, অমনি ছুটে যায় রাইফেলের গুলির মতো। আর ফেনা য

উথলে পড়ে সে দেখলেও ভয় করে! ওই মদ খাওয়ার পর সেদিন এক রাতে আমি তিন তিনবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলাম! যেই জিনে চড়ে বসি অমনি যেন হাওয়ায় আমাকে ঠেলে ফেলে দেয়। আহা অমন মদ যদি রোজ খালিপেটে দু'-এক গেলাস খাওয়া যেত তাহলে একশ' পরমায়ু আয়ু পেতাম। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে কি আর বেশি দিন বাঁচার উপায় আছে? এই যে এটার কথাই ধর – এ একটা কোন মদ হল? মদ না. ছোঁয়াচে রোগেরও বাড়া! এই জঘন্য পচা মাল খেলে আর দেখতে হবে না – সময়ের আগেই পটল তুলবে।' বলতে বলতে চোলাই মদের হাঁড়িটা মাথার ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে প্রোখর কানায় কানায় ভরে নেয় নিজের গেলাসটা।

দুনিয়াশ্‌কা ভেতরের ঘরে ছেলেমেয়েদের কাছে শুতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রোখরও উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে ভেড়ার চামড়ার কোটখানা কোনরকমে কাঁধের ওপর ফেলে সে বলল, 'হাঁড়িটা আর নিচ্ছি না। খালি হাঁড়ি নিয়ে ঘরে ফিরতে মন চায় না। . . . এই যে এখন আমি ঘরে ফিরব বৌ আমার ওপর এক চোট শুরু করে দেবে। এটা সে পারে। কোত্থেকে যে অত খারাপ খারাপ সব কথা খুঁজে পায় কে জানে বাপু! এই ধর একটু নেশা ক'রে বাড়ি ফিরেছি কি অমনি বলবে, তবে রে আঁটকুড়ের ব্যাটা, বিটলে শয়তান, হাতকাটা বেল্লিক কুকুর, তুই অমুক, তুই তমুক, এই রকম কত কী! আমি আস্তে আস্তে মিনমিন করে ওর কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি, বলি, 'আচ্ছা বল্ দেখি শয়তানের বাচ্চা, হারামজাদী কুত্তী, কোথায় দেখলি তুই মাতাল কুকুর? তাছাড়া হাতকাটা কুকুর কখনও হয়? না না, অমন হয় না কোথাও।' ওর একটা ইতর কথা যদি কাটান দিলাম সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। সেটাও যদি কাটান দেওয়া গেল ত ছাড়বে আরও একটা। এই ভাবে সারা রাত চলবে, যতক্ষণ ভোর না হয়। . . . একেক সময় ওর কথাগুলো শুনতে শুনতে মনমেজাজ খিচড়ে যায়, তখন শুতে চলে যাই চালাঘরে। আবার কখনও এমন হয় যে নেশা ক'রে বাড়ি ফিরেছি, কিন্তু ওর মুখে রাটি নেই, এতটুকু গালিগালাজ করছে না – তখন আর ঘুম আসে না! মাইরি বলছি! মনে হয় কী যেন একটা নেই। মনটা উসখুস করতে থাকে। ঘুম নেই ত নেই-ই! তখন ইস্তিরিকে ছুঁতে যাই – ব্যস্ আবার শুরু হয়ে যায় আমার ওপর। আর সে কী গালাগাল! – যেন ফুলকি ঝরছে তার ভেতর থেকে। একেবারে সাক্ষাৎ রণচণ্ডী! কিন্তু কী-ই বা করার আছে? খেপুক গে, তাতে নিজেরই খারাপ হবে। আমার কী? ঠিক বলেছি কিনা? আচ্ছা আমি চলি। আজ আর ওকে না ঘাঁটিয়ে রাতটা আত্মবলেই কাটিয়ে দেব কিনা ভাবছি।'

গ্রিগোরি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি অবধি যেতে পারবে ত?'

'কাঁকড়ার মতো গুঁড়ি মেরে হলেও ঠিক পৌঁছে যাব! আমি কি কসাকের বাচ্চা নই পান্তেলেয়েভিচ? তোমার অমন কথা শুনলেও মনে বড় ব্যথা পাই।'

'আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ভগবানের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়!'

গ্রিগোরি তার বন্ধুকে ফটকের বাইরে এগিয়ে দিল। তারপর এসে ঢুকল রান্নাঘরে।

'তাহলে কথাবার্তা হোক মিখাইল?'

'হোক।'

ওরা দু'জনে মুখোমুখি বসে ছিল। মাঝখানে টেবিল। দু'জনের কারও মুখে কথা নেই। শেষকালে গ্রিগোরি বলল, 'নাঃ আমাদের দু'জনের মধ্যে কিসের যেন একটা গোলমাল আছে।. . . তোর মুখ দেখলেই বুঝতে পারি কোথাও একটা গোলমাল আছে! আমি ফিরে আসাতে তুই খুশি হোস নি? নাকি আমি ভুল করছি?'

'না ঠিকই ধরেছিস। খুশি হই নি।'

'কেন?'

'বাড়তি ঝামেলা।'

'আমার ত মনে হয় আমি নিজেই নিজের পেটের ভাতের ব্যবস্থা করতে পারব।'

'আমি সে কথা বলছি না।'

'তাহলে কিসের কথা?'

'আমরা দু'জনে একে অন্যের শত্রু।. . .'

'ছিলাম।'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেখেশুনে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতেও থাকব।'

'তা কেন? বুঝতে পারছি না।'

'তোকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'এটা কিন্তু বলা ঠিক হল না। মোটেই ঠিক হল না!'

'না, ঠিকই বলেছি। এরকম সময়ে তোকে কেন পল্টন থেকে ছেড়ে দেওয়া হল? সোজা কথা বল্ আমায়!'

'জানি নে।'

'না, জানিস তুই। কিন্তু বলতে চাস না! তোকে ওরা বিশ্বাস করতে পারে নি। ঠিক বলেছি কিনা?'

'বিশ্বাস না করলে কি স্কোয়াড্রনের ভার দিত?'

'সে ত গোড়ার দিকে। কিন্তু আর্মিতে যখন রাখল না তার মানেই জলের মতো পরিষ্কার ভাই।'

'কিন্তু তুই আমায় বিশ্বাস করিস?' ওর দিকে সোজা তাকিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'না। নেকড়েকে যতই খাওয়াও দাওয়াও না কেন, তার মন পড়ে থাকবে বনের দিকে।'

'আজ তুই একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিস মিখাইল।'

'ছাড় দেখি! তোর চেয়ে বেশি না। ওখানে তোকে বিশ্বাস করে নি, এখানেও লোকে খুব একটা বিশ্বাস করবে না তোকে, সে কথা মনে রাখিস!'

গ্রিগোরি চুপ করে থাকে। নিস্তেজ ভাবে হাত চালিয়ে থালা থেকে এক টুকরো জারানো শশা তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে চিবোয়, তারপর থুথু ক'রে ফেলে দেয়।

'বৌ তোকে কিরিল গ্রোমভের কথা বলেছে?' মিখাইল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'ওর ফিরে আসাটাও আমার পছন্দ হয় নি। যেই শুনতে পেলাম, সেই দিনই . . .'

গ্রিগোরি ফেকাসে হয়ে গেল। রাগে চোখ গোল গোল ক'রে পাকিয়ে সে বলল, 'তুই কি আমাকে কিরিল গ্রোমভের সঙ্গে এক ক'রে ভাবছিস?'

'চেঁচামেচি করিস নে। কিসে তুই ভালো?'

'দ্যাখ, জানিস ত . . .'

'জানাজানির কিছু নেই। সব জানা হয়ে গেছে অনেক আগে। তারপর মিত্‌কা কোর্‌শুনভ এসে হাজির হবে। তার ফিরে আসাতেও আমাকে আনন্দ করতে হবে নাকি? না, তোরা গাঁয়ে না ফিরলেই ভালো হত।'

'তোর পক্ষে ভালো?'

'আমার পক্ষে ভালো, সাধারণ লোকজনের পক্ষেও। অনেক শান্তি।'

'তুই আমাকে ওদের সঙ্গে সমান করে দেখিস না!'

'আমি আগেই তোকে বলেছি গ্রিগোরি। রাগ করিস আর যাই করিস, তুই ওদের চেয়ে ভালো নোস, বরং আরও খারাপ, আরও বিপজ্জনক।'

'কী ভাবে? কী বলতে চাস তুই?'

'ওরা সাধারণ সেপাই। কিন্তু তুই সকলকে নিয়ে বিদ্রোহের ঘোঁট পাকিয়েছিলি।'

'ঘোঁট আমি পাকাই নি। আমি ডিভিশনের কম্যাণ্ডার ছিলাম।'

'সেটা কি কম হল?'

'কম কিংবা বেশি, সেটা আসল কথা নয়। . . . সে সময় মদের আসরে লাল ফৌজীরা যদি আমাকে মারার তাল না করত তাহলে হয়ত বিদ্রোহে যোগ দিতাম না।'

'তুই যদি অফিসার না হতিস তাহলে কেউ তোর গায়ে হাত দিত না।'

'আমাকে ফৌজে না নিলে আমি অফিসার হতাম না। . . . কিন্তু সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।'

'দীর্ঘ আর নোংরাও বটে!'

'এখন আর নতুন ক'রে ঘেঁটে লাভ নেই। দেরি হয়ে গেছে।'

ওরা চুপচাপ সিগারেট টানতে থাকে। নখ দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে কশেভয় বলে, 'তোর বীরত্বের কাহিনী জানি, সবই শুনেছি। আমাদের অনেক লোককে তুমি মেরেছ। তোমার মুখ দেখতেও প্রবৃত্তি হয় না আমার। . . . এটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না।'

গ্রিগোরি কাষ্ঠ হাসি হাসে।

'তোর স্মৃতিশক্তিটা ত বেশ ভালোই দেখছি! তুই আমার ভাই পেত্রোকে মেরেছিস, অথচ আমি সে কথা কেন যেন তোকে মনে করিয়ে দিচ্ছি না। . . . সবই যদি আমাদের মনে রাখতে হয় তাহলে ত নেকড়ে হতে হয়।'

'হ্যাঁ মেরেছি, অস্বীকার করছি না! তখন যদি তোকে ধরতে পারতাম তাহলে তোরও প্রাণের সাধ ঘুচিয়ে দিতাম!'

'কিন্তু আমি, ইভান আলেক্সেয়েভিচকে যখন ওরা উস্ত্-খোপিওরে বন্দী করেছিল, তখন তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম - আমার ভয় ছিল তুইও ওদের সঙ্গে ধরা পড়েছিস। ভয় হচ্ছিল কসাকরা বুঝি তোকে মেরে ফেলে। . . . দেখা যাচ্ছে তখন মিছিমিছিই অমন তাড়াহুড়ো করেছিলাম!'

'আহা কী আমার দয়ার সাগর এলেন! ক্যাডেটরা যদি ক্ষমতায় আসত, যদি তোদের জিত হত তাহলে কোন্ সুরে আমার সঙ্গে কথা বলতিস সেটা আমার দেখার ইচ্ছে ছিল। চাবুক মেরে আমার পিঠের ছালচামড়া নির্ঘাত তুলে নিতিস! এখন আর কোন উপায় না থাকায় দয়াধর্মের কথা বলছিস। . . .'

'হয়ত অন্য কেউ তোর পিঠের ছালচামড়া ওঠাত। কিন্তু আমি তোর পিঠে চাবুক মেরে হাত নোংরা করতে যেতাম না।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে তুই আর আমি আলাদা আলাদা ধরনের মানুষ। . . . দুশমনকে মেরে হাত নোংরা করতে আমার কোন কালে এতটুকু বাধে নি। এখনও দরকার হলে এতটুকু হাত কাঁপবে না।' বাকি মদটুকু দুটো গেলাসে পুরো ঢেলে মিখাইল জিজ্ঞেস করল, 'খাবি নাকি?'

'দে, খাই। এরকম আলাপ করার পক্ষে নেশাটা বড় কম হয়ে গেছে আমাদের।'

ওরা কোন কথা না বলে গেলাস ঠোকাঠুকি ক'রে মদ খায়। গ্রিগোরি টেবিলের ধারে বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ে চোখ কুঁচকে গোঁফে তা দিতে দিতে মিখাইলের দিকে তাকায়।

'কিন্তু কিসের জন্যে আমাকে তোর ভয় মিখাইল? ভাবছিস আবার যদি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসি?'

'ভয় আমি কিছুতেই করি না। তবে হ্যাঁ, ভাবছিলাম যদি কিছু একটা ওলট পালট ঘটে যায় তাহলে তুই চট করে ওদের পক্ষে সরে পড়বি।'

'সে রকম ইচ্ছে থাকলে ত আমি পোলদের কাছেই চলে যেতে পারতাম। তোর কী মনে হয়? আমাদের গোটা ইউনিটটাই ত ওদের পক্ষে যোগ দিয়েছে।'

'সময় পাস নি বুঝি?'

'না, ইচ্ছে ছিল না। পল্‌টনে চাকরী অনেক কাল করলাম। আর কারও সেবা করার ইচ্ছে আমার নেই। লড়াইয়ের সাধ আমার ঘুচে গেছে সারা জন্মের মতো। অসহ্য এ ভার আর আমি বইতে পারি নে। বিপ্লব প্রতি-বিপ্লব – সবেতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। যাক গে সব গোল্লায় . . . চুলোয় যাক গে! ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি আমার জীবন কাটাতে চাই, ঘর-গেরস্থালি নিয়ে থাকতে চাই – ব্যস, আর কিছু নয়। তুই বিশ্বাস কর মিখাইল, আমি আমার অন্তর থেকে বলছি।'

কিন্তু যত আশ্বাসই দেওয়া যাক না কেন, কশেভয় তাতে ভোলার পাত্র নয়। গ্রিগোরি তা বুঝতে পেরে চুপ ক'রে গেল। মুহূর্তের জন্য নিজের ওপর ওর প্রচণ্ড বিরক্তি ধরে গেল। কী ছাই দরকার ছিল অত কৈফিয়ত দেওয়ার, নিজেকে নির্দোষ বলে চালানোর অত চেষ্টা করার? কী কাজ হল মাতালের এই কথা কাটাকাটিতে আর মিখাইলের বাজে কতকগুলো বক্তৃতা শুনে? চুলোয় যাক! গ্রিগোরি উঠে দাঁড়াল।

'থাক গে ওসব অকাজের কথাবার্তা! অনেক হয়েছে! তবে শেষ একটা কথা আমি তোকে বলতে চাই। যতক্ষণ আমার টুটি টিপে না ধরছে ততক্ষণে সরকারের বিপক্ষে আমি যাচ্ছি নে। কিন্তু যদি টিপে ধরে তাহলে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব আমি। মোট কথা, বিদ্রোহের অপরাধে প্লাতোন রিয়াবচিকভের মতো মাথা অন্তত পেতে দিচ্ছি না আমি।'

'তার মানে?'

'মানে একটাই। লাল ফৌজে আমি যে কাজ করেছি আর তা করার সময় শরীরে যে-সমস্ত চোট আমি পেয়েছি সে সবের হিশেব নিক। বিদ্রোহের অপরাধে জেলে যেতে হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু গুলি খেয়ে মরা, না, মাপ কর! ওটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে!'

মিখাইল বিদ্রূপের হাসি হাসল।

'হুঃ, একটা কথা বললি বটে! বিপ্লবী আদালত বা জরুরী কমিশন তোকে জিগ্‌গেস করতে যাবে না তোর কী চাই না-চাই। তোর সঙ্গে দর কষাকষিও করবে না। ভুল যখন করেছ তখন তার মাশুল দিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়। পুরনো দণ সুদে মূলে শোধ করতে হবে। কোন ছাড় নেই সেখানে!'

'বেশ, তাহলে দেখা যাবে।'

'অবশ্যই! তা আর বলতে!'

কোমরের বেল্ট আর গায়ের জামা খুলল গ্রিগোরি। অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে পায়ের জুতো খুলতে লাগল। জুতোর সোলটা খানিকটা আলগা হয়ে যেতে বড় বেশি মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখতে দেখতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে সম্পত্তি ভাগাভাগি ক'রে নিতে বলিস?'

'আমাদের ভাগাভাগিতে বেশি সময় লাগবে না। নিজের কুঁড়েটা মেরামত ক'রে সেখানে উঠে যাব।'

'হ্যাঁ আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো। আমাদের মধ্যে বনিবনা হবে না।'

'হ্যাঁ তা ঠিক,' মিখাইল সায় দিল।

'আমি ভাবতে পারি নি আমার সম্পর্কে তোর এমন ধারণা . . . তা যাক গে . . .'

'আমি সোজা কথা বললাম। যা ভাবি তা-ই বললাম। ভিওশেনস্কায়া কবে যাচ্ছিস?'

'দেখি যাব দু'-এক দিনের মধ্যে।'

'দেখি যাব নয়, কালই যেতে হবে।'

'পায়ে হেঁটে এসেছি প্রায় বারো ক্রোশ পথ। শরীরের আর কিছু নেই। কালকের দিনটা জিরিয়ে নিয়ে পরশুদিন যাব রেজেস্ট্রি করতে।'

'হুকুম আছে সঙ্গে সঙ্গে রেজেস্ট্রি করতে হবে। কালই চলে যা।'

'একটা দিন জিরোতে পারব না? পালিয়ে ত যাচ্ছি না।'

'কে জানে বাপু তোর মতিগতি? তোর জন্যে কৈফিয়ত দেবার ইচ্ছে আমার নেই।'

'কী হারামীর বাচ্চাই না তুই হয়ে দাঁড়িয়েছিস মিখাইল!' ওর এককালের বন্ধুর মুখটা আরও কঠিন হয়ে উঠতে অবাক হয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে গ্রিগোরি বলল।

'ওসব হারামীর বাচ্চা-টাচ্চা আমাকে বোলো না বলে দিচ্ছি! আমার শোনার অভ্যেস নেই। . . .' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে গলা চড়িয়ে মিশ্‌কা বলল, 'ওসব অফিসারী হালচাল ছাড়, বুঝেছ? কালই রওনা দেও। যদি ভালোয় ভালোয় না যাও তাহলে সেপাই সঙ্গে দিয়ে জোর করে পাঠাব। এবারে বুঝলে ত?'

'হ্যাঁ এবারে সব পরিষ্কার। . . .' মিখাইল পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল। ঘৃণাভরে ওর পিঠের দিকে তাকাল গ্রিগোরি, জামাকাপড় না খুলেই খাটে শুয়ে পড়ল।

হ্যাঁ যেমন ঘটা উচিত ছিল তাই-ই ঘটেছে। এ ছাড়া আর কী রকম অভ্যার্থনাই বা গ্রিগোরি আশা করতে পারত? সত্যিই ত কী করে ও ভাবতে পেরেছিল যে লাল ফৌজে মাত্র কয়েক দিন বিশ্বস্ত ভাবে সেবা ক'রে তাই দিয়ে ওর অতীতের

সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে? মিখাইল যখন বলে যে সব পাপের ক্ষমা নেই এবং পুরনো ঋণ সুদে মূলে শোধ করতে হবে – সেটা হয়ত ঠিকই বলে।

. . .স্বপ্নে গ্রিগোরি দেখল স্তেপের বিশাল ধু ধু মাঠ। আক্রমণের জন্য একটা রেজিমেন্ট তৈরি করে রাখা হয়েছে সেখানে। তারপর দূরের কোথা থেকে যেন ভেসে এলো একটা টানা সুরের হুকুম: 'স্কো-য়া-ড্রন!' সেই মুহূর্তেই গ্রিগোরির মনে পড়ল ওর ঘোড়ার জিনের কষি ঢিলে হয়ে আছে, টেনে বাঁধা হয় নি। জোর ক'রে সে বাঁ রেকাবে পা গলিয়ে দিল – জিনটা হড়কে নীচে নেমে গেল। লজ্জায় আর আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে জিনের কষি শক্ত ক'রে টেনে বাঁধতে গেল। এমন সময় শুনতে পেল অসংখ্য ঘোড়ার খুরের বজ্রনাদ - মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠে পরক্ষণেই দ্রুত দূরে কোথায় মিলিয়ে গেল।

রেজিমেন্ট ওকে বাদ দিয়েই আক্রমণে নেমে পড়ল। . . .

গ্রিগোরি এপাশ ওপাশ করতে থাকে। শেষকালে ঘুম ভেঙে যেতে শুনতে পায় তার নিজের ভাঙা ভাঙা গলার কাতরানি।

জানলার বাইরে সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। হয়ত রাতে হাওয়ায় খড়খড়ি খুলে গিয়েছিল। হিমের কণায় ছেয়ে গেছে জানলার পুরনো ঘসা কাচ। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ চাঁদের সবুজাভ আলোর ঝিকিমিকি বৃত্তটা। গ্রিগোরি হাতড়ে তামাকের বটুয়া বার করে, একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরায়। হৃৎপিণ্ডটা তখনও দ্রুততালে ধড়াস ধড়াস ওঠানামা করছে। ও চিত হয়ে শুয়ে আপন মনে হাসে। 'আচ্ছা এমন বিশ্রী স্বপ্নও কেউ দেখে! লড়াই করার সুযোগটাও মিলল না! . . .' ভোরের আগের সেই মুহূর্তটিতে সেদিন সে ভাবতেও পারে নি যে ওকে আরও কয়েকবার নামতে হবে হামলায় – যেমন স্বপ্নে, তেমনি জাগরণেও।

সাত

সকাল-সকাল উঠে পড়েছে দুনিয়াশ্‌কা। গোরু দোহাতে হবে। রান্নাঘরে সন্তর্পণে পা ফেলে ঘোরাঘুরি করছে গ্রিগোরি, মাঝে মাঝে কাশছে। কম্বলটা টেনে ছেলেমেয়েদের ভালো ক'রে ঢেকে দিল দুনিয়াশ্‌কা, চটপট জামাকাপড় পরে এসে ঢুকল রান্নাঘরে। গ্রিগোরি তখন ওভারকোটের বোতাম আঁটছে।

'এত সকালে কোথায় চললেন দাদা?'

'গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে একটু দেখে আসি।'

'জলখাবার খেয়ে নিলে হত না তারপর না হয়. . .'

'ইচ্ছে করছে না। মাথা ধরেছে।'

'সকালের খাওয়ার সময় ফিরবেন ত? আমি এক্খুনি উনুন ধরাচ্ছি।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করার কোন দরকার নেই। শিগ্গির ফিরছি না।'

গ্রিগোরি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সকালের দিকে বরফ সামান্য গলতে শুরু করেছে। দক্ষিণ থেকে ভিজে আর সামান্য উষ্ণ হাওয়া বইছে। ভিজে বরফের সঙ্গে সঙ্গে চাপ চাপ কাদা লেগে যাচ্ছে জুতোর গোড়ালিতে। ধীরে ধীরে পা ফেলে গ্রামের মাঝের দিকে যেতে যেতে গ্রিগোরি তার আশৈশব চেনা ঘরবাড়ি আর চালাঘরগুলো এমন ভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল যেন কোন অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। বারোয়ারিতলার আশেপাশে সদাগরদের ঘরবাড়ি আর দোকানপাটের কালো পোড়া ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। গত বছর কশেভয় এগুলো আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। গির্জার চারধারের পাঁচিলটা পড় পড়, জায়গায় জায়গায় ভেঙে হাঁ হয়ে আছে। গ্রিগোরি নিস্পৃহ ভাবে মনে মনে ভাবল, 'উনুনের জন্য ইঁটের দরকার পড়েছিল আর কি।' গির্জাটা দাঁড়িয়ে আছে সেই আগের মতোই ছোট, যেন মাটিতে বসে আছে। চালে বহুকাল রঙ পড়ে নি, সোনালি মরচেতে ছেয়ে আছে। দেয়ালটা কালচে-বাদামী নোনা ধরা দাগে চিত্রবিচিত্র। যেখানে যেখানে পলেস্তারা খসে গেছে সেখানে লাল টকটকে টাটকা ইট বেরিয়ে আছে।

রাস্তা জনশূন্য। কুয়োর কাছাকাছি দু'-তিনজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হয় গ্রিগোরির। ঘুম জড়ানো চোখ তাদের। গ্রিগোরিকে দেখে তারা এমন ভাবে মাথা নুইয়ে নমস্কার করে যেন সে বাইরের লোক। কেবল গ্রিগোরি তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পর তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে তার চলার পথের দিকে।

'মা আর নাতালিয়ার কবরের জায়গায় গিয়ে একবার ওদের দেখে আসতে হয়,' এই ভেবে গ্রিগোরি কবরখানায় যাবার রাস্তার দিকে মোড় নিল। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। অমনিতেই মনটা তার অশান্ত হয়ে আছে। 'আরেক সময় যাওয়া যাবে না হয়,' স্থির ক'রে সে রওনা দিল প্রোখরের বাড়ির দিকে। মনে মনে নিজেকে বলল, 'আমি এলাম না এলাম এখন সবাই সমান ওদের কাছে। ওরা ওখানে এখন শান্তিতে আছে। সব শেষ হয়ে গেছে। বরফে ছেয়ে আছে ওদের কবর। আর মাটির নীচে, গভীরে নিশ্চয় বেশ ঠাণ্ডা। . . . ফুরিয়ে গেল ওদের জীবন - তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল একেবারে স্বপ্নের মতো। বৌ আর মা, পেত্রো, দারিয়া - সবাই শুয়ে আছে পাশাপাশি। . . . গোটা পরিবারটাই উঠে গেছে ওখানে, পাশাপাশি শুয়ে আছে। ওরা বেশ আছে। কিন্তু বাবা পড়ে

রইল ভিনদেশে। ওখানে অচেনাদের মাঝে নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে।...' গ্রিগোরি এখন আর আশেপাশে না তাকিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে পথ চলতে থাকে। সামান্য ভিজে ভিজে, বেশ নরম সাদা বরফ, এত নরম যে পায়ের তলায় টেরই পাওয়া যায় না। মসমস আওয়াজ করে না বললেই চলে।

তারপর গ্রিগোরি ভাবতে থাকে ছেলেমেয়েদের কথা। বয়সের তুলনায় ওরা কেমন যেন গম্ভীর আর চুপচাপ হয়ে গেছে। ওদের মা বেঁচে থাকতে অমন ছিল না। মরণ ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে – যা নিয়েছে তা বড়ই বেশি। ওরা ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। কাল পলিউশ্‌কা ওকে দেখে কেঁদে ফেলল কেন? বাচ্চারা ত দেখা হলে ওরকম কাঁদে না। ব্যাপারটা ঠিক বাচ্চাদের মতো নয়। কী ভেবেছিল ও? গ্রিগোরি যখন ওকে কোলে নিল তখন কেন ওর চোখে ভীতির ঝলক খেলে গেল? হয়ত ও এত কাল ধরেই রেখেছিল যে বাবা বেঁচে নেই, আর কখনও ফিরে আসবে না, তারপর দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল? সে যাই হোক না কেন গ্রিগোরির ওদের কাছে নিজেকে অপরাধী ভাবার কোন কারণ নেই। তবে আক্সিনিয়াকে বলতে হবে ও যেন মায়া মমতা দেখায় ওদের ওপর, নানা ভাবে ওদের মায়ের অভাব পূরণ করার চেষ্টা করে।... হয়ত ওরা এক সময় ওদের সৎ মা'র ন্যাওটা হয়ে পড়বে। ও বড় ভালো দরদী মেয়ে। গ্রিগোরিকে ভালোবাসে বলে তার ছেলেমেয়েদেরও ভালোবাসবে।

এই কথা ভাবতেও মন ভারী আর তিক্ত হয়ে ওঠে। পুরো ব্যাপারটা ত আর আসলে তাই বলে অত সোজা নয়। ওর গোটা জীবনটাই, এই কিছু দিন আগেও যেমন তার মনে হয়েছিল তেমন সহজ সরল নয়। ছেলেমানুষী সরলতায় বোকার মতো ধরে নিয়েছিল যে ঘরে ফিরে আসাটাই যথেষ্ট – পল্টনের গ্রেটকোট ছেড়ে মোটা বনাত কাপড়ের কোর্তা গায়ে চাপিয়ে হাল ধরবে – তাহলেই সব চলবে বাঁধাধরা নিয়মে। তাকে একটি কথাও বলবে না, কেউ খোঁটা দেবে না, সব আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। চাষবাস করে, পুরোপুরি সংসারী হয়ে দিব্যি সুখেশান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাস্তব জীবন অত সোজা নয়।

একটা কবজার ওপর ঝুলছে জিকভদের বাড়ির ফটকের পাল্লা। গ্রিগোরি সাবধানে পাল্লা খুলে ঢুকল ওদের বাড়ির উঠোনে। প্রোখরের পায়ে গোল ধাঁচের এক জোড়া ধ্যারধেরে পশমী জুতো, মাথায় ভুরু অবধি টেনে নামানো কানঢাকা টুপি। দুধ দোহানোর খালি বালতিখানা হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সে নিশ্চিন্ত মনে চলেছে দেউড়ির দিকে। সাদা ফোঁটা ফোঁটা দুধ বরফের ওপর পড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

'রাতটা কেমন কাটল কমরেড কম্যাণ্ডার?'

'ভগবানের আশীর্বাদে ভালোই।'

'একটু খোয়ারি ভাঙা দরকার। নইলে মাথাটা খালি খালি লাগছে – এই খালি বালতিটার মতো।'

'হ্যাঁ খোয়ারি ভাঙা একটা কাজের মতো কাজ বটে। কিন্তু বালতি খালি কেন? নিজে গোরু দোহাচ্ছিলে নাকি?'

প্রোখর মাথা নাড়িয়ে কানঢাকা টুপিটা মাথার পেছন দিকে সরিয়ে দিল। একমাত্র তখনই গ্রিগোরির নজরে পড়ল বন্ধুর অসম্ভব থমথমে মুখখানা।

'নয়ত কোন্ শয়তানে আমায় দুধ দুইয়ে দেবে বল? হুঃ খুব দোহানো দুইয়েছি হারামজাদীকে। আমার ওই দোহানোর চোটে বেটি পেটের ব্যথায় ছটফট করে না মরে।...' রাগে বালতিটা পাক মেরে ছুঁড়ে দিয়ে প্রোখর সংক্ষেপে বলে, 'চল, ভেতরে চল।'

'বৌ গেল কোথায়?' ইতস্তত ক'রে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

'শালা শয়তানে ওর মাথাটাই খেয়েছে। সেই সাত সকালে দলবল জুটিয়ে ক্রুজিলিন্‌স্কিতে চলে গেছে বৈঁচি ফল যোগাড় করে আনতে। কাল তোমাদের বাড়ি থেকে ফিরেছি কি অমনি পড়ল আমাকে নিয়ে। ওঃ সে যা বুকনি ঝাড়লে, আর কত যে ধর্মোপদেশ। শেষে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে বললে, 'যাই, বৈঁচি ফল আনতে যেতে হবে। মাক্সায়েভদের বাড়ির বৌরা আজ যাচ্ছে, আমিও ওদের সঙ্গে যাব।' আমি মনে মনে ভাবি, 'বৈঁচি কেন, অন্য কোন ফল পাকড় কুড়োতে যেতে হয় তা-ই যাও - তোমার পথ নিষ্কণ্টক হোক।' উঠে উনুন ধরালাম, তারপর গেলাম গোরু দুইতে। খুব দোয়া দুইলাম। তুমি কি মনে কর এক হাতে ও কাজ করা সম্ভব?'

'অদ্ভুত লোক ত! কোন মেয়েলোককে ডাকলেই পারতে।'

'অদ্ভুত বলতে হয় ভেড়ার বাচ্চাকে বোলো – ধেড়ে হয়ে গেলেও বুদ্ধিসুদ্ধি গজায় না, মায়ের শুকনো বাঁট চোষে। আমি বাপু জন্মে কখনও অদ্ভুত ছিলাম না। ভাবলাম নিজেই ব্যবস্থা ক'রে নেব। যা ব্যবস্থা হল। আমি ত গোরুটার নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে গেলাম, কিন্তু হারামজাদী কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে। ও যাতে না ভড়কে যায় আমি তাই মাথার টুপিটাও খুলে ফেললাম - কিন্তু লাভ থোড়াই। দুধ দোহাতে দোহাতে আমার গায়ের জামা ভিজে জবজবে হয়ে গেল। যেই ওর তলা থেকে বালতিটা নেব' বলে হাত বাড়িয়েছি অমনি এমন এক লাথি ঝাড়ল। বালতিটা এক পাশে কাত হয়ে গেল, আমি কাত হয়ে পড়লাম আরেক পাশে। এই হল আমার দোহানো। গোরু ত নয়, সাক্ষাৎ শিঙওয়ালা এক শয়তানী। ওটার মুখের ওপর থুতু ফেলে

আমি সরে গেলাম। দুধ ছাড়াও চলে যাবে। কী, খোয়ারি ভাঙা চলবে?'

'আছে নাকি, ঘরে?'

'শালার একটা বোতল আছে।'

'বেশ। ওতেই চলে যাবে।'

'এসো তাহলে ভেতরে এসে বোসো। ডিমে ভেজে দেবো? সে আমি ঝট করে বানিয়ে দিতে পারব।'

গ্রিগোরি খানিকটা চর্বির টুকরো কুচি কুচি ক'রে কাটল, বাড়ির কর্তাকে চুলোর আগুন উসকে দিতে সাহায্য করল। গোলাপী চর্বির টুকরোগুলো ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ ক'রে চাটুর গায়ে গড়াতে গড়াতে গলে যাচ্ছে। ওরা দু'জনে কোন কথা না বলে তাই দেখতে লাগল। প্রোখর শেষ কালে বিগ্রহের কুলুঙ্গির পেছন থেকে ধুলোমাখা বোতলখানা বার করল।

'গোপন ব্যাপার স্যাপার গিন্নির কাছ থেকে ওখানে লুকিয়ে রাখি,' সংক্ষেপে সে বলল।

ভেতরের ছোট্ট ঘরটা চুল্লীর আঁচে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। সেখানে বসে ওরা চাটের সঙ্গে মদ খেতে খেতে নীচু গলায় কথাবার্তা বলতে লাগল।

মনের গোপন কথাগুলো প্রোখর ছাড়া আর কাকেই বা প্রাণ খুলে বলতে পারে গ্রিগোরি? দীর্ঘ পেশীবহুল পাদুটো অনেকটা ছড়িয়ে টেবিলের ধারে বসেছে সে, ওর ভাঙা ভাঙা মোটা গলা চাপা শোনাচ্ছে।

'পল্টনে থাকতে আর বাড়ি ফেরার পথেও সারাক্ষণ ভেবে এসেছি মাটির কাছাকাছি থাকব, সমস্ত আপদ থেকে দূরে পরিবারের লোকজনের মাঝে একটু বিশ্রাম নেব। আট বছর হতে চলল ঘোড়ার পিঠ থেকে নামি নি বলা যেতে পারে – একি খেলা কথা! স্বপ্নে ঘুমের ঘোরে, প্রায় রোজ রাতেই দেখি সেই মধুর দৃশ্য – হয় আমি কাউকে খুন করতে যাচ্ছি নয়ত কেউ আমাকে খুন করতে আসছে। . . . কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি প্রোখর, আমি যা ভেবেছিলাম তা হবার নয়। . . দেখা যাচ্ছে জমি চাষ করা, তার যত্ন নেওয়া আমার কপালে আর হয়ে উঠবে না – অন্য কেউ করবে সে কাজ।'

'কাল মিখাইলের সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

'হ্যাঁ, মধুঢালা কথায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল।'

'কী বলে?'

গ্রিগোরি ক্রুশের আকারে আঙুলের ওপর আঙুল রেখে কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'এই হল আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সাদাদের দলে কাজ করেছিলাম বলে আমাকে কথা শোনাচ্ছে। ওর ধারণা নতুন সরকারের বিরুদ্ধে আমি ভেতরে ভেতরে রাগ

পুষে রেখেছি, সুযোগ পেলেই পিঠে ছুরি মারব। ওর ভয়, একটা বিদ্রোহ-টিদ্রোহ বাধিয়ে বসব। কিন্তু কেন, কিসের জন্যে ছাই ওকাজ আমি করতে যাব গাধাটা তা নিজে জানে না।'

'ও আমাকেও সে কথাই বলেছিল।'

গ্রিগোরি নিরানন্দ হাসি হাসল।

'ইউক্রেন দিয়ে যখন আমরা পোল্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছি সেই সময় এক ব্যাটা ঝোটন নিজের গ্রাম রক্ষা করবে বলে আমাদের কাছে হাতিয়ার চাইল। দস্যুদল ওদের কাবু করে লুটতরাজ করছে ওদের ওপর, গোরুবাছুরগুলো কেটে ফেলছে। রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার – আমার সামনেই কথা হচ্ছিল – বললে, 'তোমাদের হাতিয়ার দিলে তোমরা নিজেরাই দস্যুদলে গিয়ে ভিড়বে।' ঝোটনটা হেসে বলল কি জান? 'তোমরা আমাদের একবার হাতিয়ার দিয়ে দেখ কমরেড – দস্যুদের ত বটেই, তোমাদেরও ঢুকতে দেবো না গাঁয়ে।' আমিও এখন অনেকটা ওই ঝোটনের মতো ভাবি, তাতারস্কিতে যদি সাদা লাল কাউকে ঢুকতে দেওয়া না যেত তাহলে বরং ভালো হত। আমার শালা মিত্‌কা কোর্‌শুনভ বল আর মিখাইল কশেভয়ই বল, আমার কাছে দু'জনের দাম এক। মিখাইল ভাবে সাদাদের ওপরে আমার এত ভক্তি যে ওদের ছাড়া আমি বাঁচতেই পারি না! আহা কী কথাই বলল! কী রকম ভক্তি আমার ওদের ওপরে? এই ত কিছুদিন আগে, ক্রিমিয়ার দিকে এগোতে গিয়ে কর্নিলভ-দলের এক অফিসারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লড়াই বেধে যায় আমার। ছোটখাটো চেহারার চটপটে ধরনের কর্ণেলটি, সরু গোঁফজোড়া ইংরেজি কায়দায় ছাঁটা, নাকের নীচে সরু দুটো দাগ, সর্দির মতো ঝুলছে। এইসা তেড়েফুঁড়ে কোপটা মারলাম না যে আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস ক'রে উঠল! বেচারি কর্ণেলটির অর্ধেকটা মাথা আর অর্ধেক টুপি রয়ে গেল . . . টুপির মাথায় সাদা অফিসারের যে চুড়া সেটাও উড়ে বেরিয়ে গেল। . . . এই ত আমার ভক্তির নমুনা! ওরাও হাড় কম জ্বালায় নি আমার! শালার অফিসারের পদে আমি উঠেছি গায়ের রক্ত ঝরিয়ে, অথচ ওদের মাঝখানে আমি ছিলাম হংসমধ্যে বকো যথা। শালা শুয়োরের বাচ্চারা আমাকে কখনও মানুষ বলে গণ্য করে নি। আমার হাতে হাত মেলাতেও ওদের খারাপ লাগত। এর পরও কিনা আমি ওদের . . . কোন্ মা ওদের পেটে ধরেছিল কে জানে? আরে ওদের কথা বলতেও ত গা ঘিন ঘিন করে! আর কখনও ওদের রাজত্ব কায়েম হতে দেব? ফিট্‌জহেলাউরভদের মতো জেনারেলদের ডেকে আনব? একবার ওর স্বাদ নিয়ে আমি দেখেছি, তারপর সারাটা বছর ধরে হেঁচকি তুলে মরতে হয়েছে। অনেক হয়েছে, অনেক ভুগেছি। ঠেকে শিখেছি।'

গরম চর্বিতে রুটি ডুবিয়ে নিতে নিতে প্রোখর বলল, 'বিদ্রোহ-টিদ্রোহ কিছু হবে না। প্রথম কথা হল কসাকরা আছেই খুব কম। যারা কোন রকমে মাথা বাঁচিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে তাদেরও জ্ঞানগম্যি হয়েছে। তাইদের রক্ত কম ঝরায় নি, এখন তাই এত শান্ত আর বুদ্ধিমান হয়েছে যে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে আনলেও বিদ্রোহে নামানো যাবে না। তাছাড়া লোকে শান্তির জীবনের জন্যে আকুলিবিকুলি করছে। এবছর গরম কালে লোকে কী ভাবে কাজ করেছে তা যদি তুমি দেখতে! বিশাল বিশাল গাদা ক'রে খড় তুলেছে, ফসল যা তুলেছে - একটা দানাও ফেলে রাখে নি। কাতরাতে কাতরাতে প্রাণপাত ক'রে চাষ করেছে, ফসল বুনেছে – যেন একশ' বছর ক'রে বাঁচতে হবে সবাইকে! না, বিদ্রোহের কোন কথাই উঠতে পারে না। একেবারে বাজে কথা ওসব। অবিশ্যি কে জানে বাপু কসাকগুলোর মাথায় কখন কোন্ ভূত চেপে বসে! . . .'

'কোন্ ভূত চেপে বসতে পারে? কী বলতে চাও তুমি?'

'আমাদের পড়শিদের মাথায় ত চেপেইছে . . .'

'কী চেপেছে?'

'বাঃ, যেন জান না আর কি! ভরোনেজ প্রদেশে বগুচার ছাড়িয়ে কোথায় যেন বিদ্রোহ হয়েছে না? . . .'

'স্রেফ বাজে কথা!'

'বাজে কথা হতে যাবে কেন? কালই ত মিলিশিয়ার জানাশোনা একজন লোক বললে। ওদের নাকি ওখানে পাঠানোর তোড়জোড় করা হচ্ছে।'

'ঠিক কোন্ জায়গায়?'

'মনাস্তিরশ্চিনা, সুখোয়ে দনেৎস, পাসেকা, নয়া কালিত্‌ভা আর পুরনো কালিত্‌ভায়, আরও কোথায় কোথায় যেন। শোনা যাচ্ছে বিদ্রোহ নাকি মস্ত বড় রকমের।'

'কাল সেকথা বলিস নি কেন বুড়ো নিষ্কম্মা?'

'মিখাইলের সামনে বলার ইচ্ছে ছিল না। তাছাড়া এসব কথা নিয়ে আলোচনা করার মধ্যে সুখও তেমন নেই। ওসব জিনিস যেন বাকি জীবনে আর শুনতে না হয়,' প্রোখর অসন্তুষ্ট হয়ে বলল।

গ্রিগোরির মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে সে বলল, 'খারাপ খবর শোনালে তুমি।'

'তোমার তাতে কী আসে যায়? ভাবতে হয় ঝোঁটনগুলো ভাবুক গে। পাছায় চাবুক মেরে যখন ঘা ক'রে দেবে তখন বুঝতে পারবে বিদ্রোহ করা কাকে বলে। তোমার আমার কোন ব্যাপারই নয় এটা। ওদের জন্যে এতটুকু দুঃখু হয় না আমার।'

'আমার এখন অসুবিধে হয়ে যাবে।'

'তা কেন?'

'কেন মানে? আমার সম্পর্কে কশেভয়ের যে ধারণা, এলাকার সরকারী কর্তৃপক্ষেরও যদি সেই ধারণা হয়ে থাকে তাহলে ঝামেলা এড়ানোর উপায় আমার থাকবে না। পাশের এলাকায় বিদ্রোহ, আর আমি একজন পুরনো অফিসার, তাছাড়া এক কালে বিদ্রোহীদের দলে ছিলামও – আর কী? ... ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তো?'

প্রোখরের চিবুনো বন্ধ হয়ে গেল, গভীর চিন্তায় পড়ে গেল সে। এরকম ভাবনা ওর মাথায় আসে নি। খোয়ারির ফলে মাথাটা ভোঁতা হয়ে গেছে। ধীরে, ধীরে, কষ্ট ক'রে ভাবতে হচ্ছে।

'কিন্তু তুমি এর মধ্যে কী ক'রে আস গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ?' ভেবাচেকা খেয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

গ্রিগোরি বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকায়, চুপ ক'রে থাকে। দেখাই যাচ্ছে এ খবরে সে রীতিমতো বিচলিত। প্রোখর ওকে গেলাসটা এগিয়ে দিতে গিয়েছিল, কিন্তু তার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে দৃঢ় গলায় বলে উঠল, 'আর খাচ্ছি না।'

'আরও একটা করে হয়ে যাক না? খাও গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, যতক্ষণ না চোখমুখ কালো হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ চালিয়ে যাও। জীবন আজকাল এত সুখের হয়ে দাঁড়িয়েছে যে চোলাই মদে বুঁদ হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।'

'কালো হতে হয় তুমি একা হও গে। মাথাটা এমনিতেই গেছে, ও খেলে একেবারেই যেতে হবে। আমায় আজই ভিওশেনস্কায়া যেতে হবে, রেজিস্ট্রি করতে যাব।'

প্রোখর একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওর দিকে। গ্রিগোরির রোদে জলে হাওয়ায় পোড় খাওয়া মুখখানা কালচে বাদামী রঙের গাঢ় রক্তোচ্ছ্বাসে ছেয়ে গেল। শুধু তার ব্যাকব্রাশ করা চুলের একেবারে গোড়ার চামড়ার ফ্যাকাসে সাদা রঙটুকু তখনও ফুটে বেরোচ্ছে। যুদ্ধ আর দুর্দিনের মধ্যে এই যে সৈনিকটির সঙ্গে প্রোখরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, জীবনে কীই না দেখেছে সে! অধীরতা তার নেই। সামান্য ফোলা ফোলা চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ, সেখানে পড়েছে নিদারুণ ক্লান্তির ছাপ।

'তোমার কি ভয় করছে না যদি ... যদি ওরা তোমায় জেলে পোরে?' প্রোখর জিজ্ঞেস করে।

গ্রিগোরি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

'ঠিক সেটাই আমার ভয় রে ভাই! জীবনে কখনও জেলখানায় কাটাই নি।

যমের চেয়েও বেশি ভয় করি জেলের। এখন দেখা যাচ্ছে তারও কিছু স্বাদ নেওয়া কপালে লেখা আছে।'

'কেন যে তুমি বাড়ি ফিরতে গেলে!' প্রোখর দুঃখ করে বলে।

'কিন্তু কোথায় যেতাম তাহলে?'

'শহরে কোথাও ঘুরে টুরে বেড়ালেই পারতে, অপেক্ষা করতে। ঝামেলা কেটে গেলে না হয় ফিরতে।'

গ্রিগোরি হাত নেড়ে ওর কথাটা উড়িয়ে দিল, হেসে বলল, 'ও আমার পোষায় না! কখন ধরবে সেজন্য অপেক্ষা ক'রে থাকা - এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? ছেলেপিলেগুলোকে ফেলে কোথায়ই বা যেতে পারতাম বল?'

'এ একটা কথা হল! তোমাকে ছাড়া যেন ওরা এতদিন কাটায় নি! তাছাড়া পরে তুমি ওদের আর তোমার পিয়ারীকেও নিতে পারতে। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে তোমায় ভুলে গেছি! তোমার মনিবরা, ওই যে যাদের কাছে লড়াইয়ের আগে তুমি আর আক্সিনিয়া ছিলে, দু'জনের কেউই আর নেই।'

'লিস্তনিৎস্কিদের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ গো, তারাই। পিছু হটার সময় আমার জ্ঞাতি ভাই জাখর ছোট কর্তা লিস্তনিৎস্কির চাপরাসী ছিল। তার মুখেই শুনলাম, বুড়ো কর্তা মরোজভস্কায়াতে টাইফাস জ্বরে ভুগে মরেছে। আর ছোটজন, ইয়েকাতেরিনোদার পর্যন্ত যেতে পেরেছিল - সেখানে তার ইস্তিরিটি জেনারেল পক্রোভস্কির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। আর সহ্য করতে না পেরে ছোটকর্তা রেগেমেগে গুলি ক'রে আত্মহত্যা করে।'

'মরুক গে ওরা,' নির্লিপ্ত ভাবে গ্রিগোরি বলল। 'যে সব ভালো ভালো লোক চলে গেছে তাদের জন্যে দুঃখু হয়। কিন্তু এই এগুলোর জন্যে কেউ শোক করতে যাবে না।' উঠে দাঁড়িয়ে সে গ্রেটকোটটা গায়ে চাপাল। দরজার হাতলটা ধরে এবারে যেন গভীর চিন্তা করতে করতে বলল, 'অবিশ্যি শয়তানই জানে কেন, ছোট লিস্তনিৎস্কি বা আমাদের কশেভয়ের মতো লোকদের আমি বরাবর হিংসে ক'রে এসেছি। . . . ওদের কাছে একেবারে শুরু থেকেই সব পরিষ্কার ছিল, কিন্তু আমি আজ অবধি সব ব্যাপার স্যাপার পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারলাম না। ওদের, ওদের দু'জনেরই ছিল নিজেদের রাস্তা - সোজা রাস্তা, তার শেষও ওরা জানত। কিন্তু আমি সেই সতেরো সাল থেকে আঁকাবাঁকা পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, নেশাখোর মাতালের মতো টক্কর খাচ্ছি। . . . সাদাদের দল ছেড়ে দিলাম, কিন্তু লালদের সঙ্গেও ভিড়লাম না। ডোবার জলে নোংরা গোবরের মতো ভাসছি। . . . বুঝলে প্রোখর, আমার অবিশ্যিই উচিত ছিল শেষ পর্যন্ত লাল ফৌজে থেকে যাওয়া। তাহলে হয়ত সব .িকছু ভালোয় ভালোয় সামাল দিতে পারতাম। অথচ দেখ,

তুমি ত জানই, গোড়ায় আমি বেশ মনপ্রাণ দিয়ে সোভিয়েত সরকারের সেবা করেছিলাম, কিন্তু তারপর সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল।... সাদাদের দলে থাকতে ওদের কর্তাব্যক্তিদের কাছে আমি ছিলাম বাইরের লোক, বরাবর ওরা আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত। তা হবেই বা না কেন? আমি হলেম গিয়ে চাষীর ছেলে, অশিক্ষিত কসাক – আমি ওদের কে? ওরা আমায় বিশ্বাস করত না! কিন্তু পরে লাল ফৌজের সঙ্গেও সেই একই ব্যাপার হল। আমি ত আর অন্ধ নই, আমি ঠিকই দেখতে পেতাম স্কোয়াড্রনে কমিসার আর কমিউনিস্টরা আমাকে কী নজরে দেখত।... লড়াইয়ের সময় আমাকে চোখে চোখে রাখত, আমার প্রত্যেকটা চালচলনের ওপর কড়া নজর রাখত। ওরা হয়ত মনে মনে ভাবত, 'শালা শুয়োরের বাচ্চা, সাদাদের এই ঘাগু কসাক অফিসারটা আমাদের পথে বসিয়ে না দেয়!' এই ব্যাপারটা লক্ষ করার পর আমার মনের উৎসাহও সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। শেষের দিকে ওদের এই অবিশ্বাস আর সইতে পারতাম না। তাপে পাথরও ত ফেটে যায়। ফৌজ থেকে আমাকে যে ছাড়িয়ে দিয়েছে এটা ওরা ভালোই করেছে। তাতে শেষটা আরও তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এলো।' চনচন ক'রে কেশে সে গলা খাঁকারি দেয়। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর প্রোখরের দিকে না তাকিয়ে একেবারে অন্য সুরে বলে, 'তুমি আমাকে খাওয়ালে, সে জন্য ধন্যবাদ তোমাকে। আমি চলি। ভালো থাকো তুমি। যদি ফিরি ত সন্ধেনাগাদ একবার এসে দেখা করে যাব। বোতলটা সরিয়ে ফেল। নইলে গিন্নি এসে দেখলে তোমায় আর আস্ত রাখবে না।'

প্রোখর ওকে দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল, বারান্দায় ওকে কানে কানে বলল, 'দেখো পান্তেলেয়েভিচ, ওখানে ওরা যেন তোমায় আটকে রেখে না দেয়।'

'দেখা যাবে,' সংযত কণ্ঠে গ্রিগোরি জবাব দিল।

বাড়িতে ফিরে না গিয়ে গ্রিগোরি দনের দিকে নেমে গেল। কার একটা নৌকো বাঁধা ছিল ঘাটে। সেটা খুলে নিয়ে দু'হাতে অঞ্জলি ক'রে ভেতরের জল ছেঁচে ফেলল। তারপর বেড়া থেকে একটা খুঁটি উপড়ে নিয়ে চারপাশের জমাট বরফ ভাঙল, দাঁড় বয়ে এগিয়ে চলল ওপারের দিকে।

দনের গাঢ় সবুজ রঙের ঢেউ হাওয়ায় আছাড় খেয়ে ফেনা তুলে গড়িয়ে চলেছে পশ্চিমের দিকে। পারের কাছে শান্ত জলে ঘা দিয়ে স্বচ্ছ হালকা ভঙ্গুর বরফ ভাঙছে, গোছা গোছা জলা ঘাস আর সবুজ মখমলী শেওলা দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। পারের মাথায় বরফের চাঁইয়ে ঠোকাঠুকি লাগার টুংটাং স্ফটিক-ভাঙা আওয়াজ উঠছে, ডাঙার কাছের নুড়ি পাথরগুলোর ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে সরসর আওয়াজ তুলছে। কিন্তু দূরে, মাঝখানে, জলের স্রোত জোরাল, একটানা।

সেখানে গ্রিগোরি শুনতে পায় কেবলই নৌকোর বাঁ পাশে ভিড় করে এসে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের চাপা ছলাত ছলাত আর কলকল শব্দ, সেই সঙ্গে দন তীরের বনভূমিতে বাতাসের অবিরাম গভীর নীচু খাদের গর্জন।

নৌকো অর্ধেকটা পারে টেনে তুলে আনল গ্রিগোরি। মাটিতে বসে বুটজুতো খুলল। পায়ে জড়ানো ন্যাকড়ার ফালিগুলো খুলে আবার যত্ন করে জড়াল। তাতে হাঁটতে অনেকটা সুবিধা হবে।

দুপুর নাগাদ সে এসে পৌঁছুল ভিওশেনস্কায়ায়।

প্রদেশের সামরিক প্রশাসন দপ্তরে অসংখ্য লোকের ভিড় আর চেঁচামেচি। থেকে থেকে ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বাজছে, দরজা খোলা বন্ধ হওয়ার দড়াম দড়াম আওয়াজ হচ্ছে, সশস্ত্র লোকজন ঢুকছে বেরুচ্ছে। আশেপাশের ঘরগুলোর ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে টাইপরাইটারের খটাখট শব্দ। ভেতরের গলি-বারান্দায় ডজন দুয়েক লাল ফৌজী বেঁটেখাটো একজন লোককে ঘিরে হুড়োহুড়ি ক'রে কী যেন বলছে আর থেকে থেকে হো হো ক'রে হেসে উঠছে। লোকটার গায়ে কোমরে কুঁচি দেওয়া রমানভ মার্কা খাটো ভেড়ার চামড়ার কোর্তা। গলি-বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে গ্রিগোরি দেখতে পেল দূরের একটা ঘরের ভেতর থেকে দু'জন লাল ফৌজী একটা ভারী মেশিনগান টেনে বার করছে। মেশিনগানের চাকাগুলো খরখরে কাঠের মেঝেতে লেগে মৃদু খটখট আওয়াজ তুলছে। মেশিনগানারদের একজন, বেশ দশাসই হৃষ্টপুষ্ট চেহারার এক সেপাই, ঠাট্টা ক'রে চেঁচিয়ে বলছিল, 'এই তফাত যাও, তফাত যাও, জরিমানা আদায়ের কোম্পানি। রোলার চালিয়ে দেবো কিন্তু!'

'দেখা যাচ্ছে সত্যি সত্যি বিদ্রোহ দমাতে যাচ্ছে,' গ্রিগোরি মনে মনে ভাবল।

রেজিস্ট্রেশনে বেশিক্ষণ আটকাল না ওকে। তাড়াতাড়ি ওর কাগজপত্র দেখে সইসাবুদ ইত্যাদির পালা শেষ হওয়ার পর দপ্তরের সেক্রেটারী বলল, 'দন জরুরী কমিশনের পলিটব্যুরোতে* চলে যান। আপনি একজন পুরনো অফিসার, তাই ওদের কাছে আপনাকে রিপোর্ট করতে হবে।'

'জে আজ্ঞে,' বলে গ্রিগোরি টুপির কানাতে হাত ঠেকিয়ে মিলিটারী কায়দায় সেলাম ঠুকল। ভেতরে ভেতরে যে চঞ্চল হয়ে পড়েছিল বাইরে হাবভাবে তা প্রকাশ করল না।

বেরিয়ে চত্বরে আসার পর সে বেশ ভাবনায় পড়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে

---

* এখানে ১৯২০-১৯২১ সালে জরুরী কমিশনের প্রাদেশিক অথবা জেলা সংস্থাগুলি। – সম্পাঃ

পড়ল। পলিটব্যুরো যাওয়া দরকার, কিন্তু ওর সমস্ত সত্তা প্রচণ্ড বিদ্রোহ করছে। ওর অন্তরাত্মা বলে উঠল, 'জেলে পুরবে!' ভাবতেই ভয়ে ঘৃণায় শিউরে ওঠে গ্রিগোরি। স্কুল বাড়ির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে গোবরের সার দেওয়া জমির দিকে। কল্পনায় দেখতে পায় ওর দু'হাত বাঁধা, নোংরা সিঁড়ি দিয়ে ও নামছে মাটির তলার কুঠুরিতে। ওর পেছন পেছন ন্যাগান রিভলভারে খরখরে বাঁটটা সজোরে চেপে ধরে আসছে একটা লোক। গ্রিগোরি মুঠো করে হাত পাকিয়ে ফুলে ওঠা নীল শিরার দিকে তাকিয়ে দেখল। এই হাতদুটো ওরা বাঁধবে? ভাবতেই সমস্ত রক্ত ওর মাথায় চড়ে যায়। না, আজ ও ওখানে যাবে না! কাল, সে যাওয়া যাবে। কিন্তু আজ গাঁয়ে ফিরে যাবে। আজকের দিনটা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটাবে, আক্সিনিয়াকে দেখবে, সকালবেলা আবার ফিরে আসবে ভিওশেনস্কায়ায়। হাঁটতে গেলে পায়ে অবশ্য ব্যথা লাগছে, কিন্তু সে মরুক গে, কিছু এসে যায় না। ও শুধু একটি দিনের জন্য বাড়ি যাবে, তারপর আবার ফিরে আসবে এখানে – অবশ্যই আসবে। কাল যা হবার হোক, কিন্তু আজ নয়!

'আরে মেলেখভ যে! প্রায় এক যুগ পরে . . .'

গ্রিগোরি ঘুরে দাঁড়াল। ওর দিকে এগিয়ে আসছে ইয়াকভ ফোমিন। পেত্রোর সঙ্গে এক রেজিমেণ্টে থেকে লড়াই করেছে, এক কালে দন ফৌজের আটাশ নম্বর বিদ্রোহী রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার ছিল।

এক সময় গ্রিগোরি তাকে যেমন দেখেছিল এ সেই আগেকার আতামান রেজিমেন্টের সৈনিক ফোমিন নয়। তখন সে ছিল জবুথবু গোছের, তার বেশভূষারও বিশেষ যত্ন ছিল না। দু'বছরে তার ভোল আশ্চর্য রকম পালটে গেছে। গায়ে ঘোড়সওয়ার সৈনিকের গ্রেটকোটখানা চমৎকার ফিট-করা। লালচে বাদামী গোঁফজোড়া বেশ মাজাঘসা, উদ্ধত ভঙ্গিতে মোচড়ানো। ওর ইচ্ছে করে বুক ফুলিয়ে হাঁটাচলায়, আত্মতৃপ্ত হাসিতে, ওর সর্বাঙ্গে ফুটে উঠছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন আর কেউকেটা ভাব।

গ্রিগোরির সঙ্গে করমর্দন ক'রে অনেকখানি ব্যবধান জুড়ে থাকা নীল চোখজোড়া দিয়ে তাকে ভালো করে দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী মনে ক'রে আমাদের এখানে?'

'পল্টন থেকে ছাড় পেয়ে গেছি। মিলিটারী দপ্তরে গিয়েছিলাম। . . .'

'কত দিন হল এসেছ?'

'গতকাল।'

'তোমার দাদা পেত্রো পান্তেলেয়েভিচের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। ভালো

কসাক ছিল। কিন্তু মারা গেল একেবারে বেঘোরে। . . . আমাদের যে গলায় গলায় ভাব ছিল! বুঝলে মেলেখভ, গত বছর বিদ্রোহ করা ঠিক হয় নি তোমাদের। ভুল করেছিলে তোমরা!'

কিছু একটা বলতে হয়, তাই গ্রিগোরি বলল, 'হ্যাঁ, ভুল করেছিল কসাকরা। . . .'

'তুমি কোন্ ইউনিটে ছিলে?'

'এক নম্বর ঘোড়সওয়ার আর্মিতে।'

'কী ছিলে?'

'স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার।'

'বটে! আমিও এখন একটা স্কোয়াড্রনের দায়িত্বে আছি। আমাদের ভিওশেন্‌স্কায়ায় নিজেদের একটা পাহারাদার স্কোয়াড্রন আছে যে।' আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফোমিন গলা নামিয়ে বলল, 'চল একটু হেঁটে এগিয়ে যাই। আমার সঙ্গে একটু হেঁটে চল। এখানে বড্ড লোকের আনাগোনা, একটু শান্তিতে কথা বলার উপায় নেই।'

ওরা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল। গ্রিগোরির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফোমিন জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে থাকবে বলে ভাবছ নাকি?'

'আর কোথায় থাকব? অবশ্যই বাড়িতে।'

'ক্ষেত খামারি করবে?'

'হ্যাঁ।'

ফোমিন সখেদে মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'বড় খারাপ সময় বেছে নিয়েছ হে মেলেখভ। হ্যাঁ বড় খারাপ সময়। . . . আরও দু'-এক বছর বাইরে থাকতে পারলে ভালো করতে।'

'কেন?'

গ্রিগোরির কনুই ধরে টেনে ওর দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে ফোমিন ফিসফিসিয়ে বলল, 'প্রদেশে উত্তেজনা চলছে। চাষীদের কাছ থেকে বাড়তি খাদ্য আদায়ের যে নীতি সরকার নিয়েছেন তার ফলে কসাকরা বেজায় খেপে আছে। বোগুচার জেলায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এখন আমরা বিদ্রোহ দমন করতে চলেছি। তুমি ভাই এখন বরং সরে পড়, যত তাড়াতাড়ি পার ততই ভালো। পেত্রো আমার বড় বন্ধু ছিল, তাই তোমাকে আমার উপদেশ: সরে পড়!'

'সরার কোন জায়গা নেই আমার।'

'সে তুমি নিজে দেখ! কথাটা আমি এই জন্যে বলছি যে পলিটব্যুরো অফিসারদের ধরপাকড় শুরু করে দিয়েছে। এই সপ্তাহেই দুদারেভ্‌কা থেকে তিনজন জুনিয়র কর্ণেটকে, রেশেতোভ্‌কার একজনকে ধরে এনেছে, দনের এপারে ত

গণ্ডায় গণ্ডায় ধরে আনা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, একেবারে সাধারণ কসাকদের বাজিয়ে দেখতে শুরু করেছে। নিজে বুঝে দেখ গ্রিগোরি পান্তেলেযেভিচ।'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। তবে কথাটা হল, আমি কোথাও যাচ্ছি নে,' গোঁয়ারের মতো গ্রিগোরি বলল।

প্রদেশের পরিস্থিতি, প্রদেশ-কর্তৃপক্ষ এবং প্রদেশের মিলিটারী কম্যাণ্ডার শাখায়েভের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলল ফোমিন। গ্রিগোরি নিজের চিন্তায় ডুবে ছিল। খুব একটা মন দিয়ে ওর কথা শুনল না। তিনটে মহল্লা পার হওয়ার পর ফোমিন দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে। চলি।' টুপিতে হাত ঠেকিয়ে সে নিরুৎসাহ গলায় বিদায় নিল গ্রিগোরির কাছ থেকে। কাঁধের নতুন বেলটে মসমস আওয়াজ তুলে সোজা হয়ে এমন গুরুগম্ভীর চালে সে গলির ভেতরে ঢুকে গেল যে দেখে হাসি পায়।

গ্রিগোরি দৃষ্টি দিয়ে তাকে অনুসরণ করল। ফিরতি পথ ধরল। পলিটব্যুরোর দু'তলা দালানের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে সে ভাবে, 'শেষ যদি করতে হয় ত যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। গড়িমসি করে লাভ কী? গণ্ডগোল যখন পাকিয়েছ গ্রিগোরি, তখন কৈফিয়ত কেমন করে দিতে হয় তাও জানা উচিত।'

আট

সকাল আটটা নাগাদ আক্সিনিয়া পোড়া কয়লা খুঁচিয়ে উনুন পরিষ্কার করল। ঘর্মাক্ত মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। বেঞ্চিতে বসে বুকের সামনের কাপড় দিয়ে মুখ মুছল সে। ভোরের আলো ফোটার আগেই সে ঘুম থেকে উঠেছিল যাতে সকাল-সকাল রান্নার কাজ সেরে ফেলা যায়। সিমাই দিয়ে মুরগীর ঝোল রান্না করেছে। সরা পিঠে বানিয়েছে, পুলিপিঠে বানিয়ে সেদ্ধ ক'রে অনেকখানি ননী দিয়ে কড়ায় ঢিমে আঁচে ভেজেছে। ও জানত গ্রিগোরি ভাজা পুলিপিঠে ভালোবাসে। ওর প্রণয়ী আজ ওর বাড়িতেই খাবে এই আশায় রীতিমতো ভোজের আয়োজন সে করেছিল।

তার বড় ইচ্ছে ছিল কোন একটা অছিলায় মেলেখভদের বাড়ি যায়, মিনিটখানেকের জন্য হলেও সেখানে গিয়ে গ্রিগোরিকে অন্তত একটু চোখের দেখা দেখে। সে এখানে পাশে আছে, অথচ তাকে দেখার উপায় নেই একথা যে ভাবাই যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইচ্ছেটা দমন করল আক্সিনিয়া, গেল না।

হাজার হোক সে ত আর একটা বাচ্চামেয়ে নয়। ওর বয়সে এরকম প্রগলভতা শোভা পায় না।

অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি যত্ন ক'রে সে হাতমুখ ধুল। এম্ব্রয়ডারি করা সায়ার ওপরে পরিষ্কার নতুন একটা জামা পরল সে। ডালা খোলা তোরঙ্গের সামনে অনেকক্ষণ দোনমন হয়ে ভাবতে লাগল - কোন্ পোশাকটা পরা ঠিক হবে। সাদামাঠা কাজের দিনে ছুটির দিনের মতো সাজগোজ করাটা বেয়াড়া দেখাবে। অথচ আটপৌরে কাজের পোশাক পরে থাকতেও মন চাইছিল না। কোনটা বাছাই করবে, কী পরবে বুঝে উঠতে না পেরে আক্সিনিয়া ভুরু কুঁচকে ইস্তিরি-করা ঘাগরাগুলো হাতে নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে নাড়াচাড়া ক'রে দেখে। শেষকালে মন ঠিক ক'রে ফেলে। গাঢ় নীল ঘাগরা আর কালো লেস দেওয়া নীল ব্লাউজটা সে তুলে নেয়। ওটা সে আগে প্রায় পরেই নি কখনও। এটাই ওর সব জামাকাপড়ের মধ্যে সেরা। মোটকথা পড়শীরা কী মনে করবে তাতে ওর কিছু এসে যায়? ওদের কাছে দিনটা মামুলী হতে পারে, কিন্তু ওর কাছে একটা দিনের মতো দিন বটে। তাড়াতাড়ি সাজগোজ ক'রে আয়নার কাছে এগিয়ে যায়। বিস্ময়ের একটা মৃদু হাসি খেলে যায় ওর ঠোঁটের কোনায়। এ যেন খুশিতে উচ্ছল অন্য কারও অল্পবয়সী চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আক্সিনিয়া বেশ যত্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মুখখানা দেখে, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। না এখনও ঝরে যায় নি ওর রূপ। এখনও কোন কসাক রাস্তায় ওকে দেখে থমকে না দাঁড়িয়ে পারবে না, ও পাশ দিয়ে চলে গেলে মুগ্ধ চোখে ফিরে না তাকিয়ে পারবে না!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাগরাটা ঠিক করতে করতে ও জোরে জোরে বলে ফেলল, 'এবারে সামলাও গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ! . . .' মুখটা লাল হয়ে উঠছে উপলব্ধি ক'রে নিঃশব্দে চাপা হাসি হাসল। তবু এরই মধ্যে কিন্তু রগের পাশে কয়েকটা পাকা চুল খুঁজে পেল, পেয়ে সেগুলো উপড়েও ফেলল। গ্রিগোরির চোখে এরকম কিছু পড়া ঠিক হবে না যা দেখে ওর বয়সের কথা মনে পড়তে পারে। গ্রিগোরির কাছে ওকে থাকতে হবে তেমনই যুবতী যেমন ছিল সাত বছর আগে।

দুপুরের খাবার সময় অবধি সে কোন রকমে ধৈর্য ধরে ঘরে বসে রইল। কিন্তু তারপরে আর থাকতে না পেরে ফুরফুরে সাদা ছাগলের লোমের চাদরখানা কাঁধে ফেলে চলল মেলেখভদের বাড়ির দিকে। বাড়িতে দুনিয়াশ্কা একা ছিল। আক্সিনিয়া যথারীতি সম্ভাষণ জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দুপুরের খাওয়া দাওয়া এখনও হয় নি তোমাদের?'

'যা সব বাউণ্ডুলে লোকজন, এদের জ্বালায় কি সময় মতো খাওয়ার জো

আছে? স্বামী গেছে সোভিয়েতের আপিসে, আর গ্রিশা চলে গেছে জেলা-সদরে। ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে দিয়েছি। এখন বসে আছি বড়দের জন্যে।'

বাইরে শান্ত ভাব বজায় রাখল আক্সিনিয়া। সে যে কী পরিমাণ হতাশ হয়েছে কথায় বা হাবেভাবে কোনটাতেই তা প্রকাশ করল না।

'আমি ত ভেবেছিলাম তোমরা সবাই বাড়ি আছ। গ্রিশা . . . গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ কখন বাড়ি ফিরবে? আজ ফিরবে কি?'

পড়শীর সাজগোজের ওপর চট করে নজর বুলিয়ে নিয়ে দুনিয়াশ্‌কা অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, 'রেজিস্টিরি করতে গেছে।'

'কখন ফিরবে বলে গেছে?'

দুনিয়াশ্‌কার চোখে জল চিকচিক করে ওঠে। একটু বাধো বাধো গলায় ঠেস দিয়ে সে বলে উঠল, 'হুঁঃ সাজগোজ করার আর সময় পেলে না। . . . জান না বুঝি যে একেবারে নাও ফিরতে পারে?'

'নাও ফিরতে পারে কী রকম?'

'আমার স্বামী বলছে তাকে জেলা-সদরে ধরে রেখে দেবে। . . .' রাগে দুনিয়াশ্‌কার চোখে সামান্য কয়েক ফোঁটা জল বেরিয়ে এসেছিল। জামার হাতায় চোখের জল মুছে সে হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হায় কী পোড়াকপাল নিয়েই এসেছি! চুলোয় যাক সব। কবে শেষ হবে এই জ্বালার? চলে ত গেল, এদিকে ছেলেমেয়েগুলো পাগলের মতো ছটফট করছে। আমার প্রাণ জেরবার ক'রে দিল: 'বাবা কোথায় গেল? কখন আসবে?' আমি তার কী জানি বাপু? ওদের বার করে দিলাম উঠোনে। কিন্তু আমার নিজেরই যে বুকের ভেতরটা ব্যথায় টনটন করে উঠছে! . . . এ কি লক্ষ্মীছাড়া জীবন হল? এতটুকু স্বস্তি নেই। অরণ্যে রোদন করাই সার! . . .'

'আজ রাতে যদি না ফেরে তাহলে কাল জেলা-সদরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানব।' আক্সিনিয়া এমন নিস্পৃহ গলায় কথাগুলো বলল যেন ব্যাপারটা নেহাৎই মামুলী, ও নিয়ে বিচলিত হওয়ার এতটুকু কারণ নেই।

আক্সিনিয়ার এই নিশ্চিন্ত ভাব দেখে দুনিয়াশ্‌কা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এখন বোঝাই যাচ্ছে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। এখানে এসেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছে!'

'আহা, এখনও সে রকম দশার মতো কিছু দেখছি না। কান্নাকাটি থামাও দেখি, নইলে ছেলেমেয়েরা ভড়কে [illegible] আচ্ছা চলি।'

* * *

গ্রিগোরি বাড়ি ফিরল সন্ধ্যার পর। খানিকক্ষণ বাড়িতে কাটিয়ে আক্সিনিয়ার কাছে গেল।

সারাটা দিন উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়ে গ্রিগোরির দেখা পাওয়ার পর আনন্দ যেন অনেকটাই মাঠে মারা যায়। সন্ধ্যার দিকে আক্সিনিয়ার মনে হতে থাকে যেন সারা দিন একটানা কাজ করেছে, মুহূর্তের জন্যও পিঠ সোজা করতে পারে নি। অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। কিন্তু বাইরে জানলার কাছে পায়ের শব্দ কানে আসতেই সে একটা বাচ্চামেয়ের মতো তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল।

গ্রিগোরিকে জড়িয়ে ধরে তার গ্রেটকোটের বোতাম খুলতে খুলতে সে জিজ্ঞেস করল, 'ভিওশেনস্কায়াতে যে যাবে সে কথা বল নি কেন?'

'বলার ফুরসৎ পাই নি, তাড়া ছিল।'

'এদিকে আমি আর দুনিয়াশ্‌কা কেঁদেকেটে অস্থির। ভাবলাম বুঝি আর ফিরবেই না।'

সংযত হাসি হাসে গ্রিগোরি।

'না, সে অবধি গড়ায় নি।' একটু চুপ থেকে পরে যোগ করল, 'এখনও গড়ায় নি।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ও টেবিলের কাছে এসে বসল। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে শোবার ঘর। এক কোনায় চওড়া কাঠের পালঙ্ক, তোরঙ্গ, তার ডালার ওপরে তামার বাঁধানো কোণগুলো আবছা জ্বলজ্বল করছে। ছোকরা বয়সে স্তেপানের অনুপস্থিতিতে যখন সে এখানে আসত তখন যে রকম দেখেছে এখনও এখানে সব ঠিক সেই রকমই আছে। পরিবর্তন বলতে প্রায় কিছুই নজরে পড়ছে না ওর। যেন সময় এই বাড়ির ভেতরে একবারও উঁকি না মেরে স্রেফ পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। এমনকি গন্ধও রয়ে গেছে সেই আগের। সেই টাটকা হপ লতার কেমন যেন একটা গাঁজলা ধরা কটুমতন গন্ধ, পরিষ্কার নিকানো মেঝে আর ঝরে পড়া থাইমের প্রায় অনুভব না করার মতো অতি মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে। মনে হয় যেন শেষ বার গ্রিগোরি মাত্র কয়েক দিন আগে খুব ভোরে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। অথচ আসলে কত কাল না কেটে গেছে এর মধ্যে! . . .

দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে গ্রিগোরি ধীরেসুস্থে সিগারেট পাকাতে শুরু করে। কিন্তু কেন যেন ওর হাত কেঁপে ওঠে, হাঁটুর ওপর তামাক ছড়িয়ে পড়ে।

আক্সিনিয়া তাড়াতাড়ি করে টেবিল সাজায়। ঠাণ্ডা সেমাই গরম করতে হয়। চালাঘরে ছুটল কাঠের চিলতে আনতে। এর মধ্যেই হাঁপাতে থাকে, মুখটাও

সামান্য ফেকাসে হয়ে ওঠে। কাঠ এনে উনুনে আঁচ ধরানোর তোড়জোড় করে। জ্বলন্ত কাঠকয়লায় ফুঁ দিতে আগুনের ফুলকি উড়ে উড়ে পড়ে। এরই মধ্যে সে একেকবার ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখে গ্রিগোরিকে - কোলকুঁজো হয়ে চুপচাপ বসে বসে সিগারেট ফুঁকে চলছে।

'ওখানে তোমার কাজকম্ম কত দূর? সব স্যরলে ত?'

'সব ভালোয়-ভালোয় সারা গেছে।'

'দুনিয়াশ্‌কার যে কোথা থেকে মাথায় ঢুকেছিল যে তোমাকে নির্ঘাত ওরা ধরে রেখে দেবে! তাই শুনে আমিও ভয়ে মরি আর কি!'

গ্রিগোরি চোখ কোঁচকায়। বিরক্ত হয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

'মিখাইলটা ওর কান ভারী করেছে। যত রাজ্যের উদ্ভট চিন্তা করে আমার আরও বিপদ ডেকে আনছে।'

আক্সিনিয়া টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো। গ্রিগোরি ওর হাত ধরল।

চোখ তুলে আক্সিনিয়ার চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে গ্রিগোরি বলল, 'তবে কি জানো, আমার ব্যাপার তেমন একটা আহা-মরিও নয়। পলিটব্যুরোতে যাবার সময় আমার নিজেরও মনে হয়েছিল ওখান থেকে আর বেরোতে পারব না। হাজার হোক, বিদ্রোহের সময় আমি একটা ডিভিশনের কম্যাণ্ডার ছিলাম, লেফ্‌টেনাণ্টের পদে ছিলাম।. . . ওরকম কাউকেই ওরা ছেড়ে কথা কইছে না।'

'কিন্তু ওরা তোমায় কী বলল?'

'একটা ফর্ম দিল ভরতি করতে। একটা কাগজ আর কি, যাতে কোথায় কী চাকরি করেছি তার পুরো ফিরিস্তি দিতে হয়। কিন্তু লেখার ব্যাপারে আমি তেমন দড় নই। জীবনে কখনও এত লেখা লিখতে হয় নি। ঘণ্টা দুয়েক বসে বসে সমস্ত কাজের পুরো বিস্তান্ত দিলাম। তারপর ঘরে ঢুকল আরও দু'জন। বারবার খালি বিদ্রোহের কথা নিয়ে জিজ্ঞেসবাদ করল। লোকদুটো মন্দ নয়, বেশ ভদ্রই। যে লোকটা বয়সে বড় সে জিগ্‌গেস করল, 'চা খাবেন? তবে চিনি নেই, স্যাকারিন দিয়ে খেতে হবে।' আমি মনে মনে ভাবি কিসের চা? এখান থেকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারলে চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।' একটু চুপ ক'রে থেকে গ্রিগোরি যেন অন্য কারও সম্পর্কে মন্তব্য করছে এই ভাবে বলল, 'যখন দাম চুকানোর সময় এলো তখন দুর্বলতা বেরিয়ে পড়ল। সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

ভিওশেন্‌স্কায়াতে ও যে ভয় পেয়ে গিয়েছিল এবং যে বিভীষিকা ওকে পেয়ে বসেছিল তাকে জয় করার মতো যথেষ্ট মনোবল তার ছিল না বলে নিজের ওপর তার ভীষণ রাগ হতে লাগল। বিরক্তিটা আরও দ্বিগুণ হয়ে ওঠে সেই

আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হতে। যা ঘটে গেছে সে সব এখন নেহাৎই হাস্যকর আর লজ্জাকর বলে মনে হয়। সারাটা রাস্তা সে এই কথা ভাবতে ভাবতে আসছিল। হয়ত সেই কারণেই এখন নিজেকে উপহাস ক'রে আর নিজের তখনকার উপলব্ধিকে খানিকটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়েও আক্সিনিয়াকে সব কথা খুলে বলল।

আক্সিনিয়া মন দিয়ে ওর কথাগুলো শুনল। তারপর আস্তে ক'রে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উনুনের কাছে গেল। আঁচ উসকে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'এর পর কী হবে?'

'এক হপ্তা বাদে আবার যেতে হবে রিপোর্ট করতে।'

'তোমার কি মনে হয় শেষ পর্যন্ত ওরা তোমাকে ধরে আটক করবে?'

'দেখে শুনে ত তাই মনে হয়। আজ হোক কাল হোক ধরবে।'

'তাহলে কী উপায়? এ ভাবে কেমন ক'রে আমরা জীবন কাটাব গ্রিশা?'

'জানি না। যাক গে, এ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। হাতমুখ ধোবার একটু জল দেবে কি?'

ওরা দু'জনে খেতে বসল। আবার আক্সিনিয়ার ফিরে আসে সেই পূর্ণমাত্রায় সুখের উপলব্ধি যা তার সকালে জেগেছিল। গ্রিগোরি এখানে, ওর পাশেই আছে। বাইরের লোকজনের নজরে পড়ে যাবার আশঙ্কা না ক'রে প্রাণ ভরে ওকে দেখা যায়। কোন কিছু গোপন না ক'রে, এতটুকু দ্বিধা না ক'রে চোখের ভাষায় সবই বলা যায়। ভগবান! কী উতলাই না সে হয়ে পড়েছিল ওর জন্য! গ্রিশার বিশাল বুক হাতদুটোর জন্য কী অধীর আগ্রহে, ব্যাকুল হয়ে ছিল তার দেহ! আক্সিনিয়া খাবার প্রায় ছুঁল না। টেবিলের সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে সে দেখতে থাকে গ্রিগোরির গোগ্রাসে খাওয়া। ওর দু'চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে আদরের দৃষ্টি বুলায় গ্রিগোরির মুখে, ওর আঁটসাঁট ফৌজী জামার খাড়া কলারে আঁটা রোদে পোড়া তামাটে গলায়, ওর চওড়া কাঁধে, টেবিলে শ্লথ ভঙ্গিতে পড়ে থাকা দুই হাতে। . . . গ্রিগোরির গা থেকে ঝাঁঝাল পুরুষালী ঘাম আর তামাকের মেশানো গন্ধ ভেসে আসছে। আক্সিনিয়া প্রাণ ভরে নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেয় সে গন্ধ। এ গন্ধ তার বড় চেনা, বড় আপনার, একমাত্র গ্রিগোরির, একান্তই তার নিজ। তার চোখ বেঁধে দিলেও একমাত্র এই গন্ধের জন্যই হাজার হাজার পুরুষের মাঝখান থেকে সে গ্রিগোরিকে ঠিক চিনে বার করতে পারবে। . . . গাঢ় রক্তিম হয়ে ওঠে আক্সিনিয়ার গালদুটো, ঘন ঘন ধড়াস ধড়াস করতে থাকে বুকের ভেতরটা। আজকের সন্ধ্যায় বাড়ির কর্ত্রী হিশেবে আপ্যায়নের দিকে মনোযোগ সে দিতে পারছে না, কারণ গ্রিগোরিকে ছাড়া

চারপাশে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। গ্রিগোরিও মনোযোগ দাবি করল না। নিজে রুটি কেটে নিল, এদিক ওদিক নজর ঘুরিয়ে শেষ কালে উনুনের ধার থেকে নুনদানি খুঁজে বার করেছে, নিজেই দ্বিতীয় আরেক বাটি সেমাইয়ের ঝোল ঢেলে নিয়েছে।

'খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে,' অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে সে হেসে বলল। 'সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি।'

একমাত্র তখনই আক্সিনিয়ার মনে পড়ে গেল তার কর্তব্যের কথা। ধড়মড় করে সে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল।

'এঃ মাথাটা দেখছি আমার একেবারেই গেছে! পুলিপিঠে আর সরা পিঠেগুলোর কথা যে একদম ভুলে বসে আছি। আমার মাথা খাও, আরেকটু মুরগী খাও! খাও, ওগো ভালো ক'রে খাও! এক্ষুনি আমি সব নিয়ে আসছি।'

কতক্ষণ সময় নিয়ে, কত মন দিয়ে যে গ্রিগোরি খেল! যেন সপ্তাহখানেক ওর পেটে কোন খাওয়া পড়ে নি। খাবার নিয়ে ওকে সাধাসাধি করার এতটুকু দরকার ছিল না। আক্সিনিয়া ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারে না। ওর পাশে বসে পড়ে বাঁ হাতে ওর মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিল, ডান হাতে ছুঁচের কাজ করা একটা পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে নিজেই প্রণয়ীর তৈলাক্ত ঠোঁট আর থুতনি মুছে দিল। অন্ধকারের মধ্যে আক্সিনিয়ার চোখে যেন কমলা রঙের আলোর ফুলকি ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিঃশ্বাস চেপে রেখে চোখ বুজে ওর ঠোঁটের ওপর সজোরে চেপে ধরল নিজের ঠোঁট।

আসলে মানুষের সুখের জন্য যা দরকার হয় তা অতি সামান্যই। মোট কথা, সেই সন্ধ্যায় আক্সিনিয়া সুখের মুখ দেখতে পেয়েছিল।

নয়

কশেভয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হওয়াটাই গ্রিগোরির পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল। প্রথম দিন থেকেই স্থির হয়ে গিয়েছিল তাদের সম্পর্ক। কথাবার্তা বলার আর কিছু ছিল না, বলে কোন লাভও নেই। সম্ভবত মিখাইলও খুশী হয় না গ্রিগোরিকে দেখে। দু'জন ঘরামি লাগাল সে। তারা চটপট ওর বাড়ি মেরামত করতে লেগে গেল। চালের আড়াগুলো প্রায় পচে গিয়েছিল। সেগুলো তারা বদল করল। একটা দেয়াল একপাশে কাত হয়ে পড়েছিল, সেটাকে তুলে ফেলে নতুন ক'রে দেয়াল দিল। নতুন চৌকাঠ, দরজা, জানলা বসাতে হল।

ভিওশেনস্কায়া থেকে ফিরে আসার পর গ্রিগোরি গ্রামের বিপ্লবী কমিটির অফিসে গিয়েছিল। সামরিক দপ্তরের সইসাবুদ করা কাগজপত্র কশেভয়কে দেখিয়ে

কোন কথা না বলে বিদায় না নিয়ে সোজা বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। নিজের কিছু জিনিসপত্র, সেই সঙ্গে ছেলেপুলেদের নিয়ে সে উঠে এলো আক্সিনিয়ার কাছে। গ্রিগোরি নতুন জায়গায় উঠে যেতে তাকে বিদায় দেওয়ার সময় দুনিয়াশ্‌কা কেঁদে ফেলল।

'দোহাই দাদামণি, আমার ওপর রাগ করবেন না। আমার কোন অপরাধ নেই,' মিনতিভরে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল।

'রাগ করতে যাব কেন রে দুনিয়া? না না, কী যে বলিস!' গ্রিগোরি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে। 'মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাস। . . . তোর আপনার জন বলতে ত একমাত্র আমিই আছি। তোর ওপর আমার সব সময় মায়া ছিল, এখনও আছে। . . . তবে তোর স্বামী – সে অন্য ব্যাপার। তোর আমার যে মধুর সম্পর্ক সেটা নষ্ট হতে দিচ্ছি না।'

'রাগ করবেন না, বাড়ি আমরা শিগ্‌গিরই ছেড়ে দিচ্ছি!'

'আরে না!' গ্রিগোরি বিরক্তি প্রকাশ করে। 'দরকার হয় বসন্তকাল অবধি থাক না কেন বাড়িতে। তোদের জন্যে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আর আক্সিনিয়ার এখানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার থাকার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে।'

'ওকে বিয়ে করবে দাদা?'

'সে সময় পরে পাওয়া যাবে,' ভাসা ভাসা জবাব দেয় গ্রিগোরি।

'ওকে তুমি বিয়ে কর দাদা। মেয়েটা ভালো,' দুনিয়াশ্‌কা জোর দিয়ে বলল। 'আমাদের মা বলে গিয়েছিলেন বৌ ক'রে ঘরে তুলতে হলে ওকেই যেন তোলে। শেষের দিকে ওর ওপর মা'র একটা টান এসে গিয়েছিল। মরার আগে আগে প্রায়ই ওর কাছে যেতেন।'

'তুই যেন আমাকে রাজী করানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিস!' গ্রিগোরি হাসে। 'ওকে ছাড়া আর কাকেই বা বিয়ে করব? বুড়ি আন্দ্রোনিখাকে নাকি অ্যাঁ?'

আন্দ্রোনিখা তাতারস্কির সবচেয়ে থুথুড়ে বুড়ি। বয়স তার একশ' পেরিয়ে গেছে অনেককাল আগে। বুড়ির মাজাপড়া ছোটখাটো চেহারাটা মনে পড়তে খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে দুনিয়াশ্‌কা।

'কী যে বল তুমি দাদা! আমি অমনি জিগ্‌গেস করলাম তোমাকে। তুমি এ ব্যাপারে চুপ করে থাক - তাই না জিগ্‌গেস করছিলাম।'

'বিয়েতে আর যাকে ডাকি আর না ডাকি, তুই বাদ পড়বি না।' গ্রিগোরি ঠাট্টা ক'রে বোনের কাঁধে চাপড় মারল। হালকা মনে বেরিয়ে গেল পৈতৃক ভিটা ছেড়ে।

সত্যি কথা বলতে গেলে কি কোথায় থাকল তা নিয়ে গ্রিগোরির কোন মাথাব্যথা ছিল না। শান্তিতে থাকতে পারলেই হল। কিন্তু সেই শান্তির সন্ধানই

ও সে পাচ্ছে না। . . . কয়েকটা দিন নিষ্কর্মার মতো কাটানোর পর হাঁপিয়ে উঠল সে। আক্সিনিয়ার ঘরবাড়ির জন্য এটা ওটা বানানোর চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল কিছুই করার ক্ষমতা তার নেই। কোন কাজে মন লাগে না। একটা অসহ্য উড়ু উড়ু ভাব ওকে পীড়া দিতে থাকে, সংসারযাত্রার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যে চিন্তাটা এক মুহূর্তের জন্যও তার মাথা থেকে যায় না তা হল এই যে ওকে গ্রেপ্তার করতে পারে, জেলে পুরতে পারে – তাও কপাল নেহাৎ ভালো থাকলে – নয়ত গুলি করে মারতেও পারে।

অনেক সময় রাতে ঘুম ভেঙে যেতে আক্সিনিয়া দেখতে পায় গ্রিগোরি ঘুমুচ্ছে না। সাধারণত সে মাথার পেছনে হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকে ছায়াঘন অন্ধকারের দিকে চেয়ে। হিমকঠিন দৃষ্টিতে ক্রোধ ঝরে পড়ছে। আক্সিনিয়া জানে ও কী ভাবছে। কিন্তু ওকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা তার নেই। গ্রিগোরিকে কষ্ট পেতে দেখে এবং ওদের একসঙ্গে ঘর বেঁধে থাকার আশা ভরসা যে আবার মিলিয়ে যেতে চলেছে তাই ভেবে আক্সিনিয়া নিজেও কষ্ট পায়। কিছু প্রশ্ন করে না সে। যা সমাধান করার ও নিজেই করুক। শুধু একবার রাতের বেলায় ঘুম ভেঙে যেতে পাশে সিগারেটের লালচে আগুন দেখতে পেয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'গ্রিশা, তুমি একদম ঘুমোও না। এই সময় কিছুদিনের জন্যে গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়াই হয়ত তোমার পক্ষে ভালো ছিল? নাকি আমরা একসঙ্গে কোথাও চলে গিয়ে গা ঢাকা দেবো?'

আক্সিনিয়ার পায়ের ওপর সযত্নে কম্বলটা চাপা দিয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রিগোরি উত্তর দিল, 'ভেবে দেখি। তুমি ঘুমোও।'

'তারপর এখানে সব শান্ত হয়ে গেলে না হয় ফিরে আসতাম, অ্যাঁ?'

এবারেও ওর জবাব হয় ভাসা-ভাসা গোছের, যেন কোন সিদ্ধান্তেই ও আসতে পারে নি।

'দেখা যাবে, পরে অবস্থা কী দাঁড়ায়। ঘুমোও আক্সিনিয়া লক্ষ্মীটি।' সাবধানে, আদর করে ওর রেশমের মতো মোলায়েম, স্নিগ্ধ কাঁধে ঠোঁট ছোঁয়ায় গ্রিগোরি।

আসলে কিন্তু ইতিমধ্যে সে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে ফেলেছে। ভিওশেনস্কায়াতে সে আর যাবে না। পলিটব্যুরোর সেই যে লোকটির সঙ্গে গতবার দপ্তরে ওর কথা হয়েছিল, বৃথাই সে বসে থাকবে ওর অপেক্ষায়। লোকটা সেদিন গ্রেটকোট কাঁধে ফেলে টেবিলের ধারে বসে গ্রিগোরির মুখ থেকে বিদ্রোহের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে মটমট শব্দে শরীরের আড় ভাঙছিল, মাঝে মাঝে হাই তোলার ভান করছিল। আর কোন কথা তাকে শুনতে হচ্ছে না। যা বলার বলা হয়ে গেছে।

এরপর পলিটব্যুরোতে যে দিন ওর রিপোর্ট করতে যাওয়ার কথা, সেদিন

গ্রিগোরি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে – দরকার হলে দীর্ঘকালের জন্য। কোথায় যাবে তা নিজেই এখনও জানে না। কিন্তু যাবে বলে দৃঢ়সঙ্কল্প ক'রে ফেলেছে সে। মরার বা জেলখানায় ঢোকার কোন ইচ্ছে ওর নেই। পথ সে ঠিক ক'রে নিয়েছে। কিন্তু সেটা আগে থেকে আক্সিনিয়াকে জানাতে চায় না। আক্সিনিয়ার সাধের শেষ কয়েকটা দিন বিষিয়ে দিয়ে কী লাভ? অমনিতেই ত সে দিনগুলো তেমন সুখের নয়। ও কথা একেবারে শেষ দিন জানালেই চলবে – গ্রিগোরি মনে মনে ঠিক করল। আপাতত ও ঘুমোক, শান্তিতে ঘুমোক গ্রিগোরির বগলের তলায় মুখ গুঁজে। সেই রাতগুলোতে আক্সিনিয়া প্রায়ই বলত, 'তোমার ডানার নীচে ঘুমোতে কী ভালোই না লাগে আমার!' থাক, এখনকার মতো ঘুমিয়ে থাক। আর ক'টা দিনই বা গ্রিগোরির বুকের কাছ ঘেঁসে থাকতে পারবে বেচারি! . . .

সকালে গ্রিগোরি বাচ্চাদের নিয়ে মেতে থাকে। তারপর উদ্দেশ্যহীন ভাবে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। লোকজনের মাঝখানে বেশ স্বস্তি লাগে।

একবার পলটনের অল্পবয়সী সাথীদের সঙ্গে নিকিতা মেল্‌নিকভের বাড়িতে মদের আড্ডা জমানোর প্রস্তাব দিয়েছিল প্রোখর। গ্রিগোরি সরাসরি 'না' ক'রে দিল। গ্রামের লোকজনের কথাবার্তা থেকে সে জানতে পেরেছে যে খাদ্যসংগ্রহের সরকারী নীতি নিয়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ আছে। মদের আসরে সে প্রসঙ্গ নির্ঘাত উঠবে। নিজের ওপর সন্দেহ ডেকে আনার সাধ তার ছিল না। এমন কি চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও রাজনীতির আলোচনা এড়িয়ে চলে। অনেক রাজনীতি হয়েছে। এর জন্য কম ঝামেলা পোহাতে হয়েছে নাকি তাকে!

ওর এই সাবধানতা মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। তার কারণ বাড়তি ফসল সরকারী ভাণ্ডারে খুব একটা ভালো জমা পড়ছিল না, আর এরই ফলে তিনজন বুড়োকে জামিন হিশেবে ধরে খাদ্যসংগ্রহ অভিযান বাহিনীর দু'জন পাহারাদার সঙ্গে দিয়ে ভিওশেনস্কায়াতে পাঠানো হয়েছে।

পর দিন সাধারণ ক্রেতা সমবায় সমিতির দোকানের কাছে রেড আর্মির এক কালের গোলন্দাজ জাখার ক্রামস্কোভের সঙ্গে গ্রিগোরির দেখা হয়ে গেল। সবে সে ফিরেছে ফৌজ থেকে। মদে চুর হয়ে টলে টলে হাঁটছিল। কিন্তু গ্রিগোরির কাছাকাছি আসতেই কাদামাখা কোর্তার সবগুলো বোতাম পটপট ক'রে লাগিয়ে ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'নমস্কার গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ!'

'নমস্কার,' গোলন্দাজের ইয়া চওড়া হাতের থাবা ধরে ঝাঁকুনি দিল গ্রিগোরি। বিশাল শালগাছের মতোই গাঁটাগোট্টা শক্ত সমর্থ লোকটা।

'চিনতে পারলে?'

'পারব না কেন?'

'মনে আছে গত বছর বকোভ্স্কায়ার কাছে আমাদের গোলন্দাজদল কেমন বাঁচিয়ে দিয়েছিল তোমাকে? আমরা না থাকলে তোমার ঘোড়সওয়ারদলের অবস্থা ঘোরাল হয়ে দাঁড়াত। কত লাল সেপাইয়ের লাশ আমরা তখন ফেলেছি - উঃ! একবার অমনি কামানের গোলা, তারপর শ্রাপনেল। প্রথম কামানের নিশানদার ছিলাম আমি! এই শর্মা!' চওড়া বুকের ছাতিতে দুমদুম করে কিল মেরে জাখার বলল।

গ্রিগোরি আড়চোখে এদিক ওদিক তাকাল। খানিকটা দূরে কয়েকজন কসাক দাঁড়িয়ে ছিল, ওদের দিকে তাকাচ্ছিল। ওদের কথাবার্তাও মন দিয়ে শুনছিল। গ্রিগোরির ঠোঁটের কোনা কেঁপে উঠল। রাগে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠতে সাদা ঝকঝকে ঘন দাঁতের সারি বেরিয়ে এলো।

দাঁতে দাঁত চেপেই চাপা গলায় গ্রিগোরি বলল, 'তুমি মাতাল। যাও বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে নেশা কাটাও। বাড়তি বোকো না।'

'না, আমি মাতাল নই!' গাঁক গাঁক করে চেঁচায় নেশাগ্রস্ত গোলন্দাজ। 'হয়ত বা মাতাল হয়েছি - কিন্তু হয়েছি বড় দুঃখে! বাড়ি ফিরলাম। ফিরে কী দেখলাম? কী বাপ্পোতের জীবন! কসাকদের জীবন বলে কিছু নেই, কসাকও নেই আর! বারো মনের খাজনা চাপিয়ে দিয়েছে আমার ওপর - কী বলবে বল? যারা আমাদের ওপর খাজনা চাপিয়েছে তারা বুনেছে নাকি? ফসল কিসে হয় ওদের জানা আছে নাকি?'

জবাফুলের মতো লাল টকটকে চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর হঠাৎ একটু টলে উঠে তার মুখের ওপর চোলাই মদের চুঁয়া ঢেকুর তোলা কড়া গন্ধ ছাড়ে।

'তুমি দু'পাশে লাল ডোরা দেওয়া পাতলুন ছেড়ে চাষাভুষোদের পোশাক ধরেছ যে বড়? চাষীদের দলে নাম লিখিয়েছ বুঝি? না ছাড়ছি না। মানিক আমার, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। ফের লড়াই করতে হবে। সেই যে গত বছর যেমন লড়েছিলাম আমরা। কমিউন মুর্দাবাদ! সোভিয়েত সরকার জিন্দাবাদ!'

গ্রিগোরি ঝটকা মেরে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বাড়ি চলে যা, মাতাল শুয়োর কোথাকার! কী বলছিস সে খেয়াল আছে?'

ক্রামস্কোভ তার তামাকের ছোপধরা হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় ক'রে বলল, 'যদি উলটো পালটা কিছু বলে থাকি মাপ কোরো। দয়া করে ক্ষমাঘেন্না ক'রে দিও। কিন্তু আমি তোমাকে আমার কম্যাণ্ডার ভেবেই সত্যি কথা বলছি। . . . তুমি আমাদের কম্যাণ্ডার . . . আমাদের মা-বাপ, তাই তোমাকেই বলছি, আমাদের ফের লড়তে হবে!'

গ্রিগোরি নীরবে ফিরে চলল। চত্বর পেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। সন্ধ্যা

পর্যন্ত এই অদ্ভুত সাক্ষাৎকার তার মনে দাগ কেটে বসে থাকে। ক্রামস্কোভের মাতাল চিৎকার, কসাকদের সমবেদনাপূর্ণ নীরবতা আর হাসি মনে পড়তে সে মনে মনে ভাবল, 'না, চটপট সরে পড়া দরকার। ভালো কিছু হওয়ার কোন লক্ষণ দেখছি না। . . .'

ভিওশেন্স্কায়া যাওয়ার কথা ছিল শনিবার দিন। তিন দিন পরে ওকে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু ঘটনা হয়ে দাঁড়াল অন্য রকম। বৃহস্পতিবার রাত্রে গ্রিগোরি শোবার আয়োজন করছে এমন সময় দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ হল। আক্সিনিয়া বারান্দায় বেরিয়ে এলো। গ্রিগোরি শুনতে পেল আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করছে, 'কে ওখানে?' উত্তরটা সে শুনতে পেল না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে উদ্বেগ বোধ করতে বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে এলো। বারান্দায় দরজায় ঝনাৎ করে শেকল খোলার আওয়াজ হল। দুনিয়াশ্‌কা ভেতরে ঢুকল। গ্রিগোরি দেখতে পেল ওর পাণ্ডুর মুখ। কোন কথা জিজ্ঞেস না করেই বেঞ্চি থেকে টুপি আর গ্রেটকোটখানা তুলে নিল।

'দাদা . . .'

'কী ব্যাপার?' কোটের আস্তিনের ভেতরে হাত গলাতে গলাতে মৃদুস্বরে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়াশ্‌কা হাঁপাতে হাঁপাতে তড়বড়িয়ে বলল, 'দাদা গো, এক্ষুনি চলে যাও। জেলা-সদর থেকে চারজন ঘোড়সওয়ার আমাদের বাড়িতে এসেছে। বড় ঘরটাতে বসে আছে। . . . ওরা ফিসফিস ক'রে কথা বলছিল, কিন্তু আমি শুনেছি। . . . দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সব শুনতে পেয়েছি। . . . মিখাইল বলছিল, তোমাকে ধরা উচিত। তোমার নামে বলাবলি করছে। . . . পালাও!'

গ্রিগোরি চট করে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে গাঢ় চুমু দিল ওর গালে।

'ভালো থাক রে বোনটি! চলে যা, নইলে ওদের হয়ত খেয়াল হবে যে তুই বাড়ি নেই। চলি।' আক্সিনিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'একটু রুটি দাও! জলদি! আরে পুরোটা দরকার নেই, খানিকটা হলেই হবে।'

শেষ হল ওর স্বল্পকালের শান্তির জীবন। . . . ও কাজ করতে লাগল যেন লড়াইয়ের ময়দানে – চটপট, কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। শোবার ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের সন্তর্পণে চুমু খেল, আক্সিনিয়াকে চুমু খেল।

'এবারে চলি। শিগ্‌গিরই খবর পাঠাব। প্রোখর বলবে। ছেলেমেয়েদের দেখো। দরজা বন্ধ করে দাও। জিগ্‌গেস করলে বোলো ভিওশেন্স্কায়ায় চলে গেছে। চলি আক্সিনিয়া, সোনা আমার, দুঃখু কোরো না।' ওকে চুমু খেতে গিয়ে চোখের জলের নোনতা স্বাদ টের পায় গ্রিগোরি।

আক্সিনিয়ার অসহায় অসংলগ্ন বিলাপ শোনার অথবা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো সময় গ্রিগোরির ছিল না। আস্তে করে আক্সিনিয়ার বাহুর আলিঙ্গন ছাড়িয়ে নিয়ে সে বারান্দায় পা বাড়াল। একবার কান পেতে শোনার পর ঝট ক'রে বাইরের দরজা খুলে ফেলল। দন থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখে ঝাপটা মারল। চোখ বুজে ফেলে অন্ধকারের মধ্যে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করল।

আক্সিনিয়া প্রথমে শুনতে পেল গ্রিগোরির পায়ের চাপে বরফ ভাঙার মচমচ শব্দ। প্রতিটি পদক্ষেপ বুকে কঠিন হয়ে বাজে। পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, মট করে বেড়ার আওয়াজ হল। পরে চারদিকে সুনসান। শুধু দনের ওপারে বনে বাতাসের মর্মর। বাতাসের সেই শব্দ ভেদ করে আক্সিনিয়া কিছু শোনার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই শুনতে পায় না। শীত শীত করতে থাকে। রান্নাঘরে গিয়ে নিভিয়ে দেয় বাতিটা।

দশ

১৯২০ সালের হেমন্তকালে খাদ্যসংগ্রহের নীতি প্রয়োগ ক'রে ফসল আদায়ের কাজ সুবিধাজনক না হওয়ায় সরকার যখন খাদ্যসংগ্রহ অভিযানের বাহিনী গড়ে তুলল তখন কসাক জনসাধারণের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। দন-প্রদেশের উজানের জেলাগুলোতে – শুমিলিনস্কায়া, কাজানস্কায়া, মিগুলিন-স্কায়া, মেশকোভস্কায়া, ভিওশেনস্কায়া, ইয়েলানস্কায়া, স্লাশ্চেভস্কায়া এবং আরও নানা জায়গায় দেখা দিল ছোট ছোট সশস্ত্র দল। খাদ্যসংগ্রহ অভিযানের বাহিনী গড়ে তোলার বিরুদ্ধে, খাদ্যসংগ্রহ নীতি জোরদার করে তোলার জন্য সোভিয়েত সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তারই বিরুদ্ধে এ ছিল কসাক সম্প্রদায়ের স্বচ্ছল ও জোতদার অংশের পাল্টা জবাব।

একেক দলে পাঁচ থেকে বিশজন করে রাইফেলধারী। বেশির ভাগই গড়া হয়েছে স্থানীয় কসাকদের নিয়ে, যারা এক সময় ছিল সক্রিয় শ্বেতরক্ষী। তাদের মধ্যে আছে এমন সমস্ত লোক যারা আঠারো-উনিশ সালে পিটুনি বাহিনীতে ছিল, অথবা এক কালের দন ফৌজের নিম্নপদস্থ অফিসারমণ্ডলীর সার্জেন্ট, সার্জেন্ট-মেজর বা জুনিয়র কর্পেট, যারা সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ফৌজ সমাবেশের সময় ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছিল। এদের সঙ্গে জুটেছে বিদ্রোহীরা, যারা গত বছর দনের উজান এলাকায় বিদ্রোহের সময় লড়াইয়ে কৃতিত্ব দেখিয়ে বা বন্দী লাল ফৌজীদের গুলি ক'রে মেরে নাম কিনেছিল। মোট কথা এরা সেই লোক যারা

সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে এক পথের পথিক নয়।

তারা গ্রামে গ্রামে খাদ্যসংগ্রহ অভিযান বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়, গাড়ি ক'রে আড়তে জমা দেওয়ার জন্য শস্য নিয়ে যেতে দেখলে ফেরত পাঠিয়ে দেয়, সোভিয়েত সরকারের অনুগত পার্টিবহির্ভূত কসাক আর কমিউনিস্টদের ধরে ধরে খুন করে।

এই সব ডাকাতদল উচ্ছেদের ভার পড়েছিল দনের উজান এলাকার গ্যারিসন ব্যাটেলিয়নের ওপর। ব্যাটেলিয়ন ভিওশেনস্কায়া জেলা-সদরে আর বাজকি গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছিল। কিন্তু দলগুলো দন প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকায় তাদের ধ্বংস করার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হতে থাকে। প্রথম কারণ, স্থানীয় লোকদের সহানুভূতি আছে তাদের ওপর। তারা ওদের খাদ্যদ্রব্য জোগায়, লাল ফৌজের ইউনিটগুলোর চলাচলের খবরাখবর দেয়, এমনকি লাল ফৌজ পিছু নিলে তাদের লুকিয়ে রেখে দেয়। দ্বিতীয়ত, ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার কাপারিন। লোকটা জারের আর্মির প্রাক্তন জুনিয়র ক্যাপ্টেন, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলভুক্ত। সম্প্রতি দনের উজান এলাকায় গড়ে ওঠা প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোকে ধ্বংস করার এতটুকু ইচ্ছে তার নেই, এ ব্যাপারে সে বরং নানা বাগড়াই দিতে থাকে। শুধু মাঝে মধ্যে, তাও পার্টির আঞ্চলিক কমিটির সভাপতির চাপে পড়ে, ছোটখাটো চড়াও অভিযান চালায়, তারপর আবার ফিরে আসে ভিওশেনস্কায়ায় - এই অজুহাত দেখায় যে বাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে ভিওশেনস্কায়া আর তার আশেপাশের এলাকার অফিসকাছারি আর গুদামগুলো একেবারে অরক্ষিত হয়ে পড়বে, সেগুলো এ অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই শ' চারেক বেয়নেটধারী সৈন্যের সঙ্গে চৌদ্দটি মেশিনগান নিয়ে তৈরি এই ব্যাটেলিয়নটি ঘাঁটি আগলানোর কাজ করে। বাহিনীর লাল ফৌজীরা বন্দীদের পাহারা দেয়, জল তোলে, জঙ্গলের গাছ কাটে। এ ছাড়া সামাজিক শ্রমদানের যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে সেই অনুযায়ী তারা কালি তৈরির জন্য ওক গাছের ফল কুড়োয়। এলাকার অসংখ্য আঞ্চলিক দপ্তর আর সমস্ত অফিস-কাছারিকে ব্যাটেলিয়ন বেশ ভালোমতো জ্বালানি কাঠ আর কালি সরবরাহ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রদেশে ছোটখাটো ডাকাতে দলের সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে চলেছে তা রীতিমতো আশঙ্কাজনক। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে যখন ভরোনেজ প্রদেশের বোগুচার জেলায় উজানী দনের লাগোয়া এলাকা জুড়ে বড় রকমের বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, একমাত্র তখনই নেহাৎ অনিচ্ছাভরে গাছ কাটা, তক্তা বানানো আর কালির জন্য ওকফল কুড়ানো বন্ধ রাখতে হল। দন প্রদেশ বাহিনীর সেনাপতির হুকুমে তিনটি কম্পানি আর একটা মেশিনগান দল দিয়ে বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্যাটেলিয়ন পাঠানো হল। একটা

পাহারাদার স্কোয়াড্রন, বারো নম্বর খাদ্য সরবরাহ রেজিমেন্টের এক নম্বর ব্যাটেলিয়ন আর দুটো ছোট ছোট প্রতিরোধ বাহিনীও তাদের সঙ্গে গেল।

সুখোই দনেৎস গ্রামে ঢোকার মুখে এক লড়াইয়ে ইয়াকভ ফোমিনের পরিচালনায় ভিওশেনস্কায়া-স্কোয়াড্রন বিদ্রোহীদের সারিগুলোকে পাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে ছাতু করে দিল। ওদের পিছু ধাওয়া ক'রে প্রায় একশ' সত্তর জনকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলল। নিজেদের মাত্র তিনজন সৈন্য খোয়া গেল। সামান্য কয়েকজন বাদে স্কোয়াড্রনের প্রায় সকলেই কসাক – দনের উজান এলাকার লোক। এখানেও তারা প্রাচীন কসাক প্রথা বজায় রাখল। স্কোয়াড্রনের দু'জন কমিউনিস্টের আপত্তি সত্ত্বেও লড়াইয়ের পর প্রায় অর্ধেক সৈন্য নিজেদের পুরনো ওভারকোট আর তুলোঠাসা গরম জ্যাকেট বদলে কাটা পড়া বিদ্রোহীদের গা থেকে পশুলোমের ভালো ভালো খাটো ওভারকোট খুলে নিয়ে পরল।

বিদ্রোহ দমন করার কয়েক দিন পরে স্কোয়াড্রনকে ডেকে পাঠানো হল কান্তানস্কায়া জেলা-সদরে। সামরিক জীবনের ভার থেকে মুক্ত হয়ে ফোমিন এখানে যত দূর পারা যায় আমোদ আহ্লাদ করে অবসর সময় কাটাতে লাগল। ফোমিন লোকটা ফুর্তিবাজ, শিশুকে আড্ডাবাজ স্বভাবের, মেয়েবাজীতেও ওস্তাদ। দিনে রাতে তার টিকিটি দেখা যায় না। আস্তানায় সে ফেরে ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে। সৈন্যদের সঙ্গে ওর খুব দহরম-মহরম। সন্ধ্যাবেলায় ওরা তাদের কম্যাণ্ডারকে ঝকঝকে পালিশ করা বুটজুতো পরে রাস্তায় বেরোতে দেখলে বুঝদারের ভঙ্গিতে চোখ টেপাটেপি ক'রে বলে, 'আমাদের নাগরটি চললেন স্বামী সঙ্গ ছাড়া সেপাই বৌদের সঙ্গে পরকীয়া লীলাখেলা করতে! ভোরের আগে ফেরার কোন আশা নেই।'

স্কোয়াড্রনের চেনাশোনা কসাকদের কারও কাছে চোলাই মদ জমেছে আর মদের আসরের আয়োজন হচ্ছে খবর পেলেই হল, ফোমিন সঙ্গে সঙ্গে তাদের আস্তানায় গিয়ে হাজির। স্কোয়াড্রনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও কমিসারের কাছে অবশ্য ব্যাপারটা গোপন থাকত। এরকম প্রায়ই ঘটে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে দেখা গেল বেপরোয়া কম্যাণ্ডারটি মুষড়ে পড়েছে। সে এখন মুখ গোমড়া ক'রে থাকে। এই কিছুদিন আগেও যেরকম আমোদস্ফূর্তি করত তা যেন প্রায় ভুলতে বসেছে। সন্ধ্যা হলে এখন আর আগের মতো উৎসাহ নিয়ে [illegible] হাইবুটজোড়া পালিশ করে না। রোজ দাড়িও কামায় না। [illegible] পাড়াপড়শী যে সমস্ত সেপাই আছে [illegible] বসে, মদও খায়, কিন্তু কথাবার্তা খুব একটা বেশি বলে না।

ফোমিনের স্বভাবের এই পরিবর্তন ঘটেছে ভিওশেনস্কায়া থেকে [illegible] খবরটি সে পেয়েছে তারই সঙ্গে সঙ্গে। [illegible] জরুরী কমিশনের [illegible]

বাহিনীর কম্যাণ্ডারকে জানিয়েছে যে পাশের উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎস্কায়া জেলার মিখাইলভ্‌-কায় গ্যারিসন-ব্যাটেলিয়ন তাদের কম্যাণ্ডার ভাকুলিনের পরিচালনায় বিদ্রোহ করেছে।

ভাকুলিন ছিল ফোমিনের বন্ধু। পলটনের সাথীও বটে। কোন এক সময় একসঙ্গে তারা ছিল মিরোনভের কোর্-এ। সারানস্ক থেকে দনে একসঙ্গে মার্চ ক'রে গেছে। বুদিওন্নিও ঘোড়সওয়ার দল যখন মিরোনভের বিদ্রোহী দলকে ঘিরে ফেলে তখন একসঙ্গে আত্মসমর্পণ ক'রে একই স্তূপে জমা দেয় তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র। ফোমিন আর ভাকুলিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। এই সেদিনও, সেপ্টেম্বরের গোড়ায়, ভিওশেনস্কায়ায় এসেছিল ভাকুলিন। এমনকি তখনও, 'কমিসাররা মাতব্বরি খাটিয়ে খাদ্যশস্য আদায় করে চাষীদের সর্বস্বান্ত ক'রে দিচ্ছে আর দেশটার বারোটা বাজাচ্ছে' – এই বলে দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে সে তার পুরনো বন্ধুর কাছে নালিশ করেছিল। ভাকুলিনের কথাগুলোতে মনে মনে সায় থাকলেও ফোমিন সাবধানে, ধূর্তামি করে পাশ কাটিয়ে যায়। নিজের সহজাত বুদ্ধির অভাবটুকু সে অনেক সময়ই ধূর্তামি দিয়ে পুষিয়ে নেয়। অমনিতেই সে খুব সাবধানী লোক। কখনও তাড়াহুড়ো করে না, হ্যাঁ বা না কোনটাই চট ক'রে বলে না। কিন্তু ভাকুলিনের ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে এই সংবাদ পাওয়ার কিছুকাল পরেই তার বরাবরের সাবধানতা যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে ছেড়ে চলে গেল। একদিন সন্ধ্যায় ওদের স্কোয়াড্রন ভিওশেনস্কায়া যাত্রার আগে আগে ট্রুপ-কম্যাণ্ডার আলফেরভের আস্তানায় সকলে জড় হয়েছে। ঘোড়ার দানাপানি দেওয়ার বিশাল এক বালতি ভরতি চোলাই মদ এসেছে। খেতে খেতে উত্তেজিত কথাবার্তা চলতে লাগল। মদের আসরে ফোমিনও উপস্থিত। সে চুপচাপ মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল, বালতি থেকে মদ তুলে গেলাস ভরে নীরবে খেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সৈন্যদের মধ্যে একজন যখন সুখোই দনেৎসে কী ভাবে তারা আক্রমণ করেছিল সে প্রসঙ্গ তুলল, তখন ফোমিন চিন্তিত ভাবে গোঁফে তা দিতে দিতে লোকটার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ঝেঁটিনগুলোকে আমরা বেশ ভালোই সাবাড় করেছি ভাই, কিন্তু দেখো শিগ্‌গির যেন আমাদের নিজেদের আবার হা হুতোশ করতে না হয়।... ভিওশেনস্কায়া ফিরে গিয়ে যদি দেখি খাবার যোগাড়ের দল আমাদের সকলের বাড়ি থেকে সব ফসল ঝেড়ে পুঁছে নিয়ে গেছে তখন কী হবে? কাজানস্কায়ার লোকেরা ওদের ওপর দারুণ খাপ্পা হয়ে আছে। গোলা থেকে শেষ দানাটি অবধি ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে।...'

ঘরের ভেতরে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। ফোমিন সকলের দিকে তাকাল। জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল, 'একটু তামাসা করছিলাম আর কি।... দেখো এই নিয়ে আবার বাইরে বেফাঁস কিছু বলে বোসো না। তাহলে তামাসাই যে

কোথায় গিয়ে গড়াতে পারে কোন্ শয়তান জানে?'

ভিওশেন্স্কায়ায় ফিরে এসে ফোমিন লাল ফৌজীদের আধখানা ট্রুপ সঙ্গে নিয়ে রুবেজনি গ্রামে নিজের দেশের বাড়ির দিকে রওনা দিল। গ্রামে উপস্থিত হওয়ার পর বাড়ির উঠোনে না ঢুকে ফটকের কাছে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ঘোড়ার মুখের লাগাম একজন লাল ফৌজীর হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

বৌয়ের দিকে নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে মাথাটা ঝাঁকাল, অনেকখানি ঝুঁকে বুড়ি মাকে ভক্তি জানাল, ছেলেমেয়েদের আদর ক'রে জড়িয়ে ধরল।

জলচৌকির ওপর বসে দু'হাঁটুর মাঝখানে তলোয়ারটা খাড়া ক'রে রেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কোথায় গেল?'

'আটাকলে গেছে,' বুড়ি উত্তর দিল। কড়া সুরে হুকুম দিল, 'ওরে মেলেচ্ছ, মাথার টুপিটা ত খুলবি! বিগ্রহের কুলুঙ্গির তলায় টুপি মাথায় দিয়ে কেউ বসে নাকি? ওরে ইয়াকভ, তোর ভালো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। . . .'

ফোমিন জোর ক'রে হেসে পশুলোমের ঘের দেওয়া চামড়ার টুপিটা খুলল। কিন্তু বাইরের জামাকাপড় খোলার কোন লক্ষণ তার দেখা গেল না।

'জামাকাপড় খুলছিস না যে?'

'মিনিট কয়েকের জন্যে বাড়িতে ছুটে এসেছি তোমাদের দেখব বলে। কাজকর্মের মাঝখানে ফাঁকই পাই নে। . . .'

'তোর কাজকর্মের কথা আমাদের জানতে বাকি নেই. . .' ছেলের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন আর ভিওশেন্স্কায়ায় মেয়েঘটিত তার যাবতীয় কীর্তিকাণ্ডের ইঙ্গিত দিয়ে কঠিন স্বরে বুড়ি বলল।

এ সম্পর্কে গুজব অনেক আগেই ছড়িয়েছে রুবেজনিতে।

অকালে বুড়িয়ে গেছে ফোমিনের স্ত্রী। ফেকাসে চেহারা, দেখলেই মনে হয় বড় অবহেলিত। সভয়ে শাশুড়ীর দিকে তাকায় সে, উনুনের কাছে সরে যায়। যে ভাবেই হোক স্বামীকে তুষ্ট করতে হয়, তার মন যোগাতে হয়। অন্ততপক্ষে স্বামী যদি একবার একটু সোহাগের দৃষ্টিতে তাকায় তাতেই সে বর্তে যায়। তাই উনুনের তলা থেকে একটা ন্যাতা বার ক'রে হাঁটু গেড়ে বসে ঘাড় গুঁজে ফোমিনের পায়ের বুটজোড়ায় লেগে থাকা চাপচাপ কাদা চেঁছে তুলতে থাকে।

'কী সুন্দর তোমার জুতোজোড়া গো! . . . ইস, কী অবস্থা করেছ কাদা লাগিয়ে! . . . আমি এখুনি পরিষ্কার ক'রে দেব, ঘসে ঝকঝকে ক'রে দেব!' প্রায় অস্ফুটস্বরে ফিসফিসিয়ে বলতে থাকে সে। মাথা তোলে না, স্বামীর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকে হাঁটু ঘসটে ঘসটে।

ফোমিন অনেক দিন তার বৌয়ের সঙ্গে থাকা ছেড়ে দিয়েছে। যাকে সে যৌবনে কোন এক সময় ভালোবেসেছিল, অনেক দিন হল সেই স্ত্রীলোকটির ওপর তার আর কোন অনুভূতিই নেই অবজ্ঞামিশ্রিত সামান্য একটু করুণা ছাড়া। কিন্তু ফোমিনের বৌ তাকে বরাবরই ভালোবাসে। একদিন আবার ওর কাছে ফিরে আসবে মনে মনে এই গোপন আশা পোষণ ক'রে তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছে। বহু বছর হল সে খেতখামার দেখাশোনা করছে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করছে, খাপছাড়া স্বভাবের শাশুড়ীর মন বুঝে চলার চেষ্টা করেছে। খেতের কাজের সমস্ত বোঝা বইতে হয় ওর ওই রোগা কাঁধদুটিতে। হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে আর দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর সেই যে রোগ তাকে ধরল তাতে যত দিন যাচ্ছে ততই ওর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। রোগা হয়ে গেছে। মুখে এতটুকু লাবণ্য নেই। অকাল বার্ধক্য এসে সারা গালে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম বলিরেখা ছড়িয়ে দিয়েছে। চোখে ফুটে উঠেছে একটা ভয়কাতর করুণ ভাব যা বুদ্ধিমান বুগণ জন্তুর চোখে সচরাচর দেখা যায়। ওর নিজের খেয়াল নেই কত তাড়াতাড়ি ও বুড়িয়ে যাচ্ছে, ওর স্বাস্থ্য দিনের পর দিন কেমন ভেঙে পড়ছে। তবু কিসের একটা আশায় যেন বুক বেঁধে আছে। কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়ে গেলে ভীরু ভালোবাসা বুকে নিয়ে প্রাণ ভরে দেখে তার সুপুরুষ স্বামীটিকে।

ফোমিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কী শোচনীয় ভাবে বেঁকে আছে ওর স্ত্রীর পিঠটা, জামার তলা থেকে ফুটে বেরোচ্ছে কাঁধের পেছনের তীক্ষ্ণ হাড়জোড়া। বড় বড় হাতদুটো কাঁপছে, সযত্নে তার জুতোর কাদা চেঁছে তোলার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভাবে: 'আহা মরি মরি! এই শাকচুন্নিটির সঙ্গে নাকি আমি কোন এক সময় শুতাম!... অবিশ্যি বেজায় বুড়িয়ে গেছে, এটাও ঠিক!... ওঃ কি বুড়িয়েই না গেছে!'

'হয়েছে, আর নয়! আবার ত সেই কাদাতেই মাখামাখি হবে!' বৌয়ের হাত থেকে জুতোজোড়া ছাড়িয়ে নিতে নিতে বিরক্তির সঙ্গে সে বলল।

অনেক চেষ্টায় পিঠ সোজা করে উঠে দাঁড়াল ফোমিনের বৌ। তার পাণ্ডুর মুখে ফুটে ওঠে সামান্য রক্তিমাভা। স্বামীর দিকে সজল চোখে যে ভাবে তাকাল তার মধ্যে এত ভালোবাসা আর কুকুরের মতো প্রভুভক্তি প্রকাশ পেতে থাকে যে ফোমিন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মাকে জিজ্ঞেস করে, 'তারপর তোমরা আছ কেমন?'

'আছি এই যেমন ছিলাম,' গোমড়ামুখে বুড়ি জবাব দেয়।

'গাঁয়ে ফসল আদায় করার দল এসেছিল?'

'হ্যাঁ, এই ত কাল চলে গেল ভাটির ক্রিভ্স্কায়াতে।'

'আমাদের কাছ থেকে ফসল নিয়েছে?'

'নিয়েছে। কতটা নিয়েছে রে দাভিদ্‌কা?'

বাপেরই মতো দেখতে চৌদ্দ বছরের ছেলেটা। ওই রকমই নীল চোখ, দু'চোখের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক। উত্তরে সে বলল, 'দাদু ছিল ওখানে, দাদুই জানে। মনে হয় দশ বস্তা।'

'এই কথা!' ফোমিন উঠে দাঁড়াল। ছেলের দিকে এক পলক তাকিয়ে তলোয়ারের বেল্‌টটা ঠিক করে নিল। মুখটা তার একটু ফেকাসে হয়ে গেল যখন জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা ওদের বলেছিলে কার ফসল নিচ্ছে ওরা?'

বুড়ি হতাশ ভাবে হাত নাড়ল। খানিকটা যেন হিংস্র উল্লাসই ফুটে ওঠে তার মুখের হাসিতে।

'ওরা তোমাকে থোড়াই পেরোয়া করে। ওদের ওপরওয়ালা লোকটা বলল: 'কোন বাছাবাছির ব্যাপার নেই - বাড়তি ফসল আমরা নেব।' এই বলে আমাদের গোলা তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে শুরু করল।'

'আচ্ছা মা, আমি ওদের দেখে নেব! দেখে নেব ওদের!' চাপা গলায় এই কথা বলে তাড়াহুড়ো করে বাড়ির লোকজনের কাছ থেকে বিদায় নেয় ফোমিন।

বাড়ি থেকে ফেরার পর ফোমিন সাবধানে বাজিয়ে দেখতে লাগল তার স্কোয়াড্রনের সেপাইদের মতিগতি ঠিক কী রকম। বিশেষ চেষ্টা করতে হল না। অচিরেই এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল যে বেশির ভাগ লোকই সরকারী খাদ্য সংগ্রহ নীতিতে বিক্ষুব্ধ। নানা জেলা আর গ্রাম থেকে ওদের বৌরা, নিকট ও দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন ওদের কাছে আসে। তাদের মুখে শোনা যায় খাদ্যসংগ্রহ বাহিনীর লোকেরা বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে তল্লাশ চালাচ্ছে। শুধু বীজশস্য আর পরিবারের খাবারের জন্য শস্য ছেড়ে দিয়ে বাকি সব নিয়ে যাচ্ছে। ফলে অবস্থা দাঁড়াল এই যে জানুয়ারীর শেষে বাজ্‌কিতে গ্যারিসনের যে সভা হল সেখানে এলাকার মিলিটারী কমিশনার শাখায়েভের বক্তৃতার সময় স্কোয়াড্রনের লোকেরা সরাসরি প্রতিবাদ শুরু ক'রে দিল। সৈন্যদের সারির ভেতর থেকে শুরু হল নানা কণ্ঠের চিৎকার চেঁচামেচি।

'ফসল আদায়ের বাহিনী উঠিয়ে নাও!'

'ফসল কাড়া চলবে না!'

'ফুড কমিশনার মুর্দাবাদ!'

জবাবে পাহারাদার কম্পানির লাল ফৌজীরাও চেঁচায়।

'বিপ্লবের শত্রু!'

'হারামজাদাদের দল ভেঙে দাও!'

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে সভা চলল। গ্যারিসনে যে স্বল্পসংখ্যক

কয়েকজন কমিউনিস্ট ছিল তাদের একজন উত্তেজিত হয়ে ফোমিনকে বলল, 'তোমার কিছু বলা দরকার কমরেড ফোমিন! তোমার স্কোয়াড্রনের লোকেরা কী খেল দেখাচ্ছে দ্যাখ!'

ফোমিন গোঁফের তলায় চোরা হাসি হাসে।

'আমি যে পার্টির বাইরের লোক। ওরা কি আমার কথা শুনবে?'

বক্তৃতা সে দিল না। সভা শেষ হওয়ার বেশ খানিকটা আগেই ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার কাপারিনের সঙ্গে সে বেরিয়ে গেল। ভিওশেনস্কায়াতে যাবার পথে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে আলোচনা হল। খুব তাড়াতাড়ি ওরা নিজেদের মধ্যে মতের মিল খুঁজে পেল। এক সপ্তাহ পরে ফোমিনের আস্তানায় এক নিভৃত আলোচনার সময় কাপারিন তাকে বলল, 'আমাদের নামতে হলে এখনই নামতে হয়, নইলে আর কখনও নামা যাবে না – আমার এই সাফ কথা জেনে রেখো ইয়াকভ ইয়েফিমভিচ! এই হল মোক্ষম সময়। এর সদ্ব্যবহার করা দরকার। কসাকরা আমাদের সমর্থন করবে। এলাকায় তোমার প্রভাব প্রতিপত্তি বিরাট। সাধারণ লোকজনের মনের যা অবস্থা – এর চেয়ে ভালো আর ধারণাই করা যায় না। তুমি চুপ করে আছ কেন? যা করবার ঠিক করে ফেল!'

'ঠিক করার আর কী আছে এখানে?' ভুরুর তলা থেকে দৃষ্টি হেনে ধীরে ধীরে টেনে টেনে ফোমিন বলে। 'সব ত ঠিক হয়েই আছে। শুধু প্ল্যানটা এমন তৈরি করা চাই যাতে ভালোয় ভালোয় ওত্‌রায়, কোথাও এতটুকু খুঁত না থাকে। এসো, এখন সেই নিয়েই আলোচনা করা যাক।'

কাপারিনের সঙ্গে ফোমিনের সন্দেহজনক বন্ধুত্ব কিন্তু লোকের নজর এড়াল না। ব্যাটেলিয়নের কয়েকজন কমিউনিস্ট ওদের চোখে চোখে রাখতে লাগল। দন জরুরী কমিশনের পলিটব্যুরোর প্রধান আর্তেমিয়েভ আর আঞ্চলিক মিলিটারী কমিশনার শাখায়েভকে তারা তাদের সন্দেহের কথা জানাল।

আর্তেমিয়েভ হেসে বলল, 'ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। আরে কাপারিন হল ভীতু লোক। কোন কিছু করার মতো হিম্মত আছে নাকি তার? ফোমিনের ওপর অবশ্য নজর রাখব আমরা। ওকে অনেক কাল হল লক্ষ ক'রে আসছি। তবে কিনা, কোন অ্যাকশনে নামার সাহস ফোমিনের হবে বলে আমার ত অন্তত মনে হয় না। ওসব তোমাদের বাজে কথা,' জোর দিয়ে সে প্রকাশ করল তার সিদ্ধান্ত।

কিন্তু নজর রাখার পক্ষে দেরিই হয়ে গিয়েছিল তত দিনে। ষড়যন্ত্রকারীরা এর মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে ফেলেছে নিজেদের মধ্যে। বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার কথা বারোই মার্চ সকাল আটটার সময়। ঠিক করা হয়েছিল ফোমিন ওই দিন

তার স্কোয়াড্রনকে পুরোদস্তুর অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে সকালের কুচকাওয়াজে নামাবে। তারপর জেলা-সদরের উপকণ্ঠে যে মেশিনগান প্লেটুন বসানো আছে তার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে মেশিনগান দখল করে ফেলবে। পরে প্রাদেশিক দপ্তরগুলোকে 'সাফ' করার কাজে গ্যারিসন মদত দেবে।

ব্যাটেলিয়ন তাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে কিনা সে বিষয়ে কাপারিনের সন্দেহ ছিল। ওর সেই সন্দেহের কথা একবার সে ফোমিনকে জানিয়েও ছিল। ফোমিন মন দিয়ে সব কথা শুনে বলল, 'মেশিনগানগুলো দখল করতে পারলেই হল, তারপর তোমার ওই ব্যাটেলিয়ন কাবু করতে আর কতক্ষণ?'

ফোমিন আর কাপারিনের ওপর কড়া নজর রেখেও কোন ফল পাওয়া গেল না। ওদের দেখাসাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ। তাও আবার নেহাৎই কাজের ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারীর শেষে একদিন রাতে একটা টহলদার দল রাস্তায় ওদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে পায়। ফোমিন তার জিন-আঁটা ঘোড়াটাকে মুখের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে হাঁটছে, কাপারিন চলেছে তার পাশে পাশে। টহলদারের হাঁক শুনে কাপারিন জবাব দেয়: 'বন্ধু!' ওরা দু'জনে কাপারিনের আস্তানায় গিয়ে ঢোকে। ঘোড়াটা ফোমিন বারান্দার কাছে রেলিঙে বেঁধে রাখে। ঘরের ভেতরে আলো ওরা জ্বালায় নি। ভোর তিনটের পরে ফোমিন সেখান থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে নিজের ডেরায় ফিরে আসে। এর বেশি আর কিছু বার করা যায় নি।

আঞ্চলিক মিলিটারী কমিশনার শাখায়েভ দন প্রদেশের সর্বাধিনায়কের কাছে পাঠানো এক সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম মারফত ফোমিন ও কাপারিন সম্পর্কে সন্দেহের কথা জানাল। কয়েক দিন বাদে সর্বাধিনায়কের যে জবাব এলো তাতে ফোমিন আর কাপারিনকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে গ্রেপ্তার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পার্টির জেলা কমিটির ব্যুরোর এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ফোমিনকে জানানো হবে যে আঞ্চলিক সামরিক কমিসারিয়েটের হুকুমে তাকে নোভোচের্কাসস্কে সর্বাধিনায়কের হেফাজতে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সে যেন স্কোয়াড্রনের ভার তার সহকারী ওভ্‌চিন্নিকভের হাতে তুলে দেয়। সেই দিনই কাজান্‌স্কায়ায় কিছু দলের আবির্ভাব ঘটেছে এই অজুহাতে স্কোয়াড্রনকে সেখানে পাঠানো হবে এবং এরপর রাতে ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার করা হবে। জেলা-সদর থেকে স্কোয়াড্রনকে সরানোর সিদ্ধান্ত হল এই আশঙ্কায় পাছে ফোমিনের গ্রেপ্তারের খবর শুনে তারা বিদ্রোহ ক'রে বসে। গ্যারিসন ব্যাটেলিয়নের দু'নম্বর কম্পানির কম্যাণ্ডার তৃকাচেঙ্কো নামে একজন কমিউনিস্ট। তার ওপর ভার দেওয়া হল ব্যাটেলিয়নের কমিউনিস্ট আর কম্পানি-কম্যাণ্ডারদের যেন বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে আগে থাকতে সাবধান করে দেয় এবং জেলা-সদরে অবস্থানকারী কম্পানি আর মেশিনগান

প্রেটুনকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে রাখে।

পর দিন সকালে ফোমিন হুকুমনামা পেল।

'বেশ, স্কোয়াড্রনের ভার নাও তাহলে ওভ্‌চিন্নিকভ। আমি নোভোচের্কাসস্ক যাচ্ছি,' শান্ত ভাবে সে বলল। 'হিসাব-টিসাবগুলো দেখে নেবে নাকি?'

ট্রুপ কম্যাণ্ডার ওভ্‌চিন্নিকভ পার্টির লোক নয়। তাকে আগে থাকতে কেউ সতর্ক ক'রে দেয় নি। তাই কোন রকম সন্দেহ তার মনে জাগল না। সঙ্গে সঙ্গে সে ডুবে গেল কাগজপত্রের মধ্যে।

ফোমিন এই ফাঁকে একটা চিরকুট লিখল কাপারিনকে। 'আজই কাজে নেমে পড়তে হবে। আমাকে সরিয়ে দিচ্ছে। তৈরি হও।' বারান্দায় এসে চিরকুটটা তার আর্দালির হাতে দিয়ে চুপিচুপি বলল, 'চিরকুটটা মুখের ভেতরে পুরে রাখ। ঘোড়াটাকে পায়ে পায়ে চালিয়ে নিয়ে যাবি – পায়ে পায়ে চালিয়ে চলে যাবি কাপারিনের কাছে – বুঝলি? পথে যদি কেউ আটকায় তাহলে গিলে ফেলবি চিরকুটখানা। ওকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসিস এখানে।'

কাজানস্কায়া জেলা-সদরের দিকে যাওয়ার নির্দেশ পেয়ে ওভ্‌চিন্নিকভ অভিযানের প্রস্তুতি হিশেবে স্কোয়াড্রনের সৈন্যদের গির্জার চকে এনে সার বেঁধে দাঁড় করাল। ফোমিন ঘোড়ায় চড়ে ওভ্‌চিন্নিকভের কাছে এসে বলল, 'স্কোয়াড্রনের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি?'

'অবশ্যই। তবে একটু সংক্ষেপে সার দয়া করে। আমাদের দেরি করিয়ে দিও না।'

ঘোড়াটা ছটফট করছিল। লাগাম টেনে তাকে সামলাতে সামলাতে স্কোয়াড্রনের সামনে দাঁড় করিয়ে ফোমিন সৈন্যদের উদ্দেশে বলল, 'কমরেডরা, তোমরা আমাকে ভালো করেই জান। জান কিসের জন্যে আমি এতকাল লড়াই করে এসেছি। কিন্তু এখন কসাকদের ওপর যে রকম লুটতরাজ চলছে সেটা কোন মতেই মেনে নিতে পারছি না। লুটতরাজ চলছে যারা চাষবাস করে ফসল ফলাচ্ছে তাদের সকলের ওপর। আর সেটা আমি মেনে নিতে পারছি না বলেই আমাকে সরানো হচ্ছে। আমাকে নিয়ে ওরা কী করবে তা আমি জানি। এই কারণে তোমাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে চাই। . . .'

মুহূর্তের জন্য চিৎকার চেঁচামেচি, হৈ হট্টগোলে ফোমিনের বক্তৃতায় বাধা পড়ল। রেকাবে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে গলার স্বর উঁচুতে তুলে সে বলল, 'লুটতরাজের হাত থেকে যদি রেহাই পেতে চাও তাহলে খাদ্য আদায়ের দলগুলোকে ভাগাও, মুর্জোভের মতো যত ফুড কমিশনার আর শাখায়েভের মতো যত মিলিটারী কমিশনারদের ধরে ধরে ঠ্যাঙাও! ওরা আমাদের এখানে, দনে এসেছে . . .'

গোলমালের মধ্যে ফোমিনের শেষ কথাগুলো ডুবে গেল। মোক্ষম সময় বুঝে

এবারে সে গলা চড়িয়ে ফৌজী হুকুম দিল, 'তিনজন তিনজন ক'রে ডাইনে . . . ডাইনে মোড়। মার্চ!'

স্কোয়াড্রনের সেপাইরা সুরসুর ক'রে হুকুম তামিল করল। ঘটনার এই গতি দেখে ওভ্‌চিন্নিকভের চক্ষু চড়কগাছ। ঘোড়া ছুটিয়ে ফোমিনের কাছে এসে বলল, 'কোথায় চললেন কমরেড ফোমিন?'

মাথা না ঘুরিয়েই ফোমিন কৌতুকভরে জবাব দিল, 'এই গির্জার চারধারে একটু পাক খেয়ে আসি। . . .'

একমাত্র তখনই এই কয়েক মিনিটের সমস্ত ঘটনা ওভ্‌চিন্নিকভ উপলব্ধি করতে পারল। সারি থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলো সে। রাজনৈতিক সংগঠক, এসিস্টেন্ট কমিশনার এবং মাত্র একজন লাল ফৌজী তাকে অনুসরণ করল। ওরা যখন দু'শ' পা মতন এগিয়ে গেছে তখন ফোমিনের নজরে পড়ল যে ওরা নেই। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে হাঁক দিল, 'ওভ্‌চিন্নিকভ, থাম বলছি! . . .'

চারজন ঘোড়সওয়ার এতক্ষণ হাল্কা চালে চলছিল। এবারে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জোর কদমে। তাদের ঘোড়ার খুরের তলা থেকে চারধারে ছিটকে পড়তে লাগল ডেলা ডেলা গলা বরফ। ফোমিন হুকুম দিল, 'হাতিয়ার ধরে লড়াইয়ে নামো। ওভ্‌চিন্নিকভকে পাকড়াও! . . . এক নম্বর ট্রুপ! ধাওয়া কর!'

এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা যায়। এক নম্বর ট্রুপ থেকে জনা ষোল সেপাই দুরন্ত বেগে পিছু ধাওয়া করে। ইতিমধ্যে ফোমিন স্কোয়াড্রনের বাকি সেপাইদের দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। তিন নম্বর ট্রুপের কম্যাণ্ডার চুমাকোভের পরিচালনায় একটা দলকে সে পাঠিয়ে দিল মেশিনগান প্লেটুনকে নিরস্ত্র করার কাজে আর বাকি দলটাকে সে নিজে চালিয়ে নিয়ে গেল গ্যারিসন কম্পানির আস্তানার দিকে। জেলা-সদরের উত্তরের উপকণ্ঠে এক কালে যেখানে জেলার ঘোড়া লালন পালন ও বংশবৃদ্ধির জন্য আস্তাবল ছিল সেখানে ছিল গ্যারিসনের ঘাঁটি।

প্রথম দলটা শূন্যে গুলি ছুঁড়ে আর তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে সদর রাস্তা ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। পথে চারজন কমিউনিস্টের দেখা পেতে তাদের কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলল। এর পর বিদ্রোহীরা তাড়াতাড়ি জেলা-সদরের প্রান্তে এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেশিনগান-প্লেটুনের লাল ফৌজীরা আস্তানা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে কোন সাড়াশব্দ না তুলে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর।

যে বাড়িটাতে মেশিনগান-প্লেটুন আস্তানা নিয়েছিল সেটা ছিল বসতির একটু বাইরে। জেলা-সদরের শেষ বাড়ি থেকে তার দূরত্ব শ' দুয়েক গজের বেশি হবে না। সরাসরি লক্ষ্যে মেশিনগানের গুলি ছুটে আসতে বিদ্রোহীরা চট করে উলটো

দিকে ঘুরিয়ে দিল ঘোড়ার মুখ। ওদের মধ্যে তিনজন কাছাকাছি গলির ভেতরে সরে পড়ার আগেই গুলি খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। অতর্কিত আক্রমণে মেশিনগানারদের ধরার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা দ্বিতীয়বার আর চেষ্টা চালাল না। তিন নম্বর ট্রুপের কম্যাণ্ডার চুমাকোভ তার দলটাকে আড়ালে সরিয়ে নিল। ঘোড়া থেকে না নেমে পাকা গাঁথনি তোলা একটা চালাঘরের আড়াল থেকে সন্তর্পণে উঁকি মেরে গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল।

'আরেও দুটো ম্যাক্সিমগান বার করে এনেছে দেখছি।' মাথার লোমশ টুপি দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে সেপাইদের দিকে ফিরে বলল, 'চলো হে, ফিরে যাই! . . . ফোমিন নিজে এসেই ওদের ধরুক গে। আমাদের ক'জন পড়ে রইল বরফের ওপরে - তিনজন? বোঝ তাহলে। না বাপু, নিজে এসেই চেষ্টা ক'রে দেখুক।'

জেলা-সদরের পুব দিকের উপকণ্ঠে যেই গুলিগোলা চলতে শুরু হল অমনি কম্পানির কম্যাণ্ডার ত্কাচেঙ্কো ছুটে বেরিয়ে এলো আস্তানা থেকে। ব্যারাকের দিকে ছুটতে ছুটতেই জামাকাপড় পরতে থাকে। ততক্ষণে জনা তিরিশেক লাল ফৌজী ব্যারাকের কাছে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সকলে হকচকিয়ে গিয়ে কম্পানি-কম্যাণ্ডারকে প্রশ্নবাণে অস্থির ক'রে তুলল।

'কারা গুলি ছুড়ছে?'

'কী ব্যাপার?'

কোন জবাব না দিয়ে, ব্যারাক থেকে যে লাল ফৌজীরা ছুটে এসেছিল, ত্কাচেঙ্কো চুপচাপ তাদেরও দাঁড় করিয়ে দিল সারিতে। জেলা প্রশাসন দপ্তরের কর্মীরা - জনা কয়েক কমিউনিস্টও প্রায় ওরই সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাকের কাছে ছুটে এসেছিল। তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল সারিতে।

জেলা-সদরের এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে রাইফেলের গুলির ছর্‌রা চলছে। পশ্চিমের উপকণ্ঠে কোথায় যেন দুম্ করে ফেটে পড়ল একটা হাতবোমা।

পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ারের একটা দল খোলা তলোয়ার হাতে ব্যারাকের দিকে ছুটে আসছে দেখে ত্কাচেঙ্কো ধীরেসুস্থে খাপ থেকে নাগান রিভলভারটা বার করল। হুকুম দেওয়ার কোন অবকাশ সে পেল না। সারির মধ্যে তৎক্ষণাৎ কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। লাল ফৌজীরা রাইফেল বাগিয়ে ধরল।

'আরে এরা যে আমাদের লোক! তাকিয়ে দেখ, ওই ত আমাদের ব্যাটেলিয়ন-কম্যাণ্ডার কমরেড কাপারিন।' একজন লাল ফৌজী চেঁচিয়ে উঠল।

ঘোড়সওয়াররা রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ যেন হুকুম পেয়ে একসঙ্গে তাদের ঘোড়াগুলোর ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে ব্যারাক লক্ষ্য করে ছুটল।

'থামাও ওদের!' কর্কশ স্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে তুকাচেস্কো।

ওর গলার আওয়াজ ডুবিয়ে দিয়ে গুড়ুম শব্দে এক ঝাঁক গুলি ছুটল। লাল ফৌজীদের ঘনবদ্ধ সারির হাত পঞ্চাশেক দূরে চারজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার পিঠ থেকে উলটে পড়ে গেল। বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে উলটো দিকে ফিরে চলল। তাদের পেছন পেছন তাড়া করে চলল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। একজন ঘোড়সওয়ার – দেখেই বোঝা যায়, সামান্য জখম হয়েছে – জিন থেকে পড়তে পড়তে লাগামটা হাতে ধরে রেখেছে। ঘোড়াটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ওই অবস্থায় তাকে গজ বিশেক হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল। তারপর লোকটা এক লাফে খাড়া হয়ে উঠে একটা রেকাব আর জিনের পেছনের কাঠামোটা খপ করে চেপে ধরল, চোখের পলকে আবার উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। লাগামে ঝটকা টান মেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে কাছের গলিটার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক নম্বর ট্রুপের ঘোড়সওয়াররা ওভ্‌চিন্নিকভের পিছু ধাওয়া ক'রে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে জেলা-সদরে ফিরে এলো। কমিশনার শাখায়েভের তল্লাশ করেও কোন সুবিধা হল না। সামরিক কমিসারিয়েটের দপ্তর খালি। সেখানে ত তাকে পাওয়া গেলই না, আস্তানায়ও তার সন্ধান মিলল না। গুলিগোলার আওয়াজ শুনেই সে দনের দিকে ছুটে গিয়েছিল। জমা বরফের ওপর দিয়ে ছুটে ওপারের বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল। সেখান থেকে বাজ্‌কি গ্রামে। পরের দিন সে গিয়ে হাজির হল ভিওশেন্‌স্কায়া থেকে ষোল-সতেরো ক্রোশ দূরে উস্ত্‌-খোপিওরস্কায়া জেলা-সদরে।

ওপরওয়ালা কর্মীদের বেশির ভাগই সময়মতো গা ঢাকা দিতে পেরেছিল। তাদের খোঁজার চেষ্টা করাও একেবারে নিরাপদ নয়, কারণ মেশিনগান-প্লেটুনের লাল ফৌজীরা হালকা মেশিনগান নিয়ে জেলা-সদরের একেবারে মাঝামাঝি জায়গায় এসে গেছে, প্রধান চত্বরের লাগোয়া সবগুলো রাস্তাই তাদের গুলির আওতার মধ্যে।

বিদ্রোহী ঘোড়সওয়াররা খোঁজাখুঁজি ছেড়ে দিল। দনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পড়িমরি ক'রে ঘোড়া ছুটাল গির্জাবাড়ির চত্বরটার দিকে, যেখান থেকে তারা ওভ্‌চিন্নিকভের পিছু ধাওয়া শুরু করেছিল। দেখতে দেখতে ফোমিনের দলের বাকি সকলেও সেখানে এসে জুটল। আবার তারা সার বেঁধে দাঁড়াল। ফোমিন ওদের ঘাঁটি গেড়ে পাহারার ব্যবস্থা করার হুকুম দিল। বাকি সেপাইদের তাদের আস্তানায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেও ঘোড়াগুলোকে কিন্তু জিন চাপিয়েই রেখে দিতে বলল।

ফোমিন আর কাপারিন, সেই সঙ্গে ট্রুপ-কম্যাণ্ডাররাও উপকণ্ঠের একটা ছোট বাড়ির ভেতরে ঢুকে গোপনে সলাপরামর্শ শুরু করে দিল।

'খেল খতম!' অসহায় ভাবে ধপ্ করে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে হতাশকণ্ঠে কাপারিন বলল।

'হ্যাঁ জেলা-সদর যখন দখল করতে পারলাম না তখন এখানে টিকে থাকা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে,' ফোমিন মিনমিন ক'রে বলল।

চুমাকোভ প্রস্তাব দিল, 'ইয়াকভ ইয়েফিমভিচ, আমাদের উচিত প্রদেশের চারদিক ঘোরা। এখন আর ডরানোর কী আছে? মরণ যখন কপালে লেখা আছে তখনই মরব – তার আগে ত আর মরব না। কসাকদের জাগিয়ে তুলতে হবে। তাহলে জেলা-সদরও আমাদের হাতে এসে যাবে।'

ফোমিন কোন কথা না বলে তার দিকে তাকাল। কাপারিনের দিকে ফিরে বলল, 'হুজুর মুষড়ে পড়লেন নাকি? ওসব নাকি কান্না কি আর এখন শোভা পায়? হুঁ হুঁ, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন! তা একসঙ্গে যখন শুরু করেছি তখন একসঙ্গেই চলতে হবে শেষ অবধি। . . . তোমার কী মনে হয়? – জেলা-সদর থেকে সরে পড়া, নাকি আরও একবার চেষ্টা করে দেখা?'

চুমাকোভ ঝটপট বলে উঠল, 'চেষ্টা করতে হয় অন্য কেউ করুক। আমি বাপু মেশিনগানের সামনে মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছি না।'

'আমি তোমায় জিগ্‌গেস করছি না! চুপ্!' ফোমিন কটমট ক'রে চুমাকোভের দিকে তাকাতে সে চোখ নামিয়ে নিল।

একটু চুপ থেকে শেষকালে কাপারিন বলল, 'না, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার আর কোন অর্থ হয় না। অস্ত্রবলে ওরা আমাদের ওপরে। ওদের চৌদ্দটা মেশিনগান আছে, আমাদের একটাও নেই। তাছাড়া লোকবলও ওদের বেশি। . . . এখান থেকে ঘুরে গিয়ে বিদ্রোহের জন্য কসাকদের গড়ে তুলতে হবে। যতক্ষণে ওদের কাছে মিলিটারীর সাহায্য এসে পৌঁছুবে তার আগেই সমস্ত প্রদেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। একমাত্র এটাই আমাদের ভরসা। এই আমাদের ভরসা!'

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফোমিন বলল, 'বেশ, তাহলে এ ব্যাপারে কিছু একটা ঠিক করতে হয়। ওহে ট্রুপ-কম্যাণ্ডাররা! এখুনি গিয়ে যুদ্ধের সমস্ত সরঞ্জামের হিসাব নাও, দেখ কার হাতে কত কার্তুজ আছে। কড়া হুকুম, একটা কার্তুজও যেন ফালতু খরচ না হয়। প্রথমেই যাকে দেখতে পাব হুকুম মানছে না তাকে আমি নিজের হাতে তলোয়ারের কোপে উড়িয়ে দেব। এই কথাই জানিয়ে দাও সেপাইদের।' একটু চুপ থেকে ভীষণ রেগে বিরাট মুঠো পাকিয়ে ঘুষি মারে টেবিলের ওপর। 'আঃ যত গণ্ডগোল বাধাল ওই মেশিনগানগুলো! কিন্তু সবই তোমার দোষে চুমাকোভ! যদি গোটা চারেকও ছিনিয়ে নেওয়া যেত! এখন ওরা অবশ্যই জেলা-সদর থেকে আমাদের তাড়াবে। . . . আচ্ছা এখন চলে

যাও যে যার জায়গায়! আজকের রাতটা আমরা এখানে কাটাব, যদি না খেদিয়ে দেয়। ভোর বেলায় আমরা যাত্রা করব, প্রদেশের ভেতর দিয়ে যাব।...'

রাতটা নির্বিঘ্নে কেটে গেল। ভিওশেনস্কায়ার একটা প্রান্তে বিদ্রোহী ঘোড়সওয়ার সেপাইরা, অন্য প্রান্তে গ্যারিসন কম্পানি যাদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা এবং যুব কমিউনিস্ট লীগের লোকজনও আছে। দুই বিরুদ্ধদলের মাঝখানে ব্যবধান মাত্র দুটো মহল্লার। কিন্তু কোন পক্ষই নৈশ হামলায় নামতে সাহসী হল না।

সকালে বিদ্রোহীদের স্কোয়াড্রনটা বিনা যুদ্ধে এলাকা ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা করল।

এগার

বাড়ি ছেড়ে আসার পর প্রথম তিন সপ্তাহ গ্রিগোরি ইয়েলানস্কায়া জেলার উজানের ক্রিভস্কি গ্রামে ওর রেজিমেন্টের পুরোনো সাথী এক পরিচিত কসাকের বাড়িতে কাটাল। এর পর চলে গেল গর্বাতোভ্স্কি গ্রামে। সেখানে আক্সিনিয়ার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে মাসখানেকের ওপর কাটিয়ে দিল।

সারাটা দিন সে ভেতরের ঘরে শুয়ে থাকে। বাইরে বের হয় শুধু রাতের বেলায়। এ যেন অনেকটা জেলখানার জীবন। গ্রিগোরির মন ভীষণ ভার হয়ে থাকে। কিছু না ক'রে নিষ্কর্মার মতো শুয়ে বসে কাটাতে অসহ্য লাগে তার। বাড়ির দিকে একটা অদম্য টান সে অনুভব করে – ছেলেমেয়েদের কাছে, আক্সিনিয়ার কাছে ফিরে যেতে চায়। প্রায়ই বিনিদ্র রাত কাটে। গ্রেটকোটখানা গায়ে চাপিয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করে ফেলে তাতারস্কি যাবে বলে। কিন্তু প্রতি বারই মন বদলায়। কোট খুলে ফেলে বিছানায় ঝাঁপিয়ে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে কাতরায়। শেষ পর্যন্ত এ জীবন ওর সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে গেল। বাড়ির কর্তা আক্সিনিয়ার দূর সম্পর্কের মামা। গ্রিগোরির ওপর তার সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এমন অতিথিকে আর কতকালই বা রাখা যায়? একদিন রাতের খাওয়াদাওয়ার পর গ্রিগোরি তার ঘরে ফিরে গেছে, এমন সময় শুনতে পেল কর্তা গিন্নির কথাবার্তা। গলায় বিষ ঢেলে ক্যানকেনে গলায় গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞেস করছে, 'কবে শেষ হবে বল ত এই জ্বালা?'

'কিসের জ্বালা?' মোটা গলায় বাড়ির কর্তা বলল।

'এই হাড় জ্বালানিটার হাত থেকে কবে রেহাই পাব তাই জিগ্‌গেস করছি।'

'চুপ কর ত!'

'কেন চুপ করব শুনি? আমাদের নিজেদের ঘরেই বাড়ন্ত। ভাঁড়ার টুঁ টুঁ।

আর তুমি কিনা ওই কুঁজো শয়তানটাকে পুষছ, রোজ রোজ খাওয়াচ্ছ! জিগ্গেস করি আর কদ্দিন এমন ভাবে চলবে? আর সোভিয়েতের লোকেরা যদি জানতে পাবে? আমাদের মুণ্ডু খসিয়ে নেবে, ছেলেমেয়েগুলো অনাথ হবে!'

'আঃ চুপ কর বলছি আভ্‌দোতিয়া!'

'না, চুপ করব না! আমাদের ছেলেপুলে আছে। ঘরে দানা বলতে মন দশেকের বেশি নেই, অথচ তুমি এই গুখেগোর ব্যাটাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছ! ও তোমার কে হয় শুনি? নিজের মায়ের পেটের ভাই নাকি? নাকি তোমার কুটুম? খুড়তুত-জ্যাঠতুত কেউ? তোমার সঙ্গে ওর চৌদ্দ পুরুষের কারও কোন সম্পর্ক নেই। যদি বল ও তোমার মামার শালা, নয়ত পিসের ভাই, তাহলেও খাইয়ে দাইয়ে আদর করে রাখতে হবে নাকি? তবে রে টেকো মিনসে! চুপ! অমন মুখ ঝামটা দিও না বলে দিচ্ছি! নইলে কাল আমি নিজে গিয়ে সোভিয়েতের দপ্তরে জানিয়ে আসব ঘরে তুমি কী রত্ন রেখেছ!'

পরের দিন বাড়ির কর্তা গ্রিগোরির ঘরে ঢুকে মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, তুমি আমাকে যা খুশি ভাবতে পার, কিন্তু এ বাড়িতে তোমার আর বেশি দিন থাকা চলছে না। আমি তোমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তোমার বাবাকে চিনতাম, তাকেও ভক্তি করতাম। কিন্তু এখন তোমাকে খাওয়া দাওয়া দিয়ে ঘরে রাখা আর পোষাচ্ছে না। . . . তাছাড়া ভয়ও হয় কবে সরকারের লোকজন তোমার খবর পেয়ে যায়। যেখানে খুশি যাও। আমি ছাপোষা মানুষ। তোমার জন্যে আমার মাথাটা যাক তা আমি চাই নে। যিশুর দোহাই, মাপ করো, আমাদের রেহাই দাও ভাই। . . .'

'বেশ,' গ্রিগোরি সংক্ষেপে বলল। 'তুমি যে খেতে দিয়েছ, আমাকে আশ্রয় দিয়েছ তার জন্যে তোমার কাছে আমি ঋণী। সব কিছুর জন্যেই ঋণী। আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি যে আমি তোমার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু কোথায় যাব বল? আমার সমস্ত পথই যে বন্ধ!'

'সে তুমি ভালো জান।'

'বেশ। আজই চলে যাব। আমি তোমার কাছে ঋণী রইলাম আর্তামোন ভাসিলিয়েভিচ। আমার জন্যে যা করেছ সে সবের জন্যেই ঋণী আমি।'

'না না ওসব বলার মতো কিছুই আমি করি নি।'

'তোমার উপকারের কথা আমি ভুলব না। হয়ত একদিন তোমার কোন কাজে লাগব।'

বাড়ির কর্তা বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে। গ্রিগোরির কাঁধে মৃদু চাপড় মারে। 'ওকথা আর বোলো না! আমার ওপরে যদি সব নির্ভর করত তাহলে তুমি

আরও দু'মাস থেকে গেলেও কোন আপত্তি করতাম না। কিন্তু আমার গিন্নি শুনবে না, রোজ বকাবকা করছে হারামজাদী মাগী। আমি কসাক, তুমিও কসাক, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। তুমি আমি দু'জনেই সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে। আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি ইয়াগদ্‌নি গাঁয়ে চলে যাও। সেখানে আমার বেয়াই থাকেন, তোমাকে ঠাঁই দেবেন। আমার নাম ক'রে ওঁকে এই কথাই বোলো – আর্তামোন তোমাকে নিজের ছেলের মতো ঘরে আশ্রয় দিয়ে যতদিন সাধ্যে কুলোয় খাইয়ে পরিয়ে রাখতে বলেছে। পরে ওর সঙ্গে হিসেবনিকেশ ক'রে নেব। কিন্তু কথা একটাই – আজই তোমায় চলে যেতে হবে। আমার পক্ষে তোমাকে রাখাটা আর ঠিক হবে না। একদিকে গিন্নি চাপ দিচ্ছে, অন্যদিকে ভয়ও আছে সোভিয়েতের লোকেরা টের না পেয়ে যায়। . . . কয়েকদিন থাকতে দিয়েছিলাম, এই ঢের। আমারও ত নিজের প্রাণের মায়া আছে।'

গভীর রাতে গ্রিগোরি গ্রাম ছেড়ে বের হল। কিন্তু টিলার ওপরকার হাওয়াকলের কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই তিনজন ঘোড়সওয়ার যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো, ওর পথ রুখে দাঁড়াল।.

'এই শালা শুয়োরের বাচ্চা! দাঁড়া! কে তুই?'

গ্রিগোরির বুকটা ধড়াস করে উঠল। একটি কথাও না বলে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পালানোর চেষ্টা করাটা হত নেহাৎ বোকামি। পথের ধারে কাছে না আছে কোন খানাখন্দ, না কোন ঝোপঝাড়। চারদিকে ধু ধু করছে খালি স্তেপের মাঠ। দু'পাও এগিয়ে যাওয়ার অবকাশ পেত না।

'কমিউনিস্ট নাকি? তোর মায়ের নিকুচি করেছি। পেছনে ফিরে আয় বলছি। জলদি!'

দ্বিতীয় জন গ্রিগোরির প্রায় গায়ের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে হুকুম দিল, 'হাত তোল! পকেট থেকে হাত বার কর বলছি। নইলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেবো!'

গ্রিগোরি নীরবে গ্রেটকোটের পকেট থেকে হাতদুটো বার করল। ওর ভাগ্যে কী ঘটল, যারা ওকে থামাল তারাই বা কারা, এখনও পরিষ্কার কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সে প্রশ্ন করল, 'কোথায় যেতে হবে?'

'গাঁয়ে। পিছু ফের।'

গ্রাম অবধি ওর সঙ্গে সঙ্গে চলল একজন ঘোড়সওয়ার। বাকি দু'জন গোরুচরানোর মাঠ পর্যন্ত গিয়ে তাদের ছেড়ে দিয়ে সদর রাস্তার দিকে ঘোড়া ছুটাল। গ্রিগোরি চুপচাপ চলতে লাগল। গ্রামের রাস্তায় উঠে আসার পর পায়ের গতি একটু কমিয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কারা ভাই?'

'এগিয়ে চল, এগিয়ে চল! কোন কথা নয়! হাত দুটো পেছনে রাখ, শুনছ?'

গ্রিগোরি নীরবে ওর হুকুম তামিল করল। একটু বাদে ফের জিজ্ঞেস করল, 'সে যাই হোক, বলই না কেন, তোমরা কারা?'

'গ্রীক মতের সদাচারী খ্রীষ্টান*।'

'আমি নিজেও সনাতনপন্থী নই।'

'তাহলে আর কি! ওই আনন্দেই থাক।'

'তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'কম্যাণ্ডারের কাছে। চল শালা, নইলে তোকে . . .'

সঙ্গের পাহারাদারটি তলোয়ারের ডগা দিয়ে আস্তে করে খোঁচা মারে গ্রিগোরিকে। ঝকঝকে ধারাল ঠাণ্ডা ইস্পাতের হুলটা ওভারকোটের কলার আর মাথার টুপীর ঠিক মাঝখানে গ্রিগোরির খালি ঘাড়টার ওপর ছ্যাঁত ক'রে এসে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ফুলকির মতো এক পলকের জন্য জ্বলে ওঠে একটা আতঙ্কের ভাব, তার পরেই নেমে আসে নিষ্ফল ক্রোধ। কলারটা তুলে পাহারাদারের দিকে মাথাটা একটু ঘুরিয়ে সে তাকাল, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ওসব ছাড় দেখি! শুনছ? নইলে আমি কিন্তু ও জিনিস তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেব।'

'যা যা হারামীর বাচ্চা! বেশি কথা বলিস নে! ছিনিয়ে নেওয়া আমি বার করছি তোর! দু'হাত পেছনে রাখ্ বলছি!'

গ্রিগোরি মুখ বুজে দু'চার পা এগিয়ে যায়। তারপর বলে, 'আমি অমনিতেই চুপচাপ আছি। গালিগালাজ করার কোনো দরকার নেই। হুঁঃ ওরকম ভুষোমাল অনেক দেখা আছে!'

'পিছন ফিরে তাকিও না!'

'পিছন ফিরে আবার তাকাচ্ছি কোথায়?'

'মুখ বুজে চল হে! একটু তাড়াতাড়ি চল!'

চোখের পাতার ওপর হালকা বরফের গুঁড়ো এসে লেগেছিল। ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'ছুটতে বল নাকি।'

পাহারাদার জবাব না দিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিল। রাতের ভিজে বাতাস আর

---

* গ্রীক মতের সদাচারী খ্রীষ্টান ও সনাতনপন্থী – সামগ্রিক ভাবে গ্রীক অর্থডক্স চার্চের অনুসৃত যে ধর্মপন্থা রাশিয়ায় গৃহীত হয় তা অর্থডক্স খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত। কিন্তু সপ্তদশ শতকে নিকনের পরিচালনায় রাশিয়ায় গির্জার যে সংস্কার প্রচলিত হয় তার বিরোধিতা ক'রে যে সমস্ত ধর্মীয় দল ও গোষ্ঠী প্রচলিত গির্জার আওতা থেকে বেরিয়ে যায় তাদের বলা হত সনাতনপন্থী। এরা সরকারী অর্থডক্স চার্চের ঘোর বিরোধী হওয়ায় রাজরোষে পতিত হয়। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত জার সরকার সনাতনপন্থার সমর্থকদের উপর নানা রকম অত্যাচার উৎপীড়ন চালান। বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান ও হীনযানের সঙ্গে তুলনীয়। – অনুঃ

ঘামে জবজবে ঘোড়ার বুকটা গ্রিগোরির পিঠে পেছন থেকে গুঁতো মারে। ঘোড়াটার একটা খুর গ্রিগোরির ঠিক পায়ের কাছে গলা বরফের মধ্যে সশব্দে দেবে যায়।

কোনরে হাত ঠেকিয়ে ঘোড়াটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গ্রিগোরি চিৎকার করে ওঠে, 'সাবধান!'

পাহারাদার ওর মাথা বরাবর তলোয়ার তুলে চাপা গলায় বলল, 'শালা শুয়োরের বাচ্চা! এগো বলছি! কোন কথা নয়। নয়ত তোকে যেখানে নিয়ে যাবার কথা সে জায়গা অবধি নিয়ে যেতে পারব কিনা সন্দেহ। এ ব্যাপারে আমার হাত আবার একটু তাড়াতাড়ি চলে। চোপ্! আর একটি কথাও নয়!'

গ্রাম অবধি বাকি রাস্তাটা ওরা চুপচাপ চলল। শেষ প্রান্তের বাড়ির উঠোনের কাছে এসে ঘোড়াটাকে লাগাম টেনে থামিয়ে লোকটা বলল, 'এই ফটকের ভেতরে ঢুকে যাও।'

হাটখোলা ফটকের ভেতরে ঢুকে পড়ল গ্রিগোরি। উঠোনের অনেকখানি ভেতরে দেখা গেল টিনের শেড দেওয়া একটা বেশ বড়সড় বাড়ি। চালাঘরের ছাঁচতলায় কতকগুলো ঘোড়া ফোঁসফোঁস শব্দে নাক ঝাড়ছে আর সশব্দে দানা চিবুচ্ছে। দেউড়ির কাছে জনাছয়েক সশস্ত্র পাহারাদার। গ্রিগোরির সঙ্গের পাহারাদারটি তলোয়ার খাপে পুরে ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল, 'চৌকাট ডিঙিয়ে সোজা বাড়ির ভেতরে চলে যাও। বাঁ দিকের প্রথম দরজা। যাও, পেছন ফিরে তাকাবে না। কতবার বলতে হবে! তোর গলায় পা চাপা দিয়ে পিত্তি টেনে বার করলে তবে টের পাবি হতভাগা!'

গ্রিগোরি ধীরে ধীরে দেউড়ির ধাপ বয়ে উঠতে থাকে। রেলিং-এর ধারে লম্বা ঘোড়সওয়ারী গ্রেটকোট পরা আর লাল ফৌজী টুপি মাথায়-দেওয়া যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে জিজ্ঞেস করল, 'ধরে আনলে নাকি?'

'হ্যাঁ,' গ্রিগোরির সঙ্গের পাহারাদারটি সেই পরিচিত ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'হাওয়াকলের কাছে ধরেছি।'

'পার্টির কোন সম্পাদক-টম্পাদক? কে লোকটা?'

'কে জানে বাপু! হবে কোন হারামজাদা। ঠিক কে, এখুনি জানতে পারব আমরা।'

বারান্দায় ঢুকে ইচ্ছে ক'রে একটু দেরি করতে থাকে গ্রিগোরি, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভাবতে চেষ্টা করে। মনে মনে ভাবে, 'হয় এটা কোন গুণ্ডাদল, নয়ত জরুরী কমিশনের লোকজন কোন একটা মতলবে ভেক ধরেছে। ফেঁসে গেলাম! বোকার মতো ফেঁসে গেলাম!'

দরজা খুলে প্রথম যাকে সে দেখতে পেল সে হল ফোমিন। একটা টেবিলের ধারে বসে আছে। তাকে ঘিরে সামরিক পোশাক পরা একদল লোক। তাদের

গ্রিগোরি চেনে না। খাটের ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে গ্রেটকোট আর পশুলোমের খাটো কোট। বেঞ্চির পাশে সার বেঁধে দাঁড় করানো কার্বাইন বন্দুক। ওই বেঞ্চের ওপরেই এলোমেলো ভাবে গাদা করে রাখা তলোয়ার, কার্তুজের বেল্ট, ফৌজী ব্যাগ আর জিনের থলি। লোকজন, গ্রেটকোট আর সাজসরঞ্জাম থেকে ভেসে আসছে ঘোড়ার ঘামের তীব্র গন্ধ।

গ্রিগোরি মাথার টুপি খুলে নীচু গলায় বলল, 'নমস্কার!'

'আরে মেলেখভ যে! সাধে কি আর বলে, স্তেপের মাঠ এত বিরাট হলে কী হবে, রাস্তাটা আসলে একেবারেই সরু! আবার দেখা হয়ে গেল তাহলে? কোত্থেকে হাজির হলে? কোট খোলো, এসো, বোসো।' টেবিলের ধার থেকে উঠে এসে গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এলো ফোমিন। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে তুমি ঘোরাঘুরি করছিলে কেন?'

'একটা কাজে এসেছিলাম।'

'কী কাজে? বেশ দূরে চলে এসেছ ভাই। . . .' অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ফোমিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গ্রিগোরিকে। 'সত্যি কথা বল, এখানে গা ঢাকা দিয়ে ছিলে, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছ। এটাই আসল কথা,' জোর করে হেসে উত্তর দেয় গ্রিগোরি।

'আমার লোকেরা কোথায় পাকড়াও করল তোমাকে?'

'গাঁয়ের কাছে।'

'কোথায় যাচ্ছিলে?'

'যে দিকে দু'চোখ যায়। . . .'

ফোমিন আরও একবার মন দিয়ে গ্রিগোরির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, মুচকি হাসল।

'আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি ভাবছ তোমাকে আমরা ধরে এখনই ভিওশেনস্কায়ায় চালান ক'রে দেবো? না ভাই, সে পথ আমাদের বন্ধ। . . . ভয় পেয়ো-না! সোভিয়েত সরকারের নোকরি আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ওদের সঙ্গে গাঁটছড়াটা আলগা হয়ে গেল। . . .'

'তালাক দিয়েছি ওদের,' চুল্লীর পাশে বসে সিগারেট টানতে টানতে হেঁড়ে গলায় বলল একজন বয়স্ক কসাক।

টেবিলের ধারে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে কে একজন হো-হো করে হেসে উঠল।

'আমার সম্পর্কে কিছু শোন নি তুমি?' ফোমিন জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'আচ্ছা, তাহলে টেবিলের কাছে এসে বোসো, আলোচনা করা যাক। এই কে আছ, আমাদের অতিথিকে বাঁধাকপির ঝোল আর মাংস দিয়ে যাও।'

ফোমিনের একটা কথায়ও বিশ্বাস হচ্ছিল না গ্রিগোরির। ওর মুখ ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল। তাও নিজেকে সংযত রেখে ওপরের কোট খুলে টেবিলের কাছে এসে বসল। সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। কিন্তু মনে পড়ে গেল গত দু'দিন হল ওর কাছে তামাক নেই।

ফোমিনের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'তামাক ধরানোর কোন রসদ নেই?'

ফোমিন সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে চামড়ার সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরে তার দিকে। সিগারেট নিতে গিয়ে গ্রিগোরির হাত যে কাঁপছিল সেটা ফোমিনের নজর এড়ায় নি। আবার সে মুচকি হাসল বাদামী রঙের কোঁকড়ানো গোঁফের ফাঁকে।

'আমরা সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমরা জনগণের পক্ষে, খাদ্যসংগ্রহনীতি আর কমিশনারদের বিরুদ্ধে। ওরা অনেককাল আমাদের বোকা বানিয়ে রেখেছিল, এখন আমরা ওদের বোকা বানাব। বুঝতে পেরেছ ত মেলেখভ?'

গ্রিগোরি চুপ ক'রে থাকে। সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে থাকে। ওর মাথাটা সামান্য ঘুরছিল, গলার কাছে ঠেলে আসছিল বমি বমি ভাব। শেষ মাসটা ও ভালোমতো খেতে পায় নি। মাত্র এখনই টের পেল কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে এই সময়ের মধ্যে। সিগারেট নিভিয়ে গোগ্রাসে খাবার খেতে শুরু করে। ফোমিন সংক্ষেপে শোনাল বিদ্রোহের কথা, এলাকায় প্রথম কয়েকদিন কী ভাবে তারা উলটো পালটা ঘুরে বেড়িয়েছে সে কাহিনী – যদিও ঘুরে বেড়ানোটাকে সে জমকাল ভাষায় 'হানা দেওয়া' বলে উল্লেখ করে। গ্রিগোরি নীরবে শুনে যায়। প্রায় না চিবিয়েই গব গব করে গেলে রুটি আর চর্বিওয়ালা আধাসেদ্ধ ভেড়ার মাংস।

'যাই বল না কেন, পরের বাড়িতে খেয়ে একদম রোগা হয়ে গেছ তুমি,' প্রসন্ন হাসি হেসে ফোমিন বলল।

ভরা পেটে ঢেকুর তুলে গ্রিগোরি বিড়বিড় করে বলল, 'শ্বশুর বাড়িতে ত আর ছিলাম না।'

'সে ত দেখাই যাচ্ছে। আরেকটু খাও ভাই, যতটা পার ঠেসেঠুসে খাও। আমরা কিপ্টে নই।'

'না আর নয়। এবারে একটা সিগারেট ধরানো যেতে পারে। . . .' সিগারেট পেয়ে সেটা নিয়ে গ্রিগোরি এগিয়ে গেল বেঞ্চির ওপর রাখা লোহার পাত্রটার কাছে। কাঠের মগে জল গড়িয়ে নিল। ঠাণ্ডা কনকনে জল, একটু নোনতা স্বাদের। খাওয়ার পর নেশাগ্রস্তের মতো লাগছিল। ঢক ঢক করে বড় দুই মগ

জল খাওয়ার পর তৃপ্তির সঙ্গে সিগারেট ধরাল গ্রিগোরি।

উঠে এসে গ্রিগোরির কাছে বসে ফোমিন চালিয়ে যেতে লাগল তার বিবরণ।

'কসাকরা আমাদের দেখে আজকাল আর তেমন খুশি হচ্ছে না। গত বছর বিদ্রোহের সময় তাদের ওপর দিয়ে খুব একচোট গেছে। . . . তবে কিছু ভলান্টিয়ার পেয়েছি আমরা। জনা চল্লিশেক যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমাদের যা দরকার তা এটা নয়। গোটা এলাকাটাকে আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে, এমন ভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে আশেপাশের জেলাগুলো – খোপিওর, উস্ত্-মেদ্‌ভেদিৎসাও আমাদের মদত দেয়। একমাত্র তখনই সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আমাদের সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হবে।'

টেবিলে উত্তেজিত আলোচনা চলছে। ফোমিনের কথা শুনতে শুনতে গ্রিগোরি গোপনে চেয়ে দেখছে তার সঙ্গীসাথীদের। একটি মুখও চেনা নয়। এখনও ফোমিনকে তার বিশ্বাস হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন কোন ফন্দি আঁটছে। তাই সাবধানতার খাতিরে সে চুপ করে থাকে। কিন্তু সারাক্ষণ চুপ করে থাকাও ঠিক নয়।

একটা ঝিমুনির ভাব ওকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল, সেটা তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কমরেড ফোমিন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যিই হয় তার মানে, কী চাও তোমরা? নতুন করে যুদ্ধ বাধাতে চাও?'

'কী চাই সে ত তোমায় আগেই বলেছি।'

'সরকার বদল করতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বদলে কাকে বসাবে?'

'নিজেদের সরকার, কসাক সরকার।'

'আতামানদের?'

'তা সে আতামানদের কথা না হয় একটু পরে হবে। লোকে যে সরকার বেছে নেবে সেই সরকারই বসাব আমরা। কিন্তু সেটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। তাছাড়া রাজনীতি আমি তেমন বুঝি সুঝি না। আমি মিলিটারীর লোক, আমার কাজ কমিশনার আর কমিউনিস্টগুলোকে খতম করা। আর সরকারের কথা যদি বল সে ব্যাপারে আমার আর্মির সদর দপ্তরের নেতা কাপারিন তোমাকে বলবে। এ ব্যাপারে সে আমার মাথা। বেশ মাথাওয়ালা লোক। শিক্ষিত লোক।' গ্রিগোরির দিকে ঝুঁকে পড়ে ফোমিন ফিসফিস ক'রে বলল, 'জারের আর্মির ক্যাপ্টেন ছিল এককালে। বুদ্ধিমান ছোকরা। এখন ভেতরের ঘরে ঘুমোচ্ছে। শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। লম্বা লম্বা পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে মার্চ ক'রে – অভ্যেস নেই কিনা।'

বারান্দায় হঠাৎ একটা গোলমাল শুরু হল। পায়ের দাপাদাপি, আর্তনাদ আর ধ্বস্তাধ্বস্তির চাপা আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন চাপা গলায় গরগর করে উঠল, 'দে ওকে আচ্ছা ক'রে এক ঘা লাগিয়ে!' টেবিলের ধারের কথাবার্তা থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ফোমিন সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল দরজার দিকে। কে যেন এক ঝটকায় হাঁ ক'রে খুলে দিল দরজাটা। ঘরের ভেতরে গলগল করে নীচু হয়ে এসে ঢুকল একরাশ সাদা বাষ্পের কুণ্ডলী। পেছন থেকে দড়াম ক'রে এক ধাক্কা খেয়ে একজন ঢ্যাঙা লোক সামনে ঝুঁকে পড়ে হোঁচট খেতে খেতে হুড়মুড় ক'রে ঘরের ভেতরে এসে পড়ল। লোকটার গায়ে ভেতরে আস্তর দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় সেলাই করা খাকি রঙের মোটা কোর্তা, পায়ে ধূসর পশমী জুতো। চুল্লীর একটা কোনায় সজোরে কাঁধ ঠুকে গেল তার। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে বারান্দা থেকে কে একজন সোল্লাসে চিৎকার ক'রে বলল, 'এই যে ধর আরও একটা।'

ফোমিন উঠে দাঁড়িয়ে মিলিটারী জামার বেল্টখানা ঠিকঠাক ক'রে নেয়।

'কে তুমি?' গুরুগম্ভীর সুরে সে জিজ্ঞেস করল।

তুলোঠাসা গরম কোর্তা পরা লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে চুলে হাত বুলিয়ে নিল। কাঁধের ফলক নাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে যন্ত্রণায় ভুরু কোঁচকায়। ভারী একটা কিছু দিয়ে, সম্ভবত রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ওকে ঘা মারা হয়েছিল পিঠের শিরদাঁড়ায়।

'চুপ করে রইলে যে? জিভ খসে গেছে নাকি? বলি, কে তুমি?'

'লাল ফৌজী।'

'কোন ইউনিটের?'

'বারো নম্বর ফুড রেজিমেণ্টের।'

'বটে বটে! এতক্ষণে পাওয়া গেছে একটাকে!' টেবিলের ধারে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে একজন হেসে বলল।

ফোমিন জেরা চালাতে লাগল।

'এখানে কী করছিলে?'

'প্রতিরোধদল। . . . আমাদের পাঠানো হয়েছিল . . .'

'বুঝেছি। এখানে গাঁয়ে তোমরা কতজন?'

'চৌদ্দজন।'

'বাকিরা কোথায়?'

লাল ফৌজী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। অনেক চেষ্টায় ঠোঁট আলগা করল। গলার ভেতর থেকে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হল। ঠোঁটের বাঁ কোণ থেকে থুতনি বয়ে গড়িয়ে পড়ল রক্তের ক্ষীণ ধারা। হাত দিয়ে ঠোঁট মুছে হাতের

তেলোর দিকে তাকাল সে, তারপর প্যান্টের গায়ে হাতটা মুছে ফেলল।

রক্ত গিলে ফেলে ঘড়ঘড়ে গলায় সে বলল, 'তোমার ওই হারামীর বাচ্চাটা আমার ফুসফুস জখম ক'রে দিয়েছে।...'

'ঘাবড়াও মত্‌! আমরা তোমাকে সারিয়ে তুলব!' গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার এক কসাক টেবিলের ধার থেকে উঠতে উঠতে ঠাট্টা ক'রে কথাগুলো বলে অন্যদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

'বাকিরা কোথায়?' ফোমিন আবার প্রশ্ন করে।

'মালপত্রের গাড়ির দলের সঙ্গে ইয়েলান্‌স্কায়ায় চলে গেছে।'

'তুমি কোথা থেকে এসেছ? কোথাকার লোক তুমি?'

তাড়সে জ্বরের রুগীর মতো জ্বলজ্বলে নীল চোখ মেলে ফোমিনের দিকে তাকিয়ে পায়ের কাছে রক্তের দলা থুতু ফেলল লোকটা। এবারে সে স্পষ্ট গমগমে মোটা গলায় জবাব দিল।

'প্‌স্কোভ প্রদেশের।'

'প্‌স্কোভ, মস্কো ... ওসব অনেক শুনেছি ...' বিদ্রূপের সুরে ফোমিন বলল। 'অন্যের ফসল লুটতে অনেক দূর চলে এসেছ হে ছোকরা। ... কথাবার্তা তাহলে এখানেই শেষ? তোমাকে নিয়ে কী করা যায় বল ত?'

'আমাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'তুমি যে নেহাৎই সাদাসিধে ছোকরা দেখছি হে। ... আচ্ছা সত্যি সত্যি ছেড়ে দিলেই বা কী? তোমরা সকলে কী বল, অ্যাঁ?' টেবিলের ধারে যারা বসে ছিল তাদের দিকে ঘুরে গোঁফের ফাঁকে মুখ টিপে হাসে ফোমিন।

গ্রিগোরি মনোযোগ দিয়ে সমস্ত দৃশ্যটা লক্ষ করছিল। রোদে জলে পোড় খাওয়া বাদামী মুখগুলোর দিকে তাকাতে সমঝদারের সংযত হাসি দেখতে পেল সে।

ফোমিনের দলের একজন বলল, 'আমাদের কাছে মাস দুয়েক চাকরী করুক। তারপর না হয় ওকে বাড়ি ছাড়া যাবে। বৌয়ের কাছে ফিরে যাবে।'

বৃথাই হাসি চেপে রাখার চেষ্টা ক'রে ফোমিন বলল, 'কী বল, সত্যি সত্যি কাজ করবে ত আমাদের দলে? তোমায় ঘোড়া দেবো, জিনও দেবো। তোমার পায়ে ওই যে পশমী জুতোজোড়া আছে তার বদলে একজোড়া নতুন টপবুট পাবে। তোমাদের কম্যাণ্ডাররা দেখছি তোমাদের ভালো সাজগোজ কিছুই দেয় না। আরে ছোঃ। ওকে কেউ জুতো বলে! বাইরে বরফগলা জল আর তুমি কিনা পশমী জুতো পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ! আমাদের দলে ভিড়ে যাও হে, কী বল?'

নকল সরু গলায় হিসহিস আওয়াজ তুলে আরেকজন কসাক ভাঁড়ামি ক'রে বলল, 'আরে ও হল গিয়ে চাষাভুষো মানুষ। জীবনে কোন দিন ঘোড়ায় চড়ে নি।'

লাল ফৌজী চুপ ক'রে থাকে। ওর চোখজোড়া আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চুল্লীতে পিঠ ঠেকিয়ে স্পষ্ট দৃষ্টি মেলে সে তাকায় সকলের দিকে। থেকে থেকে যন্ত্রণায় ভুরু কোঁচকায়। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, সামান্য হাঁ করছে।

'তাহলে আমাদের কাছে থাকছ ত? না কি?' ফোমিন আবার জিজ্ঞেস করল।

'কিন্তু তোমরা কারা?'

'আমরা?' ভুরু অনেকখানি উঁচিয়ে গোঁফে হাত বুলায় ফোমিন। 'আমরা মেহনতী জনসাধারণের জন্যে লড়াই করি। আমরা কমিশনার আর কমিউনিস্টদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে—এই হল আমাদের পরিচয়।'

এবারে গ্রিগোরির হঠাৎ নজরে পড়ল লোকটার মুখে হাসি।

'আচ্ছা, এবারে বুঝলাম তোমরা কারা।... আমি ত ভাবলাম, এরা আবার কারা?' হাসতে গিয়ে বন্দীর রক্তমাখা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। তার কথা শুনে মনে হয় এই মাত্র যে সংবাদটি শুনল তাতে যেন আনন্দ আর বিস্ময় দুইই হয়েছে তার। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ফুটে উঠেছিল যার ফলে উপস্থিত সকলে কান খাড়া না ক'রে পারল না। 'তোমাদের মতে, তোমরা জনসাধারণের জন্যে লড়াই করছ? এই কথা? কিন্তু আমাদের মতে, তোমরা হলে স্রেফ ডাকাতের দল। আমি তোমাদের নোকরি করতে যাব বলে আশা কর? বেশ মজার কথা! তোমরা ঠাট্টাও করতে পার!'

'তুমিও বেশ ফুর্তিবাজ লোক, দেখতে পাচ্ছি...' ফোমিন ভুরু কোঁচকাল, সংক্ষেপে প্রশ্ন করল, 'কমিউনিস্ট?'

'না, না, কী যে বল! আমি পার্টির লোক নই।'

'দেখেশুনে ত মনে হয় না।'

'হলপ করে বলছি, পার্টির লোক নই!'

ফোমিন গলা খাঁকারি দিয়ে টেবিলের দিকে ফেরে।

'চুমাকোভ! এটাকে নিকেশ ক'রে দিয়ে এসো।'

'আমাকে খুন ক'রে কোন লাভ হবে না। কোন যুক্তি নেই,' শান্ত গলায় লাল ফৌজীটি বলল।

জবাবে নেমে এলো নীরবতা। চুমাকোভ গাঁটাগোঁট্টা ধরনের সুপুরুষ কসাক। গায়ে বিলিতি চামড়ার জার্কিন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। লালচে চুলগুলো অমনিতে পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো হলেও হাত দিয়ে পাট ক'রে নেয়।

'এই চাকরীতে আমার ঘেন্না ধরে গেল,' উৎফুল্ল হয়ে কথাগুলো বলে বেঞ্চির ওপর স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকা তলোয়ারগুলোর ভেতর থেকে নিজেরটা টেনে

বার করল। বুড়ো আঙুল দিয়ে ধারটা একটু পরখ ক'রে দেখল।

ফোমিন পরামর্শ দিল, 'কাজটা যে তোমার নিজেকে করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বাইরে উঠোনে যারা আছে তাদের কাউকে বল।'

চুমাকোভ শীতল দৃষ্টিতে লাল ফৌজীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'সামনে এগিয়ে চল হে চাঁদ।'

লাল ফৌজী চুল্লীর ধার থেকে টলতে টলতে এগিয়ে আসে, কোলকুঁজো হয়ে ধীরে ধীরে পা বাড়ায় দরজার দিকে। মেঝের ওপর সে রেখে যায় ভিজে পশমী জুতোর জলকাদামাখা ছাপ।

'ঢোকার সময় অন্তত পা মুছে নেওয়া উচিত ছিল! জুতোর দাগ ফেলে একেবারে নোংরা ক'রে দিলে মেঝেটা!. . . কী নোংরা লোক হে তুমি!' বন্দীর পেছন পেছন চলতে চলতে কৃত্রিম বিরক্তি দেখিয়ে চুমাকোভ বলল।

পেছন থেকে ফোমিন চিৎকার করে বলল, 'ওদের বোলো গলিতে নয়ত মাড়াই-উঠোনে নিয়ে গিয়ে যেন কাজটা সারে। বাড়ির কাছাকাছি দরকার নেই, তাতে বাড়ির মালিকেরা মনে দুঃখ পাবে।'

গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এসে তার পাশে বসে পড়ে ফোমিন বলল, 'আমরা বড় চটপট বিচার ক'রে ফেলি তাই না?'

'হ্যাঁ,' ফোমিনের সরাসরি চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে গ্রিগোরি উত্তর দিল।

ফোমিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'কিছু করার নেই। এরকমই দরকার আজকাল।' আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু এমন সময় দেউড়িতে জোর দুপদাপ আওয়াজ উঠল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। গুড়ুম ক'রে একটা গুলি ছোটার আওয়াজ হল।

'ওখানে আবার কোন্ শয়তানের খেল শুরু হল?' বিরক্ত হয়ে চিৎকার ক'রে উঠল ফোমিন।

টেবিলের ধারে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে একজন তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে দরজাটা হাট খুলে দিল।

'কী ব্যাপার?' অন্ধকারের মধ্যে সে হাঁক পাড়ল।

চুমাকোভ ভেতরে এসে ঢুকল। উত্তেজিত ভাবে সে বলল, 'বেজায় চটপটে ব্যাটা! কী শয়তান! ওপরের ধাপ থেকে লাফ মেরে ছুটতে শুরু করল। একটা কার্তুজ ফালতু খরচ করতে হল। আমাদের লোকেরা ওখানে ওকে সাবাড় ক'রে দিচ্ছে।. . .'

'বলে দাও যেন উঠোন থেকে বার ক'রে গলির ভেতরে নিয়ে যায়।'

'সে আমি বলে দিয়েছি, ইয়াকভ ইয়েফিমভিচ।'

মুহূর্তের জন্য ঘরের ভেতরে নেমে এলো নিস্তব্ধতা। তারপর কে একজন হাই চাপতে চাপতে বলল, 'আবহাওয়া কেমন হে চুমাকোভ? আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে কি?'

'মেঘ জমে আছে।'

'এক পশলা বৃষ্টি হলে শেষ বরফটুকু ধুয়ে যাবে।'

'বৃষ্টির কী দরকার তোমার?'

'কোন দরকার নেই। জলকাদার ভেতর দিয়ে ছপাত ছপাত করে পথ চলার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

গ্রিগোরি খাটের কাছে গিয়ে নিজের টুপিটা তুলে নেয়।

'তুমি কোথায় চললে?' ফোমিন জিজ্ঞেস করল।

'বাইরে গিয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে আসি।'

দেউড়িতে বেরিয়ে এলো গ্রিগোরি। মেঘের ফাঁক দিয়ে আবছা চাঁদ উঁকি মারছে। চওড়া উঠোন, চালাঘরের ছাদ, পিরামিড আকারে থরে থরে ঊর্ধ্বগামী পপলার গাছগুলোর ন্যাড়া চুড়ো, খুঁটির কাছে চাদরে ঢাকা ঘোড়াগুলো – সব কিছু মাঝরাতের ছমছমে নীল আলোয় উজ্জ্বল। দেউড়ির কয়েক গজ দূরে বরফগলা জলের একটা ডোবা মৃদু দীপ্তি দিচ্ছে। তার মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে আছে লাল ফৌজীর দেহটা। তিনজন কসাক তার ওপর ঝুঁকে পড়ে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছে। কী যেন করছে তারা মৃতদেহটার কাছে দাঁড়িয়ে।

একজন বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখনও নিঃশ্বাস ফেলছে মাইরি! ঠিকমতো শেষ করে দিতি পারলি না, ঠুঁটো হাত শয়তান? কত ক'রে বললাম, মার মাথায় কোপ! আরে রামো, একেবারেই আনাড়ি দেখছি!'

সেই যে কসাকটা, যার গলাটা একটু ফ্যাসফেঁসে, গ্রিগোরিকে যে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছিল, উত্তরে বলল, 'এই এখুনি শেষ হয়ে যাবে! একটু আধটু ধড়ফড় ক'রেই শেষ হয়ে যাবে। . . . আরে মাথাটা তুলে ধর না। কিছুতেই খুলতে পারছি নে যে। চুলের মুঠো ধরে উঁচু ক'রে তোল্, এই এমনি করে। হয়েছে, এবারে একটু ধরে থাক।'

ছপাৎ করে জলের ওপর আওয়াজ হল। লাল ফৌজীর দেহের ওপর যারা ঝুঁকে ছিল তাদের মধ্যে একজন সোজা হয়ে দাঁড়াল। যে লোকটার ফ্যাসফেঁসে গলা সে উটকো হয়ে বসে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে লাল ফৌজীর গা থেকে তুলোর আস্তর দেওয়া গরম কোর্তাটা টেনে খুলছে। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, 'আমার হাতের ছোঁয়াটা আবার একটু হাল্কা মতন কিনা, তাই এখনও প্রাণটা যাই যাই করেও বেরোতে পারে নি। . . . আরে তুলে ধর্, তুলে ধর্, ফেলে

দিস নি। ধুত্তোর, করছিস কী!... হ্যাঁ, যা বলছিলাম, শুয়োর কাটতে গিয়ে সিধে গলায় ছুরি বসিয়ে একেবারে শ্বাসনালী অবধি পোঁচ মারলাম। কিন্তু হারামজাদা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দাপাদাপি করে বেড়ায় সারা উঠোন জুড়ে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ায়। সারা গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, তবু ঘুরছে আর ঘড়ঘড় আওয়াজ বার করছে। নিঃশ্বাস নেওয়ার কিছু নেই, তবু বেঁচে আছে। তার মানে আমার হাতের ছোঁয়াটাই অমনি হালকা কিনা।... আচ্ছা, নামিয়ে দে এবারে।... এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে? বোঝো কাণ্ড! কিন্তু তলোয়ার ত একেবারে ঘাড়ের হাড় অবধি বসে গিয়েছিল!...'

তৃতীয় আরেকজন কসাক লাল ফৌজীর কোর্তাখানা বেশ খানিকটা দূরে হাতের ওপর মেলে ধরে বলল, 'বাঁ পাশটা একেবারে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে। হাত চটচট করছে। ইস, কী বিচ্ছিরি!'

'ও কিছু নয়, মুছে যাবে। চর্বি ত আর নয়,' ভাঙা ভাঙা গলার লোকটা শান্ত ভাবে কথাগুলো বলে আবার উটকো হয়ে বসে। 'হয় অমনিতে মুছে যাবে, নয়ত ধুলে সাফ হয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নেই।'

'আরে করছিস কী? ওর প্যান্টও খুলে নেবার মতলব করছিস নাকি?'

গলা ভাঙা কসাকটা ঝাঁঝিয়ে ওঠে: 'তোর যদি তাড়া থাকে তাহলে চলে যা ঘোড়াগুলোর কাছে। তোকে ছাড়াই চালিয়ে নেবো। ভালো জিনিস ত আর তাই বলে বরবাদ হতে দেওয়া যায় না।'

গ্রিগোরি ঝট করে পিছন ফিরে বাড়ির দিকে চলল।

ফোমিন এক পলক ওর ওপর সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'চল ভেতরের ঘরে গিয়ে কথা বলা যাক। এখানে বড্ড হৈ হট্টগোল।'

ভেতরের ঘরটা বেশ বড়সড়, ভালোমতো গরম করা। ইঁদুর আর তিসির বীজের গন্ধে ছেয়ে আছে। উঁচু কলারওয়ালা আঁটো খাকী জামা গায়ে হাতপা ছড়িয়ে খাটের ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল ছোটখাটো চেহারার একটি লোক। মাথার পাতলা চুলগুলো এলোমেলো, ফুরফুরে আঁশ আর ছোট ছোট পালক লেগে আছে। ওয়াড় ছাড়া একটা নোংরা বালিশে গাল ঠেকিয়ে শুয়ে আছে। একটা ঝোলানো বাতি থেকে আলো এসে পড়ছে লোকটার অনেকদিন না কামানো ফেকাসে মুখের ওপর।

ফোমিন তাকে জাগিয়ে তুলে বলল, 'উঠে পড় হে কাপারিন। আমাদের এখানে একজন অতিথি এসেছে। আমাদের লোক – গ্রিগোরি মেলেখভ। এককালের লেফ্‌টেনান্ট, তোমার অবগতির জন্য জানিয়ে রাখলাম।'

কাপারিন ততক্ষণে বিছানার ধারে পা ঝুলিয়ে দিয়েছে। দু'হাতে মুখ মুছে

উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। হাল্‌কা ভাবে মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে গ্রিগোরির সঙ্গে করমর্দন করল।

'বড় খুশি হলাম। আমি জুনিয়র ক্যাপ্টেন কাপারিন।'

ফোমিন সাদরে একটা চেয়ার ঠেলে দিল গ্রিগোরির দিকে, নিজে গিয়ে বসল তোরঙ্গের ওপরে। গ্রিগোরির মুখ দেখে সে সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল যে লাল ফৌজীর প্রতি নৃশংস অত্যাচার তাকে মর্মপীড়া দিয়েছে। তাই সে বলল, 'তুমি কিন্তু ভেবে বোসো না যে আমরা সকলের ওপরেই এরকম ব্যবহার ক'রে থাকি। বুঝলে কিনা, ফসল আদায়কারী দলের লোক ছিল ও ব্যাটা। ওদের আর ওই সব কমিশনার ধরনের লোকজনদের আমরা ছেড়ে কথা কই না, কিন্তু বাকি সকলকে দয়া ক'রে ছেড়ে দিই। এই ত গতকাল তিনজন মিলিশিয়ার লোককে আমরা ধরেছিলাম। ওদের ঘোড়া, জিন আর হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিলাম আমরা। কী ছাই লাভ হত ওদের মেরে?'

গ্রিগোরি চুপ ক'রে থাকে। হাঁটুর ওপর হাত রেখে ও নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল। ফোমিনের গলার আওয়াজ যেন স্বপ্নের ঘোরে শোনার মতো ওর কানে এসে বাজে।

ফোমিন বলে চলেছে, '. . .এই ভাবেই আমরা লড়াই ক'রে চলেছি আপাতত। আশা রাখি শেষ পর্যন্ত কসাকদের জাগিয়ে তুলতে পারব। সোভিয়েত সরকার টিকতে পারে না। গুজব শোনা যাচ্ছে, সব জায়গাতে নাকি লড়াই চলছে। সব জায়গায় বিদ্রোহ। সাইবেরিয়ায়, ইউক্রেনে, এমনকি খোদ পেত্রোগ্রাদেও। . . . কী যেন নাম ওই কেল্লাটার. . . সেই সেখানেও নাকি গোটা নৌবাহিনী বিদ্রোহ করেছে। . . .'

'ক্রনস্টাড্‌ট,' কাপারিন ধরিয়ে দিল।

গ্রিগোরি মাথা তুলে শূন্যদৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায় ফোমিনের দিকে, তারপর কাপারিনের দিকে।

ফোমিন তার সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও সিগারেট খাও। . . . তা হ্যাঁ, পেত্রোগ্রাদ এর মধ্যে দখল ক'রে ফেলেছে, এখন মস্কোর দিকে আসছে। যেখানেই যাও এই গীত। আমাদেরও তাই ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। কসাকদের জাগিয়ে তুলব, সোভিয়েত সরকার খতম করব। এ ব্যাপারে ক্যাডেটরা যদি আমাদের মদত দেয় তাহলে ত কথাই নেই। ওদের জ্ঞানীগুণী লোকেরা সরকার গড়ে তুলুক না, আমরা ওদের সাহায্য করব।' একটু চুপ ক'রে থেকে পরে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী ভাবছ মেলেখভ? ক্যাডেটরা যদি কৃষ্ণসাগর থেকে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে আর আমরা যদি তাদের

সঙ্গে যোগ দিই তাহলে লড়াইয়ের ময়দানের পেছনে প্রথম বিদ্রোহ করার কৃতিত্বটা ত আমরাই পাব, তাই না? কাপারিন বলছে সে ত একশ'বার। যেমন ধর, আমি যে আঠারো সালে আটাশ নম্বর রেজিমেন্টকে ফ্রন্ট থেকে সরিয়ে নিয়ে বছর দুয়েক সোভিয়েত সরকারের চাকরি করেছি সেটা কি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে?'

'আচ্ছা, তলে তলে এতদূর। অমনিতে বোকা হলে কী হবে, ধূর্ত আছে।...' গ্রিগোরি মনে মনে ভাবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ফোমিন উত্তরের অপেক্ষায় থাকে। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে সমস্যাটা তার কাছে রীতিমতো গুরুতর। ইচ্ছে না থাকলেও গ্রিগোরিকে জবাব দিতে হল।

'সে বলতে গেলে এক দীর্ঘ কাহিনী হয়ে যাবে।'

'তা বটে, তা বটে,' সোৎসাহে সায় দিয়ে বলল ফোমিন। 'আমি অমনি কথার কথা বললাম আর কি। যা হবার পরে দেখা যাবে। কিন্তু এখন আমাদের কাজ করতে হবে। ফ্রন্ট লাইনের পেছন থেকে ধ্বংস করতে হবে কমিউনিস্টদের। ওদের জীবন আমরা অতিষ্ঠ ক'রে তুলব! ওরা ওদের পায়দল সেপাইদের তুলেছে মালগাড়িতে, ভাবছে ওই নিয়ে আমাদের পিছু তাড়া করবে। চেষ্টা ক'রে দেখুক না। যতক্ষণে ঘোড়সওয়ার দলের সাহায্য ওদের কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে ততক্ষণে আমরা গোটা এলাকাটা ওলটপালট করে দেবো।'

গ্রিগোরি ফের নিজের পায়ের দিকে চেয়ে থাকে, আপন মনে ভাবে। কাপারিন ক্ষমা চেয়ে নিয়ে খাটে শুয়ে পড়ে।

'বড় হয়রান হয়ে পড়ি। পাগলের মতো মার্চ ক'রে পথ চলা। ঘুমের সুযোগ কম,' বলে ক্ষীণ হাসি হাসল সে।

ফোমিন উঠে দাঁড়ায়। ভারী হাতখানা গ্রিগোরির কাঁধে রাখে।

'আমাদেরও বিশ্রাম করতে যেতে হয়। সাবাস মেলেখভ! সেদিন ভিওশেনস্কায়ায় আমার পরামর্শ শুনে ভালোই করেছিলে! গা ঢাকা যদি না দিতে তাহলে ওরা নির্ঘাত তোমাকে কয়েদ করত। এতদিনে ভিওশেনস্কায়ার বালিয়াড়ির ভেতরে পড়ে থাকতে, তোমার নখগুলো পচে গলে যেত।... আমি সবই দেখতে পাই জলের মতো পরিষ্কার। তাহলে কী ঠিক করলে বল। আরে বলেই ফেল না, তারপর চল শুতে যাই।'

'কী বলব?'

'আমাদের সঙ্গে চলবে কিনা? অন্যের কুঠুরিতে লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতকাল কাটাবে?'

গ্রিগোরি এই প্রশ্নটাই আশঙ্কা করছিল। ওকে একটা পথ বেছে নিতে হবে। হয় আবার এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো, ক্ষুধার্ত গৃহহীন

জীবন যাপন, একটা ব্যাকুলতা মনের ভেতরে চেপে রেখে তিলে তিলে মরা, যতক্ষণ না বাড়ির কর্তা তাকে সরকারের হাতে তুলে দেয়, অথবা নিজেই দোষ কবুল ক'রে পলিটব্যুরোর কাছে গিয়ে ধরা দেওয়া। নয়ত ফোমিনের দলে যোগ দেওয়া। পথ সে বেছে নিল। সারা সন্ধ্যা কালের মধ্যে এই প্রথম সোজা ফোমিনের চোখে চোখ রাখল, ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, 'আমার অবস্থা রূপকথার গল্পের সেই বীরের মতো। বাঁয়ে গেলে মরবে ঘোড়া, ডাইনে গেলে পড়বি মারা। . . . পথ আছে তিনটে, কিন্তু একটাও সে রকম পথ নয়। . . .'

'রূপকথার গল্প বাদ দিয়ে এবারে নিজেই বাছ। ওসব রূপকথা পরে হবে।'

'যাবার কোন জায়গা নেই, তাই বেছে নিতে হল।'

'কী সেটা?'

'তোমার ঠ্যাঙারে দলে যোগ দিচ্ছি।'

ফোমিন বিরক্ত হয়ে মুখ বেজার করে। গোঁফের ডগা কামড়ায়।

'ওই নামটা আবার কেন? ঠ্যাঙারে বলছ কেন? কমিউনিস্টরা ওই নাম দিয়েছে আমাদের। কিন্তু তোমার মুখে ওটা শোভা পায় না। আমরা স্রেফ বিদ্রোহী। এই হল আসল কথা, সাফ কথা।'

শুর অসন্তোষটা ছিল ক্ষণিকের। গ্রিগোরির সিদ্ধান্তে সে স্পষ্টই খুশি। খুশির ভাবটা সে গোপন করতে পারে না। সোৎসাহে হাতে হাত ঘসে সে বলল, 'আমাদের রেজিমেন্টে আরেকজনকে পেলাম আমরা। শুনছ ক্যাপ্টেন কাপারিন? আমরা তোমাকে একটা ট্রুপ দেবো মেলেখভ। যদি ট্রুপের ভার নিতে না চাও তাহলে কাপারিনের সঙ্গে স্টাফে থাকতে পার। আমার নিজের ঘোড়াটা তোমাকে দেবো। একটা বাড়তি ঘোড়া আমার আছে।'

বারো

ভোরের দিকে হাল্‌কা তুষারপাত হল। এখানে ওখানে জমে থাকা জলের ওপর নীলচে রঙের স্বচ্ছ বরফের আচ্ছাদন পড়ল। তুষার হয়ে দাঁড়াল কঠিন আর মচমচে। সদ্য পড়া দানা দানা বরফের আচ্ছাদন ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘোড়ার খুরগুলো গোল গোল অস্পষ্ট ছাপ ফেলে যাচ্ছে। যে সব জায়গায় গতকাল বরফ গলার ফলে ক্ষয়ে গিয়ে মাটি আর গত বছরের লেগে থাকা মরা ঘাস বেরিয়ে এসেছে, সেখানে ঘোড়ার খুরের চাপ ধপধপ চাপা আওয়াজ তুলে সামান্যই কেটে বসছে।

অভিযানে যাত্রার আগে গ্রামের বাইরে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে ফোমিনের দল। যে টহলদার দলটাকে আগে থাকতে সামনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দূরে বড় রাস্তার ওপর তার ছয়জন ঘোড়সওয়ার সেপাইকে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে।

ঘোড়া চালিয়ে গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এসে ফোমিন বলল, 'এই হল আমার সৈন্যদল! এমন সব ডাকাবুকো ছেলের দল নিয়ে শয়তানের শিঙও ভাঙা যায়!'

গ্রিগোরি সৈন্যদের সারির ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে বিষণ্ণ মনে ভাবে, 'তোমার এই সৈন্যদল নিয়ে একবার যদি আমার বুদিওন্নি স্কোয়াড্রনের পাল্লায় পড়তে ত আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তোমাকে ছাতু ক'রে ছেড়ে দিতাম!'

ফোমিন হাতের চাবুক দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী, দেখে কেমন মনে হয়?'

'বন্দীদের খুন করার ব্যাপারে হাত মন্দ চলে না, মরা সেপাইদের গা থেকে জামাকাপড় খুলে নিতেও ওস্তাদ। কিন্তু লড়াই করতে গেলে কেমন দাঁড়াবে জানি না,' বিরস কণ্ঠে গ্রিগোরি জবাব দিল।

জিনের ওপরে বসা অবস্থায় হাওয়ার দিকে পিঠ ঘুরিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফোমিন বলল, 'লড়াইয়ের সময়ও দেখতে পাবে ওদের কেরামতি। আমার এখানে যারা আছে তাদের বেশির ভাগই পল্টনের সেপাই। ওরা ডোবাবে না।'

জোড়া ঘোড়ার ছয়টা গাড়ি কার্তুজ আর রসদে বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সৈন্যব্যূহের মাঝখানে। ফোমিন ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে সৈন্যদলকে মার্চ করার হুকুম দিল। টিলার ওপর ওঠার পর সে আবার গ্রিগোরির কাছে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখছ আমার ঘোড়াটাকে? মনে ধরেছে ত?'

'দিব্যি ঘোড়া।'

ওরা দু'জনে অনেকক্ষণ নীরবে চলে। রেকাবের সঙ্গে রেকাবের ঠোকাঠুকি লাগে। শেষকালে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করে, 'তাতারস্কিতে যাবার কথা ভাবছ কি?'

'বাড়ির লোকদের জন্যে মন খারাপ লাগছে বুঝি?'

'একবার দেখার ইচ্ছে ছিল বৈকি।'

'তা দেখে আসা যেতে পারে। ভাবছি এই এখনই চির্-এর দিকে ঘুরে গেলে হয়। সেখানে কসাকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওদের একটু ঠেলেঠুলে জাগাতে পারলে মন্দ হত না।'

কিন্তু 'ঠেলা খেয়ে জেগে ওঠার' ব্যাপারে কসাকদের তেমন একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।... কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রিগোরি তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে। কোন গ্রাম বা জেলা-সদর দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ফোমিন হুকুম জারি করে স্থানীয় অধিবাসীদের সভা ডাকতে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বক্তৃতা দিত সে নিজে। কখন সখন তার বদলে দিত কাপারিন। ওরা কসাকদের হাতিয়ার ধরার ডাক

দিত, 'সোভিয়েত সরকার চাষীদের ওপরে যে বোঝা চাপিয়েছে' তার কথা বলত, এও বলত যে 'সোভিয়েত সরকারের উচ্ছেদ না ঘটালে তার অনিবার্য ফল হবে চরম সর্বনাশ'। ফোমিন অবশ্য কাপারিনের মতো অমন সাজিয়ে গুছিয়ে শুদ্ধ ভাবে বলতে পারত না, তবে তার ভাষার দাপট হত অনেক বেশি, কসাকদের বেশ বোধগম্য হত সে ভাষা। বক্তৃতার শেষে সে আওড়াত একই বাঁধা বুলি: 'আজ থেকে আমরা ফসল আদায়কারী দলের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি দিচ্ছি। ওদের ফসল জমা দেওয়ার জায়গায় আর ফসল নিয়ে যাবে না। নিষ্কর্মার ধাড়ি কমিউনিস্টগুলোকে খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে এখুনি। তোমাদের খেয়ে ওদের গায়ে তেল হয়েছে। কিন্তু অন্যের খবরদারি আর চলবে না। তোমরা স্বাধীন লোক। হাতিয়ার তুলে নাও, আমাদের সরকারকে সাহায্য কর! কসাকদের জয় হোক!'

কসাকরা মুখ গোমড়া করে নীরবে মাটির দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েদের জিভের কোন আগল থাকে না। ওদের ঘন সারির ভেতর থেকে চোখা চোখা সমস্ত বাক্যবাণ আর চিৎকার-চেঁচামেচি বর্ষিত হতে থাকে।

'তোমার সরকার ভালো বুঝলাম, কিন্তু সাবান এনেছ আমাদের জন্যে?'

'তোমার সরকার তুমি কিসে করে বয়ে বেড়াও? জিনের থলেতে নাকি?'

'তোমরা নিজেরা বেঁচে আছ কার ফসল খেয়ে শুনি?'

'এই এখনই ত দোরে দোরে ভিখ মাঙতে যাবে?'

'ওদের কাছে তলোয়ার আছে। কোন জিগ্‌গেসবাদ না ক'রেই মুরগী জবাই করতে শুরু করবে।'

'ফসল না দিয়ে উপায় কি? আজ তোমরা এখানে আছ, কিন্তু কাল কুকুর লাগিয়েও তোমাদের পাত্তা পাওয়া যাবে না। তখন জবাবদিহি করতে হবে ত আমাদেরই।'

'আমাদের স্বামীদের আর যেতে দিচ্ছি না তোমাদের সঙ্গে। নিজেরাই লড়াই কর গে!'

এই রকম আরও অনেক কটুকাটব্য মেয়েরা বর্ষণ করল ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে। লড়াইয়ের বছরগুলোতে তাদের সমস্ত দিক থেকে মোহমুক্তি ঘটেছে। নতুন যুদ্ধের কথায় তারা ভয় পায়। তাই ব্যাকুল হয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকে তাদের স্বামীদের।

ফোমিন উদাসীন ভাবে ওদের উলটো পালটা চিৎকার-চেঁচামেচি শোনে। সেগুলোর দাম যে কী তা ওর জানা আছে। ওরা যতক্ষণ না চুপ করে ততক্ষণ অপেক্ষা করে থাকে। তারপর কসাকদের দিকে ফেরে। এবারে কসাকরা বেশ যুক্তি দিয়ে সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

'আমরা চেষ্টা ক'রে দেখেছি। উনিশ সালে বিদ্রোহ ক'রে দেখেছি।'

'কী নিয়ে বিদ্রোহ করব? কিসের জন্যেই বা করব? আপাতত কোন দরকার দেখছি না।'

'এখন ফসল বোনার সময়। লড়াইয়ের সময় নয়।'

একদিন পেছনের সারি থেকে কে একজন চিৎকার ক'রে বলল, 'এখন ত বেশ মিঠে মিঠে বুলি আওড়াচ্ছ। উনিশ সালে যখন আমরা বিদ্রোহ করেছিলাম তখন কোথায় ছিলে শুনি? বড় দেরিতে তোমার টনক নড়েছে হে ফোমিন!'

গ্রিগোরি দেখতে পেল ফোমিনের চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল। কিন্তু বেশ সামলে নিল নিজেকে। উত্তরে কোন কথা বলে নি সেদিন।

প্রথম সপ্তাহে ফোমিন সভাগুলোতে মোটের ওপর শান্ত ভাবে শুনে গেল কসাকদের আপত্তি আর ওর অভিযানে সমর্থন জানাতে ওদের অমত। এমনকি মেয়েদের চিৎকার আর গালিগালাজও তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে নি। 'ও কিছু নয়। আমরা ওদের গোঁ ভাঙব,' গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলেছে। কিন্তু যখন ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে কসাক জনসাধারণের একটা বড় অংশই ওকে সুনজরে দেখছে না তখন সভায় যারা নিজেদের মতামত প্রকাশ করত তাদের প্রতি ওর আচরণ রাতারাতি পাল্‌টে গেল। ঘোড়া থেকে না নেমেই এখন সে বক্তৃতা দেয়। বক্তৃতার মধ্যে যতটা না আবেদন-নিবেদন থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে ধমকানি। কিন্তু ফল সেই এক। যাদের ওপর ওর এত আশা ভরসা ছিল সেই কসাকরা নীরবে ওর বক্তৃতা শোনে, আবার নীরবেই সভা শেষে যে যার কাজে চলে যায়।

এক গ্রামে ওর বক্তৃতার পর জবাব দিতে উঠল এক কসাক বিধবা। বিশাল ভারী চেহারা, শরীরের হাড়গুলো চওড়া। পুরুষালি গোছের হেঁড়ে গলা। পুরুষমানুষের মতোই জোরে হাত নেড়ে চোখেমুখে কথা বলে। বসন্তের দাগে ভরা তার চওড়া মুখে ক্রুর সঙ্কল্পের উচ্ছ্বাস। ওল্‌টানো পুরু ঠোঁটদুটো অনবরত কোঁচকাচ্ছে বিদ্রুপের বাঁকা হাসিতে। ফুলো ফুলো লাল হাতটা বাড়িয়ে ফোমিনকে দেখিয়ে সে যেন বিষোদ্গার ক'রে চলে। ফোমিন পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে জিনের আসনে।

'এখানে গোলমাল পাকাতে এসেছ কেন আবার? কোথায়, কোন্ গর্তে ঠেলে দিতে যাচ্ছ আমাদের কসাকদের? এই পোড়ার লড়াই আমাদের কম মেয়েকে বিধবা করেছে? কম ছেলেমেয়েকে অনাথ করেছে? আমাদের মাথার ওপর আবার নতুন ক'রে সর্বনাশ ডেকে আনতে চাইছ? এ কোন্ উদ্ধারকর্তা মহারাজের উদয় হল বুবেজ্‌নি গ্রাম থেকে? তুমি বরং নিজের ঘরদোর সামলাও গে, এই তাণ্ডব

বন্ধ কর, তারপর আমাদের শেখাতে এসো কী করে বাঁচতে হবে, কোন্ সরকার আমাদের বেছে নিতে হবে, কোন্‌টা নেওয়া ঠিক হবে না। তোমার নিজের ঘরে নিজের মাগই জোয়াল খুলে বেরিয়ে আসতে পারছে না – ও সব আমাদের ভালো জানা আছে! আর তুমি কিনা দিব্যি গোঁফ ফুলিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছ! তোমার নিজের ঘর গেরস্থালির দিকে একবার চেয়ে দেখ – হাওয়াতে কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছে হয়ত, নইলে কবে পড়ে যেত। কোথাকার আমার গুরুঠাকুর এলেন। চুপ করে আছিস যে বড়, ব্যাঙমুখো? আমি কি মিছে কথা বলছি?'

জনতার মধ্যে চাপা হাসির গুঞ্জন উঠল। বাতাসের মতোই মৃদু গুনগুনিয়ে উঠে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। ফোমিনের বাঁ হাতটা জিনের কাঠামোর ওপর ছিল। ধীরে ধীরে সে ঘোড়ার লাগাম হাতড়াতে থাকে। চাপা রাগে কালো হয়ে যায় তার মুখখানা। কিন্তু তবু চুপ করে থাকে। যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে সসম্মানে বেরিয়ে আসার একটা উপায় খুঁজতে থাকে মনে মনে।

বিধবাটি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মহা উৎসাহে বলে চলে, 'তাছাড়া কী তোমার সরকার, যে তাকে তুমি মদত দিতে বলছ?'

কোমরে হাত রেখে বিশাল জঙ্ঘা দোলাতে দোলাতে সে এগিয়ে যায় ফোমিনের দিকে। কসাকরা হাসিতে উপচে পড়া চোখগুলো মাটিতে নামায়। হাসি চেপে রেখে পথ ক'রে দেয় ওকে। তারা ঠেলাঠেলি ক'রে ভিড়ের মাঝখানে গোলমতন খানিকটা জায়গা খালি ক'রে দিল – যেন কোন নাচের আসর বসবে এখনই। . . .

'তোমার রাজত্বি তুমি সরে গেলেই আর থাকছে না,' নীচু মোটা গলায় বিধবা বলল। 'তোমার রাজত্বি চলে তোমার পেছন পেছন – এক জায়গায় ঘন্টাখানেকের বেশি টেঁকে না! আজ রাজা কাল ফকির – এই ত তোমার অবস্থা, তোমার সরকারেরও তাই!'

ফোমিন সজোরে ঘোড়ার পাঁজরায় লাথি মেরে ভিড়ের মধ্যে ঘোড়াটা চালিয়ে দিল। লোকজন চমকে সরে পড়ে এদিক ওদিক। মাঝখানের বড় গোল ফাঁকা জায়গাটাতে একা দাঁড়িয়ে থাকে সেই বিধবা মহিলাটি। জীবনে অনেক কিছুই দেখেছে সে। তাই ফোমিনের ঘোড়ার খোলা দাঁতের পাটি আর ক্রুদ্ধ ঘোড়সওয়ারের ফেকাসে মুখের দিকে সে তাকিয়ে থাকে অবিচলিত দৃষ্টিতে।

ঘোড়া চালিয়ে বিধবা স্ত্রীলোকটির প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে ফোমিন হাতের চাবুকখানা অনেকখানি উঁচুতে তোলে।

'চোপ্ রও হারামজাদী, কুচ্ছিত মাগী! . . . এখানে লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছিস!'

লাগামের টানে মুখ উঁচিয়ে ঘোড়াটা দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে ডাক্‌সাইটে কসাক

স্ত্রীলোকটির ঠিক মাথার ওপরে। ঘোড়ার মুখের কড়িয়াল থেকে এক দলা হালকা সবুজ ফেনা এসে পড়ল বিধবার মাথার কালো ওড়নার ওপর, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল তার গালে। হাতের এক ঝটকায় সেটা মুছে ফেলে সে এক পা পিছিয়ে গেল।

রাগে তার চোখদুটো জ্বলে উঠল। চোখ গোল গোল ক'রে ফোমিনের দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার ক'রে বলল, 'শুধু তুমিই কথা বলতে পার, আমরা পারব না?'

ফোমিন তাকে চাবুকের ঘা মারল না। চাবুক নেড়ে গর্জন ক'রে উঠল, 'ওরে হতচ্ছাড়ী বলশেভিক! তোকে চাবকে সিধে করব! এখনই হুকুম দেবো তোর ঘাগরা তুলে ডাণ্ডা মারার, তাহলে যদি তোর বুদ্ধিসুদ্ধি একটু খোলে!'

বিধবা এবারে আরও দু'পা পিছিয়ে গেল। তারপর আচমকা ফোমিনের দিকে পিছন ফিরে মাথা নীচু করে ঘাগরা ওপরে তুলে ধরল।

'ওরে আমার বীরপুরুষ! এটা কখনও দেখেছিস আগে?' বলে সে অদ্ভুত চটপট সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। ফের ফোমিনের মুখোমুখি হল। 'আমাকে? তুই আমাকে চাবকাবি? তোর বাবার ক্ষ্যামতা আছে? . . .'

ফোমিন ক্ষিপ্ত হয়ে থুতু ফেলল। ঘোড়াটা ভয়ে পিছিয়ে যেতে লাগাম টেনে তাকে সামলাল।

'বন্ধ কর বলছি বাঁজা বুড়ী! শরীরে মাংস অনেক আছে বলে গুমর দেখানো হচ্ছে, আঁ?' গলা চড়িয়ে কথাগুলো বলে ঘোড়াটাকে সে ঘুরিয়ে নিল। মুখের গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না।

জনতার মধ্যে উচ্চকিত চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল। ফোমিনের দলের একজন লোক তাদের কম্যাণ্ডারের মান সম্মান ধুলোয় গড়াগড়ি যায় দেখে মুখরক্ষা করতে গিয়ে কার্বাইন বন্দুকের বাঁটখানা ঝট ক'রে উচিয়ে ধরে বিধবার দিকে তেড়ে গেল। কিন্তু ওর চেয়েও দু'মাথা উঁচু এক জোয়ান কসাক তার চওড়া কাঁধ দিয়ে মহিলাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। শান্ত অথচ দস্তুরমতো দৃঢ় স্বরে বলল, 'খবরদার!'

গ্রামের আরও তিনজন লোক চটপট এগিয়ে এসে বিধবাকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল। তাদের একজনের বয়স অল্প, মাথায় ঝুঁটি, ফোমিনের লোকটার কানে কানে বলল, 'বন্দুক দোলাচ্ছ যে বড়, আঁ? মেয়েমানুষকে মারার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই। খেলা দেখাতে হয় দেখাও গিয়ে তুই টিলায় গিয়ে। খিড়কির উঠোনে সবাই বীরপুরুষ। . . .'

ফোমিন পায়ে পায়ে ঘোড়া চালিয়ে বেড়ার কাছে সরে গেল। রেকাবে পা রেখে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। কসাকদের ভিড়টা পাতলা হতে শুরু করেছে।

সে দিকে তাকিয়ে ফোমিন চেঁচিয়ে বলল, 'ভাইসব, তোমরা একটু ভালো ক'রে ভেবে দেখো! আজ ভালোয় ভালোয় বলছি। কিন্তু এক হপ্তার মধ্যে আবার ফিরে আসব – তখন অন্য ভাষায় কথা হবে!'

কেন যেন ওর মেজাজটা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল। ঘোড়াটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপা তুলে নাচছিল। রাশ টেনে সেটাকে সামলে হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা ঘাবড়ানোর পাত্র নই! ওসব মেয়েমানুষের (এরপর কতকগুলো অশ্রাব্য শব্দ ব্যবহার করল সে) দেখিয়ে আমাদের ঘাবড়ে দিতে পারবে না! বসন্তের দাগওয়ালা, আরও হরেক রকমের দাগওয়ালা ওরকম ঢের দেখা আছে আমাদের। আবার ফিরে আসব আমরা। তখন যদি নিজেদের ইচ্ছেয় তোমাদের কেউ আমাদের দলে নাম না লেখায় তাহলে জোয়ান কসাকদের সকলকে জোর ক'রে পল্টনে ভর্তি করব। একথা জেনে রেখো! তোমাদের সঙ্গে বাবা-বাছা ক'রে কথা কইবার বা তোমাদের মুখের দিকে হা পিত্যেশ ক'রে তাকিয়ে থাকার সময় আমাদের নেই!' জনতা ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াল। ভিড়ের মধ্যে হাসি আর সোৎসাহ আলাপ চলতে লাগল। ফোমিনের মুখে তখনও হাসি লেগে আছে। দলের লোকদের সে হুকুম দিল, 'ঘোড়ায় উঠে বসো!'

অনেক কষ্টে হাসি চাপতে গিয়ে গ্রিগোরির মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল তার নিজের ট্রুপের কাছে।

কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে সার বেঁধে ফোমিনের বাহিনী দেখতে দেখতে টিলার ওপর গিয়ে উঠল। তাদের চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল অতিথি সৎকারবিমুখ গ্রামখানা। গ্রিগোরি তখনও থেকে থেকে হাসছিল আর মনে মনে ভাবছিল, 'ভালো বলতে হবে যে আমরা কসাকরা ফুর্তিবাজ লোক। দুঃখের চেয়ে রসিকতাকেই আমরা বেশি আপন বলে ভাবি। ভগবান না করুন, আমরা যদি সব ব্যাপারেই গাম্ভীর্য বজায় রাখতাম তাহলে আমাদের যা জীবন তাতে কোন্ কালে ফাঁসিতে লটকে মরতে হত।' ফুর্তির মেজাজটা তার অনেকক্ষণ বজায় ছিল। শুধু মাঝখানে রাত্রিবাসের জন্য ওরা যখন বিরতি দিল তখন উৎকণ্ঠা ও তিক্ততার ভাব তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল, মনে মনে সে ভাবল কসাকদের হয়ত আর জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে না আর ফোমিনের সমস্ত পরিকল্পনাটা অনিবার্য ভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে।

তেরো

তখন বসন্তকাল। সূর্য প্রখর কিরণ দিচ্ছে। টিলার দক্ষিণের ঢালে বরফ গলতে শুরু করেছে। গত বছরের মরচে ধরা লালচে রঙের ঘাসে ঢাকা মাটি থেকে দুপুরের দিকে স্বচ্ছ বেগুনি ধোঁয়া ধোঁয়া ভাপ উঠছে। টিলার ওপরে,

যেখানে যেখানে সূর্যের তাপ পড়েছে, দোআঁশ মাটির ভেতরে গেঁথে বসা পাথরের চাঁইগুলোর নীচ থেকে দেখা যাচ্ছে কচি ঘাসের প্রথম উজ্জ্বল সবুজ ডগা। শরৎকালে যে জমিতে লাঙল দিয়ে রাখা হয়েছিল তা এখন বরফের কবল মুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। শীতের পরিত্যক্ত রাস্তাগুলো ছেড়ে দাঁড়কাকের দল এখন মাড়াই উঠোনে আর বরফগলা জলে ডোবা রবিশস্যের ক্ষেতগুলোতে উঠে আসছে। পাহাড়ী খাত আর খানার মধ্যে বরফ নীল হয়ে জমে আছে, জলীয় বাষ্পে টলটল করছে কানায় কানায়। সেখান থেকে এখনও বয়ে আসে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু এখনই, চোখে দেখা না গেলেও, দরীগুলোর ভেতরে বরফের নীচে কলকণ্ঠে বয়ে চলেছে বরফগলা জলের ক্ষীণ ধারা। বনেবাদাড়ে বসন্তের পুরো ছোঁয়া লেগেছে – পপলার গাছের গায়ে দুর্লক্ষ্য হলেও সবুজের স্নিগ্ধ আভা দেখা দিয়েছে।

চাষবাসের সময় এসে যাচ্ছিল। যত দিন যায় ততই যেন মিলিয়ে যেতে থাকে ফোমিনের ঠ্যাঙারে দল। প্রতিবারই রাত কাটানোর পর সকালে দু' একজনের আর কোন পাত্তা মেলে না। একবার ত একসঙ্গে প্রায় অর্ধেক টুপই হাওয়া হয়ে গেল। দলের আটজন লোক ঘোড়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিওশেন্‌স্কায়াতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল। জমি চাষ করতে হবে, ফসল বুনতে হবে। মাটির ডাক এসেছে, কাজ তাদের টানছে; তাই লড়াইয়ে কোন ফল হবে না বুঝতে পেরে ফোমিনের দলের অনেকে গোপনে দল ছেড়ে যে যার বাড়ি সরে পড়ছে। রয়ে গেল শুধু বেপরোয়া কিছু লোকজন, যাদের ফেরার কোন উপায় নেই, যাদের অপরাধ সোভিয়েত সরকারের চোখে এত বেশি যে ক্ষমার আশা করা যায় না।

এপ্রিলের প্রথম দিকে দেখা গেল ফোমিনের দলে ছিয়াশিজনের বেশি তলোয়ারধারী সৈন্য নেই। গ্রিগোরিও দলে রয়ে গেল। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সাহস ওর হল না। ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে ফোমিনের খেলা শেষ হয়ে গেছে, আজ হোক কাল হোক তার ঠ্যাঙারে দল ধ্বংস হবে। গ্রিগোরি জানত যে রেড আর্মির কোন নিয়মিত ক্যাভালরি ইউনিটের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষেই তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবু সে ফোমিনের দক্ষিণ হস্ত হয়ে রইল। মনে মনে ওর আশা ছিল এই ভাবে যা হোক তা হোক করে গরমকাল অবধি টেনে যাবে, তারপর দলের একজোড়া ভালোজাতের ঘোড়া হাতিয়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সটকান দেবে তাতারস্কির দিকে – সেখান থেকে আক্সিনিয়াকে নিয়ে চলে যাবে দক্ষিণে। দনের স্তেপভূমি বিশাল, বিস্তৃত, অনেক নির্জন পথঘাট আছে তার বুকে। গরমকালে সব রাস্তা খোলা, যে কোন জায়গায় আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। . . . সে ভাবে কোথাও ঘোড়াদুটোকে ছেড়ে দিয়ে আক্সিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলে যাবে কুবানে – জন্মভূমি থেকে অনেক দূরে, ককেশাসের পাহাড়গুলিতে।

সেখানে ডামাডোলের সময়টা কাটিয়ে দেওয়া। ওর মনে হয়, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

কাপারিনের উপদেশ শুনে ফোমিন ঠিক করেছিল দনে বরফ ভাঙা শুরু হওয়ার আগেই বাঁ তীরে গিয়ে উঠবে। খোপিওর প্রদেশের সীমান্তে অনেক বনজঙ্গল আছে। আশা ছিল তেমন প্রয়োজন হলে, সেখানে ঢুকে তাড়া খাওয়ার হাত থেকে গা বাঁচানো যাবে।

রিব্‌নি গ্রামের আরও ওপরের দিকে এসে ওদের দলটা দন পার হল। জায়গায় জায়গায় স্রোতের বেগ বেশি থাকায় বরফ ইতিমধ্যেই ভেঙে গিয়েছিল। এপ্রিলের উজ্জ্বল রোদে জল চিকচিক করছে রুপোলি আঁশের মতো। কিন্তু যেখানে শীতের সময় বরফের স্তরের হাত তিনেক উঁচু ক'রে পথ তৈরি হয়েছিল সেখানে দন নিশ্চল। কঞ্চির বেড়া ভেঙে এনে কিনারার কাছে অল্প জলের ওপর ফেলে তার ওপর দিয়ে এক এক ক'রে ঘোড়াগুলোকে ধরে ধরে পার করা হল। দনের ওপারে সেগুলোকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখার পর আগে একটা সন্ধানী দল পাঠিয়ে দেওয়া হল। খোঁজখবর নেওয়ার পর সকলে রওনা দিল ইয়েলান্‌স্কায়া জেলা-সদরের দিকে।

পরদিন ঘটনাক্রমে নিজেদের গ্রামের এক পড়শীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গ্রিগোরির। লোকটা এক চোখ কানা বুড়ো চুমাকোভ। বুড়ো যাচ্ছিল গ্রিয়াজনোভ্‌স্কিতে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে, এমন সময় গ্রামের কাছে দলটার সঙ্গে তার দেখা। বুড়োকে রাস্তা থেকে একপাশে ডেকে নিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'আমার ছেলেমেয়েরা বেঁচে বর্তে আছে ত?'

'ভগবান ওদের রক্ষে করুন গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, ভালোই আছে।'

'তোমার কাছে আমার একটা বড় অনুরোধ আছে দাদু। আমার তরফ থেকে ওদের আর আমার বোন ইয়েভ্‌দোকিয়া পান্তেলেয়েভ্‌নাকেও আমার একান্ত স্নেহ ভালোবাসা জানাবে, আর প্রোখর জিকভকেও। আক্সিনিয়া আস্তাখভাকে বোলো, শিগ্‌গিরই দেখা হবে, অপেক্ষা করে যেন। ওদের ছাড়া আর কাউকে কিন্তু বলবে না যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কেমন?'

'বলব কত্তা, ঠিক বলব! নিশ্চিন্ত থাকতে পার, যেমন যেমন দরকার ঠিক জানাব।'

'গাঁয়ের নতুন কোন খবর আছে কি?'

'সেরকম কিছুই নেই। সব আগের মতো চলছে।'

'কশেভয় এখনও চেয়ারম্যান আছে?'

'হ্যাঁ, সে-ই আছে।'

'আমার পরিবারের লোকজনকে উত্যক্ত করছে না ত?'

'সেরকম কিছু শুনি নি, ওদের কিছু করে না বলেই ত মনে হয়। তাছাড়া করবেই বা কেন? তোমার কাজের জন্য ওরা দায়ী হতে যাবে কেন?'

'গাঁয়ে আমার সম্পর্কে লোকে কী বলে?'

বুড়ো নাক ঝাড়ল, লাল কম্ফর্টারটা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গোঁফদাড়ি মুছল, তারপর এড়ানোর মতো ক'রে উত্তর দিল, 'ভগবান জানেন।... যার যা মনে আসে... নানা রকম কথা বলছে।... সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে শান্তি তোমরা শিগগিরই করে ফেলবে কি?'

কী উত্তর দেবে গ্রিগোরি? দলের আর সকলে এগিয়ে যেতে তাদের পিছু নেওয়ার জন্য ঘোড়াটা ছটফট করছিল। সেটাকে সামলাতে সামলাতে গ্রিগোরি মুচকি হেসে বলল:

'জানি না দাদু। এখনও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।'

'দেখা যাচ্ছে না কেমন? চের্কাসীয়দের সঙ্গে লড়াই করেছি আমরা, তুর্কীদের সঙ্গে লড়াই করেছি, কিন্তু শেষ অবধি শান্তি ত এসেছিল। অথচ তোমরা সকলে নিজের নিজের লোক হয়েও কিছুতেই মিটমাট করে নিতে পারলে না নিজেদের মধ্যে।... ভালো নয়, গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ। সত্যি বলছি, ভালো নয়। ভগবান দয়াময়, তিনি সবই দেখতে পান। তিনি তোমাদের কাউকে ক্ষমা করবেন না। আমার কথাটা মনে রেখো! খুনীরা, খাঁটি খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি করছে, থামানোর কোন নাম নেই – এর কি কোন অর্থ হয়? বেশ ত, একটু আধটু না হয় লড়াই করেছিলে... কিন্তু আজ চার বছর হতে চলল মারপিট করেই কাটবে? আমার বুড়োমানুষের বুদ্ধিবিবেচনায় বাপু এটাই বলে – আর নয়, এবারে ক্ষ্যামা দাও!'

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রিগোরি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে তার ট্রুপের নাগাল ধরতে। চুমাকোভের কানা চোখের কোটরটা জলে ভরে ওঠে। জামার আস্তিনে জলটা মুছে ফেলে। লাঠিতে ভর দিয়ে সে অনেকক্ষণ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। যে চোখটায় এখনও যুবকের মতো দৃষ্টির জোর আছে সেটা দিয়ে তাকিয়ে দেখে গ্রিগোরির চলে যাওয়া। ঘোড়ার পিঠে গ্রিগোরির বেপরোয়া ভঙ্গিটি দেখে মনে মনে তারিফ করে, আপন মনে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ভালো কসাক! সব গুণ আছে, স্বভাবচরিত্রও ভালো। কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল।... নিজের পথ থেকে সরে গেছে! চের্কাসীয়দের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত মানুষ। অথচ এ কী ওর মাথায় ঢুকেছে! কী ছাই ওর দরকার পড়েছে এই সরকার নিয়ে মাথা ঘামানোর? কী ভাবে এই কসাক ছোঁড়াগুলো? গ্রিশ্‌কা ছোঁড়াকে এসব কথা জিগ্যেস করে

কোন লাভও নেই অবিশ্যি, ওদের পুরো গুষ্টিটাই ওই রকম - একেবারে উচ্ছন্নে যাওয়া। . . . ওর বাপ পান্তেলেই - সেটাও ছিল একই ধাঁচের . . . প্যাঁচোয়া। আর ওর দাদু প্রকোফিকেও মনে আছে। . . . মানুষ ত নয়, বাঘা তেঁতুল যাকে বলে। . . . কিন্তু ওদের দলের আর সব কসাকরা যে কী ভাবে . . . ভগবান জানেন, মরে গেলেও আমার মাথায় ঢুকবে না!'

* * *

ফোমিন আজকাল গ্রাম দখল করলে কোন জনসভা ডাকে না। সে বেশ বুঝতে পেরেছে যে প্রচার অভিযান চালিয়ে কোন লাভ নেই। এখন নিজের লোকদের সামলে রাখতে পারলে হয়, নতুন লোক রিক্রুট করা ত দূরের কথা। আজকাল তার থমথমে চেহারা চোখে পড়ার মতো, কথাবার্তা সে আগের চেয়ে কম বলে। সান্ত্বনা সে খুঁজতে থাকে চোলাই মদের মধ্যে। যেখানে রাত্রিবাস করার সুযোগ পায় সেখানেই চলে বিষাদগ্রস্ত পানের আসর। দলের সর্দারের দৃষ্টান্ত দেখে বাকিরাও মদ খায়। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল। লুঠতরাজের ঘটনা আরও ঘন ঘন ঘটতে লাগল। ওদের দল এগিয়ে আসছে খবর পেয়ে সোভিয়েত সরকারে যারা চাকরি ক'রে তারা গা ঢাকা দেয়। তাদের ঘরদোর লুটপাট ক'রে ঘোড়ার পিঠে যা যা তোলা সম্ভব সব নিয়ে চলে যায় ওরা। অনেকের জিনের থলে অসম্ভব ফুলে ফেটে পড়ার উপক্রম হল। এক দিন গ্রিগোরি তার ট্রুপের একজন সেপাইয়ের কাছে একটা সেলাইকল দেখতে পেল। জিনের কাঠামোর ওপর লাগাম ছেড়ে দিয়ে মেশিনটা বাঁ হাতে বগলদাবা ক'রে আছে। চাবুকের ঘা লাগিয়ে তবেই গ্রিগোরি কসাককে তার লুটের মাল হাতছাড়া করাতে পারল। সেই দিন সন্ধ্যায় ফোমিন আর গ্রিগোরির মধ্যে বেশ খানিকটা কটু কথাবার্তা হয়ে গেল। ঘরে শুধু ওরা দু'জন ছিল। মদে চুর হয়ে ফোমিন বসে ছিল টেবিলের ধারে। তার চোখমুখ ফোলা। গ্রিগোরি বড় বড় পা ফেলে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল।

ফোমিন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ বোসো দেখি। চোখের সামনে অমন ছটফট ক'রে বেড়ানো ভাল্লাগে না বাপু!'

ওর কথায় কান না দিয়ে গ্রিগোরি আরও খানিকক্ষণ কসাক-বাড়ির ভেতরের ছোট ঘরটার ভেতরে ছটফটিয়ে পায়চারি ক'রে বেড়ায়।

শেষকালে সে বলল, 'আমার ঘেন্না ধরে গেছে ফোমিন! বন্ধ কর এই লুটতরাজ আর মদ খেয়ে হুল্লোড়বাজি!'

'কোন খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে নাকি কাল রাতে?'

'রসিকতার একটা সীমা আছে। . . . লোকে আমাদের সম্পর্কে যা-তা বলতে শুরু ক'রে দিয়েছে।'

ফোমিন অনিচ্ছাভরে বলল, 'দেখতেই পাচ্ছ ওদের দিয়ে কিছু করার উপায় নেই আমার।'

'কিছু করার চেষ্টাও তুমি করছ না।'

'হয়েছে, আমাকে শেখাতে এসো না। আর যাদের হয়ে তুমি বলতে এসেছ সেই লোকেরাও ভালো কিছু নয়। শালা শুয়োরের বাচ্চাদের জন্যে আমরা কষ্ট করছি, আর ওরা কিনা . . . আমি নিজের কথা ভাবি। ঢের হয়েছে।'

'নিজের কথাও তেমন ভাবো বলে ত মনে হয় না। মাতলামি করে ব্যস্ত, অত সময় কোথায়? আজ চারদিন হল তোমার চটক ভাঙার নাম নেই, বাকিরাও টেনে চলেছে। রাতে টহলদারী ঘাঁটিতেও চালিয়ে যাচ্ছে। তোমার মতলবটা কী বল ত? মাতাল অবস্থায় কোন গাঁয়ে আমরা ধরা পড়ে যাই আর আমাদের সবাইকে কেটে সাফ ক'রে ফেলে এটাই তোমার ইচ্ছে নাকি?'

'তুমি কি ভাব- আমরা তা থেকে পার পাব?' কাষ্ঠহাসি হাসল ফোমিন। 'একদিন না একদিন মরতে হবেই। . . . জানোই ত সেই কথাটা, পিঁপড়ের পাখা ওঠে . . .'

'তাহলে চল, কাল ভিওশেনস্কায়ায় গিয়ে নিজেরাই ধরা দিই, দু'হাত মাথার ওপরে তুলে বলি আমাদের নাও, আমরা ধরা দিচ্ছি।'

'না, আরও কিছুদিন আমোদ আহ্লাদ করে নেওয়া যাক। . . .'

গ্রিগোরি দু'পা অনেকখানি ফাঁক ক'রে টেবিলের উলটো দিকে দাঁড়াল।

'দেখ, আইনশৃঙ্খলা যদি ঠিক না কর, যদি এই লুটতরাজ আর মাতলামি বন্ধ না কর, তাহলে আমি তোমারি দল ভেঙে বেরিয়ে যাব, সঙ্গে তোমার অর্ধেক লোকও নিয়ে যাব,' শান্ত কণ্ঠে গ্রিগোরি বলল।

'এক বার চেষ্টা করেই দেখ না,' ফোমিন শাসানির ভঙ্গিতে টেনে টেনে বলল।

'চেষ্টা করতে হবে না, অমনিতেই হবে।'

'তুমি . . . তুমি আমায় ধমকাবে না বলে দিচ্ছি!' বলতে বলতে পিস্তলের খাপে হাত রাখে ফোমিন।

'পিস্তলের খাপ থেকে হাত সরাও! নইলে টেবিলের এই এপাশ থেকেই তলোয়ার চালিয়ে ধরে ফেলব!' খাপ থেকে চট করে তলোয়ারটা অর্ধেক বার ক'রে ফেলেছিল গ্রিগোরি। ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

ফোমিন টেবিলে হাত রাখল। হাসল।

'আচ্ছা আমাকে জ্বালাচ্ছ কেন বল ত? অমনিতেই যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ার যোগাড়, তার ওপর তুমি যত সব আজেবাজে কথা শুরু করেছ। তলোয়ার খাপে পোর বলছি। তোমার সঙ্গে কি একটু ঠাট্টাও করা যায় না? দেখ দেখি কী কড়া মেজাজ। এ যে একেবারে ষোল বছরের একটা মেয়ের মতো ...'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি কী আমি চাই, এখন সেটা ভালোমতো মাথায় রেখো। আমাদের এখানে সকলের মন তোমার মতো নয়।'

'জানি।'

'জান যখন তখন মনে রেখো। কালই হুকুম দিতে হবে সবাই যেন তল্পিতল্পা খালি করে। এটা আমাদের ঘোড়সওয়ার ইউনিট, মালটানা গাড়ি নয়। ওদের মনের ভেতরে গেঁথে দিতে হবে এই কথাটা। হুঁঃ' বলে কিনা আবার সাধারণ মানুষের জন্যে লড়াই করছে! লুটের মালের ভারে নুয়ে পড়ছে, গ্রামে গ্রামে সেই মাল বিক্রি করে বেড়াচ্ছে পুরনো আমলের ফিরিওয়ালাদের মতো। ... লজ্জায় আমি মরি। কী কুক্ষণে যে আমি তোমাদের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধেছিলাম।' রাগে ক্ষোভে ফেকাসে হয়ে গেল গ্রিগোরির মুখ। থুতু ফেলে জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

ফোমিন হো হো করে হেসে বলল, 'এখনও কোন ঘোড়সওয়ার দল আমাদের তাড়া করে নি। ... নেকড়ের যখন ভরপেট থাকে তখন যদি কোন শিকারী ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাকে তাড়া করে তাহলে সে ছুটতে ছুটতেই বমি ক'রে সব খাবার উগড়ে দেয়। আমার এই খানকির বাচ্চাগুলোও তেমনি। যেদিন সত্যি সত্যি চাপ আসবে আমাদের ওপর সেদিন সব ফেলে দিয়ে পালাবে। ঠিক আছে মেলেখভ, উত্তেজিত হয়ো না। সব ঠিক করে ফেলব! আসলে হয়েছে কি আমি নিজেও একটু উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাই ঢিলে দিয়েছিলাম। তবে এবারে রাশ টেনে ধরব। দল ভেঙে দেওয়া আমাদের চলবে না, সমস্ত ভোগান্তি একসঙ্গেই ভুগতে হবে।'

ওদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল। ধূমায়মান বাঁধাকপির ঝোলের বাটি নিয়ে ঘরে ঢুকল বাড়ির কর্ত্রী। তারপরই একদল সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হুড়মুড় ক'রে এসে ঢুকল চুমাকোভ।

কিন্তু আলোচনায় শেষ পর্যন্ত ফল হয়েছিল। পর দিন সকালে ফোমিন তল্পিতল্পা খালি করার হুকুম দিল, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখল সেই হুকুম কতখানি তামিল করা হচ্ছে। তল্লাশি চালানোর সময় একজন ঘাগী লুটেরা বাধা দিতে গিয়েছিল, লুটের মাল ছাড়ার ইচ্ছে তার ছিল না। ফোমিন সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যসারির মধ্যেই তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলল।

লাশটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় সে বলল, 'এই ভাগাড়ের মড়াটাকে হটাও এখান থেকে!' তারপর সারির লোকজনের ওপর চোখ বুলিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'হয়েছে শুয়োরের বাচ্চারা! আর সিন্দুক হাতড়ানো চলবে না! এই জন্যে কি তোমাদের জাগিয়ে তুলেছিলাম সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে? শত্রু যদি মরে যায় তার গা থেকে সব কিছু খুলে নিতে পার, এমনকি তোমাদের সেরকম প্রবৃত্তি হলে ভেতরের নোংরা প্যান্ট পর্যন্ত। কিন্তু পরিবারের গায়ে হাত তোলা চলবে না! আমরা মেয়েমানুষদের সঙ্গে লড়াই করছি না। এতে যে বাধা দেবে তার এই দশা হবে!'

সারির মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠে আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল।

শৃঙ্খলা যেন ফিরেও এলো। দিন তিনেক দলটা ছোটখাটো সংঘর্ষের মধ্যে স্থানীয় আত্মরক্ষাবাহিনীর ছোট ছোট দলগুলোকে ধ্বংস করতে করতে দনের বাঁ তীর ধরে এগিয়ে চলল।

শুমিলিনস্কায়া জেলায় আসার পর কাপারিন ভরোনেজ প্রদেশের সীমানায় ঢোকার প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবের পেছনে ওর যুক্তি ছিল যেহেতু ভরোনেজের সাধারণ লোকেরা সম্প্রতি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাই তাদের বিপুল সমর্থন ওরা পাবে। কিন্তু ফোমিন যখন কসাকদের কাছে তা ঘোষণা করল তখন তারা সকলে এক বাক্যে জানিয়ে দিল: 'নিজেদের প্রদেশ ছেড়ে আমরা কোথাও যাব না!' প্রতিবাদে দলের সকলে ছোট ছোট জোট পাকিয়ে সভা-সমিতি করতে লাগল। শেষকালে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হল। চারদিন ধরে দলটা কোথাও না থেমে ক্রমাগত পুবের দিকে সরে যেতে লাগল। সেই কাজানস্কায়া জেলা-সদর থেকেই লাল ফৌজের একটা ঘোড়সওয়ারদল ফোমিনের পায়ে পায়ে তাড়া করে আসছিল, কিন্তু ফোমিনের দল লড়াই এড়িয়ে গেল।

নিজেদের চলার পথের চিহ্ন মুছে ফেলা ওদের পক্ষে সোজা ছিল না, কারণ তখন বসন্তকাল, ক্ষেতের কাজ চলছে, স্তেপের সুদূরতম প্রান্তেও লোকজন গিজগিজ করছে। ওদের দলটা রাতের অন্ধকারে পথ পাড়ি দেয়। কিন্তু যেই ভোরের দিকে ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দেওয়ার জন্য কোথাও থামতে যায় অমনি শত্রুপক্ষের টহলদার ঘোড়সওয়ার সেপাইরা কাছে এসে উপস্থিত হয়, হাল্কা মেশিনগান থেকে পটপট করে ঘনঘন গুলি ছোঁড়ে। ফোমিনের লোকেরা গুলিগোলার মধ্যে আবার তাড়াতাড়ি ঘোড়াগুলোর মুখে লাগাম পরাতে শুরু করে। ভিওশেনস্কায়া জেলার মেলনিকভো গ্রাম পার হওয়ার পর বেশ চালাকি খাটিয়ে শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়া সম্ভব হল। ফোমিন তার সন্ধানী দলের কাছ থেকে খবর পেয়েছিল যে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর অধিনায়ক ইয়েগর জুরাভলিওভ বুকানোভস্কায়া

জেলার এক কসাক – লোকটা একগুঁয়ে গোছের, যুদ্ধের কলাকৌশল ভালোই জানে। এও জানতে পেরেছিল ঘোড়সওয়ার বাহিনীটা সংখ্যায় ওদের দলের প্রায় দ্বিগুণ, ছ'টা হালকা মেশিনগান তাদের আছে, আর আছে তাজা ঘোড়া যেগুলো দীর্ঘ পথ হাঁটে নি বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে নি। এই সব কথা ভেবেচিন্তে ফোমিন লড়াই এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করল। ওর মনে হল তাহলে দলের লোকজন আর ঘোড়াগুলো বিশ্রামের সুযোগ পাবে, তারপর না হয় সুবিধা বুঝে সম্মুখ যুদ্ধে না নেমে আচমকা হানা দিয়ে বাহিনীটাকে ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে। এই ভাবে ওদের নাছোড়বান্দার মতো পিছু লেগে থাকার হাত এড়ানো যাবে। সে এও ভেবেছিল যে শত্রুর ঘাড় ভেঙে মুফতে কিছু মেশিনগান আর রাইফেল বুলেটও হাতানো যাবে। কিন্তু ওদের হিসাবে ভুল হয়ে গিয়েছিল। গ্রিগোরি যা আশঙ্কা করেছিল সেটাই ঘটল আঠারোই এপ্রিল তারিখে স্লাশ্চেভ্স্কি ওক বনের প্রান্তে। আগের দিন সন্ধ্যায় ফোমিন আর তার দলের বেশির ভাগ সাধারণ সেপাই সেভাস্তিয়ানোভ্স্কি গ্রামে প্রচুর মদ টেনেছিল। গ্রাম থেকে ওরা বের হল ভোর বেলায়। রাত্রে প্রায় কারুরই ঘুম হয় নি, তাই অনেকে এখন জিনের আসনে বসে ঝিমুচ্ছে। সকাল ন'টা নাগাদ গুজোগিন গ্রামের কাছে তারা মার্চে বিরতি দিল। ফোমিন পাহারা বসিয়ে ঘোড়াগুলোকে দানা দেওয়ার হুকুম দিল।

পুব দিক থেকে প্রচণ্ড দমকা হাওয়া বইছে। কালচে বাদামী রঙের ধুলোবালির মেঘ দিগন্ত ঢেকে দিচ্ছে। স্তেপের মাঠের ওপর ঘন হয়ে ঝুলছে কুয়াশা। অনেক উঁচুতে কুয়াশার জটাজাল ভেদ ক'রে অস্পষ্ট সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে। হাওয়ায় উড়ছে সৈন্যদের গ্রেটকোটের কিনারা, ঘোড়াগুলোর লেজ আর কেশর। ঘোড়াগুলো হাওয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বনের প্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খাতলা কাঁটা ঝোপের মধ্যে আড়াল খোঁজার চেষ্টা করছে। ছুঁচের মতো চোখে এসে বিঁধছে ধুলোবালি। কোন কিছু ঠাহর করে দেখা কষ্টকর – এমন কি কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যেও।

গ্রিগোরি যত্ন করে তার ঘোড়ার মুখ আর ভিজে চোখের কিনারা মুছে দিল। ঘোড়ার মুখে খাবারের থলি ঝুলিয়ে সে এগিয়ে এলো কাপারিনের দিকে। কাপারিন তখন তার গ্রেটকোটের কোঁচড়ে করে ঘোড়াকে দানা খাওয়াচ্ছিল।

হাতের চাবুক তুলে জঙ্গলের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে গ্রিগোরি বলল, 'আহা, বিশ্রাম নেবার কী জায়গাই না বেছে নেওয়া হয়েছে!'

কাপারিন কাঁধ ঝাঁকাল।

'বুদ্ধুটাকে ও কথা আমি বলেছিলাম। কিন্তু ওকে বলে বোঝায় কার সাধ্যি?'

'আমাদের থামা উচিত ছিল হয় স্তেপের মাঠে নয়ত কোন গাঁয়ের শেষে।'

'আপনি কি মনে করেন বনের দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'শত্রু এখনও অনেক দূরে আছে।'

'শত্রু খুব কাছেও থাকতে পারে। এ ত আপনার পায়দল সৈন্য নয়!'

'বনটা ফাঁকা। সে রকম কিছু হলে সম্ভবত চোখে পড়বে।'

'নজর রাখবেটা কে? প্রায় সবাই ঘুমোচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে পাহারাদাররাও ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'গতকালের মদের আসরের পর দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা ওদের নেই, এখন ওদের ঠেলেও জাগানো যাবে না।' কাপারিন ভুরু কোঁচকাল, মনে হল যেন ওর যন্ত্রণা হচ্ছে। তারপর নীচু গলায় বলল, 'অমন নেতার পাল্লায় পড়ে আমাদের দফা রফা হয়ে গেল। লোকটা একেবারে ফাঁপা, মাথায় কিছু নেই, আকাট যাকে বলে! আপনি কেন ভার নিতে চান না? কসাকরা আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আপনি ভার নিলে ওরা খুশিমনে মেনে নেবে।'

শুকনো গলায় গ্রিগোরি বলল, 'আমার দরকার নেই। আমি আপনাদের এখানে দু'দিনের অতিথি।' নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসাবধানে মুখ ফসকে মনের কথাটা বেরিয়ে আসায় গ্রিগোরির আপসোস হচ্ছিল। সে সরে গেল তার ঘোড়ার কাছে।

কাপারিন কোঁচড় ঝেড়ে বাকি দানা কটা মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে গ্রিগোরিকে অনুসরণ করল। বনগোলাপের একটা ডাল ভেঙে শক্ত টসটসে কুঁড়িগুলো খুঁটতে খুঁটতে এগোতে লাগল সে। বলল, 'বুঝলেন মেলেখভ আমার মনে হয় আমরা যদি বড় রকমের কোন সোভিয়েত বিরোধী দলের সঙ্গে মিলতে না পারি তাহলে বেশিদিন টিকতে পারব না। এই ধরুন না কেন, মাস্‌লাকের দলে। জেলার দক্ষিণ দিকে কোথাও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে যাবার চেষ্টা করতে হবে, নইলে কোন্ দিন এখানেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।'

'এখন বানের সময়। দন পেরোনো যাবে না।'

'এখন নয়। জল যখন নেমে যাবে। তখন আমাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে। আপনার কী মনে হয়?'

একটু চিন্তা করে গ্রিগোরি উত্তর দিল, 'ঠিকই বলেছেন। এখান থেকে বেরোতে হবে। এখানে কিছু করার নেই।'

কাপারিন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সে সবিস্তারে বলতে শুরু করে কসাকদের কাছ থেকে যে সমর্থন তারা আশা করেছিল সেটা সত্য প্রমাণিত হয় নি। এখন ফোমিনকে যে করেই হোক বোঝাতে হবে যাতে সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এই এলাকায় ঘুরে না বেড়িয়ে আরও ক্ষমতাবান কোন বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ভাবে।

লোকটার বকবকানি শুনতে গ্রিগোরির আর ভালো লাগছিল না। সে মনোযোগ দিয়ে ঘোড়ার খাওয়া দেখছিল। ঘোড়াটা যেই থলের খাবার শেষ করল অমনি সে তার মুখ থেকে থলেটা খুলে নিল। ঘোড়ার মুখে বলগা এঁটে জিনের কষিগুলো টেনে বাঁধল।

'শিগ্‌গির বেরোচ্ছি না এ জায়গা ছেড়ে। খামোকা অত তাড়াহুড়ো করছেন,' কাপারিন বলল।

'আপনি বরং গিয়ে আপনার ঘোড়াটা তৈরি করে রাখুন। নইলে তখন জিন লাগানোর সময় পাবেন না,' গ্রিগোরি জবাব দিল।

কাপারিন ওকে একবার খুঁটিয়ে দেখল। এগিয়ে গেল মালগাড়ির সারির কাছে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তার নিজের ঘোড়াটা।

গ্রিগোরি লাগাম ধরে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে ফোমিনের কাছে গেল। আস্ত্রাখান আঙরাখাটা মাটিতে বিছিয়ে দু'পা অনেকখানি ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে অলস ভাবে সেদ্ধ মুরগীর একটা ডানা থেকে মাংস ছাড়িয়ে খাচ্ছিল ফোমিন। একটু সরে গিয়ে গ্রিগোরিকে ইঙ্গিতে পাশে বসতে বলল।

'এসো আমার সঙ্গে দুপুরের খানা খাও।'

'এখনই সরে পড়া দরকার এখান থেকে। খাবার সময় নয় এটা,' গ্রিগোরি বলল।

'ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে তারপর রওনা দেওয়া যাবে।'

'খাওয়ানো পরে যেতে পারে।'

'অত তাড়াহুড়োর কী আছে?' মুরগীর খালি হাড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আঙরাখায় হাত মোছে ফোমিন।

'এখানে আমাদের ধরে ফেলবে। জায়গাটা তার উপযোগী।'

'এখানে আমাদের ধরবে কী? আমাদের টহলদার দল এইমাত্র ফিরে এসেছে। তারা বলছে টিলা ফাঁকা। তার মানে দেখা যাচ্ছে জুরাভ্‌লিওভ আমাদের সন্ধান হারিয়ে ফেলেছে। তা না হলে এখনও লেজে লেজে ঘুরত। বুকানোভ্‌স্কি থেকে আক্রমণের কোন ভয় নেই। সেখানকার মিলিটারী কমিশনার মিখেই পাভ্‌লভ। ছোকরা লড়াকু বটে, তবে ওর লোকবল কম, আমাদের মুখোমুখি থোড়াই হতে যাবে। আমরা ভালোমতো জিরিয়ে নিই, এই বাতাসটা একটু পড়ে আসুক, তারপর রওনা দেওয়া যাবে স্লাশ্চেভ্‌স্কায়ার দিকে। বোসো, একটু মুরগী খাও। প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে ছাড়লে যে! তোমার কী হয়েছে বল ত মেলেখভ? কেমন যেন ভীতু হয়ে গেছ। শিগ্‌গিরই দেখা যাচ্ছে যে-কোন ঝোপঝাড় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে– তাহলে কতটা পথ ঘুরতে হবে একবার ভেবে দেখ!' ফোমিন হাত নেড়ে অনেকখানি জায়গা দেখিয়ে দিয়ে হো-হো ক'রে হাসতে থাকে।

গ্রিগোরি রেগে ফোমিনের মুণ্ডপাত করতে করতে সেখান থেকে সরে গেল। ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের ডালের সঙ্গে বেঁধে ওভারকোটের কিনারা দিয়ে হাওয়া থেকে মুখ আড়াল করে পাশেই শুয়ে পড়ল। বাতাসের শিস আর মাথার ওপর ঝুঁকে পড়া লম্বা লম্বা শুকনো ঘাসের মৃদু সুরেলা সন সন আওয়াজ তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল।

মেশিনগানের একটানা আওয়াজ শুনে সে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। গুলির আওয়াজ তখনও শেষ হয় নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই গ্রিগোরি তার ঘোড়ার বাঁধন খুলে নিয়েছে। সকলের গলার স্বর ডুবিয়ে ফোমিন গর্জন করে উঠল: 'সবাই ঘোড়ায় উঠে পড়!'

ডানদিকে বনের ভেতর থেকে আরও দু'-তিন দফায় কটকট আওয়াজ হল। জিনের আসনে উঠে বসে গ্রিগোরি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিস্থিতিটা আঁচ ক'রে ফেলল। ডান দিকে বনের প্রান্তের কাছে আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে জনা পঞ্চাশেক লাল ফৌজী। ধুলোর মেঘের আড়ালে তাদের প্রায় চোখেই পড়ে না। টিলার দিকে পালানোর পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে তারা। সূর্যের ম্লান আলোয় তাদের মাথার ওপর ঝিকমিক করছে খোলা তলোয়ারের নীলচে ফলা। হিমশীতল অথচ অতি পরিচিত সেই দ্যুতি। বনের ঠিক ভেতরে ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটা ঢিবি মতো জায়গা থেকে ওরা পাগলের মতো দ্রুত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি উজাড় ক'রে দিয়ে ঘা মেরে চলেছে। বাঁ দিকেও প্রায় অর্ধেক স্কোয়াড্রন লাল ফৌজী ছুটে আসছে নিঃশব্দে, তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে, দু'দিক থেকে ছড়িয়ে পড়ে পুরোপুরি ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে। এখন একটাই মাত্র পথ খোলা: বাঁ দিকের আক্রমণকারীদের পাতলা সারি ভেঙে বেরিয়ে দনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা। 'আমার পেছন পেছন চলে এসো!' চেঁচিয়ে ফোমিনকে এই কথা বলে খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল গ্রিগোরি।

শ'খানেক হাত দূরে সরে আসার পর সে পিছু ফিরে তাকাল। দেখতে পেল ফোমিন, কাপারিন, চুমাকোভ এবং আরও কয়েকজন সেপাই ওর হাত পঞ্চাশেক পেছনে পাগলের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। বনের ভেতরে মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু একেবারে ডান দিকের একটা তখনও ঘন ঘন ক্রুদ্ধ গুলিবর্ষণ ক'রে চলেছে ফোমিনের দলের সেই সমস্ত লোকজনের ওপর যারা মালগাড়ির কাছে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিল। কিন্তু সেই শেষ মেশিনগানটাও হঠাৎ এক সময় থেমে গেল। গ্রিগোরির বুঝতে বাকি রইল না যে লাল ফৌজীরা এবারে ওদের আশ্রয়ের জায়গায় এসে পড়েছে, পেছনে এখন তলোয়ারের কোপ শুরু হয়ে গেছে। লোকগুলোর চাপা মরিয়া চিৎকার আর মাঝে মধ্যে আত্মরক্ষার

খাতিরে দু'-একটা গুলি ছোঁড়ার শব্দে সে এটা আন্দাজ করতে পারছিল। কিন্তু পেছন ফিরে দেখার সময় তার ছিল না। সামনে বন্যাস্রোতের মতো এগিয়ে আসছে শত্রুসৈন্য। প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে তাদের কাছাকাছি আসতে আসতে সে তার লক্ষ্য স্থির ক'রে ফেললে। সামনের ঘোড়ায় এগিয়ে আসছে ভেড়ার চামড়ার খাটো কোর্তা গায়ে এক লাল ফৌজী। তার ছাইরঙা ঘোড়াটা তেমন তেজী নয়। বিদ্যুৎচমকের মতো. কোন এক অধরা মুহূর্তের মধ্যে গ্রিগোরির চোখে পড়ল ঘোড়াটার বুকের ওপরে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনায় ছাওয়া সাদা তারার আকারের পটিটা, ঘোড়সওয়ার, তার উত্তেজিত তাবুণ্যদীপ্ত লাল টকটকে মুখখানা আর তার পেছনে সুদূর দল পর্যন্ত বিস্তৃত গম্ভীর বিষণ্ণ স্তেপের বিপুল প্রান্তর। . . . আর একটি মাত্র মুহূর্ত . . . এবারে প্রতিপক্ষের আঘাত এড়িয়ে নিজেকেই হানতে হবে আঘাত। ঘোড়সওয়ার তখনও তার হাত পাঁচিশেক দূরে, এমন সময় গ্রিগোরি চট করে বাঁ পাশে হেলে পড়ল, শুনতে পেল সাঁই ক'রে মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া কেটে গেল তলোয়ার। পর মুহূর্তেই এক ঝটকা টানে সোজা হয়ে জিনের আসনে পড়ল গ্রিগোরি। লাল ফৌজী ঘোড়সওয়ারটি ঠিক সেই মুহূর্তে ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। গ্রিগোরির তলোয়ারের শুধু ডগাটা তার মাথা স্পর্শ করল। ওর হাত প্রায় উপলব্ধিই করতে পারে নি আঘাতের জোরটা। কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল লাল ফৌজী ঢলে পড়েছে, ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে জিনের ওপর থেকে, তার হলুদ চামড়ার কোর্তার পিঠ বয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘন রক্তের ধারা। ছাইরঙা ঘোড়াটার গতিবেগ এবারে কমে গেছে, দুলকি চালে বড় বড় পা ফেলে চলতে লাগল সেটা। একপাশে কাত হয়ে পাগলের মতো মাথাটা পেছনে হেলিয়ে এমন ভাবে চলছে যেন নিজের ছায়া দেখে নিজেই ভয় পেয়ে-গেছে। . . .

গ্রিগোরি ঝুঁকে পড়ে ঘোড়ার ঘাড় ঘেঁসে, অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নামিয়ে রাখে তলোয়ারটা। মাথার ওপর দিয়ে মৃদু সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে গুলি ছুটছে। ঘোড়ার কানদুটো শক্ত করে লেপ্‌টে ছিল মাথার সঙ্গে। তিরতির করে কাঁপছে তার দুই কান, কানের ডগায় জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গ্রিগোরি শুধু শুনতে পেল ওকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া বুলেটের প্রচণ্ড সাঁই সাঁই আওয়াজ আর হাঁপিয়ে ওঠা ঘোড়ার প্রবল নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস। আরও একবার পিছন ফিরে তাকাতে সে দেখতে পেল ফোমিন আর চুমাকোভকে। তাদের একশ' গজখানেক দূরে পিছিয়ে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে কাপারিন। আরও খানিকটা দূরে দু'নম্বর ট্রুপের মাত্র একজন সেপাই - খোঁড়া স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ। দু'জন লাল ফৌজী ওর ওপর এসে পড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আক্রমণ ঠেকাচ্ছে। বাকি যে আট-নয়জন লোক ফোমিনের পিছু ধাওয়া করেছিল তারা সকলে তলোয়ারের ঘায়ে কাটা পড়ল।

আরোহীহীন ঘোড়াগুলো শূন্যে লেজ তুলে এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছে। লাল ফৌজীরা তাড়া ক'রে তাদের ধরে ফেলছে। শুধু ফোমিনের দলের খ্রিবিত্‌কভের পাটকিলে রঙের উঁচু ঘোড়াটা নাক দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে তার মৃত মনিবকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ছুটে আসছে কাপারিনের ঘোড়ার পাশাপাশি। লোকটা পড়ার সময় রেকাব থেকে পা ছাড়িয়ে নিতে পারে নি।

বালির টিলাটা পার হওয়ার পর গ্রিগোরি তার ঘোড়াটাকে থামাল। লাফিয়ে জিন থেকে নেমে তলোয়ার খাপে পুরল। ঘোড়াটাকে মাটিতে শুইয়ে দিতে আরও কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। এই সহজ কৌশলটা গ্রিগোরি তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে শিখিয়েছিল। টিলার আড়াল থেকে সে চেম্বার খালি ক'রে দিয়ে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে গুলি ছোঁড়ার ফলে নিশানা ঠিক করতে পারছিল না। শুধু শেষ গুলিটা একজন লাল ফৌজীর ঘোড়া ধরাশায়ী করল। এর ফলে ফোমিনের দলের পঞ্চম সেপাইটি তাড়া খাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

গ্রিগোরির কাছাকাছি আসার পর ফোমিন চিৎকার ক'রে বলল, 'ঘোড়ায় উঠে বোসো! নইলে খতম হয়ে যাবে যে!'

* * *

পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল দলটা। গোটা দলের মধ্যে টিকে রইল মাত্র পাঁচজন। আস্তনভ্স্কি গ্রাম পর্যন্ত লাল ফৌজীরা ওদের পিছু ধাওয়া করেছিল। পলাতক পাঁচজন যখন গ্রামের পাশের বনের ভেতরে ঢুকে গা ঢাকা দিল একমাত্র তখনই শত্রুপক্ষ পিছু ধাওয়া করা ছেড়ে দিল।

যতক্ষণ ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে পালাচ্ছিল সেই সময়ের মধ্যে পাঁচজনের কেউই একটি কথাও বলে নি।

একটা ছোট নদীর কাছে এসে কাপারিনের ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ওটাকে কিছুতেই আর দাঁড় করানো গেল না। অন্যদের ঘোড়াগুলো তাড়া খেয়ে এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে তারা টলছিল, কোন মতে পা ফেলে চলছিল, তাদের গা থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ছিল চাপচাপ ঘন সাদা ফেনা।

ঘোড়া থেকে নামতে নামতে ফোমিনের দিকে না তাকিয়ে গ্রিগোরি বলল, 'ফৌজের কম্যাণ্ডার না হয়ে ভেড়া চরানো উচিত ছিল তোমার।'

ফোমিন কোন জবাব না দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে জিন খুলতে শুরু করল। কিন্তু শেষকালে জিন না খুলেই এক পাশে সরে গেল, ফার্ণঝোপে ঢাকা একটা উঁচু জায়গার ওপর বসে পড়ল।

ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'ঘোড়াগুলোকে তাহলে ছেড়েই দিতে হবে।'

'তারপর কী হবে?' চুমাকোভ জিজ্ঞেস করল।

'পায়ে হেঁটে ও ধারে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'রাত যতক্ষণ না নামে ততক্ষণ বনের মধ্যে কাটিয়ে দেবো। তার পর দন পার হব। এখনকার মতো বুবেজনি গাঁয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকা যাবে। ওখানে আমার অনেক আত্মীয়স্বজন আছে।'

কাপারিন ক্ষেপে চিৎকার করে উঠল, 'আবার আরেকটা বোকামি। তোমার কি ধারণা ওখানে ওরা তোমার খোঁজ করবে না? এখুন ত তোমার নিজের গাঁয়েই ওরা আশা করবে তোমাকে! কী করে যে তুমি ওকথা ভাবতে পারলে জানি না।'

ফোমিন হকচকিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'তাহলে কোথায় আমরা যাব?'

গ্রিগোরি জিনের থলে থেকে এক টুকরো রুটি আর কার্তুজগুলো বার করে নিয়ে বলল, 'আর কতক্ষণ চলবে তোমাদের এই তক্কাতক্কি? চলে এসো। ঘোড়াগুলোকে কোথাও বেঁধে রাখ, জিন খুলে ফেল ওদের। তারপর চল হাঁটা দেওয়া যাক। নইলে এখানেও আমাদের ধরে ফেলতে পারে।'

চুমাকোভ চাবুকটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে কাদার মধ্যে পায়ে দলতে দলতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমরা তাহলে পায়দল সেপাই হয়ে গেলাম।... আমাদের দলের সবাই গেল।... ওরে বাবা, কী রকম তুলোধুনো ক'রে দিল আমাদের! আজ যে জ্যান্ত ফিরে আসব ভাবতেই পারি নি।... মরণের মুখোমুখি হয়েছিলাম।...'

ওরা চুপচাপ ঘোড়ার জিন খুলে ফেলল। চারটে ঘোড়াকেই একটা এলডার গাছের সঙ্গে বাঁধল। তারপর একে একে সার বেঁধে এগোতে লাগল দনের দিকে। জিনগুলো ওরা হাতে ক'রে নিয়েছে। যতটা পারা যায় ঘন ঝোপঝাড়ের আড়াল ঘেঁসে চলার চেষ্টা করে ওরা।

চৌদ্দ

বসন্তকালে দন যখন দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে আর বানের জলে আশেপাশের সমস্ত নীচু ঘাসজমি ভেসে যায় তখন বুবেজনি গ্রামের উলটো দিকে বাঁ পারে ছোট্ট এক টুকরো জমি তারই মাঝখানে জেগে থাকে।

এই সময়টাতে দনের পারের পাহাড় থেকে অনেক দূরে দেখা যায় চারধারে বন্যার জলে থই থই এই দ্বীপটি, তার বুকে কচি বেতসের ঘন বন, শুক গাছ আর ডালপালা ছড়ানো ময়ূরকণ্ঠীরঙা উইলো ঝাড়।

গরমকালে সেখানে গাছপালার গা জড়িয়ে মাথা অবধি উঠে যায় বুনো স্বর্ণলতা। নীচের মাটি ছেয়ে যায় দুর্ভেদ্য কাঁটালতায়। পাকিয়ে পাকিয়ে ঝোপঝাড় বয়ে ওপরে ওঠে ফিকে নীল পুষ্পলতা। উর্বর মাটির পর্যাপ্ত রসে পুষ্ট হয়ে বনের ভেতরকার অল্পস্বল্প ফাঁকা জায়গাগুলোতে ঘন হয়ে গজায় লম্বা লম্বা ঘাস। মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যায় সেগুলো।

গরমকালে দুপুরবেলাতেও বনের ভেতরটা নিস্তব্ধ, আবছা অন্ধকারে ঢাকা, স্নিগ্ধ শীতল। শুধু বেনে-বৌ পাখির ডাক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, আর কোকিলগুলো যেন পাল্লা দিয়ে গুনে চলে কারও সাধের পরমায়ু। কিন্তু শীতকালে এ বন একেবারে শূন্য, ফাঁকা, মৃত্যুর নীরবতায় ঢাকা। শীতের সাদাটে আকাশের পটে বিষণ্ণ কালো দেখায় গাছের খাঁজকাটা মাথাগুলো। বছরের পর বছর শুধু নেকড়ে আর তাদের ছানাপোনারা নিরাপদ আশ্রয় পায় এখানকার গভীর ঝোপগুলোর মধ্যে, বরফের ভারে নুয়ে পড়া লম্বা লম্বা আগাছার ওপর গড়াগড়ি দিয়ে দিন কাটায়।

ফোমিনের দল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ফোমিন, গ্রিগোরি মেলেখভ আর অন্য যারা টিকে ছিল তারা এখন এই দ্বীপেই আস্তানা নিয়েছে। কোন রকমে জীবনধারণ করছে। ফোমিনের খুড়তুত ভাই রাতে নৌকো করে এসে সামান্য যেটুকু খাবার দিয়ে যায় তাই খেয়ে থাকতে হয়। আধপেটা খেয়ে থাকে, তবে ঘুমোয় তারা মনের সুখে, জিনের গদিগুলো মাথার নীচে দিয়ে। রাতে পালা ক'রে পাহারা দেয়। কেউ তাদের আস্তানার সন্ধান পেয়ে যাবে এই ভয়ে আগুন জ্বালায় না।

দ্বীপের চারধার ধুয়ে বানের জল প্রবল বেগে ছুটে চলে দক্ষিণ দিকে। পথে পুরনো পপলার গাছের সারির বাঁধ ভাঙে ঘোর গর্জনে। আবার ডুবে যাওয়া ঝোপঝাড়ের মাথাগুলো দুলিয়ে দিয়ে মৃদু গানের সুরে শান্ত কলতান তোলে।

এত কাছে জলের এই অবিরাম একটানা শব্দ শুনে শুনে অল্পদিনের মধ্যেই তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে গ্রিগোরি। খাড়া পারের কাছে সে প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে চেয়ে দেখে জলের বিপুল বিস্তার, আর দনের পারে ধোঁয়া ধোঁয়া বেগুনি কুয়াশায় ডুবে থাকা খড়িমাটির পাহাড়ের পাশের অংশগুলো। ওই কুয়াশার ওপারে আছে তার জন্মভূমি, তার নিজের গ্রাম, আক্সিনিয়া আর ছেলেমেয়েরা। ... ওর নিরানন্দ মনটা উড়ে চলে সেই দিকে। প্রিয়জনদের

কথা মনে হতে মুহূর্তের মধ্যে ওর বুকের ভেতরে দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে, একটা ব্যাকুলতায় ওর মনটা আনচান করতে থাকে, চাপা ঘৃণা জেগে ওঠে মিখাইলের ওপর। কিন্তু এসব উপলব্ধি সে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, আবার যাতে নতুন ক'রে সেই স্মৃতি মনে না জাগে তার জন্য চেষ্টা করে দন পারের পাহাড়গুলোর দিকে না তাকাতে। নিষ্ঠুর স্মৃতির রাশ আলগা ক'রে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। অমনিতেই ত তার জীবনটা কম দুর্বিষহ নয়। অমনিতেই মাঝে মাঝে ওর বুকটা এমন ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে যে মনে হয় বুঝি হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তার স্পন্দন থেমে গেছে, সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বোঝাই যায় ওর শরীরের জখমগুলো, যুদ্ধের নিদারুণ অভিজ্ঞতা আর টাইফাস রোগে ভোগার ফল ফলতে শুরু করেছে। গ্রিগোরি প্রতিমুহূর্তে শুনতে পায় হৃৎপিণ্ডের ক্লান্তিকর একটানা স্পন্দন। কখন কখন বুকের ভেতরে বাঁ দিকের বোঁটার তলায় টনটনে ব্যথাটা এমন অসহ্যরকমের তীব্র হয়ে ওঠে যে মুহূর্তের মধ্যে ওর ঠোঁট শুকিয়ে যায়, অনেক কষ্টে কাতরানি চেপে রাখে। কিন্তু এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা নিশ্চিত উপায় সে খুঁজে বার করেছে। বুকের বাঁ দিকটা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে চেপে শুয়ে থাকে অথবা ঠাণ্ডা জলে গায়ের জামাটা ভিজিয়ে নেয় – ব্যথাটা ধীরে ধীরে, যেন নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার শরীর থেকে দূর হয়।

চমৎকার, শান্ত দিনগুলো। শুধু মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে সাদা সাদা মেঘখণ্ড ভেসে চলে নির্মল আকাশে। বন্যার জলের ওপর তাদের ছায়া সরে যায় এক ঝাঁক রাজহাঁসের মতো, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় দূরের উপকূল ছুঁয়ে।

ভালো লাগে প্রচণ্ড কলকল শব্দে পারের কাছ দিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রখর স্রোতের আছড়ে পড়া দেখতে, জলরাশির কলকণ্ঠ শুনতে, সমস্ত ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে থাকতে। যাতে কষ্ট হয় এমন চিন্তা করতে আর মন চায় না। গ্রিগোরি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে চেয়ে দেখে খেয়ালী জলস্রোতের অবিরাম পাকে পাকে বিচিত্র রূপবদল। প্রতি মুহূর্তে তাদের আকার বদলে চলেছে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে নিস্তরঙ্গ স্রোত বয়ে যাচ্ছিল নলখাগড়ার ভাঙা ডাঁটা, দোমড়ানো পাতা আর শেকড়বাকড়সুদ্ধ ঘাসের চাপড়া বুকে নিয়ে, পর মুহূর্তেই সেখানে হঠাৎ দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত পাকানো এক ঘূর্ণিস্রোত। সে-ঘূর্ণির আশেপাশে যা কিছু ভেসে আসছে সবই সে গ্রাস করছে লোভীর মতো। আবার কিছুক্ষণ বাদেই সেই গহ্বরের আর কোন চিহ্ন রইল না। তার জায়গায় এখন ফুঁসে এলোমেলো পাক খেয়ে চলেছে ঘোলা জলের আবর্ত, উগরে বার করে দিচ্ছে কখনও নলখাগড়ার একটা

কালচে ধরা শেকড়, কখনও একটা থেঁতলানো শুক পাতা। কখনও বা কোথা থেকে কে জানে এক গোছা খড়ও ভেসে আসে।

সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের বেগনী লাল আভা ধিকি ধিকি জ্বলে। উঁচু পপলার গাছের আড়াল থেকে চাঁদ ওঠে। দনের বুকে সাদা হিমশীতল শিখার মতো ছড়িয়ে পড়ে চাঁদের আলো। যেখানে যেখানে হাওয়ায় কাঁপন লেগে জলের বুকে হাল্কা ছোট ছোট ঢেউ খেলে যায় সেখানে গাঢ় কালো জলের ফাঁকে ফাঁকে আলোর প্রতিফলন ঝলক দেয়। রাতে জলের কল্লোলের সঙ্গে মিশে ওই রকমই অবিরাম কলকণ্ঠে দ্বীপটাকে মুখরিত করে উত্তরের দিকে উড়ে চলে অসংখ্য বুনো হাঁসের ঝাঁক। কোন রকম শান্তিভঙ্গের ভয় না থাকায় পাখিগুলো প্রায়ই দ্বীপ ছাড়িয়ে, পুবদিকে এসে বসে। ওখানে ডোবা বনভূমির নিস্তরঙ্গ জলের বুকে করুণ পি পি শব্দে ডেকে চলে জলপিপি, পাতিহাঁসের দল প্যাঁক প্যাঁক ডাকে, নীচু গলায় ডাক ছাড়ে, নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করে বালিহাঁস আর বুনো হাঁসগুলো। এক দিন গ্রিগোরি নিঃশব্দে পায়ের কাছে এগিয়ে এসে দেখে দ্বীপের সামান্য দূরে বড় এক ঝাঁক রাজহাঁস। তখনও সূর্য ওঠে নি। দূরের বনরেখার ওপাশে ভোরের আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আকাশ। সেই আলো পড়ে জলের রঙ দেখাচ্ছে গোলাপী। ওই রকমই গোলাপী দেখাচ্ছে স্থির জলের বুকে বিশাল বিশাল রাজকীয় পাখিগুলো। সূর্যোদয়ের দিকে সগর্বে মাথা ফিরিয়ে রেখেছে তারা। তীরে সরসর আওয়াজ শুনতে পেয়ে জোরাল তূর্যনাদ ক'রে তারা পাখা মেলল; যখন বনের মাথায় গিয়ে ওঠে তখন তাদের তুষারধবল পাখনার আশ্চর্য ঝলকে ধাঁধিয়ে যায় গ্রিগোরির চোখ।

ফোমিন আর তার সঙ্গীসাথীরা যে যার মতো ক'রে সময় কাটিয়ে যাচ্ছে। স্তের্লিয়াদ্নিকভ লোকটি গেরস্থ ধরনের। সে তার খোঁড়া পাটা একটু আরাম ক'রে রেখে দিনরাত জামা-জুতো মেরামত করে, সযত্নে অস্ত্র সাফ করে। রাতে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শুয়ে ঘুমানোর ফলে কাপারিনের অপকার বৈ উপকার কিছু নেই। এখন সে ভেড়ার চামড়ার কোটে মাথা ঢেকে সারাদিন রোদে শুয়ে কাটায়, মাঝে মাঝে খুক খুক ক'রে কাশে। ফোমিন আর চুমাকোভ কাগজ কেটে তাস বানিয়ে তা-ই খেলে চলেছে এক টানা। গ্রিগোরি দ্বীপে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়, অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের ধারে বসে থাকে। ওদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বিশেষ হয় না – কথা যা বলার ছিল অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ওরা একসঙ্গে হয় শুধু খাওয়ার সময় আর সন্ধ্যাবেলা যখন পথ চেয়ে বসে থাকে ফোমিনের ভাইয়ের আশায়। একঘেয়ে জীবনে হাঁপিয়ে ওঠে ওরা। এরই মাঝখানে তাদের দ্বীপে বসবাসের এই এতকালের মধ্যে গ্রিগোরি একদিন দেখতে

পেল চুমাকোভ আর স্তেরলিয়াদনিকভ কেন যেন হঠাৎ খুশির মেজাজে কুস্তিতে মেতে উঠেছে। এক জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারা পাঁয়তারা কষে, হুপহাপ আওয়াজ করে, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করে ছোট ছোট চাপান-কাটান ছুঁড়ে মারে! তাদের পা গোড়ালি অবধি ডুবে গিয়েছে সাদা দানা দানা বালির স্তূপের মধ্যে। খোঁড়া স্তেরলিয়াদ্‌কভের গায়ের জোর যে বেশি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চুমাকোভ বেশি চটপটে। ওরা একে অন্যের কোমর জড়িয়ে ধরে, কাঁধজোড়া সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে পরস্পরের পায়ের দিকে নজর রেখে কালমিক কায়দায় কুস্তি লড়তে থাকে। উত্তেজনায় ওদের দু'জনের মুখ ফেকাসে হয়ে ওঠে, একাগ্রভাব ফুটে ওঠে ওদের চোখেমুখে। ঘন ঘন ভারী নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। গ্রিগোরি সোৎসাহে লক্ষ করে ওদের কুস্তি লড়া। সে দেখতে পেল চুমাকোভ একটা সুযোগ পেয়ে হঠাৎ এক ঝটকায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে সঙ্গে নিয়ে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, তারপর হাঁটু মুড়ে পায়ের ধাক্কায় তাকে মাথার ওপর দিয়ে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই বনবেড়ালের মতো নমনীয় চুমাকোভ চটপট লাফিয়ে উঠে শুয়ে পড়ল স্তেরলিয়াদ্‌কভের ওপর, ওর কাঁধদুটো চেপে ধরল বালির ভেতরে। স্তেরলিয়াদ্‌কভ হাঁপাচ্ছে আর হাসতে হাসতে গজরাচ্ছে, 'ওরে হারামজাদা! মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে... এমন কথা ত ছিল না!...'

'দুই জোয়ান মোরগের মতো খুব ত লেগেছিলে! অনেক হয়েছে! নয়ত আবার সত্যিকারের লড়াই শুরু হয়ে যাবে,' ফোমিন বলল।

না, লড়াই করার কোন মতলব ওদের আদৌ ছিল না। ওরা গলা জড়াজড়ি ক'রে শান্ত ভাবে বালির ওপর বসল। চুমাকোভ চাপা অথচ মিষ্টি খাদের গলায় দ্রুত তালে জুড়ে দিল একটা নাচের গান।

নিদারুণ হিমে উহু যাই জমে!
হিম যেন পড়ে বাঘের বিক্রমে।
নেকড়েটা জমে কাঁপে শরবনে,
গড়ের ভেতরে হি হি কাঁপে কনে।...

স্তেরলিয়াদ্‌নিকভ সরু চড়া গলায় সুর মেলায়। ওরা দু'জনে অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দর গলা মিলিয়ে গান গাইতে থাকে।

কনেটি বেরোয় ঘর ছেড়ে দোরে,
মিশকালো রঙা পশমী পোশাক
তার সিপাহীরে পরায় আদরে।...

স্তেলিয়াদ্‌নিকভ আর সামলাতে পারল না নিজেকে। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে খোঁড়া পায়ে বালি ছড়িয়ে তুড়ি মেরে ধেই ধেই ক'রে নাচতে শুরু ক'রে দিল। গান না থামিয়েই চুমাকোভ তলোয়ার হাতে নিয়ে বালির ভেতরে একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে বলল, 'দাঁড়া খোঁড়া শয়তান, একটু সবুর কর। তোর একটা পা যে একটু খাটো, সমান জায়গায় নাচা তোর চলবে না। . . . নাচতে হবে হয় ঢালু জায়গায়, নয়ত লম্বা পাখানা গর্তে আর অন্যটা বাইরে রেখে। তোর লম্বা পা'টা এই গর্তের ভেতরে রেখে নাচ দেখবি কেমন খাসা হয়। . . . নে, এবারে শুরু কর! . . .'

স্তেলিয়াদ্‌নিকভ কপালের ঘাম মুছে বাধ্য ছেলের মতো ভালো পা'টা চুমাকোভের খোঁড়া গর্তের ভেতরে ঢোকাল।

'আরে ঠিকই ত! এখন বেশ সুবিধে হচ্ছে,' সে বলল।

হাসতে হাসতে চুমাকোভের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। হাত তালি দিয়ে দ্রুত উচ্চারণে সে চালিয়ে যায় তার গান।

পাশ দিয়ে গেলে এসো মোর ঘরে
লক্ষ্মীটি, পাবে সোহাগের চুমু। . . .

স্তেলিয়াদ্‌নিকভও যে-কোন সাচ্চা নাচিয়ের মতো মুখে গাম্ভীর্য বজায় রেখে কৌশলে নাচতে শুরু করে, এমনকি মাঝে মাঝে অনেকটা বসার মতো ভঙ্গি ক'রে পা ছোঁড়ারও চেষ্টা করে। . . .

একের পর এক একই ধাঁচের দিনগুলো কাটে। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে সকলে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে কখন ফোমিনের ভাই আসবে। ওরা পাঁচ জনেই তীরে জড় হয়ে নীচু গলায় কথাবার্তা বলে, গ্রেটকোটের কিনারায় আগুন আড়াল করে সিগারেট টানে। ওরা ঠিক করে আরও এক সপ্তাহ এই দ্বীপে থাকবে, তারপর রাতে দন পেরিয়ে ডান তীরে গিয়ে উঠবে। সেখানে ঘোড়া যোগাড় ক'রে দক্ষিণ দিকে রওনা দেবে। শোনা যাচ্ছে এই এলাকার দক্ষিণে কোথাও মাস্‌লাকের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফোমিন তার আত্মীয়দের ওপর ভার দিয়েছে আশেপাশের কোন্ গ্রামে চড়ার উপযোগী ঘোড়া আছে সে ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। এছাড়া এলাকায় যা যা ঘটছে রোজ তাও বিশদে জানাতে বলেছিল। যে খবর ওদের কাছে এলো তা আশ্বাসজনকই বলতে হবে। ফোমিনের খোঁজ করা হয়েছিল দনের বাঁ তীরে। লাল ফৌজীরা য়েলান্‌স্কায়াতে হানা দিয়েছিল বটে, কিন্তু ফোমিনের বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছে।

একদিন সকালের খাবার খেতে বসে চুমাকোভ বলল, 'শিগ্‌গিরই এখান

থেকে সরে পড়া দরকার। এখানে বসে থাকার কী ছাই মানে হয়? চলো, কালই বেরিয়ে পড়ি!'

ফোমিন বলল, 'আগে ঘোড়ার খবর নিতে দাও। এত তাড়াহুড়োর কী আছে? আরেকটু যদি ভালো খাওয়াদাওয়া দিত আমাদের তাহলে আমি ত শীতের আগে এ আস্তানা ছাড়তাম না। দ্যাখ দ্যাখ, কী চমৎকার শোভা চারধারের। একটু জিরিয়ে নিই, তারপর আবার কাজে লাগা যাবে। ওরা আমাদের খুঁজে বার করুক, আমরা সহজে ওদের হাতে ধরা দিতে যাচ্ছি না। আমাদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, স্বীকার করি আমারই বোকামিতে, বড় দুঃখের কথা তাও ঠিক। কিন্তু এটাই সব নয়। আমরা আবার লোকজন জড় করব! ঘোড়ার পিঠে একবার উঠে বসতে পারলে হল – আশেপাশের গ্রামগুলোর ভেতরে যাব। এক হপ্তার মধ্যে এক শ' না হলেও অন্তত পঞ্চাশজনের একটা দল বানিয়ে ফেলতে পারব। আবার আমাদের লোকবল বাড়বে, মাইরি বলছি!'

'বাজে কথা! বোকার মতো আত্মবিশ্বাস!' বিরক্ত হয়ে কাপারিন বলে। 'কসাকরা আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে। আমাদের সঙ্গে তারা আসে নি, আসবেও না। যা সত্যি তার মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহস থাকা চাই। মিথ্যে আশা দিয়ে নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।'

'আসবে না মানে? এ তুমি কী বলছ?'

'মানে এই যে তারা আসবে না। প্রথমে যখন আসে নি, তখন পরেও আর আসবে না।'

'সে দেখা যাবে'খন!' রণং দেহি সুরে ফোমিন বলল। 'হাতিয়ার আমি ছাড়ছি না!'

'ওসব ফাঁকা বুলি,' ক্লান্ত স্বরে কাপারিন বলল।

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু!' রাগে আগুন হয়ে জোরে চিৎকার করে ওঠে ফোমিন। 'আতঙ্ক ছড়াচ্ছ কেন বল ত? তোমার ওই নাকি কান্না শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গেল আমার। তাহলে আর অত ঝামেলার কী দরকার ছিল? কী দরকার ছিল বিদ্রোহ করার? কলজের জোর যদি না থাকে তাহলে মরতে এসেছিলে কেন? তুমিই প্রথম আমাকে উসকেছিলে বিদ্রোহ করতে, আর এখন কিনা সরে পড়ার তাল করছ? চুপ করে আছ যে?'

'তোমাকে আমার কিছু বলার নেই। চুলোয় যাও তুমি, হাঁদা কোথাকার!' পাগলের মতো উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলে ভেড়ার চামড়ার কোটখানার কলার তুলে মুড়ি দিয়ে এমন ভাবে সরে গেল কাপারিন যেন তার শীত-শীত লাগছে।

'এই বড় ঘরের মানুষগুলোর সবারই গায়ের চামড়া এরকম পাতলা। একটুতেই গায়ে ফোস্কা পড়ে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোমিন বলে।

কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ বসে থাকে। বসে বসে শোনে জলের একটানা প্রবল গর্জন। তাদের মাথার ওপর দিয়ে কর্কশস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল একটা মাদী হাঁস, তার পেছন পেছন দুটো মর্দা হাঁস। শালিকের একটা ঝাঁক মহা উৎসাহে কিচিরমিচির করতে করতে নেমে আসছিল বনের ভেতরের ফাঁকা জায়গাটাতে, কিন্তু মানুষ দেখে একটা কালো বিনুনীর মতো পাক খেয়ে আবার ওপরে উঠে গেল।

খানিক পরে কাপারিন আবার ফিরে এলো। ফোমিনের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট ক'রে সে বলল, 'আমি আজ গাঁয়ে যেতে চাই।'

'কেন?'

'আজব প্রশ্ন! দেখতে পাচ্ছ না, কী ভীষণ সর্দি লেগেছে আমার, দু'পায়ে প্রায় দাঁড়াতেই পারছি না।'

'বেশ ত, তাতে কী? গাঁয়ে তোমার সর্দি সেরে যাবে নাকি?' ফোমিন এতটুকু বিচলিত না হয়ে শান্ত ভাবে প্রশ্ন করে।

'আমাকে অন্তত কয়েকটা রাত একটু গরমের মধ্যে কাটাতে হবে।'

'কোথাও যাওয়া চলবে না তোমার,' দৃঢ় কণ্ঠে ফোমিন বলে।

'এখানে আমাকে পচে মরতে হবে তাহলে?'

'সে তোমার যেমন ইচ্ছে।'

'কিন্তু কেন যেতে পারব না? রাতে এই ভাবে ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে আমি একেবারে শেষ হয়ে গেলাম।'

'গাঁয়ে যদি তুমি ধরা পড়ে যাও? সে কথা তুমি ভেবে দেখেছ কখনও? তাহলে আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে। আমি তোমাকে চিনি না ভেবেছ? প্রথম জেরাতেই তুমি আমাদের ধরিয়ে দেবে! এমন কি জেরার আগেই ভিওশেনস্কায়ার রাস্তাতেই সব বলে দেবে।'

চুমাকোভ হেসে ওঠে। মাথা নেড়ে সায় দেয় ওর কথায়। ফোমিনের সঙ্গে ও সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু কাপারিন গোঁ ছাড়ে না।

'আমাকে যেতেই হবে। তোমার কোন যুক্তিতর্কই আমার মত পাল্টাতে পারছে না।'

'আমি ত তোমাকে বলেইছি – চুপচাপ বসে থাক। এতটুকু নড়াচড়া চলবে না।'

'কিন্তু আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা কর ইয়াকভ ইয়েফিমভিচ - এই পশুর জীবন আমি আর কাটাতে পারছি না। আমার প্লুরিসি হয়েছে, বলা যায় না, হয়ত নিউমোনিয়াও হতে পারে!'

'সেরে যাবে। রোদে শুয়ে থাক, সেরে যাবে।'

কাপারিন তীক্ষ্নকণ্ঠে জানাল, 'যা-ই বল না কেন, আমি আজই যাব। আমাকে ধরে রাখার কোন অধিকার তোমার নেই। যা থাকে কপালে, আমি যাবই।'

ফোমিন সন্দিগ্ধ ভাবে চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকায়, তারপর চুমাকোভের দিকে চোখ টিপে ইশারা করে উঠে দাঁড়ায়।

'তোমাকে দেখে কিন্তু সত্যিই অসুখে পড়েছ বলে মনে হচ্ছে, কাপারিন। . . . তোমার বোধহয় খুব জ্বর। . . . দেখি কপালটা দেখি গরম কিনা!' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল কাপারিনের দিকে।

ফোমিনের মুখ দেখে ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝতে পেরে কাপারিন পিছু হটে গিয়ে তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, 'সরে যাও বলছি!'

'চেঁচিও না। অমন চেঁচাচ্ছ কেন? আমি শুধু দেখতে যাচ্ছিলাম। অমন ঘাবড়ে গেলে কেন?' ফোমিন এগিয়ে এসে কাপারিনের গলা টিপে ধরল। 'ধরা দেবার তাল করছ শালা?' চাপা গলায় ফিসফিস করে বলতে বলতে গায়ের সমস্ত জোর খাটিয়ে কাপারিনকে মাটিতে উলটে ফেলার চেষ্টা করে সে।

গ্রিগোরি তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অতি কষ্টে ওদের দু'জনকে ছাড়িয়ে দিল।

খাওয়াদাওয়ার পর গ্রিগোরি যখন তার কাচা কাপড়জামাগুলো ঝোপের গায়ে মেলে দিচ্ছে এমন সময় কাপারিন কাছে এসে বলল, 'আপনার সঙ্গে আড়ালে একটু কথা বলতে চাই। . . . আসুন এখানেই বসা যাক।'

ঝড়ে একটা পপ্লারগাছ পড়ে গিয়েছিল, তার পচা গুঁড়িটার ওপর গিয়ে বসল ওরা দু'জনে।

কাপারিন খুক খুক করে কেশে জিজ্ঞেস করল, 'এই ইডিয়টটার হাবভাব দেখে আপনার কী মনে হয়? আপনি সময়মতো বাধা দিয়েছিলেন, সেই জন্য আপনার কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আপনি মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন, একজন অফিসারের যোগ্য কাজ করেছেন। কিন্তু এ বড় ভয়ঙ্কর! আর ত পারা যায় না! আমরা যেন জন্তুজানোয়ার। . . . কতকাল গরম খাবার খাই নি! তার ওপর এই স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শুয়ে ঘুমানো . . . আমার ঠাণ্ডা লেগে গেছে, পাশের দিকে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে। আমার বোধহয় নিউমোনিয়া হয়েছে। একটু আগুনের পাশে বসতে, গরম ঘরে ঘুমোতে, ভেতরের জামাকাপড় বদল করতে কী ইচ্ছেই না আমার করছে। . . . আমি পরিষ্কার কাচা জামা আর বিছানার চাদরের স্বপ্ন দেখি। . . . না, আর পারছি না!'

গ্রিগোরি মৃদু হাসল।

'আরাম ক'রে লড়াই করবেন ভেবেছিলেন নাকি?'

'আচ্ছা, একে কি আপনি যুদ্ধ বলেন?' চটপট জবাব দেয় কাপারিন। 'এ

ত যুদ্ধ নয়, অনবরত এখানে ওখানে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ানো, সোভিয়েত কর্মচারীদের আলাদা আলাদা পেয়ে খুন করা, তারপর পালানো। যুদ্ধ বলা যেত তখনই যদি সাধারণ লোকজন আমাদের পক্ষ নিত, যদি বিদ্রোহ শুরু হত। কিন্তু এটা কী? একে কি লড়াই বলা যায়? . . . না, এ লড়াই নয়!'

'আমাদের আর কোন উপায় নেই। আমরা কি ধরা দিতে যাব তাই বলে?'

'না, তা নয়। কিন্তু কী করা যায়?'

গ্রিগোরি কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকায়। এই দ্বীপে শুয়ে বসে দিন কাটাতে কাটাতে যে চিন্তাটা একাধিকবার তার মাথায় এসেছে সেটাই সে বলল।

'কোন স্বাধীনতা যদি খারাপও হয় তা আরামের জেলখানার চেয়ে শতগুণে ভালো। জানেন ত, কথায় বলে: জেলের দেয়াল শক্ত, তবু শয়তানই তার ভক্ত।'

কাপারিন বালির ওপর একটা কাঠি দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছিল। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল, 'ধরা দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াইয়ের নতুন কোন উপায় বার করতে হবে। এই ইতরগুলোর কাছ থেকে আমাদের আলাদা হতেই হবে। আপনি একজন শিক্ষিত লোক . . .'

'আমি আবার কিসের শিক্ষিত লোক?' গ্রিগোরি কাষ্ঠহাসি হাসল। 'ওই শব্দটাই ত আমি উচ্চারণ করি অনেক কষ্টে।'

'আপনি একজন অফিসার।'

'সে দৈবক্রমে।'

'না, ঠাট্টা নয়। আপনি যে অফিসার, অফিসারদের মহলে ঘোরাফেরা করেছেন, খাঁটি লোকজন দেখেছেন আপনি। আপনি ত আর ফোমিনের মতো কোন সোভিয়েত ভুঁইফোঁড় নন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এখানে আমাদের থাকার কোন অর্থ হয় না। এ যে আত্মহত্যার সামিল। ওক বনের ভেতরে ও আমাদের আক্রমণের মুখে নিয়ে ফেলেছিল। ওর সঙ্গে আবার যদি আমরা আমাদের ভাগ্যের গাঁটছড়া বাঁধি তাহলে আবারও ওই একই বিপদের মুখে ও আমাদের নিয়ে যাবে। ওটা একটা বেহায়ার একশেষ। তাছাড়া বেজায় রকমের ইডিয়ট। ওর সঙ্গে থাকলে আমরা খতম হয়ে যাব।'

গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে ধরা আমাদের দেওয়া চলবে না, কিন্তু ফোমিনের সঙ্গ ছাড়তে হবে? ছেড়ে কোথায় যাব? মাস্লাকের কাছে?'

'না। সেও আরেক হঠকারী। তবে একটু বড় দরের এই যা। এখন আমি অন্য চোখে দেখছি ব্যাপারটা। যাওয়া দরকার ঠিকই, তবে মাস্লাকের কাছে নয়। . . .'

'তাহলে কোথায়?'

'ভিওশেন্‌স্কায়ায়।'

গ্রিগোরি বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকায়।

'আবার সেই পুরনো কথা। ও আমার পোষাবে না।'

কাপারিনের চোখদুটি জ্বলজ্বল করে উঠল। তীব্র দৃষ্টিতে গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আপনি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন নি মেলেখভ? আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?'

'সম্পূর্ণ।'

'অফিসার হিসাবে আপনি হলফ ক'রে বলছেন?'

'সত্যিকারের একজন কসাকের মতো আমি কথা দিচ্ছি।'

ফোমিন আর চুমাকোভ ঘাঁটির কাছে কোন একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। কাপারিন সে দিকে দৃষ্টিপাত করল। ওরা বেশ খানিকটা দূরে ছিল। কাপারিনের কথাবার্তা ওদের কানে না যাওয়ারই কথা। তবু গলার স্বর নামিয়ে সে বলল, 'ফোমিন আর তার দলের লোকদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী আমি জানি। ওদের মধ্যে আপনিও আমারই মতো বিজাতীয়। কী কারণে আপনি সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছেন তা জানার কোন আগ্রহ আমার নেই। আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি তাহলে আপনার অতীত আর ওদের কাছে ধরা পড়ার ভয়ই বোধহয় সেই কারণ, তাই না?'

'আপনি বললেন, কারণ জানার আগ্রহ আপনার নেই।'

'হ্যাঁ ঠিকই। কথার কথা বললাম আর কি। এখন নিজের সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলি। আমি এককালে অফিসার ছিলাম, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলের সদস্যও ছিলাম। পরে আমি ভেবেচিন্তে আমার রাজনৈতিক মতামত পুরোপুরি পালটে ফেলেছি।... একমাত্র রাজতন্ত্রই রাশিয়াকে বাঁচাতে পারে! একমাত্র রাজতন্ত্র! ঈশ্বরের অপার করুণাই নির্দেশ করছে এই পথে আমাদের দেশের মুক্তি। সোভিয়েত সরকারের প্রতীক কী? হাতুড়ি আর কাস্তে – মানে, 'মোলোত' আর 'সের্প', তাই ত?' এই বলে কাপারিন একটা কাঠি দিয়ে বালির ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখল 'ম-ও-ল-ও-ত' আর 'স-এ-র-প' কথাদুটো। তারপর প্রবল উত্তেজনায় জ্বলজ্বলে চোখে একদৃষ্টে তাকাল গ্রিগোরির মুখের দিকে। এবারে উলটো দিক থেকে পড়ুন। পড়লেন? বুঝতে পারছেন? প-র-এ-স-ত-ও-ল-ও-ম – 'প্রেস্‌তোলোম' – মানে? 'প্রেস্‌তোল'* অর্থাৎ একমাত্র

---

* লক্ষণীয়, কথার খেলা। – অনুঃ

রাজসিংহাসনের মারফতই খতম হবে বিপ্লব আর বলশেভিক শাসনক্ষমতা। জানেন এই রহস্য যখন আমি জানতে পারি তখন এক অলৌকিক উপলব্ধিতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। আমার রোমাঞ্চ হয়, কেন না, বলতে পারেন এ হল ঈশ্বরের অঙ্গুলিনির্দেশ। তিনিই যেন আমাদের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভাবের অবসানের নির্দেশ দিচ্ছেন। . . .'

উত্তেজনায় কাপারিনের শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হল। সে চুপ ক'রে গেল। গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। ওর তীব্র দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা ক্ষ্যাপাটে ভাব ফুটে উঠেছিল। কিন্তু গ্রিগোরির মধ্যে রোমাঞ্চের এতটুকু লক্ষণ দেখা গেল না, এমন একটা রহস্য উদ্‌ঘাটনের কথা শুনে কোন অলৌকিক শিহরণ সে অনুভব করল না। জগতের যে কোন বস্তু সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি চিরকাল সাদাসিধে ও প্রকৃতিস্থ ধরনের। তাই উত্তরে সে বলল, 'এটা কোন অঙ্গুলিনির্দেশ নয়। জার্মান যুদ্ধের সময় আপনি লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন?'

প্রশ্নটা শুনে কাপারিন একটু হকচকিয়ে গেল। চট করে তার মুখে জবাব জোগাল না।

'ও কথা জিগ্‌গেস করছেন কেন বলুন ত? না, সরাসরি ফ্রন্টে আমি ছিলাম না।'

'তাহলে যুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন? ফ্রন্টলাইনের পেছনে?'

'হ্যাঁ।'

'সব সময়?'

'হ্যাঁ, না, মানে সব সময় নয়। তবে বেশির ভাগ সময়। কিন্তু কেন? ও কথা জিগ্‌গেস করছেন কেন?'

'আমি ফ্রন্টে আছি সেই চৌদ্দ সাল থেকে আজ অবধি – অবিশ্যি মাঝে সামান্য কিছু কিছু সময় বাদ দিয়ে। তাই ওই যে অঙ্গুলিনির্দেশের কথা বলছিলেন না . . . কিসের ওসব অঙ্গুলিনির্দেশ যখন ঈশ্বরই নেই? ওসব বাজে বিশ্বাস আমার বহুকাল হল কেটে গেছে। পনেরো সাল থেকে লড়াই দেখে দেখে শেষকালে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর বলে কারও অস্তিত্ব নেই! যদি থাকত তাহলে এতখানি বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষকে ফেলার কোন অধিকার তাঁর আছে বলে মনে করি না। আমরা যারা ফ্রন্টে লড়াই করেছি তারা ঈশ্বরকে বাতিল করে দিয়েছি, বুড়ো আর মেয়েমানুষদের জন্যে রেখে দিয়েছি তাঁকে। ওঁকে নিয়ে তারাই সান্ত্বনা পাক। তাই কোন আঙুল টাঙুলের ব্যাপার নেই, রাজতন্ত্র হতে পারে না। লোকে চিরকালের মতো তা চুকিয়ে দিয়েছে। আর অক্ষর ওলটপালট করে আপনি যা দেখাচ্ছেন, মাফ করবেন, এ নেহাৎই ছেলেমানুষী খেলা – তার বেশি কিছু নয়। এদিয়ে আপনি কী বলতে চাইছেন আমি এতটুকু

বুঝতে পারছি না। আপনি আমাকে আরও সহজ ভাষায়, সংক্ষেপে বলুন। আমি ক্যাডেট কলেজে কখনও পড়াশুনা করি নি, আমার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় বেশি দূর নয়, যদিও অফিসার আমি হয়েছিলাম বটে। আমি যদি আরেকটু শিক্ষিত হতাম তাহলে হয়ত চারপাশে বন্যার জলে থই থই দ্বীপে একটা বুনো জানোয়ারের মতো আপনাদের সঙ্গে বসে থাকতাম না।' শেষের কথাগুলোর মধ্যে সে তার আক্ষেপের ভাব এতটুকু গোপন রাখল না।

'ওটা বড় কথা নয়,' কাপারিন তড়বড় ক'রে বলে উঠল। 'আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন কি করেন না সেটা বড় কথা নয়। সে হল আপনার নিজস্ব বিশ্বাস আর বিবেকের ব্যাপার। ঠিক তেমনি, আপনি রাজতন্ত্রী না সংবিধান সভায় আপনার বিশ্বাস, নাকি আপনি স্রেফ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী একজন কসাক তাও বড় কথা নয়। আসল কথা হল আমাদের একসঙ্গে বেঁধেছে সোভিয়েত সরকার সম্পর্কে আমাদের মনের মিল। আপনি এটা স্বীকার করেন ত?' 'বলে যান।'

'আমরা ভরসা করেছিলাম যে কসাকরা সকলে একসঙ্গে বিদ্রোহ করবে, তাই কি না? কিন্তু সে আশাভরসা আমাদের চুরমার হয়ে গেল। এখন এই অবস্থার জট ছাড়িয়ে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াই পরেও করে যেতে পারে—তবে ফোমিনের পরিচালনায় কোন মতেই নয়। এখন বড় কথা হল প্রাণ বাঁচানো। তাই আপনার সঙ্গে আমি জোট বাঁধার প্রস্তাব দিচ্ছি।'

'কিসের জোট? কার বিরুদ্ধে?'

'ফোমিনের বিরুদ্ধে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'সবই জলের মতো পরিষ্কার। আমি আপনাকে আমার সহযোগী হতে বলছি। ...' কাপারিনের চোখেমুখে স্পষ্টই উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে ওঠে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে বলে, 'আমরা দু'জনে ওদের তিনজনকে খুন ক'রে ভিওশেনস্কায়ায় চলে যাব। এবারে বুঝলেন ত? এতে আমরা প্রাণে বাঁচব। এরকম একটা ভালো কাজের ফলে সোভিয়েত সরকারের শাস্তির হাত থেকে আমরা রেহাই পাব। আমরা বেঁচে যাচ্ছি! বুঝতে পারছেন, আমরা বেঁচে যাচ্ছি! ... আমরা প্রাণে বেঁচে যাচ্ছি! আর ভবিষ্যতে সুযোগ পেলেই আমরা যে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব সে ত বলাই বাহুল্য। তবে একমাত্র তখনই যখন সত্যিকারের ভালো সুযোগ পাওয়া যাবে। এই হতভাগা ফোমিনটার পাল্লায় পড়ে যে হঠকারিতা আমরা করেছি তা আর হবে না। আপনি রাজী? মনে রাখবেন, আমাদের এই হাল ছাড়া অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার এটাই একমাত্র উপায়। শুধু তা-ই নয়, চমৎকার উপায়ও বলতে পারেন।'

'কিন্তু কী ভাবে করা যাবে কাজটা?' জিজ্ঞেস করে গ্রিগোরি। ভেতরে ভেতরে রাগে তার সর্বাঙ্গ রি-রি ক'রে জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু অতি কষ্টে মনের ভাবটা চেপে রাখল সে।

'আমি সব ভালো ক'রে ভেবে রেখেছি। কাজটা আমরা হাসিল করব রাতের বেলায়, তলোয়ার দিয়ে। পরের দিন রাতে যে কসাকটা আমাদের খাবারদাবার আনে সে এলে আমরা দন পার হব, ব্যস। অতি সহজ সরল, কোন বিশেষ চালাকি খাটানোরও দরকার নেই!'

বাইরে ভালোমানুষির ভাব বজায় রেখে মৃদু হেসে গ্রিগোরি বলল, 'বাঃ, চমৎকার! কিন্তু বলুন ত কাপারিন, সকালে যখন আপনি গা গরম করার জন্যে গাঁয়ে যেতে চেয়েছিলেন... তখন কি ভিওশেনস্কায়াতেই যাবার ইচ্ছে ছিল আপনার? ফোমিন তাহলে ঠিকই ধরেছিল?'

গ্রিগোরির ভালোমানুষ ধরনের হাসি হাসি মুখখানা ভালোমতো নজর ক'রে দেখল কাপারিন, তারপর নিজেই নিভে গিয়ে একটু যেন অপ্রতিভের হাসি হাসল।

'খোলাখুলি বলতে গেলে কি তা-ই বটে। বুঝলেন কিনা, যখন নিজের চামড়া বাঁচানোর প্রশ্ন আসে তখন পন্থার বাছবিচার ক'রে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'আপনি আমাদের ধরিয়ে দিতেন?'

'হ্যাঁ, তা দিতাম,' কাপারিন অকপটে স্বীকার করে। 'তবে আপনি যদি এখানে, এই দ্বীপে ধরা পড়তেন তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে ঝামেলার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতাম।'

'কিন্তু আপনি একা আমাদের সকলকে খুন ক'রে ফেললেন না কেন? রাতের বেলায় ত সেটা সহজেই করা যেত।'

'তাহলে ঝুঁকি নেওয়া হত। প্রথম গুলির শব্দে বাকিরা...'

'হাতিয়ার রাখ!' ঝট করে নাগান পিস্তলটা বার করে চাপা গলায় গ্রিগোরি বলে উঠল। 'রাখ বলছি, নইলে এই এখানেই গুলি করে মেরে ফেলব! আমি এই উঠে দাঁড়াচ্ছি, পিঠ দিয়ে আড়াল করছি, যাতে ফোমিনের চোখে না পড়ে। পিস্তলটা আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দাও। কী হল? গুলি ছোঁড়ার কথা মনেও এনো না! চেষ্টা করেছ কি মরেছ।'

কাপারিন বসে রইল। ওর মুখ মড়ার মতো ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল। রক্তশূন্য ঠোঁটদুটো কোন রকমে নেড়ে ফিসফিস ক'রে সে বলল, 'আমাকে প্রাণে মারবেন না!'

'তা মারব না। কিন্তু অস্ত্র চাই।'

'আপনি আমায় ধরিয়ে দেবেন।...'

কাপারিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরতি গাল বয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বিতৃষ্ণায় আর অনুকম্পায় ভুরু কোঁচকায় গ্রিগোরি, গলা চড়িয়ে বলে, 'ছাড় বলছি পিস্তল! ধরিয়ে দেবো না, তবে দেওয়াই উচিত ছিল! কী প্যাঁচোয়া লোক দেখ। ওঃ কী প্যাঁচোয়া!'

কাপারিন তার রিভলভারটা গ্রিগোরির পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল।

'আর ব্রাউনিংটা? ব্রাউনিংটাও দাও। ওটা তোমার ভেতরের জামার বুকপকেটে আছে।'

কাপারিন ঝকঝকে নিকেল প্লেট করা ব্রাউনিংটা বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দু'হাতে মুখ ঢাকল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে, কান্না চাপতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

'চোপ রও হারামজাদা!' খাঁঝিয়ে উঠল গ্রিগোরি। লোকটাকে একটা চড় কষিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল গ্রিগোরির। অনেক কষ্টে সে সামলে নিল নিজেকে।

'আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবেন। আমি গেলাম এবারে।'

'বললাম যে ধরিয়ে দেবো না। কিন্তু এই দ্বীপ যেই ছেড়ে যাব আমরা, সঙ্গে সঙ্গে যেদিকে পার সটকে পড়ো। তোমার মতো লোককে কারও দরকার নেই। নিজেই নিজের মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজ গে।'

কাপারিন মুখ থেকে হাত সরাল। ওর লাল টকটকে মুখটা চোখের জলে ভিজে উঠেছে, চোখদুটো ফোলা ফোলা, আর নীচের চোয়ালটা থরথর করে কাঁপছে। বীভৎস দেখাচ্ছে ওকে।

'তাহলে... তাহলে আমার হাতিয়ার কেড়ে নিলেন কেন?' তোতলাতে থাকে সে।

গ্রিগোরি অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল, 'কেড়ে নিয়েছি এই জন্যেই যাতে পেছন থেকে গুলি না ক'রে বস। তোমাদের কাছ থেকে, তোমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের কাছ থেকে সবই আশা করা যেতে পারে।... হুঃ কোথাকার কোন্ আঙুলের নির্দেশ, আর, ভগবান কত কথাই না বললে।... একেবারে আসল কালকেউটে তুমি।...'

কথা বলতে বলতে গ্রিগোরির মুখে প্রচুর থুতু জমে যাচ্ছিল। কাপারিনের দিকে না তাকিয়ে ঘন ঘন থুতু ফেলতে ফেলতে ধীরে ধীরে সে চলে যায় ওদের ঘাঁটির কাছে।

স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ চামড়া সেলাইয়ের সুতো দিয়ে নিজের ছেঁড়া পেটিটা সেলাই করছিল আর আস্তে আস্তে শিস দিচ্ছিল। ফোমিন আর চুমাকোভ ঘোড়ার গা ঢাকা দেওয়ার কম্বলের ওপর শুয়ে শুয়ে যথারীতি তাস খেলছিল।

গ্রিগোরির ওপর চট করে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ফোমিন জিজ্ঞেস করল, 'ও কী বলছিল তোমাকে? কী নিয়ে কথা হচ্ছিল?'

'নিজের কপাল নিয়ে আক্ষেপ করছিল।... যা বকবক করছিল...'

গ্রিগোরি কথা রেখেছিল। কাপারিনকে সে ধরিয়ে দেয় নি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা সবার অলক্ষ্যে কাপারিনের রাইফেলের ছিটকিনিটা খুলে লুকিয়ে রেখে দিল। ঘুমোতে যাবার সময় মনে মনে ভাবল, 'রাতে আবার ব্যাটার মাথায় কী ফন্দি খেলে কে জানে বাবা!'

সকালে ঘুম ভাঙল ফোমিনের ডাকে। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফোমিন মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কাপারিনের অস্ত্র তুমি নিয়ে রেখেছ নাকি?'

'কী? কিসের অস্ত্র?' কনুইয়ে ভর দিয়ে গ্রিগোরি উঠে বসে। অনেক কষ্টে কাঁধদুটো সোজা করে।

ভোরের ঠিক আগে সবে ঘুমটা এসেছিল। সকালের হিমে ওর হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে কুয়াশা পড়েছিল তাতে ওর গ্রেটকোট, মাথার টুপি, পায়ের বুটজুতো সব ভিজে একাকার।

'ওর হাতিয়ারগুলো আমরা পাচ্ছি না। তুমি নিয়েছ নাকি? আরে কী হল মেলেখভ? চোখ খোল!'

'হ্যাঁ আমি নিয়েছি। কিন্তু কী ব্যাপার?'

ফোমিন কোন কথা না বলে সরে গেল। গ্রিগোরি উঠে গ্রেটকোটটা ঝাড়ল। চুমাকোভ একটু দূরে সকালের খাবারের যোগাড় করছিল। ওদের ক্যাম্পের সম্বল বলতে যে বাটিখানা ছিল সেটা জল দিয়ে ধুল সে। রুটিটা বুকের কাছে চেপে ধরে সমান চারটে টুকরো ক'রে কাটল। জগ থেকে বাটিতে দুধ ঢেলে সেদ্ধ কাউনের চালের শক্ত একটা ডেলা ভেঙে গুঁড়ো ক'রে তার মধ্যে ফেলে দিল। গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আজ অনেকক্ষণ ঘুমুলে মেলেখভ। দেখ সূর্য কোথায় উঠেছে!'

'যার বিবেক পরিষ্কার সে ভালো ঘুমুবে না ত কে ঘুমুবে?' পরিষ্কার ধোওয়া কাঠের চামচখানা গ্রেটকোটের কিনারায় মুছতে মুছতে স্তের্লিয়াদ্নিকভ বলল। 'কিন্তু কাপারিন সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারে নি, খালি এপাশ ওপাশ করেছে।...'

ফোমিন নীরবে হেসে গ্রিগোরির দিকে তাকায়।

'এসো হে ডাকাতের দল, সকালের জলখাবার খাওয়া যাক!' চুমাকোভ বলে।

চুমাকোভই প্রথম দুধের বাটিতে চামচ ডুবিয়ে দেয়। রুটির একটা বেশ বড় টুকরো কামড়ে ছিঁড়ে নেয়। গ্রিগোরি নিজের চামচটা তুলে নিয়ে সকলের মুখ

বেশ করে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল, 'কাপারিন কোথায়?'

ফোমিন আর স্তের্লিয়াদ্নিকভ চুপচাপ খেয়ে চলে। চুমাকোভ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে গ্রিগোরির দিকে, কিন্তু সেও কোন কথা বলে না।

'কাপারিনকে কোথায় রেখে এলে তোমরা?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল বটে, কিন্তু রাতে কী ঘটে গেছে অস্পষ্ট ভাবে তা যেন আন্দাজ করতে পারছিল।

প্রশান্ত হাসি হেসে চুমাকোভ বলল, 'কাপারিন এখন অনেক দূরে। রস্তভের দিকে ভেসে চলেছে। এতক্ষণে হয়ত উস্ত্-খোপিওরের কাছাকাছি কোথাও দোল খাচ্ছে। ওই যে ওর ভেড়ার চামড়ার কোটখানা ঝুলছে, দেখতে পাচ্ছ?'

কাপারিনের কোটের দিকে চট ক'রে তাকিয়ে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি সত্যি ওকে মেরে ফেললে তোমরা?'

প্রশ্নটা করার কোন অর্থ হয় না। অমনিতেই সব পরিষ্কার। তবু সে কেন যেন জিজ্ঞেস করল। উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পেল না, তাই আবার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ মেরে ফেলেছি আমরা, এ ত পরিষ্কার ব্যাপার।' মেয়েলি ধরনের সুন্দর ধূসর চোখের পাতাদুটো নামিয়ে দিয়ে চুমাকোভ বলল, 'আমিই মেরেছি। মানুষ খুন করা – এটাই এখন আমার কাজ। . . .'

গ্রিগোরি ওকে খুঁটিয়ে দেখল। গোলাপী রঙধরা নিখুঁত পরিষ্কার তামাটে মুখখানা চুমাকোভের, শান্ত – এমনকি যেন প্রফুল্লও। রোদেপোড়া মুখের ওপর সোনালি ছোপধরা কাপাস রঙের গোঁফজোড়া দারুণ স্পষ্ট দেখায়, ভুরু আর ব্যাক ব্রাশ করা চুলের ঘন কালো রঙকে যেন আরও গাঢ় ক'রে তুলেছে। খাঁটি সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়, আর দেখতেও বেশ বিনীত ফোমিনের ঠ্যাঙারে দলের এই কৃতি জল্লাদটি। . . . তেরপলের ওপর চামচটা নামিয়ে রেখে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে গোঁফ মুছে সে বলল, 'ইয়াকভ ইয়েফিমিচের* কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত মেলেখভ। সে-ই তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। নইলে এতক্ষণে কাপারিনের সঙ্গে তুমিও দনের জলে ভাসতে। . . .'

'কেন বল ত?'

চুমাকোভ ধীরে ধীরে টেনে বলল, 'কাপারিন যে ধরা দেবার তাল করছিল সে ত বোঝাই যাচ্ছিল। কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কী সব কথাবার্তা বলছিল। . . . তাই আমি আর ইয়াকভ ইয়েফিমভিচ ঠিক ক'রে ফেললাম পাপ করার কোন সুযোগ না দিয়ে ওকে খতম করতে হবে। সব কথা বলা যেতে পারে কি একে?' চুমাকোভ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ফোমিনের দিকে।

---

* ফোমিনের পুরো নাম। – অনুঃ

ফোমিন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে চুমাকোভ কড়মড় শব্দে আধসেদ্ধ কাউনের দানা চিবুতে চিবুতে বিবরণ চালিয়ে যায়।

'কাল সন্ধ্যায় ওকগাছের গুঁড়ি দিয়ে একটা মুগুর তৈরি ক'রে রেখেছিলাম। ইয়াকভ ইয়েফিমিচকে আমি বললাম: 'আজ রাতে কাপারিন আর মেলেখভ দু'জনকেই সাবাড় করে দেবো,' কিন্তু ও বলল: 'কাপারিনকে শেষ করে দাও, মেলেখভকে ক'রে কাজ নেই।' আমি তাতেই রাজী হলাম। কাপারিন যতক্ষণ না ঘুমোয়, আমি নজর রাখলাম। আওয়াজ শুনে বুঝলাম তুমিও ঘুমোচ্ছ, নাক ডাকাচ্ছ একটু একটু। তারপর আস্তে আস্তে গুড়ি মেরে এগিয়ে এসে মুগুর দিয়ে দিলাম ঝেড়ে ওর মাথায়। আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব পা পর্যন্ত ছোঁড়ার অবকাশ পেল না। বেশ আয়েস করে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে সাধের প্রাণটা ছেড়ে চলে গেল। ... আস্তে আস্তে ওর শরীর তালাশ করে দেখলাম, তারপর হাত-পা ধরে চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে গেলাম পারে। ওর জুতো, গায়ের জামা আর ভেড়ার চামড়ার কোটখানা খুলে দিলাম ছুঁড়ে ওকে জলে। তুমি তখনও ঘুমোচ্ছ, জোর ঘুমোচ্ছ। এ সবের কিছুই টের পেলে না। ... কাল রাতে একটুর জন্যে যমদুয়ার থেকে ফিরে এসেছ, মেলেখভ। যম তোমার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইয়াকভ ইয়েফিমিচ যদিও বলেছিল তোমাকে না ছুঁতে, তবু আমি ভাবলাম, 'কাল দিনের বেলা ওদের দু'জনের কী নিয়ে এত কথা হয়েছিল? পাঁচজনের মধ্যে দু'জন যখন আলাদা হয়ে গোপনে কোন আলোচনা ক'রে তখন গতিক খারাপই বলতে হবে। ...' চুপিচুপি তোমার কাছে এগিয়ে এলাম, টেনে একখানা বসিয়ে দেবার ইচ্ছেও হয়েছিল, পরে আবার ভাবলাম মুগুর না হয় বসিয়ে দিলাম, কিন্তু ব্যাটা যা জোয়ান ...' এক ঘায়ে যদি শেষ করতে না পারি ... তাহলে বলা যায় না, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দুমদাম গুলি ছুঁড়তে শুরু করতে পারে। তখন? ... তা ফোমিনই আবার এসে আমাকে ক্ষান্ত করল। এগিয়ে এসে আমাকে কানে ক'নে বলল, 'ওকে ছুঁয়ো না। ও আমাদের লোক। ওকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।' তা ত হল, কিন্তু একটা জিনিসই আমাদের কাছে পরিষ্কার হল না – কাপারিনের হাতিয়ারগুলো গেল কোথায়? যা হোক আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। ওঃ কী ঘুমই তুমি ঘুমোচ্ছিলে! এত বড় একটা ফাঁড়া যে কেটে গেল তার এতটুকু টের পেলে না!'

গ্রিগোরি শান্ত গলায় বলল: 'আমাকে খুন করলে ভুলই করতে বোকা কোথাকার! কাপারিনের সঙ্গে মিলে আমি কোন ষড়যন্ত্রই করতে যাই নি।'

'কিন্তু ওর অস্ত্র তোমার কাছে এলো কী ক'রে?'

গ্রিগোরি হাসল।

'আমি কাল দিনের বেলাতেই ওর পিস্তলগুলো কেড়ে রেখে দিয়েছিলাম। আর রাইফেলের ছিটকিনিটা সন্ধ্যাবেলায় খুলে জিনের নীচে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

কাপারিনের সঙ্গে গতকালের কথাবার্তা আর তার প্রস্তাবের কথা এবারে খুলে বলল গ্রিগোরি।

ফোমিন অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু গতকাল বললে না কেন?'

গ্রিগোরি অকপটে স্বীকার করল, 'ব্যাটা ছিঁচকাঁদুনে শয়তান! ওর ওপর আমার একটু মায়া হয়েছিল বলতে পার।'

এবারে চুমাকোভের সত্যি সত্যি অবাক হওয়ার পালা। সে বলে ওঠে, 'ওঃ মেলেখভ! কেমন ধারা লোক তুমি! তোমার ওই দয়ামায়া সব তুলে রাখ জিনের কাপড়ের তলায় যেখানে কাপারিনের রাইফেলের ছিটকিনিটা লুকিয়ে রেখেছিলে। নইলে ওতেই কিন্তু তুমি বিপদে পড়বে একদিন!'

'তুমি আমায় শেখাতে এসো না। তোমার চেয়ে কম আমি জানি না,' গ্রিগোরি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে।

'তোমাকে শেখাতে যাব কেন আমি? কিন্তু ধর তোমার এই মায়ামমতার জন্যেই স্রেফ বিনা কারণে কাল রাতে যদি তোমাকে পরপারে পাঠিয়ে দিতাম – তাহলে?'

একটু ভেবে গ্রিগোরি মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, 'তাহলে বুঝতে হবে ওটাই আমার ভবিতব্য ছিল।' তারপর ঠিক অন্যদের শোনানোর জন্য নয়, অনেকটা যেন আপন মনেই বলল, 'জীবমাত্রেই জাগা অবস্থায় মরতে ভয় পায়, কিন্তু ঘুমের মধ্যে মরা বোধ হয় সহজ। . . .'

পনেরো

এপ্রিলের শেষে এক রাতে ওরা নৌকোয় করে দন পার হল। বুবেঙ্কনিতে পারের কাছেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক জোয়ান বয়সী কসাক – ভাটির ক্রিভস্কি গ্রামের আলেক্সান্দর কোশেলেভ।

ফোমিনকে নমস্কার ক'রে সে বলল, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি ইয়াকভ ইয়েফিমিচ। ঘরে বসে বসে হাঁপ ধরে গেল।'

কনুই দিয়ে গ্রিগোরিকে ঠেলা মেরে ফোমিন ফিসফিস ক'রে বলল, 'দেখলে ত? কী বলেছিলাম? . . . দ্বীপ ছেড়ে এপারে আসতে না আসতেই দ্যাখ, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে লোকজন – এই যে এক জন। এ আমার চেনাজানা – লড়িয়ে

ছোকরা। ভালো লক্ষণ বলতে হবে। তার মানে আমাদের কাজ এগোবে।'

ফোমিনের গলার আওয়াজে রীতিমতো খুশির রেশ। নতুন একজন সাথী পেয়ে তার যে বেশ আনন্দ হয়েছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। নিরাপদে পার হওয়া গেছে, তার ওপর আবার সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন দলে এসে জুটল – এই সব কারণে সে চাঙ্গা হয়ে উঠল, নতুন আশা জেগে উঠল তার বুকে।

অন্ধকারের মধ্যে ভালো করে নজর চালিয়ে, কোশেলেভের অস্ত্রশস্ত্রগুলো হাতড়ে দেখতে দেখতে খুশি হয়ে ফোমিন বলে ওঠে, 'বাঃ, রাইফেল, রিভলভার আর তলোয়ার ছাড়া তোমার দূরবীনও আছে দেখছি। একেই বলে কসাক। দেখেই বোঝা যায় খাঁটি কসাক, কোন ভেজাল নেই!'

ফোমিনের খুড়তুত ভাই ছোট্ট একটা ঘোড়ায় টানা মালগাড়ি নিয়ে পারের কাছে এগিয়ে এলো।

নীচু গলায় সে বলল, 'ঘোড়ার জিনগুলো সব গাড়িতে রাখ। ভগবানের দোহাই, তাড়াতাড়ি কর। ভোর হয়ে এলো, তাছাড়া রাস্তাও অনেকটা পাড়ি দিতে হবে। . . .'

লোকটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, ফোমিনকে তাড়া দিচ্ছে। এদিকে ফোমিন দ্বীপ ছেড়ে এসে পায়ের নীচে নিজের গ্রামের শক্ত মাটি অনুভব করছে, এমনকি ঘণ্টাখানেকের জন্য নিজের বাড়ি ঘুরে আসায় আর গ্রামের চেনাজানা লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে তার বড় একটা আপত্তিও ছিল না। . . .

ভোরের ঠিক আগে আগে ইয়াগোদ্‌নোয়ে গ্রামের কাছে এক পাল ঘোড়া চরতে দেখে সেখান থেকে ভালো ভালো ঘোড়া বাছাই ক'রে নিয়ে জিন চাপাল তাদের ওপর। যে বুড়ো ঘোড়ার পাল আগলাচ্ছিল তাকে চুমাকোভ বলল, 'ঘোড়াগুলোর জন্যে দুঃখু কোরো না বুড়ো কর্তা। ওরা কোন ভালো কথারও যুগ্যি নয়। আমরা এই সামান্য খানিকটা যাব। আরও ভালো ঘোড়া পেলেই এগুলোকে ফেরত পাঠিয়ে দেবো ওদের মালিকদের কাছে। যদি কেউ জিগ্‌গেস করে কারা ঘোড়া নিয়েছে, বলে দিও ক্রাস্নকুৎস্কায়া জেলা-সদরের মিলিশিয়ার লোকে নিয়েছে। ঘোড়ার মালিকরা সেখানেই যাক। . . . আমরা ডাকাতদলের পিছু ধাওয়া করছি, এই কথাই বলবে!'

সদর রাস্তায় ওঠার পর ফোমিনের ভাইয়ের কাছ থেকে ওরা বিদায় নিল। তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে পাঁচজনেই টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। গুজব শোনা গিয়েছিল দিন কয়েক আগে মেশ্‌কোভ্‌স্কায়া জেলা-সদরের কাছেপিঠে কোথায় যেন মাস্‌লাকের দলটা দেখা গেছে। তার দলে ভিড়বে স্থির ক'রেই ফোমিন এই পথ ধরেছে।

মাস্‌লাকের দলের খোঁজে ওরা তিন দিন হন্যে হয়ে দনের ডান পারে স্তেপের সমস্ত রাস্তাঘাট চষে বেড়াল। পথে বড় বড় গ্রামগঞ্জ তারা এড়িয়ে গেছে। কার্গিন্‌স্কায়া জেলা-সদরের সীমান্তে তাতারস্ক বসতিগুলোতে ওরা নিজেদের ছোটখাটো মরকুটে ঘোড়াগুলো বদলে ভালো দানাপানি খাওয়া হালকা দৌড়বাজ তাতারস্ক ঘোড়ায় চেপে বসল।

চার দিনের দিন সকালে ভেজি গ্রামের অদূরে গ্রিগোরিই প্রথম লক্ষ করল ঘোড়াসওয়ার বাহিনীর একটা সারি। দূরের গিরিখাতের ভেতর দিয়ে তারা আসছে। অন্ততপক্ষে দুটো স্কোয়াড্রন চলেছে রাস্তা ধরে। সামনে আর দু'পাশে ছোট ছোট টহলদারী দল।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে ফোমিন বলল, 'হয় মাস্‌লাক, নয়ত. . .'

'হয় বৃষ্টি, নয় বরফ, হয় হবে, নয়ত না,' চুমাকোভ ব্যঙ্গ ক'রে বলল। 'তুমি একটু ভালো করে দেখ, ইয়াকভ ইয়েফিমিচ। যদি লাল ফৌজ হয় তবে আমাদের ফিরে পালাতে হবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়!'

'ধুত্তোর! এত দূর থেকে দেখে কি বোঝার উপায় আছে?' বিরক্ত হয়ে ফোমিন বলে।

'দেখ! ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে! টহলদারদের দলটা ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই আসছে!' স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ চেঁচিয়ে উঠল।

ওরা সত্যি সত্যিই চোখে পড়ে গিয়েছিল। সারির ডান দিক ধরে টহলদারদের যে দলটা এগিয়ে আসছিল সেটা চট করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে জোর কদমে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ফোমিন চটপট দূরবীন খাপের ভেতরে পুরে ফেলল। কিন্তু গ্রিগোরি জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে ফোমিনের ঘোড়ার মুখের লাগামটা চেপে ধরল।

'তাড়াহুড়ো ক'রে কাজ নেই! আরেকটু কাছে আসতে দাও। ওরা মাত্র বারো জন লোক। একটু ভালো ক'রে দেখে নিই ওদের। বেগতিক দেখলে ঘোড়া ছুটিয়ে পালানোও যাবে। আমাদের ঘোড়াগুলো তাজা। ঘাবড়ানোর কী আছে? দূরবীন দিয়ে দেখই না!'

বারোজন ঘোড়সওয়ার ক্রমে এগিয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তে ওরা আকারে সমানে বড় হয়ে উঠছে। কচি ঘাসে ঢাকা টিলার সবুজ পটভূমিতে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওদের মূর্তিগুলো।

গ্রিগোরি আর তার সঙ্গের লোকেরা অধৈর্য হয়ে তাকায় ফোমিনের দিকে। ফোমিনের হাতে দূরবীন ধরা। অল্প অল্প কাঁপছে তার হাতদুটো। একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকার ফলে ওর চোখ টাটিয়ে উঠেছিল। গালের যেদিকটা রোদের দিকে ফেরানো তার ওপর দিয়ে একফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

'লাল ফৌজ! ওদের টুপিতে তারা আছে! . . .' চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দেয় ফোমিন।

এবারে ছোটার পালা। ওদের পেছন পেছন মাঝে মাঝে এলোমেলো গুলির আওয়াজ। ক্রোশ দেড়েক ফোমিনের পাশে পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গ্রিগোরি, কদাচিৎ পিছন ফিরে দেখে।

'খুব দলে যোগ দেওয়া হল।' বিদ্রূপের হাসি হেসে গ্রিগোরি বলল।

ফোমিন মনমরা হয়ে পড়েছিল। কোন কথা বলল না। চুমাকোভ ঘোড়াটাকে সামান্য রুখে চেঁচিয়ে বলল, 'গ্রামগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। ভিওশেন্স্কায়াতে ঘোড়া চরানোর যে জমি আছে সে দিকে এগোন যাক—জায়গাটা অনেক নিরিবিলি।'

আরও কয়েক ক্রোশ এই ভাবে পাগলের মতো ছোটাতে হলে ঘোড়াগুলো মুখ থুবড়ে পড়বে। ওদের ঘাড়গুলো লম্বা হয়ে সামনে বেরিয়ে এসেছে, ঘাড়ের ওপর পুঞ্জ পুঞ্জ ঘাম জমে উঠেছে পেশীর মাঝে মাঝে গভীর খাঁজ পড়েছে।

'একটু আস্তে চালাও! অত তাড়াহুড়ো কোরো না!' গ্রিগোরি হুকুম দেয়।

পেছনে বারোজন ঘোড়সওয়ারের মধ্যে এখন আছে মাত্র নয়জন। বাকিরা পিছিয়ে পড়েছে। গ্রিগোরি একবার চোখের আন্দাজে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা মেপে দেখল, তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'এবারে থামো। এসো গুলি ছোঁড়া যাক ওদের ওপর!'

ওরা পাঁচজনেই ঘোড়াগুলোকে কদমচালে চালিয়ে চলতে চলতেই মাটিতে নেমে পড়ে, রাইফেল নামিয়ে নেয়।

'লাগাম ধরে রাখ! বাঁ ধারের একেবারে শেষ লোকটাকে সোজা তাক কর! . . . ছোঁড় গুলি।'

ওরা একেক দফা করে কার্তুজের ক্লিপ খালি ক'রে দিয়ে গুলি ছুঁড়ল। একজন লাল ফৌজীর ঘোড়া খতম হয়ে গেল। এরপর আবার তাড়া খেয়ে ছুটতে লাগল ওরা। তবে ওদের পিছু ধাওয়া করার তেমন একটা ইচ্ছে লাল ফৌজীদের আর দেখা গেল না। মাঝে মাঝে অনেকখানি দূর থেকে গুলি ছোঁড়ে। শেষ কালে একেবারেই ছেড়ে দেয় পিছু ধাওয়া করা।

দূরে স্তেপের মাঠের ভেতরে নীল নীল দেখা যাচ্ছিল একটা পুকুরের রেখা। হাতের চাবুক দিয়ে সেই দিকে দেখিয়ে স্তের্লিয়াদ্নিকভ বলল, 'ঘোড়াগুলোকে একটু জল খাওয়ানো দরকার। ওই যে ওখানে একটা পুকুর আছে।'

এবারে ওরা সাধারণ কদমে ঘোড়া চালাচ্ছে। চলার সময় সামনে যত গিরিখাত আর উপত্যকা পড়ছে বেশ ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। জমির এবড়ো খেবড়ো ভাঁজের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে চলেছে তারা।

পুকুরে ঘোড়াগুলোকে জল খাইয়ে আবার পথে নামল। ঘোড়া ছুটাল প্রথমে কদম চালে, কিছুক্ষণ পরে দুলকি চালে। তেরছা ভাবে স্তেপের মাঠের বরাবর চলে গেছে একখানা গভীর খাত, তারই ঢালে দুপুর নাগাদ ওরা থামল ঘোড়াগুলোকে খেতে দেবে বলে। কোশেলেভ্‌কে ফোমিন হুকুম দিল পায়ে হেঁটে কাছের টিলাটার মাথায় উঠে উপুড় হয়ে শুয়ে চারদিকে নজর রাখতে। স্তেপের মাঠের কোথাও কোন ঘোড়সওয়ার চোখে পড়লে কোশেলেভ ওদের সঙ্কেত করবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘোড়াগুলোর দিকে ছুটবে।

গ্রিগোরি তার ঘোড়ার পা ছেঁদে চরতে ছেড়ে দিল। নিজে কিছু দূরে ঢালের গায়ে শুকনো দেখে জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

খাতের এ ধারটায় রোদ পড়ে, এখানে কচি ঘাস বেশ ঘন আর উঁচু। স্তেপভূমির ভায়োলেট ফুল এখানে ঝরে পড়ছে। রোদে পোড়া কালো মাটির সোঁদা গন্ধ ফুলের মৃদু সুবাসকে ঢাকতে পারে নি। বেশ কিছুকাল ফেলে রাখা একখণ্ড চাষজমির ওপর কলমিশাকের শুকনো ডাঁটার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে ফুলগাছগুলো। পরিত্যক্ত পুরনো ক্ষেতের আলের ধারে ধারে বিচিত্র আলপনার মতো ছড়িয়ে আছে। এমনকি কস্মিনকালে হালের আঁচড় না পড়া শক্ত পাথুরে মাটিতেও গেল বছরের বিবর্ণ ঘাসের ভেতর থেকে তারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে শিশুর মতো নিষ্পাপ, নীল চোখ মেলে। ভায়োলেট ফুলগুলো স্তেপের এই নির্জন, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাদের যেটুকু পরমায়ু ছিল তা শেষ করছে। এখন তাদের জায়গায় খাতের ঢালে লবণজমিতে মাথা তুলতে শুরু করেছে টিউলিপ ফুল। অবিশ্বাস্য রকমের উজ্জ্বল। সূর্যের দিকে মুখ করে আছে তাদের লাল টকটকে, হলুদ আর সাদা মাথাগুলো। নানা ফুলের নানা সুগন্ধ একসঙ্গে মিশিয়ে বাতাস তাদের স্তেপের প্রান্তর দিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে অনেক দূরে।

উত্তরের ঢালটা সোজা উঠে গেছে, খাড়া পারের ছায়া পড়েছে তার ওপর। সেখানটায় এখনও বরফের স্তর জমে আছে, একটু একটু ক'রে গলে চুঁইয়ে পড়ছে। বরফ থেকে হিমেল বাতাস বয়ে আসছে, কিন্তু সে হিমেল বাতাস ঝরে পড়া ভায়োলেটের সৌরভকে আরও মধুর ক'রে তুলছে। এ যেন সুদূর অতীতের প্রিয় কোন কিছুর স্মৃতির মতো অস্পষ্ট আর বেদনাচ্ছন্ন।

দু'পা ছড়িয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে ছিল গ্রিগোরি। সতৃষ্ণ নয়ন মেলে সে দেখছে রোদের ঝিকিঝিকি হলকার পাকে পাকে জড়ানো স্তেপের ধূ ধূ প্রান্তর,

দূর দিগন্তের চূড়ায় ঘন নীলে ঢালা সারি সারি পাহাড়ের টিলা, ঢালের সীমায় কুয়াসাঢাকা অস্থির চঞ্চল মরীচিকার ঝলক। মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে সে শোনে চাতক পাখিদের কাছের আর দূরের গান, মাঠে যে ঘোড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছে তাদের হালকা পায়ের আওয়াজ আর নাক ঝাড়ার শব্দ, তাদের মুখের কড়িয়ালের টুংটাং আর কচি ঘাসের মধ্যে বাতাসের মর্মরধ্বনি। ... সমস্ত অঙ্গ দিয়ে কঠিন মাটি চেপে শুয়ে থাকতে থাকতে একটা বৈরাগ্য ও প্রশান্তির অনুভূতি জাগে ওর মনে। বহুকালের পরিচিত এই উপলব্ধি। সব সময়ই একটা উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আসার পর এরকম হয়। তখন যেন আশেপাশের সমস্ত কিছু সে নতুন করে দেখতে পায়। ওর যেন দৃষ্টি আর শোনার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আগে যা নজর এড়িয়ে যেত উত্তেজনা কাটিয়ে ওঠার পর সে সমস্তই এখন ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে। কোথায় আকাশে একটা চিল ডানায় শিস কেটে তির্যক-গতিতে উড়তে উড়তে একটা ছোট্ট পাখির পিছু তাড়া করে চলেছে, গ্রিগোরির নিজের ছড়ানো দুই কনুইয়ের মাঝখানের দূরত্বটা মন্থরগতিতে অনেক কষ্টে পার হওয়ার চেষ্টা করছে একটা কালো গুবরে পোকা, আবার কোথায় বাতাসের সামান্য আন্দোলনে মৃদু দোল খাচ্ছে কালচে লাল টিউলিপ ফুল, জ্বলজ্বল করছে তার অনাহত সৌন্দর্যের দীপ্তি – এখন, এই মুহূর্তে এসবই সে সমান আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছে। টিউলিপ ফুলটা ফুটে আছে গ্রিগোরির খুব কাছে, মেঠো ইঁদুরের ধ্বসে পড়া একটা গর্তের কিনারায়। একটু হাত বাড়ালেই ফুলটা ছিড়ে আনা যায়। কিন্তু গ্রিগোরি নড়াচড়া করে না, শুয়ে থাকে, চুপচাপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দ্যাখে ফুলটা আর তার ডাঁটার গায়ের শক্ত পাতাগুলো। পাতার ভাঁজে ভাঁজে যে ভাবে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে ভোরের শিশিরকণা আর কণাগুলোর গায়ে যে রামধনুর খেলা চলছে সেই ঈর্ষণীয় দৃশ্যের তারিফ করে গ্রিগোরি। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আনমনে তাকিয়ে দেখে মেঠো ইঁদুরদের পরিত্যক্ত ছোট বসতিটার মাথার ওপর, দিগন্তের বুকে একটা ঈগলের ডানা মেলে ভেসে বেড়ানো। ...

ঘণ্টা দুয়েক পরে ওরা আবার ঘোড়ায় চড়ে বসল। সন্ধ্যা নাগাদ ইয়েলান্স্কায়া জেলা-সদরে চেনাজানা গ্রামগুলোয় পৌঁছুনো ওদের উদ্দেশ্য।

লাল ফৌজের টহলদার দল সম্ভবত টেলিফোনে ওদের গতিবিধির খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। কামেন্কার ইউক্রেনীয় বসতিতে ঢোকার মুখে ছোট নদীর ওপার থেকে রাইফেলের গুলির কটকট আওয়াজ ওদের অভ্যর্থনা জানাল। বুলেটের একটানা শিস শুনতে পেয়ে ফোমিনকে এক পাশে ফিরতে হল। গুলিগোলা বর্ষণের মধ্য দিয়েই ওরা বসতিটার প্রান্ত দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে দেখতে দেখতে ভিওশেন্স্কায়া জেলার ঘোড়া-চরানো জমিগুলোর ওপর এসে উঠল। পাঁকাল খাত

পল্লীর ওধারে মিলিশিয়ার একটা ছোটখাটো বাহিনী ওদের ধরার চেষ্টা করল।

ফোমিন প্রস্তাব করল, 'এবারে এসো বাঁ দিক ঘুরে সরে পড়ার চেষ্টা করি।'

গ্রিগোরি দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বলল, 'চল হামলা চালাই। ওদের দলে নয়জন, আমরা পাঁচজন। ভেঙে বেরিয়ে যাব।'

চুমাকোভ আর স্তের্লিয়াদ্‌নিকভও সায় দিল। খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে ওরা ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে হাল্‌কা চালে ছেড়ে দিল। মিলিশিয়ার সেপাইরা ঘোড়া থেকে না নেমেই ঘন ঘন গুলি ছুঁড়তে লাগল, তারপর আর পাল্টা আক্রমণের কোন গরজ না দেখিয়ে পাশে সরে গেল।

কোশেলেভ ঠাট্টা ক'রে বলল, 'দলটা একেবারেই কমজোরি। রিপোর্ট লিখতে ওস্তাদ, কিন্তু সত্যিকারের লড়াই করার মুরোদ নেই।'

ওদের পিছন পিছন মিলিশিয়ার দলটা যেই চাপ সৃষ্টি করে অমনি ফোমিন আর তার দলবল গুলি ছুঁড়ে তার জবাব দেয়। এই ভাবে তারা পুবের দিকে সরে যেতে লাগল। সরে যেতে লাগল শিকারী কুকুরের তাড়া খাওয়া একপাল নেকড়ের মতো। মাঝে মাঝে পাল্টা খেঁকালেও প্রায় কোথাও থামল না বললেই চলে। এই রকম একবার গুলিগোলা বিনিময়ের সময় স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ জখম হল। একটা গুলি ওর বাঁ পায়ের ডিম ফুঁড়ে হাড় ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। অসহ্য চিনচিনে ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল স্তের্লিয়াদনিকভ, ওর মুখ ফেকাসে হয়ে গেল।

'পায়ে লেগেছে। . . . লাগবি ত লাগ খোঁড়া পা'টাতেই। . . . হারামজাদা আর কাকে বলে!'

চুমাকোভ শরীরটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে যায়। স্তের্লিয়াদ্‌নিকভকে তার হাতের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসতে সাহায্য করে সে, কিন্তু তখনও হাসির দমকে দমকে সে দুলতে থাকে।

'কী ভাবে ওই পা'টাই ঠিক বেছে বার করল বল ত? তাক ক'রে মেরেছিল বলতে হয়। . . . দেখেছে একটা খোঁড়া লোক কেমন যেন লাফ ঝাঁপ দিতে দিতে চলেছে, ভাবলে দাও ব্যাটার ওই পা'টা একেবারে খতম করে। . . . ওঃ স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ! ওঃ হো-হো! হাসিয়ে মেরে ফেললি আমাকে। . . . তোর পা ত আরও বিঘৎখানেক খাটো হয়ে যাবে। . . . তাহলে নাচবি কী ক'রে? এখন দেখছি তোর ওই পায়ের জন্যে আমাকে দু'বিঘৎ গর্ত খুঁড়তে হবে। . . .'

'বাজে বকিস না ত! চুপ কর! তোর সঙ্গে তামাসা করার মতো অবস্থা আমার নেই। ভগবানের দোহাই, চুপ কর।' যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে অনুনয় করল স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ।

আধ ঘন্টা পরে অসংখ্য গিরিখাতগুলোর একটার ভেতর থেকে ওরা যখন মাথার ওপর উঠতে শুরু করেছে তখন স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ ওদের মিনতি ক'রে বলল, 'এসো এখানে একটু থেমে জিরোন যাক। . . . জখমের জায়গাটা একটু বেঁধে নিতে হবে। নইলে দেখ না রক্ত পড়ে পড়ে বুটটা একেবারে ভরে উঠেছে। . . .'

ওরা থামল। গ্রিগোরি ঘোড়াগুলোকে ধরল। মিলিশিয়ার সেপাইদের মূর্তিগুলো দূরে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছিল। ফোমিন আর কোশেলেভ মাঝে মাঝে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। স্তের্লিয়াদ্‌নিকভকে জুতো খুলতে সাহায্য করল চুমাকোভ।

'ইস্, সত্যিই ত, রক্ত খুব একটা কম পড়ে নি। . . .' চুমাকোভ ভুরু কুঁচকে এই বলে জুতো উপুড় করে মাটিতে ঢেলে ফেলল লাল থকথকে পদার্থটুকু।

রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল স্তের্লিয়াদ্‌নিকভের পাতলুনের পায়াটা। চুমাকোভ সেটা আরেকটু হলেই লম্বালম্বি কেটে ফেলেছিল। কিন্তু স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ রাজী হল না।

'আমার পরনের পাতলুনটা বেশ ভালো। এটা কাড়ার কোন দরকার নেই।' দু'হাতের চেটোয় মাটিতে ভর দিয়ে জখম পা'টা উঁচু ক'রে ধরে বলল, 'নে এবারে পাতলুন টেনে খোল, তবে একটু সাবধানে, ভাই।'

পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে চুমাকোভ জিজ্ঞেস করে, 'ব্যাণ্ডেজ আছে তোর কাছে?'

'ও দিয়ে আমার ছাই কী হবে? ও ছাড়াই চলে যাবে।'

জখমের যে দিকটা ফুঁড়ে গুলি বেরিয়ে গেছে সেই জায়গাটা বেশ খুঁটিয়ে দেখল স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ। তারপর কার্তুজের খোপ থেকে দাঁত দিয়ে টেনে একটা বুলেট বার করল। বারুদটুকু হাতের তেলোয় ঢেলে একটু মাটির সঙ্গে থুতু দিয়ে ভিজিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মেশাল। এফোঁড় ওফোঁড় জখমের দুটো গর্তেই প্রচুর পরিমাণে ওই কাদামাটি দিয়ে লেপে বুজিয়ে দিল, তারপর খুশি হয়ে বলল, 'বহু পরীক্ষিত যাকে বলে! জখম শুকিয়ে যাবে। দু'দিনের মধ্যে সেরে উঠবি কুকুরের মতো।'

চির্ পর্যন্ত তারা এক নাগাড়ে পথ চলল। মিলিশিয়ার সেপাইরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পেছন পেছন চলেছে। কেবল মাঝে মধ্যে এক আধটা গুলি ছুঁড়ছিল তারা। ফোমিন প্রায়ই পিছন ফিরে দেখে আর মন্তব্য করে, 'চোখে চোখে রাখছে আমাদের। . . . কোন জায়গা থেকে সাহায্যের আশায় আছে নাকি? অমনি অমনি দূর থেকে নজর রাখছে বলে ত মনে হয় না। . . .'

ভিস্‌লোগুজভ্‌স্কি গ্রামের কাছে পায়ে হেঁটে তারা চির্-এর সোঁতা পার হল। ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে চড়াই বয়ে ওপরে ওঠাল। ঘোড়াগুলো বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। উতরাইয়ের পথে তাদের পিঠে বসে কোন রকমে দুলকি চালে

চলা যেতে পারে। কিন্তু চড়াইয়ে ওঠার সময় তাদের মুখের লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হয়। ভিজে পাঁজরার দু'পাশে আর পাছার ওপর পুঞ্জ পুঞ্জ ঘামের ফেনা জমে কাঁপতে থাকে, হাত দিয়ে সেগুলো বারবার ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়।

ফোমিনের অনুমানটা মিথ্যে ছিল না। ভিস্‌লোগুজভ্‌স্কি ছাড়িয়ে তারা ক্রোশ দুয়েক চলে এসেছে এমন সময় সাতজন ঘোড়সওয়ার তরতাজা টগবগে ঘোড়ায় চেপে আবার ওদের পিছু ধাওয়া শুরু ক'রে দিল।

কোশেলেভ মুখ কালো ক'রে বলল, 'ওরা যদি এরকম এক হাত থেকে আরেক হাতে আমাদের তুলে দেয় তাহলে ত আমাদের দফা রফা হয়ে যাবে।'

ওরা রাস্তাঘাটের কোন পরোয়া না ক'রে স্তেপের ভেতর দিয়ে চলতে থাকে, মাঝে মাঝে থেমে পালা ক'রে পিছন ফিরে গুলি ছোঁড়ে। দু'জন ঘাসের মধ্যে শুয়ে যতক্ষণ গুলি ছোঁড়ে ততক্ষণে বাকিরা চারশ' গজ মতো এগিয়ে গেছে। এবারে তারা ঘোড়া থেকে নেমে শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে, প্রথম দু'জন সেই ফাঁকে আটশ' গজ এগিয়ে যায়, সেখানে মাটিতে শুয়ে পড়ে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হতে থাকে। মিলিশিয়া দলের একজন সেপাই ওদের গুলিতে হয় মারা গেছে, নয়ত গুরুতর জখম হয়েছে। আরেকজনের ঘোড়াটা মারা পড়ল। খানিক বাদে চুমাকোভের ঘোড়াটাও মারা গেল। কোশেলেভের ঘোড়ার রেকাব ধরে তার পাশে পাশে ছুটতে লাগল সে।

ছায়াগুলো লম্বা লম্বা হয়ে আসছে। সূর্য পাটে যেতে বসেছে। গ্রিগোরির পরামর্শে ওরা ছাড়াছাড়া হয়ে না চলে সকলে একসঙ্গে পায়ে পায়ে ঘোড়া চালিয়ে যেতে লাগল। তাদের পাশে পাশে হেঁটে চলল চুমাকোভ। কিছু পরে একটা টিলার মাথার ওপর একটা জোড়া-ঘোড়ায় টানা গাড়ি দেখতে পেয়ে ওরা রাস্তার দিকে মোড় নিল। গাড়ি চালাচ্ছিল এক দাড়িওয়ালা বুড়ো কসাক। লোকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিন্তু গুলির আওয়াজ শুনে তাকে থামতে হল।

'ওরে বুড়ো হারামজাদা! এক কোপে মুণ্ডু খসিয়ে দেবো! পালানো কাকে বলে টের পাবে! . . .' দাঁতে দাঁত ঘসে কোশেলেভ বলে। ঘোড়ার পিঠে সপাং সপাং চাবুক কষিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনে এগিয়ে যায়।

'ওর গায়ে হাত দিও না সাশা! অমন কাজ করা চলবে না!' ফোমিন সাবধান করে দেয় ওকে। দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ও বুড়ো কত্তা শুনছ? ঘোড়ার জো'াল খোলা! বাঁচতে চাও ত জোয়াল খোলো!'

বুড়োর কান্নাকাটি কাকুতি মিনতি ওরা কানেই তুলল না। নিজেরাই ঘোড়াদুটোর চামড়ার ফিতের বাঁধনগুলো খুলল, ঘাড়ের জোয়াল, পেটের আর পেছন দিককার বাঁধন খুলে চটপট পিঠে জিন চাপিয়ে দিল।

'অন্তত বদলে তোমাদের একটা ঘোড়া ত রেখে যাও!' বুড়ো কাঁদ কাঁদ গলায় মিনতি করল।

কোশেলেভ বলল, 'ওরে বুড়ো শয়তান, দাঁতের গোড়ায় দেবো নাকি একটা রেড়ে? বড় সাধ হয়েছে মনে হচ্ছে। আমাদের নিজেদেরই ঘোড়া দরকার! ভগবানের দয়া বলতে হবে যে জানে বেঁচে গেলি। . . .'

ফোমিন আর চুমাকোভ তাজা ঘোড়াদুটোর পিঠে উঠে বসল। যে ছয়জন ঘোড়সওয়ার ওদের পিছু নিয়েছিল, খানিক বাদেই দেখা গেল তাদের সঙ্গে আরও তিনজন এসে জুটেছে। ফোমিন বলল, 'ঘোড়া ছুটাতে হয়! চল ভাইসব! সন্ধ্যানাগাদ যদি ক্রিভ্স্কি খাতে পৌঁছুতে পারি তাহলে আমরা বেঁচে যাব। . . .'

ফোমিন তার ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষায়। সামনে এগিয়ে যায়। ওর বাঁ দিকে মুখে ছোট লাগাম দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে দ্বিতীয় ঘোড়াটাকে। ঘোড়ার খুরের নীচে কাটা পড়ে টিউলিপের লাল টকটকে মাথাগুলো চারদিকে উড়ে ছিটকে যাচ্ছে রক্তের বড় বড় ফোঁটার মতো। ফোমিনের পেছন পেছন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল গ্রিগোরি। বিন্দু বিন্দু লালের এই ছিটেগুলো দেখে সে চোখ বুজল। কেন যেন ওর মাথাটা ঘুরে গেল। বুকের ভেতরে টের পায় আবার সেই পরিচিত তীব্র যন্ত্রণাটা। . . .

ঘোড়াগুলো চলেছে তাদের শেষ শক্তি খরচ করে। অবিরাম ঘোড়ায় চড়ে ছোটা আর অনাহারের ফলে ঘোড়ার সওয়ারিরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। স্তের্লিয়াদ্নিকভ জিনে বসে টলছিল। তাকে মড়ার মতো ফেকাসে দেখাচ্ছে। প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে তার। পিপাসায় আর বমি বমি ভাবের উদ্রেক হওয়ায় সে কাতর হয়ে পড়েছে। খানিকটা বাসি রুটি সে খেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে গেল।

তখন গোধূলি। ক্রিভ্স্কি গ্রামের কাছাকাছি স্তেপের মাঠ থেকে একপাল ঘোড়া ঘরে ফিরছিল। ওরা সেই পালের মাঝখানে ঢুকে পড়ল। পিছু ধাওয়া করা শত্রুদের লক্ষ্য করে শেষবারের মতো কয়েক দফা গুলি ছুঁড়ল। শেষকালে দেখে খুশি হল যে আর কেউ ওদের পিছু নিচ্ছে না। দূরে দেখা গেল নয়জন ঘোড়সওয়ার একসঙ্গে জড় হয়ে কী একটা ব্যাপারে যেন আলোচনা করছে। তারপর সকলেই ফিরে চলে গেল।

* * *

ক্রিভ্স্কি গ্রামে ফোমিনের চেনাজানা একজন কসাকের বাড়িতে ওরা দু'দিন কাটাল। বাড়ির মালিক সম্পন্ন গৃহস্থ, ওদের বেশ আদর অভ্যর্থনা করল। একটা অন্ধকার চালাঘরে ঘোড়াগুলোকে রাখা হয়েছিল। বস্তা বস্তা জই ওদের দেওয়া হয়

খেয়ে শেষ করতে পারে না। পাগলের মতো ছুটতে হয়েছিল ওদের। ভালোমতো জিরোতে পেরে দ্বিতীয় দিনের শেষেই ওরা চাঙা হয়ে উঠেছে। দলের লোকেরা পালা ক'রে দিনের বেলায় ওদের দেখাশোনা করে। মাকড়-..র জাল ছড়ানো ঠাণ্ডা ভুবিঘরে সকলে গাদাগাদি করে ঘুমোয়। ইচ্ছেমতো পেট পুরে খেয়ে এতদিন অর্ধাহারে দ্বীপে কাটানোর ক্ষতি পুরিয়ে নেয়।

পর দিনই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া যেত। কিন্তু স্তের্লিয়াদ্নিকভের জন্য আটক থাকতে হল। ওর জখমটা জোর টাটাচ্ছে। চারধার লাল দগদগে হয়ে উঠেছে। সন্ধের দিকে পা ফুলে গেল, রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। তৃষ্ণায় ওর বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সারারাত ধরে যখনই জ্ঞান ফিরেছে জল চেয়েছে। জল সে খেয়েছে লোভীর মতো ঢকঢক ক'রে, অনেকখানি ক'রে। এক রাতের মধ্যে প্রায় বালতিখানেক জল খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু অন্যের সাহায্য ছাড়া ওঠার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই ওর। একটু নড়াচড়া করলেই অসহ্য যন্ত্রণা। মেঝে থেকে উঠতে না পেরে ওখানেই শুয়ে শুয়ে পেচ্ছাপ করে, অনবরত গোঙাতে থাকে। ওর কাতরানি যাতে তেমন শোনা না যায় তাই ওকে সকলে ধরাধরি করে ভুবিঘরের দূরের এক কোণে শুইয়ে রেখে দিল। কিন্তু তাতেও বিশেষ কাজ হল না। কখন কখন সে ভীষণ জোরে কাতরায়, আর যখন সংজ্ঞা লোপ পায় তখন বিকারের ঘোরে চিৎকার ক'রে ভুল বকে।

ওর ওপরও নজর রাখতে হচ্ছে এখন। জল খাওয়াতে হয়, উত্তপ্ত কপালে জলপটি দিতে হয়। যখন বড় বেশি জোরে গোঙায় বা চেঁচিয়ে বকতে থাকে তখন হাত বা টুপি চাপা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয়।

দ্বিতীয় দিনের শেষে ওর জ্ঞান ফিরে এলো। বলল একটু ভালো বোধ করছে।

আঙুলের ইশারায় চুমাকোভকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'কবে যাচ্ছ এখান থেকে?'

'আজ রাতে।'

'আমিও যাব। আমাকে তোমরা ছেড়ে যেয়ো না, ভগবানের দোহাই।'

ফোমিন অর্ধস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি কোথায় যাবে? তুমি যে নড়াচড়াই করতে পারছ না।'

'পারি না মানে? এই দ্যাখ।' স্তের্লিয়াদ্নিকভ অনেক চেষ্টায় একটু ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শুয়ে পড়ে।

ওর মুখ টসটস করছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

চুমাকোভ দৃঢ় স্বরে বলল, 'নেবো। ঘাবড়িও না, ঠিকই নেবো। চোখের জল মোছ। তুমি ত আর মেয়েমানুষ নও।'

'চোখের জল নয়, ঘাম,' মৃদুস্বরে ফিসফিস করে এই কথা বলে চোখের ওপর টুপিটা টেনে দেয় স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ। . . .

'তোকে এখানে রেখে যেতে পারলে আমরা খুশিই হতাম। কিন্তু বাড়ির কর্তা রাজী নয়। ঘাবড়ানোর কিছু নেই ভাসিলি। তোর পা সেরে যাবে। আমরা আবার কুস্তি লড়ব, একসঙ্গে নাচবও। অমন মনমরা হয়ে পড়লি কেন? জখমটা সেরকম সাঙ্ঘাতিক হলেও না হয় বুঝতাম। কিন্তু এ যে কিছুই নয়।'

অমনিতে লোকের সঙ্গে ব্যবহারে চুমাকোভ বরাবরই অমার্জিত আর অভব্য ধরনের। কিন্তু এই কথাগুলো সে এত দরদভরে আর মন কেড়ে নেওয়ার মতো এমন কোমলতা মিশিয়ে, আন্তরিকতা ঝরিয়ে বলল যে গ্রিগোরি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

গ্রাম ছেড়ে যখন ওরা বের হল তখন ভোর হতে খুব বেশি বাকি নেই। স্তের্লিয়াদ্‌নিকভকে কষ্টেসৃষ্টে জিনের আসনে বসিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু নিজে সে বসে থাকতে পারছিল না, একবার এদিক আরেকবার ওদিক গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। চুমাকোভ ডান হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি চলতে লাগল।

গ্রিগোরির পাশাপাশি ঘোড়াটা চালিয়ে এনে চলতে চলতে সখেদে মাথা নেড়ে ফিসফিসিয়ে ফোমিন বলল, 'এ আরেক বোঝা হল যে! কোথাও ফেলে যেতে হবে দেখছি।'

'শেষ করে দিতে বল নাকি?'

'তা ছাড়া কী? বসে বসে মুখ দেখব নাকি? ওকে নিয়ে কোথায় যাব আমরা?'

ওরা অনেকক্ষণ পায়ে পায়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে চলে। কেউ কোন কথা বলে না। চুমাকোভের জায়গায় গ্রিগোরি আসে স্তের্লিয়াদ্‌নিকভকে সাহায্য করতে, গ্রিগোরির পরে কোশেলেভ।

সূর্য উঠেছে। নীচে দনের বুকে তখনও কুয়াশার ঘের। এদিকে টিলার ওপরে স্তেপের দূর দিগন্ত স্বচ্ছ, স্পষ্ট। প্রতিটি মুহূর্তে নভোমণ্ডল গাঢ় নীল হয়ে উঠছে। শুধু মাঝ আকাশে স্থির হয়ে জমে আছে পেঁজা তুলোর মতো কিছু মেঘ। ঘাসের ওপর রুপোলি জরির মতো ছড়িয়ে আছে ঘন শিশির। যেখান যেখান দিয়ে ঘোড়াগুলো চলে যাচ্ছে সেখানে থেকে যাচ্ছে কালো জলের রেখা। স্তেপের সুবিশাল প্রান্তরজোড়া এই ধ্যানগম্ভীর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে শুধুই চাতক পাখিরা।

ঘোড়ার পা ফেলার তালে তালে অসহায়ের মতো মাথাটা দুলছিল স্তের্লিয়াদ্‌নিকভের। নীচু গলায় সে বলল, 'ওঃ বড় কষ্ট হচ্ছে।'

'চুপ!' কর্কশ গলায় ফোমিন বলল। 'তোমার সেবা করাটাও আমাদের পক্ষে সহজ নয়!'

হেটমান সড়কের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এমন সময় ঘোড়াগুলোর পায়ের কাছ থেকে হুস্ ক'রে ডানা মেলে সোজা আকাশে উড়ল একটা বনমোরগ। পাখিটার ডানার মৃদু শন্-শন্ শিসে স্তের্লিয়াদ্নিকভের হুঁশ ফিরে এলো।

সে অনুনয় করে বলল, 'ভাইসব, তোমরা আমাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দাও। . . '

কোশেলেভ ও চুমাকোভ সাবধানে ওকে ধরাধরি ক'রে জিনের গদি থেকে নামিয়ে ভিজে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল।

উটকো হয়ে ওর পাশে বসে চুমাকোভ বলল, 'দে দেখি একবার, তোর পা'টার অবস্থা অন্তত দেখি। হ্যাঁ, প্যান্টের বোতাম খোলা!'

স্তের্লিয়াদ্নিকভের পা বীভৎস রকমের ফুলে গেছে। চামড়া ফুলে টানটান হয়ে আছে, কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই। ঢোলা পাতলুনের পুরো পায়াটাই ভরে গেছে। একেবারে কোমরের কাছ অবধি চামড়ার রঙ কালচে বেগনী মতো হয়ে চকচক করছে, কালো চাকায় ছেয়ে গেছে, ধরলে মখমলের মতো নরম মনে হয়। পেটটা শুকিয়ে অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেছে, সেখানেও তামাটে চামড়ার ওপর এই রকম সব চাকা - তবে অনেকটা হালকা রঙের। জখমের জায়গা থেকে, পাতলুনে শুকিয়ে কালচে বাদামী রঙধরা রক্ত থেকে এখন বিশ্রী পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। চুমাকোভ আঙুলে নাক টিপে ধরে বন্ধুর পা পরীক্ষা করতে থাকে। মুখ বিকৃত করে। একটা বমি বমি ভাব গলা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। অনেক কষ্টে সে চেপে রাখে। স্তের্লিয়াদ্নিকভের চোখের পাতা নীল হয়ে নেমে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে ভালো ক'রে দেখার পর ফোমিনের সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় হল।

'মনে হয় ঘা শুঁড়ি হয়ে পচতে শুরু করেছে। . . . হুম। . . . গতিক তোর ভালো নয়, ভাসিলি স্তের্লিয়াদ্নিকভ। . . . অবস্থা একেবারেই সঙ্গীন। . . . ইস্ ভাসিয়া, এরকম কী ক'রে হতে দিলি? . . .'

স্তের্লিয়াদ্নিকভ হাঁপাতে হাঁপাতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। একটি কথাও বলছিল না। ফোমিন আর গ্রিগোরি যেন কোন হুকুম পেয়ে একই সঙ্গে নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। হাওয়ার দিকে মুখ করে তারা এগিয়ে এলো জখম লোকটার কাছে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থাকার পর সে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল, ঘোলাটে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল সকলকে। দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে কঠিন বৈরাগ্যের ভাব।

'ভাইসব, তোমরা আমাকে মেরে ফেল! . . . এ পৃথিবীতে আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। . . . আর সইতে পারছি না এ যাতনা, আর শক্তি নেই আমার। . . .'

আবার চিত হয়ে শুয়ে সে চোখ বুজল। এরকম একটা অনুরোধ যে এক সময় আসবে ফোমিন আর বাকি সকলের তা জানা ছিল। এর অপেক্ষায় ছিল ওরা। কোশেলেভের দিকে এক পলক দৃষ্টি হেনে ফোমিন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এদিকে কোশেলেভ এতটুকু ওজর-আপত্তি না ক'রে চটপট কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে নিল। চুমাকোভ এক পাশে সরে গিয়েছিল। 'মেরে ফেল!' শোনার চেয়ে চুমাকোভের ঠোঁট নাড়া দেখেই বুঝি বা কোশেলেভ আন্দাজ করতে পারল কথাগুলো। কিন্তু স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ আবার চোখ খুলল, দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'এখানটায় গুলি কর!' হাত তুলে আঙুল দিয়ে সে দু'চোখের মাঝখানে নাকের খাঁজটা দেখিয়ে দেয়। 'তাহলে আলো নিভতে এতটুকু দেরি হবে না। . . . আমার গাঁয়ে যদি কখনও যাও তাহলে আমার বৌকে বলবে কী ভাবে কী হল। . . . আর যেন অপেক্ষা না করে আমার জন্যে।'

কোশেলেভের হাবভাব কেমন যেন সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। রাইফেলের ছিটকিনিটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খুটখাট করতে থাকে। দেরি করতে লাগল সে। স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ চোখের পাতা নামিয়ে এই ফাঁকে তার অসমাপ্ত কথাটা শেষ করল।

'আমার সংসার বলতে শুধু আমার বৌ। . . . ছেলেপুলে আমাদের নেই। . . . একটাই বিইয়েছিল, সেটাও জন্মাল মরা। . . . এরপর আর হয় নি। . . .'

কোশেলেভ দু'বার রাইফেল উঠিয়েছিল, দু'বারই নামিয়ে রাখল। ক্রমেই যেন আরও বেশি ফেকাসে হয়ে উঠতে লাগল ওর মুখ। . . . চুমাকোভ খাপ্পা হয়ে ওর কাঁধে এক ঠেলা মেরে হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল।

'যদি না-ই পারিস ত খবরদারি করতে গিয়েছিলি কেন? কুকুর ছানারও অধম! . . .' ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে চুমাকোভ। মাথার টুপি খুলে চুলে হাত বুলায়।

'শিগগির কর!' রেকাবে পা রেখে ফোমিন তাগাদা দিল।

লাগসই কথা হাতড়াতে হাতড়াতে চুমাকোভ ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে বলতে লাগল, 'ভাসিলি! বিদায়! ভগবানের দোহাই, আমাকে, আমাদের সবাইকে ক্ষমা কোরো! পরকালে আবার আমাদের দেখা হবে, তখন ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন। তোমার স্ত্রীকে যা বলতে বলেছ সব বলব।' জবাবের আশায় একটু অপেক্ষা করল সে। কিন্তু স্তের্লিয়াদ্‌নিকভ নীরব। মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পাণ্ডুর তার মুখ। শুধু তার চোখের পাতা রোদে ঝলসে যাচ্ছে, তিরতির ক'রে কাঁপছে। যেন বাতাসে কাঁপছে। আঁটো ফৌজী জামার বুকের ভাঙা বোতামটা কেন যেন আঁটার চেষ্টা করছে, তাইতে বাঁ হাতের আঙুলগুলো অল্প অল্প কেঁপে উঠছে।

জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছে গ্রিগোরি। কিন্তু এ মৃত্যু দেখার জন্য সে আর দাঁড়াল না। মুখের লাগাম জোরে চেপে ধরে ঘোড়াটাকে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে গেল। গুলির আওয়াজটার জন্য এমন একটা অনুভূতি নিয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকে যেন ওটা তার নিজেরই পিঠে দু'কাঁধের ফলকের মাঝখানে এসে বিঁধবে।... গুলির জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের ওঠা পড়ার তালের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত সে গুনতে থাকে। কিন্তু যেই মুহূর্তে পেছন থেকে একটা ছাড়া তীক্ষ্ণ আওয়াজ ক'রে গুলি ফেটে পড়ল, অমনি ওর হাঁটু যেন ভেঙে পড়ল। ঘোড়াটা চমকে উঠে পেছনের দু'পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কোন রকমে সেটাকে সামলাল।...

ঘণ্টা দুয়েক সকলে চুপচাপ চলল। শুধু বিশ্রাম নিতে যখন তারা থামল তখন চুমাকোভই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল। করতলে চোখ ঢেকে ধরা গলায় সে বলল, 'কেন ছাই গুলি করতে গেলাম ওকে? ওকে স্তেপের মাঠে ফেলে গেলেই ত হত – তাহলে বাড়তি পাপের বোঝাটা ঘাড়ে চাপত না। এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে।...'

ফোমিন জিজ্ঞেস করল, 'এখনও গা সওয়া হয়ে ওঠে নি? কত মানুষকে ত মারলে এ জীবনে – তাতেও সইতে পারছ না? তোমার বুকের ভেতরে যা আছে সেটা ত কলজেই নয়! তার বদলে ওখানে আছে মরচে ধরা লোহালক্কড়।'

চুমাকোভের মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। কটমট ক'রে তাকাল ফোমিনের দিকে।

চাপা গলায় সে বলল, 'আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না বলছি, ইয়াকভ ইয়েফিমভিচ! আমায় জ্বালিও না। নইলে কিন্তু তোমাকেই সাবাড় করে দেবো খুবই সহজে।'

'তোমাকে জ্বালাতে যাব কোন্ দুঃখে? অমনিতেই আমার ঝামেলার অন্ত নেই,' আপসের সুরে এই কথা বলে ফোমিন চিত হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। রোদে চোখ কোঁচকায়, আরামে হাত পা ছড়িয়ে দেয়।

ষোল

গ্রিগোরির আশঙ্কাকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে দিন দশেকের মধ্যে জনা চল্লিশ কসাক তাদের দলে এসে ভিড়ল। সোভিয়েতের লোকজনদের সঙ্গে বিভিন্ন লড়াইয়ে ছোট ছোট যে সমস্ত দল ভেঙে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছিল এরা ছিল তাদেরই ঝড়তি পড়তি অংশ। নিজেদের সর্দারদের হারিয়ে তারা এই এলাকায় উদ্দেশ্যহীন

ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা সোৎসাহে ফোমিনের সঙ্গে যোগ দিল। কার চাকরি করবে, অথবা কাকে খুন করবে এ সব প্রশ্ন তাদের কাছে সম্পূর্ণ গৌণ ছিল, স্বাধীন যাযাবর জীবন যাপন আর হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তার ওপরে রাহাজানি করতে পারা – এই সুযোগ পেলেই তারা খুশি। লোকগুলো একেবারে উচ্ছন্নে যাওয়া। তাদের দেখে গ্রিগোরির দিকে ফিরে ফোমিন অবজ্ঞাভরে মন্তব্য করে, 'নাঃ মেলেখভ, মানুষ ত নয়, কতকগুলো স্রোতের আবর্জনা আমাদের কাছে এসে জমেছে। . . . বাছা বাছা সব ফাঁসীর আসামী!' এখনও ফোমিন মনের গভীরে নিজেকে 'মেহনতী জনতার যোদ্ধা' বলে মনে করে। আগের মতো অত ঘন ঘন না হলেও এখনও বলে থাকে: 'আমরা কসাক জনগণের মুক্তিদাতা। . . .' এই আশা চরম মূর্খতার নামান্তর হলেও গোঁয়ার্তুমি ক'রে তাকে সে আঁকড়ে ধরে থাকে। . . . তার সঙ্গীসাথীরা লুটপাট করতে থাকলে আগের মতোই এখনও সে তা দেখেও দেখে না। তার ধারণা এসব অনিষ্ট এড়ানোর উপায় নেই, এগুলোকে মেনে নিতেই হবে, সময়ে এই লুটেরাদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে এবং আজ হোক কাল হোক ছোটখাটো ডাকাত দলের সর্দার আর সে থাকছে না – বিদ্রোহী বাহিনীর একজন খাঁটি সেনাপতি হবেই হবে। . . .

কিন্তু চুমাকোভ এতটুকু সঙ্কোচ না ক'রে ফোমিনের দলবলকে 'ডাকাতদল' বলে থাকে। গলা ভেঙে গেলেও তর্ক ক'রে ফোমিনকে সে বোঝাতে যায় যে ফোমিন একজন রাহাজান ছাড়া আর কিছু নয়। বাইরের কেউ আশেপাশে না থাকলে ওদের দু'জনের মধ্যে প্রায়ই তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যায়।

রাগে ফোমিনের মুখ লাল টকটকে হয়ে ওঠে। সে চেঁচিয়ে বলে, 'আমি আদর্শের খাতিরে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আর তুমি কি না যা নয় তাই বলে আমাকে বদনাম দিচ্ছ! আমি যে একটা আদর্শের জন্য লড়ছি এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধিও তোমার নেই, বোকা কোথাকার!'

চুমাকোভ প্রতিবাদ করে বলে, 'ওসব কথা বলে আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না! যা খুশি তাই বলে আমাকে বুঝ দেবে অত বোকা আমি নই। আমি তোমার কচি খোকাটি নই! আদর্শ কপচানো হচ্ছে! খাঁটি ডাকাত বলতে যা বোঝায়, তুমি তাই – এর বেশি কিছু নও। কথাটাতে এত ভয় কিসের তোমার? আমি ত বুঝতে পারি না বাপু!'

'আমায় কেন এমন অপমান কর? তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না? সরকারের বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ, অস্ত্র হাতে তার সঙ্গে আমি লড়াই করছি। আমি হয়ে গেলাম ডাকাত?'

'ঠিক এই কারণেই ত ডাকাত যে সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছ। যারা ডাকাত

তারা সব সময়ই সরকারের বিরুদ্ধে - আবহমান কাল ধরে এটা চলে আসছে। সোভিয়েত সরকার যা-ই হোক না কেন, একটা সরকার ত বটে। সতেরো সাল থেকে ক্ষমতায় আছে, তার বিরুদ্ধে যে যাবে সে-ই ডাকাত।'

'তোমার মাথায় কিছু নেই। তাহলে জেনারেল ক্রাস্নোভ বা দেনিকিন - তাঁরাও ডাকাত ছিলেন?'

'তা নয় ত কী? শুধু ওদের কতকগুলো তকমা-টকমা ছিল এই যা। . . . তা ছাড়া ওসব তকমাও ত অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তুমি আমিও লাগাতে পারি। . . .'

ফোমিন টেবিলের ওপর ঘুষি মারে, রাগে থুতু ফেলে। লাগসই কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে অর্থহীন তর্কের ছেদ টানে। চুমাকোভকে কোন ব্যাপারে বোঝানো অসম্ভব। . . .

নতুন যারা ডাকাতে দলে যোগ দিয়েছিল তাদের বেশির ভাগেরই চমৎকার অস্ত্রশস্ত্র আর পোশাকপরিচ্ছদ। প্রায় সকলেরই ভালো ঘোড়া। সেগুলো একটানা অনেকদূর চলতে অভ্যস্ত, অনায়াসে দিনে তিরিশ-চল্লিশ ক্রোশ পথ পাড়ি দিতে পারে। কারও কারও আবার দুটো ক'রে ঘোড়া। একটায় জিন কষিয়ে সওয়ার হয়ে চলে। আরেকটাকে বলা হয় সঙ্গী ঘোড়া, সেটা পিঠের বোঝা ছাড়া ঘোড়সওয়ারের পাশে পাশে চলে। দরকারি হলে এক ঘোড়া থেকে আরেক ঘোড়ার পিঠে বসে পালা ক'রে ওদের বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া যায়। এই ভাবে দুই ঘোড়ার সওয়ার ইচ্ছে করলে দিনে ষাট-সত্তর ক্রোশ পথ যেতে পারে।

একদিন গ্রিগোরিকে ফোমিন বলল, 'আমাদের যদি গোড়া থেকেই প্রত্যেকের দুটো ক'রে ঘোড়া থাকত তাহলে কার বাপের সাধ্যি হত আমাদের নাগাল ধরে। মিলিশিয়া কিংবা লাল ফৌজের লোকেরা সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে ঘোড়া নিতে পারে না। সে কাজ করতে ওদের বাধে। কিন্তু আমরা যা খুশি তাই করতে পারি। প্রত্যেকের জন্যে একটা ক'রে বাড়তি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে আমাদের আর কখনই ধরতে পারবে না। বুড়ো লোকদের মুখে শুনেছি বটে, আগেকার দিনে নাকি তাতাররা কোথাও হানা দিতে গেলে প্রত্যেকে দুটো এমনকি তিনটে ক'রে ঘোড়াও সঙ্গে নিত। কে ওদের ধরবে বল? আমাদের তাই করতে হবে। তাতারদের এই বুদ্ধিটা আমার বেশ মনে ধরেছে।'

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ঘোড়ার আর কোন অভাব তাদের রইল না। এর ফলে প্রথম প্রথম ওদের ধরা সত্যি সত্যিই অসাধ্য হয়ে পড়েছিল। ভিওশেনস্কায়াতে নতুন ক'রে যে ঘোড়সওয়ার মিলিশিয়া দল গড়া হয়েছিল তারা ওদের পাকড়াও করতে গিয়ে ব্যর্থ হল। বাড়তি ঘোড়া থাকার ফলে ফোমিনের স্বল্পসংখ্যক লোকের

দলটি অনায়াসে শত্রুকে পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে যায়, বিপজ্জনক সংঘর্ষের ঝুঁকি নেয় না।

তা সত্ত্বেও মে মাসের মাঝামাঝি সংখ্যায় ওদের দলের প্রায় চারগুণ বড় একটা বাহিনী কৌশল খাটিয়ে উস্ত-খোপিওরস্কায়া জেলার বব্‌রোভ্‌স্কি গ্রামের কাছে দনের দিকে ফোমিনকে চেপে ধরেছিল। কিন্তু ছোটখাটো একটা লড়াইয়ের পর দলটা শেষ পর্যন্ত ব্যূহ ভেঙে দনের পার বরাবর পেরিয়ে যায়। হতাহত নিয়ে আটজন লোক ওরা হারায়। এর কিছুকাল পরেই ফোমিন গ্রিগোরিকে সদর দপ্তরের প্রধানের পদ নিতে বলল।

'আমাদের দরকার একজন লেখাপড়া জানা লোক, যাতে প্ল্যান ক'রে ম্যাপ দেখে চলাফেরা করা যায়। নয়ত কবে আমাদের চেপে ধরবে, আবার ঝাড় দেবে। নাও গ্রিগোরি পান্তেলেয়েভিচ, এ কাজের ভার নাও।'

গ্রিগোরি উত্তরে গোমড়ামুখে বলল, 'মিলিশিয়ার সেপাইদের ধরে ধরে তাদের মাথা কাটা – এর জন্যে কোন দপ্তর-টপ্তরের দরকার হয় না।'

'যে-কোন সৈন্যদলের মাথার ওপরে কারও থাকা দরকার। কী সব বাজে বকছ।'

'কর্তা ছাড়া যদি একান্তই না চলে তোমার তাহলে চুমাকোভকে নাও না কেন সে পদে?'

'কিন্তু তুমি কেন চাও না?'

'এ ব্যাপারের মাথামুণ্ডু আমি বুঝি নে।'

'কিন্তু চুমাকোভ বোঝে?'

'চুমাকোভও বোঝে না।'

'তাহলে কেন ছাই ওকে চাপিয়ে দিচ্ছ আমার ঘাড়ে? তুমি হলে গিয়ে অফিসার। তোমার নিশ্চয়ই কিছু জানা আছে, নানা রকম কায়দা কৌশল আরও সব ব্যাপারে জ্ঞান থাকার কথা তোমার।'

'তুমি যেমন এখন পল্টনের কম্যাণ্ডার হয়েছ আমাকেও তেমনি অফিসার বানানো হয়েছিল! আর কৌশল? সে ত আমাদের একটাই – স্তেপের মাঠে দাবড়ে বেড়াও আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখ...' বিদ্রূপের সুরে গ্রিগোরি বলল।

গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল ফোমিন। আঙুল উঁচিয়ে শাসাল।

'তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই। এখনও নিজেকে আড়ালে রাখতে চাও? সামনে আসতে চাও না? না ভাই, ওটি চলবে না! ট্রুপ কম্যাণ্ডারই হও আর স্টাফের চীফই হও – সকলের দাম এক। তুমি ভাবছ তোমাকে পেলে ওরা ছেড়ে কথা কইবে? সেই আশাতেই থাক।'

'ওসব কিছুই আমি ভাবছি না। খামোকা তুমি উলটো পালটা যত অনুমান

করছ।' গ্রিগোরি তার তলোয়ারের হাতলের ফিতেটা মন দিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে বলে। 'যা আমি জানি না সে কাজের ভার আমি নিতে চাই না। . . .'

'নিতে না চাও ত দরকার নেই। তোমাকে ছাড়াই আমরা যা হোক করে চালিয়ে নেবো,' ফোমিন রাজী হয়ে রুক্ষস্বরে বলল।

প্রদেশের পরিস্থিতি ইতিমধ্যে দারুণ ভাবে পালটে গেছে। আগে ফোমিনের জন্য অতিথি সেবার এলাহি আয়োজন ক'রে সর্বত্র স্বচ্ছল কসাকদের বাড়ির দরজা খুলে রাখা হত, এখন ওকে দেখলেই সদর দরজায় খিল পড়ছে। ফোমিনের ঠ্যাঙাড়েদের গ্রামে আবির্ভাব ঘটামাত্র বাড়ির মালিকরা সকলে হুড়োহুড়ি করে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায়, বাগানে আর জলামাঠে লুকিয়ে পড়ে। বিপ্লবী আদালতের এক সদস্যদল ভিওশেন্স্কায়ায় এসেছিল। সেখানেই আদালতের এক সেসনে ফোমিনকে আগে যারা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাদের বিচার ক'রে কঠোর সাজা দেওয়া হল। এই খবর অনেক দূর দূর জেলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাকাতদের যারা খোলাখুলি সমর্থন করেছিল তাদের মনের ওপর এর যথাযথ প্রভাবও পড়ল।

দু'সপ্তাহের মধ্যে ফোমিন উজানী দনের সবগুলো জেলা ভালো মতো চষে বেড়াল। দলে এখন প্রায় একশ' তিরিশজন তলোয়ারধারী সৈন্য। এখন ওদের যারা তাড়া করে ফিরছে তা তাড়াতাড়ি ক'রে গড়ে তোলা কোন ঘোড়সওয়ার দল নয় – দক্ষিণ থেকে যে তেরো নম্বর ক্যাভালরি রেজিমেন্টকে তুলে আনা হয়েছিল তারই কয়েকটা স্কোয়াড্রন।

সম্প্রতি ফোমিনের দলে যে সমস্ত ডাকাত এসে ভিড়েছে তাদের অনেকেই দূর দূর এলাকার লোক। তারা সকলে দনে এসে পড়েছে নানা পথে। কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন ভাবে পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়ে কোন হাজত থেকে, জেলখানা বা বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু বেশির ভাগই মাস্লাকের দলছুট কয়েক ডজন তলোয়ারধারী আর কুরোচ্কিনের বিধ্বস্ত ডাকাত দলের ঝড়তি পড়তি অংশ। মাস্লাকের লোকেরা ইচ্ছে ক'রেই আলাদা আলাদা হয়ে একেক ট্রুপে চলে গেল। কিন্তু কুরোচ্কিনের লোকেরা তাদের দল ভাঙতে রাজী হল না। তারা বাকি সকলের থেকে বেশ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। ভালো মতো জোট বেঁধে পুরোপুরি একটা আলাদা ট্রুপ বজায় রাখল। কি লড়াইয়ের ময়দানে, কি বিশ্রামের সময় তারা সকলে জোট বেঁধে কাজ করে, জানপ্রাণ দিয়ে একে অন্যের জন্য দাঁড়ায়। ক্রেতা সমবায়ের কোন দোকান বা গুদাম লুট ক'রে যা মাল পায় সব তাদের ট্রুপের সাধারণ ভাণ্ডারে এনে জমা করে, সাম্যের নীতি কঠোর ভাবে মেনে নিয়ে সমান ভাগ ক'রে নেয়।

ফোমিনের দলটা অমনিতেই পাঁচমিশালী লোকজন নিয়ে তৈরি। তাদের সকলের পোশাক আশাকও বিচিত্র ধরনের। তাতে আরও বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে লম্বা ঝুলের ছেঁড়াখোঁড়া চেরকাসীয় কোর্তা পরা কয়েকজন 'তেরেক' কসাক আর 'কুবান' কসাক, ভেলিকোক্নিয়াজেস্কায়া জেলার দু'জন কাল্‌মিক, জঙ্ঘাসমান উঁচু শিকারী বুটজুতো পায়ে একজন লাত্‌ভীয়, সেই সঙ্গে পাঁচজন এনার্কিস্ট নাবিক, যাদের গায়ে ডোরাকাটা জাহাজী গেঞ্জি আর রোদে রংজ্বলা জাহাজী কোর্তা।

একবার ওরা যখন লম্বা সার বেঁধে মার্চ করে চলেছে তখন চোখের ইশারায় ওদের দেখিয়ে ফোমিনকে চুমাকোভ বলল, 'এখনও কি তুমি এই বলে তর্ক করবে যে তোমার দলের লোকেরা ডাকাত নয়?... এরা সব... আদর্শের জন্যে লড়াই করতে নেমেছে বলতে চাও? আমাদের অভাব শুধু একজন কাত্তিল-করা পুরুতঠাকুর আর পাতলুনধারী শুয়োর। ওদুটো হলেই সোনায় সোহাগা! একেবারে চাঁদের হাট যাকে বলে!...'

ফোমিন চুপচাপ হজম ক'রে যায়। ওর এখন একমাত্র ইচ্ছে যত বেশি সম্ভব লোক নিজের চারপাশে জড় করা। স্বেচ্ছাসেবকদের দলে নেওয়ার সময় ও কোন রকম বাছবিচার করত না। ওর নেতৃত্বে যে কেউ কাজ করতে ইচ্ছে করলে ও নিজেই তাকে গোটাকতক প্রশ্ন করে, তারপর সংক্ষেপে বলে, 'তোমাকে দিয়ে চলবে। কাজে নিয়ে নিচ্ছি। আমার স্টাফের চীফ চুমাকোভের কাছে চলে যাও। সে তোমাকে বলে দেবে কোন্ ট্রুপে তোমায় নেওয়া হবে, হাতিয়ারও দেবে।'

মিগুলিনস্কি জেলার একটা গ্রামে এক ছোকরাকে ফোমিনের কাছে হাজির করা হল। চুল কোঁকড়া, রোদে পোড়া কালো রঙ, ভালো জামাকাপড় পরা। ছোকরা দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে জানাল। জিজ্ঞেসবাদ ক'রে ফোমিন জানতে পারল যে সে রস্তোভের লোক, মাত্র কিছু দিন আগে সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধে শাস্তি পেয়েছিল, কিন্তু রস্তোভের জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছে। এখন ফোমিনের খবর পেয়ে উজানী দনের এলাকায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

'তোমার জাতিগোত্র কী? আর্মানী না বুল্‌গারী?' ফোমিন জিজ্ঞেস করল।

'না, আমি ইহুদী,' আমতা আমতা ক'রে ছেলেটি জবাব দিল।

ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে ফোমিন হতভম্ব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ওর মুখে কোন কথা জোগাল না। এরকম অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে কী করা উচিত সে বুঝতে পারছিল না। মাথা ঘামিয়ে খানিকক্ষণ ভেবেচিন্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তা হলেই না হয় ইহুদী।... তাদের দেখেও আমরা নাক সিঁটকোই না।... দলে একজন বাড়তি লোক আসা সব সময়ই ভালো। ঘোড়ায় চড়তে পার? পার না? যাক গে শিখে নেবে। গোড়ায় আমরা তোমাকে একটা খুব

সাদাসিধে ছোটখাটো ধরনের ঘোড়া দেবো। পরে শিখে নেবে। চুমাকোভের কাছে চলে যাও, ও তোমায় বলে দেবে কোন্ ট্রুপে যেতে হবে।'

কয়েক মিনিট বাদে চুমাকোভ রাগে উত্তেজিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফোমিনের কাছে এসে হাজির।

'তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, নাকি তামাসা করছ?' লাগাম টেনে ঘোড়া সামলাতে সামলাতে চেঁচিয়ে ওঠে সে। 'একটা ইহুদী হারামজাদাকে আমার কাছে পাঠালে কী বলে? আমি নিতে পারব না! যেখানে খুশি চলে যাক!'

'নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। দল ভারী হবে,' শান্ত গলায় ফোমিন বলে।

কিন্তু চুমাকোভ মুখে ফেনা তুলতে তুলতে গলা ফাটিয়ে বলল, 'নেবো না! নেবো ত না-ই, খুন করে ফেলব! কসাকরা এই নিয়ে কথা শুরু ক'রে দিয়েছে। তুমি নিজে গিয়ে ওদের যা বলার বল গে!'

ওদের দু'জনের মধ্যে যতক্ষণ তর্কবিতর্ক আর বচসা চলছে সেই ফাঁকে কসাকরা একটা মালগাড়ির কাছে ইহুদী ছোকরাটাকে টেনে নিয়ে তার গায়ের এম্ব্রয়ডারি করা শার্ট আর বনাত কাপড়ের বেল-বটম পাতলুনখানা খুলে নিয়েছে। একজন কসাক জামাটা নিজের গায়ে পরে দেখতে দেখতে বলল, 'ওই যে গাঁয়ের বাইরে লম্বা লম্বা আগাছার একটা পুরনো ঝোপ দেখতে পাচ্ছিস? একছুটে ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়। আমরা যতক্ষণ এখান থেকে না যাই ততক্ষণ শুয়ে থাকবি। চলে গেলে উঠে যেখানে খুশি যেতে পারিস। আমাদের কাছে আর আসার চেষ্টা করিস নে। ভালোয় ভালোয় মায়ের ছেলে রস্তোভে তোর মায়ের কাছে ফিরে যা। লড়াই করা তোদের ইহুদী জাতের কম্ম নয়। প্রভু তোদের লড়াই করতে শেখান নি, শিখিয়েছেন ব্যবসা করতে। তোদের ছাড়াই আমরা চালিয়ে নিতে পারব, আমরা যা পাকিয়েছি তা আমরাই খেয়ে হজম করতে পারব!'

ইহুদীটাকে নেওয়া হল না। কিন্তু ওই দিনই ভিওশেনস্কায়া জেলার সব ক'টি গাঁয়ে হাবাগোবা বলে যাকে সকলে এক ডাকে চেনে সেই পাশাকে দু'নম্বর ট্রুপে ভর্তি ক'রে নেওয়া হল। এই নিয়ে দলের সকলে খুব হাসিঠাট্টাও করল। ওকে ধরা হয়েছিল স্তেপের মাঠে। ওকে গ্রামে এনে মহা ধুমধাম ক'রে একজন নিহত লাল ফৌজীর উর্দি পরানো হল, রাইফেল চালানোর কায়দাকানুন শেখানো হল, কী ভাবে তলোয়ার চালাতে হয় তাও শেখান হল অনেকক্ষণ ধরে।

গ্রিগোরির ঘোড়াটা খুঁটিতে বাঁধা ছিল। ঘোড়াটার কাছে যেতে গিয়ে একপাশে অতগুলো লোকের ঘন ভিড় দেখে সে সেই দিকে পা বাড়াল। দম ফাটা হো হো হাসি শুনে পায়ের গতি আরও বাড়িয়ে দিল। এর পর যে নীরবতা নেমে এলো তার মাঝখানে গ্রিগোরি শুনতে পেল কে একজন গুরুগিরি ফলিয়ে বেশ

গুরুগম্ভীর গলায় বলছে, 'আরে না না পাপা। অমন নয়। ও ভাবে কেউ কোপ বসায় নাকি? ও ভাবে কাঠ কাটা যায়, মানুষ কাটা চলে না। এই যে এই ভাবে, বুঝলে? লোকটাকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাঁটু গেড়ে বসার হুকুম দেবে। দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে কাটতে তোমার অসুবিধে হবে।... যেই হাঁটু গেড়ে বসবে অমনি তুমি পেছন থেকে এই যে এ ভাবে বসিয়ে দেবে গর্দান ঘেঁসে এক কোপ।... দেখবে সোজা মারবে না, তেরছা ক'রে পোঁচ বসিয়ে নিজের দিকে হেঁচকা টান মারবে।...'

চারধার ঘিরে আছে ডাকাতগুলো। মাঝখানে হাবাটা বুক টান টান ক'রে দাঁড়িয়ে আছে খোলা তলোয়ারের বাঁটখানা শক্ত হাতের মুঠোয় ধরে। ওর ধূসর রঙের ড্যাবডেবে চোখদুটো পরম সুখাবেশে বুজে আসছে, হাসিমুখে গদগদ হয়ে সে শুনে যাচ্ছে একজন কসাকের উপদেশ। জাব কাটার সময় ঘোড়ার যেমন হয় ওরও ঠোঁটের কোনায় তেমনি সাদা ফেনা জমে উঠেছে, তামাটে লাল দাড়ি বয়ে বুকের ওপর গড়িয়ে পড়ছে প্রচুর লালা।... লালায় ভেজা ঠোঁট চাটতে চাটতে শিসের মতো আওয়াজ তুলে আড়িয়ে আড়িয়ে সে বলছে, 'সব বুঝতে পেরেছি গো, সবই বুঝেছি। যা যা বললে ঠিক তা-ই করব।... ভগবানের দাসকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলব, তারপর দেবো ঝপাং ক'রে ঘাড়ে এক কোপ বসিয়ে। কাটব... কেটে একেবারে দু'ফাঁক ক'রে দেবো! তোমরা আমায় পাতলুন দিয়েছ, জামা দিয়েছ, জুতো দিয়েছ।... কিন্তু দেখ ওপরের ওই কোটটাই আমার নেই।... ওরকম একটা অন্তত ছোটখাটো কোটও যদি আমায় দাও তাহলে আমি তোমাদের কাজে লাগব। জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব!'

'লালদের কোন কমিশনারকে যদি মারতে পার তাহলেই তোমার কোট জুটে যাবে। কিন্তু গেল বছর তোমার বিয়েটা কেমন হল সেটা এবার শোনাতে হবে,' একজন কসাক প্রস্তাব করল।

হাবা লোকটার বিস্ফারিত চোখের ঘোলাটে পর্দার ওপর একটা জান্তব ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। একরাশ গালাগাল বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে। সকলের হাসি হুল্লোড়ের মাঝখানে কী যেন বলতে থাকে সে। পুরো ব্যাপারটা এমনই ন্যক্কারজনক যে গ্রিগোরি শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি সরে যায়। নিজের ওপর, ওর এই সমস্ত ঘৃণ্য জীবনের ওপরই আক্ষেপে, তিক্ততায় ও রাগে ভরে ওঠে মন। মনে মনে ভাবে – 'এই সব লোকের সঙ্গে কিনা নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছি!...'

ঘোড়া বাঁধার খুঁটিগুলোর কাছেই সে শুয়ে পড়ল। চেষ্টা করল হাবা লোকটার চিৎকার আর কসাকদের হাসির হর্‌রা যাতে কানে না আসে। নিজের ঘোড়াদুটো ইতিমধ্যে দানাপানি খেয়ে বেশ সবল হয়ে উঠেছে। সেই দিকে তাকিয়ে ও মনে

মনে মনে সঙ্কল্প করল, 'আর নয়। কালই সরে পড়ব।' পালানোর পরিকল্পনাটা বেশ যত্ন ক'রে ভেবেচিন্তে তৈরি করেছিল। এক সম্বর্ষের সময় উশাকোভ নামে এক মিলিশিয়া-সেপাই কাটা পড়েছিল। সেপাইটার কাছ থেকে তার নামে লেখা কাগজপত্রগুলো নিয়ে গ্রিগোরি তার নিজের ওভারকোটের আস্তরের ভেতরে সেলাই ক'রে রেখে দেয়। দুসপ্তাহ আগে থেকেই ঘোড়াদুটোকে অল্প দূরত্বে দ্রুত ছোটার তালিম দিতে শুরু করেছিল। সময় মতো ওদের জল খাওয়ায়। এত যত্ন ক'রে ধোয়ামোছা করে যে পল্টনে নিয়মিত চাকরি করার সময়ও তেমন কখনও করে নি। সাধু-অসাধু যে-কোন উপায়েই হোক, রাত্রে ওদের দানা যোগাড় করে। ওর ঘোড়াগুলোকে দলের আর সকলের ঘোড়ার চেয়ে ভালো দেখায় – বিশেষত ছাইরঙা তাতারীয় ঘোড়াটা, যেটার গায়ে গোল চাকা চাকা দাগ। ঘোড়াটা আগাগোড়া চকচক করছে, সূর্যের আলোয় তার গায়ের লোম চিকচিক করছে কালচে রঙধরা ককেশীয় রুপোর মতো।

যত বড় শত্রুই তাড়া করুক না কেন, এমন ঘোড়া থাকলে তার পিঠে চড়ে পালিয়ে যাওয়ার সাহস রাখা যেতে পারে। গোলাঘরের চৌকাটে যে বুড়ি বসে ছিল তাকে গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল, 'একটা কাস্তে হবে দিদিমা?'

'কোথায় যেন ছিল একটা। কিন্তু এখন কোথায় আছে কে জানে বাপু? কেন, কী হবে?'

'তোমাদের জলাজমিতে গিয়ে ঘোড়াগুলোর জন্যে খানিকটা সবুজ ঘাস কাটার ইচ্ছে ছিল। কাটতে পারি?'

বুড়ি একটু ভেবে বলল, 'আমাদের ঘাড় থেকে তোমরা কবে নামবে বল ত? কেবল এটা দাও, ওটা দাও। একদল এসে ফসল দাবি করে, আরেকদল এলো ত চোখের সামনে যা পড়ল সব কেড়েকুড়ে নিয়ে চলে গেল। কোন কাস্তে-টাস্তে তোমায় দিতে যাচ্ছি নে! যা খুশি তাই কর গে, দেবো না।'

'কেন গো বুড়ি মা, একটু ঘাস তুমি প্রাণে ধরে দিতে পার না?'

'তোমার কি মনে হয় ঘাস আকাশ থেকে আসে? গোরুকে আমি কী খাওয়াই তাহলে?'

'স্তেপের মাঠে কি ঘাসের কমতি আছে?'

'বেশ ত, সেখানে গিয়েই ঘাস কাট না কেন বাছা আমার? ঠিকই বলেছ, স্তেপের মাঠে অনেক আছে।'

গ্রিগোরি বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি বরং কাস্তেটা দাওই না গো দিদিমা। আমি এই একটুখানি কেটে আনব, বাকিটা তোমারই থেকে যাবে। কিন্তু ঘোড়াগুলোকে যদি আমরা মাঠে ছেড়ে দিই তাহলে সবটুকু যাবে!'

বুড়ি কঠিন চোখে গ্রিগোরির দিকে তাকাল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'যাও, নাও গে। ওই চালাঘরের বাতার নীচেই কোথাও ঝুলছে।'

গ্রিগোরি চালাঘরের বাতার নীচে খুঁজে পেতে একটা পুরনো ঝরঝরে কাস্তে বার করে। বুড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট শুনতে পেল সে বকবক করছে, 'তোমাদের মতো এই হতভাগাগুলোর হাত থেকে একটুও নিস্তার নেই গো!'

এসব ব্যাপার গা সওয়া হয়ে গেছে গ্রিগোরির। গ্রামের লোকেরা ওদের কী চোখে দেখে থাকে, অনেক দিন হল সে লক্ষ ক'রে এসেছে। সাবধানে কাস্তে চালিয়ে যাতে কোন অনিষ্ট না হয় এই ভাবে পরিষ্কার ক'রে ঘাস কাটার চেষ্টা করে গ্রিগোরি, আর মনে মনে ভাবে, 'ওরা ঠিকই বলে। আমাদের নিয়ে ওদের দরকারটাই বা কী? আমরা কারও কোন কাজে লাগি না। আমরা সকলকে শান্তিতে বসবাস করতে, কাজ করতে বাধা দিচ্ছি। এ জিনিস বন্ধ করতে হবে, আর নয়!'

নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে সে ঘোড়াগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখে কেমন লোভীর মতো ওরা ওদের কালো মখমল ঠোঁটের ফাঁকে চেপে নিয়ে কোমল কচি ঘাসের গোছা চিবুচ্ছে। ওর ধ্যানভঙ্গ হল এক কিশোরের গলার আওয়াজে - সবে ভেঙ্গে মোটা হতে শুরু করেছে গলার আওয়াজটা।

'কী চমৎকার ঘোড়া! ঠিক যেন রাজহাঁস!'

গ্রিগোরি ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল বক্তাকে। আলেক্সেয়েভ্স্কায়া জেলা-সদরের এক অল্পবয়সী কসাক, সবে ফোমিনের দলে এসে ঢুকেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছাইরঙা ঘোড়াটাকে দেখছে, মাথা নেড়ে তারিফ করছে। ঘোড়ার ওপর থেকে মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি না সরিয়ে বেশ কয়েকবার তার চারপাশে ঘুরল সে,-জিভ দিয়ে আলটাকরায় টুসকি মারল।

'তোমার নাকি?'

'তোমার তাতে কী?' রুক্ষস্বরে গ্রিগোরি জবাব দিল।

'বদলাবদলি করবে? আমার একটা আছে পাটকিলে রঙের, খাঁটি দন জাতের রক্ত তার শরীরে। যে-কোন বাধা ডিঙিয়ে যেতে পারে। আর যা তেজী, ওঃ কী বলব! ঠিক যেন বিজলী!'

'চুলোয় যাও!' নিস্পৃহ গলায় গ্রিগোরি বলল।

ছোকরা একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর সখেদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাছেই এসে বসল। বেশ খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাইরঙাটাকে দেখার পর শেষ পর্যন্ত বলল, 'তোমার ঘোড়াটার পাঁজর বসা। ঠিক মতো নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় ওর।'

গ্রিগোরি কোন কথা না বলে একটা কুটো দিয়ে দাঁত খোঁচাতে থাকে। এই সাদাসিধে ছোকরাটাকে ওর ভালো লাগতে শুরু করেছে।

'তাহলে বদলাবদলি করবে না দাদা?' গ্রিগোরির দিকে মিনতি ভরা চোখে চেয়ে সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল।

'না। এমনকি ঘোড়ার সঙ্গে তুমি যদি নিজেকে দাও তা হলেও নয়।'

'ঘোড়াটা তুমি পেলে কোত্থেকে?'

'আমার মাথা থেকে।'

'না না সত্যি করে বল না!'

'সেই একই ফটক থেকে যেখান থেকে সব ঘোড়া আসে - একটা মাদী ঘোড়া ওকে পেটে ধরেছিল।'

'নাঃ এমন বোকা লোকের সঙ্গে কথা বলার কোন মানে হয় না!' ক্ষুব্ধ স্বরে এই বলে ছোকরা সেখান থেকে সরে পড়ল।

গ্রিগোরির সামনে গ্রামটা পড়ে আছে শূন্য, প্রাণের কোন চিহ্ন নেই সেখানে। ফোমিনের দল ছাড়া আশেপাশে কোন জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। গলির মধ্যে একটা পরিত্যক্ত মালগাড়ি, উঠোনে কাঠ কাটার একটা গুঁড়ি, তার ওপর তাড়াতাড়িতে গেঁথে রেখে ফেলে যাওয়া একটা কুড়ুল, কাছেই একটা তক্তা যেটা সম্পূর্ণ চাঁছা হয় নি। জোয়ালে জোতা গোটা কয়েক বলদ রাস্তার মাঝখানে অলস ভাবে অবাড়ন্ত ঘাস ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে, কুয়োর পারে একটা বালতি উল্টে পড়ে আছে। গোটা দৃশ্যটা এ কথাই বলছে যে গ্রামের শান্ত জীবনপ্রবাহ আচমকা ব্যাহত হয়েছে, গেরস্থরা তাদের কাজ অসমাপ্ত রেখেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। . . .

এই একই রকমের জনশূন্যতা, স্থানীয় লোকজনের দ্রুত পলায়নের এমনই চিহ্ন গ্রিগোরি দেখেছিল কসাক রেজিমেন্ট পূর্ব প্রাশিয়ার ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়। এখন এই দৃশ্য তাকে দেখতে হচ্ছে তার নিজের দেশে। সেবার যেমন সাক্ষাতের সময় জার্মানদের দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা আর ঘৃণা ফুটে উঠত এবারে তারই দেখা মিলছে উজানী দনের কসাকদের দৃষ্টিতে। বুড়ির সঙ্গে কথাবার্তা মনে পড়ে যায় গ্রিগোরির। বেদনায় ব্যাকুল হয়ে সে আশে পাশে চেয়ে দেখে, জামার কলারের বোতাম খোলে। বুকের ভেতরের সেই হতচ্ছাড়া ব্যথাটা আবার শুরু হয়ে যায়। . . .

রোদের তাপে মাটি তেতে উঠেছে। গলির ভেতরে ঘোড়ার ঘাম, বাথুয়া শাক আর ধুলোর সোঁদা সোঁদা গন্ধ। কূলের জলামাঠে উঁচু উইলোঝাড়ের মাথাগুলো আলুথালু কাকের বাসায় ছেয়ে আছে। কাকেরা ডেকে চলেছে। গিরিখাতের মাথার ওপরকার কোন ঝরনার জলে পুষ্ট হয়ে স্তেপের একটা ছোট্ট নদী গ্রামের ভেতর

দিয়ে মন্থরগতিতে বয়ে চলেছে গ্রামটাকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে দিয়ে। দুই তীর ধরেই তার দিকে গড়িয়ে আসছে কসাক বাড়ির প্রশস্ত আঙিনাগুলো। বাগিচায় ঘন হয়ে ছেয়ে আছে সেগুলো। চেরী গাছের ডালপালায় আড়াল পড়ে গেছে কুটিরের জানলা। সূর্যের দিকে শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে আছে ঝাঁকড়া আপেলগাছগুলো, তাদের সবুজ পাতা আর কচি ফলের গুচ্ছ।

ঝাপসা চোখের দৃষ্টিতে গ্রিগোরি তাকিয়ে দেখে বড় বড় চেটাল পাতাওয়ালা গাছের ঝোপে ঢাকা একটা বাড়ির উঠোন। খড়ের চালে ছাওয়া কুটির। হলুদ রঙের খড়খড়ি। কুয়োর ওপরে জল তোলার উঁচু কপিকল। . . . মাড়াই উঠোনের ধারে পুরনো বেড়ার একটা খুঁটির গায়ে ঝুলছে একটা ঘোড়ার মাথার খুলি। বৃষ্টির জলে ধুয়ে সাদা হয়ে গেছে, চোখের খালি কোটরদুটো কালো হয়ে জেগে আছে। ওই খুঁটিটারই গা বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে সূর্যের আলোর দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে একটা কুমড়োলতা। লতাটা তার শুঁয়ো ওঠা ছোট ছোট শুঁড় দিয়ে ঘোড়ার খুলির খাঁজ আর মরা দাঁতের পাটি আঁকড়ে ধরে খুঁটির আগায় পৌঁছে গেছে। তার ঝুলে থাকা ডগাটা অবলম্বনের সন্ধানে ইতিমধ্যেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কাছের বনগোলাপ ঝাড়টার দিকে।

এসব কি গ্রিগোরি স্বপ্নের মধ্যে কখনও দেখেছিল? না কি দেখেছিল সুদূর অতীতে তার শৈশবের দিনগুলোতে? হঠাৎ একটা তীব্র আকুলতা ওকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। দু'হাতে মুখ ঢেকে বেড়ার ধারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে গ্রিগোরি। উঠে দাঁড়াল একমাত্র তখনই যখন দূর থেকে শুনতে পেল টানা গলার চিৎকার: 'জিন চাপাও!'

রাত্রে মার্চ করতে করতে পথ চলার সময় সারি থেকে বেরিয়ে এলো গ্রিগোরি। যেন এক ঘোড়া থেকে আরেক ঘোড়ার পিঠে জিন পালটে চাপবে এই ছল করে থমকে দাঁড়াল। তারপর কান পেতে শোনে ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ একটু একটু ক'রে দূরে সরে যেতে যেতে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। তখন সে এক লাফে জিনের আসনে চেপে বসে রাস্তা ছেড়ে হুড়হুড় ক'রে অন্য দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

প্রায় ক্রোশ দেড়েক একনাগাড়ে ঘোড়া ছুটাল একবারও না থেমে। এরপর গতি একটু মন্দ ক'রে দিল, কান পেতে শুনে নিল কেউ পিছু ধাওয়া করছে কিনা। স্তেপের মাঠে সব সুনসান। শুধু থেকে থেকে বালিয়াড়ির কাছে করুণকণ্ঠে ডাকাডাকি করছে জলপিপিরা। অনেক অনেক দূরে কোথায় যেন কুকুর ডাকছে – কানে প্রায় শোনাই যায় না।

কালো আকাশের গায়ে মিটিমিটি তারার সোনালি চুমকি ছড়ানো। স্তেপের

মাঠে নিস্তব্ধতা। সোমরাজ লতার তিক্ত গন্ধে ভরপুর মৃদুমন্দ বাতাস। বড় আপন মনে হয়।. . . গ্রিগোরি রেকাবে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। গভীর স্বস্তিতে বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নেয়।

সতেরো

ভোর হওয়ার অনেক আগে গ্রিগোরি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলো তাতারস্কির উলটো দিকের ঘাসজমিতে। গ্রামের নীচের দিকে দনের জল অগভীর। সেখানে সে জামাকাপড় একেবারে খুলে ফেলল। জামাকাপড়, বুটজুতো আর অস্ত্রশস্ত্র ঘোড়াদুটোর মাথায় বেঁধে কার্তুজের থলেটা দাঁতে চেপে ধরে গ্রিগোরি তাদের নিয়ে সাঁতরে দন পার হওয়ার জন্য জলে নেমে পড়ল। জল ছাঁত করে গায়ে লাগে, অসহ্য ঠাণ্ডায় ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়। শরীর গরম রাখার চেষ্টায় সে তাড়াতাড়ি ডান হাত ঝপাঝপ ছুঁড়ে সাঁতার কাটতে থাকে। ঘোড়ার মুখের লাগামগুলো বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে রাখে। ঘোড়াগুলো সাঁতার কাটতে কাটতে আর্তনাদ তুলতে আর ঘন ঘন নাক ঝাড়তে থাকলে নীচু গলায় তাদের উৎসাহ দেয়।

পারে উঠে গ্রিগোরি চটপট জামাকাপড় পরে নেয়, জিনের কষি টেনে বাঁধে। তারপর ঘোড়াগুলোর শরীর যাতে গরম হয় সেজন্য টগবগিয়ে তাদের ছুটিয়ে দেয় গ্রামের দিকে। গ্রেটকোটটা জলে ভিজে সপসপ করছে, জিনের পাশগুলো ভিজে গেছে, গায়ের জামাটাও ভিজে। ফলে শরীর ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত লেগে যায়, শিরদাঁড়া সিরসির করতে থাকে, সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপে। কিন্তু দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীর বেশ গরম হয়ে ওঠে। গ্রামের কাছাকাছি আসার পর ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে চলল, আশেপাশে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে লাগল, কান সজাগ রাখল। ঘোড়াদুটোকে খাতের মধ্যে রাখবে ঠিক করল। আলগা নুড়ি পাথরের স্তূপ বয়ে খাতের তলায় নামে। ঘোড়ার খুরের তলায় পড়ে নুড়িপাথরগুলো শুকনো কড়কড় আওয়াজ তোলে, নালের আঘাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের ফুলকি।

শুকনো এল্‌ম গাছটা ছেলেবেলা থেকে চেনা গ্রিগোরির। তার গায়ে ঘোড়া বেঁধে সে হাঁটা দিল গ্রামের দিকে।

এই ত মেলেখভদের সেই পুরনো বাড়ি। আপেলগাছের ছায়াঘন সারি। কুয়োর ওপরে জল তোলার কপিকলটা মাথা উঁচিয়ে আছে সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে। . . . উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রিগোরি দনের দিকে নামে, বেড়া ডিঙিয়ে

সন্তর্পণে আস্তাখভদের উঠোনে এসে ঢোকে, এগিয়ে যায় খড়খড়ি খোলা জানলাটার কাছে। এখন সে শুনতে পাচ্ছে শুধুই বুকের ভেতরে ঘন ঘন স্পন্দন আর মাথার মধ্যে রক্তস্রোতের চাপা সোঁ সোঁ আওয়াজ। জানলার চৌকাটে আস্তে ক'রে টোকা দিল, এত আস্তে যে নিজের কানেই প্রায় শুনতে পেল না। আক্সিনিয়া নিঃশব্দে জানলার কাছে এগিয়ে এসে ঠাহর ক'রে দেখল। গ্রিগোরি দেখতে পেল আক্সিনিয়া দু'হাতে বুক চেপে ধরল, শুনতে পেল একটা অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে। গ্রিগোরি ইশারায় ওকে জানলা খুলতে বলল। রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিল। জানলার পাল্লা পুরো খুলে দিল আক্সিনিয়া।

'আস্তে! কেমন আছ? দরজা খুলো না। আমি জানলা টপকে আসছি,' ফিসফিস ক'রে গ্রিগোরি বলল।

গ্রিগোরি রোয়াকের ওপর দাঁড়াল। আক্সিনিয়ার নিরাবরণ বাহুদুটো ওর গলা জড়িয়ে ধরল। গ্রিগোরির বড় আদরের দুই বাহু ওর কাঁধের ওপর এমন কাঁপতে থাকে, এমন থরথর ক'রে ওঠে যে সেই কাঁপুনি গ্রিগোরির দেহেও সঞ্চারিত হয়।

'আক্সিনিয়া। আক্সিনিয়া আমার! . . . একটু সবুর কর। . . . রাইফেলটা ধর।' হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রিগোরি এমন ফিসফিস করে বলে যে প্রায় শোনাই যায় না।

ঝোলানো তলোয়ারটা হাতে ঠেকিয়ে সামলে নিয়ে গ্রিগোরি জানলার ধারিতে পা রেখে মেঝেতে নামল, তারপর জানলাটা বন্ধ ক'রে দিল।

ও চেয়েছিল আক্সিনিয়াকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু আক্সিনিয়া ওর সামনে ধপ করে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ওর পা। গ্রিগোরির ভিজে গ্রেটকোটে মুখ গুঁজে কান্না চাপার চেষ্টা করে আক্সিনিয়া, কেঁপে কেঁপে ওঠে তার সর্বাঙ্গ। গ্রিগোরি ওকে তুলে ধরে বেঞ্চির ওপর বসিয়ে দিল। গ্রিগোরির ওপর ঝুঁকে পড়ে তার বুকে মুখ লুকোয় আক্সিনিয়া, কোন কথা বলে না। থেকে থেকে ফুলে ফুলে কাঁপছে, গ্রেটকোটের কলার জোরে দাঁতে কামড়ে ধরে কান্না চাপছে, পাছে ছেলেমেয়েদের ঘুম ভেঙে যায়।

আক্সিনিয়ার মনের যতই জোর থাকুক না কেন, সেও যে দুঃখবেদনায় ভেঙে পড়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। গত কয়েক মাসে জীবনের যে অভিজ্ঞতা তার হয়েছে তাও মধুর কিছু নয়, বলাই বাহুল্য। . . . ওর পিঠের ওপর আলুথালু ছড়িয়ে পড়া চুলে আর ঘামে ভেজা তপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দেয় গ্রিগোরি। গ্রিগোরি ওকে প্রাণভরে কাঁদতে দেয়, তারপর জিজ্ঞেস করে, 'ছেলেমেয়েরা ভালো আছে ত?'

'হ্যাঁ।'

'দুনিয়াশা?'

'দুনিয়াশাও।... ভালোই আছে।... সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে।'

'মিখাইল কি বাড়িতে? আরে সবুর কর না! আর কেঁদো না। আমার জামাটা যে পুরো ভিজে গেল তোমার চোখের জলে! শুনছ?... লক্ষ্মীটি আক্সিনিয়া! আর নয়! কান্নাকাটির সময় এখন নেই। হাতে খুব কম সময়।... মিখাইল কি বাড়িতে?'

আক্সিনিয়া চোখের জল মোছে। ভিজে দুই হাতে চেপে ধরে গ্রিগোরির গাল। আদরের মানুষটির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি একবারও না সরিয়ে হাসতে হাসতে চোখের জলের ফাঁকে নীচু গলায় বলে, 'আমি কাঁদব না।... আর কাঁদছি না ত।... না মিখাইল বাড়ি নেই। দু'মাস হল ভিওশেনস্কায়ায় আছে, কোন এক সেপাইদলে কাজ করছে। এসো, ছেলেমেয়েদের একবার দেখে যাও! ওঃ আমরা তোমার আশা করি নি, আশাই করতে পারি নি যে তুমি কখনও আসবে!...'

মিশাত্‌কা আর পলিউশ্‌কা দিব্যি হাতপা ছড়িয়ে খাটে ঘুমোচ্ছে। গ্রিগোরি ওদের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটুখানি সময় দাঁড়িয়ে রইল, তারপর পা টিপে টিপে সরে এসে নীরবে বসে পড়ল আক্সিনিয়ার পাশে।

আক্সিনিয়া উত্তেজিত হয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তোমার খবর কী? কী ভাবে এলে? কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? ওরা যদি তোমাকে ধরে ফেলে?'

'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। ধরতে পারবে বলে মনে হয় না! যাবে?'

'কোথায়?'

'আমার সঙ্গে। আমি দল ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। আমি ফোমিনের দলে ছিলাম। শুনেছ?'

'হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু কোথায় যাব তোমার সঙ্গে?'

'দক্ষিণে। কুবানে, নয়ত আরও দূরে, কোথাও। চালিয়ে নেবো, যা হোক করে খেয়ে পরে থাকা যাবে, কী বল? কোন কাজেই আমার ঘেন্না নেই। আমার এই দু'হাতের এখন লড়াই করা নয়, কাজ করা দরকার। এই কয় মাসে আমার মনের ভেতরটা পুড়ে পুড়ে বুঝি ছারখার হয়ে গেল।... কিন্তু ও কথা পরে।'

'কিন্তু বাচ্চাগুলোর কী হবে?'

'দুনিয়াশ্‌কার কাছে রেখে যাব। তারপর দেখা যাবে। পরে ওদেরও নিয়ে যাব। কী হল? যাবে?'

'গ্রিশা।... গ্রিশা আমার।...'

'আচ্ছা, বললাম যে আর নয়! চোখের জল আর নয়। অনেক হয়েছে। পরে আমরা একসঙ্গে গলা জড়াজড়ি ক'রে কাঁদব 'খন, যখন সময় পাওয়া যাবে।...

তৈরি হয়ে নাও। আমার ঘোড়াগুলো রাখা আছে খাতের ভেতরে। কী হল? আসছ ত?'

'কেন, তুমি কী ভেবেছিলে বল?' হঠাৎ জোরে বলে উঠেই আক্সিনিয়া ভয়ে ঠোঁটের ওপর হাত রেখে ঘুরে তাকাল বাচ্চাদের দিকে। 'কী ভেবেছিলে তুমি?' এবারে সে ফিসফিসিয়ে বলে। 'আমার একার এই জীবন কি বড় সুখের? যাব গ্রিশা। ওগো, আমি যাব! দরকার হলে পায়ে হেঁটে যাব, তোমার পেছন পেছন হামাগুড়ি দিয়ে যাব, কিন্তু আর আমি একা থাকব না! তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। . . . আমায় মেরে ফেল তাও ভালো, আবার ছেড়ে চলে যেয়ো না! . . .'

সে জোরে গ্রিগোরিকে বুকে চেপে ধরে। গ্রিগোরি ওকে চুমু খায়, আড়চোখে জানলার দিকে চেয়ে দেখে। গ্রীষ্মের রাত ছোট। তাড়াতাড়ি যেতে হয়।

'একটু শুয়ে জিরিয়ে নিলে পারতে না?' আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করে।

'না না, কী যে বল!' আঁতকে ওঠে সে। 'একটু বাদেই ভোর হয়ে যাবে, আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার। জামাকাপড় পরে দুনিয়াশ্‌কাকে ডেকে আন। ওর সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। অন্ধকার থাকতে থাকতে শুকনো খাতে পৌঁছে যেতে হবে আমাদের। সেখানে দিনের বেলাটা বনের ভেতরে কাটিয়ে রাতের বেলায় আবার পথ ধরব। ঘোড়ায় চড়ে পারবে ত?'

'কী যে বল! ঘোড়ায় কেন যাতে বল, তাতেই যাব যা হোক ক'রে! আমার এখনও মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি না ত? আমি তোমাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি . . . একেকবার একেক রকম। . . .' চুলের কাঁটাগুলো দাঁতে চেপে ধরে আক্সিনিয়া দ্রুত হাতে চুল আঁচড়ায়। ওর নীচুগলার কথাগুলো অস্পষ্ট শোনায়। চটপট পোশাক পরে ও দরজার দিকে পা বাড়ায়।

'বাচ্চাদের জাগাব? একটি বার অন্তত ওদের দেখে নিতে।'

'না, দরকার নেই,' দৃঢ় কণ্ঠে গ্রিগোরি বলে।

টুপির তলা থেকে তামাকের বটুয়াটা বার করে গ্রিগোরি সিগারেট পাকাতে লাগল। কিন্তু যেই আক্সিনিয়া বেরিয়ে গেল, অমনি তাড়াতাড়ি খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাচ্চাদের চুমু খেল। তারপর ওর মনে পড়ে গেল নাতালিয়ার কথা, নিজের কঠিন জীবনের আরও অনেক ঘটনা। চোখের জল বাধা মানল না।

চৌকাট ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকেই দুনিয়াশ্‌কা বলল, 'দাদা, ভালো আছ ত তুমি? ঘরে এলে তবে শেষকালে? আর কতকাল মাঠে ঘাটে এরকম ঘুরে বেড়াবে? . . .' বলতে বলতে শুরু হয়ে যায় বিলাপ: 'ছেলেমেয়েগুলো এতকাল পরে তাহলে বাপের দেখা পেল! . . . বাপ বেঁচে থেকেও যে ওরা অনাথ! . . .'

গ্রিগোরি ওকে জড়িয়ে ধরে, কঠিন স্বরে বলে, 'আস্তে আস্তে! বাচ্চাদের

ঘুম ভাঙিয়ে দিবি! ওসব রাখ দেখি এখন বোনটি। ও গান আমার শোনা আছে। আমার নিজেরই দুঃখকষ্ট আর চোখের জলের কমতি নেই। এর জন্যে তোকে ডেকে পাঠাই নি। বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা করার ভার নিবি?'

'কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'আমি চলে যাচ্ছি, আক্সিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ছেলেপিলেগুলোকে রাখবি ত নিজের কাছে? একটা কোন কাজকর্ম যোগাড় করে পরে এসে নিয়ে যাব ওদের।'

'রাখব না কেন? তোমরা দু'জনেই যদি চলে যাও তাহলে অবিশ্যিই রাখব। ওদের ত আর রাস্তায় ফেলে দিতে পারি না, অন্য লোকের হাতেও ছেড়ে দিতে পারি না। . . .'

গ্রিগোরি নীরবে দুনিয়াশ্‌কাকে চুমু খেয়ে বলল, 'তোর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই বোন! আমি জানতাম তুই 'না' বলবি না।'

দুনিয়াশ্‌কা কোন উত্তর না দিয়ে তোরঙ্গের ওপরে বসে, জিজ্ঞেস করে, 'কখন যাচ্ছ তোমরা? এখনই?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বাড়িটার কী হবে? ঘর গেরস্থালি?'

আক্সিনিয়া ইতস্তত ক'রে জবাব দেয়, 'নিজে দেখাশোনা কোরো। ভাড়াটে বসিও, কিংবা তোমার যা খুশি কোরো। জামাকাপড় আর বিষয়-আশয় বলতে যা রইল নিজের বাড়িতে তুলে এনে রাখতে পার।'

'লোককে কী বলব আমি? যদি জিগ্গেস করে কোথায় গেলে তুমি তাহলে কী বলব?' দুনিয়াশ্‌কা জানতে চায়।

'বলিস যে কিছু জানিস না – ব্যস, ফুরিয়ে গেল।' এরপর আক্সিনিয়ার দিকে ফিরে গ্রিগোরি বলল, 'চটপট তৈরি হয়ে নাও, লক্ষ্মীটি। সঙ্গে বিশেষ কিছু নিও না। গরম জামা নাও, দুটো-তিনটে ঘাগরা, ভেতরের কিছু জামাকাপড় আর এই প্রথম কয়েকদিনের মতো খাবারদাবার – ব্যস।'

তখন ভোর হয় হয়। দুনিয়াশ্‌কাকে চুমু খেয়ে, ছেলেমেয়েদুটির ঘুম না ভাঙিয়ে তাদেরও চুমু খেয়ে গ্রিগোরি আর আক্সিনিয়া ঘর ছেড়ে সদর দরজায় বেরিয়ে এলো। ওরা দনের দিকে নেমে গেল, পার ধরে ধরে এগিয়ে চলল খাতটার কাছে।

গ্রিগোরি বলল, 'এক সময় তুমি আর আমি এমনি ভাবেই ইয়াগোদ্‌নয়েতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তবে তখন তোমার পুঁটলিটা ছিল একটু বড়। আর আমাদের দু'জনার বয়সও ছিল কম। . . .'

আক্সিনিয়া আনন্দে আত্মহারা। গ্রিগোরির দিকে কটাক্ষ হেনে জবাব দেয়,

'আমার কিন্তু এখনও ভয় হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি না ত? তোমার হাতটা দাও, ছুঁয়ে দেখি। নইলে বিশ্বাসই হচ্ছে না যে!' গ্রিগোরির কাঁধ ঘেঁসে চলতে চলতে নীরবে হাসতে থাকে সে।

গ্রিগোরি দেখল ওর চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে, তবু খুশিতে উজ্জ্বল। ভোরের আগের আবছা আলোয় ফেকাসে দেখাচ্ছে ওর গালদুটো। সস্নেহে মৃদু হেসে গ্রিগোরি মনে মনে ভাবে, 'বলতে না বলতে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো যেন নেমন্তন্ন-বাড়ি চলেছে।... কোনো ভয়ডর নেই। ধন্যি মেয়ে!'

ওর চিন্তার জবাবেই যেন আক্সিনিয়া বলে ওঠে, 'দেখলে ত কেমন মেয়ে আমি!... 'তু' করে ডাক দিলে অমনি বাড়ির পোষা কুকুরটার মতো ছুটে এলাম তোমার পেছন পেছন। তোমার ভালোবাসা, তোমার জন্যে আকুলি বিকুলি আমাকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। কেবল বাচ্চাগুলোর কথা ভেবে মন খারাপ লাগছে। কিন্তু নিজের জন্যে আমি একবারও 'আহা-উহু' করব না। যেখানে যেতে বল সেখানে যাব তোমার সঙ্গে সঙ্গে—এমন কি মরতে হলে তাও সই!'

ওদের পায়ের শব্দ পেয়ে ঘোড়াগুলো মৃদু চিঁহিহি ডাক ছাড়ল। খুব তাড়াতাড়ি ফরসা হয়ে আসছে। পুব আকাশের কিনারার একটা ফালিতে ইতিমধ্যে ক্ষীণ গোলাপী আভা দেখা দিয়েছে। দনের বুকে জল থেকে কুয়াশা উঠেছে।

গ্রিগোরি ঘোড়াগুলোর বাঁধন খুলল। আক্সিনিয়াকে জিনের আসনে উঠে বসতে সাহায্য করল। রেকাবদুটোর ঝুল আক্সিনিয়ার পায়ের তুলনায় একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে। আগে খেয়াল হয় নি বলে নিজের ওপর রাগই হল গ্রিগোরির। ফিতেগুলো টেনে খাটো ক'রে দিল। নিজে গিয়ে উঠল দ্বিতীয় ঘোড়াটার পিঠে।

'আমার পেছন পেছন আসতে থাক আক্সিনিয়া। খাত থেকে বেরিয়ে আসার পর টগবগিয়ে চালাব আমরা। বেশি ঝাঁকুনি লাগবে না তোমার। হাতের লাগাম ঢিলে করবে না কিন্তু। যে ঘোড়ার পিঠে তুমি বসেছ সে আবার ওটা পছন্দ করে না। হাঁটু সামলে। মাঝে মাঝে ওর মাথায় শয়তানি জাগে, তখন হাঁটু কামড়ানোর চেষ্টা করে। তাহলে চলা যাক।'

শুকনো খাত পর্যন্ত যেতে ক্রোশ তিনেকের পথ। অল্প সময়ের মধ্যে ওরা এই দূরত্বটা পার হল। সূর্য যখন উঠল ততক্ষণে ওরা বনের কাছে চলে এসেছে। বনের ধারে গ্রিগোরি আক্সিনিয়াকে ধরে নামাল।

গ্রিগোরি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম? অভ্যেস না থাকলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে পথ চলা কঠিন, তাই না?'

ঘোড়া ছোটানোর ফলে আক্সিনিয়ার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল। কালো চোখে ঝিলিক খেলে গেল।

'ভালো! পায়ে হাঁটার চেয়ে ভালো। শুধু পাদুটো ...' অপ্রতিভ হয়ে একটু হেসে সে বলল, 'ওপাশে একটু মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াও গ্রিশা, দেখি পায়ে কী হল। চামড়া যেন জ্বালাজ্বালা করছে।... ঘসটে গেল বোধ হয়।...'

'ও কিছু নয়, সেরে যাবে,' গ্রিগোরি আশ্বাস দেয়। 'একটু হাঁটা চলা ক'রে পাগুলো খেলিয়ে নাও। তোমার পা কাঁপছে যে!...' তারপর চোখ কুঁচকে ঠাট্টার সুরে বলে, 'কী কসাক-মেয়ে গো তুমি!'

গিরিপথের একেবারে তলার দিকে গাছপালা ছাড়া ছোটমতো একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে গ্রিগোরি বলল, 'এখানেই হবে আমাদের আস্তানা। এবারে আরাম কর গো!'

জিন খুলে ঘোড়াগুলোর পা ছেঁদে দিল গ্রিগোরি। জিন আর হাতিয়ারগুলো রেখে দিল একটা ঝোপের তলায়। ঘাসের ওপর প্রচুর শিশির জমেছে ঘন হয়ে। শিশিরের নীচে ঘাসগুলোকে দেখাচ্ছে ময়ূরকণ্ঠী রঙা। ঢালের গায়ে ভোরের আধা অন্ধকারের ঘোর এখনও কাটে নি। সেখানকার ঘাসে ঝাপসা নীলের মৃদু ঝিলিক। আধ ফোটা ফুলের পুটের ভেতরে ভোমরারা ঝিমুচ্ছে। স্তেপের মাঠের ওপরে আকাশের বুকে চাতক পাখিদের গুঞ্জরন। গমের ক্ষেতে, সুগন্ধী ঘাসের ঘন জঙ্গলের ভেতরে একটানা ডেকে চলেছে তিতির পাখিরা 'ঘুম আয়! ঘুম আয়! ঘুম আয়!' কচি ওক গাছের একটা ঝাড়ের কাছে ঘাসগুলো হাত দিয়ে সমান ক'রে নিয়ে জিনের গদিতে মাথা রেখে গ্রিগোরি শুয়ে পড়ল। লড়াইয়ে মত্ত তিতিরগুলোর ডানার ঝটপটানি, চাতক পাখিদের ঘুম পাড়ানি গান, দনের ওপার থেকে রাতে জুড়িয়ে না যাওয়া বালির তপ্ত নিঃশ্বাস – সব মিলিয়ে ঘুমের উপযোগী পরিবেশ। আর কারও হোক না হোক গ্রিগোরির অন্তত ঘুম আসারই কথা। পর পর কয়েক রাত তার ঘুম হয় নি। তিতির পাখিদের ডাকে ও সাড়া দিয়েছে। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে চোখ বোজে গ্রিগোরি। আক্সিনিয়া চুপচাপ ওর পাশে বসে ছিল। আনমনে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছিল একটা সুগন্ধী বেগনী রঙের ফুলের পাপড়ি।

ফুলের ডাঁটা দিয়ে গ্রিগোরির দাড়ি ভরতি গাল ছুঁয়ে আক্সিনিয়া নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আমাদের কেউ ধরে ফেলবে না ত গ্রিশা?'

অনেক কষ্টে তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠে গ্রিগোরি ভাঙা গলায় বলল, 'স্তেপের মাঠে কেউ নেই। এখন চাষের সময়ও নয়। আমি ঘুমোব, লক্ষ্মীটি, তুমি ঘোড়াগুলোর ওপর নজর রাখ। তারপর তুমিও ঘুমিয়ে নিও। ঘুমে শরীর ভেঙে আসছে... আর পারছি না... এত ঘুম পেয়েছে। চারদিন হয়ে গেল।... পরে কথা হবে।...'

'ঘুমোও। ওগো, ভালো করে ঘুমিয়ে নাও।'

গ্রিগোরির ওপর এক গোছা চুল ঝুলে ছিল। আক্সিনিয়া ঝুঁকে পড়ে চুলের গোছাটা কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে আলতো ভাবে ঠোঁট দিয়ে ওর গাল ছুঁল।

'ওগো কত চুল পেকেছে তোমার!' ফিসফিস ক'রে আক্সিনিয়া বলে। 'বুড়ো হয়ে যাচ্ছ তাহলে? এই কিছুদিন আগেও ত তুমি একেবারে ছোকরাটি ছিলে গো . . .' গ্রিগোরির দিকে তাকিয়ে একটা করুণ হাসির ছায়া ফুটে ওঠে ওর মুখে।

ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক ক'রে গ্রিগোরি ঘুমোচ্ছে। সমান তালে ওঠা পড়া করছে ওর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস। চোখের কালো পালকের ডগাগুলো রোদে পোড়া, একটু একটু কাঁপছে। ওপরের ঠোঁটটা নড়ছে, তাইতে ঘন সার বাঁধা সাদা দাঁতের পাটি চোখে পড়ে। আক্সিনিয়া আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখে। মাত্র এখনই লক্ষ করে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর এই কয়েকমাসের মধ্যে কত বদলে গেছে গ্রিগোরির চেহারা। ওর প্রিয় মানুষটির দুই ভুরুর মাঝখানে আড়াআড়ি গভীর রেখাগুলোর মধ্যে, ঠোঁটের পাশের ভাঁজে আর গালের উঁচু হাড়ের ওপর একটা কঠোর, প্রায় নিষ্ঠুর ধরনের কী যেন ছিল। . . . এই প্রথম আক্সিনিয়া ভাবল লড়াইয়ের সময় খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়ার পিঠে ওকে নিশ্চয় বড় ভয়ঙ্কর দেখায়। চোখ নামিয়ে ওর গাঁট ধরা বড় বড় হাতদুটোর দিকে এক ঝলক তাকাল, কেন যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে আক্সিনিয়া নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। পাছে শিশির ভেজা ঘাসে ভিজে যায় তাই ঘাগরাটা অনেকখানি উঁচু করে ধরে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ওপাশে চলে গেল। কাছাকাছি কোথায় যেন একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদীর ধারা নুড়ির গায়ে ধাক্কা খেয়ে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। সবুজ নরম শেওলা ধরা পাথরের ফলকে ছেয়ে আছে সোঁতার ধার। আক্সিনিয়া নেমে এলো খাতের শেষে জলের ধারে। প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা ঝরনার জল খেয়ে হাতমুখ ধুল। লাল ছোপ ধরা মুখখানা ওড়না দিয়ে শুকনো খটখটে করে মুছল। ওর ঠোঁটের কোনায় লেগেই থাকে শান্ত মৃদু হাসি। আনন্দে ঝিলিক দেয় দুই চোখ। গ্রিগোরি আবার ওর সঙ্গে! আবার অজানার হাতছানিতে সে ভেসে চলেছে কোথায় কোন্ এক সুখের কল্পনা জগতে! . . . কত বিনিদ্র রাত আক্সিনিয়ার কেটেছে চোখের জল ফেলে, কত দুঃখই না তাকে সইতে হয়েছে গত কয়েক মাসে! এই ত কাল দিনের বেলাতেই ওর পাশের আলুক্ষেতে নিড়ানি দিতে দিতে মেয়েরা যখন একটা করুণ মেয়েলি গান ধরল তখন কী দারুণ ব্যথায়ই না মোচড় দিয়ে উঠেছিল ওর বুকের ভেতরটা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও কান পেতে শোনে সেই গান।

আ-আ-আ-আ, আয় হাঁসেরা সেরে জলের খেলা,
আয় রে ঘরে থাকতে দিনের আলো।
নয়ন জলে ভেসেছ সই মেলা,
সেই পালা আজ চুকিয়ে দেওয়াই ভালো।

উঁচু সুরে বাঁধা নারীকণ্ঠে অভিশপ্ত জীবনের জন্য আক্ষেপ ঝরে পড়ছিল। সে গান শুনে আক্সিনিয়া স্থির থাকতে পারে নি। বাধা মানে নি ওর চোখের জল। কাজের মধ্যে ভুলে থাকার চেষ্টা করছিল সে। যে আকুলি বিকুলি ভাব ওর বুকের ভেতরে হঠাৎ জেগে উঠেছিল তা চাপা দিতে চাইল। কিন্তু চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে, টপটপ করে চোখের জল পড়তে থাকে আলুগাছের সবুজ পাতায়, ওর অসহায় হাতদুটোর ওপর। ও আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না, কাজও করতে পারছিল না। কোদাল ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে, দু'হাতে মুখ ঢেকে বাঁধভাঙা কান্নার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়।...

গতকালও নিজের অভিশপ্ত জীবনের কথা ভেবে খেদ করেছে সে। আশেপাশের সমস্ত কিছু মেঘলা দিনের মতো নিরানন্দ আর ধূসর মনে হয়েছে ওর। কিন্তু আজ গোটা দুনিয়াটাই যেন গ্রীষ্মকালের প্রচুর বর্ষণক্লান্ত এক স্নিগ্ধ দিনের মতো উজ্জ্বল আর আনন্দোচ্ছল। উদীয়মান সূর্যের তির্যক কিরণে ওক গাছের নক্সাকাটা পাতায় আগুনের রঙ ধরেছে। অন্যমনস্ক ভাবে সেই দিকে চেয়ে আক্সিনিয়া মনে মনে ভাবল, 'আমরাও একদিন আমাদের সৌভাগ্য খুঁজে পাব!'

ঝোপের কাছে, যে সব জায়গায় রোদ পড়েছে সেখানে বিচিত্র বর্ণের সব ফুল ফুটে আছে। তাদের সৌরভ চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আক্সিনিয়া একরাশ ফুল দু'হাত ভরে তুলে নেয়। আস্তে করে গ্রিগোরির কাছাকাছি এসে বসে যৌবনের দিনগুলোর কথা ভেবে মালা গাঁথতে শুরু করে। মালাটা বড় বাহারের, সুন্দর হয় দেখতে। আক্সিনিয়া অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখে তারিফ করে, তারপর কয়েকটা বন গোলাপ গেঁথে ওটা রেখে দেয় গ্রিগোরির শিয়রে।

বেলা নয়টা নাগাদ ঘোড়ার ডাকে গ্রিগোরির ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় ক'রে উঠে বসে চারধার হাতড়াতে লাগল হাতিয়ারের খোঁজে।

'এখানে কেউ নেই,' শান্ত গলায় আক্সিনিয়া বলল। 'ভয় পেয়ে গেলে কেন?'

গ্রিগোরি চোখ রগড়ায়, ঘুমচোখে হাসি।

'খরগোসের মতো ভয়ে-ভয়ে থাকা অভ্যেস। ঘুমের মধ্যেও একচোখ খোলা রাখতে হয়। একটু খুট করে শব্দ হলেই চমকে উঠি।... এই অভ্যেস কাটিয়ে ওঠা অত সোজা নয়, বুঝলে গো মেয়ে? অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, না?'

'না। আরও একটু ঘুমোবে কি?'

'ঘুমের ঘাটতি পুরোতে হলে আমার পুরো একটা দিন ঘুমানো দরকার। এসো বরং সকালের খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। রুটি আর ছুরি আমার জিনের থলেতে আছে, নিজে বার করে নাও। আমি ঘোড়াগুলোকে জল খাইয়ে আনি।'

গ্রিগোরি জলের কাছে নেমে গেল। পাথর আর ডালপালা দিয়ে একটা জায়গায় বাঁধমতন তৈরি করল। তলোয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তুলে পাথরের মাঝের ফাঁকগুলো বুজিয়ে দিল। বাঁধ দেওয়া জায়গাটার ভেতরে যখন অনেকটা জল এসে জমল তখন সে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে এলো জল খাওয়াতে। জল খাওয়া হয়ে গেলে ওদের মুখের সাজ খুলে আবার ছেড়ে দিল ঘাস খেতে।

জলখাবার খেতে বসে আক্সিনিয়া জিজ্ঞেস করে, 'এখান থেকে কোথায় যাব আমরা?'

'মরোজোভ্‌স্কায়া। প্রাতভ অবধি যাব ঘোড়ায় চড়ে। তারপর পায়ে হেঁটে।'

'তাহলে ঘোড়াগুলোর কী হবে?'

'ছেড়ে দিয়ে যাব।'

'আপসোসের কথা, গ্রিশা! এত ভালো ঘোড়াদুটো! ছাইরঙাটার দিকে ত চেয়ে চেয়ে আর আশ মেটে না। অমন ঘোড়া ছেড়ে দিতে হবে? কোত্থেকে জোটালে?'

'জোটালাম . . .' গ্রিগোরি কাষ্ঠ হাসি হাসল। 'লুট ক'রে নিয়েছিলাম একজন আত্মীয় লোকের কাছ থেকে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সে ফের বলল, 'আপসোস হলেও কিছু করার নেই। ফেলে যেতেই হবে। . . . ঘোড়ার ব্যবসা করার সময় আমাদের নেই।'

'কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিয়ে চলছ কেন বল ত? ও দিয়ে আমাদের কী হবে? ভগবান না করুন, কেউ যদি দেখে ফেলে আমরা বিপদে পড়ে যাব।'

'রাতে কে আমাদের দেখতে পাবে? ও আমি রেখে দিয়েছি অমনি – সাবধানের মার নেই। ওগুলো ছাড়া আমার কেমন যেন ভয়-ভয় লাগে। . . . ঘোড়া যখন ছেড়ে দেবো তখন ওগুলোও ছাড়ব। তখন আর দরকার হবে না।'

সকালের খাবারের পর ওরা গ্রেটকোট বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ল। ঘুমের বিরুদ্ধে যুঝতে থাকে গ্রিগোরি। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। আক্সিনিয়া কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে গ্রিগোরিকে শোনাচ্ছে ওকে ছাড়া কী ভাবে সে দিন কাটিয়েছে, কত দুঃখকষ্ট সে পেয়েছে তার কাহিনী। তন্দ্রার দুর্জয় শক্তি গ্রিগোরিকে কাবু ক'রে ফেলেছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে শুনতে পায় আক্সিনিয়ার একটানা গলার আওয়াজ, কিন্তু চোখের পাতা এত ভারী হয়ে এসেছে যে খোলার কোন ক্ষমতা নেই। একেক সময় আবার একটা কথাও ওর কানে ঢোকে না। আক্সিনিয়ার গলার আওয়াজ দূরে সরে যেতে যেতে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে,

শেষকালে একেবারে মিলিয়ে গেল। গ্রিগোরি চমকে জেগে ওঠে, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার বুজে আসে ওর চোখের পাতা। ওর আকাঙ্ক্ষার চেয়ে, ইচ্ছাশক্তির চেয়ে প্রবল ছিল ওর ক্লান্তি।

'. . .তোমার জন্যে ওরা মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াত। বলত, বাবা কোথায়? আমি যতটা পারি আদর ক'রে ওদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। আমার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল ওরা, আমার ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল। দুনিয়াশ্‌কার কাছে আর আগের মতো অতটা যাওয়া আসা করত না। পলিউশ্‌কাটা শান্ত, ঠাণ্ডা মেজাজের মেয়ে। ন্যাকড়া দিয়ে ওর জন্যে রাজ্যের পুতুল সেলাই ক'রে দিই। ওগুলো নিয়েই টেবিলের নীচে বসে বসে খেলা করে। আর মিশাত্‌কা ত একদিন রাস্তা থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়ি আসে, ওর সর্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছে। আমি জিগ্‌গেস করি, 'কী ব্যাপার?' ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। ওঃ সে কী কান্না! বলল, 'ছেলেরা আমার সঙ্গে খেলতে চায় না, বলে তোর বাবা ডাকাত। আচ্ছা, মা, সত্যিই কি ডাকাত, আমার বাবা? ডাকাতেরা কেমন হয় বল না!' আমি ওকে বললাম, 'তোর বাবা ডাকাত মোটেই নয়। এই অমনি . . . অমনি একজন বড় দুঃখী লোক। . . .' ব্যস, তারপর সেই যে লেগে রইল - শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন - দুঃখী কেন? দুঃখী কাকে বলে? কিছুতেই আর ওকে বোঝাতে পারি না ব্যাখ্যা করে। . . . ওরা নিজেরাই কিন্তু আমাকে 'মা' বলে ডাকতে শুরু করেছে, গ্রিশা। ভেবো না, আমি ওদের শিখিয়েছি। কিন্তু মিখাইল ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত না, আদর করত। আমার সঙ্গে দেখা হলে অবিশ্যি ভালো-মন্দ কিছুই বলত না, মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত। তবে ওদের জন্যে জেলা-সদর থেকে বার দুয়েক চিনি এনে দিয়েছিল। প্রোখর খালি তোমার কথা বলে আর দুঃখু করে। বলে, লোকটা শেষ হয়ে গেল গো। গত হপ্তায় আমার কাছে এসেছিল তোমার কথা নিয়ে গল্প করতে। বলতে বলতে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল, কেঁদে ফেলেছিল ও। . . . আমার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েছিল, হাতিয়ারের খোঁজে। চালের বাতা, তলকুঠুরি, কোন জায়গাই খুঁজতে বাদ রাখে নি। . . .'

গ্রিগোরি ঘুমিয়ে পড়েছিল। গল্পের শেষ দিকটা তার আর শোনা হয় নি। মাথার ওপর হাওয়ায় কানাকানি করছে কটি এল্‌ম গাছের পাতাগুলো। গ্রিগোরির মুখের ওপর খেলা করছে রোদের হলুদ আলোর বিন্দু। আক্সিনিয়া অনেকক্ষণ ধরে ওর বোজা চোখের পাতায় চুমু খেল। শেষকালে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল গ্রিগোরির বাহুতে গাল চেপে। আক্সিনিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল ঘুমের মধ্যে।

* * *

ওরা যখন শুকনো খাত ছেড়ে বেরিয়ে এলো তখন রাত অনেক। আকাশে চাঁদ উঠেছে। দু'ঘন্টা চলার পর একটা টিলা ছেড়ে ওরা চির্‌-এর দিকে নামল। ঘাসজমিতে পানকৌড়ি ডাকছে, খাড়িতে কাশবনের ভেতরে গলা ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে ব্যাঙেরা। দূরে কোথায় যেন চাপা করুণ সুরে ডাকছে একটা কোঁচবক।

তীর বরাবর ঘন হয়ে চলে গেছে বাগিচার পর বাগিচা। কুয়াশার কালো ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে আছে।

একটা ছোট সাঁকোর কাছাকাছি এসে গ্রিগোরি থমকে দাঁড়াল। মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে গ্রামে। জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াটাকে ছুঁয়ে একপাশে ফিরিয়ে নিল গ্রিগোরি। সাঁকোর ওপর দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ওর ছিল না। এই নীরবতায় ওর বিশ্বাস নেই, ভয় হয়। গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে যেখানটায় জল কম সেখান দিয়ে ওরা ঘোড়ায় চড়ে পার হল। সবে একটা সরু গলির ভেতরে মোড় নিয়েছে, এমন সময় নালার ভেতর থেকে ভুস ক'রে উঠে দাঁড়াল একজন মানুষ, তার পেছন পেছন আরও তিনজন।

'থামো! কে যায়?'

চিৎকার শুনে গ্রিগোরি হঠাৎ ঘুসি খাওয়ার মতো চমকে উঠল। ঘোড়ার মুখের লাগাম টেনে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে জোর গলায় সাড়া দিল, 'বন্ধুলোক!' তারপর ঝট ক'রে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে কোন রকমে চাপা গলায় আক্সিনিয়াকে বলার অবকাশ পেল, 'উল্‌টো দিকে ফের! আমার পেছন পেছন চলে এসো!'

খাদ্যসংগ্রহ বাহিনীর একটা দল সবে রাতের আস্তানা নিয়েছিল গ্রামটাতে। সেই দলের ঘাঁটি পাহারা দিচ্ছিল চারজন সেপাই। তারা কোন কথা না বলে ধীরেসুস্থে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। একজন সিগারেট ধরানোর জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে, দেশলাই জ্বালে। গ্রিগোরি সপাটে চাবুক কষিয়ে দিল আক্সিনিয়ার ঘোড়ার ওপর। ঘোড়াটা তড়াক ক'রে জায়গা ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। গ্রিগোরি নিজের ঘোড়ার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার পেছন পেছন ছুটিয়ে দিল সেটাকে। আরও খানিকক্ষণের নিস্তব্ধতা, ক্লান্তিকর কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরই বজ্রপাতের মতো ফেটে পড়ল এলোমেলো কয়েকবার গুড়ুম গুড়ুম গর্জন। অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে এলো কয়েক ঝলক আগুনের শিখা। গ্রিগোরির কানে-এলো বুলেটের জ্বালাধরা শিস আর একটানা একটা চিৎকার।

'হাতিয়ার ধর! . . .'

ছাইরঙা ঘোড়াটা লম্বা লম্বা পা ফেলে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। জলের ধারা থেকে দু'শ' গজ মতন এগিয়ে এসে সেটার কাছাকাছি হওয়ার পর গ্রিগোরি চিৎকার ক'রে বলল, 'মাথা নীচু কর আক্সিনিয়া। মাথা নীচু কর।'

এদিকে আক্সিনিয়া লাগাম ধরে টানতে টানতে পেছন দিকে হেলে একপাশে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। গ্রিগোরি ঠিক সময়ে ধরে না ফেললে ও পড়েই যেত।

'তুমি কি জখম হয়েছ? কোথায় লেগেছে তোমার? বল! কথা বলছ না যে।...' ভাঙা গলায় গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

আক্সিনিয়া কোন কথা বলে না। শরীরের ভার আরও বেশি করে ছেড়ে দেয় গ্রিগোরির হাতের ওপর। দুটো ঘোড়াই ছুটছে। সেই অবস্থাতেই আক্সিনিয়াকে বুকের কাছে চেপে ধরে গ্রিগোরি হাঁপাতে হাঁপাতে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভগবানের দোহাই! অন্তত একবার কথা বল! হল কী তোমার?'

কিন্তু নির্বাক আক্সিনিয়ার মুখে কোন কথা বা কাতরানি কিছুই শুনতে পেল না গ্রিগোরি।

গ্রাম থেকে ক্রোশখানেক দূরে গিয়ে গ্রিগোরি হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে ঘুরে একটা খাতের দিকে নেমে গেল। সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে আক্সিনিয়াকেও নামাল কোলে করে। সাবধানে মাটিতে শুইয়ে দিল ওকে।

আক্সিনিয়ার গায়ের গরম জামাটা খুলে ফেলল, ছিটকাপড়ের পাতলা ব্লাউজ আর জামার বুকের কাছটা পড়পড় করে ছিঁড়ে ফেলল, হাতড়ে খুঁজে বার করল জখম জায়গাটা। আক্সিনিয়ার বাঁ কাঁধের ফলকে বিঁধেছিল গুলিটা, হাড় চুরমার করে তেরছা হয়ে বেরিয়ে গেছে ডান কণ্ঠার হাড়ের কাছ দিয়ে। গ্রিগোরির হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে যায়। কাঁপা কাঁপা হাতে জিনের থলে থেকে সে একটা পরিষ্কার ভেতরের জামা আর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য রাখা ব্যাণ্ডেজের কাপড় বার করল। আক্সিনিয়াকে একটু উঁচু ক'রে তুলে ধরে ওর পিঠে হাঁটু ঠেকিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করল জখমটার ওপর। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছিল কণ্ঠার হাড়ের ভেতর থেকে। রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল সে। জামার ছেঁড়া টুকরো আর ব্যাণ্ডেজের কাপড়টা দেখতে দেখতে কালচে লাল রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গেল। আক্সিনিয়ার আধখোলা মুখের ভেতর থেকেও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, গলার ভেতরে কলকল, ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। আতঙ্কে মড়ার মতো হয়ে গেল গ্রিগোরি, বুঝতে পারল সব শেষ হয়ে গেছে। ওর জীবনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যা ঘটতে পারে তা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে।...

খাড়া ঢাল বেয়ে, আক্সিনিয়াকে কোলে নিয়ে ঘাসের ওপর ভেড়ার নাদ ছড়ানো একটা সরু পায়ে-চলা-পথ ধরে গ্রিগোরি সাবধানে নামতে লাগল খাতের

ভেতরে। আক্সিনিয়ার মাথাটা অসহায় ভাবে নেতিয়ে পড়ে আছে ওর কাঁধের ওপর। গ্রিগোরি শুনতে পাচ্ছিল আক্সিনিয়ার দমকে দমকে সাঁই সাঁই নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ। টের পাচ্ছিল আক্সিনিয়ার মুখ দিয়ে তার শরীরের উষ্ণ রক্ত বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওর বুক। ওর পেছন পেছন দুটো ঘোড়াই নেমে এলো খাতের ভেতর। ফোঁস ফোঁস নাক ঝেড়ে, মুখের কড়িয়াল ঝমঝম ক'রে ওরা রসাল ঘাস চিবুতে শুরু ক'রে দিল।

ভোর হওয়ার খানিকক্ষণ আগে গ্রিগোরির কোলেই মারা গেল আক্সিনিয়া। জ্ঞান ওর আর ফিরে আসে নি মরার আগে। গ্রিগোরি নীরবে ওর ঠোঁটে চুমু খেল। ঠাণ্ডা ঠোঁটে রক্তের নোন্‌তা স্বাদ। সাবধানে ওকে ঘাসের ওপর নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা অজ্ঞাত শক্তি ওর বুকে যেন ধাক্কা মারল। পিছিয়ে গিয়ে চিত্ হয়ে পড়ে গেল সে। কিন্তু পরক্ষণেই এক লাফে উঠে দাঁড়াল। আবার পড়ে গেল। এবারে ওর টুপিছাড়া মাথাটা জোরে ঠুকে গেল একটা পাথরের ওপরে। তারপর আর উঠে না দাঁড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বসেই খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে কবর খুঁড়তে শুরু ক'রে দিল। মাটি ভিজে আর নরম। খুব তাড়াতাড়ি কাজটা সারার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু গলাটা কে যেন টিপে ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। ভালো ক'রে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য নিজের গায়ের জামাটা সে একটানে ছিঁড়ে ফেলল। ভোরের আগের তাজা বাতাস ওর ঘামে ভেজা বুকটা জুড়িয়ে দিল। এখন আর কাজ করতে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। দু'হাতে আর টুপি দিয়ে মাটি তুলতে লাগল। এক মুহূর্তও বিশ্রাম নিল না। কিন্তু গর্তটা কোমর সমান গভীর ক'রে খুঁড়তে ওর অনেক সময় লেগে গেল।

ভোরের আলো যখন উজ্জ্বল হয়ে এসে পড়েছে সেই সময় গ্রিগোরি কবর দিল ওর আদরের আক্সিনিয়াকে। আক্সিনিয়ার রোদে পোড়া তামাটে হাতদুটো এখন মৃত্যুপাণ্ডুর। কবরে শুইয়ে দেওয়ার পর গ্রিগোরি ওর দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ ক'রে রেখে দিল। ওর আধবোজা চোখের দীপ্তি ম্লান হয়ে এসেছে। দৃষ্টি আকাশের দিকে স্থির নিবদ্ধ। গ্রিগোরি ওড়না দিয়ে ওর মুখটা ঢেকে দিল যাতে চোখে মাটি না পড়ে। আক্সিনিয়ার কাছ থেকে সে বিদায় নিল মনে মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে ওদের এই বিচ্ছেদ বেশি দিনের নয়। ...

বেশ যত্ন করে হাতের তেলো দিয়ে চেপে চেপে সমান ক'রে দিল কবরের ঢিবির হলদে ভিজে মাটি। কবরের ধারে অনেকক্ষণ মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল হাঁটু গেড়ে। আস্তে আস্তে দুলতে লাগল এদিক ওদিক।

এখন আর ওর তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। সব শেষ।

খরা বাতাসের ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা ভেদ করে খাতের মাথার ওপর সূর্য

উঠছে। গ্রিগোরির খালি মাথার পাকা চুলের ঘন রাশির ওপর রুপোলি রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে সূর্যের কিরণ, গড়িয়ে পড়ছে তার ভয়ঙ্কর কঠিন নিথর পাণ্ডুর মুখ বয়ে। যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে মাথা তুলে তাকাল গ্রিগোরি, মাথার ওপরে দেখতে পেল কালো আকাশ আর চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল সূর্যের কালো থালাটা।

আঠারো

বসন্তের শুরুতে যখন তুষার অদৃশ্য হয়ে যায় আর শীতকালের বরফ চাপা ঘাস শুকনো হয়ে ওঠে তখন স্তেপের মাঠে মাটি চাষের উপযোগী করে তোলার জন্য পুরনো শুকনো ঘাসপাতা পোড়ানো হয়। হাওয়ার টানে বন্যাস্রোতের মতো গড়িয়ে চলে সে আগুন, লোভীর মতো গ্রাস করে শুকনো জলাঘাস, উড়ে পড়ে লম্বা লম্বা কাঁটাঝোপের মাথায়, সোমরাজলতার বাদামী রঙ ধরা মাথার ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ছড়িয়ে পড়ে নীচু জমিতে। এর পর স্তেপের মাঠে দীর্ঘকাল থেকে যায় পোড়া ফাটা মাটির কটু গন্ধ। সর্বত্র কচি শ্যামল ঘাসের খুশির ঝলক, মাথার ওপর নীল আকাশে ডানা ছড়িয়ে উড়ে বেড়ায় অসংখ্য চাতকপাখি, হাঁসের দল এখান দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় সরস সবুজ ঘাসের ওপর এসে বসে খাবারের সন্ধানে। বনমোরগেরা এসে গ্রীষ্মকালের জন্য বাসা বেঁধে থেকে যায়। কিন্তু যে সব জায়গার ওপর দিয়ে আগুন ছড়িয়েছে সেখানে মাটি পুড়ে ঝাঁই, অলক্ষুণে কালো প্রাণহীন। কোন পাখি সেখানে বাসা বাঁধে না, জন্তুজানোয়ার তাকে এড়িয়ে চলে। কেবল খরবায়ু দ্রুত ডানায় ভর দিয়ে তার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, ধূসর নীল ছাই আর কালো রঙের ঝাঁঝাল ধুলো দূরে ছড়িয়ে দেয়।

স্তেপের ওই আগুনে পোড়া মাটির মতো গ্রিগোরির জীবনটাও যেন এখন পুড়ে কালো হয়ে গেছে। যা ছিল ওর প্রাণের ধন সে সব থেকেই ও বঞ্চিত। নির্মম মৃত্যু ওর কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়েছে, সব নষ্ট ক'রে দিয়েছে ওর। রয়ে গেছে শুধু ছেলেমেয়েদুটো। ছটফট করতে করতেও ও পড়ে আছে মাটি আঁকড়ে, যেন ওর কাছে অথবা অন্যদের কাছে ওর এই ভগ্ন জীবনটার সত্যি সত্যিই কোন দাম আছে। . . .

আক্সিনিয়াকে কবর দেওয়ার পর তিনদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল স্তেপের মাঠে। তবু বশ্যতা স্বীকারের প্রবৃত্তি ওর হল না – বাড়ি অথবা ভিওশেন্স্কায়া কোথাও গেল না। চার দিনের দিন ঘোড়াদুটোকে উস্ত্-খোপিওরস্কায়া জেলার একটা গ্রামে ছেড়ে দিয়ে সে দন পেরিয়ে পায়ে হেঁটে চলল স্লাশ্চেভ্স্কায়া ওক

বনের দিকে। এই বনের প্রান্তেই এপ্রিল মাসে ফোমিনের দল প্রথম চুরমার হয়ে যায়। তখন, সেই এপ্রিলেই ও শুনেছিল যে ওক বনে কিছু ফেরারী সৈন্য আশ্রয় নিয়ে আছে। ফোমিনের কাছে ফেরার কোন ইচ্ছে ওর ছিল না। তাই ওদের কাছেই চলল গ্রিগোরি।

বিরাট বনের মধ্যে বেশ কয়েকদিন সে উলটোপালটা ঘুরে বেড়াল। খিদেয় কষ্ট পেলেও লোকালয়ে যাওয়ার সাহস ওর হল না। আক্সিনিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওর বুদ্ধিবিবেচনা আর আগেকার সেই সাহসও যেন লোপ পেয়ে গেছে। ডালপালা ভাঙার মটমট আওয়াজ, ঘন বনের ভেতরে পাতার মর্মর, কোন নিশাচর পাখির ডাক সবেতেই ওর ভয় আর বিহ্বলতা। কাঁচা স্ট্রবেরি ফল, খুদে খুদে কিছু ব্যাঙের ছাতা আর বুনো বাদামগাছের পাতা – এই সব খেয়ে প্রাণধারণ করছে গ্রিগোরি। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। পঞ্চম দিনের শেষে বনের ভেতরে ফেরারীদের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। তারা ওকে নিজেদের সুরঙ্গ-ঘরে নিয়ে গেল।

সাতজন লোক ওরা। সকলেই আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দা। গত বছরের শরৎকালে যখন জোর ক'রে ধরে ধরে পলটনে লোক ঢোকানো হচ্ছিল তখন থেকে ওরা এই ওক বনে বসবাস করছে। সুরঙ্গ খুঁড়ে গেরস্থ বাড়ির মতো বেশ বড়সড় ঘর বানিয়ে তার মধ্যে ওরা বাস করছে। বলতে গেলে কিছুরই অভাব নেই। রাতে প্রায়ই গিয়ে দেখা ক'রে আসে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে। ফিরে আসে শস্যের দানা, রুটি, ময়দা আর আলু নিয়ে। মাংস সেদ্ধ ক'রে খায়। তাও পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না, বাইরের গ্রাম থেকে মাঝে মধ্যে গোরুভেড়া চুরি ক'রে আনে।

ফেরারীদের একজন কোন এক সময় বারো নম্বর কসাক রেজিমেন্টে কাজ করত। গ্রিগোরিকে সে চিনতে পারে। তাই বিশেষ কথা কাটাকাটি না ক'রে ওরা ওকে দলে নিয়ে নিল।

* * *

ক্লান্তিকর দিনগুলো কাটতে থাকে। গ্রিগোরি দিনের হিসাব ভুলে যায়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত চোখ কান বুজে বনে পড়ে থাকল। কিন্তু শরৎকালে বর্ষণ শুরু হয়ে গেল, তারপর ঠাণ্ডা নামল। এই সময় ছেলেমেয়েদের দেখার, নিজের গ্রামে যাওয়ার একটা ব্যাকুল বাসনা আচমকা ওর মনে জাগল। . . .

কোন রকমে সময় কাটিয়ে দেওয়ার জন্য ডেরায় সারা দিন তক্তপোষে বসে বসে ও কাঠ কুঁদে চামচ বানায়, বাটি বানায়। নরম ধরনের কাঠ পেলে তাই

দিয়ে বেশ নিপুণ হাতে লোকজন আর জীবজন্তুর মূর্তি গড়ে। ও চেষ্টা করে কোন কিছু না ভাবতে, মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে বেদনাদায়ক ব্যাকুলতা। দিনের বেলায় তা সম্ভবও হয়। কিন্তু শীতের দীর্ঘ রাত্রিগুলোয় স্মৃতির ভার ওর মনের ওপর চেপে বসে ওকে উতলা ক'রে তোলে। তক্তপোষের ওপর অনেকক্ষণ ছটফট করতে থাকে, ঘুমোতে পারে না। দিনের বেলায় কিন্তু সুরঙ্গ-ঘরের বাসিন্দাদের কেউই ওর মুখে কোন আক্ষেপ-অভিযোগ শুনতে পায় না। কিন্তু রাতে ও প্রায়ই চমকে জেগে ওঠে, মুখের ওপর হাত বুলায়। ওর গাল আর ছয় মাসে ঘন হয়ে গজানো দাড়ি চোখের জলে ভিজে যায়।

প্রায়ই স্বপ্নে দ্যাখে ছেলেমেয়েদুটোকে, আক্সিনিয়াকে, মা'কে, আরও সমস্ত আপন জনকে যারা আর বেঁচে নেই। গ্রিগোরির সমস্ত জীবনটাই তখন অতীতে ডুবে থাকে। কিন্তু সে অতীত মনে হয় ক্ষণস্থায়ী, বেদনাদায়ক স্বপ্ন। প্রায়ই মনে মনে ভাবে, 'আরও একবার যদি আমার দেশ গাঁয়ের সেই জায়গাগুলোতে একটু ঘুরে বেড়াতে পারতাম, ছেলেমেয়েদুটোকে যদি একবার চোখের দেখা দেখতে পারতাম তাহলে নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারতাম!'

বসন্তের শুরুর দিকে একদিন দিনের বেলায় আচমকা চুমাকোভের আবির্ভাব। কোমর পর্যন্ত জলে ভিজে জুবড়ি। কিন্তু আগের মতোই ফুর্তিবাজ আর ছটফটে। চুল্লির ধারে জামাকাপড় শুকিয়ে গা গরম করার পর গ্রিগোরির পাশে তক্তপোষের ওপর এসে বসল।

'তুমি আমাদের দল থেকে সরে পড়ার পর আমরা কত যে ঘুরে বেড়ালাম, মেলেখভ! আস্ত্রাখানের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, কাল্মিকদের স্তেপেও গিয়েছিলাম।... এই দুনিয়ায় আর কিছু দেখতে বাকি রইল না। আর কত মানুষের যে রক্ত আমরা ঝরালাম তারও কোন লেখাজোখা নেই। ফোমিনের বৌকে লাল ফৌজীরা জামিন হিশেবে বন্দী ক'রে নিয়েছিল, ওদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিন্তু ইয়াকভ ইয়েফিমিচ তাতে একেবারে পাগল হয়ে যায়। যে-কোন লোক সোভিয়েত সরকারের চাকরি করছে তাকেই খুন করার হুকুম দিয়ে বসল! আমরা তাই ইস্কুলের মাস্টার, ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার, যাকে পাই তাকেই ধরে ধরে খুন করতে শুরু করলাম।... কাকে যে খুন করি নি শয়তানই জানে! কিন্তু এখন ওরা আমাদের নিকেশ করে দিল — একেবারে নিকেশ ক'রে দিল।' বলতে বলতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ঠাণ্ডায় তখনও কেমন যেন জড়সড় হয়ে থাকে। 'প্রথম আমাদের চুরমার ক'রে দেয় তিশানস্কায়ার কাছে। তারপর হপ্তাখানেক আগে সলোম্নিতে। রাতের বেলায় তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল। একটা মাত্র রাস্তা খোলা ছিল আমাদের সামনে, টিলার ওপরে উঠে যাওয়া। কিন্তু

সেখানে বরফ ঘোড়াগুলোর পেট সমান।... ভোরের আলো দেখা দিতে না দিতে ওরা শুরু করল মেশিনগান চালাতে। ব্যস হয়ে গেল আমাদের।... মেশিনগানের গুলিতে কচুকাটা করে দিল সবাইকে। বেঁচে গেলাম শুধু আমরা দু'জনে – আমি আর ফোমিনের বাচ্চাছেলে দাভিদ্‌কা। সেই শরৎকাল থেকে ইয়াকভ ইয়েফিমিচ তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ইয়াকভ ইয়েফিমিচ নিজেও মারা গেল।... আমার চোখের সামনে মারা গেল। প্রথম গুলিটা ওর পায়ে ঢোকে, হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে যায় তাতে। দ্বিতীয়টা মাথায় লেগে পিছনে বেরিয়ে যায়। তিন তিনবার পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। প্রত্যেকবারই আমরা থেমে গিয়ে ওকে উঠিয়ে বসিয়ে দিই ঘোড়ার পিঠে। একটু দূর গিয়ে আবার পড়ে যায়। তৃতীয় গুলিটায় ওর প্রাণ গেল, পাঁজরে এসে লাগল।... তখন ওকে ছেড়ে চলে আসতে হল। খানিক দূর চলে আসার পর পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ও মাটিতে পড়ে আছে আর দু'জন ঘোড়সওয়ার ওর ওপর তলোয়ারের কোপ বসাচ্ছে।...'

গ্রিগোরি উদাসীন ভাবে বলল, 'ওই রকমই ত হবার কথা।'

চুমাকোভ রাতটা সুরঙ্গ-ঘরে ওদের সঙ্গে কাটিয়ে দিল। পর দিন সকালে ওদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে লাগল।

'কোথায় চললে?' গ্রিগোরি জিজ্ঞেস করল।

চুমাকোভ মৃদু হেসে জবাব দেয়, 'সহজ জীবনের উপায় খুঁজে দেখতে হয়। তুমিও আসবে নাকি আমার সঙ্গে?'

'না, একাই যাও।'

'তোমাদের সঙ্গে আমার থাকা পোষাবেও না বাপু।... তোমার ওই হাতের কাজ – বাটি চামচ বানানো – ও আমার কম্ম নয়,' ঠাট্টার সুরে কথাগুলো বলে টুপি খুলে সেলাম ঠোকে চুমাকোভ। 'ওগো নিরীহ ডাকাতেরা, তোমরা যে অন্ন আর আশ্রয় দিয়েছ তার জন্যে ভগবান তোমাদের বাঁচিয়ে রাখুন। ভগবান তোমাদের খুশির জীবন দিন। তোমাদের এখানকার জীবন বড্ড একঘেয়ে কিন্তু যাই বল। বনে বাস করছ, ভাঙা কপালের কথা ভেবে মাথা ঠুকছ – এ আবার একটা জীবন হল?'

চুমাকোভ চলে যাওয়ার পর গ্রিগোরি আরও সপ্তাহখানেক ওক বনে কাটাল। তারপর তৈরি হল পথে নামার জন্য।

'বাড়ি চললে?' ফেরারীদের একজন জিজ্ঞেস করল।

এতকাল বনে কাটানোর মধ্যে এই প্রথম গ্রিগোরি একটু হাসল। প্রায় নজরেই পড়ে না সে হাসি।

'হ্যাঁ। বাড়ি চললাম।'

'বসন্তকাল অবধি একটু সবুর ক'রে গেলে পারতে। পয়লা মে'র উৎসব নাগাদ আমাদের ক্ষমা করার সরকারী হুকুম বেরোবে। তখন আমরা যার যার ঘরে ফিরে যাব।'

'না, আর সবুর করতে পারছি না,' এই বলে গ্রিগোরি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

পর দিন সকালে তাতারস্কি গ্রামের মুখোমুখি দনের কাছে এসে হাজির হল। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল পিতৃপুরুষের ভিটে। আনন্দে ও উত্তেজনায় ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল ও'র মুখ। রাইফেল আর ফৌজী থলেটা কাঁধ থেকে নামাল। রিফু করার সরঞ্জাম, খানিকটা ফেঁসো, বন্দুক পরিষ্কার করার এক শিশি তেল বার করল। কার্তুজগুলো কেন যেন একবার গুনে দেখল। বারোটা ক্লিপ আর ছাব্বিশটা খুচরো।

খাড়া পারে, খাতের কাছে বরফ তীর থেকে দূরে সরে গেছে। স্বচ্ছ নীল জল ছলাৎ ছলাৎ করে ধাক্কা খেয়ে ধারের বরফের ছুঁচাল ডগাগুলো ভেঙে দিচ্ছে। গ্রিগোরি ওর রাইফেলটা আর পিস্তলটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। শেষে কার্তুজগুলোও, জলাঞ্জলি দিয়ে সযত্নে হাত মুছল গ্রেটকোটের কিনারায়।

মার্চ মাসের বরফ। গাঁয়ের দিক থেকে জেটির কাছটায় ঘন নীল বরফ আধগলা হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে আছে। সেখান দিয়ে দন পার হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বাড়ির দিকে চলল।

দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল মিশাত্‌কাকে ঘাটের কাছে ঢালু জায়গাটার মাথায়। একছুটে ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল।

একটা পাথরের গায়ে লম্বা লম্বা কাঠি হয়ে বরফ ঝুলছিল। মিশাত্‌কা সেগুলো ভেঙে ভেঙে জলে ছুঁড়ে ফেলছে আর মন দিয়ে লক্ষ করছে নীলচে ভাঙা টুকরোগুলোর পাহাড় বয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া।

গ্রিগোরি ঢালু জায়গাটার কাছে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা গলায় ডাকল ছেলেকে: 'ওরে মিশাত্‌কা! . . . বাপধন আমার! . . .'

মিশাত্‌কা ভয়ে চমকে উঠে ওর দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। ভয়ঙ্কর চেহারার এই দাড়িওয়ালা লোকটাকে ওর বাবা বলে চিনতে পারল। . . .

সেই ওক বনে ছেলেমেয়েদের স্মরণ ক'রে এত কাল রাত্রে যত মিষ্টি, যত আদরের কথা সে মনে মনে আউড়েছিল সব যেন এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল ওর স্মৃতি থেকে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে ছেলের ঠাণ্ডা গোলাপী

ছোট্ট হাতদুটোতে চুমু খেতে খেতে ধরা গলায় সে বারবার আওড়াতে লাগল একটি মাত্র কথা: 'ওরে খোকা আমার।... আমার খোকা।...'

ছেলেকে কোলে তুলে নিল গ্রিগোরি। শুকনো জ্বালাধরা চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি লোভীর মতো ছেলের মুখে বিঁধিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোরা সব কেমন আছিস? পিসিমা, পলিউশ্‌কা সবাই ভালো আছে ত?'

তখনও বাপের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না মিশাত্‌কা। মৃদু গলায় উত্তর দিল, 'দুনিয়া পিসি ভালো আছে। কিন্তু পলিউশ্‌কা মারা গেছে শরৎকালে। ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছিল। মিখাইল পিসে পল্টনে কাজ করছে।...'

যা হোক, এত কাল বিনিদ্র রাত কাটিয়ে গ্রিগোরি যে স্বপ্ন দেখেছে তার অন্তত খানিকটাও গ্রিগোরির জীবনে সফল হল। সে দাঁড়িয়ে আছে তার নিজের বাড়ির ফটকের সামনে, ছেলে কোলে নিয়ে।...

তার জীবনে থাকার মধ্যে আছে শুধু এইটুকুই, যা এখনও তাকে আত্মীয়তার সম্পর্কে বেঁধে রেখে দিয়েছে, মাটির সঙ্গে, শীতল সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত এই বিপুল বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুর সঙ্গে।

সমাপ্ত

'রাদুগা' প্রকাশন থেকে ১৯৯১ সালে
প্রকাশিত হবে

ভাসিলি ইয়ান। বাতু

ভাসিলি ইয়ান (১৮৭৪-১৯৫৪) বিখ্যাত রুশ লেখক, ইতিহাসবিদ ও পর্যটক। সর্বতোমুখী অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই মানুষটি বহু বছর ধরে এশিয়ায় ইতিহাস চর্চা করেন। প্রাচীন মোঙ্গল, চৈনিক, পারসিক, আরবী ও রুশ সর্বপঞ্জী এবং রুশী ও বিদেশী গবেষকদের রচনার সঙ্গে তাঁর চমৎকার পরিচয় ছিল।

'তাঁর সাহিত্যকীর্তির শীর্ষস্বরূপ হয়ে আছে 'মোঙ্গল আক্রমণ' বিষয়ক রচনাত্রয়ী – ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চেঙ্গিজ খান' (বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত), 'বাতু' আর 'শেষ সাগরের সন্ধানে'। উপাখ্যান তিনটি সোভিয়েত সাহিত্যের ক্ল্যাসিক। এগুলিতে আখ্যানভাগ এমনভাবে বিন্যস্ত যে তিনটি গ্রন্থই সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবে পঠিত হতে পারে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য, আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

М. Шолохов, Тихий Дон. Роман в 4-х книгах.
Перевод сделан по изданию: Шолохов М.,
Тихий Дон., в 2 тт., Т.2, изд-во «Молодая гвардия»,
М., 1980.

Переводчик Арун Сом
Редактор русского текста Е. Нестерова
Контрольный редактор В. Коровин
Художник Б. Алимов
Художественный редактор Н. Малкина
Технический редактор Л. Чуева
Корректор Т. Хандик

ИБ № 5850

Сдано в набор 5.09.89. Подписано в печать 31.07.90. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура Бенгали. Печать офсет. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 30,46. Уч.-изд. л. 45,4. Тираж 3580 экз. Заказ № 580. Цена 3 р. 80 к. Изд. № 6524. Издательство "Радуга" В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по печати. 119859, Москва, Зубовский бульвар, 17. Фирмы-партнеры: Маниша Грантхалая (П) Лтд., г. Калькутта, Индия; Джатия Сахитья Пракашани и Стандард Паблишерз, г. Дакка, Бангладеш. Отпечатано с готовых пленок типография издательства "Правда". Бумажный проезд, д. 14 в ордена Трудового Красного Знамени Московской типографии № 7 "Искра революции" В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по печати. 103001, Москва, Трехпрудный пер. 9.

5 р. 80 к.

মিখাইল শোলখভ

'প্রশান্ত দন' সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে। দন-কসাকদের জীবনযাত্রা নিয়ে লিখিত এই উপন্যাসে মিখাইল শোলখভ (১৯০৫ - ১৯৮৪) এমন সমস্ত চরিত্রের ভাগ্য ও জীবনের গতিপথ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৭ সালের অক্টোবর মহাবিপ্লব ও গৃহযুদ্ধকালীন ঘটনাবলীর প্রবল ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়েছে। যে প্রসাদগুণ, শিল্পবোধ আর নিখুঁত ইতিহাসচেতনার সমাহারে ইতিহাসের ঘটনা উপন্যাস হয়ে ওঠে তারই সাহায্যে লেখক সমাজ-জীবনে, মানুষের ব্যক্তি-চৈতন্যে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের এক জটিল সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

উপন্যাসটি লেখককে নোবেল পুরস্কারবিজয়ীর দুর্লভ খ্যাতি এনে দিয়েছে।

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো